সাহিত্য

মাসিকপত্র ও সমালোচন

———::○::———

শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি

সম্পাদিত

——:○:——

কলিকাতা,

২।১, রামধন মিত্রের লেন, সাহিত্য-কার্য্যালয় হইতে

সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও

৭১, বলরাম দের ষ্ট্রীট, মেটকাফ প্রেসে

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মিত্র দ্বারা মুদ্রিত।

সাহিত্য

মাসিকপত্র ও সমালোচন

———::০::———

শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি

সম্পাদিত

——:০:——

কলিকাতা,

২।১, রামধন মিত্রের লেন, সাহিত্য-কার্য্যালয় হইতে

সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও

৭[illegible], বলরাম দের ষ্ট্রীট, মেটকাফ প্রেসে

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মিত্র দ্বারা মুদ্রিত।

ইহারা জাতিভেদ স্বীকার করে না, এবং হিন্দু মুসলমানদিগের ন্যায় খাদ্যাখাদ্যও বিচার করে না। (৩) এ জন্য ভিন্নসম্প্রদায়ী লোকের নিকট সে বিষয় গোপন রাখিবার নিমিত্ত কতকগুলি সাঙ্কেতিক শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকে। তাহার কয়েকটা শব্দ নিম্নে প্রকাশিত হইল।

সনিপ	জল	বটের	হাঁস
ফুলারাম, ফুল	ভাত	হুদুররাম	মদ্য
রুক্মিণী	দাল	জলাধেম	মৎস্য
মুন্না	রুটি	হুধি	বাগুন
বাতাসা	পাঁউরুটি	সনিপদর্কন	জলপান
কাঁঠাল	ছাগমাংস	মুরলি	হুঁকা
রামবস	লবণ	খৈনি	দোক্তা
রামকরলা	পলাণ্ডু	পিহনি	গুড়াকু
কবুতরি	লশুন	আকাশকামিনী	তাড়ি
চন্দনখোরি	শূকরমাংস	আনন্দরাম	গাঁজা
তিতর	মুরগি	ভোলারাম	অহিফেণ

এই সম্প্রদায়ের আর এক নাম সন্ত; ইহার প্রবর্ত্তকের নাম শিবনারায়ণ বলিয়া শিবনারায়ণী সংজ্ঞা হইয়াছে। গাজিপুরের অন্তঃপাতী চন্দোয়ার গ্রামে নরাওনি নামক ক্ষত্রিয়কুলে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি মহম্মদ শাহের রাজত্বকালে ধর্ম্মপ্রয়োজক বলিয়া বিখ্যাত হন, এবং ১৭৯১ সংবতে গুরুন্যাস নামে এক গ্রন্থ প্রস্তুত করেন। (৪) তদ্ভিন্ন লও, সন্তবিলাস, ওজন, সন্তসুন্দর, সন্তাখেরি, সন্তউপদেশ, তিনবাসী শব্দাবলী, সন্তমহিমা, জ্ঞানবাণী প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁহার প্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে।

শিবনারায়ণের চারি শিষ্য ছিল; রামনাথরাম, যুবরাজরাম, রঘুনন্দন-

---

(৩) দেখি দেখি ঘর যাও।
যো মন চাহে সো খাও॥

বিচার করিয়া চল,
যাহা খাইতে রুচি হয় তাহাই খাও।

(৪) সম্বৎ সত্তর অস্ত একনব্বই হোই।
এগার অস্ত সন্ পঁয়তাল্লিশ সোই॥
অগ্রহাণ মাস পহ্ উজিয়ারা।
তিথি ত্রয়োদশী শুক্র সে বারা॥
তেই দিনে নির্ম্মল কথা বুনীতা।

গুরুন্যাস কথা সব হীতা॥
শাহ মহম্মদ দিল্লী স্থলতানা।
কাশী ছত্র আগর হ্যায় যানা॥
তেই সময়মে শিবনারায়ণ বঙ্গদেশ চলি আউ।
কণ্ঠে বৈসে সরস্বতী কথান্যাস বনাউ॥

রাম ও লক্ষ্মণরাম। (৫) লক্ষ্মণরামের শিষ্য সদাশিবরাম হুকুমনামা ও সওয়াল-জবাব নামে দুই গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই সদাশিবরামের শিষ্য বলদিরাম কলিকাতাস্থ সন্তদিগের মহন্ত ছিলেন। লক্ষ্মণরাম এ সম্প্রদায়ের এক জন গণ্য মনুষ্য, কিন্তু তিনি লোকরঞ্জনার্থ কিছু কিছু কপট ব্যবহার করিয়াছিলেন। শিবনারায়ণ-প্রণীত জ্ঞানবাণী ও তিনবাণী গ্রন্থে প্রতিমাপূজা ও হিন্দুশাস্ত্রসিদ্ধ নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়ার নিষেধ আছে; এ জন্য লক্ষ্মণরাম তাহা গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন। সদাশিবরাম তিনবাণী প্রকাশ করেন। লক্ষ্মণরাম স্বীয় সম্প্রদায়ে লোকসংগ্রহার্থ মোহনভোগের কড়া ও ভাণ্ডারা, (৬) উপাসনার পর আজ্ঞারি, (৭) কবীরপন্থীদিগের ন্যায় বন্দেগি, বসন্তপঞ্চমীর উৎসব ইত্যাদি কতকগুলি কাল্পনিক ব্যবহার প্রচলিত করেন। আর পূর্ব্বে যে সকল সাঙ্কেতিক শব্দ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাও তাঁহারই সঙ্কলিত, শুনা গিয়াছে। অবগত হওয়া গিয়াছে, তিনিই স্বীয় সম্প্রদায়মধ্যে বিধবাদিগের পুনঃসংস্কার প্রচলিত করিয়া যান।

এ সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িক গ্রন্থের নামোল্লেখ করা গিয়াছে; এক্ষণে তাহা হইতে কতিপয় বচন উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

১। কর্ত্তা সব গুণকারকা গুণ কারণ ভও ভার।
সৃষ্টি সোঁয়ারণ চার ফল চাল চলন ব্যবহার॥

২। তুঁহ দুঃখহরন সকল সংসারা।
শিবনারায়ণ দাস তোমারা॥

৩। তোহি ছোরি আওর গহো কাহি।
তও মায়ার ন লেতাহ নিবাহি॥

৪। সন্তপতি কান্ত তুঁহি পতি পিতা পরমগুরু সমদর্শী।
শান্ত তুঁহি আদি মধ্য অন্ত বাণিমে গুণখানি তুঁহি॥

---

(৫) এই প্রকার প্রবাদ আছে, যে কোনও ব্যক্তি শিবনারায়ণের সমীপে আগমন করিলে, তিনি তাঁহাকে স্নেহপূর্ব্বক "আইয়ে মেরা রাম!" বলিয়া সম্বোধন করিতেন, এবং যে ব্যক্তি তাঁহার মত অবলম্বন করিত, তাহার নামের অন্তে "রাম" শব্দ যোগ করিয়া দিতেন।

(৬) মিষ্টান্নভোজন।

(৭) থালার উপরে ধুনচি রাখিয়া, তাহাতে ধূপ, ধূনা, লোবান, জটামাংসী, কর্পূর প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য দগ্ধ করিতে হয়, এবং পুস্তকের উপরে সেই ধুনচি ধারণ করিয়া ঘূর্ণিত করিতে হয়। ইহাকেই আজ্ঞারি বলে। ঐ থালার উপরে ঘৃতের দীপও দিয়া থাকে।

৫। ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি সব দেবা।
করত সত্যকি সব কোই সেবা॥
৬। সতী স্ত্রীয়াকো যস্ পতি পিয়ারা।
ত্যায়সে সন্তনকো সন্তপতি ইয়ারা॥
৭। জেঁও নেহি সতী দুজা পতি ভাবে।
ত্যায়সে সন্ত জন পরদেব না সেবে॥
৮। অপর দেব পূজা সব ভ্রম হ্যায়।
মিথ্যা দুঃখভোগ সব শ্রম হ্যায়॥
৯। অপর দেবতে শুভ কহে যোই।
কালকর্ম্মকে বশ হ্যায় সোই॥
১০। সন্ত নাম ধরাইকে না পূজে দেও পাথর।
ইহে লোক দুঃখ পাইকে পড়হি নরক ঘোর॥
১১। ছাড় বাত কাঁচা। সত্য শব্দ সাঁচা॥
১২। যো দুঃখ প[illegible] তো সত্য ব্যবহারা।
সত্যকি জানো পুরুখ অপারা॥
১৩। পরস্ত্রী দেখিকে নয়ন ছিপায়ে।
সঙ্গ কুসঙ্গ কবহুঁ নাহি হোয়ে॥
১৪। বাস পাওৎ ফিরি না আওৎ বহুবি ইহ জগপন্থা॥
বহুৎ জনা সব ঢুঁড়ৎ ফিরে গলে ডারে কন্থা॥
কেহু বোকো সকা ঢুঁড়ৎ কেহু পূজ ধ্যান।
কেহু তীরথ বরত দেও পাথর পূজে লেহু গতিপতিজ্ঞান॥
এক এক সব ঢুঁড়ৎ ফিরে ভূকে পায় নাহি অন্ত।
আপু আপনো জানু নাহি কহত কেহু সন্ত॥

গীত।

ওহি দেশ বসন্ত গাইয়ে যাঁহা রহিমি দিবস না হোই।
যাঁহা ধরতি আকাশা না পাতালা ; যাঁহা চাঁদ সুরয না তারা
বিনা দীপক উজিয়ারা হো ; যাঁহা বিন্দুদক কমল ফুলানা,
মধুবন পিয়া মরু ঝানা তাঁহা শিবনারায়ণ মন মনা ;
তাঁহা সন্তন কিয়া পিয়া না।

৺অক্ষয়কুমার দত্ত।

বৈবাহিক আচার ও অনুষ্ঠান।

এক্ষণে যে সকল জাতি পৃথিবীতে সভ্য বলিয়া পরিগণিত, তাহাদের সকলেরই বিবাহ-ব্যাপার অল্লাধিকপরিমাণে অনুষ্ঠানাত্মক। সভ্যসমাজে গুরুতর কার্য্য-মাত্রই অনুষ্ঠানাত্মক; এবং মানব-জীবনে বিবাহের ন্যায় গুরুতর কার্য্য আর কি আছে? সুতরাং সভ্য-সমাজে বিবাহ-ব্যাপার যে অনুষ্ঠান-পরায়ণ হইবে, ইহা স্বতঃসিদ্ধের মধ্যে। কিন্তু চিরদিনই যে বিবাহ-ব্যাপার অনুষ্ঠানসাপেক্ষ ছিল, এরূপ নির্দ্দেশ করা যায় না। মনুষ্যেতিহাসের প্রথম অবস্থায় বোধ হয় যৌন-সম্মিলন-ব্যাপার অনুষ্ঠান-নিরপেক্ষ ছিল। এখনও এরূপ অনেক অসভ্য জাতি পৃথিবীতে বিদ্যমান আছে, যাহাদের মধ্যে বিবাহ ব্যাপারে কোন প্রকার অনুষ্ঠান আচরিত হয় না। এস্কিমো জাতির মধ্যে পুরুষ কোন কন্যাকে আপন কুটীরে লইয়া গিয়া একত্র বাস করিলেই বিবাহ সিদ্ধ হয়। স্কুলক্রাফট্ সাহেব বলেন যে, কোমাঞ্চি জাতির বিবাহ আচার-শূন্য। আমাদের দেশের খাসিয়া ও চালিকাটা মিশ্মি জাতির সম্বন্ধে ডালটন সাহেব ইহাই বলিয়াছেন।

কিন্তু মানুষ খানিকটা উন্নত হইলে, বিবাহ-ব্যাপারের গুরুত্ব খানিকটা উপলব্ধি করিলে, বিবাহকার্য্যে আচার অনুষ্ঠান স্বতঃই প্রবর্ত্তিত হয়। প্রচলিত এবং বিলুপ্ত বৈবাহিক আচার অনুষ্ঠানের আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, সে সকল নানারূপে উদ্ভূত হয়। কতকগুলি বর-কন্যার অভিনব-সম্বন্ধ-সূচক। একত্র পানাহারই ইহার মধ্যে প্রধান ও বিস্তৃতভাবে প্রচলিত। কোথাও এই পানাহার বর-কন্যার মধ্যেই নিবদ্ধ; কোথাও বা আত্মীয় বন্ধু বান্ধবও এই উৎসবে আহূত হইয়া থাকেন। নাভাজো জাতির বৈবাহিক অনুষ্ঠান কেবলমাত্র এই যে, বর-কন্যা উভয়ে একই পাত্রে কিঞ্চিৎ পিষ্টক ভোজন করে। সাঁওতাল-দিগের মধ্যে বর-কন্যা একত্র আহার করিলেই কন্যা পিতৃকুল হইতে বিমুক্ত এবং স্বামিকুলে সংযুক্ত বলিয়া পরিগণিত হয়। মালয় দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসী-দিগের মধ্যে একত্র ভোজনই বিবাহের প্রধান অনুষ্ঠান। ব্রেজিলের কতকগুলি জাতির নিয়ম এই যে, বর ও কন্যা একত্র সুরাপান করিলেই বিবাহ সিদ্ধ হয়। জাপানে বর-কন্যাকে নির্দ্ধারিতসংখ্যক সুরা-পাত্র নিঃশেষিত করিতে হয়; ইহাই তাহাদের প্রধান বৈবাহিক অনুষ্ঠান। কিয়ংথ প্রভৃতি অনেক জাতির বিবাহ-

ব্যাপারে সূত্রবন্ধনই একমাত্র অনুষ্ঠান। মলক্কার ওরাংবান্নুয়া জাতির বরকন্যা একত্র বসিয়া পরস্পরের কর-গ্রহণ করে, এবং তখন তাহাদের পিতা মাতা নব দম্পতিকে পরস্পরের প্রতি সদ্ভাবসম্পন্ন হইবার ও কলহাদি হইতে বিরত থাকিবার আদেশ করিয়া আশীর্ব্বাদ করেন। ইহাতেই তাহাদের বিবাহ-ব্যাপার সম্পন্ন হয়। এই কর-গ্রহণের অনুষ্ঠান আমাদের মধ্যেও প্রচলিত আছে— বিবাহের একটা নামই পাণিগ্রহণ। রোমান্‌দিগের "dextrarum junctio" এই প্রকারেরই অনুষ্ঠান। ভারতবর্ষের কোন কোন প্রদেশে বর-কন্যাকে পরস্পরের শোণিত দ্বারা চিহ্নিত করিবার রীতি প্রচলিত আছে। ইহা অবশ্যই স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধের ঘনিষ্ঠতাসূচক। ডাল্‌টন্ সাহেব বিবেচনা করেন যে, সীমন্তে সিন্দুর-ধারণপদ্ধতি এই প্রথারই লোপাবশিষ্ট চিহ্ন।

কতকগুলি বৈবাহিক অনুষ্ঠান পূর্ব্ব-প্রচলিত, অধুনা-পরিত্যক্ত, বিবাহ-পদ্ধতির লোপাবশেষ। রাক্ষস-বিবাহ সভ্যসমাজে আর প্রচলিত নাই; তথাপি ইংরেজদিগের বরের সঙ্গে এক জন 'বেষ্ট্‌ম্যান্', আমাদের বরের সঙ্গে এক জন 'নীত-বর' আজিও থাকে। আমাদের এই বাঙ্গলা দেশেরই ক্ষত্রিয়েরা আজি পর্য্যন্ত বিবাহ করিতে তরবারি লইয়া যায়। রাক্ষস-বিবাহের লোপাবশিষ্ট নিদর্শন বলিয়া পরিগণিত না করিলে, এ সকল প্রথার ব্যাখ্যা দুর্ঘট হইয়া উঠে। পরিত্যক্ত বিবাহপদ্ধতি প্রচলিত বিবাহপদ্ধতিতে অনুষ্ঠানরূপে বিদ্যমান থাকার দৃষ্টান্ত অসভ্যসমাজে খুবই পরিস্ফুট দেখা যায়। যে সকল অসভ্য জাতি বিবাহ-ব্যাপারে রাক্ষস-প্রণালী পরিত্যাগ করিয়া আসুর-প্রণালী অবলম্বন করিয়াছে, তাহারাও পরিত্যক্ত রাক্ষস-প্রণালীর একটা অভিনয় করিয়া থাকে। অরোকানীয় জাতির মধ্যে বলপ্রয়োগের ভাণ করিয়া কন্যাহরণ করা বিবাহের অবশ্যপালনীয় পূর্ব্বানুষ্ঠান। এমন কি, কন্যা বরের যতই কেন অনুরাগিণী হউক না, সে যদি এই কৃত্রিম অপহরণে বাধা না দেয়, এবং আত্মমুক্তির চেষ্টা না করে, তাহা হইলে নারীধর্ম্মের অবমাননাকারিণী বলিয়া তাহাকে সমাজমধ্যে নিন্দিত হইতে হয়। মস্কিটো ইণ্ডিয়ানদিগের মধ্যে বিবাহের কথাবার্ত্তা স্থির হইয়া গেলে, এবং যৌতুক উপহারাদির আদান প্রদান হওয়ার পর, বর আসিয়া বলপ্রকাশের ভাণ করিয়া কন্যাকে ধরিয়া লইয়া যায়—কন্যাপক্ষের কুটুম্বিনীরা কিঞ্চিৎ বাধাপ্রদর্শনের অভিনয়ও করিয়া থাকে। বেচুয়ানা জাতির বৈবাহিক অনুষ্ঠানের মধ্যে একটি এই যে, বর কর্ত্তৃক কন্যার কুটীরে একটি শর নিক্ষিপ্ত হয়। এই রীতি যে রাক্ষস-

বিবাহেরই লোপাবশেষ, ইহা সহজেই বলা যায়। ওয়াকাম্বা জাতির মধ্যে আস্থর-বিবাহ প্রচলিত; কিন্তু মূল্যাদি স্থির হইলে পর ইহাদিগকেও বলপ্রয়োগপূর্ব্বক বা কৌশলে কন্যাহরণ করিতে হয়। এ বিষয়ে আর দৃষ্টান্তবাহুল্যের বোধ হয় প্রয়োজন নাই।

কতকগুলি বৈবাহিক অনুষ্ঠান, বর কর্ত্তৃক কন্যার উপর কর্তৃত্বগ্রহণ, বা কন্যার পিতা কর্ত্তৃক বরের হাতে কর্তৃত্বভারের পরিচায়ক। ক্রোয়াশিয়া প্রদেশের বর, কন্যার গণ্ডে মুষ্ট্যাঘাত করে;—ইহার অর্থ অবশ্যই এই যে, "আজি হইতে আমি তোমার প্রভু, তুমি আমার আমার আজ্ঞানুবর্ত্তিনী দাসী।" প্রাচীন কালে রুসিয়া রাজ্যে একটী বৈবাহিক অনুষ্ঠান এইরূপ ছিল;—বিবাহকালে কন্যার পিতা একখানি চাবুক হস্তে লইয়া কন্যার পৃষ্ঠে একটু মৃদু আঘাত করিয়া বলিতেন,—"ইহাই আমার শেষ শাস[illegible] তার পর চাবুকখানি বরের হাতে দিয়া বলিতেন,—"আজ হইতে ইহার শাসনের ভার তোমার হাতে।"

মানুষ খানিকটা সভ্য হইলে, তাহাদের বিবাহের ন্যায় গুরুতর ব্যাপার যে ধর্ম্মসংস্রববিশিষ্ট হইবে, ইহা অবশ্যম্ভাবী। সেই জন্য অনেক স্থলে দেখা যায় যে, বিবাহ-ব্যাপার ধর্ম্মযাজকগণের আশীর্ব্বাদ বা প্রার্থনাসাপেক্ষ। ইহা যে কেবল সভ্যতাপ্রাপ্ত জাতিদিগের লক্ষণ, এরূপ নহে। বরং দেখা যায় যে, মানুষ অতিরিক্ত সভ্যতার গৌরবস্পর্দ্ধা করিতে আরম্ভ করিলে বিবাহব্যাপারকে ধর্ম্ম-সংস্রব হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলে। এইরূপ দৃশ্য ইউরোপখণ্ডেই বিশেষরূপে পরিস্ফুট; কেন না, ইউরোপীয় জনসাধারণ ধর্ম্ম-প্রাণ জনসাধারণ নহে; তাহারা মুখে ধর্ম্মের দোহাই দেয় বটে, কিন্তু ধর্ম্মভাবকে জীবনের অংশীভূত করিতে পারে না।

অনেক অসভ্য সমাজে বিবাহ-ব্যাপার ধর্ম্ম্য-অনুষ্ঠান-সাপেক্ষ। গন্দ জাতির বিবাহ দেবোদ্দেশে বলি-প্রদান না করিয়া নিষ্পন্ন হয় না। পেটাগোনীয়েরা স্ত্রী-গ্রহণ করিয়া দেবোদ্দেশে বলিদান করে। আমেরিকার মেকটেকা জাতি বিবাহের পর বিংশতি দিন ধরিয়া উপবাস করে, বলিদান করে, এবং দেবতার কাছে বলিদান করে। ফিজিয়ানদিগের ন্যায় অসভ্যদিগের মধ্যেও বিবাহকালে পুরোহিত আসিয়া আসন গ্রহণ করিলে, বর তাহার দক্ষিণ পার্শ্বে এবং কন্যা বাম পার্শ্বে উপবেশন করে। তখন পুরোহিত, কন্যার জন্য দেবতার নিকট কৃপা প্রার্থনা করিয়া, বর-কন্যার হস্ত সংযুক্ত করিয়া, এই বলিয়া আশী-

চন প্রদান করে,—"তোমরা দুই জনে পরস্পরের প্রতি প্রেম-সম্পন্ন, শ্রদ্ধাশীল ভক্তিশীল হইবে; পরস্পরের নিকট বশ্যতা প্রতিপালন করিবে ও একনিষ্ঠ হইবে, এবং শেষে একত্র পরলোক-যাত্রা করিবে।" কি সুন্দর, কি চমৎকার আশীর্ব্বাদ! ইহার পর আর কোন দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন এবং অসঙ্গত।

এসিয়া খণ্ডের সভ্য ও অর্দ্ধ-সভ্য জাতিদিগের মধ্যে বিবাহ কার্য্যে ধর্ম্ম্য অনুষ্ঠান প্রচলিত। যাহাদের বিবাহ কেবল চুক্তিমাত্র, তাহারাও বিবাহ-কালে ঈশ্বরোপাসনা করে, এবং ধর্ম্মযাজকের সাহায্যে এ ব্যাপার নিষ্পন্ন করে। মুসলমানদিগের বিবাহ একটা ব্যক্তিগত চুক্তিমাত্র, তথাপি আল্লার প্রসাদ প্রার্থনা করিয়া ইহা সম্পাদিত হয়। বৌদ্ধেরা যৌনসম্মিলন ব্যাপারকে অতি কদর্য্য, অতি হেয় বলিয়া মনে করে; সুতরাং তাহাদের বিবেচনায় বিবাহ-ব্যাপার মনুষ্যের স্বাভাবিক দুর্ব্বলতার অনিবার্য্য ফলস্বরূপ—একটা কুপ্রথা এড়াইবার যো নাই বলিয়াই ইহার অনুমোদন করিতে হয়। তথাপি বৌদ্ধদিগের বিবাহেও ধর্ম্ম্য অনুষ্ঠান আচরিত হয়—অনেক স্থলে লামার পৌরোহিত্যে ইহা সম্পন্ন হয়। হিব্রু জাতির বিবাহপদ্ধতিতে কোন ধর্ম্ম্য আচরণের অস্তিত্বের প্রমাণ তালমুদে বা বাইবেলে নাই, তথাপি কোন কোন প্রত্নতত্ত্বকোবিদ অনুমান করেন যে, ইহাদের মধ্যেও বিবাহ-কার্য্যে ধর্ম্ম্য অনুষ্ঠান আচরিত হইত। ভারতবর্ষীয় আর্য্যদিগের কথা উল্লেখ করা বাহুল্যমাত্র। আমাদিগের মধ্যে বিবাহ একটা সংস্কার—মনুষ্য-জীবনের সর্ব্ব-প্রধান সংস্কার—স্ত্রীজাতির একমাত্র সংস্কার।

ইউরোপে দেখা যায় যে, ঐতিহাসিক কালে গ্রীক ও টিউটনদিগের মধ্যে বিবাহকার্য্যে ধর্ম্ম্য অনুষ্ঠানের অস্তিত্বের কোন পরিচয় নাই। রোমকদিগের ত্রিবিধ বিবাহ-পদ্ধতির মধ্যে কেবল এক পদ্ধতির (confarreatio) বিবাহে একটু ধর্ম্মের সংস্রব পাওয়া যায়, কিন্তু তাহাও বহুপ্রাচীনকালসমাগত। পরবর্ত্তী কালে, অর্থাৎ সভ্যতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, ইহা ক্রমেই লুপ্ত হইয়া যাইতেছিল। খৃষ্টীয়ান ধর্ম্ম প্রচলিত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে ইহা প্রায় লুপ্ত হইয়াছিল।

খৃষ্টীয়ান ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক স্বয়ং যদিও বিবাহানুষ্ঠান সম্বন্ধে কোন প্রকার ধর্ম্ম্য আচরণের ব্যবস্থা করেন নাই, তথাপি ইউরোপে খৃষ্টীয় ধর্ম্ম লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই বিবাহ-ব্যাপারে ধর্ম্ম্য অনুষ্ঠান পুনঃপ্রচলিত হয়। খৃষ্টীয়ান

ধর্ম্মের সর্ব্বপ্রধান সংস্কারক মার্টিন লুথর, যদিও এইরূপ মত প্রচার করিয়াছিলেন যে, বিবাহটা সামাজিক ব্যাপারমাত্র, ধর্ম্মের সহিত [illegible] কোন সম্পর্ক নাই, তথাপি তাঁহার শিষ্যেরা এই মতের অনুবর্ত্তন করে নাই। তাঁহার পরেও প্রোটেষ্টাণ্ট [illegible] বিবাহ ব্যাপারকে ঈশ্বর-নির্দ্দিষ্ট বিধান বলিয়াই বিবেচনা করিতে লাগিল, এবং পুরোহিতের সাহায্যেই তাহা নিষ্পন্ন করিতে চলিল।

ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের প্রসাদে এই বিধানের পরিবর্ত্তন হইয়া [illegible]। সেই অবধি ইউরোপে বিবাহানুষ্ঠান সামাজিক যৌন-সম্মিলনে (civil marriage) রূপান্তরিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। দিন দিন ইহার প্রসার বৃদ্ধি পাইতেছে। ভবিষ্যতে যে এই পদ্ধতি বহুপ্রচলিত হইবে, এরূপ [illegible] নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ত, ইউরোপ ধর্ম্মপ্রাণ নহে।

শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়।

নবাবিষ্কৃত গুপ্তমুদ্রা।

রাঙ্গামাটি মুর্শিদাবাদের একটি পরম রমণীয় স্থান। ইহার উচ্চ রক্তবর্ণ ভূমি বর্ষাকালে ভাগীরথী-বক্ষ হইতে বড়ই সুন্দর দেখায়। রাঙ্গামাটী আবার মুর্শিদা[illegible] একটি বহু প্রাচীন স্থান বলিয়াও প্রসিদ্ধ। ইহা চীন পরিব্রাজক হিউএন্‌ সিয়ঙ্গ-বর্ণিত কর্ণসুবর্ণ বলিয়া একরূপ প্রতিপন্ন হইয়াছে। মুর্শিদাবাদের ইতিহাস লিখিতে প্রবৃত্ত হওয়ায় আমাকে এই প্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করিতে হইতেছে। রাঙ্গামাটি কর্ণসুবর্ণ কি না, এ বিষয়ে যত দূর অনুসন্ধান ও গবেষণা হইয়াছে, তদপেক্ষা আরও অনুসন্ধানের আবশ্যক বিবেচনায়, আমি অনেক দিন হইতে উক্ত বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। সেই জন্য সম্প্রতি একবার আমাকে রাঙ্গামাটী গমন করিতে হইয়াছিল। রাঙ্গামাটী মুর্শিদাবাদ হইতে ছয় ক্রোশ ও বহরমপুর হইতে তিন ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিম। যত দিন মুর্শিদাবাদে আসিয়াছি, তদবধি শুনিয়া আসিতেছি যে, রাঙ্গামাটী প্রাচীন স্থান, তথায় দাতাকর্ণের বাটী ছিল; তাঁহার পুত্রের

অন্নপ্রাশনের সময় বিভীষণ স্বর্ণবৃষ্টি করিয়াছিলেন বলিয়া উক্ত স্থানের ভূমি রক্তবর্ণ হইয়াছে, ইত্যাদি। ইহাও শুনিয়া আসিতেছি যে, সেখানে অনেক লোকে টাকা, মোহর প্রভৃতি কুড়াইয়া পায়। কিন্তু কি প্রকারের টাকা বা মোহর, তাহা দেখি নাই; তবে তাহাদের আকার প্রকার সম্বন্ধে দুই একটি কথামাত্র শুনিয়াছিলাম। সুতরাং কোন্ জাতীয় মোহর বা টাকা, তাহার কিছুই স্থির করিতে পারি নাই। সম্প্রতি রাঙ্গামাটী গমন করিয়া অনেকের নিকট টাকা মোহর প্রভৃতির প্রাপ্তি সম্বন্ধে নানারূপ গল্প শুনিলাম। কিন্তু যাহারা পাইয়াছে, তাহারা স্বীকার করিল না।

আমরা যখন এইরূপ অনুসন্ধান করিতেছিলাম, সেই সময়ে এক কৃষক-পত্নী একটি মোহর পাইবার কথা স্বীকার করিল। মাঠে মৃত্তিকাখননকালে তাহা পাওয়া যায়। কৃষক-পত্নী আমাদিগকে মোহরটি দিতে অঙ্গীকৃত হয়, কিন্তু তাহা স্থানান্তরে বন্ধক থাকায় সে দিন আমাদের ভাগ্যে তাহার দর্শনলাভ ঘটিল না। যে গ্রামে কৃষক-পত্নীর বাস, তাহার নাম যদুপুর। রাঙ্গামাটী ও যদুপুর পরস্পর-সংলগ্ন গ্রাম, এবং যদুপুরের নিকটেই প্রাচীন রাজবাটী প্রভৃতির চিহ্ন বিদ্যমান। যদুপুরে কাশীমবাজারের মহারাজার অন্যতম সভা-পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামতারণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাস; তিনি উদ্যোগী হইয়া উক্ত মোহরটি আমাদের নিকট উপস্থিত করিয়া দেন। মোহরটি দেখিয়াই বুঝিলাম যে, উহা গুপ্তবংশের স্বর্ণমুদ্রা। মুদ্রাটির এক দিকে একটি পুরুষ-মূর্ত্তি (রাজমূর্ত্তি) বাম হস্তে ধনুক ধারণ করিয়া অবস্থিত; দক্ষিণ হস্তে কিছু আছে কি না, বুঝা যায় না। ঐ মূর্ত্তির দক্ষিণ দিকে একটি দণ্ড, দণ্ডের উপরি-ভাগে পক্ষীর মূর্ত্তি বলিয়া মনে হয়; বাম হস্তের নিম্নে দুইটি অক্ষরের মত বোধ হয়, অক্ষর দুইটি অর্দ্ধস্পষ্ট। অপর দিকে একটি দেবীমূর্ত্তি পায়ের উপর পা দিয়া একটি পদ্ম ফুলের বা অন্য কিছুর উপর বসিয়া আছেন। তাঁহার হাতে কিছু আছে কি না, বুঝা যায় না। বোধ হইল, দেবীর বাম দিকে কতিপয় অক্ষর ছিল, এক্ষণে তাহা, বড়ই অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। মুদ্রাটি ওজনে ৮/০ তের আনা, বা ১৪৬ গ্রেণ। আকারে পয়সা অপেক্ষাও ক্ষুদ্র। উক্ত মুদ্রার চিহ্ন সকল গুপ্তবংশীয়দের ধানুষ্ক-চিহ্নিত মুদ্রার চিহ্নের ন্যায়; আকার ও ওজনেও এক; ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় স্মিথ সাহেব গুপ্ত-বংশীয়দের মুদ্রা সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহার ধানুষ্ক-চিহ্নিত মুদ্রার সহিত ইহার চমৎকার ঐক্য আছে।—এই মুদ্রাটি তাঁহার সন্দিগ্ধ গুপ্তমুদ্রার

শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

ERRY PRESS, CALCUTTA.

শ্রেণীতে পড়িয়াছে। তাঁহার কুমার গুপ্ত মহেন্দ্রের ধানুষ্ক-চিহ্নিত সন্দিগ্ধ মুদ্রার সহিত ইহার একরূপ সম্পূর্ণ সাদৃশ্য আছে, এবং তাঁহার ৪নং প্লেটের ৮ম চিত্রের সহিত এই মুদ্রার সম্পূর্ণ ঐক্য আছে বলিলেই হয়। স্মিথ সাহেবের কথিত কুমার গুপ্ত মহেন্দ্রের সন্দিগ্ধ মুদ্রার যে আকার ও ওজন, ইহারও তাহাই। এই সকল সাদৃশ্য দেখিয়া মনে হয়, এই নবাবিষ্কৃত মুদ্রা যে গুপ্তবংশের মুদ্রা, সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ নাই। অনুসন্ধানের দ্বারা জানা গিয়াছে যে, অন্যান্য যাহারা রাঙ্গামাটীতে মোহর পাইয়াছে, তাহাদের নিকটও এই জাতীয় মোহর আছে। ইহাতে বেশ বুঝা যায় যে, রাঙ্গামাটী গুপ্তবংশীয়দের একটি প্রধান স্থান ছিল, এবং কর্ণসুবর্ণের রাজা শশাঙ্ক যে নরেন্দ্র গুপ্তের নামান্তরমাত্র, ইহাও প্রত্নতত্ত্ব-বিদ্‌গণ স্থির করিয়াছেন। উক্ত মুদ্রা ব্যতীত আমরা রাঙ্গামাটীর যমুনা সরোবর হইতে প্রাপ্ত কতকগুলি প্রস্তরাঙ্কিত মূর্ত্তিও আনয়ন করিয়াছি। আমাদের অনু-সন্ধান আজিও সমাপ্ত হয় নাই। আমরা আরও মুদ্রার অনুসন্ধানে আছি, এবং রাঙ্গামাটী সম্বন্ধে অন্যান্য অনুসন্ধান করিতেছি। অনুসন্ধান শেষ হইলে আমার মুর্শিদাবাদের ইতিহাসে রাঙ্গামাটী সম্বন্ধে যথাসাধ্য আলোচনা করিব। ইতিহাস-প্রকাশের পূর্ব্বে কর্ণসুবর্ণ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধও প্রকাশিত হইবে।

শ্রীনিখিলনাথ রায়।

রঘুনাথ।

গাথা।

সন্ধ্যা—বরষার সন্ধ্যা, মেঘে অন্ধকার,
মৃদুমন্দ অবিশ্রান্ত ঝরে বৃষ্টিধার।
পথশ্রমে শ্রান্তদেহ, শুষ্ক উপবাসে,
রিক্তকরে রঘুনাথ গৃহমুখে আসে।

কোথা গৃহ? আজি ঋণ-পরিশোধ-দিন,
গৃহস্বামী অর্থ লাগি কঠোর কঠিন।
পশারী মাসেক ঋণে রূঢ় দৃঢ়পণ,
প্রবঞ্চিতে নাহি চাই—অবস্থা ভীষণ!

এই কলি-রাজধানী—আলোকচ্ছুরিত,
আনন্দে উল্লাসে গর্ব্বে সদা মুখরিত;
কামনার কামধেনু, সর্ব্বসিদ্ধিদাতা,
ধনজনশুভস্থলী, দরিদ্র-বিমাতা।

বৃথা শিক্ষা, বৃথা দীক্ষা, বৃথা উচ্চ আশ—
থামিছে, ভাবিছে, কভু ফেলিছে নিশ্বাস।
চলিছে জনতারাশি ঠেসাঠেসি গায়,
দড়বড়ি কাদা দিয়া দ্রুত যান যায়।

চলিছে, পড়িছে মনে দূর বনগ্রাম—
তরুলতানদী-ঘেরা নিত্য অভিরাম।
চিররুগ্ন পুত্রকন্যা, শীর্ণ প্রণয়িনী,
পঙ্গু পিতা, অন্ধ মাতা, বিধবা ভগিনী।

নিত্য এই অনশন, ঋণ-নিপীড়ন,
প্রাণ কাঁদে ভিক্ষা মাগে,—সরে না বচন।
কি করিব, কোথা যাব, না দেখি উপায়,
মরিব—মরিব শেষে উদর-জ্বালায়।

ফিরিল, সেতুর পরে গেল ধীরে ধীরে,
লৌহদণ্ডে ভর দিয়া দাঁড়া'ল গম্ভীরে।
চলিয়াছে ভাগীরথী—ত্রিতাপহারিণী,
তরঙ্গিয়া কল্লোলিয়া বিপুলবারিণী।

করে মাথা, তীক্ষ্ণদৃষ্টে চাহিয়া নিশ্চল—
দেখিছে নদীর যেন কত দূরে তল!
শত বাহু বাড়াইয়া ডাকে উর্ম্মিরাশি—
"সর্ব্বদুঃখ-অবসান—দেথ হেথা আসি।

দিব তৃপ্তি, চির সুপ্তি, বল বাঁধ' মনে,
কে কার সংবাদ রাখে বিধির সৃজনে!
উর্ম্মিতে মিশিবে উর্ম্মি কিবা চিন্তা তায়?"
চমকিল রঘুনাথ কণ্টকিত-কায়।

উন্মাদের স্বপ্ন সম সম্মুখে নগরী
বিকট আলোকে শব্দে স্তূপাকারে পড়ি।
মুখেতে নগররক্ষী ধরিল আলোক।
"জীবিত না মৃত আমি? এ কি প্রেতলোক?"

বুঝিল; চলিল; পথ ক্রমশঃ নির্জ্জন,
দূরে দ্বিপ্রহর-ঘণ্টা বাজে ঢন্ ঢন্।
ইতস্ততঃ নৃত্যগীত, সুরা-কোলাহল;
"জীবন কি বিড়ম্বনা!"—বসিল বিকল।

"মৃত্যু নাই, অন্ন নাই, শরীর দুর্ব্বহ,
কোন্ অধিকারে তার দার-পরিগ্রহ?
নিরন্ন জনক আনে কোন্ অধিকারে
নিরন্ন সন্তানদলে নির্ম্মম সংসারে?

"নিরক্ষর গলগ্রহ অল্পায়ু বামন
জগতের কোন্ কার্য্য করিবে সাধন?
পুণ্যচ্ছলে মূর্ত্তিমান পাপ দেয় দেখা—
শুভ্র বিধিপটে দিতে কলঙ্কের রেখা।

"নিরন্ন পতিরে বরে যে মূঢ়কামিনী
পলে পলে মরিবে না সে আত্মঘাতিনী?
নিরন্ন পুত্রের সেই নিরন্ন জনক
জীবনে কি ভুগিবে না জীবন্ত নরক?"

উঠিল, চলিল ; এক মদ্যপ বিহ্বল
রঙ্গ করি শ্মশ্রু ধরি হাসে খল খল।
বিরক্ত, চলিতে দ্রুত কর্দ্দমে লুটায়—
"একি দানবের দেশ, মানব কোথায় ?"

কর্দ্দমাক্ত সর্ব্বদেহ সিক্ত বৃষ্টিজলে,
ছিন্নবাস, ঘূর্ণদৃষ্টি, দীর্ঘপদে চলে।
"একি ? কর্দ্দমের স্তূপ ?" দাবিল চরণ।
অতি ক্ষীণ কণ্ঠস্বর, ঈষৎ কম্পন !

স্তম্ভিত-হৃদয় রঘু নিরুদ্ধ-নিশ্বাস,
একে একে সরাইল ছিন্ন বস্ত্ররাশ।
বাহিরিল দেহ এক জীর্ণ শীর্ণ অতি,
শুষ্ক রুক্ষ অস্থিসার কিম্ভুত মূরতি।

যেন মানবেরে চেয়ে বলেনি কখন,
ওগো, তোমাদেরি মত আমি একজন।
আমিও দারুণ ক্ষুধা উদরেতে ধরি,
আশার গভীর খাতে আমিও সন্তরি।

অন্নদন্তহীন বৃদ্ধ ছিন্নদৃষ্টে চাহি,
ঝরে স্থূল অশ্রুধারা শুষ্ক গণ্ড বাহি।
প্রকট পঞ্জরে বদ্ধ শুষ্ক বাহুদ্বয়,
আনাভি কম্পিত শ্বাস—কি যন্ত্রণাময় !

সম্মুখে করাল মৃত্যু—কিবা ভয়হীন,
এই মৃত্যু সেধেছিল যেন প্রতিদিন !
আশাস্বপ্নে বিহরিত সেই প্রিয় সনে,
মিলিতে এসেছে আজ বরষানির্জ্জনে !

"পিবে জল?" প্রসারিল বদনগহ্বর,
দিল দেখা বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা ভয়ঙ্কর!
সভয়ে হটিল রঘু, এ কি নরাকারে
পড়িয়া পিশাচ কোন গ্রাসিতে আমারে?

দিল জল, গড়াইয়া পড়িল দু'পাশে।
"কোথা গৃহ?" ত্যক্তদৃষ্টে চাহিল আকাশে।
"সকলেরি গৃহ ওই"—একি অন্ধকার—
স্তব্ধ ক্ষুব্ধ চির-অন্ধ অতল অপার!

"সবারি কি ওই গৃহ?" ক্রুদ্ধ রঘুনাথ।
"সুধুই কি জন্ম মৃত্যু শূন্যে যাতায়াত?
দয়াহীন মায়াহীন বিধাতৃবিহীন
সবারি কি ওই গৃহ?" দৃষ্টি শূন্যে লীন।

"সত্য বটে ওই গৃহ! জন্ম বিড়ম্বনা।
তোমার আমার শুধু দারিদ্র্য-সাধনা!
নিত্য হাহাকাররোলে ধরণী ধ্বনিত,
থাকিলে দুঃখীর বিধি অবশ্য শুনিত।"

সহসা বিকট শব্দ—'তস্কর পলায়।'
প্রাণপণে ছোটে এক দীর্ঘ দৃঢ়কায়।
বাধিল, পড়িল, পলে ছুটিল আবার,
পশ্চাতে তেমতি ছোটে জনতা চাৎকার।

নিমেষে নিস্তব্ধ সব, ত্রস্ত রঘুনাথ
গা ঝাড়ি উঠিল বসি—কিসে দিল হাত!
"থলী—স্বর্ণমুদ্রাথলী"—চক্ষে অগ্নি জ্বলে,
"চিরদিন-সংস্থান!" ধরিল সবলে।

"কি সুখ-ভবিষ্য অহো!" হৃদি আসে ঠেলি,
"কি সদর্পে যায় দিন, দিনে অবহেলি!
গৃহপূর্ণ ধনধান্য, মান্য দেশময়,
এ দারিদ্র্য দুঃখ কষ্ট স্বপ্ন মনে হয়।

"উঠ, বৃদ্ধ, উঠ উঠ, ছুট গো ত্বরিতে,
এ জীবনে পথে আর হবে না মরিতে।
দিব অন্ন, দিব গৃহ, দিব দাসদাসী,
প্রত্যয় কি নাহি হয়? দেখ অর্থরাশি।

"কি ভ্রুকুটি, কি ঘর্ঘর, একি আন্দোলন!
নহে পাপ-আহরিত, নহে হৃত ধন।
মূর্খ আমি—নাহি জানি কিবা পাপকাজ,
খুঁজিয়াছি আজীবন, লভিয়াছি আজ।

"উঠ, দাও স্কন্ধে ভর, বিলম্ব না সয়;
পাপ হয়, প্রায়শ্চিত্তে হবে পাপক্ষয়।
সহ নিত্য মেঘ-বৃষ্টি তপন-কিরণ,
লহ আজ বিধাতার করুণাবর্ষণ।...

"মৃত! এ কি মৃত বৃদ্ধ! সর্ব্বাঙ্গ শীতল।
হা বিধাতঃ!" দর দর ঝরে অশ্রুজল।
যুক্তকর, ঊর্দ্ধনেত্র, কর্দ্দমে আসীন,
"হা বিধাতঃ! এই দেহ বহি প্রতিদিন।

"কার ভোগ অনুযোগ, কার আহরণ,
কার সুখ, কার দুঃখ, কার অনশন!
তুমি ধর্ম্ম, তুমি কর্ম্ম, কে বাঁচে কে মরে!"
ফিরিল জনতা রক্ষী লইয়া তস্করে।

"উঠ উঠ !" চমকিল। "কই হৃতধন ?"
মুহূর্ত্তে মস্তিষ্কে দ্রুত বিশ্ব-আবর্ত্তন।
ম্লানমুখ পুত্র কন্যা, পিতা মাতা প্রিয়া—
শবমুখে ঘূর্ণদৃষ্টি পড়িল ঘুরিয়া।

অপগত মেঘজাল, নির্ম্মল আকাশ,
অতি পরিশ্রান্ত শ্বাস শ্বসিছে বাতাস।
পড়িয়াছে চারি দিকে চন্দ্রিকা উজ্জ্বল ;
শব-মুখে চাহি রঘু পাষাণ-নিশ্চল।

সে রেখা-কুঞ্চিত ভাল প্রশান্ত সরল,
ভ্রুকুটি-বিকট দৃষ্টি নিস্তেজ সজল ;
শীর্ণ শুষ্ক ওষ্ঠাধরে অব্যক্ত কম্পন—
"পিতা—পিতা, তুমি—তুমি !" নিশ্বাস ভীষণ !

আছাড়ি পড়িল ভূমে। জনতা নীরব।
ধূমায়িত, ক্রমে অন্ধ, অন্ধকার সব।
"কই স্থলী ?" দৃঢ়মুষ্টি, স্পন্দন-বিহীন ;
ঠেলিছে, টানিছে, দেহ তুষার-কঠিন।

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল।

বাণভট্ট।

শোণনদের পশ্চিমতীরবর্ত্তী প্রীতিকূট নগরে বাৎস্য গোত্রে বাণভট্টের জন্ম হয়। এই স্থানের দেড় ক্রোশ দূরে চবন ঋষির আশ্রম ছিল। তাঁহার পিতার নাম চিত্রভানু ও মাতার নাম রাজদেবী। 'কাদম্বরী' ও 'হর্ষচরিত' নামে দুই-খানি গদ্যকাব্য রচনা করেন। 'কাদম্বরী'র আরম্ভে ও 'হর্ষচরিতে'র প্রথম উচ্ছ্বাসে তিনি আপনাকে বাৎস্যগোত্রজ কুবেরের বংশধর বলিয়া আত্ম-

পরিচয় দিয়াছেন। অচ্যুত, ঈশান, হর ও পশুপতি নামে কুবের ভট্টের চারি পুত্র জন্মে। পশুপতির পুত্র অর্থপতি; এই অর্থপতিই বাণভট্টের পিতামহ। অর্থপতির একাদশ পুত্রের মধ্যে চিত্রভানু অষ্টম। ভৃগু, হংস, শুচি, কবি, মহীদত্ত, ধর্ম্ম, শতবেদা, চিত্রভানু, ত্র্যক্ষ, অহিদত্ত ও বিশ্বরূপ নামে অর্থপতির একাদশ পুত্র জন্মে।

বাল্যকালেই বাণভট্টের মাতৃবিয়োগ ঘটে। তিনি পিতার যত্নে লালিত পালিত হন। চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়সে তাঁহার পিতা চিত্রভানুর মৃত্যু হয়। তিনি সংসারে বিতৃষ্ণ হইয়া, পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিয়া, নানা দেশে পর্য্যটন করেন। এই সুযোগে তিনি বিশেষভাবে লোকচরিত্র শিক্ষা করেন। দীর্ঘকাল পর্য্যটনে অতিবাহিত করিয়া, বাণভট্ট গৃহে প্রত্যাগত হন। তাঁহার বিদ্যা, বুদ্ধি ও পাণ্ডিত্যের খ্যাতি চতুর্দ্দিকে বিস্তারিত হয়। কান্যকুব্জপতি হর্ষদেবের পিতৃব্যপুত্র কৃষ্ণদেব তাঁহাকে কান্যকুব্জের রাজসভায় আহ্বান করেন। রাজদূত মেখলকের সঙ্গে তিনি কান্যকুব্জ নগরে গমন করেন, এবং আপনার পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার প্রভাবে, তিনি মহারাজ হর্ষবর্দ্ধনের অনুরাগ আকর্ষণ করেন। সেই সময়ে ময়ূরভট্ট ও জৈনাচার্য্য মনাতঙ্গ স্থরি রাজসভায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। বাণভট্ট ময়ূরভট্টের তনয়ার পাণিগ্রহণ করেন। ময়ূরভট্ট 'সূর্য্যশতক' রচনা করিয়া দুরন্ত কুষ্ঠরোগ হইতে মুক্তিলাভ করেন। জৈনাচার্য্য মনাতঙ্গ স্থরি 'ভক্তামরস্তোত্র' রচনা করেন।

বর্দ্ধনবংশীয় মহারাজ হর্ষবর্দ্ধন ৬০৬-৫০খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কান্যকুব্জে রাজত্ব করেন। রাজ্যারম্ভের কাল হইতে তিনি যে হর্ষাব্দ প্রচলিত করেন, খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত আবুরিহান আলবিরুণী তাহা উত্তর-ভারতে প্রবহমান দেখিতে পান। বর্দ্ধনবংশের আদিম স্থান শ্রীকণ্ঠ বা স্থানেশ্বর। কান্যকুব্জ নগরে হর্ষবর্দ্ধনের ভগিনী রাজ্যশ্রীর পতি গ্রহবর্ম্মা রাজত্ব করিতেন। মালবরাজ গ্রহবর্ম্মাকে নিহত করিয়া কান্যকুব্জ অধিকার করেন। অনতিবিলম্বে মালবরাজ রাজ্যবর্দ্ধন কর্ত্তৃক নিহত হইলে, কান্যকুব্জে বর্দ্ধনবংশের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়।

'হর্ষচরিতে'র প্রথম তিন উচ্ছ্বাসে বাণভট্ট নিজবংশ ও স্বকীয় বৃত্তান্তের বর্ণনা করিয়া, তৃতীয় উচ্ছ্বাসের মধ্যভাগ হইতে আপনার আশ্রয়দাতা হর্ষবর্দ্ধনের জীবনী আরম্ভ করিয়াছেন। শ্রীকণ্ঠ (কুরুক্ষেত্র) প্রদেশে সরস্বতী নদীর তীরে স্থানীশ্বর (স্থানেশ্বর) নামে নগর অবস্থিত। তথায় পুষ্পভূতি

নামে পরম শৈব এক রাজা রাজত্ব করিতেন। ভৈরবাচার্য্য নামে এক দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণের নিকট পুষ্পভূতি তান্ত্রিক ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। একদা কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী নিশায় গুরু ভৈরবাচার্য্য মহাশ্মশানে বিদ্যাধরত্ব-লাভের কামনায় মন্ত্রসাধনে প্রবৃত্ত হন। রাজা পুষ্পভূতি তাঁহার রক্ষক নিযুক্ত হন।

অকস্মাৎ সেই স্থান বিদীর্ণ করিয়া, এক ভীষণকায় পুরুষ উত্থিত হয়, এবং আপনাকে শ্রীকণ্ঠ নাগ বলিয়া পরিচিত করে। পূজার্চ্চনার অভাবে শ্রীকণ্ঠ ক্রুদ্ধ হইয়া, ভৈরবাচার্য্যের সহিত রাজা পুষ্পভূতিকে সংহার করিতে উদ্যত হয়। রাজা তাহার সহিত বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া, শ্রীকণ্ঠকে পরাজিত করেন। নাগরাজের পরাজয়ে লক্ষ্মী দেবী তুষ্ট হইয়া, ভৈরবাচার্য্যকে বিদ্যাধরত্ব প্রদান করেন। তাঁহার বংশে হর্ষ নামে মহাপরাক্রান্ত রাজচক্রবর্ত্তী জন্মগ্রহণ করিবেন বলিয়া পুষ্পভূতিকে বরদান করেন। কালক্রমে পুষ্পভূতির বংশে প্রভাকরবর্দ্ধন জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সূর্য্যদেবের উপাসক ছিলেন। প্রভাকরবর্দ্ধন বাহুবলে হূনজাতিকে পরাজিত করেন। গান্ধার, সিন্ধু, গুর্জ্জর, লাট ও মালবদেশ তাঁহার পদানত হয়। রাজমহিষী যশোমতীর গর্ভে রাজ্যবর্দ্ধন ও হর্ষবর্দ্ধন নামে দুই পুত্র এবং রাজ্যশ্রী নামে কন্যা জন্মে। যশোমতীর ভ্রাতুষ্পুত্র ভাণ্ডি, বৈদ্যপুত্র রসায়ন, কুমার গুপ্ত ও মাধব গুপ্ত রাজকুমারদ্বয়ের প্রধান সহচর ছিলেন।

মৌখরীবংশীয় কান্যকুব্জপতি অবন্তিবর্ম্মার পুত্র গ্রহবর্ম্মার সহিত রাজ্যশ্রীর বিবাহ হয়। পরাক্রান্ত হূনজাতির শাসনার্থ রাজ্যবর্দ্ধন সসৈন্যে উত্তর দিকে প্রেরিত হন। হর্ষবর্দ্ধন হিমালয় পর্ব্বতের পাদদেশ পর্য্যন্ত অশ্বারোহী সেনা সহ জ্যেষ্ঠের অনুগমন করেন; জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বিদায় দিয়া, মৃগয়া উপলক্ষে তথায় কিয়ৎকাল অবস্থিতি করেন। একদা কুরঙ্গক নামে বার্ত্তাবহ রাজধানী স্থানেশ্বর হইতে আগমন করিয়া, পিতার প্রবল দাহজ্বরের বিষয় জ্ঞাপন করিল। এই সংবাদে তিনি ব্যাকুলচিত্তে রাজধানীর অভিমুখে যাত্রা করেন, এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকট সংবাদ প্রেরণ করেন। তাঁহার প্রত্যাগমনের পর প্রভাকরবর্দ্ধন মানবলীলা সংবরণ করেন। মাতা যশোমতী পিতৃবিয়োগের পূর্ব্বেই অনলে প্রবেশ করেন। প্রভাকরবর্দ্ধনের মৃত্যুসংবাদ প্রচারিত হইবামাত্র দুর্বৃত্ত মালবরাজ কান্যকুব্জপতি গ্রহবর্ম্মার প্রাণসংহার করেন, এবং তাঁহার পত্নী রাজ্যশ্রীকে কারারুদ্ধ করিয়া কান্যকুব্জের সিংহাসন বলপূর্ব্বক অধিকার করেন। শোকবিহ্বল রাজ্যবর্দ্ধন অবিলম্বে মালব-

রাজের বিরুদ্ধে সসৈন্যে প্রস্থান করেন। হর্ষবর্দ্ধন রাজধানীতে একাকী অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। মালবরাজ রাজ্যবর্দ্ধনের হস্তে পরাজিত ও নিহত হন। তাঁহার মিত্র গৌড়েশ্বর শশাঙ্কদেব গুপ্ত, শিবিরস্থ রাজ্যবর্দ্ধনকে বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক নিহত করিয়া মালবরাজের মৃত্যুর প্রতিশোধ লন। এই সংবাদে হর্ষবর্দ্ধন কান্যকুব্জ অভিমুখে যাত্রা করেন। পথে রাজ্যবর্দ্ধনের সহচর ভাণ্ডি সসৈন্যে তাঁহার সহিত মিলিত হয়। ভাণ্ডির নিকট রাজ্যশ্রীর কারাগার হইতে বিন্ধ্যারণ্যে পলায়নের সংবাদ পাইয়া, তিনি ভগিনীর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। ভাণ্ডি সসৈন্যে অগ্রসর হইয়া জাহ্নবীতটে শিবির সন্নিবিষ্ট করিতে আদিষ্ট হইলেন। বিন্ধ্যারণ্যে বৌদ্ধ যতী দিবাকর মিত্রের সহিত পরিচয় হয়। বৌদ্ধ যতিবরের আশ্রমে অবস্থানকালে, তিনি এক রূপবতী রমণীর চিতানলে প্রবেশোদ্যোগের সংবাদ পান। তথায় উপস্থিত হইয়া ভগিনী রাজ্যশ্রীর উদ্ধার করেন। রাজ্যশ্রী বৌদ্ধতাপসের আশ্রমে অবস্থিতি করিবেন, স্থিরীকৃত হয়। এই দিবাকর মিত্র রাজ্যশ্রীর পতির পরম বন্ধু বলিয়া, রাজ্যশ্রী তাঁহার আশ্রমে বৌদ্ধযোগিনীভাবে অবস্থিতি করিতে থাকেন। হর্ষবর্দ্ধন গঙ্গাতীরে স্বীয় সেনার সহিত সম্মিলিত হন।

এখানেই আট অধ্যায়ে হর্ষচরিত সমাপ্ত হইয়াছে। হর্ষবর্দ্ধন দিবাকর মিত্রের উপদেশে বৌদ্ধধর্ম্মে অনুরক্ত হইয়া থাকিবেন। পরে তিনি পৈতৃক হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তজ্জন্য বোধ হয় বৌদ্ধ-বিদ্বেষী বাণভট্ট তাঁহার জীবনী সমাপ্ত করিবার চেষ্টা করেন নাই।

'হর্ষচরিত' ও 'কাদম্বরী' ভিন্ন বাণভট্ট 'চণ্ডিকাশতক' ও 'পার্ব্বতীপরিণয়-নাটকের' রচনা করেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত 'দেবীমাহাত্ম্য' অবলম্বনে 'চণ্ডিকাশতক' কাব্য বিরচিত হয়। ইহা আদ্যোপান্ত শার্দ্দূলবিক্রীড়িত ছন্দে গ্রথিত। কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' কাব্য অবলম্বনে 'পার্ব্বতীপরিণয়' প্রণীত হইয়াছে। ইহার প্রস্তাবনায় স্পষ্টাক্ষরে নিজের নাম নির্দ্দেশ করা সত্ত্বেও, রামদাস বাবু ইহা বাণভট্টের লেখনীপ্রসূত বলিয়া স্বীকার করিতে সম্মত হন নাই; এই সন্দেহ অমূলক বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

> "অস্তি কবিসার্ব্বভৌমো বাৎস্যান্বয়জলধিসম্ভবো বাণঃ।
> নৃত্যতি যদ্রসনায়াং বেধোমুখলাসিকা বাণী॥—পার্ব্বতীপরিণয়।

পদ্য অপেক্ষা গদ্যরচনার জন্য বাণভট্ট প্রসিদ্ধ। তাঁহার রচিত গ্রন্থের মধ্যে কাদম্বরী সর্ব্বোৎকৃষ্ট। তাঁহার রচনায় কবিত্ব, পাণ্ডিত্য ও ভূয়োদর্শনের

অভাব নাই। কিন্তু দীর্ঘসমাস, অতিবিস্তৃতি, কষ্টকল্পনা ও দূরান্বয়াদি দোষে তাঁহার বর্ণনা এত দূষিত যে, বাণভট্ট প্রথম শ্রেণীর কবি বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য নহেন। সুবন্ধুর 'বাসবদত্তা'র অনুকরণে বাণভট্টের 'হর্ষচরিত' ও 'কাদম্বরী' রচিত হয়। সুবন্ধু খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে আবির্ভূত হন। বাণভট্টের 'হর্ষচরিত' খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর আরম্ভে রচিত হয়। 'হর্ষচরিত' আট উচ্ছ্বাসে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে বাণভট্ট নিজের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে শ্রীহর্ষবর্দ্ধনের সভায় বাণভট্টের গমন ও অবস্থিতি বর্ণিত হইয়াছে, তৃতীয় অধ্যায়ে হর্ষবর্দ্ধনের রাজসভা হইতে বাণভট্টের গৃহে প্রত্যাগমন ও পুষ্পভূতির বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। চতুর্থ অধ্যায়ে প্রভাকরবর্দ্ধনের পুত্র রাজ্যবর্দ্ধন ও হর্ষবর্দ্ধনের জন্মবৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। পঞ্চমে রাজ্যবর্দ্ধনের হূনরাজ্যাভিমুখে অভিযান ও প্রভাকরবর্দ্ধনের মৃত্যু বিবৃত হইয়াছে। ষষ্ঠে মালবরাজের বিনাশে হর্ষবর্দ্ধনের প্রতিজ্ঞা, সপ্তমে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের কুমার ভাস্করবর্ম্মার পরাজয়, এবং অষ্টম অধ্যায়ে বিন্ধ্যারণ্যে ভগিনী রাজ্যশ্রীর সহিত হর্ষবর্দ্ধনের সাক্ষাৎকার বর্ণিত হইয়াছে।

এই গ্রন্থের শেষভাগে বাণভট্ট আপনাকে চিত্রভানুর পুত্র ও 'কবিচক্রচূড়ামণি' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। 'হর্ষচরিতে'র আরম্ভে বাণভট্ট আপনার পূর্ব্ববর্ত্তী কয়েক জন কবির নাম উল্লেখ করিয়াছেন। তাহা হইতে কয়েকটি শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"নমঃ সর্ব্ববিদে তস্মৈ ব্যাসায় কবিবেধসে।
চক্রে পুণ্যং সরস্বত্যা যো বর্ষমিব ভারতং॥ ৪॥
শ্লেষপ্রায়মুদীচ্যেষু প্রতীচ্যেষ্বর্থমাত্রকং।
উৎপ্রেক্ষা দাক্ষিণাত্যেষু গৌড়েষ্বক্ষরডম্বরঃ॥ ৮॥
কিং কবেস্তস্য কাব্যেন সর্ব্ববৃত্তান্তগামিনী।
কথেব ভারতী যস্য ন প্রাপ্নোতি দিগন্তরং॥ ১০॥
উচ্ছ্বাসান্তেঽপ্যখিন্নাস্তে যেষাং বক্ত্রে সরস্বতী।
কথমাখ্যায়িকাকারা ন তে বন্দ্যাঃ কবীশ্বরাঃ॥ ১১॥
কবীনামগলদ্দর্পো নূনং 'বাসবদত্ত'য়া।
শক্ত্যেব পাণ্ডুপুত্রাণাং গতয়া কর্ণগোচরং॥ ১২॥
পদবন্ধোজ্জ্বলো হারী কৃতবর্ণক্রমস্থিতিঃ।
ভট্টার-'হরিশ্চন্দ্রস্য' গদ্যবন্ধো নৃপায়তে॥ ১৩॥
অবিনাশিনমগ্রাম্যমকরোৎ 'শাতবাহনঃ'।

বিশুদ্ধজাতিভিঃ কোষং রত্নৈরেব সুভাষিতৈঃ ॥ ১৪ ॥
কীর্ত্তিঃ 'প্রবরসেন'স্য প্রযাতা কুমুদোজ্জ্বলা।
সাগরস্য পরং পারং কপিসেনেব সেতুনা ॥ ১৫ ॥
সূত্রধারকৃতারম্ভৈর্নাটকৈ র্বহুভূমিকৈঃ।
সপতাকৈর্যশো লেভে 'ভাসো'দেবকুলৈরিব ॥ ১৬ ॥
নির্গতাসু ন বা কস্য 'কালিদাস'স্য সূক্তিষু।
প্রীতির্মধুরসার্দ্রাসু মঞ্জরীষিব জায়তে ॥ ১৭ ॥
সমুদ্দীপিতকন্দর্পা কৃতগৌরীপ্রসাধনা।
হরলীলেব নো কস্য বিস্ময়ায় 'বৃহৎকথা' ॥ ১৮ ॥
আঢ্যরাজকৃতোৎসাহৈর্হৃদয়স্থৈঃ স্মৃতৈরপি।
জিহ্বান্তঃ কৃষ্যমাণেব ন কবিত্বে প্রবর্ত্ততে ॥ ১৯ ॥
তথাপি নৃপতের্ভক্ত্যা ভীতো নির্ব্বহনাকুলঃ।
করোম্যাখ্যায়িকাম্ভোধৌ জিহ্বাপ্লবনচাপলং ॥ ২০ ॥
সুখপ্রবোধললিতা সুবর্ণঘটনোজ্জ্বলৈঃ।
শব্দৈরাখ্যায়িকা ভাতি শয্যেব প্রতিপাদকৈঃ ॥ ২১ ॥
জয়তি জ্বলৎপ্রতাপজ্বলন-প্রাকারকৃতজগদ্রক্ষঃ।
সকলপ্রণয়িমনোরথসিদ্ধিঃ শ্রীপর্ব্বতোপমো হর্ষঃ ॥ ২২ ॥—হর্ষচরিত।

"ইতি শ্রীচিত্রভানুসুত মহাকবিচক্রচূড়ামণি-ভট্টবাণ-কৃতৌ হর্ষচরিতে মহাকাব্যেঽষ্টমউচ্ছ্বাসঃ।"
—হর্ষচরিত।

পূর্ব্বোদ্ধৃত অংশের চতুর্থ শ্লোকে 'মহাভারতে'র রচয়িতা ব্যাসদেবের উল্লেখ আছে। অষ্টম শ্লোকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের লেখকদিগের বিশেষত্ব বর্ণিত হইয়াছে। বাণভট্টের সময় হইতেই বঙ্গদেশীয় লেখকেরা শব্দাড়ম্বরের জন্য খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। বাঙ্গলার এই বিশেষত্ব অদ্যাপি অব্যাহত রহিয়াছে। ১২—১৮শ শ্লোকে সুবন্ধু, ভট্টারক হরিশ্চন্দ্র, শাতবাহন, প্রবর সেন, ভাস, কালিদাস ও 'বৃহৎকথা'র প্রশংসা কীর্ত্তিত হইয়াছে। ইহা হইতে জানা যাইতেছে যে, প্রাগুপ্ত গ্রন্থকারেরা খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হন। ১৯—২১শ শ্লোক পর্য্যন্ত 'হর্ষচরিত'-রচনার কারণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। দ্বাবিংশ শ্লোকে মহারাজ হর্ষবর্দ্ধনের প্রশংসা দেখা যায়। 'কাদম্বরী'র পূর্ব্বার্দ্ধ রচনা করিয়া বাণভট্ট মৃত্যুমুখে পতিত হন। অনন্তর তাঁহার কৃতী পুত্র উক্ত গ্রন্থের উত্তরার্দ্ধ প্রণয়ন করিয়া, কাদম্বরী সমাপ্ত করেন। এই উভয় ভাগের রচনার বৈসাদৃশ্য দেখিয়া, তাহা দুই বিভিন্ন গ্রন্থকারের প্রণীত বলিয়া স্পষ্ট অনুভূত হয়।

ডাক্তর হল সাহেবের মতে এই বাণভট্ট 'রত্নাবলী' নাটিকা প্রণয়ন করেন।

রত্নাবলী নাটিকার একটি (১) শ্লোক অবিকল হর্ষচরিতে উদ্ধৃত দেখা যায়। ইহাই ডাক্তর হল ও বুলার, এবং বোম্বের পণ্ডিত কাশীনাথ ত্রিম্বক তেলাঙ্গের প্রচারিত মতের প্রবর্ত্তক। স্বরচিত 'বাসবদত্তা'র ইংরেজী ভূমিকায় ডাক্তর হল এই ভ্রান্ত মত সর্ব্বপ্রথম প্রচারিত করেন। এক গ্রন্থ হইতে সমসাময়িক বা পরবর্ত্তী গ্রন্থে কোন কবিতা গৃহীত হওয়া, সংস্কৃত সাহিত্যে বিরল নহে। এক কবির রচনা আংশিকভাবে অন্য কবির গ্রন্থে উদ্ধৃত হইলে, উভয় গ্রন্থকে এক ব্যক্তির রচনা বলিয়া অবধারণ করা সুযুক্তির অনুমোদিত নহে। এইরূপ সিদ্ধান্তকে ভ্রান্ত ও অমূলক অপসিদ্ধান্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করা অসঙ্গত নহে।

কাশ্মীরী পণ্ডিত মম্মট খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে 'কাব্যপ্রকাশ' নামক সুবিখ্যাত অলঙ্কার গ্রন্থ রচনা করেন। এই পুস্তকের দ্বিতীয় শ্লোকের ভাষ্যে তিনি ধাবক নামে কবির উল্লেখ করিয়াছেন। কবি ধাবক মহারাজ হর্ষবর্দ্ধনের সভায় বিদ্যমান ছিলেন। তিনি 'রত্নাবলী' নাটিকার রচনা করিয়া, আপনার প্রভু হর্ষবর্দ্ধনের নামে তাহার প্রচার করেন। তজ্জন্য হর্ষবর্দ্ধন তাঁহাকে প্রভূত ধনরত্নদানে পরিতুষ্ট করেন। কাব্যপ্রকাশের টীকাকার মহেশ্বর, নাগেশ ভট্ট, বৈদ্যনাথ ও জয়রাম প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এই মত সর্ব্বত্র প্রচার করিয়াছেন। হর্ষবর্দ্ধনের পাঁচ শত বৎসর পরে মম্মটভট্ট আবির্ভূত হইয়া প্রচলিত জনপ্রবাদ অবলম্বনে হর্ষবর্দ্ধনের নামে এই কলঙ্কের রটনা করিয়াছেন। হর্ষবর্দ্ধন বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া হিন্দুদিগের এত দূর বিদ্বেষভাজন হন যে, তাঁহার সভাসদ্ বাণভট্ট বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি অতিমাত্র অশ্রদ্ধাবশতঃ হর্ষবর্দ্ধনের জীবনী অসম্পূর্ণ রাখিতে বাধ্য হন। পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণের গভীর গবেষণায় হর্ষবর্দ্ধনের প্রদত্ত তাম্রশাসনাদি আবিষ্কৃত হইয়া, তাঁহার নাম দীর্ঘকালের পর বিস্মৃতিসাগর হইতে উদ্ধার করিয়াছে। বৌদ্ধনরপতির প্রতি অবজ্ঞাপ্রদর্শন হিন্দুদিগের পক্ষে আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। মহারাজ অশোক ও হর্ষবর্দ্ধনের ন্যায় মহাপরাক্রান্ত সম্রাট উত্তর-ভারতে কখনও অভ্যুদিত হন নাই। তাঁহাদের নামাঙ্কিত শাসনলিপি হইতে এই বিষয় নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে। অথচ তাঁহাদের অবদানপরম্পরা হিন্দুদিগের রচিত পুরাণ ও ইতিহাসাদি গ্রন্থে ভ্রমক্রমেও উল্লিখিত হয় নাই। এই নিমিত্তই বোধ হয় হিন্দু মম্মটভট্ট ভ্রান্ত জনপ্রবাদ অবলম্বনে হর্ষবর্দ্ধনের কবিত্বের প্রতি সন্দিহান হইয়া, তাঁহার প্রতি অনুচিত কটাক্ষপাত

---

(১) "দ্বীপাদন্যস্মাদপি মধ্যাদপি জলনিধের্দিশোঽপ্যন্তাৎ।
আনীয় ঝটিতি ঘটয়তি বিধিরভিমতমভিমুখীভূতঃ॥"—রত্নাবলী।

করিয়াছেন। টীকাকারেরা নিরাপত্তিতে মম্মটভট্টের এই ভ্রান্ত ও অমূলক উক্তি গ্রহণ করিয়া সর্ব্বত্র প্রচার করিয়াছেন।

ধাবক নামে কোন কবি হর্ষবর্দ্ধনের সভায় বিদ্যমান ছিলেন না। বাণভট্ট, ময়ূরভট্ট ও মনাতঙ্গ সূরির ন্যায় ধাবক হর্ষবর্দ্ধনের সভাসদ থাকিলে, তাঁহার রচিত কোন না কোন গ্রন্থ অবশ্যই বিদ্যমান থাকিত। কাব্যপ্রকাশের ভাষ্য ভিন্ন ধাবকের অস্তিত্ব হর্ষবর্দ্ধনের সভাসদরূপে কুত্রাপি পরিকল্পিত হয় নাই। সুপণ্ডিত বুলার সাহেব কাশ্মীর গমন পূর্ব্বক কাব্যপ্রকাশের যে সকল প্রাচীন প্রতিলিপি দর্শন করেন, তাহাতে ধাবকের পরিবর্ত্তে বাণভট্টের নাম পরিদর্শন করেন। কাব্যপ্রকাশের পাঠান্তরে বাণভট্টের পরিবর্ত্তে ধাবকের নাম পরিকল্পিত হইয়াছে। বুলার সাহেবের গবেষণায় ইহা নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

ধাবক, হর্ষবর্দ্ধন ও বাণভট্টের সমসাময়িক কবি নহেন। তিনি বাণভট্টের অপেক্ষা অনেক প্রাচীন। বাণভট্ট হর্ষচরিতের আরম্ভে কালিদাসকে আপনার অপেক্ষা প্রাচীন কবি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। কালিদাসের সময় অদ্যাপি নিশ্চিতরূপে নিরূপিত হয় নাই। সপ্তম শতাব্দীতে বাণভট্ট হর্ষচরিতে তাঁহার নামোল্লেখ করিয়াছেন। ইহা হইতে অনুমিত হইতেছে যে, কালিদাস অন্ততঃ বাণভট্টের শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর আরম্ভে বিদ্যমান ছিলেন। বিভিন্ন সংস্কৃতবিৎ পণ্ডিতগণ কালিদাসকে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর গ্রন্থকার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই মত অদ্যাপি অখণ্ডিত রহিয়াছে। 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকের প্রস্তাবনায় কালিদাস আপনার পূর্ব্বতন কবি বলিয়া শূদ্রক, ধাবক, ভাসক, রামিল্ল ও সৌমিল্লের নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। 'হর্ষচরিতে' বাণভট্ট ভাস-নামধারী কবিকে কলিদাসের পূর্ব্বতন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই ভাসের সমসাময়িক ধারক খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়া থাকিবেন। তিনি সপ্তম শতাব্দীতে কনোজের মহারাজ হর্ষবর্দ্ধনের সভায় বর্ত্তমান থাকিতে পারেন না। অতএব কাব্যপ্রকাশের উক্তি বা পাঠান্তর একান্ত অমূলক। এই বিষয়ে মতদ্বৈধের বা সংশয়ের কোনও কারণ দেখা যাইতেছে না।

মহারাজ হর্ষবর্দ্ধন সুকবি ছিলেন। তাঁহার রচিত শ্লোক তিনটি মধুবনের তাম্র-শাসন স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিতেছে। তাম্রশাসনের নির্দ্দেশ উপেক্ষিত হইবার কোনও কারণ দেখিতে পাইতেছি না। আমাদের বিবেচনায়, সুকবি হর্ষবর্দ্ধন স্বয়ং 'রত্নাবলী', 'নাগানন্দ' ও 'প্রিয়দর্শিকা' নাটিকা অন্যসাহায্যনিরপেক্ষ হইয়া রচনা করেন। এই তিনখানি নাটক পাঠ করিয়া, তাহাদের সুখবোধ্য গন্ত
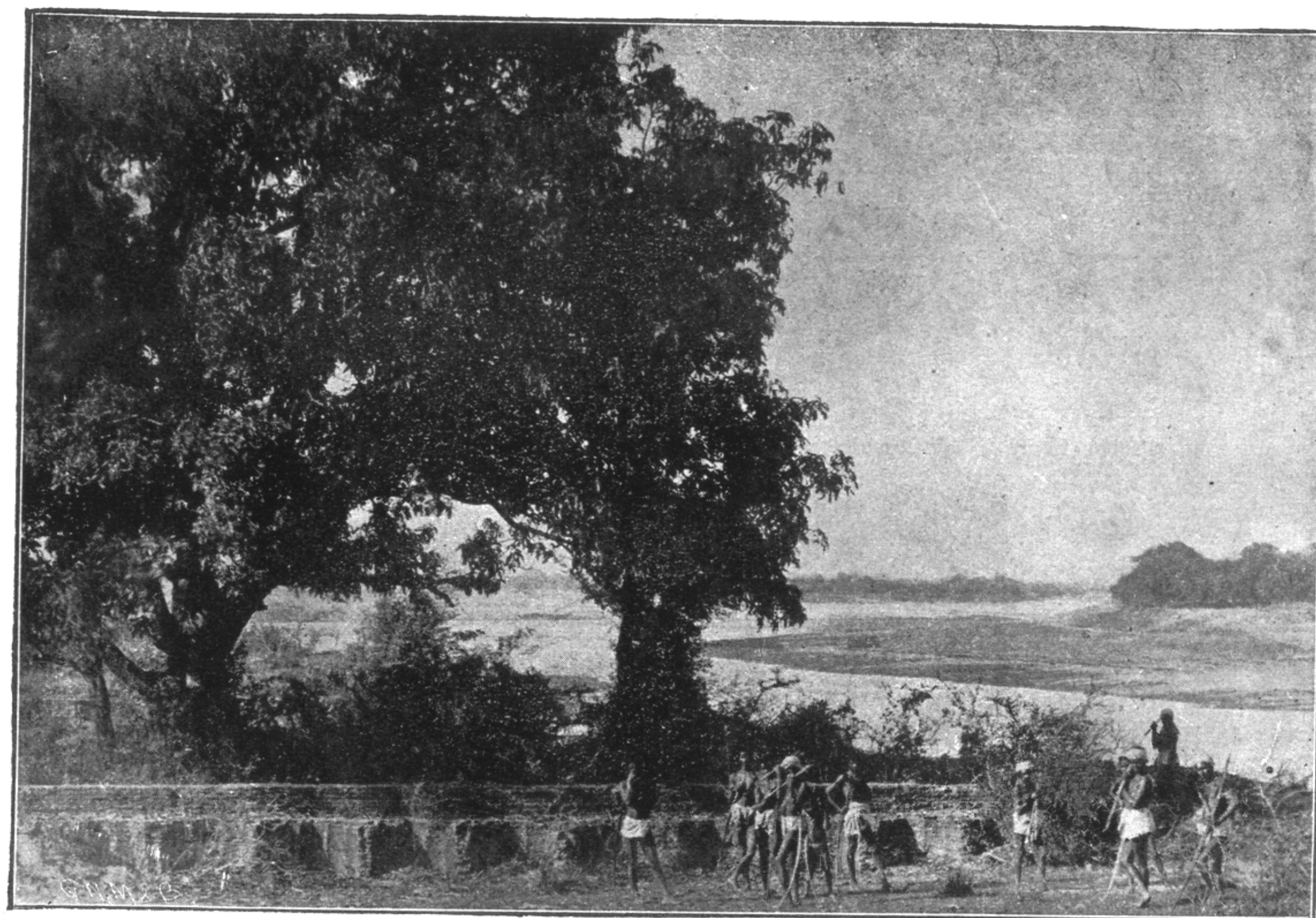
মনসুরগঞ্জ।

পঞ্চ দেখিয়া 'কাদম্বরী' ও 'হর্ষচরিত' প্রণেতার দুর্ব্বোধ্য ও বাগাড়ম্বরময় রচনার ও শব্দবিন্যাসের আভাসমাত্রও কোন পাঠক তাহাতে প্রাপ্ত হইবেন না। যে লেখনী হইতে 'কাদম্বরী' ও 'হর্ষচরিত' প্রসূত হইয়াছে, সেই লেখনী হইতে এই নাটকত্রয়ের কোন অংশ বহির্গত হইয়াছে, কোনক্রমে তাহা বিশ্বাস করা যায় না। অতএব ডাক্তার হল ও তাঁহার পদানুবর্ত্তী বুলার ও ওয়েবার সাহেবের মত একান্ত ভ্রান্ত ও অমূলক বলিয়া আমাদের নিকট প্রতীত হইতেছে।

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য।

মনস্সুরগঞ্জ।

প্রায় দেড় শত বৎসর হইল, মুর্শিদাবাদের প্রান্তবাহিনী ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে এক মনোহর অট্টালিকা চারি পার্শ্বের ঝিল-সলিলে আপনার সুন্দর ছবি প্রতিবিম্বিত করিয়া, কয়েক বৎসরমাত্র শোভা পাইয়াছিল। সেই মনোরম অট্টালিকার নাম মনস্সুরগঞ্জ প্রাসাদ। যাঁহার আদেশে ও চেষ্টায় এই প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাঁহার নাম বাঙ্গালা দেশে চিরজাগরূক রহিয়াছে। তিনি নবাব মনস্সুর-উল-মুল্ক সিরাজ উদ্দৌলা। সিরাজের উপাধি অনুসারে এই প্রাসাদের নাম মনস্সুরগঞ্জের প্রাসাদ হয়।

মনস্সুরগঞ্জও তৎকালে প্রবাহিত ভাগীরথীর পশ্চিম তীর হইতে কিছু দূরেই অবস্থিত ছিল। উক্ত প্রাসাদের চারি পাশে পরিখার ন্যায় এক কৃত্রিম ঝিল খনিত হয়; তাহার নাম ছিল হীরা ঝিল। এই জন্য ইউরোপীয়গণ মনস্সুরগঞ্জের প্রাসাদকে হীরাঝিলের প্রাসাদ বলিতেন। প্রাসাদনির্ম্মাণ সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বে সিরাজ উদ্দৌলা বৃদ্ধ মাতামহ আলিবর্দ্দী খাঁকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া, রহস্যচ্ছলে প্রাসাদের একটি কক্ষে তাঁহাকে রুদ্ধ করেন। পরে কিছু অর্থপ্রদানে অঙ্গীকার করাইয়া সিরাজ বৃদ্ধ মাতামহকে মুক্ত করিয়া দেন। সেই অর্থ বাঙ্গলার জমিদারদিগের নিকট হইতে আবওয়াব বা অতিরিক্ত করস্বরূপ আদায় করা হইয়াছিল; তাহাকে 'নজরানা মনস্সুরগঞ্জ' বলা হইত। আলিবর্দ্দী খাঁ দৌহিত্রের জন্য প্রাসাদের নিকটে মনস্সুরগঞ্জ নামে একটি গঞ্জও স্থাপিত করিয়া দেন। সেই জন্য এই প্রাসাদও মনস্সুরগঞ্জের প্রাসাদ বলিয়া অভিহিত হইত। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, সিরাজ উদ্দৌলা মাতামহকে

রুদ্ধ করিয়া রাখায়, তাঁহার উপর "মনস্থর" অর্থাৎ জয়ী হইয়াছিলেন বলিয়া, উহার নাম মনস্থরগঞ্জ হয় ; কিন্তু সিরাজের উপাধি-অনুসারে উহার উক্ত নাম হওয়াই সম্ভব।

মনস্থরগঞ্জের প্রাসাদ সাধারণতঃ ইষ্টকে নির্ম্মিত হয়, কিন্তু গৌড় হইতে নানারূপ প্রস্তর আনাইয়া সিরাজ তাহার সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি করিয়াছিলেন। এই প্রাসাদ কিরূপ বৃহৎ ও বিস্তৃত ছিল, তাহা মুতাক্ষরীণের ইংরাজী অনুবাদক মুস্তাফার কথা হইতে সাধারণে বুঝিতে পারিবেন। মুস্তাফা লিখিয়াছেন,—"That Palace which was on the other side of the Bagratty, and contained lodgings enough for three European kings, is now ruined."

আলিবর্দ্দীর জীবিতকালে সিরাজ মনস্থরগঞ্জে বাস করিতে আরম্ভ করেন। আলিবর্দ্দীর প্রাসাদ ভাগীরথীর পূর্ব্বতীরে নিজামত কেল্লার মধ্যে অবস্থিত ছিল। বর্ত্তমান নবাবের প্রাসাদ প্রভৃতি কেল্লার মধ্যেই বিদ্যমান। রাজ্যপ্রাপ্ত হইয়াও সিরাজ মনস্থরগঞ্জ ত্যাগ করেন নাই। পলাশি-যুদ্ধের পর মীরজাফর এইখানেই মসনদে বসিয়া ক্লাইভের নিকট হইতে একপাত্র স্বর্ণমোহর নজর লইয়াছিলেন। কথিত আছে, তখন মনস্থরগঞ্জের প্রাসাদ বহু ধন রত্নে পরিপূর্ণ ছিল। ইহার প্রকাশ্য ধনাগার লুণ্ঠনের সময় মীরজাফর, ক্লাইভ প্রভৃতি ইংরাজগণ, মুন্সী রামচাঁদ ও নবকৃষ্ণ উপস্থিত ছিলেন। তদ্ভিন্ন সিরাজের যে গুপ্ত ধনাগারের কথা শুনা যায়, মীরজাফর, তাঁহার কর্ম্মচারী আমিরবেগ খাঁ, রামচাঁদ ও নবকৃষ্ণ তাহার ধনরত্নাদি লুণ্ঠন করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত। আজও লোকের বিশ্বাস, এখনও তাহার ভগ্নাবশেষমধ্যে অনেক ধন রত্ন নিহিত আছে। মীরজাফর কিছু দিন মনরস্থগঞ্জের প্রাসাদে অবস্থিতি করিয়া, অবশেষে ভাগীরথীর পূর্ব্বতীরে কেল্লার মধ্যে বাস করেন। ক্রমে মনস্থরগঞ্জের প্রাসাদ ভাঙ্গিয়া কেল্লামধ্যে অনেক নূতন নূতন প্রাসাদ নির্ম্মিত হয়।

এই হীরাঝিলের প্রাসাদে জগৎ শেঠ, মহাতাপ চাঁদ ও মহারাজা স্বরূপচাঁদকে মীর কাশীমের আদেশে মহম্মদ তকী খাঁ বন্দী করিয়া রাখেন। মীরজাফরের পর হইতেই মনস্থরগঞ্জের ভগ্নদশা উপস্থিত হয়। এক্ষণে তাহার নামমাত্র চিহ্ন বিদ্যমান। যাহা কিছু আছে, তাহাও ক্রমে ভাগীরথীর কুক্ষিগত হইতেছে। উত্তর-দক্ষিণে ১২৫ হাত দীর্ঘ একটি চত্বরের ভিত্তিমাত্র আছে। পূর্ব্ব-পশ্চিমে তাহার ৭০।৭৫ হাত দেখা যায়। পূর্ব্বাংশ প্রতি বৎসরই ভাগীরথীর

গর্ত্তে পতিত হইতেছে। এই চত্বরের মধ্যে দৈর্ঘ্য-প্রস্থে প্রায় ৩০ হাত একটি গৃহ বা নাটমন্দিরের ভিত্তি এখনও বর্ত্তমান। মনসুরগঞ্জের এই ভগ্নাবশেষ এক্ষণে জঙ্গলাবৃত, ভিত্তির উপর আম্রাদি বড় বড় বৃক্ষও জন্মিয়াছে, বন্য শীকারীরা তাহার চারি পাশে শীকার করিয়া বেড়ায়।

শ্রীনিখিলনাথ রায়।

প্রণয়ের পরিণাম।

১

আমি বড় ঘরের ছোট ছেলে, বিশেষ অল্প বয়সে মাতৃহীন; কাজেই সকলের বড় আদরের পাত্র। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিয়া অনেক বাঙ্গালী বহু অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। অল্প দিনে বিপুল অর্থ সংগ্রহ করিতে দেখিয়া, লোকে তাঁহাদিগকে "আঙ্গুল ফুলিয়া কলাগাছ" বলিত। আমার পিতামহ তাঁহাদিগের একজন। তাঁহার অর্থ সদুপায়ে সংগৃহীত হইয়াছিল কি না, সে বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া আমার পক্ষে যেমন অসঙ্গত, তেমনি অন্যায়;—আমি সে বিচারে প্রবৃত্ত হইব না। পিতামহ যে পরিমাণ সম্পত্তি করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার পক্ষে একটা "রাজা" বা "মহারাজা" খেতাব ক্রয় করা বড় কষ্টসাধ্য হইত না। কিন্তু তিনি এ দুয়ের কোন খেতাবই ক্রয় করেন নাই। তাঁহার আরও বড় একটা সম্মানলাভের আশা ছিল। ঘটনাচক্রে সে সম্মানলাভ করা তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই; তাই আমরা "মহারাজা", "রাজা", বা "কুমার" নহি,—কেবল "বাবু"। ইহাতে আমাদিগের একটা বিশেষ সুবিধা হইয়াছে;—সময় মত লাটকে ভোজ দিয়া আপনাদিগের অভিজাতত্বের গর্ব্ব করাও চলে, আবার সুবিধা মত রাজনৈতিক বৈঠকে বক্তৃতা করিয়া সাধারণের করতালি লাভ করাও অসম্ভব হয় না। সে যাহা হউক, পিতামহের কৃপায় আমাদিগকে উদরান্নের ভাবনা ভাবিতে হয় নাই, এখনও কিছু কাল হইবে না।

উদরান্নের ভাবনা ছিল না বলিয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত আমাদিগের বড় বিরোধ ছিল। লোকে যেমন সখ করিয়া পায়রা পোষে, মাছ ধরে, ঘোড়ায় চড়ে, চিত্রবিদ্যা শিখে, আমরাও তেমনই সখ করিয়া কেহ কবিতা, কেহ

দর্শন, কেহ বিজ্ঞান, কেহ বা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতাম ;—সেটা সখমাত্র। কেবল আমার সেজদাদা এঞ্জিনিয়ার হইয়া পুনায় উক্ত রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। আমরা তাঁহাকে "দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ" বলিতাম।

অল্প বয়স হইতেই আমার স্কন্ধে কবিতারোগটা চাপিয়াছিল। কবে প্রথম চাপিয়াছিল, ঠিক মনে নাই। তবে বড়লোকের ছেলের কোন সখ হইলে সে সখ সমর্থনের লোকের অভাব হয় না,—আমারও হয় নাই। আমার আত্মীয়, বন্ধু, আশ্রিত ও অনুগত জনগণ, আমার ছন্দোবদ্ধ রচনামাত্রকেই অতি উৎকৃষ্ট কবিতা বলিয়া আমাকে অজস্র প্রশংসা করিতেন। এই সময় আমার পিতার কোন শ্রদ্ধেয় বন্ধু আমাকে বলিয়াছিলেন—"তুমি প্রতিভাবান। তোমার নিকট অনেক প্রত্যাশা করি ; তাই তোমাকে সাবধান করিয়া দিতেছি—তোষামোদকারিগণের তোষামোদে মুগ্ধ হইয়া গর্ব্বান্ধ হইও না—আপনাকে দেবতা ভাবিও না। দেখিয়াছি, তুমি যাহা কিছু রচনা কর, কতকগুলি লোক তাহারই প্রশংসা করে ;—

যেমন কবি কহিলেন আঃ ;
অমনি আমরা কহিলাম বাঃ।

এ বড় প্রলোভন। তোমার মত বয়সে এরূপ প্রলোভন জয় করা বড় সহজ নহে ; কিন্তু এ প্রলোভন জয় করিতে না পারিলে তুমি উৎসন্ন যাইবে। তাই তোমাকে সাবধান করিয়া দিতেছি।"

পিতার বন্ধুর এই অযাচিত উপদেশ আমার ভাল লাগিত না। আমি ইহা তাঁহার বার্দ্ধক্যসহচর বাগাড়ম্বরপ্রিয়তার অনধিকারচর্চ্চা বলিয়া মনে করিতাম।

মানব মন ভুলাইবার উপকরণে প্রকৃতি আমাকে সুসজ্জিত করিয়াছিলেন। আমার চেষ্টায় সেগুলি সহজেই সুসংস্কৃত হীরকের মত উজ্জ্বলতর ও মনোহর-তর হইয়া উঠিল। আমি আপনি শুনিয়াছি, লোকে আমাকে দেখিয়া বলি-য়াছে—"ভগবান যাহাকে ভাল করেন, তাহার সকলই ভাল হয়।"

আমি যেখানে যাইতাম, সেখানেই আদৃত হইতাম—সেখানেই আমার যশোগান শুনিয়া মনে প্রচুর আনন্দ উপভোগ করিতাম। আপনার যশো-গানে কখনও কাহারও তৃপ্তি হয় না—সে গান যত শুনা যায়, তত আরও শুনিতে ইচ্ছা করে। মানব আপনার আদর্শেই দেবতার রচনা করে, তাই সিংহাসনসম্মুখে নিরন্তর আপনার যশোগান শুনিয়াও মিল্টনের ঈশ্বরের তৃপ্তি বা বিরক্তিবোধ হইত না।

সাময়িক পত্রগুলা আমার রচনা পাইবার জন্য আমাকে বড় বিরক্ত—বড় তোষামোদ করিত। সে আমার রচনার গুণে, কি আমার সম্পত্তির প্রভাবে, তাহা বলিতে পারি না। তবে যাহার আহারীয়ের অভাব নাই, সে যেমন দয়া করিয়া সময় সময় গৃহপালিত বিড়ালকে একখানা মাছ, বা কুকুরকে এক টুকরা আমিষ দান করে, আমিও তেমনই সময় সময় তাহাদিগকে আমার এক একটা রচনা দিতাম। তাহারা কৃতার্থ হইত।

এমনই ভাবে আমার যৌবন-প্রারম্ভ কাটিতে লাগিল।

২

কার্য্যের জন্য সেজদাদা প্রায় বাড়ী আসিতে পারিতেন না। পাঁচ বা ছয় বৎসর অন্তর তিনি এক একবার বাড়ী আসিতেন। আমি কখনও কোথাও বেড়াইতে যাইতে পাই নাই; কাজেই আমার একবার কোথাও বেড়াইতে যাইবার ইচ্ছাটা দুর্ভিক্ষপীড়িতের ক্ষুধার মত অতি তীব্র হইয়া উঠিয়াছিল। এই সময় সেজদাদা আমাকে পুনায় যাইতে অনুরোধ করিলেন। আমি তাঁহার নিকটে যাইতে ব্যগ্রতা প্রকাশ করিলাম। আমার নির্ব্বন্ধাতিশয্যে পিতা আমাকে পুনায় যাইবার অনুমতি দিলেন; কিন্তু আদেশ করিলেন যে, বৃদ্ধ সরকার রামমোহন আমার সঙ্গে যাইবে। আমি আমার এই বোঝাটিকে রাখিয়া যাইবার চেষ্টা করিলাম;—পিতা সম্মত হইলেন না। অগত্যা রামমোহনকে সঙ্গে লইয়া আমি পুনা যাত্রা করিলাম।

পুনায় যাইয়া প্রথম কয় দিন বড় আনন্দে কাটিল। ভ্রাতার ও ভ্রাতৃজায়ার অতিরিক্ত আদরে ও যত্নে আমি যেন হাঁফাইয়া উঠিলাম। সেজদাদার ছেলে মেয়েরা দুই দিনেই আমাকে এমন পাইয়া বসিল যে, তাহারা কিছুতেই আমাকে ছাড়িতে চাহিত না। তাহারা অতি সহজেই আমার কবিতরোগোদ্ভূত কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের আবরণ দূর করিয়া দিল,—তাহাদের সংস্রবে আমার অকৃত্রিম হৃদয়খানাই বিকশিত হইয়া উঠিতে লাগিল।

পুনায় দুইটি জিনিস বড় লক্ষ্য করিলাম,—শীতাতপাতিশয্যবর্জ্জিত ঋতু, আর মহারাষ্ট্রমহিলার মনোরম নিঃসঙ্কোচ স্বাধীনতা।

কিছু দিন পুনায় অবস্থান করিয়া, আমি সহর ছাড়িয়া একবার পল্লীগ্রাম দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম। সেজদাদা বলিলেন,—"গ্রামে যাইয়া তুমি কোথায় থাকিবে? পল্লীগ্রামে যাইয়া কাজ নাই। তবে যদি ইচ্ছা কর, অদূরবর্ত্তী সিংহগড়ে দুই চারি দিন থাকিয়া আইস। সরকারী বাঙ্গলায় তোমার

বাসের বন্দোবস্ত করিয়া দিব। ইতিহাসে অবশ্য সিংহগড়ের কথা পাঠ করিয়াছ। সিংহগড় মুসলমানের ছিল,—শিবাজী দুর্গ অধিকার করিয়া ইহার বর্ত্তমান নামকরণ করেন। তাহার পর এই দুর্গ কখনও মুসলমানের, কখনও মহারাষ্ট্রীয়দিগের অধিকারে আইসে। শেষে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ সেনাগণ এই দুর্গ অধিকার করে।”

নাই মামার অপেক্ষা কানা মামা ভাল—আমি সিংহগড়ে যাইতে চাহিলাম। সিংহগড় পুনা হইতে সপ্তক্রোশ দূরে অবস্থিত। প্রায় চল্লিশ ফিট উচ্চ পর্ব্বতোপরি প্রায় একক্রোশব্যাপী ত্রিভুজাকৃতি ভূমিতে দুর্গ অবস্থিত। নিশাশেষে পুনা ত্যাগ করিয়া প্রভাতে আমি সিংহগড়ে উপনীত হইলাম।

সিংহগড় হইতে দূরবর্ত্তী পর্ব্বতমালার ও অদূরবর্ত্তী প্রান্তরের দৃশ্য বড় মনোরম। দক্ষিণে পুরন্দর দুর্গ দেখা যাইত। এই সকল দুর্গই মহারাষ্ট্র-গৌরবের সাক্ষী। মহারাষ্ট্র-গৌরবের প্রখর প্রভাকর এখন অস্তগত; কিন্তু তাহার মরণাহত কিরণজাল এখনও ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে মুছিয়া যায় নাই।

সিংহগড়ের অধিবাসিবিরল বাঙ্গলোয় আমার সঙ্গী ছিল—কিট্সের কবিতা, আর আপনার চিন্তাজাল। আমি ভাবিতাম,—যখন এই দুর্গ মহারাষ্ট্রীয়দিগের অধিকারে আসিত, তখন দুর্গমধ্যে সর্ব্বদা কি রণসজ্জার আয়োজনই চলিত! তখন দুর্গমধ্যে কক্ষে কক্ষে অস্ত্রের ঝনৎকার শ্রুত হইত, কক্ষপ্রাচীরে সশস্ত্র প্রহরীর করধৃত বর্শার ফলকে রবিকর প্রতিফলিত হইত। রণানন্দোন্মত্ত মহারাষ্ট্রীয় বীর সৈনিকগণ সকল প্রকার ক্লেশ স্বীকার করিয়া আপনাদিগের সমরকৌশলের উন্নতিসাধন করিত। আবার যখন এই দুর্গ মুসলমানের হস্তগত হইত, তখন দুর্গমধ্যে বিলাসের কি উচ্ছৃঙ্খল স্রোত বহিয়া যাইত! তখন কক্ষে কক্ষে যুবকের শিরস্ত্রাণে, যুবতীর শিরসিজে, হীরকের দীপ্তি প্রকাশ পাইত; সুন্দরীর মাল্যাভরণভূষিত কেশজাল হইতে উত্থিত সৌরভ ও আতর গোলাবের মধুগন্ধ সমস্ত কক্ষ সৌরভময় করিয়া তুলিত; তরুণী সুন্দরীদিগের মধুর কণ্ঠের কলহাস্যে ও গজলগানে দুর্গটি বিলাস-বাহুল্য-বিশিষ্ট মায়াপুরী বলিয়া বোধ হইত। তখন এই দুর্গমধ্যে কত ষড়যন্ত্র, কত নরহত্যা, কত প্রেমপরিচয়, কত বিরহবেদনা—নিত্য অভিনীত হইত! সুন্দরীর বাহুবন্ধ বীরকে ভীরু করিত, আবার ভীরুর দুর্ব্বল বাহুতে বীরের

একাকী সেই বাঙ্গলোয় আমি এমনই কত কি ভাবিতাম। আর আমার ব্রাহ্মণ পাচক মহাদেও, শিবাজীর অলৌকিক কীর্ত্তিকাহিনীর নানা কিম্বদন্তী-বিজড়িত ইতিহাস শুনাইয়া আমার সময়যাপনের সাহায্য করিত।

বাঙ্গলোর পার্শ্বেই একখানি পরিচ্ছন্ন ক্ষুদ্র গৃহে এক জন মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি আপনাকে শিবাজীর পুরোহিতবংশীয় বলিয়া পরিচয় দিতেন। কথাটা সত্য কি না, সন্দেহ করিবার কারণ থাকিতে পারে; কিন্তু তখন সে কথাটায় আমার কোনরূপ সন্দেহ হয় নাই।

সেই ব্রাহ্মণের পদার্পিতমাত্রযৌবনা অতিবাহিতা দুহিতা—রেবা, পিতার পূজার জন্য কুসুমচয়ন করিতে প্রতিদিন প্রভাতে বাঙ্গলোর উদ্যানে আসিত। সেই মৃদুমধুরানিলবীজিত, বিহগবিরাবিত প্রভাতে, সেই প্রস্ফুট কুসুমরাশির মধ্যে সেই কুসুমচয়ননিরতাকে দেখিয়া আমার কি মনে হইত, তাহা কেমন করিয়া বুঝাইব? সেই কুসুমরাশির মধ্যে মধুরতম কুসুমকে দেখিয়া—কি আনন্দে—কি আশায় আমার হৃদয় চন্দ্রোদয়ে সিন্ধুর মত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত, তাহা আমি প্রকাশ করিতে অক্ষম।

বসন্তের প্রভাতে যেমন প্রথম কোকিলকূজন শুনিয়া বনভূমে কুসুমরাশি প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে, তেমনই সেই বালিকাকে দেখিয়া আমার হৃদয়ে প্রেম বিকশিত হইয়া উঠিল। সে প্রেম বড় বেদনার—বড় সুখের। প্রথম প্রণয়ে কে সেরূপ অনুভব করে নাই! সংসারসঙ্ঘাতে হৃদয়ের বৃত্তি সকল বিকল হইবার পূর্ব্বে হৃদয় যখন নির্ম্মল থাকে, প্রেমপ্রবৃত্তি যখন নবীন থাকে—তখনকার প্রেম বড় পবিত্র—বড় প্রবল। তাই তাহার স্মৃতি সহজে হৃদয় হইতে অপনীত হয় না। হৃদয় অনুসন্ধান কর,—দেখিবে, অতীত জীবনের কুহেলিকাচ্ছন্ন নানা স্মৃতির মধ্যে একটি স্মৃতি বড় স্পষ্ট;—দেখিবে, সে অন্ধকার হৃদয়-আকাশে একটি তারকা বড় উজ্জ্বল। সে আজ কত দিনের কথা,—সে যেন স্বপ্নরাজ্যের স্মৃতি! সে আজ কোথায়—সে আজ কাহার? আজ আর তাহাকে দেখিলে চিনিতে পার না, সেও আজ আর তোমাকে দেখিলে চিনিতে পারে না; আজ সেই পুত্রকন্যাপরিবেষ্টিতা গৃহিণীকে দেখিলে চিনিতে পার না; কিন্তু সেই যে বালিকামূর্ত্তি আজও হৃদয়ে অঙ্কিত রহিয়াছে, তাহা মুছিতে পার কি?

প্রতিদিন প্রভাতে বারান্দায় আরাম-কেদারায় শয়ন করিয়া আমি উদ্যানের

বেগে আঘাত করিতে থাকিত।—সে আসিবে ত? সে আসিত। আমার তৃষিত নয়ন যেন তাহার গতিবিধি সাগ্রহে পান করিত। তাহার পর সে ফুলের সাজি লইয়া চলিয়া গেলে আমি আপনার চিন্তায় আপনি মগ্ন হইয়া পড়িতাম।

আমি সে বালিকার কি জানিতাম, কতটুকু জানিতাম! তবুও আমি তাহাকে ভালবাসিতাম। তাই সেক্সপীয়র বলিয়াছেন,—

যুবকের প্রেম কভু বাস নাহি করে
হৃদে তা'র ; বাসে তা'র নয়ন উপরে।

সত্যই যুবক যুবতীর প্রেম নয়নের মোহমাত্র। কাব্যে ও উপন্যাসে কেবল প্রেমের কথা পাঠ করিয়া আমার হৃদয়ের প্রেমপদ্ম বিকাশের জন্য কেবল প্রথম রবিকরস্পর্শের অপেক্ষা করিতেছিল। আমি আমার সেই হৃদয়রুদ্ধ প্রেমের মধুর কল্লোল শুনিতে পাইতাম, তাহার আন্দোলন আমার হৃদয়ে অনুভব করিতাম। কেবল তাহাকে মুক্ত করিবার অবসর পাই নাই। বিহগ যেমন মধুকণ্ঠের সুধাময় কাকলি লইয়া অপেক্ষা করে—বিহগীকে পাইলে গীতস্বরে তাহাকে প্লাবিত করিয়া দেয়, আমিও তেমনই এই বালিকাকে দেখিয়া আমার হৃদয়ের রুদ্ধ প্রেমরাশি মুক্ত করিয়া দিয়াছিলাম। তাহার স্রোতোবেগে আমি আপনি চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিলাম।

আমি অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম—ব্রাহ্মণ সহজে বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণের করে আপনার কন্যাকে সমর্পণ করিতে স্বীকৃত হইবেন না! সেই প্রথম যৌবনে আমার হৃদয়ে সমাজসংস্কারের বাসনা অত্যন্ত বলবতী ছিল। আমি এক দিন ব্রাহ্মণকে ডাকাইয়া অন্যান্য কথার পর এক সুদীর্ঘ বক্তৃতায় তাঁহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম যে, ভারতবর্ষে ভিন্ন-ভিন্ন-প্রদেশবাসী সমবর্ণের লোকদিগের মধ্যে বিবাহ প্রচলিত না হইলে জাতীয় একতার,—জাতীয় উন্নতির কোনও সম্ভাবনা নাই; একবর্ণোদ্ভূতদিগের মধ্যে কেবল আবাসস্থানের পার্থক্যহেতু বিবাহব্যবহার নিষিদ্ধ হওয়াই অস্বাভাবিক। হৃদয়ে যাহা সত্য সত্যই অনুভব করা যায়, তাহা প্রকাশের জন্য জ্বালাময়ী ভাষার অভাব হয় না। এখন মনে করি,—সেই বক্তৃতাটা লিখিয়া যদি কলিকাতার কোন বক্তৃতামঞ্চে খাতা পড়িতাম, তবে ছাত্রগণও আমাকে ধন্য ধন্য করিত, কোন না কোন সাময়িক পত্রেরও দুই তিন মাসের খোরাক জুটিত। ব্রাহ্মণ নীরবে আমার কথা

দরিদ্রের পক্ষে অর্থের প্রলোভন বড় প্রবল প্রলোভন। আমার রাজোচিত সম্পদের কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণের আপত্তির বালির বাঁধ দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে লাগিল। তিনি ভাবিলেন, বিবাহ দিয়া কন্যাকে আর না আনিলেই ত হয়! সমাজে চলিত হইতে প্রায়শ্চিত্তের ব্যয় বড় অধিক কি?

আমি সে কথা জানিতে পারিলাম।

৪

প্রাণে প্রবল পিপাসা বহিয়া আমি সিংহগড় হইতে পুনায় ফিরিয়া আসিলাম। দুই দিন পরেই সেজ দাদার নিকট বিদায় লইয়া পুনা ছাড়িয়া গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলাম।

সেক্‌স্‌পীয়ারের নাটক হইতে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস পর্য্যন্ত নানা পুস্তকে আমি প্রেমিকদিগের—বিশেষ হতাশ প্রেমিকদিগের বর্ণনা পাঠ করিয়াছিলাম। গৃহে ফিরিয়া আমি প্রেমিকজনসুলভ ইচ্ছাকৃত বেশবিশৃঙ্খলা হইতে ক্ষুধামান্দ্য পর্য্যন্ত সকল লক্ষণই ধারণ করিলাম। কিন্তু কি দুর্দ্দৈব—আমার এ দুর্দ্দশা কেহই লক্ষ্য করিলেন না। আমি সকলের উপর বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিতে লাগিলাম।

কেবল শুনিতে পাইতাম, আমার স্নেহময়ী ভ্রাতৃজায়ারা পরস্পরের মধ্যে বলাবলি করিতেন—"বিবাহের ভাবনা ভাবিয়া ভাবিয়াই ঠাকুরপো শুকাইয়া যাইতেছে।" শুনিয়া স্কটের সেই কথা আমার মনে পড়িত,—

যাতনা-তাড়িত যবে, ব্যথিত যখন—
দেবীমূর্ত্তি হেরি তব, রমণী তখন।

বোধ করি, বৌদিদিদিগের কথায় দাদারা আমার দুর্দ্দশার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। কান ধরিয়া কেহ দেখাইয়া না দিলে নিষ্ঠুর পুরুষ অপরের দুর্গতির দিকে দৃষ্টিপাত করে?

তখন আমি রাশি রাশি প্রেমের ও হতাশার কবিতা লিখিতাম। আমার কক্ষে যেখানে রাখিলে কবিতার খাতাখানি বৌদিদিদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে—জানিতাম, ইচ্ছা করিয়া (যেন ভ্রমক্রমে) সেখানা সেখানে রাখিয়া যাইতাম। মাঝে মাঝে সেখানাকে দেখিতে পাইতাম না; তাহার পর আবার খাতাখানা যথাস্থানেই মিলিত। বোধ করি, খাতাখানা দুই এক দিন দাদাদের হাতেও পঁহুছিয়াছিল।

বুঝিতেন না,—তিনি মধ্যপথাবলম্বিগণকে বড় ঘৃণা করিতেন। আমি বুঝিলাম, হয় আমি তিরস্কৃত হইব—নয় ত আমার মনস্কামনা পূর্ণ হইবে।

এক দিন অপরাহ্নে এক জন আত্মীয় আমার নিকট সকল কথা জানিতে আসিলেন। আমি বুঝিলাম, বাবাই তাঁহাকে পাঠাইয়াছেন। আমি সকল কথা ভাঙ্গিয়া বলিলাম।

তিনি গিয়া বাবাকে সকল কথা বলিলেন। বাঁধ ভাঙ্গিবার পূর্ব্বেই নদী যেমন স্থির হয়, পিতা তেমনই গম্ভীর হইলেন; কোনও উত্তর দিলেন না। আশায় ও আশঙ্কায় সে রাত্রে আমার নিদ্রা হইল না। নিশাশেষে যখন প্রভাততপন আমার জাগরণক্লান্ত নয়নে স্নেহস্পর্শ দিতেছিল, তখন লঘুনিদ্রায় আমি স্বপ্ন দেখিলাম,—যেন সিংহগড়ে সেই বাঙ্গলোর বারান্দায় আরামকেদারায় শুইয়া আছি—আর সম্মুখে উদ্যানে রেবা কুসুম চয়ন করিতেছে। সেই সময় এক দল চড়াই কলরব করিতে করিতে মুক্ত গবাক্ষপথে আমার কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। আমার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল।

প্রভাতে পিতার আজ্ঞা শুনিতে পাইলাম। তিনি বলিয়াছেন,—"আমার গৃহে থাকিয়া ওরূপ পাগলামী করা চলিবে না। যদি পাগলামী করিতে হয়, তবে আমার গৃহ ত্যাগ করিতে হইবে। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহ করিয়া আমার যে পুত্র সমাজচ্যুত হইবে, তাহার সহিত আমার কোন সম্বন্ধই থাকিবে না।"

কথাটা শুনিয়া কাঁদিয়া ফেলিলাম। ক্ষোভে ও দুঃখে ভাবিলাম, কবিতার খাতাখানা দগ্ধ করিয়া ফেলি। পরক্ষণেই বিষয়বুদ্ধি বলিল যে, কবিতাগুলা ছাপাইলে যশোলাভের সম্ভাবনা। কাজেই আর খাতাখানা ধ্বংস করা হইল না;—যুবকযুবতীদিগের মাথা খাইবার জন্য কবিতাগুলি রাখিয়া দিলাম।

আমি জানিতাম, আমার জনকের নিয়োগ নিয়তির বিধানের মত কঠোর ও অপরিবর্ত্তনীয়। কাজেই সে কথা লইয়া আর গোলযোগ করিলাম না। আমার প্রেমরোগ আমার বুদ্ধির বিকার জন্মাইতে পারে নাই। আমি বুঝিয়াছিলাম—কালের ভেষজে এ হৃদয়ক্ষত বিদূরিত হইতে পারিবে, কিন্তু পিতৃগৃহ হইতে বিতাড়িত হইলে উদরান্নের উপায়চিন্তার যন্ত্রণা এ জীবনে আর দূর হইবে না।

আমার কবিতারোগ ও প্রেমরোগ সত্ত্বেও আমি এ কথাটা দৃঢ় বুঝিয়া-

তখন একটা সোজা কথা বুঝিলেই হইত; কিন্তু সেটা তখন বুঝিতে পারি নাই—মহারাষ্ট্রীয় মহিলাকে বিবাহ করিলে অনুবাদ করিতেই সমস্ত জীবন অতিবাহিত হইত।

তাহার পর ছয় বৎসর বহিয়া গেল। আমি বিবাহ করিলাম না। সে যে কেবল আমার প্রবল প্রেমব্যাধির জন্য, এমন কথা বলিতে পারি না। তবে প্রথম প্রণয়ের স্মৃতি লইয়া আমি যে বিবাহিত জীবনের শত সুখ ইচ্ছায় পরিহার করিলাম,—প্রেমের মন্দিরে জীবনের সুখ বলি দিলাম,—আত্মত্যাগের একটা জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইলাম,—ইহা মনে করিতেও গর্ব্ব আছে। আমি সে গর্ব্বানুভবের সুখ হইতে আপনাকে বঞ্চিত করিতে স্বীকৃত ছিলাম না। টেনিসনের রাজকন্যা যেমন তাঁহার ভ্রম মুকুটের মত করিয়া ধারণ করিতেন, আমি তেমনই আমার সেই "প্রেমপাগ্‌লামী" মুকুটের মত ধারণ করিতাম;—তাহার জন্য লজ্জিত হইতাম না, বরং গর্ব্বিত হইতাম।

এই ছয় বৎসর পরে কিছু দিনের অবকাশ লইয়া সেজদাদা গৃহে আসিলেন। অবকাশান্তে কর্ম্মস্থলে ফিরিবার সময় তিনি আমাকে বলিলেন, "চল,—কিছু দিন পুনায় থাকিয়া আসিবে।" আমি স্বীকৃত হইলাম। সেজদাদার পত্নী রহস্য করিয়া বলিলেন, "বিষে বিষক্ষয় হয়। চল; একবার মহারাষ্ট্র দেশে যাইয়া যে ব্যাধি বাধাইয়া আসিয়াছ, আর একবার মহারাষ্ট্র দেশে গিয়া যদি সে ব্যাধির করাল কবল হইতে মুক্তিলাভ করিতে পার!"

আমি সেজদাদার সঙ্গে পুনর্যাত্রা করিলাম।

শুনিয়াছি, শিকারী কর্তৃক তাড়িত হইলে মরিবার জন্য শশক তাহার যাত্রার স্থানে ফিরিয়া আইসে। তেমনই নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হইবার জন্যই কি আমার প্রেম তাহার প্রথম উৎপত্তিস্থানে ফিরিয়া চলিল?

পুনায় আসিয়া প্রথম কয় দিন মনটা বড় অস্থির হইতে লাগিল। ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় আমি অতীতের নানা কথা স্মরণ না করিয়া থাকিতে পারিতাম না। কেবল সময় সময় সেজদাদার পুত্রকন্যাদিগকে লইয়া সে সকল ভাবনা ভুলিয়া থাকিতাম। যেখানে একটা ঘটনায় হৃদয়ের সব উল্টা পাল্টা হইয়া গিয়াছিল, সেখানে গেলে শেষ ঘটনাটার কথা ও তাহার আনুষঙ্গিক নানা কথা না ভাবিয়া থাকা যায় না; তাই আমিও সেই সকল কথা ভাবিতাম। আশা করি, সে জন্য দুর্ব্বলচেতা বলিয়া উপহসিত হইব না।

জন্মিতে লাগিল। কথিত আছে, নরহন্তা ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় তাহার হত্যাভিনয়ক্ষেত্র দেখিতে আসিয়া থাকে। সেইরূপ কোনও একটা প্রবল আকর্ষণ প্রেমিককে তাহার প্রেমাভিনয়ক্ষেত্রের দিকে আকর্ষণ করে কি না, তাহা কে বলিবে? চুম্বক কেন লৌহকে আকর্ষণ করে? সূর্য্য কেন পৃথিবীকে করদান করে? প্রেম কেন মানবহৃদয় অধিকার করে? এ সকল কথার মীমাংসা করা দর্শনের ও বিজ্ঞানের সাধ্যাতীত। জগতের অনেক ঘটনা,—অনেক কার্য্য, আমাদিগের জ্ঞানের অতীত।

সিংহগড়ে যাইবার কথাটা সেজদাদাকে বলিতে কেমন লজ্জাবোধ হইতে লাগিল। শেষে এক দিন আমি মুখ ফুটিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"সিংহগড়ের সরকারী বাঙ্গলো কি খালি আছে?" সেজদাদা বলিলেন, "কেন? সিংহগড়ে বেড়াইতে যাইবে?" আমি মৃদুস্বরে বলিলাম,—"হাঁ।"

সেজদাদা আমার সিংহগড়ে যাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

বৌদিদির গুটিকতক চোকাল চোকাল বিদ্রূপবাণ সহ্য করিয়া আমি সিংহগড়ে যাত্রা করিলাম।

৬

যখন আমি সিংহগড় গিরিমূলে উপনীত হইলাম, তখন বাঁধভাঙ্গা জলস্রোতের মত স্মৃতির স্রোত আমার হৃদয়ে বহিয়া যাইতে লাগিল। আমার হৃদয় বেগে আঘাত করিতে লাগিল। আমি কল্পনানয়নে বাঙ্গলোর উদ্যানে বিকসিত কুসুমরাশির মধ্যে ফুল্লারবিন্দবৎ সেই বালিকাকে দেখিতে পাইলাম;—তাহার প্রকোষ্ঠসংলগ্ন অলঙ্কারের মৃদু মধুর ধ্বনি শুনিতে পাইলাম।

সে সকল চিন্তার,—সে সকল স্মৃতির আর শেষ হয় না!

সিংহগড়ে উপস্থিত হইয়া আমি সেই ব্রাহ্মণের সন্ধান লইলাম। যাহা শুনিলাম, তাহাতে এত দিন পরেও আমার নয়ন দুটি অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল। শুনিলাম—সে ব্রাহ্মণ এখন মৃত; যেখানে তাঁহার আবাসগৃহ ছিল, সেখানে এখন এক জন বিজাতীয় যুরোপীয় একখানা বাঙ্গলো নির্ম্মাণ করিয়াছেন,—সময় সময় সপরিবারে সেখানে আসিয়া বাস করিয়া থাকেন। সেই যুরোপীয়ের পক্ষে মূল্য দিয়া সেই ভূমি ক্রয় করিয়া সেখানে গৃহনির্ম্মাণ করিয়া বাস করাও আমার নিকট পৈশাচিক বর্ব্বরতা বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। আমার কল্পনারচিত নন্দনকাননে সেই দুরাচার দৈত্যের অবস্থিতি নিতান্তই বিরক্তি-

তবে সে কোথায়?

সেই দিন অপরাহ্নে আমি বাঙ্গলোর বারান্দার আরাম-কেদারায় শয়ন করিয়া কত কি ভাবিতেছিলাম। এমন সময় একটি চার কি পাঁচ বৎসরের বালিকাকে সঙ্গে হইয়া এক জন মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ বাঙ্গলোর উদ্যানে প্রবেশ করিল। সে আমার দিকে অগ্রসর হইল,—নিকটে আসিয়া অভিবাদন করিল। আমি দেখিলাম, সেজদাদার ভূতপূর্ব্ব পাচক—মহাদেও। আমি তাহার কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলাম। সে বলিল যে, সেজদাদার কর্ম্মত্যাগ করিয়া সে কিছু দিন ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিল; কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া,—বিবাহবন্ধনে বদ্ধ হইয়া, এখানেই বাস করিতেছে।

তাহার কন্যাটি এক দৃষ্টে আমার দিকে চাহিয়াছিল। আমি তাহার মুখে যেন কাহার মুখের সাদৃশ্য লক্ষ্য করিতেছিলাম। অথচ কি সাদৃশ্য,—কাহার সাদৃশ্য—তাহা কিছুতেই মনে করিতে পারিতেছিলাম না!

আমি মহাদেওকে তাহার গৃহ কোথায়—জিজ্ঞাসা করিলাম। সে বলিল যে, বাঙ্গলোর উদ্যানের বাহিরেই তাহার গৃহ। তাহার পর সে সঙ্কুচিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল,—"বাবু কি একবার আমার বাড়ী যাইবেন?" আমি কখনও কোন মধ্যবিত্ত মহারাষ্ট্রীয়ের গৃহাভ্যন্তর দেখি নাই,—দেখিতে কৌতূহল ছিল। আমি যাইতে স্বীকৃত হইলাম। মহাদেও আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিল।

আমরা তাহার গৃহে উপনীত হইলে, আমাকে বাহিরের ঘরে বসাইয়া মহাদেও কন্যাকে বলিল,—"ভদ্রা, তোর মাকে বলিয়া আয়—বাঙ্গালী বাবু আসিয়াছেন,—ছোট বাবু। তাঁহাকে আসিতে বল।"

আমি কিছু বিস্মিত হইলাম। মহারাষ্ট্রীয়দিগের মধ্যে স্ত্রীস্বাধীনতা কতকাংশে প্রচলিত আছে বটে, কিন্তু মহারাষ্ট্রমহিলাগণ যে নবাগত অতিথির সম্মুখে আইসেন—এ কথা আমি জানিতাম না।

অল্পক্ষণ পরে একটি পুত্রক্রোড়ে গৃহকর্ত্রী আসিয়া আমার কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। ছয় বৎসর পূর্ব্বে, একটি মহারাষ্ট্র বালিকা সিংহগড়ে বাঙ্গলোর উদ্যানে, বঙ্গদেশ মহারাষ্ট্র দেশেরই মত কি না, আমাকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। সে স্বর তখনও আমার কর্ণে বাজিতেছিল। আমি চমকিয়া উঠিলাম।

গৃহকর্ত্রীর জননীমূর্ত্তিতে আমি তাঁহার বালিকামূর্ত্তি চিনিতে পারিলাম।

আমি সেখানে আর অপেক্ষা করিলাম না ; মিষ্টান্নের জন্য ক্ষুদ্র বালিকাটির হস্তে কয়টি মুদ্রা দিয়া বিদায় লইলাম।

মহাদেও আমার সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গলো পর্য্যন্ত আসিল।

৭

আমি আর বিলম্ব করিলাম না,—পুনায় ফিরিয়া আসিলাম। তাহার পর তাড়াতাড়ির জন্য সেজদাদার নিকট কোনরূপ কৈফিয়ৎ না দিয়াই পুনা হইতে গৃহে ফিরিলাম।

আমার মনে হইতে লাগিল,—যেন আমি প্রতারিত—অত্যাচারপীড়িত। আমি স্থির করিলাম—প্রতিশোধ লইব। অথচ কেন প্রতিশোধ লইব, কিসের প্রতিশোধ লইব, তাহার কিছুই বলিতে পারি না! কিন্তু প্রতিশোধের উপায় স্থির হইয়া গেল। আমি স্থির করিলাম—অতীত জীবন হইতে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করিব—আমি বিবাহ করিব।

বিবাহে পাত্রীর রূপ বা গুণ কিছু দেখিবার আবশ্যকতার কথা আমার একবার মনেও হইল না। পিতার বহু কর্ম্মচারীর মধ্যে এক জন আমাদিগের স্বজাতীয় ছিলেন। তাঁহার একটি বিবাহযোগ্যা কন্যা ছিল। উপকথার নৃপতি যেমন প্রভাতে প্রথম যাহার মুখ দেখিবেন, তাঁহারই সহিত কন্যার বিবাহের প্রস্তাব করিতে চাহিয়াছিলেন, আমি তেমনই তাহার কথা শুনিয়া তাহাকেই বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিলাম। শুনিয়া পিতা কিছু বিস্মিত হইলেন ; কিন্তু সম্মতি দিলেন। অল্প দিনের মধ্যেই বিবাহ হইয়া গেল।

আমার পত্নী "রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী" না হইলেও, যেমনটি হইলে লইয়া ঘর করিবার সুবিধা হয়, ঠিক তেমনই। বাঙ্গালীর মেয়ের পক্ষে তাহাই কি আবশ্যক নহে? যাহাদের কর্ম্মক্ষেত্র রাজপথ নহে, পরন্তু গৃহ, তাহাদের পক্ষে ঠিক ঘর করিবার মত হওয়াই কি আবশ্যক নহে? দেবীর কাছে প্রাণ হাঁফাইয়া ওঠে, দানবী লইয়া ঘর করা চলে না। মানবের পক্ষে মানবীই আবশ্যক, মানবীই যথেষ্ট।

*   *   *   *   *   *

এখন প্রায় বর্ষে বর্ষে বা বৎসর অন্তর গৃহিণী আমাকে হয় একটি পুত্র, নয় একটি কন্যা, উপহার দিয়া থাকেন। ছেলে মেয়ে লইয়া, পিতার প্রজাদিগকে পীড়ন ও তাড়ন করিয়া আমার দিন বেশ কাটিয়া যাইতেছে। কেবল আমার

কাটাইতে পারি নাই; তাহাদের জন্ত অনেক অর্থ ও সময়ের অপব্যয় হইয়াছিল।

বোধ করি, আমার কোন বৌদিদি গৃহিণীকে আমার সেই বাল্যপ্রেমের কথাটা বলিয়া দিয়াছেন। তাই "খোট্টা" মেয়ের প্রেমে পড়িয়াছিলাম বলিয়া, আমাকে এখনও মধ্যে মধ্যে গৃহিণীর কাছে খোঁটা খাইতে হয়।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

ফুল ও ফল।

"গুণ গুণ গুণ!", মৌমাছি ফুলের বাগানে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়—আর বলে, গুণ গুণ গুণ। সে কি গুণের ব্যবসা করে? মাথাঘসা, চীনের সিন্দুর, ফুলের রঙ্গ ও পানের মসলার মত গৌরবিনী-মহলে গুণের পসরা লইয়া রোজ রোজ ফিরি করিতে আসে? না। ফুলের বাগানে গুণের অভাব নাই। নিউকাসলে কয়লা বেচিতে কেহ যায় না। বিশেষতঃ মানিনী-মহলে গুণ বেচিতে যাইলে, গুণের তাঁদের অভাব আছে—বুঝায়, ধৃষ্ট মধুকর তাহা হইলে অচিরে শিক্ষালাভ করিয়া পাড়া ছাড়িতে বাধ্য হইত। তবে কি মধুকর flirtation করিবার জন্য গুণবতী-মহলে হাজির হইয়া ঘোষণা করে যে, এখানে চারি দিকে গুণের রাশি, যে দিকে চাই, সেই দিকেই গুণ গুণ গুণ! এ কথাটা কতক সম্ভব বটে।

কিন্তু ফুলরাজ্যে কি সবাই স্ত্রীলোক? মৌচাক স্ত্রীসাম্রাজ্য—মেয়ে চাকর, মেয়ে চাপরাশী, মেয়ে জজ ও মেয়ে রাজা। ফুলের রাজ্যে কি পুরুষ নাই? শাস্ত্রমতে কমল ও কুমুদ স্ত্রীজাতি; যূথী, জাতি, মল্লিকা, সেঁউতি, গোলাপ, সেফালিকা, চামেলী ও অপরাজিতা স্ত্রীলোক। গোলাপ বিলাতী ফুল, হাবভাব দেখিয়া বুঝা কঠিন, সে পুরুষ না মেয়ে। সে যাই হউক, শাস্ত্রমতে উদ্ভিজ্জবিদ্যা শিখিতে হইলে কমলকে কমলিনী বলিতে হইবে, এবং সব কমলকেই স্ত্রীজাতীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হইবে; নতুবা ভাটপাড়ার ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা আমাকে নাস্তিক বলিয়া হুঁকা বন্ধ করিবার ব্যবস্থা দিতে পারেন।

ইহা অপেক্ষা আরও শক্ত কথা যে, গুণ গুণ গুণ গুণ মধুকর বলে না—করে। এ শব্দটি মধুকরের মুখ হইতে বাহির হয় না,

হইতে এ শব্দ বাহির হয়। সুতরাং ফুলে বা ফলে, বনে বা জঙ্গলে, শরীরের উত্তেজনা লইয়া উড়িতে গেলেই মধুকরের শরীর হইতে এইরূপ শব্দ বাহির হইবে। গুণের ব্যবসা করিতে, কি যুবতীসমাজে খোসামুদি করিতে মধুকর গুণ গুণ করে না। বিজ্ঞানের কঠোর হস্তে কবিতার কোমল তন্তু ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়। এ বড় বালাই।

সাহেবদের মধ্যে যেমন স্ত্রী পুরুষ আছে, বাঙ্গালীর মধ্যেও তেমনি স্ত্রী-পুরুষ আছে। নিগ্রো, জুলু, চামাকা, সব জাতিতেই এইরূপ। ফুলের দেশে গোলাপকে সাহেব, মালতীকে আসামী, অপরাজিতাকে বাঙ্গালী, কমলকে সার্কেশিয়ান্ ও কুমুদকে য়িহুদী বলিলে, তাহাদের স্ত্রীপুরুষত্বের আরোপ করা হয় না। কমলেও স্ত্রীপুরুষ আছে, মালতীমহলেও স্ত্রীপুরুষ আছে। সুতরাং একজাতীয় ফুলকে পুরুষ, অন্যজাতীয় ফুলকে স্ত্রী বলিয়া শাস্ত্রকারেরা কবি-পণা দেখাইয়াছেন, বৈজ্ঞাণিকপণা দেখাইতে পারেন নাই।

জীবরাজ্যের সহিত ফুলরাজ্যের একটু প্রভেদ আছে। জীবরাজ্যে সৌন্দর্য্য পুরুষের, স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য্য নাই। যে জীবটি মোটা সোটা, তেজাল, সুন্দর ও সুরূপ, নাচে ভাল, গায় ভাল, চলে ভাল, বলে ভাল, হাব ভাব ভ্রুভঙ্গী ভাল, সে পুরুষ। জীবরাজ্যে রমণী ক্ষীণা দীনা। পশু পক্ষী পর্য্যবেক্ষণ করিলে এ কথা প্রতীত হইবে। ভেক প্রভৃতি কয়েক প্রকার সরীসৃপে পুরুষকে স্ত্রীর অপেক্ষা ক্ষীণাঙ্গ দেখা যায়। বলে ছোট, আকারে ছোট, দেখিতে খারাপ। তাহার কারণ, পিপীলিকা ও মধুমক্ষিকার ন্যায় সরীসৃপের পুরুষেরা মেয়েমহলে অনাদৃত, অপমানিত, আহত, বা প্রাণচ্যুত হয়।

রমণী অপেক্ষা পুরুষের সৌন্দর্য্য অধিক, এ কথা সভ্য মানবসন্তানকে বলা যায় না। অসভ্য বর্ব্বরেরা এ কথার সত্যতা স্বীকার করিবে। মাঝির চেয়ে মাঝিয়ান যে চলনসই, যে সাঁওতাল দেখিয়াছে, সেই এ কথা বলিবে। বর্ব্বরদের বৃদ্ধারা বৃদ্ধদিগের অপেক্ষা কুৎসিত; কিন্তু যুবতীরা যে যুবকদিগের অপেক্ষা সুন্দর; সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। শুধু আকার প্রকারে নহে, বুদ্ধি ও নিপুণতায় বর্ব্বরভাবিনী বর্ব্বরের চতুর্গুণ শ্রেষ্ঠ।

ব্যাবৃত্তি ও চালনাগুণে সভ্য মানবসমাজে কে রূপে গুণে শ্রেষ্ঠ, পুরুষ না নারী? বলা শুধু কঠিন নহে, অনেক স্থলে নিরাপদও নহে। গাইতে, বাজাইতে, নাচিতে, চলিতে, পড়িতে, শিখিতে, ভাবে, বলে, রূপে, গুণে, সভ্য মানবসমাজে নরনারীর বিশেষত্ব অতি সামান্য। সকলেই সুন্দর, সকলেই মনোজ্ঞ। ফুলের

মালায় কোনটি কলিকা, কোনটি ফুটন্ত, কিন্তু সুরভি সকলেই। ফুল জাতিতে রূপ গুণ দেখিয়া বলিবার উপায় নাই, কে পুরুষ, কে রমণী। সকলেই সুন্দর, সকলেই সৌরভসম্পন্ন।

ফুলের এত রূপ কেন—এত সুগন্ধ কেন ? রাজার বাগানে যে ফুল ফুটে—যা দিয়া বৈঠকখানার 'বোকে', বা বরের গলার মালা, বা ফুলশয্যার শয্যা রচিত হয়—সে ফুলে রূপ গুণের প্রয়োজন বটে ;—যে ফুলে দেবতার পূজা হয়, সে ফুলে গন্ধ থাকিলেই হইল, রূপ না থাকিলেও চলে। মধু চাই, গন্ধ চাই, একটু কোমলতা হইলে ভাল হয়—কিন্তু রূপ চাই না। দেবতারা বুঝি রূপ ভালবাসেন না। সে যাহা হউক, যে ফুল বনে জন্মে, মরুভূমির উত্তপ্ত পবন দুর্দ্দমতেজে যাহাকে দলন করে, শুকায়, বা ছিঁড়িয়া ফেলে,—অথবা আকাশের তারা বা মাটীর পুত্তিকা ভিন্ন যাহাকে কেহ দেখে না, দেখিবে না,—সে ফুলে অলোকসামান্য অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য, নবনীতকোমলতা, মুগ্ধকরী মধুরতা কেন ? কেহ রূপের জন্য লালায়িত, কেহ কত মানত করে, কেহ উলকীর দাগটি মুছিয়া ফেলিতে মুখখানি পোড়াইয়া ফেলে, কেহ আপনাকে ধিক্কার দেয়, সে রূপের কাঙ্গালী, তবু সে পায় না, আর বনের মাঝে অকারণে রূপের এত অপব্যয় ! ছি ! ভগবানের কি বুদ্ধি নাই ?

রূপ, গন্ধ ও মধু কেবল ভ্রমরকে ভুলাইবার জন্য। পুরুষের মাথা ঘুরাইবার জন্য রমণীর চোখের কোণে হলাহল থাকে। ভাবিও না, ভ্রমর ফুলের প্রণয়ী। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ফুলে পুরুষ ও স্ত্রী দুই আছে। সভ্য মানবজাতির স্ত্রীপুরুষের মত ফুলের স্ত্রীপুরুষে রূপ রস গন্ধের তারতম্য নাই। পুরুষ ফুলে যেমন মধু, যেমন গন্ধ, যেমন সৌন্দর্য্য, মেয়ে ফুলেও তেমনি ; উভয়েরই একান্ত কামনা ভ্রমরকে ভুলাইবে। ভ্রমর যদি ফুলের প্রণয়ী নহে, তবে ভ্রমর কে ?

ভ্রমরকে ভুলাইতে এই ত্রিবিধ সন্ধান। রূপ দেখাইয়া বা গন্ধে মুগ্ধ করিয়া ফুল ভ্রমরকে কাছে আনে। কাছে আনিয়া আপন অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবার পূর্ব্বে যেন না পালায়, এ জন্য তাহাকে মধু খাইতে দেয়। ফুলের চাতুরী রমণীর চাতুরী অপেক্ষা ন্যূন নহে। রমণীমণ্ডলে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কেহ নাই। যাহার মুখ চোখ মনভুলান, তাহার মাথায় হয় ত কেশের বিরল সঞ্চার। যাহার গঠন মনোমোহন, সে হয় ত শ্যামাঙ্গিনী ; একটা না একটা অসম্পূর্ণতা নাই, এমন রমণী দেখিলাম না। ফুলের রাজ্যেও এমনি। যাহার রূপ ভুবনভুলান, তাহার হয় ত

রূপ ও গুণ, গন্ধ ও সৌন্দর্য্য, একাধারে অতি বিরল। তবে কোথাও কোথাও দুটি দেখিতে পাওয়া যায়। তাদের লইয়া গৃহস্থের সংসার করা চলে। ড্রইংরুম সাজাইব, অথচ সুখী হইব, এমনটি মিলে না। মৃণালে কণ্টক, সাগরাম্বুতে লবণ যাঁহার সৃষ্টি, রূপ গুণের একত্র অসমাবেশ তাঁহারই বিধান। নাই, এমন বলি না। পরম সৌভাগ্য না হইলে এ দেবদর্শন ঘটে না।

সকল ভ্রমর সকল ফুলে যায় না। সাবর্ণ চৌধুরী, গোষ্ঠীপতি, অশূদ্রপ্রতিগ্রাহী, ভ্রমরদলেও যেন যজন-যাজনের শ্রেণীবিভাগ আছে। ঠাকুরবাড়ীতে যাহাদের যাতায়াত, বসুদের বাড়ী তাহাদের দেখিতে পাইবে না। গোলাপের ভ্রমর স্বতন্ত্র, চামেলীর স্বতন্ত্র, অপরাজিতার স্বতন্ত্র। এক রকম ফুল দিনে ফুটে, তাহাদের জন্য স্বতন্ত্র ভ্রমর। এক রকম রাতে ফোটে, তাহাদের জন্য স্বতন্ত্র। রাতের বেলা কাল বা লালরঙ্গের ফুল ফুটে না। যে বর্ণ অন্ধকারে দেখা যায়,—শ্বেত বা হরিদ্রা রঙ্গের ফুল, তাহারাই রাতে ফুটে। ঝিঙ্গা কাঁকুড়ের রাতে ফুটিবার কারণ আছে; তাদের ভ্রমর নিশাচর। অপরাজিতা রাতে ফুটে না। ফুটিলে কেহ দেখিবে না। এবং দেখিবার লোক রাতে জাগে না। হিন্দু কুলবধূ রাতে ফুটে, সাহেবিনী দিনে ফুটে।

যে ফুলের যেমন আকার, তাহার ভ্রমর তাহার অনুরূপ। এক ফুলের ভ্রমর অন্য ফুলে ভ্রম করিয়া আতিথ্যস্বীকার করিলে তাহার সেখানে স্থান হয় না। ভুল চুক সকলেরই আছে। তুমিও ভুলিয়া বন্ধু ভাবিয়া অন্যকে ডাকিয়া থাক, এক বাড়ী যাইতে অন্য বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া ফেল। মুহূর্ত্তে তোমার চমক ভাঙ্গে। মুহূর্ত্তে ভ্রমরেরও চমক ভাঙ্গে। তখন সে গুণ গুণ করিয়া 'অ্যাপলজি' করিতে করিতে অন্যত্র প্রস্থান করে।

যে ফুল ফুটে নাই, অফুটন্ত ফুলে যদি ভ্রম করিয়া ভ্রমর প্রবেশ করে, ফুলের এমনি চাতুরী যে, তাকে ধরিয়া বাঁধিয়া প্রেমপিঞ্জরে বন্দী করিয়া রাখিয়া দেয়। ভ্রমর ধরা কলকৌশল ফুলকন্যা আপনা হইতে শিখে। গৃহিণীকে লজ্জার মাথা খাইয়া মেয়েকে সে সব হাব ভাব শিখাইতে হয় না। কোন কোন ফুলের এমনি গঠন যে, অকালে ভ্রমর তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলে ফুলের পরিস্ফুটতা না হওয়া পর্য্যন্ত আর বাহির হইতে পায় না। সেখানে এমন সুখে তাহাকে রাখা হয় যে, তাহার বাহির হইতেই ইচ্ছা হয় না, এবং ইচ্ছা হইলেও সে বাহির হইতে পারে না।

পুরুষফুল হইতে পরাগ লইয়া স্ত্রীফুলে তাহার সঞ্চার করাই ভ্রমরের কৃতিত্ব। ফুলের বিবাহে ভ্রমর ঘটক। তাই ফুলমহলে ভ্রমরের এত আদর।

ফুলের বিবাহ তিন প্রকারে হয়। ফুল দুই প্রকারের। এক প্রকারের ফুল আছে, যাহার প্রত্যেক ফুলে পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ দুই আছে। তাহাদিগকে উভযোগী বলা যায়। উভযোগী ফুলের বিবাহে কোন ঘটকের প্রয়োজন হয় না। অন্য সব ফুলের পুরুষ ও স্ত্রী স্বতন্ত্র। তাহাদের বিবাহের দুই জন ঘটক আছে—এক পবন, দ্বিতীয় ভ্রমর। এই জাতীয় শতকরা নব্বইটি ফুলের ঘটক ভ্রমর। পবনচালনে পুংপুষ্পের পরাগ উড়িয়া স্ত্রীপুষ্পে আসিয়া পতিত হয়। কিন্তু এরূপ পতনের সম্ভাবনা খুব অল্প। পবনসম্বন্ধ ফুলের রূপ গুণের কোন গৌরব নাই। তাহারা আকারেও খুব বৃহৎ। বৃহদায়তন না হইলে উড়ন্ত পরাগ ধরিবার সামর্থ্য কোথা হইতে হইবে? সুতরাং ফুলমহলের দৌত্যকর্ম্ম ভ্রমরের একচেটিয়া। সেই জন্য ভ্রমরের এত আদর।

ভ্রমরের দৌত্যকর্ম্ম নিঃস্বার্থ নহে। ভাবিনীমহলে আদর গৌরবের বিষয়। অনেক সুশিক্ষিত যুবা এই আদরের জন্য লালায়িত। অধিকন্তু মিষ্টান্নলাভ। অপরূপ রূপদর্শন, মনোমোহন সুগন্ধ উপহার, তার পর অমৃতপান। কমলাকান্ত আফিঙ্গের নেশায় গুণগুণের সব অর্থ বুঝিতে পারেন নাই। ভ্রমরের মত গুণবান কয় জন? নিজের গুণ নিজে গাহিলে আমরা তাহার আদর করিতে কুণ্ঠিত হই—কিন্তু ভ্রমরের মুখে গুণ গুণ গুণ শুনিয়া পুলকে অঙ্গ পরিপূরিত হয়।

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়।

বৈজ্ঞানিক সারসংগ্রহ।

মস্তিষ্ক।

আজকাল তড়িৎ, চুম্বক ও আলোকবিজ্ঞান প্রভৃতির যে প্রকার উন্নতি হইতেছে, জড়বিদ্যার অপর শাখা প্রশাখার সেরূপ শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে না। প্রাকৃতিক শক্তির অনন্ত ভাণ্ডার হইতে শক্তিসংগ্রহ করিয়া, তাহাই আমাদের দৈনন্দিন জীবনের নানা কার্য্যে প্রয়োগ করিবার জন্য বিজ্ঞানবিদ্গণ আজকাল বড় ব্যস্ত। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে জীববিজ্ঞান, উদ্ভিদবিদ্যা ও শারীরবিজ্ঞান প্রভৃতি স্বল্পোন্নত বিষয়গুলির পুষ্টিসাধনের জন্যও তাঁহাদের যত্ন আবশ্যক। সুখের বিষয়, য়ুরোপের কয়েকটি খ্যাতনামা দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক-সমাজের এই একদেশদর্শিতার

নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ইঁহাদের গবেষণার সম্পূর্ণ বিবরণ আজও প্রকাশিত হয় নাই ;—সম্প্রতি মস্তিষ্কের কার্য্যসম্বন্ধীয় যে কয়েকটি সিদ্ধান্ত জানা গিয়াছে, বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহাই আলোচিত হইবে।

অতিপ্রাচীন কাল হইতে বিজ্ঞানবিদ্‌গণ বর্ণনা করিয়া আসিতেছেন যে, মস্তিষ্কই স্মৃতি, মেধা প্রভৃতি নানা মনোবৃত্তির মূল আধার। কিন্তু কি জটিল প্রক্রিয়ায় ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে ঐ সকল জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, তাঁহারা বহু প্রযত্নেও তাহার নির্ণয় করিতে পারেন নাই। প্রায় এক শত বৎসর পূর্ব্বে এক শারীরতত্ত্ববিদ্ বহুকাল এই বিষয়ের বিফল আলোচনা করিয়া, শেষে বিরক্ত হইয়া বলিয়াছিলেন,—"যকৃত হইতে যে প্রকারে পিত্তরস সঞ্চিত হয়, সেইরূপ কোন প্রক্রিয়ায় মস্তিষ্কেও চিন্তা উৎপন্ন হইয়া থাকে ; যত দিন এই জটিল ব্যাপারের প্রকৃত সিদ্ধান্ত আবিষ্কৃত না হয়, তত দিন আমাদের এই ব্যাখ্যাতেই পরিতৃপ্ত থাকা উচিত।" এই উক্তি ভগ্নোদ্যম দার্শনিকের হৃদয়োচ্ছ্বাস নয়,—জড়বিজ্ঞানের সেই শৈশবাবস্থায়, কোন যন্ত্রাদির সাহায্য না লইয়া, মস্তিষ্কের কার্য্যপ্রণালীর প্রকৃত তত্ত্বের আবিষ্কার বাস্তবিকই অতি সূক্ষ্মদর্শী দার্শনিকেরও ক্ষমতাবহির্ভূত ছিল। এই জন্য এত দিন কোনও বৈজ্ঞানিকই মস্তিষ্কতত্ত্বের পুনরালোচনায় সাহসী হন নাই। পূর্ব্বোক্ত বৈজ্ঞানিক-সম্প্রদায়, মস্তিষ্কপরীক্ষার উপযোগী অণুবীক্ষণ প্রভৃতি বিবিধ সুন্দর যন্ত্র আজকাল সহজপ্রাপ্য দেখিয়া, প্রথমেই জ্ঞানোৎপত্তি-তত্ত্বের মীমাংসা করিবার আয়োজন করিয়াছিলেন, এবং কিছু দিন পরীক্ষা করিয়া সম্প্রতি সে সম্বন্ধে কয়েকটি নূতন সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

জগতের ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রত্যেক কার্য্যের সাধনে, কার্য্যের গুরুত্বানুসারে অল্পাধিক শক্তি-ব্যয়ের আবশ্যকতা দেখা যায়। বাষ্পীয়-যান চালাইতে হইলে, কয়লা দগ্ধ করিয়া, কয়লায় নিহিত প্রচ্ছন্নশক্তির যন্ত্রে প্রয়োগ করা আবশ্যক ;—জীবগণ ভুক্ত খাদ্যাদি হইতে শক্তি-সংগ্রহ করে, সুতরাং সংসারে চলা ফেরা করিতে হইলে, তাহাদিগকে যথাসময়ে শক্তি-উৎপাদক প্রচুর আহার উদরস্থ করিতে হয়। এইরূপ জগতের প্রত্যেক ব্যাপারে শক্তি ও কার্য্যের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ দেখিয়া অনেকে অনুমান করিয়াছিলেন,—মস্তিষ্কেও চিন্তার উদ্দীপক কোন একটা শক্তি নিহিত আছে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহ তাহা প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। পূর্ব্বোক্ত পণ্ডিতগণ বলেন,—পূর্ব্বের অনুমান যে বাস্তবিকই সত্য, তাহা ভাল অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা মস্তিষ্ক পরীক্ষা করিলে সহজেই বুঝা যায়। সুস্থ ব্যক্তির মস্তিষ্ক পরীক্ষা করিলে, মস্তিষ্কের ক্ষুদ্র কোষগুলিতে যে একপ্রকার ঘন তরল পদার্থ দেখা যায়, তাহাই মস্তিষ্কের স্নায়ুমণ্ডলীকে উত্তেজিত ও কার্য্যক্ষম রাখে। মানব-মস্তিষ্কে এই পদার্থের পরিমাণ সকল সময়ে সমান থাকে না ; অধিক কাল প্রগাঢ় চিন্তায় ব্যাপৃত থাকিলে, ক্রমেই ইহার পরি-মাণের হ্রাস হইতে থাকে, এবং শীঘ্র ক্ষয়পূরণ না হইলে, শেষে মস্তিষ্ক সম্পূর্ণ অবসাদগ্রস্ত হয়। এই জন্য একই বিষয় অবলম্বন করিয়া অধিকক্ষণ চিন্তা করিতে চেষ্টা করিলে, আমরা চিন্তনীয় বিষয়ের সমাধানে কৃতকার্য্য হইতে পারি না ; পক্ষান্তরে, মস্তিষ্কের অবসাদবশতঃ তখন অনেক ভ্রমপ্রমাদ করিয়া ফেলি। বৈজ্ঞানিকগণ বলেন,—উক্ত ক্ষয়পূরণের একমাত্র উপায় নিদ্রা ;—কেবল সুষুপ্তিকালে মস্তিষ্কস্থ নিষ্ক্রিয় কোষ সকল, শিরা ও ধমনীতে প্রবাহিত রক্ত হইতে, পূর্ব্বোক্ত রস সংগ্রহ করিয়া, মস্তিষ্ককে পুনরায় চিন্তার উপযোগী করিয়া রাখিতে পারে। এই কারণে, অধিককাল নিদ্রাহীন অবস্থায় থাকিলে, চিন্তাশক্তি প্রায়ই ক্ষীণ হইয়া যায়, এবং ক্রমে মত্ততা প্রভৃতি নানা প্রকার ব্যাধির লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে মস্তিষ্ককোষগুলির পরীক্ষা করিলে, ইহাদের প্রত্যেকটিতে

বৈজ্ঞানিকগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, আমরা কোন এক বিষয়ের চিন্তা করিবার আয়োজন করিলে, মস্তিষ্ককোষসংলগ্ন ঐ তারগুলি স্বতঃই বর্দ্ধিত হইয়া, চিন্তনীয় বিষয়ের জন্য নির্দ্দিষ্ট কোষে সংলগ্ন হইয়া যায়, এবং ইহা দ্বারাই আমাদের ঐ নির্দ্দিষ্ট বিষয়ের চিন্তা করিবার ক্ষমতা জন্মে। কোন আভ্যন্তরীণ কারণে উল্লিখিত তারগুলি বিশৃঙ্খলভাবে সংযোজিত হইলে, কোনও বিষয় স্থিরভাবে চিন্তা করিবার পক্ষে বিশেষ প্রতিবন্ধক ঘটে। পাঠকপাঠিকাগণ দেখিয়া থাকিবেন, কখন কখন কোন পরিচিত নাম বা কোন পরিজ্ঞাত ঘটনার কথা বহু চেষ্টাতেও আমরা সহসা স্মরণ করিতে পারি না, কিন্তু কিয়ৎকাল মস্তিষ্ককে বিশ্রাম দিয়া পুনরায় সেই বিষয় ভাবিলে, অল্প চেষ্টাতেই তাহা মনে পড়িয়া যায়। বিজ্ঞানবিদ্‌গণ বলেন, কোষসংলগ্ন ঐ তারগুলি বিশৃঙ্খলভাবে কোষান্তরে সংযুক্ত হয় বলিয়া, আমাদের মস্তিষ্কের এই দুর্ব্বলতা দৃষ্ট হইয়া থাকে।

অণুবীক্ষণ দ্বারা মস্তিষ্ক পরীক্ষা করিলে, ইহার আরও অনেক সূক্ষ্মাংশ দৃষ্টিগোচর হয়—তাহাদের দ্বারা জ্ঞানোৎপত্তি ব্যাপারের আর কি কি কার্য্য সাধিত হয়, তাহা অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। মস্তিষ্ককোষ অতীব ক্ষুদ্র পদার্থ, এক ঘন ইঞ্চি পরিমিত স্থানে, ইহার সংখ্যা দুই তিন কোটীর কম নহে। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এই সকল ক্ষুদ্র কোষ ও তৎসংলগ্ন ততোধিক ক্ষুদ্র অংশগুলির পরীক্ষা করিয়া, তাহাদের কার্য্যপ্রণালীর সম্পূর্ণ আবিষ্কার কত দূর শ্রমসাধ্য ও সহিষ্ণুতাসাপেক্ষ, তাহা সহজেই অনুমেয়। মস্তিষ্কস্থ যন্ত্রাদির জটিলতার কথা ভাবিলে, দূর ভবিষ্যতেও যে তাহার সমগ্র রহস্য সম্পূর্ণ জানা যাইবে, এরূপ আশা হয় না; তবে পূর্ব্বোক্ত বৈজ্ঞানিকসম্প্রদায়, এই নবাবিষ্কারে উৎসাহিত হইয়া যেরূপ উদ্যম ও সহিষ্ণুতার সহিত পরীক্ষাদি করিতেছেন, তাহাতে মনে হয়, অন্ততঃ মস্তিষ্কসম্বন্ধীয় অপর দুই একটি অমীমাংসিত তত্ত্বের সমাধান হইবে।

বেলাতত্ত্ব।

চন্দ্র ও সূর্য্য সমুদ্রের জল আকর্ষণ করিয়া জোয়ারভাঁটার উৎপাদন করেন, এই কথার সহিত আমরা শৈশব হইতে পরিচিত। ভূ-পৃষ্ঠের যে স্থান চন্দ্রের অতি নিকটবর্ত্তী, তথায় আকর্ষণের পরিমাণও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক; সুতরাং চন্দ্র ও পৃথিবীর কেন্দ্রসংযোজক রেখা-স্থিত স্থানের জলরাশি উর্দ্ধোত্থিত হইয়া থাকে, এ কথাটাও বাল্যকালে বেশ বুঝা গিয়াছিল; কিন্তু এই জোয়ারের স্থানের ঠিক বিপরীত দিকে অপর একটি বেলার (antipodal tide) যুগপৎ উৎপত্তির কথা যে বিজ্ঞানশাস্ত্রে লিপিবদ্ধ আছে, তখন তাহার ব্যাখ্যা কিছুতেই বোধগম্য হয় নাই। দ্বিতীয় বেলার স্থান আকর্ষক চন্দ্র হইতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দূরবর্ত্তী, আবার চন্দ্রের আকর্ষণও অতি মৃদু, তবে কিরূপে এই আকর্ষণে পৃথিবীর ন্যায় একটি বড় গ্রহের স্থানচ্যুতি ঘটিতে পারে? জলই বা কেন সে স্থলে আকর্ষণের বিপরীতমুখে উন্নত হইতে থাকে? তখন এই প্রকার নানা প্রশ্ন মনে উদিত হইত। তার পর ভূবিদ্যা ও জ্যোতিষ সম্বন্ধে অনেক গ্রন্থ পাঠ করিয়াছি, বেলাতত্ত্ব সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের অভিমতও বুঝিয়াছি, কিন্তু ব্যাখ্যায় পরিতৃপ্তিলাভ করিতে পারি নাই। জোয়ারভাঁটার (antipodal tide) প্রচলিত মতবাদ আজও কিঞ্চিৎ কষ্টকল্পিত বলিয়া বোধ হয়। সুবিখ্যাত দার্শনিক জর্জ ডারুইন্, কয়েক বৎসর বেলাতত্ত্ব সম্বন্ধে নানা পরীক্ষাদিতে নিরত থাকিয়া, সম্প্রতি তাঁহার গবেষণার ফল পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। এই গ্রন্থে জোয়ার ভাঁটার একটি সুন্দর মৌলিক ব্যাখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। এই নূতন মতবাদের সারমর্ম্ম নিম্নে সঙ্কলিত হইল।

আকাশস্থ কোন একটি গ্রহ বা উপগ্রহ, অপর একটি জ্যোতিষ্কের চারি দিকে প্রদক্ষিণ করিলে, মধ্যস্থ গ্রহটিতে মহাকর্ষণজনিত একটি গতি স্বতঃই উৎপন্ন হয়। এই গতির পরিমাণ সকল সময়ে সমান থাকে না ; কেন্দ্রস্থ গ্রহটির তুলনায় ভ্রাম্যমান জ্যোতিষ্ক যতই ক্ষুদ্র হয়, ইহার পরিমাণও ততই অল্প হইয়া থাকে ; ইহা ভ্রাম্যমান জ্যোতিষ্কগণের সাধারণ ধর্ম্ম। এই গতি গ্রহ উপগ্রহাদির উপর কি প্রকার কার্য্য করে, জ্যোতির্বিদ্‌গণ তাহাও স্থির করিয়াছেন। ইহাঁরা বলেন, উভয় গ্রহের সামগ্রী-পরিমাণ (mass) সমান হইলে, ইহাদের সাধারণ ভারকেন্দ্র (common centre of gravity), ঠিক্ কেন্দ্রসংযোজক রেখার মধ্যবিন্দুতে অবস্থান করে ; কাজেই গ্রহদ্বয় ঐ কেন্দ্রের চারি দিকে একই কক্ষ অবলম্বন করিয়া ভ্রমণ করিতে থাকে ; কিন্তু জ্যোতিষ্কযুগল অসম আকারের হইলে, সাধারণ ভারকেন্দ্র বৃহত্তরটির নিকটবর্ত্তী হইয়া পড়ে, সুতরাং তখন আর উহারা একই কক্ষক্রমে ভ্রমণ করিতে পারে না ; বৃহত্তর গ্রহটির কক্ষ ইহার সামগ্রীর অনুপাতে ক্রমেই সঙ্কুচিত হইতে থাকে। অধ্যাপক ডারুইন জড় ও গতিবিজ্ঞানের এই দুই তত্ত্বের সাহায্যে জোয়ার ভাঁটার কারণনির্দ্ধারণের চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলেন, চন্দ্রের তুলনায় পৃথিবীর আকার অত্যন্ত বৃহৎ বলিয়া, পৃথিবী ও চন্দ্রের সাধারণ ভারকেন্দ্র, ভূকেন্দ্রের অতি নিকটে অবস্থান করে ; এই জন্য পৃথিবীর আহ্নিকগতি দ্বারা ভূকেন্দ্রের চতুর্দ্দিকে না ঘুরিয়া, ঐ ভারকেন্দ্রের চারি দিকেই আবর্ত্তন করিয়া থাকে। একথও বৃত্তাকার স্থূল কাগজ লইয়া সহজেই এই গতির পরীক্ষা করা যাইতে পারে ; এই প্রকার কাগজের কেন্দ্রবহির্ভূত-স্থানে, একটি পিন্ বদ্ধ করিয়া, তাহা পিনের চারি দিকে ঘুরাইলে যে প্রকার গতি দেখা যায়, ডারুইনের মতে, পৃথিবীর আহ্নিকগতিও সেইরূপ। এই প্রকার গতি হওয়াতে, বিষুব-রেখা হইতে সমদূরবর্ত্তী স্থানে আবর্ত্তনজনিত ঔৎকেন্দ্রিক-বল (centrifugal force) সমভাবে উৎপন্ন হয় না ; সাধারণ ভারকেন্দ্র হইতে ধরা-পৃষ্ঠের যে স্থান সর্ব্বাপেক্ষা দূরবর্ত্তী, তথায় উক্ত বলের আধিক্য দেখা যায়। ডারুইন বলেন, এই জন্য চন্দ্র ও সাধারণ ভারকেন্দ্র হইতে সর্ব্বাপেক্ষা দূরবর্ত্তী স্থানের সামুদ্রিক জল ঔৎকেন্দ্রিক বলে উৎক্ষিপ্ত হইয়া বেলা উৎপন্ন করে।

বেলাতত্ত্ববিষয়ক এই নূতন মতবাদ, অল্প দিন হইল, প্রচারিত হইয়াছে। চন্দ্রের আকর্ষণবশে বাস্তবিকই পৃথিবীতে পূর্ব্বোক্ত প্রকার গতি উৎপন্ন হয় কি না, এখন তাহা সুধিগণের পরীক্ষণীয়।

জীবাণু ও উদ্ভিদ।

আধুনিক বিজ্ঞানবিদ্‌গণের মতে, ব্যাধিমাত্রই এক এক প্রকার জীবাণু হইতে উৎপন্ন,—ব্যাধি-জীবাণু কোন প্রকারে শরীরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া, তথায় বংশবিস্তার করিতে আরম্ভ করিলে, জীবের আর পরিত্রাণ নাই। বহুকাল হইতে আচার্য্য কস্, প্রভৃতি অনেক বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক, নানা প্রকার জীবাণু লইয়া পরীক্ষাদি করিতেছেন, কিন্তু তাঁহারা এত দিন জীবের হিতকর কোন প্রকার জীবাণুর আবিষ্কার করিতে পারেন নাই ; এই জন্য জীবাণু বলিলেই আমরা ব্যাধিবীজপূর্ণ, অতি ক্ষুদ্র কীট বুঝিয়া থাকি। অল্প দিন হইল, ডাক্তার নবিস্ (Nobbes) নামক জনৈক জর্ম্মাণ পণ্ডিত মানবজাতির অশেষহিতকর একশ্রেণীর জীবাণুর আবিষ্কার করিয়াছেন। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে, প্রচুর তাপ, আলোক ও জল যেমন সাধারণ উদ্ভিদগণের বৃদ্ধির অনুকূল, সেই প্রকার মটরজাতীয় উদ্ভিদমাত্রেরই পরিণতির

করিতে হয় না। উর্ব্বরক্ষেত্রে পূর্ব্বোক্ত উদ্ভিদগুলি রোপিত হইলেই, তাহারা স্বভাবতঃই উদ্ভিদমূলে উৎপন্ন হইয়া, গুল্মগুলির বৃদ্ধির বিশেষ সহায়তা করিয়া থাকে।

উদ্ভিদ-পোষণের জন্য স্থূলতঃ অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ও অঙ্গার, এই তিনটি পদার্থের বিশেষ আবশ্যকতা দেখা যায়। আকাশস্থ বায়ুতে এই তিন পদার্থই প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান থাকে; উদ্ভিদ সকল ইহাদের পত্রস্থিত হরিতাংশের (chlorophyle) সাহায্যে বায়ুস্থ কার্বলিক এসিড বাষ্প বিশ্লিষ্ট করিয়া, তত্রত্য অঙ্গার আত্মসাৎ করে, এবং অক্সিজেনও বায়ু হইতে শোষণ করিয়া লয়। কিন্তু ইহারা নাইট্রোজেন বাষ্প কোন ক্রমেই বায়ু হইতে শোষণ করিতে পারে না; এই কার্য্যটি কেবল মূল দ্বারা সাধিত হইয়া থাকে। এ জন্য বৃক্ষমূলে নাইট্রোজেন-যুক্ত সার প্রদানের ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। অল্প দিন হইল, পূর্ব্বোক্ত জর্ম্মাণ উদ্ভিদবিদ্, সম্পূর্ণ নাইট্রোজেন-বিমুক্ত কয়েক বর্গ ফিট ভূমিতে, নানাজাতীয় উদ্ভিদ রোপণ করিয়া, নাইট্রোজেন-হীন অবস্থায় কোন্ উদ্ভিদ কত দিন জীবিত থাকে, তাহা স্থির করিতেছিলেন। বায়ুরাশিতে নাইট্রোজেন থাকা সত্ত্বেও, বৃক্ষমূলে উক্ত বাষ্পের অভাব হওয়ায়, রোপিত উদ্ভিদমাত্রই কয়েক দিনের মধ্যে শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল,—কিন্তু মটর ও সীমজাতীয় কয়েকটি উদ্ভিদে বিন্দুমাত্র নির্জীবতার লক্ষণ দৃষ্ট হয় নাই। পরীক্ষক এই বিসদৃশ ব্যাপারে অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া প্রথমতঃ ইহার কোনও কারণের নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই; শেষে ঐ জাতীয় গুল্মমাত্রেরই মূলদেশে একজাতীয় জীবাণুর বহুল অস্তিত্ব দেখিয়া, তদ্দ্বারাই উদ্ভিদ সকল জীবিত থাকে, এই সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন।

ডাক্তার নবিস্ বলেন, পূর্ব্বোক্ত জীবাণু সকল উদ্ভিদ মূলে আশ্রয় গ্রহণ করিলে, ইহারা বায়ুস্থ নাইট্রোজেন বাষ্প আকর্ষণ করিয়া জৈবিকক্রিয়া সম্পন্ন করিতে থাকে; তাহার পর উদ্ভিদ সকল এই প্রকারে মূলদেশে প্রচুর নাইট্রোজেন সঞ্চিত পাইয়া, তাহাই দেহসাৎ করিয়া বৃদ্ধিলাভ করে। নবিস্ সাহেব কৃত্রিম উপায়ে আজকাল অনেক জীবাণুর উৎপাদন করিয়া, বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত রাখিতেছেন। মটর ও সীমজাতীয় শস্যের ক্ষেত্রে বহুব্যয়ে সার না দিয়া, এই জীবাণু সকল কোন প্রকারে ক্ষেত্রে গুল্মের মূলে নিহিত করা সুবিধাজনক বিবেচনা করিয়া, আজকাল অনেক জর্ম্মাণ কৃষক নবিসের জীবাণু দ্বারা স্বল্পব্যয়ে প্রচুর শস্য লাভ করিতেছে!

শ্রীজগদানন্দ রায়।

সিরাজ-চরিত্র। *

বাল্যকালে বিদ্যালয়ে ইতিহাসপাঠ আরম্ভ করিয়াই দেখিয়াছি, নবাব সিরাজদ্দৌলা এক অদ্ভুত মনুষ্য। "গুর্ব্বিণীর গর্ভবিদারণ, জলে জনপূর্ণ পোতনিমজ্জন, সৎকুলজাতা পতিব্রতা কুলবনিতাদিগের সতীত্বাপহরণ প্রভৃতি যাবতীয়

---

* লেখক লিখিয়াছেন, "প্রায় দুই বৎসর হইল, মুর্শিদাবাদ সহরের কোন ব্যক্তির গৃহে মুর্শিদাবাদের স্বাধীন নবাব নাজিমগণের কয়খানি চিত্রপট আবিষ্কৃত হয়। চিত্রগুলি মহম্মদ

উৎকট এবং নিষ্ঠুর ব্যাপার তাঁহার নিত্যকর্ম্মের মধ্যেই পরিগণিত ছিল" (১) "তৎকালে প্রায় কোন ব্যক্তির সম্পত্তি বা কোন স্ত্রীলোকের সতীত্ব রক্ষা পায় নাই। (২)"

উক্ত কথাগুলি নমনীয় বালকহৃদয়ে প্রবেশলাভ করিয়া, উজ্জ্বল অক্ষরে চিত্রিত হইয়া, এ কাল পর্য্যন্ত নানা শাখা প্রশাখা মস্তকে ধরিয়া, এক ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছিল।

ইতিহাস আলোচনা আরম্ভ করিয়াই দেখিলাম, সমসাময়িক উক্তির উপর রং চড়াইয়া, পরবর্ত্তী কালের কোন কোন ইংরাজী ইতিহাসে, সিরাজচরিত্র, রোমীয় সম্রাট নীরোর ছাঁচে ফেলিয়া, ভীষণতর করিয়া, তাঁহাকে ইন্দ্রিয়-পরায়ণ নৃশংস নরপিশাচ, বা কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানবিবর্জ্জিত উচ্ছৃঙ্খল অর্থপিপাসু অত্যাচারী রাজা বলিয়া বর্ণিত করা হইয়াছে। অবশ্য মিল্ প্রভৃতি মহামনা ঐতিহাসিকগণের কথা স্বতন্ত্র; কিন্তু দুঃখের বিষয়, প্রকৃত আদর্শ অবলম্বন না করিয়া, বাঙ্গালী জাতির ভাগ্যদোষে, দেশীয় লেখকগণ অনেক সময়ে অকাতরে ভ্রান্ত মতই গ্রহণ করিয়া আসিয়াছেন। কেহ বা নিজ নিজ রচনায় সরস পদ-লালিত্যবিস্তারের প্রয়াসে একটু উজ্জ্বলতর রঙ্গেও চিত্রিত করিয়াছেন। (৩) সম্প্রতি আবার স্রোত ফিরিয়াছে,—কিন্তু এ প্রতিক্রিয়া আরম্ভেই ভীষণ

রেজা খাঁর সংগৃহীত। দেখিলেই প্রাচীন ও প্রামাণিক বোধ হয়। আধুনিক চিত্রবিদ্যাবিৎ কয়েক জন প্রধান শিল্পীও ইহা স্বীকার করিয়াছেন। মুর্শিদাবাদ প্রাসাদে মীরজাফর খাঁর যে প্রাচীন চিত্র আছে, এই সংগ্রহের মীরজাফরের সহিত তাহার সম্পূর্ণ মিল হইয়াছে। এই সমস্ত কারণে নবাব বাহাদুর বহু ব্যয়ে ইউরোপীয় শিল্পীর সাহায্যে এই ক্ষুদ্র চিত্র কয়খানি হইতে বৃহৎ তৈল-চিত্র প্রস্তুত করাইয়াছেন। চিত্র প্রস্তুত হইবার পরেই তাহা হইতে ফটো লইয়া দেওয়ান ফজলে রব্বী খাঁ বাহাদুর আমার আরব্ধ "নবাবী আমলের বাঙ্গালার ইতিহাসে"র জন্য আমায় দিয়াছিলেন। আমার গ্রন্থ কখন প্রকাশিত হইবে, স্থির নাই। ইতিমধ্যে অন্যেও অনুমতি লইয়া চিত্রগুলির ফটো লইয়া যাইতেছেন। বিলম্বে সাধারণের অসুবিধা হইবে বিবেচনায় ক্রমশঃ এ গুলি প্রকাশ করিবার ইচ্ছা করিয়াছি।"—এই সঙ্গে লেখক মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক আমা-দের নিকট সিরাজের একখানি ফটোও পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু ইতিপূর্ব্বেই আমরাও মুর্শিদাবাদে ফটোগ্রাফার পাঠাইয়া "সাহিত্যের" জন্য চিত্র সংগ্রহ করিয়াছি। আমাদের সংগৃহীত চিত্র হইতে এবার সিরাজের প্রতিমূর্ত্তি ও মনসুরগঞ্জের ধ্বংসাবশেষের চিত্র প্রকাশিত হইল।—সাহিত্য সম্পাদক।

(১) ভারতবর্ষের ইতিহাস—কৃষ্ণচন্দ্র রায়।

(২) বাঙ্গলার ইতিহাস—বিদ্যাসাগর—মার্শম্যান্ অবলম্বনে।

(৩) Macferlane's Indian Empire. p. 31. Bholanath Chandra's Travels of a Hindu. কৃষ্ণচন্দ্রের ইতিহাস।

আকার ধারণ করিয়াছে, যুবক সিরাজদ্দৌলার নিদারুণ..পরিণামের জন্য তাঁহার প্রতি সহানুভূতিপ্রদর্শন করিতে গিয়া, তাঁহার সহস্র দোষ মার্জ্জনা করিয়া,—তাহাই নহে,—তৃতীয় ব্যক্তির স্কন্ধে গুরুতরভাবে দোষের ভার আরোপ করিয়া, অনেকেই এক্ষণে বিপরীত ভ্রমে পতিত হইতেছেন। সকলেই স্বীকার করিবেন, ইহাও বাঞ্ছনীয় নয়। ইংরাজীতে প্রবাদ আছে, "Give the devil his due". শয়তানের পক্ষে যাহা নির্দ্দিষ্ট, সিরাজদ্দৌলার অন্ততঃ সেটুকু ন্যায্য দাবী। তিনি উচ্ছৃঙ্খল ও কলুষিতচিত্ত ছিলেন বলিয়াই যে তাঁহার দোষের ভাগই অতিরঞ্জিত করিয়া দেখাইতে হইবে, এমন কথা নাই। পক্ষান্তরে, তাঁহার প্রতি অনুকম্পাপ্রদর্শন করিতে গিয়া, তিনি যে সকল অনাচার অত্যাচার করিয়াছিলেন, তাহার অপলাপ বা লাঘব করিবার চেষ্টাও সেইরূপ বিড়ম্বনামাত্র।

অসঙ্গত কামাসক্তিই সিরাজ-চরিত্রের সর্ব্বপ্রধান কলঙ্ক। চরিত্রহীনতার জন্যই একবিংশবর্ষীয় সিরাজকে তদীয় চিত্রে বর্ষীয়ান্ বলিয়া মনে হয়। লাম্পট্য মুসলমান রাজগণের বা সর্ব্বদেশীয় রাজপুরুষগণের সাধারণ কলঙ্ক বলিয়া, সিরাজ-চরিত্রের কলঙ্কলাঘবের চেষ্টা সমীচীন নহে। স্থলবিশেষে ইহার বিরোধিতা আছে,—সিরাজচরিত্রে ইহা ভীষণরূপে প্রতিভাত। সুবিখ্যাত মুতাক্ষরীণ-প্রণেতা গোলাম হোসেন লিখিয়াছেন,—(৪) "মহাত্মা আলিবর্দ্দী খাঁর শ্রীবৃদ্ধির দশায় তাঁহার পরিবারবর্গ যেরূপ লাম্পট্য ও অনাচার আরম্ভ করিয়াছিল, তাহা ভদ্র ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। তাহাদের ঐ সমস্ত দুষ্কৃতি তাঁহার অকলঙ্ক কুলে চিরদিনের মত কালিমালেপন করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহার কন্যারা ও প্রিয়তম সিরাজদ্দৌলা যেরূপ ঘৃণার্হ দুষ্টাচার করিতেন, তাহা যে কোন লোকের পক্ষেই নিতান্ত অযশস্কর, তাঁহাদের মত উচ্চবংশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির ত কথাই নাই। তাঁহার আদরের গোপাল সিরাজদ্দৌলা নগরের রাজপথে ছুটাছুটি করিয়া এরূপ ঘৃণিত ও অকথ্য আচরণ করিতেন যে, লোকে দেখিলে অবাক হইত। তাঁহার সহচর নবাব-পরিবারের এক দল দুশ্চরিত্র যুবকের সহিত সর্ব্বদাই তিনি জঘন্য ব্যবহারে কালক্ষেপ করিতেন। পদমর্য্যাদা, বয়স, বা স্ত্রীপুরুষ, কিছুই গ্রাহ্য করিতেন না। নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ বিবিধ বিপদের মধ্যে কষ্ট করিয়া যে রাজপদ ও সম্মান উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, এই কুকীর্ত্তিই তাহার ধ্বংসের পথ প্রশস্ত করিতে লাগিল। ক্রমাগত উপেক্ষিত হওয়ায়, এই

(৪) Mutaqh. Trans. vol I. pp. 644 &c.

অনাচারস্রোত বর্দ্ধিত হইয়া সেই অভ্রান্ত সর্ব্বদ্রষ্টার আক্রোশ আকর্ষণ করিল। নবাব দেখিয়াও না দেখায়, এই অনাচার সিরাজের চরিত্রে স্বাভাবিক হইয়া উঠিল ; উত্তরোত্তর নির্ভীক হইয়া সিরাজ ক্রমশঃই অত্যাচার অনাচারের পথে অধিকতর অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ক্রমে ইহাতে তাঁহার আর কিছুমাত্র অনুশোচনা রহিল না। তাঁহার এই অসঙ্গত কামাসক্তির নিকট ইচ্ছামত স্ত্রী-পুরুষের বলিদান চলিতে লাগিল ; যৌবনসুলভ চাপল্যে যাহাকে ইচ্ছা তাহারই উপর অনাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতা আরব্ধ হইল। কুক্রিয়াসক্ত মনের মত সহচরে বেষ্টিত হইয়া সিরাজ যে সকল পাপাচার করিতেন, আলীবর্দ্দী খাঁর নিকট ক্ষমা পাইবার ভরসায়, বা বয়স ও মনের স্বাভাবিক দোষে, সে সমস্ত যেন তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ব্যবহারের মত দাঁড়াইয়া গেল। প্রকৃতই দেখা যাইত, সিরাজ কোন সময়ে অভ্যস্ত অনাচার করিবার অবসর না পাইলে, ক্ষুণ্ণ ও বিষণ্ণ মনে থাকিতেন। এই ব্যবহার ক্রমে তাঁহার স্বভাবের সহিত এরূপ ভাবে জড়িত হইয়া গেল যে, এ জন্য অনুতাপের লেশমাত্র হইত না, কার্য্যের পরে সে কথা স্মরণই হইত না। পাপ-পুণ্যের ভেদজ্ঞান রহিত হওয়ায়, তিনি নিকট কুটুম্বও মানিতেন না। যেখানে যাইতেন, ব্যভিচারস্রোতে গা ঢালিয়া দিতেন। আত্মহারা লোকের মত সম্মানী ও উচ্চবংশীয় লোকের ভবনেও সেই কুক্রিয়ার পণ্যশালা প্রস্তুত করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। অত্যল্পকালমধ্যে সিরাজ লোকচক্ষে 'ফেরোয়া'র ন্যায় ঘৃণিত হইয়া উঠিলেন। হঠাৎ তাঁহার সম্মুখে পড়িলে লোকে 'হরি রক্ষা কর!' বলিয়া উঠিত।" (৫)

সমসাময়িক সর্ব্বপ্রধান মুসলমান লেখকের বর্ণিত উক্তিই সিরাজের পাপাচরণের যথেষ্ট প্রমাণ। গ্রন্থকার আলিবর্দ্দী খাঁর পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে

---

(৫) Making no distinction between vice and virtue and paying no regard to the nearest relations, he carried defilement wherever he went; and like a man alienated in his mind he made the houses of men and women of distinction the scene of his profligacy without minding either rank or station. In a little time he became as detested as Pharoa : people on meeting him by chance used to say *God save us from him.*—Mut—Trans. I. 644-45 p. যাঁহারা সিরাজদ্দৌলা সম্বন্ধে মুতাক্ষরীণ-কারেরও পক্ষপাত ছিল,—এই অমূলক আশঙ্কা করেন, তাঁহাদিগকে একবার গ্রন্থখানি আনুপূর্ব্বিক পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

সম্বন্ধ; কথিত অনাচারের উল্লেখ করিয়া তিনি দুঃখিত। আলীবর্দ্দী খাঁর ভক্ত ঐতিহাসিক তাঁহারই উপেক্ষা বা অসঙ্গত স্নেহ সিরাজের উচ্ছৃঙ্খলতার প্রধান কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে বিস্মৃত হন নাই। নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ পুত্রস্নেহে বঞ্চিত; অতি কষ্টে প্রথম জীবন যাপন করিয়াছিলেন। বৃদ্ধদশায় যখন সুখের সময় উপস্থিত হইল, তিনি যখন বাঙ্গলার নবাবের অধীনে সর্ব্বোচ্চ পদে বেহারের শাসনকর্ত্তৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হইলেন, তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই সিরাজের জন্ম হয়। (৬) সম্মান ও পদবীলাভের দুই চারি দিন পূর্ব্বেই নবাব নব দৌহিত্র-মুখ সন্দর্শন করেন; সুতরাং নবজাত কুমারই এই সৌভাগ্যের কারণ বলিয়া তাঁহার সংস্কার জন্মিল। আজন্মদুঃখী, অপুত্রক আলিবর্দ্দী খাঁ এই শিশুকে পোষ্য-পুত্ররূপে পালন করিতে লাগিলেন; সর্ব্বদা চক্ষে চক্ষে রাখিয়া লালনপালন করিতে করিতে স্নেহ গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইল। বৃদ্ধের এই স্নেহপ্রবণ হৃদয়ের অসঙ্গত আদরে সিরাজের বাল্যজীবনে সুশিক্ষার বীজ উপ্ত হইবার অবকাশ ঘটিল না। এই কারণে, বড় লোকের ঘরের আদুরে ছেলে সুশিক্ষার অভাবে সাধারণতঃ যেমন উচ্ছৃঙ্খল ও দুর্ব্বিনীত হইয়া পড়ে, বঙ্গ বেহার উড়িষ্যার অধিপতির স্নেহপুত্তল সিরাজের অদৃষ্টে মায় সুদ তাহাই ঘটিয়াছিল।

পুণ্যবতী রাণী ভবানীর বিধবা কন্যা তারার কাহিনীতে সম্ভ্রান্ত হিন্দুপরিবারের দিকে সিরাজের হস্তপ্রসারণের একটি প্রবল দৃষ্টান্ত আছে। সিরাজের করাল কবল হইতে রাজকুমারী তারার উদ্ধারের কথা নানারূপ কথিত হইলেও, বাঙ্গালী পাঠকের তাহা অবিদিত নাই। কিন্তু এই ঘটনায় সম্মানী হিন্দুপরিবারে মনে শান্তি ছিল না। সিরাজের হস্তে জাতি ধর্ম্ম রক্ষা হওয়া দুষ্কর, এ চিন্তা সেকালের মুর্শিদাবাদ সহরের অনেকেরই হৃদয় অধিকার করিয়াছিল। মোহন-লালের ভগ্নী-ঘটিত প্রবাদ ইতিপূর্ব্বেই "সাহিত্যে" সমালোচিত হইয়াছে। (৭)

আর একটি প্রবাদ শুনা যায়, তাহা এই;—সিরাজদ্দৌলা বলপ্রয়োগপূর্ব্বক ব্যক্তিবিশেষের বিবাহিতা পত্নীকে স্বীয় অঙ্কশায়িনী করিবার উদ্দেশ্যে অন্তঃপুরে আনিয়া অবরুদ্ধ করেন। স্বামী প্রাণের আশা ত্যাগ করিয়া স্ত্রীবেশে বেগমমহলে প্রবেশ করিয়া স্ত্রীর সহিত দেখা করে। সিরাজের আদেশে অন্দরের রক্ষিগণের হস্তে হতভাগ্য হত হইলে, সাধ্বী স্ত্রী উপস্থিত স্ত্রীরক্ষিগণের এক জনের হস্ত হইতে অস্ত্র কাড়িয়া লইয়া নিজের প্রাণনাশ করে। অতঃপর সিরাজ অনুতপ্ত-

(৬) Mutaqherin, vol. I, 306.

হৃদয়ে দম্পতীকে এক স্থানে সমাহিত করিয়া তাহাদের কবরের উপরে নিম্ন-লিখিত পারসী কবিতা লিখিয়া দিতে আদেশ করেন,—"যদি জানিতাম, এই ফুলে এত মধু, তবে তাহাকে কখনই বৃন্তচ্যুত করিতাম না।" প্রবাদ বলি-তেছে, এই সময় হইতে সিরাজ সাবধান হন। পাঠকের নিকট অনুরোধ, ইহাকে যেন প্রবাদ বলিয়াই ধারণা থাকে।

অতঃপর সিরাজের নিষ্ঠুরতা ও নরহত্যার অপবাদের আলোচনা করা যাউক। সিরাজের জ্যেষ্ঠতাত নোয়াজিস্ মহম্মদ, নামে ঢাকার ডেপুটি নবাব হইলেও, মার্হাট্টা হাঙ্গামার সময় হইতেই তিনি ঢাকায় পদার্পণ করেন নাই। তাঁহার প্রিয়পাত্র হোসেন কুলী খাঁ দেওয়ান হইয়া তাঁহার নামে ঢাকায় রাজ্য করি-তেন; খ্যাতনামা বৈদ্য রাজা রাজবল্লভ তাঁহার পেস্কার ছিলেন। কালক্রমে হোসেন কুলী খাঁও বিলাসে গা ঢালিয়া দিয়া মুর্শিদাবাদ দরবারেই থাকিয়া গেলেন। হোসেন কুলী নোয়াজিসের গৃহে সর্ব্বময় কর্ত্তা। ক্রমে এ কর্তৃত্ব অনেক দূর গড়াইল। আলিবর্দ্দী খাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা নোয়াজিস্-পত্নী ঘেসিটী বেগমের সহিত তাঁহার অবৈধ প্রণয়কথা ক্রমে প্রকাশিত হইয়া পড়িল; সিরাজ-মাতা আম্না বেগমের নামেও শেষে ঐ কলঙ্ক রটিল। (৮) অতঃপর সিরাজ এক দিন অপরাহ্নে জ্যেষ্ঠতাতের সহিত দেখা করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতে-ছিলেন, এমন সময় হতভাগ্য হোসেন কুলীর গৃহ তাঁহার সম্মুখে পড়িল। এখানে পঁহুছিয়াই তিনি হোসেন কুলী ও তাঁহার ভ্রাতাকে নিজের সমক্ষে আনিবার আদেশ দিলেন। পার্শ্ববর্ত্তী হাজী মেহেদীর গৃহ হইতে লুকায়িত হোসেন কুলীকে টানিয়া বাহির করা হইল। সিরাজ তাঁহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিবার আদেশ দিলেন; উপযুক্ত সহচরবর্গও আদেশপালনে অণুমাত্র দ্বিধা করিল না। হোসেন কুলীর অন্ধ ভ্রাতা হায়দর কুলীরও ঐরূপ দণ্ডের ব্যবস্থা হইল। হায়দর এক জন প্রাচীন যোদ্ধা; তিনি হোসেন কুলীর মত অনুনয়, বিনয়, বা প্রাণভিক্ষা না করিয়া, বীরের মত, সিরাজ ও তাঁহার পরিবারবর্গকে

(৮) At that time there happened a little misunderstanding between her (Ghesiti Bibi) and Hosein Kuli Khan for an inconsiderable subject which it would be improper to mention. Mutaqh Tranc. মুস্তাফা এই স্থলের টীকায় বলেন,—What the author calls an inconsiderable subject is by no means an inconsiderable one for ladies. Hosein Kuli Khan, who was

অভিশাপ বর্ষণ করিতে করিতে নিহত হইলেন। ইতিপূর্ব্বে সিরাজের পরামর্শে ঢাকায় হোসেন কুলীর ভ্রাতুষ্পুত্র হোসেন উদ্দীন খাঁর প্রাণবধের উল্লেখ আছে। (৯)

সত্য বটে, মুতাক্ষরীণ-কার বলিয়াছেন,—সিরাজ হোসেন কুলীর হত্যার প্রধান উদ্যোগী। কিন্তু এক জন লোককে হত্যা করিবার জন্য নবাব পর্য্যন্ত সকলেই সম্মতি দিলে, তাঁহাদের কাহাকেও সিরাজের অপেক্ষা অল্প দোষ দিতে কাহার প্রবৃত্তি হয়? পারিবারিক কলঙ্কমোচনের জন্য লোকে এইরূপ অনেক হত্যাকাণ্ড করিয়া ফেলে,—কিন্তু এত পরামর্শ আঁটিয়া, প্রবীণে নবীনে একমত হইয়া, এরূপ কার্য্য কয় ক্ষেত্রে ঘটে? হোসেন কুলীর সম্বন্ধে উল্লিখিত কারণ বর্ত্তমান থাকিলেও, তাঁহার অন্ধ ভ্রাতা হায়দর, বা ভ্রাতুষ্পুত্রের বিষয়ে বলিবার কি আছে? অন্য সময়ে না হউক, তাঁহার শোচনীয় শেষমুহূর্ত্তে সিরাজকে এ জন্য বড়ই অনুতপ্তহৃদয়ে আত্মপ্রকাশ করিতে দেখা যায়। গোলাম হোসেন জলদগম্ভীরস্বরে বলিয়াছেন,—"এই নির্দ্দোষীর রক্তপাত চিরদিনের জন্য আলীবর্দ্দীর বংশে কলঙ্ক লেপন করিয়া রাখিয়াছে, এবং ইহাই তাহার ধ্বংসের মূলীভূত কারণ।" (১০)

সিরাজদ্দৌলা হোসেন কুলীকে হত্যা করিয়া কলঙ্কমোচনের প্রতিজ্ঞা করিলেন; নবাব-পরিবারের অনেকেই এ কার্য্যে তাঁহার সহায়তা করেন। মাতামহী নবাব বেগম সিরাজের মতের অনুমোদন করিয়া হোসেন কুলীর হত্যার জন্য নবাবের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। বৃদ্ধ নবাব গোলে পড়িয়া বলিলেন, এরূপ ব্যাপার নোয়াজিসের সম্মতি ব্যতীত হইতে পারে না। গোলাম হোসেন বলিতেছেন,—এ কার্য্যেও আলিবর্দ্দী খাঁর এরূপ উপেক্ষার কারণ অখণ্ডনীয় ভাগ্য ভিন্ন আর কিছুই বলা যায় না। বৃদ্ধা নবাব বেগম তখন কন্যার সহযোগে জামাতারও মত করিলেন। কন্যা ঘেসিটী বিবী তখন "উল্লেখের অযোগ্য সামান্য কারণে" হোসেন কুলীর প্রতি ভয়ানক বিরূপ। নোয়াজিস্ চিরদিনই দুর্ব্বলচিত্ত

---

(৯) Mutaqh. Trans. I. 646.

(১০) The innocent blood spilt on that occasion proved as fertile in troubles as that of *siavush* of old. &c. Mut. pp. 649.

**had quitted the princes for her younger sister Amna Begum of amorous beauty, mother of Serajadaulah. &c. মুস্তাফা অতঃপর নোয়াজিস্ মহম্মদের বিষয়ে আর যে কুৎসিত ব্যাপার লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা ভদ্রসমাজে প্রকাশযোগ্য নহে।

লোক, তাহাতে সম্প্রতি পালিত পুত্র একরাম্‌উদ্দৌলার মৃত্যুতে তিনি সংসারে বীততৃষ্ণ ; সুতরাং ইহত্র-পরত্র-কলঙ্ককর এই হত্যাকাণ্ডে তিনিও মত দিলেন। তিনি হোসেন কুলীর প্রিয়বন্ধু, সুতরাং তাঁহার দোষ আরও গুরুতর। এই সমস্ত মন্ত্রণা শেষ হইয়া গেলে, আলীবর্দ্দী খাঁ লোক দেখাইবার জন্য মৃগয়ার্থ রাজমহলের দিকে প্রস্থান করিলেন। (১১)

সিরাজের নিষ্ঠুরতা ও নরহত্যা সম্বন্ধে যাহা কিছু ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহা এই। হোসেন কুলী খাঁকে সবংশে নিপাত করাই অভিপ্রেত ;—ইহা হইতে নরহত্যায় সিরাজদ্দৌলার আন্তরিক আমোদ ছিল, এ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার কোনও কারণই নাই।

রাজা হইয়া সিরাজ যে কুব্যবহার করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে সমসাময়িক মুতাক্ষরীণ ও রিয়াজ গ্রন্থের এক মত। "তাঁহার কর্কশ ও অভদ্রজনোচিত অকথ্য কুকথার প্রয়োগে ও পরুষ ব্যবহারে দরবারের সদস্যগণের বিষম আতঙ্ক জন্মিয়াছিল। প্রকাশ্য দরবারে সিরাজ অকাতরে অসঙ্কুচিতচিত্তে যাহাকে যাহা ইচ্ছা বলিতেন। দরবারে যাইতে হইলে সম্মান ও প্রাণ হাতে রাখিয়া যাইতে হইত।" ইত্যাদি অনেক কথা দেশীয় ইতিহাসে সমস্বরে ধ্বনিত হইয়াছে। (১২) রাজকার্য্যে সিরাজের নির্ব্বুদ্ধিতার উদাহরণ দেওয়া অনাবশ্যক ; তিনি অস্থিরমতি যুবক, তখনও বিষয়বুদ্ধির উদয় হয় নাই। তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও পরবর্ত্তী বিপ্লবের কারণ প্রধানতঃ নিম্নলিখিত তিন চারি ভাগে বিভক্ত করা যায়।

(ক) সিংহাসনে আরোহণ করিবার পরেই প্রধান মন্ত্রিবর্গের কাহারও অবমাননা, কাহাকেও বা পদচ্যুত করা হয়। প্রবীণগণকে উপেক্ষা করিয়া নিজের প্রিয়পাত্র, অপেক্ষাকৃত নিম্নপদস্থ মোহনলাল ও মীর মদন প্রভৃতিকে উন্নীত করা হইল। অনুরক্ত ব্যক্তিগণের পুরস্কারপ্রদানেরও একটা সীমা আছে ; চঞ্চলমতি সিরাজের সে জ্ঞান ছিল না। মীরজাফর খাঁ ও দুর্ল্লভরামের মনোভঙ্গের ইহাই প্রধান কারণ। (১৩)

---

(১১) All these preparations being over, Aliverdi Khan, to save appearances as he fancied and to conceal his share in the perpetration of the crime went to Rajmahal on pretence of a hunting party." Mut. I. 648.

এই সময়ে নবাবের সহিত গোলাম হোসেনের সাক্ষাৎ হয়।

(১২) রিয়াজ—৩৬৪ পৃঃ ও মুতাক্ষরীণ।

(খ) মীরজাফর খাঁ নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর ভগ্নীপতি সিরাজের আত্মীয়, পিতামহস্থানীয়, প্রধান পরামর্শদাতা। রাজ্যাভিষেকের পরেই তাঁহার হস্ত হইতে সৈন্যবিভাগের দেওয়ানী কার্য্য মীর মদনের হস্তে অর্পিত হয়। দেওয়ান মোহনলালের আদেশে মীরজাফর খাঁকে কার্য্য করিতে বাধ্য হইতে হইলে কিরূপ তীব্র অপমান সহ্য করিতে হয়, সকলেই বুঝিতে পারেন। তিনি এই কারণে কিছু দিন দরবারে গমন রহিত করেন। (১৪) এই সময়ে সওকৎ-জঙ্গকে রাজপদ দিবার কল্পনা হয়। আলিবর্দ্দী-মহিষীর মধ্যস্থতায় কিছু দিনের জন্য মিটমাট হইলেও মনোমালিন্য দূরীভূত হয় নাই। পরে প্রধান সেনাপতির কার্য্য হইতেও তাঁহাকে অপসৃত করা হয়। সময়ে সময়ে তাঁহার প্রাণনাশের উদ্যোগের কথাও ইতিহাসে আছে।

(গ) সওকৎজঙ্গ দিল্লীর দরবার হইতে সনন্দ পাইয়াছেন, এই সংবাদ শুনিয়া, জগৎশেঠ কেন ইতিপূর্ব্বেই সিরাজের জন্য সনন্দ আনাইয়া দেন নাই, এই কথা লইয়া বাদানুবাদ হয়। জগৎশেঠ রাজকোষে অর্থাভাবই ইহার কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে, নবীন নবাব হুকুম জাহির করিলেন, বণিকগণের নিকট হইতে চাঁদা করিয়া তিন কোটী টাকা আদায় করা হউক। এরূপ করিলে প্রজাবর্গের উপর ভীষণ অত্যাচার করা হয়, এই কথা মুখ হইতে বাহির হইতে না হইতে, ক্রোধোন্মত্ত সিরাজ, 'বয়সে বাপের বড়', দেশমান্য, মহাতাপ রায় জগৎশেঠের গলদেশে প্রকাশ্য দরবারে এক চপেটাঘাত করিলেন। (১৫) বলা ভাল, জগৎশেঠ ইতিপূর্ব্বে কখনই সিরাজের বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই; সওকতের স্বপক্ষে ষড়যন্ত্রে তাঁহার যোগদানের প্রমাণাভাব। এই সাধু-সম্ভাষণের পরে জগৎশেঠকে বন্দী করা হয়। মীরজাফর খাঁ প্রভৃতি সেনা-পতিগণ, যুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবেন না বলিয়া ভয় দেখাইলে, তবে জগৎশেঠ মুক্ত হন।

এই সমস্তের পরও যদি দেশের গণ্য মান্য প্রবীণ লোকে সিরাজকে সিংহা-সনচ্যুত করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন, তাহা হইলে কোন্ সহৃদয় ঐতিহাসিক তাঁহাদেরই স্কন্ধে সমস্ত দোষের আরোপ করিয়া সিরাজের জয়পতাকা বহন

(১৪) রিয়াজ ও মুতাক্ষরীণ।

(১৫) Long's Records. P. 77. এইটি ইংরাজের রচা কথা বলিলে চলে না। মুর্শিদাবাদে এখনও ইহার জনশ্রুতি প্রবল রহিয়াছে। ওলন্দাজ গবর্ণরের পত্রে এই কথা

করিবেন ? দেখা যাইতেছে, এত বিড়ম্বনা সহ্য করিয়াও নাবালক বলিয়া সিরাজের মুখে মিষ্টান্ন তুলিয়া দিতে ইঁহাদের প্রবৃত্তি হয় নাই। চক্রান্তকারিগণ সৎসাহসপ্রদর্শন করিতে পারেন নাই, প্রকাশ্যভাবে নবাবকে রাজ্যচ্যুত করিবার উদ্যোগ না করিয়া প্রতারণা প্রভৃতি নীচতার আশ্রয় লইয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় হইলেও স্বীকার্য্য, ইহা আমাদের জাতীয়চরিত্রের দোষ। এ দেশের বণিক ইংরাজও যথেষ্ট পরিমাণে এই প্রবৃত্তি দেখাইয়াছেন। দেশের রাজার শত দোষ সত্ত্বেও তিনি রাজা। প্রজাবর্গের চক্ষে রাজদ্রোহিতা মহাপাপ। দেশীয় চক্রান্তকারিগণের হৃদয়ে এই জন্যই শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ভয় ছিল। বিপ্লবের পরিণামফলে দেশীয় রাজা সুশাসনের প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলে হয় ত সিরাজের প্রতি এত সমবেদনা দেখা দিত না। কিন্তু গৃহশত্রুর যোগে বলীয়ান্ ইংরাজ-শক্তির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায়, ক্রমশঃ দুর্ব্বল দেশীয় শক্তির পরিণামে পরাভব অবশ্যম্ভাবী ; কার্য্যক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিয়াছে। ফল অন্যরূপ দেখা দিয়াছে বলিয়াই সিরাজ-চরিত্রে কল্পিত গুণের আরোপ করিবার কোনও কারণ নাই। পিতৃব্যপত্নী ঘেসিটি বেগমের সর্ব্বস্বলুণ্ঠন ব্যাপারেও এ কালের কেহ কেহ সিরাজের বড় একটা দোষ দেখিতে পান না !

নবাব ও ইংরেজের প্রথম সংঘর্ষণে ইংরেজ পক্ষের অনেক দোষ থাকিলেও, নিরপেক্ষ ইতিহাসলেখককে স্বীকার করিতে হইবে যে, কাশিমবাজার অধিকার ও কাশিমবাজারের ওয়াট্‌স্ প্রভৃতি কর্ম্মচারিগণের মুচলিকা লইয়া সিরাজের আর অধিক দূর অগ্রসর হওয়া উচিত হয় নাই। আলিবর্দ্দীখাঁর দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিলে (১৬) ইহাতেই ইংরেজপক্ষ ভীত হইয়া নবাবের আদেশপালন ও সঙ্গে সঙ্গে পূজোপচারের ব্যবস্থা করিতেন। নখে ছিঁড়িয়া যে বিবাদের মূলোৎপাটন হইত, সিরাজের ঔদ্ধত্যে ও ভাগ্যবিপর্য্যয়ে, বাঙ্গলার সমস্ত অস্ত্রেও সে কার্য্য সিদ্ধ হয় নাই। দেশীয় ঐতিহাসিকগণও এ ক্ষেত্রে সিরাজদ্দৌলারই দোষ দিয়া গিয়াছেন।

সিরাজের সাহস ও বীর্য্যবত্তা সম্বন্ধেও এক্ষণে প্রশংসাপত্র প্রস্তুত হইয়াছে। সমালোচনায় কেহ বা আকবর, কেহ বা নেপোলিয়নের সঙ্গেও

---

(১৬) Long's Records—pp. 16-19.

এখানে কাশিমবাজার অবরোধ করিয়া, কিছু কালের জন্য বাণিজ্য বন্ধ করিবার আদেশ দিয়া, বিনা রক্তপাতে নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ কার্য্যোদ্ধার করেন। এই অবরোধের পর ইংরাজ-পক্ষ অনুনয় বিনয়ের ত্রুটি করেন নাই। আলিবর্দ্দী খাঁ ইংরাজদিগের উচ্ছেদ সম্বন্ধে যে উপদেশ

সিরাজকে তুলিত করিতে চান। শৌর্য্য, বীর্য্য, ক্ষমা প্রভৃতি রাজোচিত মহত্ত্বও সিরাজে আরোপিত হইতেছে। ন্যায়বিশেষের ইহা একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত! বাঙ্গালা সাহিত্য ও সাময়িক পত্রিকার সুধী পাঠকগণের এখন আশঙ্কা হইতেছে, আমরা কোন্ পথে? ঐতিহাসিক সমালোচনায় ধীরতা যে নব্য বাঙ্গলার আদর্শ, এমন মনে হইতেছে না। সিরাজ সকল যুদ্ধক্ষেত্রেই সৈন্য সহ যাত্রা করিয়াছেন; অতএব তিনি আর নেপোলিয়ন না হইয়া যান না।

আলিবর্দ্দী খাঁর প্রিয়তম বলিয়া বর্গীর হাঙ্গামার কালে শিশু সিরাজ অনেক সময়ে মাতামহের শিবিরে বাস করিয়াছেন। যুদ্ধকার্য্যশিক্ষার তাঁহার সম্পূর্ণ সুবিধা ছিল; এ সুবিধার তিনি কত দূর সদ্ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাই চিন্তনীয়। সওকৎজঙ্গের বিপক্ষে তিনি রাজমহল পর্য্যন্তই গিয়াছিলেন। ইংরেজের বিরুদ্ধে প্রকৃত যুদ্ধক্ষেত্রে স্বয়ং সিরাজ দুই বার উপস্থিত ছিলেন। ক্লাইব প্রভৃতির কলিকাতা পুনরধিকারের সময় একবার; পলাশীতে দ্বিতীয় বার। দুই বারই তাঁহার অস্থির মতি ও ভীরুতায় কার্য্য নষ্ট হইয়াছে। প্রথম বার নিশারণে ইংরেজদল শিবিরের নিকটবর্ত্তী হইয়াছিল বলিয়াই বাঙ্গালী নেপোলিয়নের চক্ষুঃস্থির হয়। সেই জন্য, বিনা বাক্যব্যয়ে ইংরেজ পক্ষের সমগ্র প্রস্তাবে স্বীকৃত হইয়া, তিন ক্রোশ দূর হইতে সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করিয়া, সিরাজ হুগলীতে আসিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচেন। এ স্থলে পরবর্ত্তী চক্রান্তকারিগণের উপর দোষারোপ করিতে হইলে বড়ই কষ্টকল্পনা করিতে হয়। দেশীয় বিদেশীয় সমকালের ইতিহাসলেখকগণ, সিরাজের আশঙ্কাই এই অপমানজনক সন্ধির কারণ বলিয়া, একবাক্যে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পলাশীর যুদ্ধে মীরজাফরের উপদেশের প্রবাদ (১৭) সত্য বলিয়া স্বীকার করিলেও, দেখা যায়, বালক নবাবের মূর্খতা ও ভীতিই পরাজয়ের মুখ্য কারণ। অসমীক্ষ্যকারিতার উদাহরণে সিরাজ-চরিত্র পরিপূর্ণ। কিঞ্চিন্মাত্রও বিচারশক্তি থাকিলে, নবীন নবাব প্রবল যুদ্ধের সময় অকালে মোহনলালকে নিরস্ত হইবার জন্য পুনঃপুনঃ নিষেধাজ্ঞা

---

(১৭) গোলাম হোসেন প্রবাদ বলিয়াই ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। রিয়াজ-গ্রন্থকার বলেন, "মীরজাফর সসৈন্য দূরে দণ্ডায়মান ছিলেন। সিরাজের বারংবার আহ্বানেও তিনি নিকটে আসিলেন না। মীর মদনের মৃত্যুর পরে সৈন্যদলের কিয়দংশ পলাইতে লাগিল। সিরাজদ্দৌলা আর সাহস করিয়া স্থির থাকিতে পারিলেন না।" ইংরেজী ইতিহাসে ও রিয়াজ গ্রন্থে পলায়নের কাল সম্বন্ধে প্রায় এক মত। দুইটার পরে নবাব পলায়ন করিলে, "অদ্য বেলা নাই, কালি হবে রণ" প্রভৃতি জনশ্রুতির কথা খাটে না। বলা উচিত, মুতাক্ষরীণ-রচয়িতা

পাঠাইতেন না। অবশ্য, সিরাজ বালকমাত্র; তাঁহার নিকট পরিণামদর্শিতার আশা করা যায় না; প্রধান কয়েক জন সেনাপতির উপেক্ষায় তিনি তখন ভয়-চকিত। বর্ত্তমানে সিরাজ না কি বিবেচক বলিয়াও বর্ণিত হইতেছেন, এই জন্য বিপরীত দিক্‌টাও প্রদর্শিত হইল।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, সমসাময়িক ইতিহাসে ও কাগজপত্রে সিরাজের যে ছবি পাওয়া যায়, সামঞ্জস্য করিয়া তাহাই গ্রহণ করিতে আমরা বাধ্য। এই পুরাণ চিত্রে এ কালের বার্ণিস্ দেওয়া যুক্তিযুক্ত নহে। সিরাজ নবীন যুবক, সুতরাং তাঁহার বুদ্ধি অপরিণত; সুশিক্ষার অভাবে তিনি উচ্ছৃঙ্খল; উদ্দাম প্রবৃত্তিদমনের অবকাশ তাঁহার ঘটে নাই। আবার বালক বলিয়াই ব্যবহারে তিনি সরল; ছল, চাতুরী, প্রতারণা, এ চরিত্রের কলঙ্ক নহে। অবশেষে তাঁহার নিদারুণ পরিণাম হৃদয়বিদারক। বোধ হয়, এই পর্য্যন্ত বলিয়াই নিরস্ত হওয়া ভাল। কারণ, "সত্যমেব জায়তে।"

শ্রীকালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়।

মহারাষ্ট্র সাহিত্য।

মারাঠী ভাষা ও সাহিত্য।

সূচনা।

"গ্রন্থমালা" একখানি মহারাষ্ট্রীয় মাসিকপত্র। কোহ্লাপুরের ও বরোদার মহারাজের আশ্রয়ে, কোহ্লাপুর রাজারাম কলেজের অধ্যাপক রাজশ্রী বিষ্ণুগোবিন্দ বিজাপুরকর এম্. এ. মহোদয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত। মহারাষ্ট্রীয় কৃতবিদ্যগণের লিখিত ক্রমশঃপ্রকাশ্য দীর্ঘ প্রবন্ধাবলী স্বতন্ত্র পৃষ্ঠাঙ্ক সহ প্রকাশের জন্য এই পত্রের প্রচার। সাহিত্যানুরাগী কতিপয় অধ্যাপক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ-উপাধিধারী ব্যক্তি এই পত্রের নিয়মিত লেখক। তাঁহারা প্রধানতঃ ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন, প্রাণিতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, জীবনচরিত প্রভৃতি বিষয়ে উৎকৃষ্ট ইংরাজী গ্রন্থসমূহের ভাবানুবাদে প্রবৃত্ত। উৎকৃষ্ট লেখক-দিগের রচিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধেরও ইহাতে সমাবেশ হয়। ইহাতে যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, সম্পাদক তাহাই অতি সামান্য ব্যয়ে লেখকদিগকে স্বতন্ত্রভাবে মুদ্রিত করিয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই কারণে, এই মাসিকপত্রের সাহায্যে, এ পর্য্যন্ত বহুসংখ্যক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়া "গ্রন্থমালা" নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছে। যেমন অপরাপর মহারাষ্ট্রীয় মাসিকপত্রে, তেমনই গ্রন্থমালাতেও, উপন্যাস বা গল্পের স্থান নাই। গল্প উপ-ন্যাসের জন্য মারাঠী ভাষায় দুই একখানি স্বতন্ত্র মাসিকপত্র আছে; প্রেমবৈচিত্র্যপ্রদর্শনে ও কল্পিত গার্হস্থ্য চিত্রাদির অঙ্কনে তাহারা নিযুক্ত; কিন্তু কৃতবিদ্য সমাজে এই সকল পত্রের বিশেষ সমাদর নাই, এবং মহারাষ্ট্র দেশে উৎকৃষ্ট উপন্যাসকার বা গল্পলেখকের সংখ্যাও অতি বিরল। অধুনা দুই এক জন লেখক এ বিষয়ে বঙ্গীয় প্রতিভার অনুকরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন,

কিন্তু ভাবপ্রবণতায় বা কল্পনাকৌশলে তাঁহারা যে অল্প দিনের মধ্যে বাঙ্গালীর সমকক্ষ হইতে পারিবেন, তাহা মনে হয় না।

মহারাষ্ট্র সাহিত্য এখনও অনুবাদের যুগ সম্পূর্ণ অতিক্রম করিতে পারে নাই। এ স্থলে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক যে, কেবল ষাটি বৎসর পূর্ব্বে মহারাষ্ট্র দেশে পাশ্চাত্য রীতিক্রমে সাহিত্যালোচনার সূত্রপাত হইয়াছে। তথাপি ইতোমধ্যে যে মৌলিক ও স্বাধীন চিন্তাপ্রসূত গ্রন্থকলাপ রচিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে ন্যূনাধিক চল্লিশখানি গ্রন্থ মহারাষ্ট্রীয় ভাষার অলঙ্কারস্বরূপ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। ফলতঃ, মহারাষ্ট্রে স্বাধীন চিন্তার বিকাশ আরব্ধ হইলেও, তদ্দেশীয় কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণের মধ্যে অনেকের ধারণা এইরূপ যে, উচ্চশিক্ষায় বঞ্চিত জনসাধারণকে খ্যাতনামা পাশ্চাত্য লেখকগণের যুক্তি, তর্ক ও চিন্তাপ্রণালীর সহিত বিশেষরূপে পরিচিত করিতে না পারিলে, প্রকৃত লোকশিক্ষার সৌকর্য্য ঘটিবে না—পাশ্চাত্য বিদ্যার আভাসমাত্র পাইয়া যাহারা স্বতন্ত্র গ্রন্থরচনায় প্রবৃত্ত হয়, তাহাদিগের জ্ঞানের গভীরতাবৃদ্ধির সহজ উপায় বিধান করিতে না পারিলে, দেশীয় সাহিত্যের পুষ্টি ও বিস্তৃতি সাধিত হইবে না। "গ্রন্থমালা"র সম্পাদকীয় প্রবন্ধাদি পাঠ করিলে, এই কথার আভাষ পাওয়া যায়।

গত বর্ষে "গ্রন্থমালা"য় প্রকাশিত মৌলিক রচনাসমূহের মধ্যে "মহারাষ্ট্রীয় ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস" ইতিশীর্ষক প্রবন্ধগুলি বিশেষ চিত্তাকর্ষক। এই কারণে, বর্ত্তমান প্রস্তাবে আমরা উহাদিগের একটির মর্ম্মার্থ সঙ্কলন করিব। রাজশ্রী বিনায়ক লক্ষ্মণ ভাবে বি. এস. সি. মহোদয় এ বিষয়ে যে প্রবন্ধমালা লিখিতেছেন, তাহা অদ্যাপি সমাপ্ত হয় নাই; তাঁহার প্রবন্ধাবলীতে অতি বিস্তৃতভাবে ও বিশেষ বিচারপূর্ব্বক মহারাষ্ট্রীয় সাহিত্যের ইতিহাস আলোচিত হইতেছে। দ্বিতীয় প্রবন্ধটি রাজশ্রী বিষ্ণু রামচন্দ্র পাঙ্গারকর প্রণীত; উহা "মারাঠী ভাষার স্বরূপ" এই নামে সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে। এ স্থলে ঐ প্রবন্ধেরই সারাংশ সঙ্কলিত হইল। বন্ধনীর মধ্যগত বাক্যগুলি মূল প্রবন্ধের অন্তর্গত নহে—বঙ্গীয় পাঠকগণের বোধসৌকর্য্যার্থ তাহা এই প্রবন্ধের লেখক কর্ত্তৃক সংযোজিত হইয়াছে। পাঙ্গারকর মহোদয় ভূমিকায় বলিয়াছেন,—

বাহুবল ও বাক্যবল।

"মহারাষ্ট্র ইতিহাসে ভারতীর সহিত কৃপাণের, অথবা বাহুবল ও বাক্যবলের অন্বয়ব্যতিরেকসম্বন্ধ দৃষ্ট হয়। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে জয়ন্তপাল, সিংঘণ ও রামদেবরাও প্রভৃতি যাদব বীরগণ কর্ত্তৃক আধুনিক মহারাষ্ট্রীয়ত্বের বীজ উপ্ত হইবার সমকালে মুকুন্দরাজ, জ্ঞানেশ্বর ও নামদেব আবির্ভূত হইয়া, পণ্ঢরপুরে অভিনব মহারাষ্ট্র ধর্ম্মের বিজয়পতাকা উড্ডীন করিবার জন্য আধুনিক মহারাষ্ট্র সাহিত্যের সৃষ্টি করেন। খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে ছত্রপতি মহারাজ শিবাজী, তানাজি মালুসরে ও বাজী পরভুর আবির্ভাবে মহারাষ্ট্রীয় ক্ষাত্রতেজ সম্পূর্ণ বিকশিত হইতে না হইতেই একনাথ, তুকারাম ও রামদাসের দুঃসহ ব্রহ্মতেজে সমগ্র মহারাষ্ট্র দেশ উদ্ভাসিত হইয়া, মহারাষ্ট্র সাহিত্যে নবযুগের আবির্ভাব হয়। [অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পেশোয়েগণের প্রাদুর্ভাবকালে রঘুনাথ পণ্ডিত, শ্রীধর ও মহীপতির ন্যায় গ্রন্থকারগণের মধুর রচনায় মহারাষ্ট্র সাহিত্য পরিপুষ্ট হয়।] জ্ঞানেশ্বর ও নামদেবের পর প্রায় দুই শত বৎসর মহারাষ্ট্রীয় সাহিত্যাকাশ ঘোরতমসাচ্ছন্ন ছিল, এবং ঐ কালে মারাঠাদিগের মধ্যে কোন বীরপুরুষেরও উদয় হয় নাই। পেশোয়েগণের শাসনকালের শেষভাগে মহারাষ্ট্রের ক্ষত্রতেজ, স্বার্থপরতা ও হিংসা দ্বেষ প্রভৃতি মনোবিকারের দ্বারা মলিন হইয়াছিল বলিয়াই, বোধ হয়, রামজোশী ও হোনাজীর মত টপ্‌পা, খেয়াল ও কবির গান প্রভৃতির রচয়িতা ক্ষুদ্র কবিগণের উদয় হয়। ফলতঃ, সাহিত্যের অভিবৃদ্ধির সহিত রাষ্ট্রীয়

সাহিত্যগুরু স্বর্গীয় বিষ্ণুশাস্ত্রী চিপলুণকর মহোদয় মহারাষ্ট্রীয় ভাষা ও মহারাষ্ট্র ইতিহাসের পুনরুজ্জীবনের জন্য অশ্রান্ত শ্রমস্বীকার করিয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় ইতিহাসের প্রতি সাধারণের অনুরাগ যেরূপ বর্দ্ধিত হইয়াছে, দুঃখের বিষয়, কাব্যসাহিত্যের উৎকর্ষবিধানে কাহারও সেরূপ আগ্রহ দৃষ্ট হয় না। রাজ আশ্রয় ভিন্ন অনেক কার্য্য সুসিদ্ধ হয় না, এ কথা সত্য; কিন্তু মহারাষ্ট্রীয় সাহিত্যের এ পর্য্যন্ত যে সমৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে, তাহাতে কখনও রাজাশ্রয়ের আবশ্যক হয় নাই, এ কথাও স্মরণ রাখিতে হইবে। বরং বিগত আট শত বৎসর দুঃখ দারিদ্র্য ও লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াই মহারাষ্ট্র সাহিত্য ক্রমশঃ পরিপুষ্ট হইয়াছে। সংস্কৃতাভিমানী স্বদেশীয় পণ্ডিতসমাজের নিপীড়ন মারাঠী ভাষার গতিরোধে সমর্থ হয় নাই। মারাঠী ভাষায় শ্রীমদ্ভাগবতের অনুবাদ করিয়া একনাথ স্বামী পণ্ডিতমণ্ডলী কর্ত্তৃক সমাজচ্যুত ও প্রহৃত হন। তুকারামের অভঙ্গ-সমূহ নদীগর্ভে নিমজ্জিত হয়। মুক্তেশ্বর, শ্রীধর, রামদাস ও মোরোপন্ত প্রভৃতি কবিগণ সংস্কৃতের পরিবর্ত্তে মারাঠী ভাষায় গ্রন্থরচনা করিয়া বিদ্বৎসমাজে তিরস্কৃত হন। সাহিত্যসেবায় ইঁহাদিগের মধ্যে কেহই রাজাশ্রয় লাভ করেন নাই। [বরং তুকারামকে রাজপুরুষেরা মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় কবিতারচনার জন্য দেশত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন।] তথাপি এই সকল লৌকিক মানাপমানের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, রাজার নিগ্রহানুগ্রহের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া, তাঁহারা প্রাকৃত জনগণের জ্ঞান-বুদ্ধি-বৃদ্ধির জন্য গ্রন্থরচনাপূর্ব্বক দেশীয় ভাষার ও দেশবান্ধবগণের সেবা করিয়াছিলেন। পূর্ব্বসূরিগণের এই নিষ্কামব্রতের অনুকরণ প্রত্যেক শিক্ষিত মহারাষ্ট্রীয়ের প্রধান কর্ত্তব্য।

সাহিত্যের নিগ্রহ।

হস্ত কলঙ্কিত হইবার ভয়ে যাঁহারা মাতৃভাষায় লিখিত গ্রন্থাদি স্পর্শ করিতে সাহসী নহেন, তাঁহারা মারাঠী ভাষাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যাপীঠে রাজভাষার পার্শ্বে উপবিষ্ট হইবার উপযুক্ত বিবেচনা করেন না; কিন্তু আমাদিগের বিশ্বাস, মহারাষ্ট্র সাহিত্য অনেক বিষয়ে ইংরাজী সাহিত্যের সমকক্ষ ও কোন কোন বিষয়ে তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়াও পরিগণিত হইবার যোগ্য। রঘুনাথ পণ্ডিতের "নলোপাখ্যান", মুক্তেশ্বরের "আদিপর্ব্ব", তুকারামের "অভঙ্গ", মোরোপন্তের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা, রামজোশীর "লাওনী", (গীতিকবিতা) সমর্থ রামদাসের "দাসবোধ", এই কয়খানি গ্রন্থও যদি কেহ যত্নপূর্ব্বক পাঠ করেন, তাহা হইলে তিনি বুঝিতে পারিবেন যে, সেকালের সংস্কৃতভাষাভিমানী পণ্ডিতেরা ও একালের ইংরাজীনবীশেরা যে ভাষার লাঞ্ছনায় এরূপ বদ্ধপরিকর, তাহাতে কত বহুমূল্য রত্ন সংগৃহীত রহিয়াছে। মাননীয় মহাদেব গোবিন্দ রাণাড়ে মহোদয় মারাঠী ভাষার এই যোগ্যতার বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিয়া, উহাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করাইবার জন্য যত্নপরায়ণ হইয়াছেন। তিনি "উনবিংশ শতাব্দীর মহারাষ্ট্র সাহিত্যের উন্নতির ইতিহাস" ইতিশীর্ষক যে প্রবন্ধমালার রচনা করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে, গত ষষ্টি বর্ষের মধ্যে মহারাষ্ট্র সাহিত্য কিরূপ সবেগে উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে, তাহা সম্যক্ অবগত হওয়া যায়। যদি তাঁহার চেষ্টা সফল হয়, তাহা হইলে আমরা রাজকীয় বিদ্যাপীঠে বেকন, সেক্‌স্‌পীয়র, মিলটন, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, পোপ, বায়রন ও এডিসনের পার্শ্বে, জ্ঞানেশ্বর, মুক্তেশ্বর, বামন পণ্ডিত, রামদাস, মোরোপন্ত, রামজোশী ও স্বর্গীয় ৺ চিপলুণকর মহোদয়কে বিরাজমান দেখিতে পাইব। বর্ত্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদের প্রারম্ভে আমাদিগের গদ্য সাহিত্যের উদয় হইয়াছে; সুতরাং জনসন, গিবন ও স্কটের ন্যায় গ্রন্থকার কালক্রমে মহারাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করিবেন, সন্দেহ নাই। রাও বাহাদুর রাণাড়ের চেষ্টা ফলবতী না হইলেও, মহারাষ্ট্র সাহিত্যের অধ্যয়ন হইতে প্রতিনিবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য নহে; কারণ, আদর্শসতী অরুন্ধতীর ন্যায় ব্রহ্মপরায়ণা মারাঠী ভাষার গ্রন্থভাণ্ডারে প্রবেশ করিলে, নিঃসন্দেহ অনায়াসে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মতত্ত্ব, উদার নীতিজ্ঞান ও অপ্রতিম

মহারাষ্ট্র সাহিত্যের যোগ্যতা।

শান্তিসুখের লাভ হয়। এইরূপে আত্মোন্নতিসাধনের জন্য যাঁহারা প্রাচীন গ্রন্থকলাপের আলোচনা করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগের পথপ্রদর্শনের জন্য, মহারাষ্ট্র সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয়-মূলক এই প্রস্তাব রচিত হইল।"

এইরূপ ভূমিকার পর লেখক বিগত সহস্র বৎসরের মহারাষ্ট্র ভাষার ইতিহাসকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। তাহার প্রথম ভাগের নাম—

আদ্যকাল বা জ্ঞানেশ্বরের যুগ।

খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে মহারাষ্ট্রী নামক প্রাচীন প্রাকৃত ভাষা হইতে আধুনিক মারাঠী ভাষার জন্ম হয়। মুকুন্দরাজ আদি মহারাষ্ট্র কবি। তিনি ১১৩৩ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন।

মুকুন্দরাজ।

তদানীন্তন মহারাষ্ট্রপতি মহারাজ বল্লাল যাদবের পুত্র জয়ন্ত পালকে ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা দিবার জন্য, তিনি "বিবেকসিন্ধু" নামক গ্রন্থের রচনা করেন। "পরমামৃত" নামক তাঁহার আর একখানি গ্রন্থ আছে। এই গ্রন্থদ্বয়ে ব্রহ্ম, মায়া, জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্য, শরীরচতুষ্টয়, অবস্থাচতুষ্টয় ও মুক্তির চারি প্রকার ভেদের বিষয়, সংক্ষেপে আলোচিত হইয়াছে। মুকুন্দরাজের অনেক পদাবলীও সংগৃহীত হইয়াছে। এই আদি কবির রচনা এরূপ প্রাঞ্জল ও সরস যে, উহা মুকুন্দরাজের অন্ততঃ ৪।৫ শত বৎসর পূর্ব্বে মাতৃগর্ভ ত্যাগ করিয়াছিল ও তাহার পর নানা ব্যক্তির হস্তে সংস্কৃত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। নিতান্ত শৈশবে ভাষার এরূপ অভিব্যক্তি ও লাবণ্য সম্ভবপর বোধ হয় না।

মুকুন্দরাজের ৭৫ বৎসর পরে জ্ঞানেশ্বরের আবির্ভাব হয়। ১২৯০ খৃষ্টাব্দে উনবিংশ বর্ষ বয়সে তাঁহার "ভাবার্থদীপিকা" নাম্নী গীতার টীকা পরিসমাপ্ত হয়। গ্রন্থকারের নামানুসারে

জ্ঞানেশ্বর।

ঐ গ্রন্থ "জ্ঞানেশ্বরী" নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। জ্ঞানেশ্বরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নিবৃত্তিনাথ, অনুজ সোপানদেব ও কনিষ্ঠা ভগিনী চিরকুমারী মুক্তা বাঈ, যথাক্রমে "বৃত্তিবোধ", "সোপানমার্গ" ও "চাঙ্গদেব-চরিত" রচনা করেন। ইঁহাদিগের রচিত বহুসংখ্যক ভক্তিরসপূর্ণ অভঙ্গ ও পদাবলীও বিদ্যমান আছে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নিবৃত্তিনাথের আদেশে, জ্ঞানেশ্বর "অমৃতানুভব" নামক একখানি গ্রন্থের রচনা করেন। এতদ্ভিন্ন তিনি অনুগীতার মারাঠী টীকা, "হরিপাঠের অভঙ্গ" ও শত শত পদাবলীর রচনা করিয়াছেন। জ্ঞানেশ্বরের পিতা বিঠ্ঠলপন্ত বারাণসীর বিখ্যাত সাধুপুরুষ রামানন্দের অন্যতম শিষ্য ছিলেন। "রাম ও রহিমের ঐক্য" প্রতিপাদনকারী সুপ্রসিদ্ধ ভক্ত কবি কবীর এই রামানন্দেরই শিষ্য ছিলেন।

সীবন-ব্যবসায়ী নামদেব, গোরা কুম্ভকার, সাবন্ত মালী, নরহরি স্বর্ণকার, অতিশূদ্র চোখা-মেলা, বোধলে বাবা ও চাঙ্গ্‌দেব প্রভৃতি ভক্তকবিগণ জ্ঞানেশ্বরের সামসময়িক। জনা বাঈ নামে নামদেবের এক দাসী ছিল। সে নামদেবের নিকট লেখা পড়া শিক্ষা করে। তাঁহার রচিত পরমার্থতত্ত্বমূলক কবিতা পাঠ করিয়া অনেকে দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়াছেন। মুক্তা বাঈর উপদেশে যোগী চাঙ্গদেব ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন।

নিবৃত্তিনাথ, সোপানদেব, জ্ঞানেশ্বর, মুক্তা বাঈ, নামদেব ও জনা বাঈ,—এই ছয় জন এই সময়ের কবিদিগের মধ্যে বিশেষ সম্মানলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই 'ব্রহ্মপদে সদা-লীন' থাকিতেন ও আচণ্ডাল সকলকে ব্রহ্মজ্ঞান বিতরণ করিতেন।

জ্ঞানেশ্বরীর ফল।

জ্ঞানেশ্বরের উপদেশে ও তাঁহার গ্রন্থপাঠে অসংখ্য মহারাষ্ট্রবাসী অনুপম শান্তিসুখের অধিকারী হইয়াছেন ও হইতেছেন। জ্ঞানেশ্বরীর প্রচার করিয়া যোড়শ শতাব্দীতে একনাথ মহারাষ্ট্রদেশে ধর্ম্মভাব জাগরূক করেন, এবং বণিকপুত্র "তুকা" জ্ঞানেশ্বরের গ্রন্থ পাঠ করিয়াই "তুকারাম বাবা" নামে সর্ব্বত্র পূজালাভ করেন। মহারাষ্ট্র দেশে অদ্বৈত-

বাদের—জ্ঞানভক্তিমূলক ভাগবতধর্ম্মের বিস্তার জ্ঞানেশ্বরেরই চেষ্টার ফল। জ্ঞানেশ্বরীর ভাষা আবেশময়ী, ওজস্বিনী ও নানালঙ্কারভূষিতা। ইহার ভাবমাধুরীতে পাঠকের হৃদয় কখনও মন্ত্রমুগ্ধবৎ হয়, কখনও গভীর উল্লাসে উচ্ছ্বসিত হইতে থাকে। মুকুন্দরাজের গ্রন্থাবলীর ভাষা অপেক্ষা জ্ঞানেশ্বরীর ভাষা অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বোধ। এই গ্রন্থে বহু প্রাচীন শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। প্রাকৃত ভাষা হইতে মারাঠা ভাষার উৎপত্তিক্রম নির্ণয়ে এই গ্রন্থের অপেক্ষা অধিকতর উপযুক্ত গ্রন্থ প্রাচীন মহারাষ্ট্র সাহিত্যে দুর্লভ। ইহাতে ব্যবহৃত অনেক শব্দ আধুনিক সাহিত্য হইতে বিলুপ্ত হইলেও, মহারাষ্ট্রে নানা স্থানের গ্রাম্য ভাষা হইতে উহারা অদ্যাপি নিরাকৃত হয় নাই। তদানীন্তন মহারাষ্ট্রপতি রামদেবরাও যাদবের বর্ণনা, সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পৃথিবীর পরিভ্রমণ, রাজচিহ্নযুক্ত চর্ম্মপত্রের ব্যবহার প্রভৃতি বিষয়ের উল্লেখ, মারাঠী ভাষার প্রতি অনুরাগবর্দ্ধক উক্তি, মারাঠা জাতির হিতাকাঙ্ক্ষায় প্রণোদিত কবিতাবলী, এবং আত্মশক্তির প্রতি নির্ভরশীলতা প্রভৃতির জন্য, এই গ্রন্থের ঐতিহাসিক যোগ্যতাও অল্প নহে। ফলতঃ, জ্ঞানেশ্বরের "ভাবার্থদীপিকা"র সাহায্য ভিন্ন সেকালের মহারাষ্ট্র সমাজের ও সাহিত্যের ইতিহাস নির্ণয় করা অসম্ভব। এই সকল কারণে, ও সেকালের ও তৎপরবর্ত্তী কালের সাহিত্যে ও জাতীয় চরিত্রে জ্ঞানেশ্বরের রচনার প্রভাব সর্ব্বাপেক্ষা অধিকপরিমাণে পরিলক্ষিত হয় বলিয়া, মহারাষ্ট্র সাহিত্যের এই যুগকে "জ্ঞানেশ্বরের যুগ" নামে অভিহিত করা সঙ্গত বোধ হইল। এই যুগের ব্যাপ্তিকাল ১১৯২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৩০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কিঞ্চিদধিক এক শত বৎসর।

ঐতিহাসিক যোগ্যতা।

[বারান্তরে অবশিষ্ট যুগচতুষ্টয়ের ইতিহাস বিবৃত হইবে।]

শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর।

সহযোগী সাহিত্য।

সাহিত্য।

উইলিয়ম ব্ল্যাক।

অল্প দিন হইল, বিখ্যাত ঔপন্যাসিক ব্ল্যাকের মৃত্যু হইয়াছে। ব্ল্যাকের কোনও পুস্তকে অসাধারণ প্রতিভাজ্যোতিঃ লক্ষিত না হইলেও, তাঁহার সকল উপন্যাসই সুখদ, সুপাঠ্য ও সুরুচিসঙ্গত। যিনি প্রায় ত্রিশখানি সুখপাঠ্য উপন্যাসের রচনা করিয়া কঠোর জীবনসংগ্রামে নিরত কর্ম্মক্লান্ত পাঠকের বিরল অবকাশে আনন্দ দান করিয়াছেন, তিনি আমাদিগের কৃতজ্ঞতার পাত্র, সন্দেহ নাই।

আজকালকার ইংরাজী উপন্যাসে, রিয়ালিস্‌ম ও সেনসেশ্যন্যালিস্‌ম, এই দুইয়ের বড় প্রভাব। এক দল সত্যমূলক উপন্যাসের নামে সমাজের নানা প্রশ্নের আশ্রয় লইয়া, মানবের প্রকৃতিকে আবরণমুক্ত করিয়া আলোকে আনয়ন করেন; শালীনতার কথা তুলিলে শিল্পচাতুরীর নাম করিয়া চক্ষু রাঙ্গান। আর এক দল উপন্যাসচিত্রিত চরিত্রগুলিকে শঙ্কটশঙ্কিল স্থানে আনিয়া—নানা বিপদের মধ্য হইতে রক্তস্রোত অতিক্রম করিয়া, বা কোনরূপ অচিন্তিতপূর্ব্ব উপায়ে তাঁহাদিগকে বিপন্মুক্ত করেন; উপন্যাসখানি হাতে করিলে শেষ না করিয়া ছাড়া যায় না, কিন্তু তাহাতে চরিত্রবিশ্লেষণ নাই—সে ছেলেভুলান পুস্তক।

রিয়ালিস্‌ম্ ও সেনসেশ্যন্যালিস্‌ম্।

ব্ল্যাক এই উভয়ের কোন দলেই ছিলেন না। তাঁহার উপন্যাসে যে স্নিগ্ধ সংযমের, যে সুমধুর শান্তির ছায়াপাত লক্ষিত হয়, আজকালকার ইংরাজী উপন্যাসে তাহা দুর্ল্লভ। তাঁহার চিত্রিত চরিত্রগুলি দেবতাও নহে, দানবও নহে,—মানব। তাহাদের সুখ দুঃখ আমাদিগের সুখ দুঃখ;—তাহারা আমাদিগের এই বিরহ মিলন, সুখ দুঃখ, হর্ষ বিষাদে ব্যাপ্ত জগতেই বাস করে। বিশেষতঃ তাহাদিগের মধ্যে অনেক চরিত্রই আমাদিগের স্নেহ বা সহানুভূতি উদ্রিক্ত করে;—আমাদিগের অন্তরের অন্তঃপুরে অবাধে প্রবেশপথ প্রাপ্ত হয়। সে সকল চরিত্র সম্বন্ধে ব্ল্যাক তাঁহার কোন বন্ধুকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্মার্থ এইরূপ;—"আমরা সকলেই আর কিছু পরদারাপহারক নহি। সকল লোকেরই শারীরিক বা মানসিক বিকলতা নাই। আমার কোন পরিচিত লোক নরহত্যায় বা জালে লিপ্ত ছিলেন না। তবুও আমি সেইরূপ জঘন্য চরিত্র চিত্রিত করি না বলিয়া লোকে আমার উপর দোষারোপ করে। আমি মানসিকবিকারশূন্য,—সৎলোকের চিত্র চিত্রিত করিতে ভালবাসি। আমার বিশ্বাস, জগতে সেইরূপ লোকের সংখ্যাই অধিক।" দুনিয়া নিরবচ্ছিন্ন সাধু লোকের আবাসস্থান নহে সত্য; কিন্তু জগতে সাধু লোকেরও অভাব নাই। ব্ল্যাক স্বয়ং নির্ম্মল-চিত্ত ছিলেন, আপনার মত চরিত্রের চিত্রণেই তাঁহার আনন্দ ছিল।

চিত্রিত চরিত্র।

ব্ল্যাক প্রথম হইতেই সাহিত্যসেবায় নিযুক্ত হয়েন নাই। প্রথমে তিনি ললিতকলাশিক্ষায় অখণ্ড মনোযোগ দিয়াছিলেন। তেইশ বৎসর বয়সে ব্ল্যাক আপনি বুঝেন যে, তাঁহার প্রতিভার পক্ষে, চিত্রাঙ্কনে—বর্ণ অপেক্ষা ভাষাই অধিকতর উপযোগিনী। চিত্রাঙ্কনবিদ্যার যে অভিজ্ঞতা লইয়া তিনি সাহিত্যসেবায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল। চিত্রবিদ্যাশিক্ষাকালে তিনি সকল দ্রব্য সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে দেখিতে শিখিয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ চিত্রকর মিলে (Millais) একবার বলিয়াছিলেন,—"আমার অনেক সময় মনে হয়,—কেবল শিল্পীরাই সত্য সত্য দেখিতে পায়।" চিত্রবিদ্যালয়ে ব্ল্যাক প্রকৃতির বিবিধ রূপ লক্ষ্য করিবার যে শিক্ষা পাইয়াছিলেন, রচনাকালে তাহাতে তাঁহার বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল। তাঁহার পুস্তকে সূর্য্যোদয়ের ও সূর্য্যাস্তের, পর্ব্বতশ্রেণীর ও পার্ব্বত্য প্রদেশের যে সকল চিত্র নয়নসমক্ষে উদ্ঘাটিত হয়, সে সকলের অনুকরণ সহজসাধ্য নহে। এই সকল সুন্দর চিত্রে তাঁহার উপন্যাসের মাধুরী আরও বর্দ্ধিত হইয়াছে। স্কটল্যাণ্ডের হাইল্যাণ্ডের পার্ব্বত্য প্রদেশে,—তাহার হ্রদকূলে, তিনি যে সৌন্দর্য্যরাজ্যের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা চিরদিন পাঠকের আনন্দ ও বিস্ময় উৎপাদন করিবে, সন্দেহ নাই।

ললিতকলা ও সাহিত্য।

প্রথমে ব্ল্যাক কিছু কাল সংবাদপত্রসেবায় নিযুক্ত ছিলেন। কয়খানি সংবাদপত্রের সহিত সংসৃষ্ট থাকিয়া তিনি Daily News পত্রে লিখিতে আরম্ভ করেন। এই সময় তাঁহার পুস্তক হইতে তাঁহার যে আয় হইত, তাহাই যথেষ্ট দেখিয়া, তিনি সংবাদপত্রসেবা ত্যাগ করিয়া, উপন্যাসরচনাতেই অখণ্ড মনোযোগ প্রদান করেন। তিনি জনকোলাহল হইতে দূরে তাঁহার ব্রাইটনস্থ আবাসগৃহে শীতকালে উপন্যাস রচনা করিতেন। বৎসরের অবশিষ্টকাল ভ্রমণে, নৌবিহারে, মাছ-ধরায় অতিবাহিত হইত। স্কটল্যাণ্ড-ভ্রমণ তাঁহার পক্ষে বড়ই আনন্দপ্রদ ছিল। স্কটল্যাণ্ডকে তিনি প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন। তাঁহার নানা উপন্যাসে সেই ভালবাসা প্রকাশিত দেখিতে পাওয়া যায়। স্কচ-চরিত্র-চিত্রণে ও স্কটল্যাণ্ডের প্রাকৃতিক শোভাবর্ণনে তিনি অসাধারণ ক্ষমতা দেখাইয়াছেন। পুনঃপুনঃ সেই সকল চরিত্রের সহিত পরিচিত হইয়া ও সেই সকল বর্ণনা পাঠ করিয়াও পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি হয় না। তাঁহার গ্রন্থগুলি তাঁহারই মত নির্ম্মল।

সংবাদপত্রসেবা ও সাহিত্যসেবা।

"এথিনিয়ম" পত্রে প্রকাশ যে, ব্ল্যাকের A Daughter of Heth নামক উপন্যাস প্রথমে গ্ল্যাসগোর কোন সংবাদপত্রে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হয়। ইহাতে অনেক পাঠক বিরক্ত হয়েন, এবং কবে এই উপন্যাস সমাপ্ত হইবে জানিবার জন্য, সম্পাদককে পত্র লিখেন। এই সকল ছিদ্রান্বেষীর পত্র পাঠ করিয়া ব্ল্যাক বড় হতাশ হইয়া পড়েন। শেষে পুস্তকখানি যখন গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়, লেখক তখন আপনার নাম প্রকাশিত করিতে সাহস করেন নাই। যাহা হউক, লণ্ডনের সমালোচকগণ ও পাঠকসমাজ পুস্তকের মাধুরীতে মুগ্ধ হইয়া পড়েন। পুস্তকখানি বিশেষরূপে প্রশংসিত হয়। যাঁহারা পূর্ব্বে কখনও অর্থব্যয় করিয়া পুস্তক ক্রয় করেন নাই, এমন অনেক পাঠকও পুস্তকখানি ক্রয় করিয়া পাঠ করেন। "এথিনিয়ম" পত্রে পুস্তকখানির প্রশংসাত্মক সমালোচনা প্রকাশিত হইলে এক জন প্রকাশক অভিমানের স্বরে লিখিয়াছিলেন,—"আমার প্রকাশিত পুস্তকের ভাল সমালোচনা হয় না, আর ব্ল্যাক-নামধারী কোন এক জন অজ্ঞাতনাম লেখকের একখানা পুস্তকের সমালোচনায় পত্রের পৃষ্ঠা পূর্ণ করা হইতেছে।"

ওব্যানে এক দিন তীরভূমে ভ্রমণ করিতে করিতে একটু নির্জ্জন স্থানে আসিয়া কূলে পরিধেয় রাখিয়া ব্ল্যাক সন্তরণের জন্য জলে অবতরণ করেন। সেই সময় এক জন মহিলা তদ্গতচিত্তে তাঁহার The Princess of Thule নামক উপন্যাস পাঠ করিতে করিতে তথায় উপস্থিত হইয়া, যেখানে ব্ল্যাকের পরিধেয় ছিল, সেইখানে উপবেশন করেন। তিনি পুস্তক পাঠে এমনই নিবিষ্টচিত্ত হইয়াছিলেন যে, সেখানে যে একজনের পরিধেয় আছে, ইহা দেখিতেও পান নাই। এ দিকে সন্তরণের শ্রমে শ্রান্ত হইয়া ব্ল্যাক কূলে আসিতে ইচ্ছুক হইলেন। তিনি কাশিয়া সাড়া দিবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু তাহাতেও মহিলার মনোযোগ আকৃষ্ট হইল না; তিনি পুস্তকের পৃষ্ঠা হইতে দৃষ্টি তুলিলেন না। অগত্যা ব্ল্যাককে জলে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইল। এমন সময়ে পর্ব্বতের উপর হইতে এক জন শিকারী জলের উপর ব্ল্যাকের কৃষ্ণকুন্তলশোভিত মস্তক দেখিয়া, সীল (Seal) ভ্রমে তাঁহাকে গুলি করিবার জন্য বন্দুক তুলিলেন। তখন ব্ল্যাক চীৎকার করিয়া বলিলেন,—"গুলি করিও না! আমি মানুষ।" স্বপ্রণীত পুস্তকপাঠে মহিলাটির অসাধারণ মনোযোগ দেখিয়া ব্ল্যাকের মনে অধিক আনন্দ হইয়াছিল, কি বন্দুক দেখিয়া তাঁহার মনে অধিকতর ভীতির সঞ্চার হইয়াছিল, তাহা কেমন করিয়া বলিব?

গল্প।

সমুদ্র-সলিলে।

[রাজনৈতিক ক্ষেত্রে লর্ড র‍্যাণ্ডলফ চর্চ্চহিলের আবির্ভাব ও তিরোভাব একটি স্মরণীয় ঘটনা; তাহা আজও অনেকেরই মনে আছে। তাঁহার উদয় অতর্কিত, তাঁহার ক্ষণস্থায়ী জ্যোতিঃ অসাধারণ উজ্জ্বল, তাঁহার অস্তগমন অতিসহসা সংঘটিত। তাঁহার রাজনৈতিক জীবনের আদ্যোপান্ত অস্থির প্রতিভার চঞ্চল ক্রীড়া। তাঁহার ক্রীড়াকৌতুকিনী প্রতিভার উজ্জ্বলতা ও মোহিনী শক্তি যথেষ্টই ছিল—কিন্তু গভীরতা বা গম্ভীরতা ছিল কি না সন্দেহ। তিনি এখন মরণের মহাস্বপ্নে অভিভূত। তাঁহার পুত্র মিষ্টার উইনষ্টন স্পেন্সার চর্চ্চহিল সাহিত্যসেবায় নবব্রতী। এই প্রতিভাবান পিতার তরুণবয়স্ক পুত্রের রচনা আশাপ্রদ। গত সীমান্তসংগ্রামে তিনি সংবাদদাতা হইয়া ভারতসীমান্তে গমন করেন। সেই অভিজ্ঞতার ফলে তিনি যে পুস্তক রচনা করিয়াছেন (The Malakhand Field Force) তাহা অতি উপাদেয় হইয়াছে। তিনি এখনও সৈনিক ব্রতে ব্রতী। সম্প্রতি তিনি নবপ্রচারিত "হারমস্‌ওয়ার্থ ম্যাগাজিন" পত্রে একটি ক্ষুদ্র গল্প লিখিয়াছেন। আমরা তাহার মর্ম্মানুবাদ প্রদান করিলাম।]

রাত্রি প্রায় সার্দ্ধ নয় ঘটিকার সময় জাহাজের উপর হইতে এক জন যাত্রী সমুদ্রবক্ষে পড়িয়া গেল। ডাকজাহাজ লোহিতসাগরের জলবক্ষ বিদীর্ণ করিয়া গমন করিতেছিল। ভারতমহাসাগরের প্রতিকূল পবনে জাহাজের গতি মন্দ হইয়াছিল, তাই এখন বড় বেগে জাহাজ চালান হইতেছিল। একখানি মেঘে আকাশ হইতে চন্দ্রকিরণ অপসারিত;—উষ্ণ পবন বাষ্পভারকাতর। সাগরের স্থির জলরাশি কেবল জাহাজের গমনে চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিল; জলরাশি জাহাজের তাড়নে চঞ্চল হইয়া—ফেনময় ক্রোধে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিল—শেষে জাহাজের পশ্চাতে অন্ধকার জলের উপর অন্ধকারে মিশাইয়া যাইতেছিল।

জাহাজে গীতবাদ্যের আয়োজন হইয়াছিল। যাত্রীদিগের পক্ষে একঘেয়ে ভাব বড় কষ্টকর হইয়া আসিতেছিল। তাহারা সাগ্রহে সেই গীতবাদ্যে যোগদান করিয়াছিল—তাহারা সকলেই বাদ্যযন্ত্র পিয়ানোটির নিকটে গিয়া বসিয়াছিল। জাহাজের ডেক জনশূন্য। এই যাত্রীটিও সেই ঘরে বসিয়া সঙ্গীতে যোগদান করিতেছিল। কিন্তু আলোকে ও জনসমাগমে কামরায় বিলক্ষণ গরম বোধ হইতেছিল—তাই সে কামরার বাহিরে জাহাজের ত্বরিতগমনজনিতমৃদু-মন্দানিলবীজিত স্থানে যাইয়া ধূমপান করিতে ইচ্ছুক হইল। সে দিন লোহিতসাগর-বক্ষে জাহাজের ত্বরিতগমনজনিত বাতাস ভিন্ন আর বাতাসের সম্পর্ক ছিল না।

সে বাহিরে আসিয়া জাহাজের রেলের দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া—তাহাতে ঠেস দিয়া দাঁড়াইল,—তাহার পর গম্ভীরভাবে চুরট টানিয়া সেই নৈশ সমীরণে ধূমত্যাগ করিল। ও দিকে পিয়ানো বাজিয়া উঠিল—একটা রঙ্গিলা গানের প্রথম চরণ গীত হইল। সে সব সে শুনিতে পাইল। সে গীত তাহার পরিচিত। সাত বৎসর পূর্ব্বে সে যখন ভারতবর্ষে আইসে, তখন তাহার স্বদেশে সেই গানটির বড় আদর। সেই গান শুনিয়া বহুদিনের অদৃষ্ট জনকোলাহল-পূর্ণ রাজপথের চিত্র তাহার মানস-নয়ন-সমক্ষে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল—তাহার নয়নসমক্ষ হইতে যবনিকা অপসৃত হইয়া গেল। সে ভাবিল, সে শীঘ্রই আবার সেই রাজপথে উপনীত হইবে। সে বাহির হইতেই গানের "কোরস" গায়িতে যাইতেছিল—এমন সময় জাহাজের কমমজবুৎ রেল মট করিয়া ভাঙ্গিয়া গেল,—সে জাহাজের উপর হইতে লোহিত-সাগরের ঈষদুষ্ণ সলিলে পড়িয়া গেল। তাহার চারি দিকে জল ছিট্‌কাইয়া উঠিল।

পড়িয়াই সে এমন বিমূঢ় হইয়া গিয়াছিল যে, এক মুহূর্ত্তের মধ্যে সে কিছুই ভাবিতে পারিল না। তাহার পর সে বুঝিল,—চীৎকার করিয়া আপনার বিপদ জানাইতে হইবে। সে জলের উপর উঠিবার পূর্ব্বেই চীৎকার করিবার চেষ্টা করিল। ভয়কণ্ঠে অস্ফুট চীৎকারে সে আপনার বিপদ জানাইবার চেষ্টা করিল। তাহার মনে হইল,—"সাহায্য কর!" বলিয়া চীৎকার করি। সে ছয় সাত বার চীৎকার করিল। তখন জাহাজের গীতস্বর তাহার কর্ণে পশিতে লাগিল; তখন জাহাজ তাহাকে ছাড়াইয়া গিয়াছে—সাগরের শান্ত সলিল-রাশির উপর দিয়া গীতস্বর তাহার মনোযোগ আকর্ষণ করিতে লাগিল। সেই গীতস্বর যেন তাহার হৃদয়ে ছুরিকাঘাত করিতে লাগিল। এত ক্ষণে তাহার মনে হইল—হয় ত আর জাহাজের লোকেরা তাহাকে তুলিয়া লইবে না! ততক্ষণ জাহাজের যাত্রীরা আবার গীতের "কোরস" গায়িতে আরম্ভ করিয়াছে।

গানের শেষ কথাগুলি ক্রমেই অস্পষ্ট বোধ হইতে লাগিল। জাহাজ বেগে চলিতেছিল। গীতের দ্বিতীয় চরণটি আরও অস্পষ্ট বোধ হইল। জাহাজ দূরে অন্ধকারে মিশাইয়া যাইতে লাগিল—জাহাজের পশ্চাদ্ভাগের আলোক ক্রমেই ক্ষীণজ্যোতি বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল।

সে উন্মাদের মত জাহাজের পশ্চাতে সন্তরণ করিতে আরম্ভ করিল, আর মধ্যে মধ্যে বিকট চীৎকার করিতে লাগিল। সাগরসলিলে জাহাজের গমনজনিত অস্থিরতা দূর হইতে

আরম্ভ হইল। চঞ্চল তরঙ্গভঙ্গ বীচিমালায় পর্য্যবসিত হইতে লাগিল। জাহাজের শব্দ,—মানবের কণ্ঠস্বর,—গীতস্বর সকলই স্তব্ধতায় মিশিয়া গেল।

দূরে জাহাজখানি একটি কৃষ্ণ ছায়ার মত বোধ হইতে লাগিল। জলের উপর তাহার ক্ষীণ আলোকমাত্র দৃষ্ট হইতেছিল।

এতক্ষণে সে আপনার অবস্থা বুঝিল। সে সন্তরণে বিরত হইল। সেই বারিবিস্তারে সে একাকী—পরিত্যক্ত। তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল। সে আবার সন্তরণ আরম্ভ করিল। কেবল এখন চীৎকারের পরিবর্ত্তে সে অসম্বদ্ধভাবে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিল।

সহসা দূরে একটি আলোক কম্পিত ও উজ্জ্বল দেখাইল। তাহার হৃদয় আশায় ও আহ্লাদে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল ;—তবে জাহাজের লোকেরা জাহাজ থামাইয়া ঘুরাইয়া আনিতেছে! তবে ভগবান তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছেন! সে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিল।

সে স্থির হইয়া সেই আলোকের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার আত্মা যেন নয়নে উপনীত হইয়াছিল। ধীরে ধীরে আলোকটি ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর প্রতীয়মান হইতে লাগিল। সে বুঝিল, তাহার উদ্ধারের আর কোনও সম্ভাবনাই নাই। আশার পরিবর্ত্তে নিরাশা তাহার হৃদয় অধিকার করিল ; কৃতজ্ঞতার স্থান গালি কর্ত্তৃক অধিকৃত হইল। দুই করে সাগরের শান্তসলিলরাশি বিক্ষুব্ধ করিয়া সে নিষ্ফল আক্রোশে চীৎকার করিতে লাগিল। সে তাহার প্রার্থনারই মত অসম্বদ্ধভাবে গালি দিতে আরম্ভ করিল।

গুরুশ্রমে শীঘ্রই তাহার ক্রোধোন্মত্ততা বিদূরিত হইয়া গেল। সে সেই সমুদ্রেরই মত স্থির হইল। সাগরসলিলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিমালাও যেন ঘুমাইয়া স্থির হইয়া পড়িতেছিল। ভীতিবিহ্বল হইয়া সে জাহাজের পশ্চাতে পশ্চাতে কিছু দূর সাঁতরাইয়া গেল। জাহাজের আলো ক্রমেই ক্ষীণতর হইয়া আসিতে লাগিল। মেঘের ফাঁকে ফাঁকে যে দুই চারিটি তারকা উঁকি দিতেছিল, তাহাদেরই মত বোধ হইতে লাগিল।

প্রায় বিশ মিনিট অতিবাহিত হইয়া গেল ;—তাহার শরীর অবসন্ন হইয়া আসিল। সে বুঝিল যে, তাহার উদ্ধারের আর কোনও উপায় নাই। সেই অবসাদের সঙ্গে সঙ্গে সে একটু শান্তিবোধ করিল। তাহার আর সুয়েজ অবধি সাঁতরাইবার প্রয়োজন নাই ; তাহার জন্য আর একটি পথ মুক্ত—সে মরিবে। সে হাত তুলিল—ডুবিল। সে সেই উষ্ণজলমধ্যে নিমগ্ন হইতে লাগিল। তখন আবার মরণাহত হইয়া সে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল ; দুই হস্তে পদে জল বিক্ষুব্ধ করিয়া সে আবার উঠিতে চেষ্টা করিল। বহুকষ্টে সে আবার উপরে উঠিয়া আসিল। কিন্তু উঠিয়াই আবার তাহার হৃদয় হতাশায় পূর্ণ হইয়া গেল। দুই করে জলরাশি সরাইয়া সে তীব্র যাতনায় অস্ফুট স্বরে বলিল, "আর পারি না। ভগবান, আমাকে মরিতে দাও।"

সেই সময় ত্রয়োদশীর চন্দ্র মেঘাবরণের অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া সমুদ্রের উপর আপনার ম্লানোজ্জ্বল কররাশি ঢালিতে লাগিল। জলোপরি প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে একটি ত্রিকোণ বস্তু দেখা গেল, সেখানি জলচর প্রাণীর ডানা। হাঙ্গরটি ধীরে ধীরে তাহার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।

ঈশ্বর তাহার শেষ প্রার্থনা শুনিয়াছিলেন।

নবীন।

নবীন বরষে আজি বৈশাখের দিন
নিরখি অবনীতলে সকলি নবীন।
আকাশে নবীন মেঘ শ্যামলবরণ,
কাননে শ্যামলতর নবীন ভূষণ।
নবীন মুকুলে ফুলে লতা গেছে ছেয়ে,
আনন্দে নবীন তানে পাখী উঠে গেয়ে।
নবীন সমীরে লভি' নব কলেবর
লহরী রূপসী নাচে সরসী উপর।
সাধ যায় হেন দিনে নবীন মধুর
হৃদয়-বীণার তারে বাঁধিবারে সুর।
সাধ যায় বসুধার বসন্ত মতন
জীবনে জাগায়ে তুলি নবীন যৌবন।
পুরাণো এ অশ্রুরাশি করি পরিহার
রচি শুধু নব নব প্রমোদের হার।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

ভারতী। ফাল্গুন ও চৈত্র। প্রথমেই আটচল্লিশ পৃষ্ঠা ব্যাপিয়া "লক্ষ্মীর পরীক্ষা" নামক নাটকাকারে গ্রথিত একটি সুদীর্ঘ পদ্য। মানবচরিত্রের যে দুর্ব্বলতার চিত্র আঁকিবার জন্য লেখক এত বড় চিত্রপট প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা বোধ করি, ইহা অপেক্ষা অল্প-পরিসর ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ হইলে সমধিক সঙ্গত ও শোভন হইত। এই বিপুল পদ্যসমষ্টির কোনও বিশেষত্ব নাই; পক্ষান্তরে, অতিবিস্তৃতিদোষে পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি ও বিরক্তির সঞ্চার হয়। "নিমন্ত্রণ-সভা" প্রবন্ধে লেখক এ কালের ইঙ্গবঙ্গীয় নিমন্ত্রণসভায় কৃত্রিমতার বাহুল্য ও সহৃদয়তার অভাব দেখিয়া দুঃখপ্রকাশ করিয়াছেন। "বৈজ্ঞানিক পিশাচ" প্রবন্ধটি পড়িয়া আমরা নিরাশ হইয়াছি। এবারকার সূচীপত্রে নাম না দেখিলে, ইহা শ্রীযুত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের রচনা বলিয়া বিশ্বাস করিতাম না।—কেন না, এই প্রবন্ধে রামেন্দ্র বাবুর ভাষা আছে বটে, কিন্তু তাঁহার যে বিশেষত্বে আমরা মুগ্ধ, তাহার পরিচয় নাই। বক্তব্য বিষয়ের পরিমাণে প্রবন্ধের কলেবর অনাবশ্যক স্ফীত হইয়া খেলানার বেলুনের মত বাহিরে দিব্য সুগোল ও চক্‌চকে, কিন্তু কাজে অত্যন্ত লঘু হইয়া পড়িয়াছে। শিক্ষানবীশ যখন নির-বচ্ছিন্ন শব্দপ্রয়োগের লোভে, প্রবন্ধকে সাবানের মত ফেনাইয়া বুদ্‌বুদে পরিপূর্ণ করিয়া দেন, তখন তাহা নিতান্ত অস্বাভাবিক মনে হয় না। কিন্তু রামেন্দ্রবাবুর মত এক জন সিদ্ধহস্ত লেখকের হস্তে এইরূপ 'স্ফীতিকরণ-পদ্ধতি'র শ্রীবৃদ্ধি দেখিলে, দুঃখিত—এমন কি—শঙ্কিত না হইয়া থাকা যায় না। "গ্রাম্যসাহিত্য" প্রবন্ধে পাবনা জেলায় প্রচলিত কতিপয় গ্রাম্য ছড়া সংগৃহীত ও তাহার সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে, এবং এই প্রসঙ্গে লেখক নিজের বিস্তর ও দুস্তর কবিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। এই প্রবন্ধে লেখক আর একটি বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন;—তাঁহার মতে, সমাজে যে স্বাধীন প্রেম [অর্থাৎ প্রচলিত দাম্পত্যসম্বন্ধের বিরোধী মানসিক বিকার, সমাজ যাহাকে ব্যভিচার বলে,] "এক বাক্যে নিন্দিত", কাব্যে তাহারও স্থান হইতে পারে। "এই সর্ব্বনাশী, সর্ব্বত্যাগী, সর্ব্ববন্ধনচ্ছেদী প্রেমকে আধ্যাত্মিক অর্থে গ্রহণ করিতে না পারিলে কাব্যহিসাবে ক্ষতি হয় না, নীতিহিসাবে হইবার কথা।' কাব্য কি নীতির বাহিরে?—সমাজ কি কাব্যের ক্রীতদাস? সমাজের বন্ধন, শাসন, শৃঙ্খলা, কাব্যের তুলনায় কি নিতান্তই অনাবশ্যক ও অকিঞ্চিৎকর? আর অবৈধ প্রেমের সমর্থনই কি কাব্যের চরম ও পরম লক্ষ্য? কিন্তু—শান্তিঃ!—আমরা যদিও কাব্যের খাতিরে 'আস্ত' সমাজ ভাঙ্গিয়া চুরমার করিবার পক্ষপাতী নহি, যদিও অতটা কাব্যরসে 'বঞ্চিত এ দাস গোবিন্দ', তথাপি আমরা এ কথা লইয়া তর্ক করিব না। সম্পাদক মহাশয় এই সংখ্যায় "ত্রিদাষ্ট-কাল" নামক কবিতায় কামনা করিয়াছেন,—" * * ধৈর্য্য ধর, হউক সুন্দরতর বিদায়ের

ক্ষণ!" বিদায়ের ক্ষণ সুন্দরতর হওয়াই বাঞ্ছনীয়, অতএব আমরা এই অপ্রীতিকর বিষয়ের আলোচনা পরিহার করিলাম। "ডেলি প্যাসেঞ্জার" প্রবন্ধটি সুখপাঠ্য। "মহারাষ্ট্র- কথা"য় বিশেষ নূতন কিছু দেখিলাম না। "হিন্দুধর্ম্মের অভিব্যক্তি" চিন্তাশীলতার পরিচায়ক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ। "সত্য ঘটনা" একটি ভূতের গল্প,—কিন্তু সত্য। ঘটনাটি অত্যন্ত আশ্চর্য্য! "জামাই-বারিকে"র দুই সতীনের যুদ্ধ বোধ করি অনেক পাঠকের মনে আছে। এই ঘটনাটি তদ্বৎ, প্রভেদ এই যে এক পক্ষ প্রেতিনী, সুতরাং আরও ঘোরাল ও রসাল হইয়াছে। "বিদায়-কাল" ও "বর্ষশেষ" দুইটি কবিতা; প্রথমটি সুন্দর, কিন্তু "বর্ষশেষ" অতি সুন্দর। এই সংখ্যা সম্পাদন করিয়া, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'ভারতী"র সম্পাদকতা পরিত্যাগ করিলেন। "সম্পাদকের বিদায়গ্রহণে" তিনি যথেষ্ট বিনয়সহকারে ইহার কৈফিয়ৎ দিয়াছেন। রবীন্দ্র বাবুর মতে,—"আমাদের দেশের সম্পাদকের পত্রসম্পাদন হালগোরুর দুধ দেওয়ার মত।" —যেখানে হালও বহিতেন, এবং দুধও দিতেন, সেখান হইতে বাহিরে গিয়া তিনি যতটা বুঝিতে পারিতেছেন, যাহারা এখনও লিপ্ত আছে, তাহারা ততটা পারিবে, আশা করা যায় না। তবে আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, তাঁহার এতটা কৈফিয়ৎ দিবার আবশ্যক ছিল না। আমরা সকলে জানি, তিনি Lyric কবি,—তাঁহার Lyrical effortএ তিনি "ভারতী"র জন্য যাহা করিয়াছেন, এই বিদায়ের ক্ষণে, তাহাই একটি লিরিকের মত বোধ হইতেছে। বালক, সাধনা যে পথে গিয়াছে, "ভারতী" যে সে পথের পথিক হয় নাই, ইহাই আমাদের সৌভাগ্য। রবীন্দ্র বাবু উচ্চ প্রতিভার অধিকারী, তিনি তাহার সদ্ব্যবহার করিয়া বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধি করুন; মাসিকের জন্য অনবরত লিখিয়া তাঁহার সাহিত্য-শিল্পের যতটা অবনতি হইয়াছে, তাহা বঙ্গভাষার ক্ষতি বলিয়া গণনা করি।

(**উদ্বোধন।** নূতন পাক্ষিকপত্র। "প্রস্তাবনা"য় স্বামী বিবেকানন্দ লিখিয়াছেন,—"যাহা আমাদের নাই, বোধ হয় পূর্ব্বকালেও ছিল না। যাহা যবনদিগের ছিল, যাহার প্রাণস্পন্দনে ইউরোপীয় বিদ্যুতাধার হইতে ঘন ঘন মহাশক্তির সঞ্চার হইয়া ভূমণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিতেছে, চাই তাহাই। চাই সেই উদ্যম, সেই স্বাধীনতাপ্রিয়তা, সেই আত্মনির্ভর, সেই অটল ধৈর্য্য, সেই কার্য্যকারিতা, সেই একতা-বন্ধন, সেই উন্নতিতৃষ্ণা; চাই,—সর্ব্বদা পশ্চাদ্দৃষ্টি কিঞ্চিৎ স্থগিত করিয়া অনন্ত সম্মুখসম্প্রসারিতদৃষ্টি, আর চাই—আপাদমস্তক-শিরায় শিরায় সঞ্চার-কারী রজোগুণ।" * * * রজোগুণের মধ্য দিয়া না যাইলে কি সত্ত্বে উপনীত হওয়া যায়? ভোগ-শেষ না হইলে যোগ কি করিবে? বিরাগ না হইলে ত্যাগ কোথা হইতে আসিবে? অপর দিকে তালপত্রবহ্নির ন্যায় রজোগুণ শীঘ্রই নির্ব্বাণোন্মুখ, সত্ত্বের সন্নিধান নিত্যবস্তুর নিকটতম; সত্ত্ব প্রায় নিত্য, রজোগুণপ্রধান জাতি দীর্ঘজীবন লাভ করে না; সত্ত্বগুণপ্রধান যেন চিরজীবী, ইহার সাক্ষী ইতিহাস। ভারতে রজোগুণের প্রায় একান্ত অভাব; পাশ্চাত্যে সেই প্রকার সত্ত্বগুণের। ভারত হইতে সমানীত সত্ত্বধারার উপর পাশ্চাত্য জগতের জীবন নির্ভর করিতেছে নিশ্চিত, এবং নিম্নস্তরে তমোগুণকে পরাহত করিয়া রজোগুণপ্রবাহ প্রতি-বাহিত না করিলে আমাদের ঐহিক কল্যাণ যে সমুৎপাদিত হইবে না ও বহুধা পারলৌকিক কল্যাণের বিঘ্ন উপস্থিত হইবে, ইহাও নিশ্চিত। এই দুই শক্তির সম্মিলনের ও মিশ্রণের যথাসাধ্য সহায়তা করা 'উদ্বোধনে'র জীবনোদ্দেশ্য।" ইহা অপেক্ষা আর কোনও মহত্তর উদ্দেশ্য আছে কি না, জানি না। উদ্বোধনের আহ্বানে এই চিরনিদ্রিত জাতি উদ্বুদ্ধ হউক, এই আমাদের আন্তরিক কামনা।—আমরা আর কখনও বিবেকানন্দ স্বামীর বাঙ্গলা রচনা দেখি নাই। শুনিলাম, এই তাঁহার প্রথম রচনা। স্বামীজীর ওজস্বিনী ভাষার নূতন ভঙ্গী ও লীলাগতি দেখিয়া মনে হয়, সত্যই প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী।)
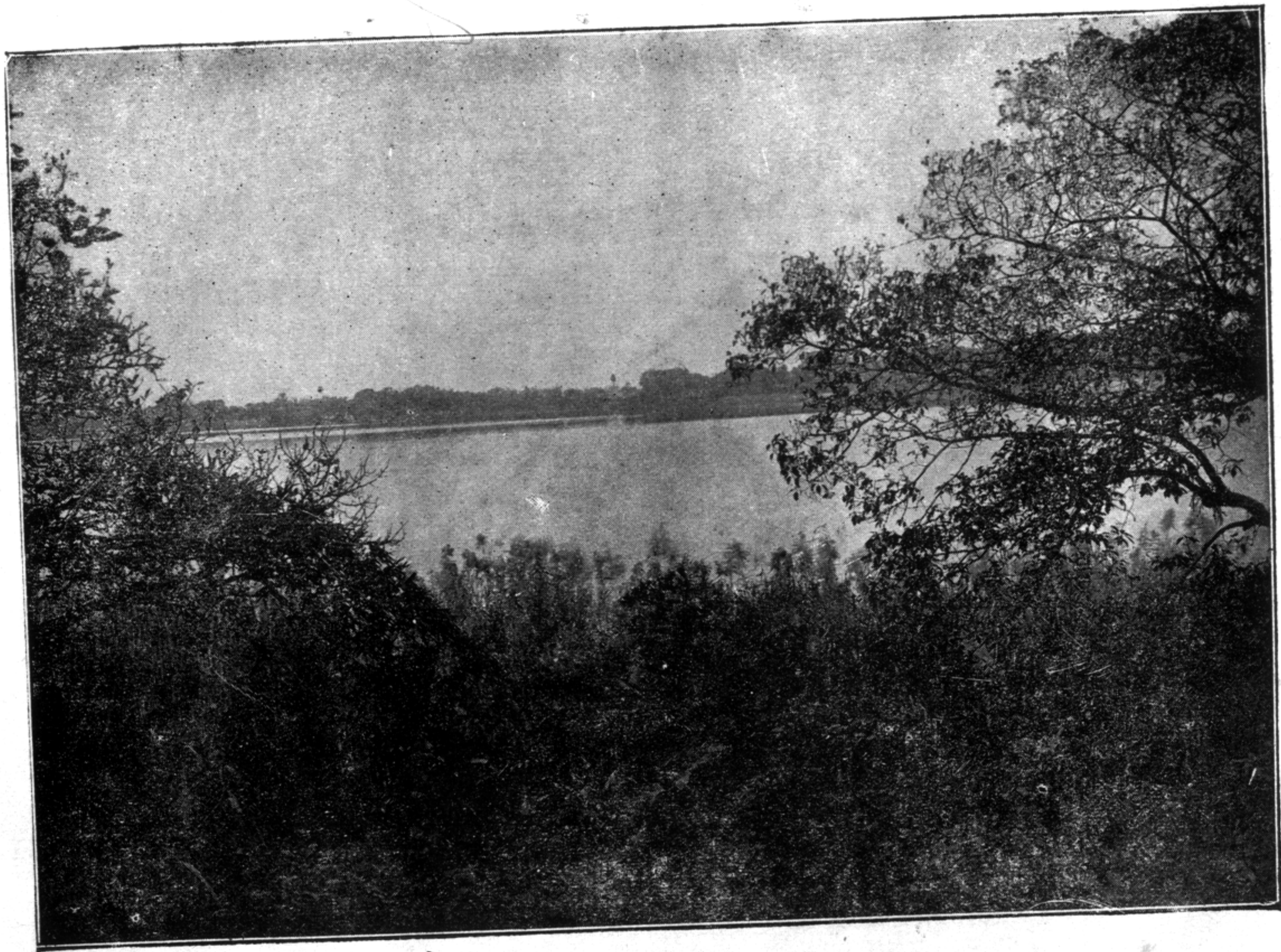
সাগর দীঘি।

Ak 591. 4

উচথ্যের পুত্র দীর্ঘতমা ঋষি।

18 58 12-1900

পূর্ব্বে (১) দীর্ঘতমা ঋষির যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়াছি। তিনি দ্বিজাতিসম্প্রদায়-ভুক্ত এক দল আর্য্য ঔপনিবেশিকগণের ব্রহ্মা বা পুরোহিত ছিলেন ; এবং সেই ঔপনিবেশিকগণের শত্রুপক্ষীয় দাসজাতীয় ত্রৈতন নামক এক ব্যক্তির হস্তে পড়িয়া অতিশয় নিগ্রহ ভোগ করিয়াছিলেন। উক্ত ঔপনিবেশিকগণ আর্য্যাবর্ত্তের কোনও এক নদীতীরে আপনাদের জনপদ স্থাপন করিয়াছিলেন, এবং দীর্ঘতমার সময়ে তাঁহাদের জনসংখ্যা ও জনপদসংখ্যার ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছিল। সেই নদী কোথায় ছিল, তাহা জানা যায় না ; কোন্ সময়েই বা দীর্ঘতমা প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তাহাও সুস্পষ্ট জানা যায় না। তাঁহার পিতা মাতার নামমাত্র জানা যায় ;—তাঁহারা কিরূপ ব্যক্তি ছিলেন, তাহাও জানিবার উপায় নাই।

মনুষ্যের মনের গতি অতি বিচিত্র, তজ্জন্য তাহার জীবনও অতি বিচিত্র। মোটামুটি এই জীবনকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। আমাদের মন, বাক্য ও কায়া, এই তিনটি দ্বারা আমরা বিবিধ কার্য্য করিয়া থাকি। যে সকল কার্য্য কেবল ঐহিক সুখস্বচ্ছন্দতার সাধনেই পর্য্যবসিত হয়, তাহা লইয়া আমাদের জীবনের এক ভাগ গঠিত ; আর যে সকল ক্রিয়া দ্বারা আমরা পারত্রিক শুভলাভের জন্য সচেষ্ট হই, তাহার দ্বারা জীবনের অপর ভাগ গঠিত। এই দুই অংশকে যথাক্রমে মানবজীবনের ঐহিক ও পারত্রিক অংশ বলিলেও বলা যায়।

দীর্ঘতমার জীবনের ঐহিক অংশের বিবরণ অতি সংক্ষিপ্ত। কিন্তু পারত্রিক অংশের বিবরণ যথেষ্ট। তাঁহার রচিত ২৫টি ঋক্‌সূক্ত ঋগ্বেদসংহিতার প্রথম মণ্ডলে নিবদ্ধ হইয়াছে। এই ২৫টি সূক্ত দীর্ঘতমার 'বেদ' বা তত্ত্বজ্ঞানের ভূয়িষ্ঠ পরিচয় প্রদান করিতেছে।

সংহিতার প্রথম মণ্ডলে এই কয়েকটি সূক্তের সংখ্যা ১৪০ হইতে ১৬৪ পর্য্যন্ত। ১৪০ হইতে ১৫০ পর্য্যন্ত ১১টি সূক্তের দেবতা অগ্নি ; ১৫১ হইতে ১৫৩ পর্য্যন্ত ৩টি সূক্তের দেবতা মিত্রাবরুণ ; ১৫৪ হইতে ১৫৬ পর্য্যন্ত ৩টি সূক্তের দেবতা বিষ্ণু ; ১৫৭-১৫৮ এই দুইটি সূক্তের দেবতা অশ্বিদ্বয় ; ১৫৯-১৬০ এই

(১) সাহিত্য ; ১৩০৪ ; ৮ম ভাগ, ৯ সংখ্যা ; ১ম প্রবন্ধ।

দুইটি সূক্তের দেবতা দ্যাবাপৃথিবী ; ১৬১ সূক্তের দেবতা ঋভুগণ ; ১৬২-১৬৩ এই দুটি সূক্তের দেবতা অশ্বমেধের অশ্ব ; আর অবশিষ্ট ১৬৪ সূক্তটি কোনও এক নির্দ্দিষ্ট দেবতার উদ্দেশে রচিত হয় নাই ; ইহা দীর্ঘতমার বিবিধবিষয়িণী চিন্তা,—এবং "অস্যবামীয় সূক্ত" নামে অতিশয় বিখ্যাত।

দীর্ঘতমার সময়ে দ্বিজাতি-আর্য্যসমাজে একটি ঋত্বিকসম্প্রদায় গঠিত হইয়াছিল, এবং ঋত্বিকগণ নানা শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন। ইহারা ঋতুর নিয়ম অনুসারে যজ্ঞ অর্থাৎ দেবার্চ্চনা করিতেন, তজ্জন্য 'ঋত্বিক্' সংজ্ঞা লাভ করিয়াছিলেন। ১৬২। ১৬৩ সূক্ত, যাহার দেবতা অশ্ব, উহা অশ্বমেধযজ্ঞে অশ্বের উদ্দেশে রচিত। ১৬২ সূক্তের পঞ্চম ঋকে সাত শ্রেণীর ঋত্বিকগণের নামোল্লেখ দেখা যায়,—১। হোতা ; ২। অধ্বর্য্যু ; ৩। আবয়া ; ৪। অগ্নিমিন্ধ ; ৫। গ্রাবগ্রাভ ; ৬। শাস্তা ; ৭। সুবিপ্র।

ইহাদের মধ্যে পরবর্ত্তী কালে, আবয়ার নাম প্রতিপ্রস্থাতা, অগ্নিমিন্ধের নাম 'অগ্নীদ্', গ্রাবগ্রাভের নাম 'গ্রাবস্তুৎ', শাস্তার নাম 'প্রশাস্তা', এবং সুবিপ্রের নাম 'ব্রহ্মা' হইয়াছিল। বেদবিৎ মার্টিন হৌগ সাহেব এই কারণে দীর্ঘতমাকে এক জন অতি প্রাচীন ঋষি বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন।

ঋত্বিকগণের মধ্যে যিনি ব্রহ্মবিদ্যায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাঁহাকেই 'সুবিপ্র' বলা হইত। বিপ্র অর্থাৎ মেধাবী, বা বিদ্বান। যিনি সর্ব্বাপেক্ষা শোভনবিদ্যাসম্পন্ন, তিনিই 'সুবিপ্র'। সমগ্র 'ব্রহ্ম' বা 'বেদ' তাঁহার কণ্ঠস্থ। তিনি যেন শরীরধারী মূর্ত্তিমান বেদপুরুষ। তাই অবশেষে তিনি 'ব্রহ্মণ্' বা 'ব্রহ্মা' এই মহীয়সী সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়াছিলেন। তিনি যজ্ঞে অবশিষ্ট সমুদায় ঋত্বিকগণের উপর অধিনায়কতা করিতেন। কোনও বিষয়ে ভ্রম হইলে তিনি তাহার সংশোধন করিতেন। সংশয় হইলে তাহার মীমাংসা করিতেন। দেখা যায়, সুবিপ্রের 'ব্রহ্ম' উপাধি দীর্ঘতমার সময় হইতেই আরব্ধ হইয়াছিল। তিনি নিজে স্বীয় সম্প্রদায়ের সুবিপ্র বা ব্রহ্মপদবী লাভ করিয়াছিলেন, এবং আপনাকে 'ব্রহ্মা' বলিয়া নিজেই উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ইহাতে দেখা যায়, দীর্ঘতমা এক জন ঋত্বিক ছিলেন। এবং বিদ্যাবুদ্ধির গৌরবে ঋত্বিকসম্প্রদায়ের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

দেখা যায়, বিশ্বামিত্রপুত্র মধুচ্ছন্দার সময়ে ঋত্বিকগণ ষোড়শ সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছিলেন। তিনি ইন্দ্রকে বলিতেছেন,—

"গায়ন্তি ত্বা গায়ত্রিনঃ অর্চ্চন্তি অর্কমর্কিণঃ।

এ স্থলে অধ্বর্য্যুগণের উল্লেখ নাই, কিন্তু তদ্ভিন্ন গায়ত্রীগণ অথবা উদ্গাতৃগণের, অর্কিগণ অর্থাৎ হোতৃগণের, এবং ব্রহ্মগণের সুস্পষ্ট উল্লেখ দেখা যায়। অধ্বর্য্যুগণের উল্লেখ না থাকিলেও, প্রমাণান্তরে তাঁহাদেরও অস্তিত্ব উপলব্ধ হয়। তাহাতে কল্পসূত্রে "চত্বারস্ত্রিপুরুষাঃ" বলিয়া যে ষোড়শ ঋত্বিকের উল্লেখ আছে, মধুচ্ছন্দার সময়ে তাঁহাদের সকলেরই আবির্ভাব দেখা যায়। মধুচ্ছন্দা এক জন নবীন ঋষি; অর্থাৎ ঋগ্বেদী ঋষিদের মধ্যে এক জন নবীন ঋষি। (২) তাঁহার সময়ে ঋত্বিকসম্প্রদায়ের শ্রেণীবিভাগসংখ্যার বৃদ্ধি হওয়াও বিচিত্র নহে। ষোল জন ঋত্বিকের মধ্যে চারি জন প্রধান, এবং তাঁহাদের প্রত্যেকের তিন তিন 'পুরুষ' বা সাহায্যকারী বলিয়া অপর দ্বাদশ জন ঋত্বিক নিরূপিত হয়েন। তাহাতেই 'হোতৃগণ', 'উদ্গাতৃগণ', 'ব্রহ্মাগণ', এইরূপ শব্দ মধুচ্ছন্দা কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হইয়াছে।

পক্ষান্তরে, ঋগ্বেদের অনেক স্থানে সপ্ত হোতার উল্লেখ দেখা যায়। কল্পসূত্রে হোতৃশ্রেণীর কেবলমাত্র চারি জন ঋত্বিক দেখা যায়; তবে সপ্তহোতা কাহারা? আমার বিবেচনায়, দীর্ঘতমা যে সাত জন ঋত্বিকের নাম উল্লেখ করেন, ইঁহারাই ঋগ্বেদের সপ্তহোতা। প্রাচীন পারসীক অগ্নি-উপাসকদের মধ্যেও হোতা ও অধ্বর্য্যুর উল্লেখ দেখা যায়; কিন্তু উদ্গাতা ও ব্রহ্মার উল্লেখ দেখা যায় না। ইহাতে বিবেচনা হয়, অপরাপর ঋত্বিকগণের মধ্যে হোতা এবং অধ্বর্য্যুই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। অধ্বর্য্যুগণ বেদীনির্ম্মাণ, কাষ্ঠ-চয়ন, অগ্নিপ্রণয়ন ইত্যাদি কার্য্যের নির্ব্বাহ করিতেন, কিন্তু যজ্ঞের প্রধান কার্য্য যে দেবতার আবাহন, তাহা হোতার দ্বারা সম্পন্ন হইত। সুতরাং অধ্বর্য্যু ও হোতার মধ্যে হোতার কার্য্যই প্রধান। যে কারণেই হউক, দেখা যায়, অতি প্রাচীন কালে হোতা বলিলে যেমন ঋত্বিকবিশেষ বুঝাইত, তেমনই হোতা বলিলে সাধারণ ঋত্বিকও বুঝাইত। অধিকন্তু অধ্বর্য্যুও হোম করেন, তজ্জন্য তিনিও হোতৃশব্দবাচ্য। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে দেখা যায়, "তদাহুর্যদধ্বর্য্যুর্জুহোতি, অথ যোঽনুবাহ যজতি চ কস্মাৎ তং হোতেব ইত্যাচক্ষতে? ইতি"—(১।১।২) সায়নাচার্য্য ইহার ব্যাখ্যা এইরূপ করেন;—"ব্রহ্মবাদিগণ এইরূপ

---

(২) আমি প্রবন্ধান্তরে মধুচ্ছন্দাকে এক জন 'অর্ব্বাচীন' ঋষি বলিয়া বড়ই বিপদ্গ্রস্ত হইয়াছিলাম। কোন কোনও বিচক্ষণ পাঠক সিদ্ধান্ত করেন, আমি মধুচ্ছন্দাকে অর্ব্বাচীন বলিয়া গালি দিয়াছি। তাঁহাদের মনদুঃখনিবারণের জন্য এবারে অর্ব্বাচীন শব্দের প্রতিশব্দ 'নবীন' এই শব্দ ব্যবহার করিলাম। বাঙ্গলা ভাষায় 'অব্রাচীন' বলিলে যে নির্ব্বোধ বুঝায়, তাহা

প্রশ্ন করেন। যে হেতু হোতা হইতে পৃথক্ অধ্বর্য্যু নামক এক জন ঋত্বিক হোম করেন, আর যিনি হোতা, তাঁহার কার্য্য পুরোনুবাক্যা ও যাজ্যা নামক মন্ত্রপাঠ, তবে তাঁহাকে 'অনুবক্তা' বা যষ্টা ঈদৃশ কোন নাম না দিয়া 'হোতা' বলা যায় কেন?" এই প্রশ্নের তাৎপর্য্য এই যে, ক্রিয়া দেখিলে হোতাকে হোতা না বলিয়া অধ্বর্য্যুকেই হোতা বলা উচিত। ইহার মীমাংসা উক্ত ব্রাহ্মণেই এইরূপ দেখা যায়, "যদ্বাব স তত্র যা যা ভাজনং দেবতা অমুম্ আবহ অমুম্ আবহ ইত্যাবাহয়তি তদেব হোতুর্হোতৃত্বং হোতা ভবতি।" ইহাতে সায়ন বলেন যে, হোতা শব্দ জুহোতি ধাতু হইতেও হয়, আবাহয়তি ধাতু হইতেও হয়। অধ্বর্য্যু 'জুহোতি', তজ্জন্য তিনিও হোতা; এবং হোতা 'আবহয়তি', তজ্জন্য তিনিও হোতা। অর্থাৎ, হোতা প্রাচীন ঋত্বিকগণের সাধারণ নাম, এবং কোন এক প্রাচীন সময়ে ঋত্বিকগণের সংখ্যা সপ্ত থাকায়, তাঁহারা 'সপ্তহোতা' বলিয়া সাকল্যে অভিহিত হইতেন। পরে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে পাইতে, ঋত্বিকগণের সংখ্যা অবশেষে ষোড়শ হইয়াছিল। যখন ঋত্বিকগণের সংখ্যা 'সপ্ত', তখন দীর্ঘতমা ঋষি আবির্ভূত হইয়াছিলেন; আর যখন তাঁহাদের সংখ্যা 'ষোড়শ', তখন মধুচ্ছন্দা ঋষি আবির্ভূত হইয়াছিলেন। মধুচ্ছন্দা হইতে দীর্ঘতমাকে প্রাচীন ঋষি বলিতে হয়। (৩)

তৎকালে বেদবেদাঙ্গশাস্ত্রই 'বিদ্যা' বলিয়া পরিগণিত ছিল, এবং বেদাঙ্গের মধ্যে 'জ্যোতিষ' শেষ ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইত। জ্যোতিষে দীর্ঘতমার কিরূপ বিদ্যা ছিল, তাহারই আলোচনা করিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব। (৪)

---

(৩) শ্রীযুত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের মত ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি ১৬৪ সূক্তের টীকায় লিখিয়াছেন;—"এই দীর্ঘ সূক্তে * * * * যেরূপ ভাব ও চিন্তা ও কল্পনা আছে, সেরূপ ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলেই অধিক পরিমাণে লক্ষিত হয়। অথর্ব্ব বেদ প্রায়ই ঋগ্বেদের দশম মণ্ডল ভাঙ্গিয়া রচিত হইয়াছে, কিন্তু অথর্ব্ব বেদে এই সূক্তের সমস্ত ঋক্গুলিই পাওয়া যায়। এই সকল ও অন্যান্য কারণে প্রতীয়মান হয় যে, ঋগ্বেদরচনাকালের শেষভাগে এই সূক্ত রচিত হইয়াছিল।" অন্যান্য কারণ কি, তাহা আমরা স্পষ্ট অবগত নহি; কিন্তু উল্লিখিত কারণে দত্ত মহাশয়ের যেরূপ প্রতীতি জন্মিয়াছে, তাহা ন্যায়ানুগত বোধ হয় না। ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের সমুদয় সূক্তই যে অর্ব্বাচীন, ইহা একটি কল্পনা। আমরা ভূয়ে ভূয়ে নির্দ্দেশ করিয়াছি যে, কালের পৌর্ব্বা-পৌর্ব্ব্য-অনুসারে ঋগ্বেদসংহিতা গঠিত হয় নাই। দশম মণ্ডলের কোনও কোন সূক্তের সহিত দীর্ঘতমার অস্যবামীয় সূক্তের ভাবসাদৃশ্য আছে, এবং ঐ সূক্ত অথর্ব্বসংহিতায় পরিগৃহীত হইয়াছে বলিয়া, দীর্ঘতমাকে এক জন শেষকালীন ঋষি বলিয়া অবধারণ করা যাইতে পারে না। পক্ষান্তরে আমরা যে হেতু নির্দ্দেশ করিলাম, তজ্জন্য তাঁহাকে এক জন অতি প্রাচীন ঋষি বলিয়াই গণ্য করিতে হয়।—লেখক।

(৪) [illegible]

শোভাময়ী।

পদ্য-গল্প।

কি বলিব, গুরুদেব? কি না জানো তুমি?
সংসার-মরুভূ মাঝে মৃগের মতন
জান না কি ফেরে এই নর-পশুপাল?
অজ্ঞান-তমসে লীন, তৃষ্ণায় কাতর,
রৌদ্রতপ্ত পাষাণের স্তূপ, তাই চাহে
শান্তিবারি শ্রমে! অবশেষে আসে মৃত্যু;
প্রাণ দিয়া অভাগারা পায় পরিত্রাণ।
সুন্দর সে বঙ্গরাজ্যে শ্যামল প্রান্তরে
শস্যপূর্ণা নামে গ্রাম, তা'রই একধারে
গৃহ বাঁধি' তব দাস করিত বসতি।
অসীম সংসারে তা'র আপনার জন
কেহ নাহি ছিল আর; শুধু স্নেহশীলা
পুণ্যের প্রতিমা মাতা, ধনীর প্রাসাদে
সোনার প্রতিমা যথা শারদীয় মাসে।
প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে কর্ম্ম হ'তে ফিরি'
ভক্তিদীপে করিতাম তাঁহারই আরতি।
প্রতি রাত্রে প্রীতিভরে শিষ্যের সমান
বসিতাম পাদমূলে; শুনাতেন মাতা
বিস্মৃত পুরাণকথা স্মরণে আনিয়া
পিতৃপিতামহদের অতীতকাহিনী।
করিতেন আশীর্ব্বাদ সাঙ্গ হ'লে কথা,—
"হও, বৎস, সেই তব পিতামহপ্রায়,
উদার, প্রশান্ত, ধীর, গাম্ভীর্য্যে সরল
শিশু সম; ধর্ম্মকার্য্যে যুধিষ্ঠির যেন।
পাই আমি গৃহলক্ষ্মী সাবিত্রীরূপিণী
শ্বশ্রূঠাকুরাণী সমা পুণ্যে পুণ্যময়ী।"
শুনিয়াছি তাঁরই মুখে, সম্মান-গৌরব
ধনজন দাসদাসী চক্রবর্ত্তী-কুলে
এককালে ছিল সব, বিপুল বিভব
হইত বিপুলতর আতিথ্যে ও দানে।
কালের মহিমা কিন্তু কে পারে বুঝিতে
নরলোকে? সর্ব্বহন্তা সব নিল হরি';—
মাথাটি রাখিতে ঠাঁই রহিল না আর।
কত দিনে পরিশ্রম করিয়া কঠোর
সযত্ন-সঞ্চিত বিত্তে তৃণের কুটীর
করিনু নির্ম্মাণ; তা'রই মাঝে শুভক্ষণে
মাতৃদেবতারে আনি' করিনু স্থাপিত।
কেমনে কাটিত দিন কোন্ সুখভোগে
জানেন হৃদয়স্বামী! কি কাজ বলিয়া?
হায় প্রভু! যোগী তুমি অরণ্য-আশ্রয়ী,
সত্য মিথ্যা, ধর্ম্মাধর্ম্ম, প্রকৃতি পুরুষ,
জগতের যুগ্মধারা, ত্রিমূর্ত্তি মহান,
সবই বুঝ, কিন্তু কভু বুঝিবে কি তুমি
কি কষ্টে দরিদ্রে করে অন্ন-আহরণ?—
ভালে তা'র যত ফোঁটা ফুটে স্বেদজল
দিনান্তে ততেক কণা শস্য নাহি মিলে!
এইরূপে গেল কিছুকাল; ভৃত্য তব
বিংশতি বরষে আসি হ'ল উপনীত।
এত যে দারিদ্র্য-দৈন্য বিষাদের ভার—
পুত্রের বিবাহ লাগি মাতৃদেবী মোর
তবু ব্যস্ত সদা। আমি তাঁরে রাখিতাম
বুঝাইয়া। বলিতাম,—"নিদ্রা না ভাঙিতে
অন্ন-চিন্তা যা'রে ক'রে গ্রাস, কন্যাদান
কে করিবে তা'রে?'—দু'দিনে ঘুচিল ভ্রান্তি,
বুঝিলাম, বিধিবরে বঙ্গগৃহে কভু
বধূ আর বালকের হয় না অভাব!
এক দিন নিদ্রা ত্যজি' বর্ষার প্রভাতে
ব'সে আছি মাতৃপাশে। হৃদয়-প্রাঙ্গণে
বিষাদবিতান সম ঘন মেঘরাশি
ছেয়ে আছে ঊর্দ্ধদেশ। অন্ধ বনস্থলী
সিক্ত অশ্রুনীরে যেন। উচ্চ কোলাহলে
হাঁকিছে দর্দ্দুর; বহিতেছে বায়ুরাশি;
ক্ষণে ক্ষণে বজ্রনাদে চকিছে দামিনী;
মাঝে মাঝে ঝম্‌ঝম্ তীব্র বারিধারা।
বলিলা মা,—"শুন, বৎস, যাহা কহি আজি।
এ দেহকুটীরে মোর জীবন-প্রদীপ

ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণতর দেখ দিনে দিনে ;
কে জানে সহসা কবে যাইবে নিবিয়া।
এ বিশ্ব মমতাহীন ; হায় কা'র কাছে
সঁপিয়া যাইব তোরে ? সংসার-সমরে,
স্নেহের পুতলী তুই চির-সুকুমার
নিতান্ত একাকী বৎস, যুঝিবি কেমনে ?
ছিল সাধ, বধূ-রত্নে হেরি' বিমণ্ডিত
গৃহ মোর, যা'ব আমি প্রতিষ্ঠিয়া তোরে
কঠোর জীবন-ব্রতে। হায়, এত দিনে
সে সাধে বিষাদ বুঝি—" কথা না সরিল
দরধারে অশ্রু শুধু ঝরিল নয়নে।
কাতরে কহিনু মায়ে ধরি পা দু'খানি,—
"হে জননী, আজ্ঞা আজি ধরিনু শিয়রে।
পুত্রের অধম আমি তব, অধমের
অপরাধে ব্যথা তুমি পেয়ো না মানসে।
কি ছার দারিদ্র্যজ্বালা ? অশ্রুবিন্দু তব
ঘুচাইতে অগ্নিকুণ্ডে পশি অকাতরে।"
সেই দিন সবিস্ময়ে গোধূলির কোলে
অপূর্ব্ব মুরতিখানি হেরিনু নয়নে।
গিরিরাজ-সুতা উমা কিম্বা সন্ধ্যারাণী,
দেখিলে উপজে ভ্রম ;—কুটীরপ্রাঙ্গণে
স্থিরা সৌদামিনী সম দাঁড়ায়ে বালিকা !
পাইলাম পরিচয়,—নহে সন্ধ্যা উমা
সৌদামিনী। মানবী সে, নাম শোভাময়ী।
শুনেছিনু লোকমুখে—কিন্তু সে সময়ে
সত্য মিথ্যা নাহি জানি—গোলাপকুমারী
মাতা তা'র, নারী-ধর্ম্মে দিয়া বিসর্জ্জন
সহরে করিত বাস ; শিশু কন্যাটিরে
কদাচিৎ দেশ-গৃহে আসিত দেখিতে।
সম্বন্ধ হইলে স্থির, ঘুচাতে সংশয়,
সমাজের সপ্তরথী যা'রা, জিজ্ঞাসিনু
জনে জনে ; মুক্তকণ্ঠে সায় দিলা সবে।
দুষ্টেরা বলিল,—"অর্থদানে পাপীয়সী
বন্ধ করিয়াছে মুখ !"—তাও কি সম্ভব ?
সংসারের কেহ নয় বিধবা কামিনী
সে ভেদিবে সপ্তরথি-ব্যূহ ?—বৃথা দ্বিধা !—
যুক্ত হ'ল দুটি পাণি বিবাহবন্ধনে।
হে নন্দনবনবাসী অনিন্দ্য-সুন্দর
ভুবনবিজয়ী দেব ! অন্ধ অপযশ
কে দিল তোমারে ? অন্ধ নিজে সেই নর।
যত দিন তুমি নাহি এস, তত দিন
অন্ধ মোরা, বদ্ধ দৃষ্টি কলুষ-আঁধারে।
কিন্তু যবে কৃপা করি দিব্য আঁখি দুটি
দাও খুলি, অকস্মাৎ ঘুচে অন্ধকার,
পাই মোরা পূর্ণ দৃষ্টি, হয় প্রতিষ্ঠিত
পুণ্যময় গৃহরাজ্য প্রেমের শাসনে।
বিচিত্র শাসনলীলা ! ক্ষুদ্র সে বালিকা
কোমল মৃণালসম ক্ষুদ্র দু'টি হাতে
ভাঙিয়া গড়িল সব। যে হৃদয় তপ্ত
চিন্তানলে, শান্তি-উৎস প্রবাহিল তাহে।
দারুণ দারিদ্র্য-ঝঞ্ঝা তুষারশীতল
মিলাইল মৃদুমন্দ মলয়-সমীরে।
প্রত্যহ প্রভাতে বালা শয্যা হ'তে উঠি
চাহিত সংসার পানে, অমনি ছুটিয়া
পলাইত যত ক্লেশ, ঢাকিত জগৎ
কণ্টকিত পথরাজি পুষ্প-আস্তরণে।
আহা প্রভু ! ভুলিতে কি পারি প্রথম সে
প্রেমলীলা ?—কিন্তু শুন, পুন বর্ষপরে
উদিল কি কালমেঘ অদৃষ্ট-গগনে।
আষাঢ়ের এক দিন আসিছে ঘনায়ে
গোধূলির অন্ধকার ; শ্বশ্রূঠাকুরাণী
অধমের গৃহদ্বারে আসি দিলা দেখা।
কলুষ চরিত্রে তাঁর কিছুমাত্র আর
ছিল না সংশয়। কিন্তু অপকর্ম্ম ভাবি'
অবজ্ঞা কে করে গুরুজনে ? সসম্ভ্রমে
পূজিলাম পদযুগ ; পাইনু আশীষ,—
"হও, বৎস, চিরসুখী শোভার প্রণয়ে।"
হারে কুহকিনী তুই ! এই কিরে তোর
পূজ্যপূজা-প্রতিফল ? গভীর নিশীথে
দুঃস্বপ্নে ভাঙ্গিল ঘুম। হেরিলাম পাশে
নাই শোভা ! হৃদিদেশ উঠিল শিহরি !
ক্ষিপ্তবৎ গৃহ হ'তে হইনু বাহির।
দুরন্ত অভদ্রা বর্ষা। নিশীথ-আঁধারে
সমাচ্ছন্ন চারিধার। সম্মুখে হেরিনু
রুদ্রমূর্ত্তি দামোদর তাণ্ডব-তাড়নে
প্রলয়প্লাবন সম চলেছে ছুটিয়া।
কোথাও ভাঙিছে তীর, উঠিছে কল্লোল ;
কোথা বা কৃতান্তপ্রায় হানামুখ দিয়া

অবিরল কল কল বহে জলরাশি।
মাঝে মাঝে দূর হ'তে পশিছে শ্রবণে
শুষ্কভেদী আর্ত্তনাদ, কোন্ অভাগার
ভাঙিল আশ্রয়গৃহ ; কিংবা ভাসমান
সাঙ্গ হ'ল লীলা কা'র তরঙ্গ-শয়নে!
মুমূর্ষু প্রিয়ার পাশে প্রিয়তম যথা
কাঁদে বসি, মুহুর্মুহু তেমতি উচ্ছ্বাসে
বহিছে বরষাবায় ; কভু বৃষ্টিধারা
দৃপ্ত দৈত্য জলদের তীরধারা হেন!
"কই শোভা! শোভাময়ী! কোথা প্রাণাধিকে!"
ছুটিলাম বহু পথ ;—ডাকিনু আবার,—
"আছ কি হোথায় প্রিয়তমে ?"—চমকিল
প্রতিধ্বনি, পথহারা নৈশ অন্ধকারে।
শুধু সে নদের বক্ষে চলিত আলোতে
হেরিনু তরণীখানি খরস্রোতোভরে
সর্ব্বস্ব হরিয়া মোর যেতেছে ভাসিয়া।
প্রভাতে ফিরিনু গৃহে। বিশ্ব ম্রিয়মাণ,
দুঃখে ভরা চারিধার! শূন্যে শির'পরি
প্রভাহীন স্তব্ধ নভস্তল,—অভাগার
অদৃষ্ট যেমতি! নিম্নে পদতলে
বসুহীনা বসুন্ধরা রোদন-বিবশা!
চারি মাস অবিশ্রাম করি অন্বেষণ
পাইনু সন্ধান শেষে। সুধাই যাহারে
সেই করে নিবারণ,—"কেন সাধ করি,
আপনার কড়ি দিয়া কলঙ্ক কিনিবে ?"
হায় প্রভু! কোন্ প্রাণে কাপুরুষ সম
ছিঁড়িয়া কণ্ঠের হার বিসর্জ্জিব জলে!
কেমনে হৃদয়হীন পুণ্য-পুতলীরে
ফেলিব কলুষ-গ্রাসে ? নিতান্ত সরলা
দ্বাদশবর্ষীয়া বালা, আনন্দে উদাস
ভালমন্দ কিছু নাহি বুঝে ; পুণ্যময়ী
নিজগুণে জীবনের দীর্ঘ বনপথ
আলোকিত করে শুধু! হায়রে পাষাণ!
তা'রে দিব বলিদান সমাজ-শ্মশানে ?
চূর্ণ হ'ক লোকলাজ, কলঙ্কের ভয়!
সমাজ অতল জলে যাউক ডুবিয়া!
দাঁড়াইয়া রাজদ্বারে কৃতাঞ্জলিপুটে
জানাইনু মরমের ব্যথা। সর্ব্বদর্শী
তুমি গুরুদেব! বুঝিয়াছ চরাচরবদ
স্বর্গ মর্ত্ত্য অখিলের নিখিল নিয়ম,
বিদেশী ব্যবস্থাশাস্ত্র বুঝিবে না তবু।
হে সন্ন্যাসী! অনুভবে পার কি ভাবিতে
পাইনু কি সুবিচার ?—অপ্রাপ্তবয়সী
বালিকা সে, এ বয়সে নহে সমুচিত
স্বামী সহ সহবাস!—হায় শোভাময়ী!
হায় অভাগিনী শোভা! আজও আছে মনে
উদ্ভ্রান্ত করুণচক্ষে চেয়েছিলে যথা
যবে সে পাপিষ্ঠা আসি সবলে ধরিয়া
তোমারে তুলিল যানে। হে নিষ্ঠুর বিধি!
কি পাপে তখনও আমি রহিনু বাঁচিয়া ?
এ কি দৃশ্য গুরুদেব! সন্ন্যাসী যে তুমি!
মুছে ফেল অশ্রুজল! সাজে কি তোমারে
কলঙ্কী জীবের মত দুর্ব্বল রোদন ?
শুন পুন, গৃহে ফিরি, কি করি'নু পরে।
এক দুই তিন করি চারিটি বৎসর
কাটিল বিলাপে। নাশিতে শোকের ব্যাধি
একমাত্র বৈদ্য কাল ; সেই কালবশে
ক্রমশঃ হৃদয়ব্যথা হ'ল প্রশমিত।
গৃহধর্ম্মে দিনু মন। মাতৃ-অনুরোধে
সংসারীর প্রয়োজন স্মরি' পুনর্ব্বার
করিনু বিবাহ ; সুকুমার পুত্রবর
পাইলাম বর্ষ না ফিরিতে। দিনে দিনে
ঘুচিল পূর্ব্বের দুঃখ। করুণা-নয়নে
চাহিলেন কুললক্ষ্মী। দেখিল বিস্ময়ে
দেশবাসী, ক্ষুদ্র সেই কুটীরের ঠাঁই
উঠিল সুন্দরী পুরী। শোভিল সম্মুখে
সরোবর, বিমণ্ডিত মর্ম্মরসোপানে।
চৌদিকে প্রশস্ত ভূমি, কোথাও শোভিত
ঘনশ্যাম দূর্ব্বাদলে,—আস্তরণে যেন!
কোথা বা বিতানে বাঁধা লতাগুল্মরাজি।
সর্ব্বশেষে মনোহর রচিনু উদ্যান।
মহীরুহ-জগতের রতন-ভাণ্ডার
সেইখানে বসাইনু আনি'। রাখিলাম
স্বর্ণাক্ষরে "শোভা" নাম মর্ম্মরে খুদিয়া।
নিত্য শত অভ্যাগত অতিথি স্বজনে
সংসার উৎসবময়। আসিলে ভিখারী
দানপ্রার্থী শূন্যমনে ফিরিত না কেহ।
ভাবিতাম তবু,—"হে বিধাতঃ! ছিনু আমি

অর্থহীন অকিঞ্চন ; দরিদ্রের শিরে
ঐশ্বর্য্যের গুরুভার সহিবে কেমনে ?
জানে না সে ব্যবহার, হ'বে পাপভাগী !"
মধুময় চৈত্রমাস, চাঁদিনী যামিনী।
একাকী উদ্যান মাঝে শুভ্র শিলাসনে
রয়েছি বসিয়া। বিকশিত তরু সব।
স্নিগ্ধ পরিমল ল'য়ে বহিছে মলয়
প্রেমক্লিষ্ট কুসুমের দীর্ঘশ্বাস সম।
সমুখে সরসীবারি শোভিছে সুন্দর
উদ্ভাসিত চন্দ্রালোকে। আকাশপ্রাঙ্গণে
কম্পিছে পাপিয়া-গীত ; তা'রই সাথে কভু
কোকিল বকুলকুঞ্জে উঠিছে কুহরি।
কে জানে সুখের দৃশ্যে কেন অকস্মাৎ
বিষম বিষাদছায়া ছাইল মরমে।
আইল ভাবনা,—"হায়! ভ্রান্তিমদে মত্ত
শান্তির ভিখারী মোরা ফিরি' চিরদিন।
দূরে ইন্দ্রধনু সম রেখেছি সাজায়ে
সমুজ্জ্বল আশা-রাজ্য। যাই, যত যাই,
তবু দূরে, কভু তা'রে পাই না ধরিতে!
অবশেষে শ্রান্তদেহে বসি শিলাতলে
অতীত দিগন্তে চাহি ফেলিতে নিশ্বাস।"
সুদীর্ঘ বরষ দশ গিয়েছে কাটিয়া,
তবু, দেব, হৃদি মাঝে দিব্য মূর্ত্তিখানি
দেখিনু জীবন্ত যেন!—সেই মোহময়
উদাসীন আঁখিযুগ, স্ফুরিত অধর,
নমিত বয়ান-শশী,—পৃথিবীর সাথে
কোন্ অপার্থিব ভাষে আলাপিছে যেন!
মুহূর্ত্তে খুলিল পট,—তৃণের কুটীর,
সেই সে প্রভাতবর্ষা, মাতৃ-অশ্রুজল,
গোধূলি-মিলন-দৃশ্য, বিবাহ-বাসর,
শান্তিময় গৃহধর্ম্ম,—সে সবার মাঝে
দ্বাদশবর্ষীয়া বালা অধিষ্ঠাত্রী দেবী।—
উঠিনু উচ্ছ্বসি'—"কোথা আজি প্রিয়তমে!
বিশ্বশোভাময়ী শোভা!"—
দেখিনু বিস্ময়ে
অপূর্ব্ব ভৈরবী-মূর্ত্তি! পশিল শ্রবণে,—
"আজও শ্রীচরণে দাসী!"—হারানু চেতনা!
কতক্ষণে সংজ্ঞা লভি দেখিনু যোগিনী
অঙ্কে ল'য়ে শিরে মোর পুষ্পদল দিয়া
সিঞ্চিছে সলিল ; স্থূল মুক্তাফলরাশি
ঝরিছে নয়নে!—"ক্ষম মোরে, প্রাণাধিকে,
হায়, আমি নরাধম। সহধর্ম্মিণীরে
কোন্ ধর্ম্ম রক্ষা হেতু দিনু বিসর্জ্জন?
প্রিয়তমে! নিজগুণে ক্ষম পাতকীরে।
চল ফিরি এইবার,—চল শোভাময়ী,—
চল, শূন্য গৃহরাজ্যে তুমি হ'বে রাণী।"
কহিল ভৈরবী,—"আসে নাই সন্ন্যাসিনী
সংসারের আশে। পেয়েছে আশ্রয় দাসী
গুরুর পরম পদ ; তাঁরই আজ্ঞা ল'য়ে
আসিয়াছে আশীর্ব্বাদ করিতে গ্রহণ।
ভাগ্যে নাহি স্বামিসেবা,—আমি অভাগিনী,—
অভাগিনী,—কিন্তু, প্রভু, নহি কলঙ্কিনী।
আট বর্ষ হ'ল আজ সন্ন্যাসিনী-বেশে
ফিরিতেছি বনে বনে। শুনিয়াছে দাসী,
পেয়েছ প্রেমের হারে পুত্র-মধ্যমণি ;—
ছিল সাধ দেখিবার। কিন্তু ক্ষম, প্রভু,
সুখের আকাশে তব লুপ্ত মেঘরাশি
চাহি না তুলিতে আর।"—"না না, প্রিয়তমে!
শোভাময়ী!—ধরি পায়!"—না ফুরাতে কথা
সহসা সে দেবীমূর্ত্তি হ'ল অন্তরিত!
জ্যোৎস্নালোকে বনস্থলী পাঁতি পাঁতি করি'
লাগিনু খুঁজিতে। সুদীর্ঘ বরষ পরে
এসেছে সে স্ব-ইচ্ছায়, কোন প্রাণে মোরে
তেয়াগিবে পুনর্ব্বার?—পরীক্ষামানসে
আছে কোথা লুকাইয়া। অশোকের পাশে
অন্ধকারে ওই বুঝি রয়েছে দাঁড়ায়ে।
লতার বিতানতলে গেল বুঝি সরি'!
হ'ল কি বাহির?—মালতীর মূলে বসি'
ডাকিছে কি মোরে?—কোথা গেল পুনর্ব্বার?
ওই কি পুন্নাগছায়ে রয়েছে শয়ান?—
প্রিয়তমে! এইবার ধরেছি তোমায়!—
সভয়ে হরিণশিশু ছুটিল চমকি',
তরুশিরে [illegible] শাচর উঠিল কাঁদিয়া!—
শোভা! শে[illegible]! নাই শোভা! পোহাল রজনী।
স্নেহময়ী জননীরে জানাইনু সব।
কহিলাম শ্রীচরণে,—"নিতান্ত অভাগা
পুত্র তব, আ[illegible]বন কাটিল বিলাপে।
সংসারে তো[illegible]রে সেবি' শিশুটিরে ল'য়ে

কাটাইতেছিনু কাল ; বিধাতার প্রাণে
তা'ও না সহিল !"—কিম্বা আমি কাপুরুষ,
বৃথা দুষি বিধাতারে! পতঙ্গ যে জন
পুড়িবে সে প্রেমানলে, ইথে দোষী কেবা ?
কিন্তু যে মিহিরধর্ম্মী, ধরে সে হৃদয়ে
বিশ্বের অনলরাশি, নিজের আলোকে
ত্রিজগৎ করে আলোকিত। নাহি দোষ
বিধাতার। বহ্নিমুখে পশিনু আপনি।
"ওরে তুই বৎস মোর! প্রাণের পুতলী!
প্রভাত প্রশান্ত-ছবি! সবই আমি পারি
তেয়াগিতে, তোরে ত্যজি' যাইব কেমনে ?
হয়েছে প্রেমের মৃত্যু ; তা'রই বক্ষ'পরে
তুমি স্নিগ্ধ স্নেহতরু উঠেছে ফুটিয়া,—
কচি কিশলয়, তবু ছায়াতে বিশাল!
তোমারে হেরিয়া মোর জীবন-উদ্যানে
আবার ডেকেছে পিক, বহেছে মলয়,
প্রাণের হিমানীশ্রান্ত শুভ্র ভাবরাশি
সৌন্দর্য্যকিরণে পুন উঠেছে হাসিয়া!
হৃদয়-আনন্দ তুমি! স্বর্গের দেবতা
শিশুরূপে! হায় বৎস, তোমারে ত্যজিয়া
আবার অনলকুণ্ডে পশিব কেমনে ?"
পরিহরি' সুখভোগ সংসার-ভবন
ফিরিলাম বহুদেশ। প্রতি তীর্থভূমি
যশের সৌরভে তা'র হেরিনু প্লাবিত।
নহে আর শোভাময়ী, নরনারী-মুখে
শোভাদেবী গুণগাথা হ'তেছে ধ্বনিত।
জগতের অভিধানে প্রেমের মূরতি
বিরাজিত যত নামে, তটিনী সমান
সকলই মিলিত সেই শোভা-সিন্ধু-মাঝে।
কেহ বা কহিছে কন্যা ; জননী বলিয়া
মুছে অশ্রুধারা কেহ!—আমার সে শোভা
সম্পূর্ণ তা'দেরই যেন, মোর কেহ নহে!
শুনি নাম উচ্চারিত, পঞ্চম-বর্ষীয়
শিশু এক এল ছুটি', কহিল উল্লাসে,—
"দেবী মা! দেবী-মা কোথা ? দেবী-মা আমার
আপনার মা'র চেয়ে ভালবাসে মোরে!"
শুনিলাম লোকমুখে, দেবী-মা তাহার
ব্যাঘ্রমুখ হ'তে তা'রে এনেছে কাড়িয়া!

তিন মাস ছিল শয্যাশায়ী। অতি যত্নে
রুধিনু নয়ন-নীর,—"ধন্য শোভাদেবী!
ধন্য তব স্বার্থহারা আত্ম-বলিদান!
কে ভাঙিবে হেন পুণ্যব্রত ?"—কিন্তু, হায়,
আমি যে প্রলয়মুখে চলেছি ভাসিয়া।
শুনিলাম, শোভাদেবী এক স্থানে কভু
নহে স্থির। সন্ন্যাসিনী যথেচ্ছ ভ্রমণে
কবে আসে কবে যায়, কেহ নাহি জানে।
অবশেষে শান্তিপ্রিয় প্রিয়শিষ্য তব
দিলা কহি পবিত্র আশ্রমপথ। ধরি'
সেই পথ, অতিক্রমি' কানন-কান্তার
পাইনু কনকজঙ্ঘা,—সৌন্দর্য্য-শোভায়
দ্বিতীয় কৈলাস সম হিমশৈল-শিরে।
দেখিলাম বনস্থলী,—বসন্তবিকাশে
শ্বেত পীত রক্ত পুষ্পে শ্যাম কিশলয়ে
স্বর্গীয় বিচিত্র বেশ! কোথা নব নব
বিহঙ্গম গাহে সুমধুর ; ঝাঁকে ঝাঁকে
উড়িছে ফিরিছে পুন বসিছে শাখায়।
কোথা বা নির্ঝর ঝরি' অস্ফুট আরাবে
শিলা হ'তে শিলান্তরে নাচিয়া নাচিয়া
লভিছে সুসমতল,—রজতের রেখা
বহিছে মিশিছে শেষে দিগন্ত-শয়নে।
মাঝে মাঝে গিরিশৃঙ্গ ঊর্দ্ধে মেঘ পানে
রয়েছে চাহিয়া ;—জগতের মর্ম্মব্যথা
জগতের অধিরাজে জানাইছে যেন
যুগযুগান্তর ধরি' !—হায় গুরুদেব!
এ বিশাল শান্তিরাজ্য করি' পরিহার
অন্ধ কারাগৃহে পুন কে চাহে পশিতে ?
সারাদিন অবিশ্রাম ঘুরিয়া ঘুরিয়া
পাই নাই পথশেষ। অতি সাবধানে
এই উঠি ঊর্দ্ধপানে, দেখিতে দেখিতে
পুনর্ব্বার সানুমূলে হই উপনীত ;—
কভু ঊর্দ্ধে কভু নিম্নে কভু সমতলে।
অবশেষে শক্তিহীন ক্ষুধাতৃষ্ণাতুর
অর্দ্ধ-অচেতন প্রায় পড়িনু বসিয়া।
আইল গোধূলি। কিন্তু ও কি গিরিশিরে ?
নহে ত পূর্ণিমা-শশী!—নামি' ধীরে ধীরে
সমুখে শোভিল আলোরাশি! দেখিলাম

গৈরিক বসন, কণ্ঠে রুদ্রাক্ষ-মালিকা।
নিমীলিনু নেত্রযুগ। লাগিনু দেখিতে
ধ্যানযোগে সেই মূর্ত্তি মহিমামণ্ডিত।
নহি ত নিদ্রিত আমি,—নহে ত স্বপন?—
শুনিলাম,—"হে সংসারী! এস মোর সাথে।"
চলিলাম মন্ত্রমুগ্ধ; উঠিলাম ক্রমে
উৰ্দ্ধে—আরও উৰ্দ্ধে। অকস্মাৎ জ্যোতির্ম্ময়ী
দাঁড়াল ফিরিয়া,—সৌম্যশান্ত আঁখিযুগ
বদ্ধদৃষ্টি মোর মুখোপরি। চন্দ্রালোকে
উদ্ভাসিত চারি ধার। সুপ্ত দশ দিক।
শুধু দূরে শূন্যে কোথা উঠিছে কাঁপিয়া
ভীমরব, প্রতিবদ্ধ পর্ব্বত-গহ্বরে।
শুধু সন্নিকটে এক হেরিনু সঙ্কট,
তমোময়ী যমপুরী যেন! গুরুদেব!
এখনো চমকে প্রাণ কাঁপে কলেবর
স্মরিলে সে ভীমদৃশ্য অমা-অন্ধকার।

দাঁড়াইল দেববালা। দেখিনু বিস্ময়ে
প্রফুল্ল কপোল বহি ঝরে দরধারা;—
যোগিনী তবুও স্থির প্রশান্তমূরতি!
"প্রিয়তম! প্রাণাধিক! স্বামিন্! দেবতা!
নির্ভয়ে বলিব আজ;—বুঝিবে কি তুমি
কি কষ্টে এ কালানল রেখেছি চাপিয়া?
পবিত্র সন্ন্যাসব্রত গুরু-উপদেশ
সবই হয়ে গেছে ছাই! তাই পাপীয়সী
দশ বর্ষ পরে পুন ধাইল মরিতে
সুখের প্রদীপ তব এল নিবাইয়া।
কিন্তু ক্ষম এ দাসীরে। গুরুর সকাশে
শুনিয়াছি, জন্মান্তর-গত পাপহেতু
স্বামিসেবা নাহি এ কপালে। অমঙ্গল
ঘটিবে তোমার, কিম্বা অপমৃত্যু নিজ,
পুনর্ব্বার ঘটিলে মিলন। সে কারণে
ওই পদাশ্রয় প্রভু এসেছি ছাড়িয়া।
কাঁদিলে ডাকিলে তুমি, তবুও পাষাণী
এসেছি ছাড়িয়া!—" পড়িলাম পদতলে,
কহিনু উচ্ছ্বাসে, "প্রাণাধিকে! রত্ন যদি
পেয়েছি কুড়ায়ে, আর আমি যাবনা'ক
ফেলি'। চল যাই গৃহে ল'য়ে। নিতান্তই
মরি যদি, শোভা মোর, মরিব দু'জনে।"—
"না, না, প্রভু! কৃপা করি ছুঁয়ো না দাসীরে।
বলি আমি, শুন তবে প্রাণের বাসনা।
পূর্ব্বজন্মপাপরাশি করিতে মোচন,
ঘুচাতে অশুভ তব মরিব আপনি!
চল যাই গুরুদেব পাশে। কন্যাসম
স্নেহ তাঁর মোর প্রতি। মাসাবধি পিতা
নিয়ত নিরত স্বস্ত্যয়নে। চল যাই,
শ্রীচরণে জানাইব সব।"—"দূর কর,
প্রিয়তমে, ভ্রান্ত এ ভাবনা! মরি যদি
সংসার সেবিয়া, সেও ভাল।"—ক্ষিপ্তবৎ
প্রসারিনু বাহুযুগ। বিদ্যুৎচকিতা
চমকি' উঠিল বালা; স্খলিতচরণ
সহসা পড়িল সেই সঙ্কট-গহ্বরে!

নির্ম্মম সন্ন্যাসী তুমি! ছি ছি গুরুদেব!
কেন এই নরাধমে রাখিলে রুধিয়া?
এত অনুগ্রহ যদি,—সর্ব্বদর্শী তুমি;—
মুহূর্ত্ত পূর্ব্বাহ্নে তবে কেন নাহি এলে?
সৃষ্টির প্রারম্ভ হ'তে সংসার-প্রাঙ্গণে
অন্তহীন শোকনাট্য হয় অভিনীত।
আসে দলে দলে লোক বক্ষ বিদারিয়া
করে আর্ত্তনাদ, অবশেষে স্বপ্নবৎ
মরণের অন্তরালে নীরবে মিশায়।
নিঠুর দেবতাবৃন্দ বসিয়া বিলাসে
দেখে তাই চিরদিন! হায় ব্রহ্মচারী,
তুমিও কি সেইরূপ বসেছ হেথায়?

ক্ষম অপরাধ প্রভু! রিপুদাস মোরা
ক্রোধে মত্ত কি যে কহি পাই না ভাবিয়া।
প্রণয়ের পরিণাম যাহা দেখেছিলে
দিব্যচক্ষে, সংসারে তা' ঘটিছে নিয়ত,—
অপমৃত্যু আত্মহত্যা আজন্ম-বিলাপ!
নিতান্ত সরলা শোভা, স্বামি-প্রেমবশে
বুঝিল সে বিপরীত। নহ দোষী তুমি।
হায় গুরুদেব! এইরূপ ভ্রান্তিঘোরে
চিরদিন ঘুরে মর্ত্ত্যবাসী;—নাহি জ্ঞান,
একমাত্র পদক্ষেপ করে নিরাপদে।
ক্ষম অপরাধ, প্রভু, ত্যজিনু বিলাপ।
পেয়েছি পবিত্র শিক্ষা;—অশুভে হেরিয়া
বিলাপ যে করে শুধু, মূঢ় সে অলস;
ধন্য সেই, শুভ-আশে যে করে সাধনা।
এ বিশাল বিশ্বরাজ্য যাঁর প্রেমব্রত

করিছে পালন, তাঁরই প্রিয় শিশু মোরা।
নহি ত ভরসাহীন। জানি এক দিন
টুটিবে সংশয়জাল, ঘুচিবে আঁধার,—
স্বর্গ মর্ত্ত্য হ'বে বদ্ধ বিবাহ-বন্ধনে।
এস মোরা ততদিন—সংসারী সন্ন্যাসী,
কি বিরাগী অনুরাগী—সবাই মিলিয়া
সাজাই এ কন্যারত্ন ব্রহ্মাণ্ডরূপিণী
জ্ঞান কর্ম্ম ভক্তি মুক্তি বিবিধ ভূষণে।

আছে এক ভিক্ষা আর। অনুমতি দাও
তব দাসে, যেখানে সে প্রতিমা তুলিয়া
করিলে অনলসাৎ, নিজ যোগাশ্রম
রচিলে নবীন, সেইখানে মাঝে মাঝে
সারিয়া সংসার-কাজ আসিব পূজিতে
পদযুগ। আশীর্ব্বাদ কর এই বার,
আজ্ঞা ল'য়ে পুনর্ব্বার পশিব ভবনে।

লক্ষ্মণ সেন।

বক্তিয়ার খিলিজির নবদ্বীপবিজয় হইতেই এত দিন বাঙ্গলার ইতিহাস লিখিত হইত। এখন প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের অদম্য অধ্যবসায় ও অক্লান্ত পরিশ্রমে তৎপূর্ব্ববর্ত্তী কয়েক শতাব্দীর বিবরণপূর্ণ কয়েকটি অধ্যায় বাঙ্গলার ইতিহাসারম্ভে সংযোজিত হইতেছে। এক্ষণে মিনহাজউদ্দীনের লছমনিয়াকে লাক্ষ্মণেয় বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার জন্য প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধায়িগণকে কষ্টকল্পনার আশ্রয় লইতে হয় না; পাদরী মার্শম্যান প্রভৃতি সপ্তদশ অশ্বারোহী কর্ত্তৃক বঙ্গ বিজিত হইয়াছিল, এই যে অতিরঞ্জিত কাহিনী রচিয়া গিয়াছেন, তাহাও সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিবার আবশ্যক নাই। প্রকৃতপক্ষে এখন ঐতিহাসিক গবেষণায় সুপ্রমাণিত হইয়াছে যে, স্বীয় প্রাণ ও স্বজনগণের মানরক্ষার মমতায় হিন্দুরাজলক্ষ্মীর ভাগীরথীগর্ভে চির-বিসর্জ্জনজনিত কলঙ্কে ও কলুষে লক্ষ্মণ সেনই কলঙ্কিত ও কলুষিত; এবং কল্পনাপ্রসূত কোনও লাক্ষ্মণেয়ের স্কন্ধে তাঁহার গুরুভার পাপরাশির আরোপণ একান্ত অনৃতদুষ্ট ও সর্ব্বাংশে অসঙ্গত।

চন্দ্রবংশীয় সেনরাজগণের মধ্যে বিজয় সেন সমধিক প্রসিদ্ধ। ইনিই গৌড়-মণ্ডলে সেন-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। বাঙ্গলার ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণের মধ্যে কৌলীন্যপ্রথার প্রবর্ত্তক স্বনামখ্যাত বল্লাল সেন ইঁহার পুত্র, এবং বখ্‌তিয়ার-ভয়ে পলায়নকারী লক্ষ্মণ সেন তাঁহার পৌত্র। বিজয় সেন দেব কোন্ সময়ে গৌড়ভূমিতে আপন শাসনদণ্ড নিহিত করেন, তাহা জানা যায় না; তবে ইহ স্থির হইয়াছে যে, গৌড়ের রাজসিংহাসন করতলস্থ হইবার অনতিকাল পরেই তাঁহার শিবলোকে গতি হইয়াছিল। বিজয় সেনের পর বল্লাল সেন গৌড়েশ্বর

গৌড়েশ্বর বল্লাল সেন এ যাবৎ কেবল কৌলীন্যপ্রথার প্রবর্ত্তক বলিয়া পরিগণিত হইতেছিলেন, কিন্তু এক্ষণে তাম্রশাসনাদির আবিষ্কার ও পুরাতত্ত্বের আলোচনাফলে আমরা জানিতে পারিতেছি যে, বল্লাল সেন দেব এক জন প্রবলপ্রতাপ রণকুশল নরপতি ছিলেন, এবং গৌড়রাজ্যের পার্শ্ববর্ত্তী মিথিলাদি জনপদ অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি যখন মিথিলাবিজয়ে নিরত, সেই সময়ে লক্ষ্মণ সেন দেব ভূমিষ্ঠ হন। মিথিলাবিজয় হইতে প্রত্যাগমনে বিলম্ববশতঃ জনশ্রুতির রসনায় বল্লালের পরলোকবার্ত্তা প্রচারিত হওয়ায়, লক্ষ্মণ সেন দেব আজন্ম রাজা বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন, এবং সম্ভবতঃ এই জনশ্রুতিই শাখা-পল্লবিত হইয়া তবকৎনসিরির লক্ষ্মণ সেনের জন্মবিষয়ক অদ্ভুত উপাখ্যানের সৃষ্টি করিয়াছে।

খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে (সম্ভবতঃ ১১০৮ খৃষ্টাব্দে) লক্ষ্মণ সেনের জন্ম হয়। সেই বৎসরেই বল্লাল সেন কর্ত্তৃক মিথিলা বিজিত হয়। এই বৎসরেই তাঁহার পরলোকবার্ত্তা অসত্য বলিয়া প্রমাণিত ও নবরাজকুমারের জন্মগ্রহণে রাজপ্রাসাদ আলোকিত হয়। আমার বিশ্বাস,—মহারাজ গৌড়েশ্বর বল্লাল সেন দেব সেই বৎসরকে শুভ সংবৎসর গণ্য করিয়া, স্বীয় পুত্ররত্নের নামানুসারে, নব "লক্ষ্মণ-সংবৎ" প্রচলিত করেন। মিথিলাপ্রদেশে লক্ষ্মণ-সংবৎ (লং সং) এখনও ব্যবহৃত হয়।

লক্ষ্মণ সেন বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, বল্লাল সেন চন্দ্রসূর্য্যবংশীয় ক্ষাত্র নরপতিগণের পথানুসরণ করিয়া তাঁহাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেন, এবং স্বয়ং শাস্ত্রালোচনে ও ধর্ম্মানুশীলনে প্রবৃত্ত হন। লক্ষ্মণ সেনের যৌবরাজ্যাভিষেকের পর (১১৬৯ খৃঃ) বল্লাল সেন দানসাগর নামক গ্রন্থরচনা করেন, এবং এই সময়ে তিনি সম্ভবতঃ পণ্ডিতমণ্ডলীতে পরিবেষ্টিত হইয়া নবদ্বীপে কালযাপন করিতেন। বোধ হয়, এই সময় হইতেই দেবী সরস্বতীর পাদপীঠ বলিয়া নবদ্বীপের ভাবী গৌরবলাভের প্রথম পত্তন হয়। লক্ষ্মণ সেন অষ্টাদশ বর্ষ বয়সের সময় যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হন, এরূপ অনুমান করিলে, বিশেষ ঐতিহাসিক ভ্রম হইবে না।

বল্লাল সেনের সময় গৌড়রাজ্যের সীমা বর্ত্তমান রাজসাহী, ঢাকা, প্রেসিডেন্সি, বর্দ্ধমান, ভাগলপুর ও পাটনা বিভাগের পূর্ব্বাংশের বহির্ভাগে বিস্তারিত ছিল, এমন বোধ হয় না। লক্ষ্মণ সেনের সময় তাঁহার সমর-বিজয়িনী অনীকিনীর প্রভাব উক্ত চতুঃসীমার বহির্ভাগেও অনুভূত হইয়াছিল। বাখরগঞ্জে প্রাপ্ত তাম্রশাসনে জানা যায় যে শ্রীক্ষেত্র, বারাণসী ও প্রয়াগধামেও

লক্ষ্মণ সেনের বিজয়স্তম্ভ ও যজ্ঞযূপ নিহিত হইয়াছিল। লক্ষ্মণ সেনের রাজ্য যে পুরী ও প্রয়াগ পর্য্যন্ত বিস্তারিত হইয়াছিল, কেহ কেহ তাহা বিশ্বাস করিতে চাহেন না। কারণ, লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বকালেই প্রয়াগ ও বারাণসী-ধাম কান্যকুব্জপতিগণের শাসনাধীন ছিল, ইহার প্রমাণ পওয়া যায়। কিন্তু লক্ষ্মণ সেন ন্যূনাধিক অর্দ্ধ শতাব্দী কাল রাজত্ব করেন। এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে উক্ত তীর্থস্থানগুলি প্রথমতঃ কান্যকুব্জের অধীন ছিল; এবং পরে লক্ষ্মণ সেন কর্ত্তৃক বিজিত হইয়া উক্ত তাম্রশাসনের বিষয়ীভূত হইয়াছিল,—ইহা কোন মতেই অসম্ভব বা বিচিত্র ব্যাপার বলিয়া বোধ হয় না। বিশেষতঃ, গৌড়েশ্বরের অমিত সামরিক বলের সংবাদ যে সেই সময়ে কান্যকুব্জপতি গোবিন্দচন্দ্রের কর্ণগোচর হইয়াছিল, তাহা তাঁহার হম্মীর-পরাজয়-সংক্রান্ত ১১৬৬ সংবতের শাসনপত্রপাঠেই অবগত হওয়া যায়।

লক্ষ্মণ সেন যৌবনকালে যে ক্ষত্রজনোচিত বলবীর্য্যসম্পন্ন ছিলেন, তাহা তৎপুত্র কেশব সেনের প্রদত্ত প্রশস্তিলিপিপাঠেই অনুমিত হয়। করিশুণ্ডো-পম বাহুবল্লী, পাষাণদৃঢ় বক্ষোদেশ, এবং অরিপ্রাণহর শরনিকর ও মদস্রাবী কুঞ্জরযূথ সতত সমর-প্রাঙ্গণে যাঁহার প্রীতিবর্দ্ধন করিত, তিনি শৌর্য্যবিহীন ছিলেন না; যাঁহার রাজধানীতে প্রত্যূষে শৃঙ্খলিত রাজন্যগণের নিগড়ধ্বনি ও মধ্যাহ্নে করভকুলের গল-লগ্ন ঘণ্টারব নভস্তল শব্দায়মান করিত, তিনি হীনবল নরপতি ছিলেন, ইহা বিশ্বাস করা যায় না। লক্ষ্মণ সেনের নৌবল ও অশ্বারোহী সৈন্যও ছিল। ফলতঃ, বল্লাল সেনের পর লক্ষ্মণ সেন অন্ততঃ কিছুকালও যে গৌড়রাজ্যের সামরিক প্রভাব ও পিতৃপিতামহের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন, সে বিষয়ে প্রমাণের অভাব নাই। তবে ইহা নিশ্চিত যে, লক্ষ্মণ সেনের সময়ে, সমরক্ষেত্রমাত্রেই বা সকল অভিযানেই তাঁহার সৈনিকবৃন্দ গৌড়ের বিজয়পতাকা সমভাবে উন্নমিত রাখিতে সক্ষম হয় নাই। ত্রিপুরার ইতিবৃত্তপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, ত্রিপুরাপতি সিংহ তুঙ্গফার রাজত্বকালে, আরাকান-রাজের প্রেরিত গৌড়েশ্বরের উপঢৌকন-দ্রব্যাদি ত্রিপুরাপতির সেনাগণ কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হয়, এবং গৌড়েশ্বর তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া ত্রিপুরা আক্রমণ করিবার জন্য সৈন্য প্রেরণ করেন। সেই যুদ্ধে ত্রিপুরাপতি কাপুরুষবৎ পশ্চাৎপদ হন, কিন্তু বীরবালা রাজমহিষী ত্রিপুরেশ্বরী দাক্ষায়ণী স্বয়ং ত্রিপুর-সৈন্যদল পরিচালিত করিয়া গৌড়ীয় সেনাদলের সহিত

সম্ভবতঃ বাঙ্গালী রমণীগণের মধ্যে একমাত্র বীরবালা। সম্মুখসমরে সৈন্যচালনা বাঙ্গালী ললনার মধ্যে দাক্ষায়ণী দেবীই সম্ভবতঃ প্রথম করিয়াছেন। রাজ্ঞী দাক্ষায়ণী দেবী বাঙ্গালীর গৃহে প্রাতঃস্মরণীয়া ও গৌড়বঙ্গে সর্ব্বত্র অর্চ্চনীয়া।

লক্ষ্মণসেনের তাম্রশাসন কয়েকখানি হইতে তাঁহার রাজত্বকালের সর্ব্বোচ্চ রাজপুরুষগণের পদের নামোল্লেখ পরিদৃষ্ট হয়। এই সকল নাম হইতে তাঁহার রাজত্বকালের শাসনপ্রণালী ও দেশের অবস্থা কিয়ৎপরিমাণে বুঝিতে পারা যায় বলিয়া, এ স্থলে উক্ত পদগুলির নাম প্রদত্ত হইতেছে,—

(১) মহাধর্ম্মাধ্যক্ষ = রাজ্যের সর্ব্বপ্রধান বিচারপতি।
(২) মহাসান্ধিবিগ্রহিক = সন্ধিবিগ্রহকার্য্যে নিযুক্ত প্রধান মন্ত্রী।
(৩) মহাসেনাপতি = সর্ব্বপ্রধান সেনাপতি।
(৪) মহামুদ্রাধিকৃত = রাজ্যের টাঁকশালের প্রধান অধ্যক্ষ।
(৫) অন্তরঙ্গ = গুপ্তমন্ত্রণায় নিযুক্ত মন্ত্রী।
(৬) বৃহদুপরিক = রাজস্নানাগারের প্রধান অধ্যক্ষ।
(৭) মহাক্ষপটলিক = দ্যূতক্রীড়ার প্রধান তত্ত্বাবধায়ক ও করগ্রাহক।
(৮) মহাপ্রতীহার = দ্বারবান্‌গণের অধ্যক্ষ।
(৯) মহাভেটনিক = রত্নাদি রাজভোগ্য মহামূল্য বস্ত্রসমূহের ভারপ্রাপ্ত প্রধান কর্ম্মচারী।
(১০) মহাপীলুপতি = হস্তিসমূহের প্রধান তত্ত্বাবধায়ক।
(১১) মহাগণস্থ = সৈন্যদলবিশেষের প্রধান অধিপতি।
(১২) দৌঃসাধিক = পূর্ত্তকার্য্যের তত্ত্বাবধায়ক।
(১৩) চৌরোদ্ধরণিক = প্রধান শান্তিরক্ষক।
(১৪) নৌবল-হস্ত্যশ্ব-গোমহিষাজাবিকাদি-ব্যাপৃতক = নৌসেনা, হস্তী, অশ্ব, গো, মহিষ, মেষ ও ছাগসমূহের তত্ত্বাবধায়ক।
(১৫) গৌল্মিক = গুল্মের অধিনায়ক। [৯ হস্তী, ৯ রথ, ২৭ ঘোড়া, ৪৫ পদাতি লইয়া এক গুল্ম গঠিত হয়।]
(১৬) দণ্ডপাশিক = যাঁহার তত্ত্বাবধারণে দণ্ড প্রদত্ত হয়।
(১৭) দণ্ডনায়ক = দণ্ডবিধাতা।

এই সকল পদের নাম হইতেই লক্ষ্মণ সেনের সমসাময়িক গৌড়ের ঐশ্বর্য্য, শাসনপ্রণালী ও সামরিক শক্তির আভাস পাওয়া যায়। মহাভারত ও হরিবংশে বর্ণিত আছে, পুণ্ড্রপতির সহস্র সহস্র হস্তী ছিল। সেনরাজবংশীয়গণের তাম্রশাসনে মহাপীলুপতি নামক কেবল হস্তিসমূহের জন্য একজন তত্ত্বাবধায়ক ছিল, এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়। আর কান্যকুব্জরাজ গোবিন্দচন্দ্রের তাম্রশাসনে, গৌড়েশ্বরের দুর্ব্বার কুঞ্জরযূথের বর্ণনা আছে। ইহাতে প্রতীত হয় যে, বহু প্রাচীন কাল হইতেই পৌণ্ড্র ও গৌড়রাজগণের প্রবল হস্তিবল ছিল। রঘুবংশে কালিদাস রঘুর দিগ্বিজয়বর্ণনাকালে বঙ্গরাজগণের রণতরীর উল্লেখ করিয়াছেন, এবং আবুলফজল-প্রণীত আইন-আকবরী গ্রন্থেও বঙ্গরাজগণের নৌবলের উল্লেখ আছে। ইহাতে বোধ হয় যে, বাঙ্গালীগণ বহু প্রাচীন কাল হইতেই নৌযুদ্ধে কুশল ছিলেন।

লক্ষ্মণ সেনের সময়ে গৌড়রাজ্য কতকগুলি ভুক্তিতে, ভুক্তি সকল মণ্ডলিকায়, এবং মণ্ডলিকা শাসনে বিভক্ত ছিল। ভুক্তিগুলিকে এক একটি পরগণা, এবং মণ্ডলিকাগুলিকে তদধীন তোক ইত্যাদি বলিয়া ধরা যাইতে পারে। প্রত্যেক শাসনের অধীনে গ্রাম ছিল। পৌণ্ড্রবর্দ্ধন বিজিত হইবার পর গৌড়রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া একটি ভুক্তির অধীন হইয়াছিল, এবং সেই ভুক্তি পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নামে অভিহিত হইয়াছিল।

উপরি-উক্ত রাজপুরুষগণের নামের অগ্রভাগে, 'মহা' শব্দ আছে; তাহা হইতে বোধ হয় যে, ভুক্তি ও শাসনাদিতে অধস্তন চৌরোদ্ধরণিক, অধস্তন পীলুপতি, বিচারকর্ত্তা, দণ্ডদাতা ইত্যাদি পদও বিদ্যমান ছিল।

লক্ষ্মণসেনের তাম্রশাসনোক্ত মহাক্ষপটলিক নামক পদের উল্লেখ দেখিয়া অনুমান হয় যে, সে সময়ে রাজ্যমধ্যে দ্যূতক্রীড়া অত্যন্ত প্রচলিত ছিল, এবং তজ্জনিত অশান্তির নিবারণকল্পে এই পদের সৃষ্টি অত্যন্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছিল। সম্ভবতঃ, মহাক্ষপটলিকের অধীন ভুক্তি ও শাসনাদিতেও অধস্তন দ্যূতক্রীড়াপরিদর্শকগণ নিযুক্ত হইতেন।

লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বকালে প্রধান মন্ত্রীর পদে উমাপতিধর, ধর্ম্মাধ্যক্ষের পদে হলায়ুধ মিশ্র, মহাসামন্তের পদে বটুদাস, মহামাণ্ডলিকের পদে বটুদাসের পুত্র শ্রীধরদাস, মহাসন্ধিবিগ্রহিকের পদে নারায়ণ দত্ত নিযুক্ত ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে বটুদাস, শ্রীধরদাস ও নারায়ণ দত্ত সম্ভবতঃ কায়স্থ ছিলেন। লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বকালে কায়স্থগণ অত্যন্ত প্রভাবশালী ছিলেন ও শাসনবিভাগীয় রাজপদ সকল তাঁহাদেরই একচেটিয়া ছিল।

লক্ষ্মণ সেনের শাসনকালের প্রথম ভাগেই যুদ্ধবিগ্রহ সংঘটিত হইয়াছিল, এবং তাঁহার রাজত্বের প্রথম কয় বৎসরের মধ্যেই তিনি যৌবন-সুলভ শৌর্য্যবীর্য্যাদিপরিচায়ক অভিযানাদিতে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণ সেন সুদীর্ঘ কাল রাজত্ব করেন, কিন্তু তাহার অল্পভাগমাত্র যুদ্ধবিগ্রহাদি ব্যাপারে যাপিত হইয়াছিল। তাঁহার রাজত্বকালের অবশিষ্ট ভাগে অখণ্ড শান্তি বিরাজিত ছিল, এবং তাহার ফলে, সেই সময়ে প্রকৃতিপুঞ্জের হিতকর নানাবিধ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছিল।

বল্লাল সেন সমাজের হিতচিকীর্ষায় কৌলীন্যপ্রথার প্রবর্ত্তন করেন, এবং লক্ষ্মণ সেন সেই কৌলীন্যপ্রথার সংস্কার ও প্রসারণ করেন; তিনি কুলীনগণের পদমর্য্যাদার সাম্য বিধান করিয়াছিলেন। অনেকে মনে করেন যে, লক্ষ্মণ

সেনের সময়েই প্রথমে ব্রাহ্মণগণের রাঢ়ী বারেন্দ্র প্রভৃতি বিভাগ হয়, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব গ্রন্থ পাঠ করিলে বোধ হয় যে, ব্রাহ্মণগণের রাঢ়ীবারেন্দ্রাদি বিভাগ তাহার বহু পূর্ব্বেই সংঘটিত হইয়াছিল।

লক্ষ্মণ সেনের পিতামহ বিজয় সেন ব্রহ্মবাদী বলিয়া পরিচিত ছিলেন, এবং বল্লাল সেনও ব্রহ্মবাদী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। সুতরাং ইহা অনুমান করা যাইতে পারে যে, সেন-রাজগণের সময়ে এ দেশে বেদান্ত ও উপনিষদাদির অনুশীলন ছিল, এবং তদুক্ত জ্ঞান ও কর্ম্মকাণ্ড লোকের যথেষ্ট শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিত। লক্ষ্মণসেনের সময়ওে যে বেদাদি শাস্ত্র অধীত ও অনুশীলিত হইত, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। তবে কৌলীন্যপ্রথা বংশগত হইবার ফলে ব্রাহ্মণগণ ঐ সময় হইতেই বেদ-বিমুখ হইতেছিলেন।

সেনরাজগণ শৈব ছিলেন। ইহাদিগের রাজত্বকালে শুভ্র শিবমন্দির-সমূহে গৌড়নগর দ্বিতীয় কৈলাসপুরীর ন্যায় প্রতিভাত হইত। ভাগিরথীতীরের অনতিদূরে অর্দ্ধগৌরীশ্বর দেবের সুবিশাল মন্দির ও রাজপ্রসাদ অভ্রভেদ করিয়া উত্থিত হইয়াছিল। গৌড়েশ্বরী দাক্ষায়ণী গৌড়রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ছিলেন। গৌড়রাজধানীর প্রত্যেক তোরণে ভিন্ন-ভিন্ন-নামধারিণী শক্তিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিতা ছিলেন। ইহাঁদের মধ্যে গৌড়ের উত্তর দ্বারের অধিষ্ঠাত্রী দেবী দ্বারবাসিনী ও দক্ষিণ দ্বারের অধিষ্ঠাত্রী দেবী পাটলা চণ্ডী সমধিক প্রসিদ্ধ। কয়েকখানি প্রাচীন হস্তলিখিত গ্রন্থে দ্বারবাসিনী দেবীর উল্লেখ আছে; এবং মৎস্য ও পদ্মপুরাণে পাটলাচণ্ডী দেবীর উল্লেখ দেখা যায়। এখনও দেবীদ্বয়ের অর্চ্চনা হইয়া থাকে, এবং প্রতিবর্ষে বহুসংখ্যক লোক মানস করিয়া তাঁহাদের পূজা দেয়। তাঁহার প্রদত্ত তাম্রশাসনগুলির শিরোভাগে দাক্ষায়ণী মূর্ত্তি খোদিত আছে। কিন্তু লক্ষ্মণ সেন স্বয়ং বিষ্ণুমন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। গোবর্দ্ধন আচার্য্য লক্ষ্মণ সেনের মন্ত্রদাতা গুরু ছিলেন।

লক্ষ্মণসেন স্বয়ং বিদ্বান্, বাগ্মী, বিদ্যোৎসাহী ও গুণিগ্রাহক ছিলেন। বিদ্যাবান্ ব্রাহ্মণগণের বিদ্যার সমাদর জন্য ইনি অকুণ্ঠিতচিত্তে ধনরত্নভূম্যাদি দান করিতেন। বিক্রমাদিত্যের নবরত্নসভার অনুকরণে ইহার পঞ্চরত্নসভা ছিল। জয়দেব, উমাপতিধর, গোবর্দ্ধন আচার্য্য, শরণ ও ধোয়ী, এই পাঁচ জন কবি তাঁহার পঞ্চরত্নের অন্তর্গত ছিলেন।

কেন্দুবিল্বের কবি জয়দেব সর্ব্বজনপরিচিত। ইহার কোমলকান্তপদাবলী ইংরাজী, ফরাসী ও জর্ম্মাণ ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে। জর্ম্মাণ-পণ্ডিত ল্যাসেন

গীতগোবিন্দের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এবং জনৈক রাজপুত নরপতি তাহার টীকা লিখিয়াছেন। এইরূপে জয়দেব জড়বাদী ইউরোপ ও রণোন্মত্ত রাজপুতভূমে সমানভাবে সমাদৃত ও সর্ব্বস্থানবাসী মানবের হৃদয়াকর্ষণে সমর্থ। সুতরাং লক্ষ্মণ সেনের পঞ্চরত্নের মধ্যে তিনি যে উজ্জ্বলতম মধ্যরত্ন ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

উমাপতিধর স্বয়ং পণ্ডিত ও কবি ছিলেন, বিজয় সেনের রাজত্বকাল হইতে লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন, এবং কিছু কাল লক্ষ্মণ সেনের মন্ত্রিত্ব করিয়াছিলেন। ইঁহার প্রণীত কোনও কাব্য বর্ত্তমান নাই, তবে ইনি কলাপ ব্যাকরণের যে সারিকা প্রণয়ন করেন, তাহা অদ্যাপি চতুষ্পাঠীসমূহে অধীত হয়। ইনি বিজয় সেনের প্রতিষ্ঠিত প্রদ্যুম্নেশ্বর শিবের মন্দিরের জন্য ষট্‌ত্রিংশশ্লোকাত্মক যে প্রশস্তি রচনা করেন, তাহা রাজসাহী জেলার গোদাগাড়ী নামক স্থানের নিকটে প্রাপ্ত একখানি প্রস্তরে খোদিত পাওয়া গিয়াছে। জয়দেব ইঁহাকে অত্যুক্তিপ্রিয় কবি বলিয়াছেন, এবং গোদাগাড়ীর উক্ত প্রশস্তিপাঠেও তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

পঞ্চরত্নসভার সদস্য গোবর্দ্ধন সম্ভবতঃ লক্ষ্মণ সেনের দীক্ষাগুরু গোবর্দ্ধন আচার্য্য। ইনি রাঢ়ীয়শ্রেণীতে সাবর্ণগোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা আদিদেব বল্লালের মন্ত্রী ছিলেন, এবং পুত্র ভবদেব ভট্ট বাণবল্লভীভুজঙ্গ উড়িষ্যা প্রদেশের সুবিখ্যাত ভুবনেশ্বর মন্দিরের নিকটবর্ত্তী বিন্দুসরোবরের তীরে একটি বৃহৎ মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া, তথায় নারায়ণ, অনন্ত ও নৃসিংহমূর্ত্তি স্থাপিত করেন। গোবর্দ্ধনাচার্য্য পিতৃপিতামহাদিক্রমে গৌড়েশ্বরগণের সভায় সমাদৃত ছিলেন, এবং ইঁহার অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহ গৌড়েশ্বরের নিকট হইতে রাঢ়দেশীয় এক শত গ্রাম দান পাইয়াছিলেন। গোবর্দ্ধনাচার্য্য আর্য্যাসপ্তশতী নামক আর্য্যাচ্ছন্দে গ্রথিত সপ্তশতশ্লোকাত্মক আদিরসপ্রধান একখানি কাব্যের রচনা করেন। এই কাব্যের মুখবন্ধ ও উপসংহারের শ্লোকগুলি ব্যতীত অপর সমস্ত শ্লোক অকারাদিবর্ণমালাক্রমে রচিত। গোবর্দ্ধন আচার্য্যের উদয়ন নামে এক শিষ্য ও বলভদ্র নামে এক ভ্রাতা ছিলেন। ইঁহারা উভয়েই পণ্ডিত ছিলেন, এবং আর্য্যাসপ্তশতীর সংশোধনে গোবর্দ্ধনের সাহায্য করিয়াছিলেন।

শরণ সম্বন্ধে আমরা কোনও বিবরণ বা তৎপ্রণীত কোনও গ্রন্থের সংবাদ পাই নাই। শ্রীধর দাসের সংগৃহীত সদুক্তিকর্ণামৃতে তৎসাময়িক কবিগণের

প্রত্যেকের পাঁচটি করিয়া শ্লোক সংগৃহীত আছে; ঐ গ্রন্থে শরণের রচিত পাঁচটি কবিতাও সংগৃহীত আছে।

ধোয়ী কবি, জয়দেব কর্ত্তৃক "কবিক্ষ্মাপতি" বিশেষণে বিশেষিত হইয়াছেন, এবং রাজা লক্ষ্মণসেন ইঁহাকে কবিরাজচক্রবর্ত্তী উপাধি প্রদান করেন। মালদহ হইতে প্রকাশিত গৌড়বার্ত্তা নামক পাক্ষিকপত্রের প্রথম বর্ষের সপ্তদশ সংখ্যার "গৌড়" প্রবন্ধের লেখক, ইঁহাকে তন্তুবায়জাতীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কালিদাসের মেঘদূত কাব্যের অনুকরণে রচিত ধোয়ী কবির পবনদূত কাব্য এখনও বর্ত্তমান আছে। জয়দেব গীতগোবিন্দে শ্রুতিধর বলিয়া ইঁহার উল্লেখ করিয়াছেন।

লক্ষ্মণ সেনের পঞ্চরত্নের নাম একটি সংস্কৃত শ্লোকে নিবদ্ধ ও তাঁহার সভামণ্ডপের দ্বারদেশে খোদিত ছিল, এবং স্বনামখ্যাত সুলতান হোসেন সাহার রাজত্বকালেও তাহা বর্ত্তমান ছিল।

পঞ্চরত্ন ব্যতীত লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বকালের বিখ্যাত পণ্ডিতগণের মধ্যে তাঁহার সভাপণ্ডিত হলায়ুধ মিশ্রের নাম বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। ইনি মীমাংসা-সর্ব্বস্ব, বৈষ্ণবসর্ব্বস্ব, শৈবসর্ব্বস্ব, পণ্ডিতসর্ব্বস্ব ও ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব নামক গ্রন্থসমূহের প্রণেতা। হলায়ুধ পণ্ডিতবংশে বাৎস্যগোত্রে উৎপন্ন হন। ইঁহার পিতা ধনঞ্জয় গৌড়েশ্বরের ধর্ম্মাধ্যক্ষ ছিলেন, এবং গোমেধযজ্ঞসম্পাদন করেন। হলায়ুধের ঈশান ও পশুপতি নামক অপর দুই জ্যেষ্ঠ সহোদর ছিলেন। ইঁহারাও লক্ষ্মণ সেনের সময়ে প্রধান স্মার্ত্তপণ্ডিত বলিয়া বিখ্যাত। ঈশান আহ্নিকপদ্ধতি ও পশুপতি পশুপতিপদ্ধতি নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। হলায়ুধ বাল্যকাল হইতেই বিচক্ষণ ছিলেন। তাই তিনি তরুণ বয়সেই লক্ষ্মণ সেনের সভাপণ্ডিত, যৌবনে মন্ত্রী ও প্রৌঢ়াবস্থায় মহাধর্ম্মাধ্যক্ষের পদ লাভ করেন। হলায়ুধের বাসস্থান মালদহ জেলার অন্তর্গত প্রাচীন গৌড় নগরের দক্ষিণ প্রান্তে মহদীপুর নামক গ্রামের নিকটে ছিল, এবং ইঁহাদের বাটীর সংলগ্ন পুষ্করিণী এখনও "হলায়ুধের গাড়া" (গর্ত্ত) বলিয়া পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের লোকের নিকট পরিচিত আছে। হলায়ুধের পুষ্করিণী ক্ষুদ্র না হইলেও, গৌড় মহানগরের বিশাল সরোবরসমূহের তুলনায়, ইহাকে "গাড়া" বলিলে অসঙ্গত হয় না।

লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বকালে ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর জাতির মধ্যেও সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন ছিল। প্রমাণস্বরূপ শ্রীধর দাস ও তাঁহার সদুক্তিকর্ণামৃত গ্রন্থের উল্লেখ করা যাইতে পারে। সদুক্তিপ্রণেতা শ্রীধর দাস সম্ভবতঃ কায়স্থ-জাতীয় ও মহামাণ্ডলিক-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

লক্ষ্মণ সেনের নিরবচ্ছিন্নশান্তিপূর্ণ রাজত্বকালের শেষভাগে গৌড়নগরে তিনি বহুসংখ্যক সুধাধবলিত সুশোভন সৌধাবলীর নির্ম্মাণ, সুপ্রশস্ত রথ্যাদির রচনা, পথিপার্শ্বে ফলছায়াপ্রদ তরুরাজির রোপণ ও অন্যান্য নানা উপায়ে নগরের শ্রীবৃদ্ধি ও সৌষ্ঠব সাধন করেন। এই জন্য এই সময় হইতে গৌড়নগর লক্ষ্মণাবতী নামে পরিচিত হইতে থাকে, এবং মুসলমান ইতিহাসলেখকগণ লক্ষ্মণাবতীর অপভ্রংশ লক্ষ্ণৌতী নামে গৌড়নগরকে অভিহিত করিয়াছেন। লক্ষ্মণ সেনের সময় গৌড়নগরে বহুসংখ্যক সরোবর খনিত ও সরোবর সকলের তীরদেশে ইষ্টকপ্রস্তরময় ঘাট নির্ম্মিত হয়। এই সকল সরোবরের মধ্যে সাগর-দীঘি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রাভেন্সা, কানিংহাম প্রভৃতি গৌড়ের প্রত্নতত্ত্বসংগ্রাহকগণ বলেন, পৃথিবীর মনুষ্যখাত সরোবর সকলের মধ্যে সাগর-দীঘিই প্রধানতম ও বৃহত্তম সরোবর।

সাগরদীঘির দৃশ্য অতীব মনোহর। নির্জ্জনভূখণ্ডস্থ সুবিমল বারিরাশি, উপকূলপ্রদেশবর্ত্তী বিটপিরাজি ও তৃণগুল্মের বিশদ প্রতিবিম্ব ধারণ করিয়া, মরকতমণ্ডিত-সুচিত্রিত-প্রান্ত সুবিশাল স্বচ্ছ মুকুরের মত বিস্তারিত রহিয়াছে, এবং তাহার উপরিভাগে গগনমণ্ডলের পুনঃপুনঃপরিবর্ত্তনশীল প্রতিকৃতি প্রতিবিম্বিত হইতেছে। এই সর্ব্বক্ষণনবীন নয়নমনোমোহন দৃশ্য দৃষ্টিগোচর করিলে, হৃদয়ে এক অননুভূতপূর্ব্ব ভাবের আবির্ভাব হয়। ইহার দৈর্ঘ্য উত্তর-দক্ষিণে এক মাইল, এবং বিস্তার পূর্ব্ব-পশ্চিমে অর্দ্ধ মাইল। ইহার জলভাগের দৈর্ঘ্য ১৬০০ গজ, এবং বিস্তার ৮০০ গজ। ইহার উত্তর ও দক্ষিণ উপকূলে দুই দুইটি, এবং পূর্ব্ব ও পশ্চিম উপকূলে এক একটি, একুণে ছয়টি সুবিস্তৃত সোপানাবলী-সমন্বিত ইষ্টকপ্রস্তররচিত ঘাট ছিল। যাঁহারা গৌড়পরিদর্শনার্থ আগমন করেন, সাগরদীঘি তাঁহাদের অবশ্যদর্শনীয়। এই দীঘি মালদহ জেলার সদর ষ্টেশন ইংরেজবাজার হইতে সাহুল্লাপুর-গামী পথের পার্শ্বে সার্দ্ধ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। সাগরদীঘি রাজা লক্ষ্মণ সেনের সময়ে খনিত হয় বটে, কিন্তু মালদহের জনশ্রুতির রসনা তাঁহাকে এই সরোবর-খননের যশোভাগী করিতে সম্মত নহে। জনশ্রুতির মতে, সাগরদীঘি জনৈক ঐশ্বর্য্যশালী বণিকের কীর্ত্তি।

এই সুবিশাল "ইন্দ্রনীলমণিপ্রভ"-সলিলপূর্ণ মনুষ্যখাত সরোবরের পশ্চিমোত্তর তীরে লক্ষ্মণ সেনের অভ্রভেদী সপ্ততল রাজপ্রাসাদ সগর্ব্বে দণ্ডায়মান ছিল। এখনও সেই সুবৃহৎ সৌধের স্তম্ভসমূহের ভগ্নাবশেষ সাগরদিঘীর পার্শ্বে পতিত

শুভ রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন হয়। এই স্থানের অনতিদূরেই অর্দ্ধগৌরীশ্বর দেবের মন্দির ছিল, এবং তাহার অল্প দূরেই ভাগীরথী প্রবাহিত ছিল। লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বকালে তাঁহার রাজধানী গঙ্গাকালিন্দীসঙ্গম হইতে বহু দূরে ছিল না, এবং তাহা বিজয়পুর নামে অভিহিত ও দেবাদিদেব মহাদেবের পুরীর সহিত উপমিত হইত।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, লক্ষ্মণ সেন বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। কিন্তু অন্যধর্ম্মাবলম্বীর প্রতি তাঁহার কোনরূপ বিদ্বেষভাব ছিল না। সাধু মহম্মদসাহ জালাল-উদ্দীন ইঁহারই রাজত্বকালে সিরাজ হইতে এ দেশে আগমন করেন। ইনিই গৌড়ে আগত প্রথম মুসলমান। কৃপাণ ও কোরাণ হস্তে তিনি এ দেশে প্রবেশ বা অবস্থান করেন নাই। ইনি প্রেম ও সাধুতার প্রভাবে সাধারণের ও গৌড়েশ্বরের শ্রদ্ধাস্পদ ও প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। একমাত্র উমাপতিধর ইঁহার প্রতি সদ্ভাবসম্পন্ন ছিলেন না। উদার লক্ষ্মণ সেন মন্ত্রী উমাপতিধরের উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়াও এই সাধুর প্রতিপালনার্থ বহু ভূসম্পত্তি প্রদান করেন। এখনও পাণ্ডুয়ায় এই সাধুর "আস্তান" আছে, এবং লক্ষ্মণ সেনের প্রদত্ত ভূসম্পত্তির আয় হইতে এখনও আস্তানের দাতব্যাদি কার্য্য সম্পাদিত হয়।

ইতিহাসে রাজা ও রাজ্যসকলের অধঃপতনের যে সকল কারণ দৃষ্ট হয়, লক্ষ্মণের রাজত্বকালে সেই সকল কারণ একে একে একত্রিত হইতেছিল। আত্মবিরোধ, বিলাসিতা, প্রজার অসন্তোষ, রাজ্যের বিষম অমঙ্গলের হেতু। লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বে ইহাদের একটিরও অভাব হয় নাই। এই সকল কারণে ও লক্ষ্মণ সেনের রাজকার্য্যে অনাস্থাবশতঃ বক্তিয়ারের গৌড়বিজয়ের পথ প্রশস্ত হইয়াছিল।

লক্ষ্মণ সেন পারিবারিক শান্তি সম্ভোগ করিতে পারিয়াছিলেন, এরূপ বোধ হয় না। বসুদেবী ও বল্লভাদেবী নামে ইঁহার দুই মহিষী ছিলেন। বসুদেবী সতীলক্ষ্মী ছিলেন, কিন্তু বল্লভাদেবী দুর্ব্বিনীতা, উদ্ধতা ও গর্ব্বিতা ছিলেন। তাঁহার পাপমতি ভ্রাতা কুমারদত্তের পাপাচরণে প্রশ্রয় দিয়া রাজসভাসদ্‌গণকেও বিরক্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। বল্লভাদেবীর আচরণফলে প্রজাগণ এই সময়ে লক্ষ্মণ সেনের প্রতি বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিল।

পিতা বল্লাল সেনের সহিত লক্ষ্মণ সেনের সদ্ভাব ছিল না। বল্লাল সেনের পরলোকের পর তৎপক্ষীয়গণকে লক্ষ্মণ সেন যে প্রীতির চক্ষে দেখিতেন, তাহা

বল্লাল সেনের পক্ষাবলম্বী থাকায়, লক্ষ্মণ সেনের সময়ে তাঁহার প্রীতিভাজন হইতে পারেন নাই। লক্ষ্মণ সেন যে সাধু মকতুম সাহ জালালউদ্দীনকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করিতেন, উমাপতিধর তাঁহার হত্যার চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রকাশ্যেই হউক আর গোপনেই হউক, লক্ষ্মণ সেনকে অবমানিত করিবার চেষ্টা করিতেন। একবার স্বীয় পদাতিক মদনের দ্বারা রাজা লক্ষ্মণ সেনের শরচালনানৈপুণ্যের প্রতি বিদ্রূপবাণী প্রয়োগ করিতেও তিনি ইতস্ততঃ করেন নাই।

সেন রাজগণের সময়ে কায়স্থগণ অত্যন্ত প্রভাবশালী ছিলেন। নানা কারণে বহুসংখ্যক কায়স্থ লক্ষ্মণ সেনের প্রতি বিরক্ত হন, এবং তাঁহাদের বিরক্তি এত দূর প্রবল হইয়া উঠে যে, এক দল কায়স্থ গৌড় ত্যাগ করিয়া বিহারে প্রস্থান করেন, এবং অদ্যাবধি তথায় গৌড়ীয় কায়স্থ বলিয়া পরিচিত আছেন।

বণিকগণও যে লক্ষ্মণ সেনের প্রতি সদ্ভাবসম্পন্ন ছিলেন, এরূপ বোধ হয় না। লক্ষ্মণ সেনের অন্যতমা মহিষী বল্লভাদেবী ও তাঁহার শ্যালক কুমারদত্তের আচরণে বণিককুল ইঁহার প্রতি বিরক্ত হন। কুমারদত্ত, মধুকর-নামক জনৈক বণিকের পত্নী মাধবীর সতীত্বনাশের চেষ্টা করেন, এবং বল্লভাদেবী আপন ভ্রাতার পক্ষাবলম্বী হইয়া রাজসভায় আসিয়া ন্যায়বিচারের অন্তরায় হন, এবং অবশেষে মাধবীর বহুমূল্য রত্নালঙ্কার বলপূর্ব্বক ছিনাইয়া লয়েন। ইহাতে রাজগুরু গোবর্দ্ধনাচার্য্য রাজসভা ত্যাগ করিতে উদ্যত হন। এই ঘটনা হইতে প্রতীত হইবে যে, লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বের শেষভাগে রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শাসন-প্রণালী শিথিল হইয়াছিল, এবং রাজসভাসদগণ রাজ্যের শাসনশৃঙ্খলার প্রতি উদাসীনতা প্রদর্শন করিতেন।

এক দিকে লক্ষ্মণ সেন বৈষ্ণবধর্ম্মপরায়ণ হইয়া হরিকথাপ্রসঙ্গে ও জয়-দেব প্রভৃতি কবিগণের কোমলকান্ত পদাবলীর অনুশীলনে রাজধানী ও রাজ-বিষয় হইতে দূরে ছিলেন, অপর দিকে তাঁহার রাজ্যমধ্যে ও প্রধানতঃ গৌড় মহানগরে বিলাসিতার অবারিত স্রোত মহাবেগে প্রবাহিত হইতেছিল। গৌড়ের প্রকাশ্য রাজপথ বারবিলাসিনীগণের চরণমঞ্জীরের মঞ্জুনিঃস্বনে মুখরিত হইত, নিশীথে স্বেচ্ছাচারিণী অভিসারিকাগণ অসঙ্কোচে অভিসারে গমন করিত, রাজসভার কবিগণ বারবামাগণকে অমলা কমলা মাতার সহিত তুলনা করিতে আদৌ লজ্জা বোধ করিত না, এবং নাগরীগণ নগরের উদ্যানসমূহে নাগরদোলায় উঠিয়া যামিনীযাপনে অনুরক্ত ছিল। এই সময়ে সৈন্যবিভাগেও স্বেচ্ছাচার, বিলাসিতা ও চরিত্রহীনতা প্রবেশ করিয়াছিল।

গৌরাঙ্গদেব কোনও নূতন ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন করেন নাই। ইতিপূর্ব্বে সন্ন্যাসিগণের সম্প্রদায়বিশেষে যে ধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইত, দক্ষিণাপথে যে ধর্ম্মের অপেক্ষাকৃত বহুলপ্রচার ছিল, যে ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা শ্রীমদ্ভাগবতে প্রতিপাদিত, এবং যাহা জয়দেবাদির মধুর পদাবলীতে অভিব্যক্ত, সেই ধর্ম্ম গৌরাঙ্গদেব স্বয়ং ও নিত্যানন্দপ্রভুর সাহায্যে বঙ্গদেশে জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত করেন। এই ধর্ম্ম নিজ প্রকৃতিবশেই সন্ন্যাসী ও নিরীহ ব্যক্তিগণের অনুষ্ঠেয়। ইহা কখনও নরপতিগণের অবলম্বনীয় হইতে পারে না, বা ইহা একটি দেশের সাধারণ ধর্ম্ম হইলে দেশের স্বাতন্ত্র্যরক্ষা সম্ভব হইবে না। উড়িষ্যায় এই ধর্ম্মের প্রভাব বিস্তৃত হইবার ও প্রতাপরুদ্র এই ধর্ম্ম অবলম্বন করিবার পর হইতেই উড়িষ্যার রাজনৈতিক পতন ও স্বাতন্ত্র্যনাশের কারণের উৎপত্তি হইয়াছিল। লক্ষ্মণ সেন শ্রীমদ্ভাগবত-প্রতিপাদিত উক্তরূপ বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং তাহার ফলে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রাক্কালে অর্জ্জুনের ন্যায়,

"ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ।"

বলিয়া, তাঁহারই ন্যায়

"যদি মামপ্রতীকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রা রণে হন্যুস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ॥"

সিদ্ধান্ত করিয়া, রাজকার্য্যে অনাস্থা প্রদর্শন করিতেছিলেন, এবং রাজ্যরক্ষায় সম্পূর্ণ অমনোযোগী হইয়াছিলেন। এই সময়ে কেহ দ্বারকানাথ কৃষ্ণের আসন গ্রহণ করিয়া লক্ষ্মণ সেনের হৃদয়ে ক্ষত্রতেজঃ জাগরিত করিতে পারিলে বাঙ্গলার ইতিহাস অন্য আকারে লিখিত হইতে পারিত, কিন্তু জয়দেব প্রভৃতি কবিগণ বৃন্দাবনবিহারী কৃষ্ণ ও ব্রজবিলাসিনী গোপীগণের মধুরভাবচ্ছবি তাঁহার হৃদয়ে অঙ্কিত করায়, রাজলক্ষ্মী তাঁহার গৃহে চঞ্চলা হইয়া উঠিয়াছিলেন। মধুর কৃষ্ণপ্রেমে লক্ষ্মণ সেনের রাজ্যে বিতৃষ্ণা জন্মে, এবং সম্ভবতঃ সেই কারণেই তিনি জয়দেবাদি পণ্ডিতগণের সহিত শাস্ত্রানুশীলন ও প্রেমানন্দসম্ভোগের উদ্দেশ্যে নবদ্বীপে বাস করিতেছিলেন। এই সময়ে লক্ষ্মণ সেনের পট্টমহিষী বসুদেবীর গর্ভজাত পুত্র কেশব সেন গৌড়ে, এবং অপর পুত্র বিশ্বরূপ সেন বিক্রমপুরে শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেছিলেন, এবং তাঁহার অপর পুত্র মাধব সেন তীর্থদর্শনাভিলাষে ভারতবর্ষের নানা স্থানে ভ্রমণ করিতেছিলেন।

মুসলমানগণ ধীরে ধীরে পশ্চিম দিক হইতে গৌড়াভিমুখে প্রধাবিত হইতেছিল। কুটবদ্দি মহম্মদ বখতিয়ার খিলিজি ১২০৩ খৃষ্টাব্দে বিহার জয় করেন

অং সংবাদ গৌড়েশ্বর লক্ষ্মণ সেনের কর্ণগোচর হয় নাই; অথবা, হইয়া থাকি , তিনি অতিশয় বিষয়বিরাগবশতঃ সে বিষয়ে অবহিত হন নাই। বুদ্ধিমান বখতিয়ার বিহারে অবস্থানকালেই গৌড়রাজ্যের অরক্ষিত অবস্থা, আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা, রণদুর্ব্বলতা, রাজার বার্দ্ধক্য, বিষয়-বৈরাগ্য ও মন্ত্রি সমাজের কর্ত্তব্যহীনতার বিষয় অনুসন্ধান দ্বারা অবগত হইয়া, রাজা লক্ষ্মণ সেনকে পরাজয় পূর্ব্বক নবদ্বীপ অধিকার করিতে পারিলেই সমগ্র গৌড় জনপদ তাঁহার করতলগত হইবে, ইহা বুঝিতে পারিয়া অতি সঙ্গোপনে, সসৈন্যে, অতর্কিতভাবে, অতি দ্রুতবেগে গৌড়াভিমুখে প্রধাবিত হইলেন। এত শীঘ্র তিনি নবদ্বীপে উপস্থিত হইলেন যে, তাঁহার নগরে উপস্থিতির পরেও নগরবাসীর মনে বখতিয়ার আসিতেছেন বলিয়া আদৌ কোনও সংশয় উদিত হয় নাই।

বখতিয়ার খিলিজি নবদ্বীপে উপস্থিত হইয়া তৎপার্শ্ববর্ত্তী নিবিড় জঙ্গলে আপনার সৈন্যদলকে লুক্কায়িত রাখেন, এবং কেবল সপ্তদশ জন অশ্বারোহী সঙ্গে লইয়া নবদ্বীপ নগরে প্রবেশ করেন। রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হইয়া বখতিয়ার বৈদেশিক রাজদূত বলিয়া আপনার পরিচয় দেন, এবং রাজসম্ভাষণ উদ্দেশ্য বলিয়া, প্রাসাদে প্রবেশ করিবার অনুমতি পান। রাজা লক্ষ্মণ সেন বখতিয়ারের ছলনা বুঝিতে পারিলেন না। বখতিয়ার রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিয়া প্রাসাদস্থ রাজসেবকগণকে আক্রমণ করিলেন। রাজসেবকগণ নিহত হইলেন, এবং সেই সময়ে বখতিয়ারের লুক্কায়িত সৈন্যগণ কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করিল। বৃদ্ধ রাজা লক্ষ্মণ সেন এই সময়ে মাধ্যাহ্নিক আহারে বসিয়াছিলেন। দাসদাসীগণের ভয়বিহ্বল কোলাহলে তিনি আপনার সঙ্কটাপন্ন অবস্থা বুঝিতে পারিলেন, এবং স্বীয় প্রাণ ও স্বজনগণের মানরক্ষার্থ রাজপ্রাসাদের পশ্চাদ্বার দিয়া পলায়ন করিয়া ভাগীরথীকূলে ভাসমান তরণীযোগে নবদ্বীপ ত্যাগ করিলেন। এ দিকে বখতিয়ারের মুসলমান সৈন্যগণ নির্ব্বিবাদে নবদ্বীপ বিজয় করিল। বখতিয়ার রাজকোষ, হস্তিযূথ ও রাজপ্রাসাদে অধিকার করিয়া, সৈন্যগণকে নগরলুণ্ঠনের অনুমতি দিলেন। এইরূপে ১২০৪ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ বখতিয়ার খিলিজি বিনা যুদ্ধে কেবল কুটিল চৌরনীতিবলে নবদ্বীপ অধিকার করিয়া এ দেশে মুসলমান-শাসনের প্রতিষ্ঠা করিলেন।

নবদ্বীপ-অধিকারের পর বখতিয়ার খিলিজী গৌড়াভিমুখে যাত্রা করেন। এই সময়ে লক্ষ্মণপুত্র কেশব সেন গৌড়ে উপস্থিত ছিলেন। পিতার পলায়নবার্ত্তা শুনিয়া হীনসাহস না হইয়া তিনি সৈন্যসংগ্রহ করিয়া বখতিয়ারের সম্মুখীন

হন। কিন্তু গৌড়ের বিলাসিতা ও পাপাচারে বিজয়লক্ষ্মী গৌড়ের প্রা [illegible] প্র ছিলেন না; তিনি মুসলমান-পক্ষপাতিনী হইয়া বখতিয়ারের অঙ্কগতা [illegible]লেন। কেশব সেন পরাভূত হইয়া পূর্ব্ববঙ্গে প্রস্থান করিলেন।

নবদ্বীপ ও গৌড়বিজয়ের পর পশ্চিমবঙ্গে মুসলমানপ্রভুতা স্থাপিত হইল, কিন্তু বখতিয়ারের চেষ্টাসত্বেও সমগ্র বাঙ্গলা তাঁহার শাসনাধীন হইল না। কেশব সেন পূর্ব্ববঙ্গে গিয়া বিক্রমপুরে সেনরাজবংশের স্বাতন্ত্র্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিলেন। মুসলমানপ্রপীড়িত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ ধর্ম্মলোপভয়ে নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া বিক্রমপুরে গিয়া, আবার হিন্দুরাজত্বের ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

লক্ষ্মণ সেনের অদৃষ্ট আর ফিরিল না। এই ঘটনার পর তিনি দুই বৎসর কাল জীবিত ছিলেন; অবশেষে শ্রীক্ষেত্রে ভগবৎপাদপদ্ম প্রাপ্ত হন। *

গৃহাগত।

লোকের মুখে তিনটি অর্থশূন্য কথা প্রায়ই শুনিতে পাই। সে কথা তিনটি অল্প-মূল্যের মুদ্রার মত সর্ব্বদা সর্ব্বত্র প্রচলিত; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে কয়টির কিছু-মাত্র মূল্য আছে কি না সন্দেহ; সে কথা কয়টি নিতান্তই অর্থশূন্য। লোকে কথায় কথায় "ক্ষুদ্র", "তুচ্ছ" ও "সামান্য", এই তিনটি কথার ব্যবহার করিয়া থাকে;—তিনটি কথাই প্রায় অবজ্ঞাসূচক অর্থে ব্যবহৃত। কিন্তু ক্ষুদ্র কাহাকে বলি? বালুকাও ক্ষুদ্র,—হীরকও ক্ষুদ্র;—হীরক ক্ষুদ্র বলিয়া যে অকিঞ্চিৎকর মনে করে, সে হয় দেবতা; নহে ত উন্মাদ বর্ব্বর। সংসারের "ক্ষুদ্র" সুখ দুঃখ লইয়াই জীবন! তুচ্ছ কি? তোমার নিকট একটা পয়সা তুচ্ছ, কিন্তু নিরন্ন বুভুক্ষিত দরিদ্রের পক্ষে সেই একটি পয়সাই কি বহুমূল্য নহে? আজ যাহাকে তুমি তুচ্ছ ভাবিতেছ, কাল আবার তাহাই কি তোমার নিকট আদৃত হইতে

* প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের আলোচনাফলে বাঙ্গলার ইতিহাসরচনার পথ ক্রমেই সুগম হইয়া আসিতেছে। ইঁহাদের কৃপায় লক্ষ্মণ সেন সম্বন্ধে আমরা যে সকল বিষয় জানিতে পারি, তাহার সারসঙ্কলনপূর্ব্বক এই প্রবন্ধ লিখিত হইল। লক্ষ্মণ সেনের সময় ও তাঁহার রাজত্বের ঘটনাবলী সম্বন্ধে বিস্তর মতভেদ আছে। এই প্রবন্ধে ঐ সকল মতভেদের সমালোচনাপূর্ব্বক তর্ক বিতর্কের সহিত ঘটনাবলী পাঠকের নিকট উপস্থিত করা হইতেছে না। বিচার বিতর্ক দূরে রাখিয়া ভিন্ন ভিন্ন মতের সামঞ্জস্যপূর্ব্বক যাহা প্রবন্ধলেখক নিজে বিশ্বাস করেন, তাহাই এই প্রবন্ধে সঙ্কলিত হইয়াছে। প্রবন্ধলেখকের বিশ্বাসের হেতু ও প্রমাণ পরে স্বতন্ত্র প্রবন্ধে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আছে।—লেখক।

পারে না! তবে "তুচ্ছ" অবস্থাভেদে,—দ্রব্যভেদে নহে। সামান্য বলিয়া কিছু আছে কি? একদিনের একটা "সামান্য" কথার দাগ অনেক সময় সারা জীবনের বাক্যস্রোতে বিধৌত হইবার নহে। আয়তনে ক্ষুদ্র একখণ্ড উপলে যেমন সময় সময় নির্ঝর-নীরের পথ পরিবর্ত্তিত হয়, তেমনই সময় সময় এক একটা "সামান্য" ঘটনায় জীবনের স্রোত ভিন্ন পথে প্রবাহিত হয়। তাই বলিয়াছি—"ক্ষুদ্র", "তুচ্ছ", ও "সামান্য",—এই তিনটি কথার অর্থ পাই না।

আমি আজ আমার জীবনের যে বিবরণ বিবৃত করিতে যাইতেছি, তাহার কারণ একটি "ক্ষুদ্র"—"তুচ্ছ"—"সামান্য" ঘটনা। কিন্তু সেই ঘটনা হইতেই এ জীবনের স্রোত ফিরিয়াছে। সেই ঘটনা হইতেই আমি ত্রয়োবিংশ বৎসরের অনুসৃত পথ পরিত্যাগ করিয়া মুহূর্ত্তে নূতন পথের পথিক হইয়াছিলাম। সেই ঘটনাটাই আমার এ ব্যর্থ জীবনের সব।

১

ম্লান কুসুমের ক্ষীণ সৌরভের মত আমার স্নিগ্ধছায়াময় পল্লীগৃহের কথা আজও মনে পড়ে—সে স্মৃতি তত উজ্জ্বল বা সুস্পষ্ট নহে, কিন্তু বড় মধুর। তখন আমি নিতান্তই বালক। সেখানে এখন আর এই শ্বেতকেশ অকালবৃদ্ধকে কে সেই চঞ্চলপ্রকৃতি বালক বলিয়া চিনিতে পারিবে? সেই চঞ্চলপ্রকৃতি বালকের শত দুষ্টামি ও ক্রীড়াকৌতুকের কথা মনে করিয়া রাখিবার কেহ আর সেখানে নাই। দীর্ঘ মধ্যাহ্নে মুকুলসুরভিময় আম্রকাননে ক্রীড়া, রৌদ্র-দীপ্ত দিবসে সরসীর স্বচ্ছ সলিলে সন্তরণ, তৃণশ্যাম প্রান্তরে বসিয়া অস্তগমনো-ন্মুখতপনকরে শোভিত, ইন্দ্রধনুর বর্ণে রঞ্জিত, অপ্সরীর অঞ্চলের মত বর্ণ-বৈচিত্র্যবহুল মেঘমালার শোভাদর্শন—সে সকল আজ স্বপ্নই বটে!

আমার পিতা দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন। সামান্য আয়ে তাঁহাকে একটি বৃহৎ সংসার প্রতিপালন করিতে হইত। কোনরূপে আমাদের সংসার চলিয়া যাইত। আমার এক অনতিদূরসম্পর্কীয় জ্যেষ্ঠতাত কলিকাতায় বাস করিতেন। তিনি মধ্যে মধ্যে অযাচিতভাবে পিতাকে অর্থসাহায্য করিতেন। আমার পিতা বড় অভিমানী ছিলেন,—যেরূপ লোক ভাঙ্গিবে, কিন্তু নমিবে না,—তিনি সেইরূপ লোক ছিলেন। প্রথম প্রথম তিনি জ্যেষ্ঠতাতের অর্থসাহায্য লইতে চাহিতেন না; জ্যেষ্ঠতাত জিদ করিয়া বলিতেন,—"তবে কি আমি তোমার পর?" অগত্যা পিতাকে সাহায্য লইতে হইত। এইরূপে ক্রমে সঙ্কোচ কাটিয়া গিয়া-

জ্যেষ্ঠতাতের অর্থের অভাব ছিল না, সম্মানের সীমা ছিল না; কিন্তু আবাসের আলোক, নয়নের আনন্দ, সৌন্দর্য্যের সার, সন্তান তাঁহার ছিল না। তিনি মধ্যে মধ্যে দুই এক দিনের জন্য আমাদিগের গৃহে আসিতেন। তিনি আসিলে গ্রামে একটা "হুলস্থূল" পড়িয়া যাইত; পূর্ব্বে যাহারা পথে আমার পিতাকে দেখিলে চিনিতেও পারিত না, তখন তাহারাই তাঁহাকে দেখিলে নমস্কার করিয়া নিতান্ত আত্মীয়ের মত কুশলপ্রশ্ন করিত,—দুই বেলা আমাদের গৃহে যাতায়াত করিত। হায়! জগতে অর্থেরই যত আদর—মনুষ্যত্বের সম্মান নাই। তদ্ভিন্ন তখন আমাদের নূতন বস্ত্রাদি হইত; আর কয় দিন আহারের আয়োজনের আর অন্ত থাকিত না।

ভ্রাতাদিগের মধ্যে আমিই দেখিতে সুন্দর ছিলাম। শেষবার আমাদের বাটীতে গিয়া কলিকাতায় ফিরিবার সময় পিতাকে বলিয়া জ্যেষ্ঠতাত আমাকে সঙ্গে লইয়া আসিলেন। আমাকে আশীর্ব্বাদ করিবার সময় মা শতচেষ্টা করিয়াও অশ্রুসংবরণ করিতে পারিলেন না। তখন আমার বয়স সাত বৎসর মাত্র। দরিদ্রসন্তান আমি অসীম স্নেহের অধিকারী ও অনন্যসাধারণ ঐশ্বর্য্যের ভাবী অধীশ্বর হইয়া কলিকাতায় আসিলাম। মার সেই অশ্রুপূর্ণ চোখ মনে করিয়া প্রথম কয় দিন বড় কষ্ট বোধ হইত; ক্রমে সে কষ্ট আর বোধ হইত না। পিতা মধ্যে মধ্যে আমাকে দেখিতে আসিতেন; কিন্তু আমি আর কখনও পিতৃগৃহে গমন করি নাই।

২

আমাকে ঘসিয়া মাজিয়া তুলিতে প্রথমে কিছু দিন জ্যেষ্ঠতাতকে একটু কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। পল্লীগ্রামের বিহগনখাঙ্কিত ধূলিময় পথ, সুমনসসুষমাকুল বকুলকুঞ্জ, কুমুদকহ্লারশোভিত দীর্ঘ দীর্ঘিকা, সেই সব বাল্যসঙ্গী,—আর সেই স্নেহশীলা জননী,—সকলের স্মৃতিতে আমার হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিত,—আমার নেত্র অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিত। ক্রমে আমার "চাল" বদলাইতে লাগিল। উরগ যেমন নির্মোক ত্যাগ করে, আমি তেমনই আমার পূর্ব্বের সব অভ্যাস পরিত্যাগ করিলাম,—নূতন হইলাম।

আমি কিছু দিন বিদ্যালয়ে নিয়মমত অধ্যয়ন করিলাম। আমার অভিভাবক জানিতেন যে, আমার পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুসৃত ভ্রমাত্মক প্রথানুসারে সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী হওয়া আবশ্যক নহে; বরং তিনিই বলিতেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিলাভ করা অপেক্ষা যে সমাজে তাঁহার চলা ফিরা, সেই সমাজে

মিশিবার মত শিক্ষালাভ করাই আমার কর্ত্তব্য। আমিও জানিতাম—আমার বিদ্যাশিক্ষা উদরান্নসংস্থানের জন্য নহে। কিছু দিন বিদ্যালয়ে অধ্যয়নের পর আমি গৃহে বিদ্যাচর্চ্চায় রত হইলাম। সেক্সপীয়ারের নাটক, স্কটের উপন্যাস, বর্ণসের গীতিকবিতা, কালিদাসের কাব্য, এই সকল লইয়াই আমার সময় কাটিত। বলিতে লজ্জা করে, সেই প্রথম যৌবনে আমি অক্ষর গণিয়া, মিল খুঁজিয়া, মধ্যে মধ্যে কবিতারচনার চেষ্টাও করিতাম। তবে আমি যে বঙ্গ-ভাষার চর্চ্চা করি, ইহা আমার জ্যেষ্ঠতাতের আদৌ অভিপ্রেত ছিল না।

জ্যেষ্ঠতাতের আশ্রিত ও অনুগৃহীতবর্গের নিকট আমার সম্মানের সীমা ছিল না। অবসর মত তাহাদের সঙ্গে মিশিয়া আমি বড় আনন্দ অনুভব করি-তাম। সে মেশামিশিতে একটা ভাব সুস্পষ্ট ছিল—আমি জানিতাম, আমি অনেক উচ্চে,—তাহারাও জানিত, তাহারা অনেক নিম্নে। বিদ্যায় বা বুদ্ধিতে, ধনে বা মানে, যাহারা তাহার সহিত সমস্তরে বা তাহার অপেক্ষা উচ্চস্তরে অবস্থিত, তাহাদের সহিত মিশিয়া যুবক যত আনন্দ অনুভব করে, যাহারা তাহার অপেক্ষা নিম্নস্তরে অবস্থিত,তাহাদের সহিত মিশিয়া সে তদপেক্ষা অনেক অধিক আনন্দ লাভ করে। তাহাতে যুবকের আত্মাভিমান তৃপ্ত হয়।

বসন্তের প্রভাতে যেমন নানা মাধুরীর মধ্যে পূর্ব্ব গগনে রবিকর ফুটিয়া উঠে, তেমনই নানা সুখের মধ্যে আমার যৌবনের রক্তকমল বিকশিত হইয়া উঠিল। আমার সুখের সীমা ছিল না।

৩

বৃহৎ অট্টালিকার দ্বিতলে এক পার্শ্বের কতকগুলা কক্ষ আমার অধিকারে—আমার পাঠাগার, শয়নাগার ইত্যাদি। আমার পাঠাগারের উত্তর দিকের বাতায়ন মুক্ত করিলেই রমণী বাবুর বাটী দেখা যাইত; দুই গৃহের মধ্যে একটা সঙ্কীর্ণ গলিমাত্র ব্যবধান। রমণী বাবু মধ্যবিত্ত-অবস্থাপন্ন ;—স্বয়ং কোন সওদাগরের আফিসে চাকুরী করিয়া বৃহৎ পরিবার প্রতিপালন করিতেন। তিনি বড় কুলীন ; তাঁহার দুই সধবা কন্যাও সন্তানাদি লইয়া পিতৃগৃহেই বাস করিতেন।

ব্রাহ্মণের শ্রমে আলস্য ছিল না। তাঁহার ক্ষুদ্র গৃহখানি আশ্চর্য্য পরিষ্কার। গৃহে অধিক স্থান নাই, কিন্তু সর্ব্বত্রই শৃঙ্খলার শ্রী ; ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণখানিতে এক-খানি ক্ষুদ্র পুষ্পোদ্যান,—যেন চিত্রে চিত্রিত ; গৃহে এখানে ওখানে সঙ্গত স্থানে

করিত। আমার বহু ভৃত্যে যাহা করিতে পারিত না, ব্রাহ্মণ একাই তাহা করিতেন। আপনি করিলে কাজ যেমন সুসম্পন্ন হয়, ভৃত্যে করিলে তেমন হয় কি?

রমণী বাবুর একটি অবিবাহিতা কন্যা ছিল। রমণী বাবু বড় কুলীন; বড় কুলীনের সমান ঘরের পাত্র পাওয়া সহজ নহে, তাই অল্প বয়সে সে কন্যার বিবাহ হয় নাই। আমার পাঠাগারের মুক্ত বাতায়নপথে আমি প্রায়ই হিমাংশুকে দেখিতে পাইতাম। যখন দেখিতাম, তরুণ অরুণের আভা তাহার মুকুলিত যৌবনমাধুরী যেন প্রস্ফুটতর করিয়া তুলিয়াছে—তখন কি স্বপ্নাবেশে আমার হৃদয় আচ্ছন্ন হইয়া যাইত, তাহা কেমন করিয়া বর্ণনা করিব? হৃদয়ের সে ভাব-প্রকাশের ভাষা নাই। ভাষা বাহিরের—ভাব অন্তরের। হৃদয়ের গভীর ভাব কখনও ভাষায় সম্যক্ প্রকাশিত হয় না। তাই কবিগুরু টেনিসন এক স্থানে বলিয়াছেন যে, বাক্য প্রকৃতির মত "আত্মার" একাংশমাত্র প্রকাশ করে, অপরাংশ অপ্রকাশিত থাকিয়া যায়। বিকশিত হইবার সময় বিকাশোন্মুখ কুসুম যে ভাব অনুভব করে, সে কি তাহা প্রকাশ করিতে পারে? যখন সায়াহ্নে সেই ক্ষুদ্র উদ্যানমধ্যে সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতিকার মত তাহাকে দেখিতে পাইতাম, তখন, জানি না, কি আকর্ষণ আমাকে বাতায়নের দিকে আকৃষ্ট করিত। তখন আমার মনে হইত—

"It is the east, and juliet is the sun!"

যেমন পূর্ব্ব গগনে মেঘের উপর অরুণাভা দেখিয়া দিবাগমের আভাষ পাওয়া যায়, তেমনই তাহার দীপ্ত কৃষ্ণতার নয়নের সঙ্কোচহীন দৃষ্টি দেখিয়া, আমি তাহার হৃদয়ের সরলতার ও পবিত্রতার আভাষ পাইতাম।

তখন আমার বয়স তেইশ বৎসর মাত্র। প্রথমবিকশিত যৌবনে কোন্ যুবক কোনও সুন্দরী কিশোরীকে ভাল না বাসিয়াছে? প্রথম যৌবনে কোন্ যুবক কোনও কিশোরীকে দেখিয়া সহসা এক দিন—আপনার সমস্ত সুপ্ত অস্তিত্ব সহসা জাগরিত হইয়াছে—এইরূপ বোধ না করিয়াছে?

আমার অপরমানবহীন কক্ষে বসিয়া আমি কত কি ভাবিতাম। আমি ভাবিতাম—কুসুমের পক্ষে সৌরভ যাহা, রমণীর পক্ষে লজ্জা যাহা, বীণার পক্ষে ঝঙ্কার যাহা, বিহগের পক্ষে কাকলি যাহা, হৃদয়ের পক্ষে প্রেম তাহাই। প্রেম বিশ্বের কবিতা, প্রকৃতির মাধুরী, জীবনের সৌন্দর্য্যোচ্ছ্বাস। প্রেমই

বিষপ্রসূন যেমন শরতের প্রথমরবিকরস্পর্শে প্রাণভরা সৌরভ লইয়া বিকশিত হইয়া উঠে, তেমনই সেই কিশোরীকে দেখিয়া আমার হৃদয়ের প্রেম-পদ্ম বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল; তাহার মধুর সৌরভে আমার সমস্ত হৃদয় আমোদিত হইয়াছিল।

আমার উচ্ছৃঙ্খল হৃদয় আপনার মধ্যে আপনি কত সুখস্বপ্নই রচনা করিত! সে সকল দিবাস্বপ্নের কি অন্ত আছে! আপনাতে আপনি নিমগ্ন হৃদয় বাস্তব সত্যের কোনও সংস্রব না রাখিয়া আপনাকে কি বিচিত্র জালেই আবদ্ধ করিত! সে জানিত না, এতটুকু আঘাতে সে লূতাতন্তুজালের আর চিহ্নমাত্র থাকিবে না!

তখন সম্ভব অসম্ভবের দিকে চাহিবার প্রবৃত্তি বা শক্তিও বুঝি আমার ছিল না। নদী কি আপনি আপনার উপলে ব্যথিত স্রোত নিবারণ করিতে পারে? আমি তখন অন্ধ আবেগে অগ্রসর হইতেছিলাম, আমি কি আপনাকে আপনি নিবারণ করিতে পারিতাম? পারিলেও আমি বাস্তবের উজ্জ্বল আলোকে আমার হৃদয়-গগনে সে সুখকল্পনার ইন্দ্রধনু নষ্ট করিতাম না। সে আবেগ, সে উচ্ছ্বাস কি ভুলিবার?

সর্ব্ববন্ধনচ্ছেদী সেই বন্ধনের কথায় সেই দূর অতীতে রচিত আমার একটি কবিতার দুইটি চরণ মনে পড়িতেছে,—

"যদি নাহি হ'ত দেখা আমাদের দু'জনায়
তবে এ ব্যথিত হৃদি করিত না হায় হায়।"

কিন্তু থাক্, সে বিগতবাত্যাবেগ শান্ত স্মৃতিসিন্ধু আর মন্থন করিব না। কে জানে, তাহাতে অমৃত কি কালকূট উঠিবে?

৪

আমার জ্যেষ্ঠতাতপত্নীর হৃদয় বড় উদার। তিনি ব্রাহ্মণগৃহিণীকে বিশেষ যত্ন ও স্নেহ করিতেন। জননীর সহিত এক এক দিন হিমাংশুও আমাদের গৃহে আসিত! এক এক দিন সন্ধ্যার পর রমণী বাবু আসিয়া জ্যেষ্ঠতাতের বৈঠক-খানায় বসিতেন।

এক দিন জেঠামহাশয়ের এক জন আশ্রিত আসিয়া হাসিতে হাসিতে আমাকে বলিল যে, পূর্ব্ব রাত্রে রমণী বাবু প্রকারান্তরে জেঠামহাশয়ের নিকট আমার সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছিলেন; জেঠামহাশয়

অধীশ্বর কোনও বিশেষ ধনবানের কন্যাকেই বিবাহ করিবে। সে আমার গর্ব্ব আরও স্ফীত করিবার অভিপ্রায়ে কথাটা বলিল; কিন্তু কথাটা আমার মর্ম্মে আঘাত করিল।

দেখিলাম,—তাহার পর হইতেই গৃহে ঘটক ঘটকীর বড় গতায়াত হইতে লাগিল। শেষে একদিন জেঠামহাশয় কয় স্থানে বিবাহসম্বন্ধের কথা জানাইয়া আমার মতামত জানিতে পাঠাইলেন। প্রথম যৌবনে—জীবনের মধুরতম কালে, কে আপনার সকল আশার বিলোপ করিতে চাহে,—কয় জন তাহা পারে? আমি আপাততঃ বিবাহে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলাম।

সেই দিন মধ্যাহ্নে বসিবার ঘরে একখানা আরাম-কেদারায় অর্দ্ধশয়ান অবস্থায় আপনার মনে কি স্বপ্নলোকের সৃষ্টি করিতেছিলাম, এমন সময় পার্শ্বে কার্পেটে কাহার কোমল পদশব্দ শুনিয়া চমকিয়া চাহিলাম। জেঠাইমা পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন দেখিয়া, তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইলাম।

জেঠাইমা বলিলেন, "বাবা, বিয়ে করিতে চাহিতেছিস্ না কেন?"

আমি নতমস্তকে অপরাধীর মত দাঁড়াইয়া রহিলাম, কোন কথা কহিতে পারিলাম না।

স্নেহার্দ্র স্বরে জেঠাইমা বলিলেন, "বাবা, তুই যদি বিবাহ না করিস্, তবে আমি আর এ বিজন পুরীতে থাকিব না। তোর জেঠামহাশয়ের লোকের সঙ্গে মেলামেশা আছে,—শত কাজ আছে, তিনি সেই সকল লইয়া থাকিতে পারেন। আমি কি লইয়া এ শূন্য পুরীতে থাকি বল? এ বাড়ী যেন হানাবাড়ীর মত বোধ হয়। যত বয়স হইতেছে, ততই যেন হৃদয়ে মহাশূন্য বোধ করিতেছি। আর একা থাকিতে পারি না। বাবা, বিবাহ কর। আমার পেটের ছেলে নাই; কিন্তু আমি কি তোকে কখন পেটের ছেলের অপেক্ষা কম করিয়াছি?"

হায়! বন্ধ্যানারীর স্নেহ এমনই বটে! আমি তাঁহার নিকটে যে অকৃত্রিম স্নেহ পাইয়াছি, কয় জন জননী আপনার পুত্রকে সেরূপ স্নেহ করিতে পারেন। হায় বন্ধ্যানারী, আপনার হৃদয়ের সঞ্চিত স্নেহরাশি দিয়া যাহাকে আপনার করিতে চাহিয়াছিলে, কই তাহাকে ত আপনার করিতে পারিলে না! সে আপনি স্নেহবন্ধনে বদ্ধ হইল না—কেবল তোমার স্নেহার্দ্র কোমল হৃদয় ব্যথিত হইল।

আমি মুখ তুলিয়া দেখিলাম—তাঁহার নয়নে অশ্রু। তখন আর থাকিতে পারিলাম না—হৃদয়ের কথা বলিয়া ফেলিলাম। সে স্নেহের নিকট আর লুকো-

সব শুনিয়া জেঠাইমা বলিলেন, "তুই যাহাতে সুখী হইবি, তাহাতেই আমার সুখ। কর্ত্তার মত হইলেই হয়। তাঁহাকে বলিয়া দেখি।"

জেঠাইমা চলিয়া গেলেন। আমি বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম—মুহূর্ত্তের আবেগে সম্ভব অসম্ভব বিবেচনা না করিয়া কি বলিয়া ফেলিলাম! সূর্য্যাস্তকালে মেঘমালার মত আমার কল্পনা নানা ছবি গড়িতে লাগিল, ভাঙ্গিতে লাগিল।

লজ্জায়,—আশায়,—আশঙ্কায়, আমার হৃদয় উদ্বেলিত হইতে লাগিল।

৫

পর দিবস প্রভাতে ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল যে, জেঠামহাশয় আমাকে ডাকিতেছেন। তাঁহার বসিবার ঘরে গিয়া দেখিলাম,—জেঠামহাশয় ধূমপান করিতেছেন; আরও দেখিলাম,—তাঁহার স্বভাবতঃ হাস্যোজ্জ্বল মুখে প্রলয়-সহায় বজ্রসহচর পার্ব্বত্য বাত্যার মত অন্ধকার। তিনি পার্শ্বেই একখানা চেয়ার দেখাইয়া দিলেন। আমি বসিলাম।

জেঠামহাশয় আমার বিবাহের কথা উত্থাপিত করিলেন। পূর্ব্ব দিন আমি জেঠাইমাকে যাহা বলিয়াছিলাম, সেই কথা বলিয়া জেঠামহাশয় গম্ভীরভাবে বলিলেন, "এই সম্পত্তি ও সম্মানের অধিকারী হইয়া তুমি দরিদ্রকন্যা বিবাহ করিতে পাইবে না। ওজন বুঝিয়া চলিতে শিখ। তোমার মর্য্যাদা ভুলিও না। বড় ঘরে অনেকে তোমাকে জামাতা করিতে পাইলে কৃতার্থ হইবে। যৌবন-সুলভ 'সেণ্টিমেণ্ট্যালিটি' ত্যাগ কর।"

যে আমার মত আদরে পালিত, তাহার সহিষ্ণুতা ও সংযম স্বভাবতঃই বড় অল্প হইয়া পড়ে। বিশেষ, আমি তখন প্রেমমন্দাকিনীর প্রবল স্রোতে ভাসিতে-ছিলাম। আমি বলিলাম, "সামাজিক সম্মানের অপেক্ষা মনের শান্তি ও সুখ অধিক মূল্যবান নহে কি?"

জেঠামহাশয় বলিলেন, "ও সব 'সেণ্টিমেণ্টালিটি' মাত্র। তুমি রমণী বাবুর কন্যাকে বিবাহ করিতে পাইবে না।"

আমার রাগ হইল। উচ্ছ্বসিত স্বরে আমি বলিলাম, "তবে আমি বিবাহ করিব না।"

জ্যেষ্ঠতাতের নয়ন পূর্ণোন্মুক্ত হইল। তিনি বলিলেন, "জান,—আমি তোমাকে দূর করিয়া দিতে পারি?"

ব্যথিত জনক অবাধ্য পুত্রকে যেমন করিয়া তিরস্কার করেন, জেঠামহাশয় তেমনই আমাকে এ কথা বলিলেন। কিন্তু আমি তাহা বুঝিলাম না। আমি

ভাবিলাম,—আমি দরিদ্রসন্তান, তাঁহার অনুগ্রহদত্ত অন্নে পরিপুষ্ট ; তাই আমি তাঁহার অবাধ্য হইলে তিনি আমাকে দূর করিয়া দিবেন। আমি তাঁহার কে? বিদ্যুৎহাস্যময়ী বর্ষা গিরিশিরে তাহার নিশীথনিবিড় কুন্তলজাল এলাইয়া দিলে যেমন এক দিন জলধরধারাপাতে পর্ব্বত-অঙ্গে শত সুপ্ত নির্ঝরের বারিরাশি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, তেমনই তাঁহার এক কথায় আমার ষোড়শ বর্ষের রুদ্ধ অভিমান উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। কম্পিতকণ্ঠে আমি কহিলাম, "আমাকে দূর করিয়া দিবার অধিকার আপনার আছে। কিন্তু আমার মাথা খাইবার অধিকার আপনাকে কে দিয়াছিল? আমি দরিদ্রসন্তান ; করিয়া খাইতে পারিতাম। আপনি কেন আমার সে পথ বন্ধ করিলেন?"

আমি এমনই আরও কি বলিতে যাইতেছিলাম ; বিবক্ষু রসনার বেগ সম্বরণ করিলাম। আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম ; দেখিলাম, জেঠামহাশয়ের নয়ন অশ্রুপূর্ণ। তিনি আমাকে ভালবাসিতেন। তাঁহার সেই অশ্রুর স্মৃতি জ্বলন্ত অঙ্গারের মত এখনও আমার হৃদয় দগ্ধ করিতেছে।

জেঠামহাশয় আমাকে ডাকিলেন। আমি ফিরিলাম না ;—আপনার পাঠাগারে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলাম। একখানা চেয়ারে বসিয়া কাঁদিবার চেষ্টা করিলাম ;—কান্না আসিল না। উঠিয়া ড্রয়ার খুলিয়া কবিতার খাতাখানা বাহির করিলাম—টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলাম। ছিন্ন অংশগুলাকে একখানা জাপানী ধাতুনির্ম্মিত ট্রের উপর রাখিয়া, বাতায়নের কাছে লইয়া দেশলাই জ্বালিয়া দিলাম। প্রতিভার পরিণাম,—যত্নের যাতনা,—সব পুড়িয়া গেল। কতকগুলা ভস্মীভূত কাগজের টুকরা বাতাসে উড়িয়া রমণী বাবুর গৃহপ্রাঙ্গণে ছড়াইয়া পড়িল। সেগুলার দিকে চাহিতে দেখিলাম—চঞ্চলা চপলার মত হিমাংশু উদ্যান হইতে চলিয়া গেল ; একটুক্‌রা দগ্ধ কাগজ তাহার অবেণীবদ্ধ আলুলায়িত কুন্তলে পড়িল।

তাহার পরেই আমি জ্যেষ্ঠতাতের গৃহ ত্যাগ করিলাম।

৬

বাটীর বাহির হইয়া চলিতে লাগিলাম। কোন্ দিকে যাইব—কোথায় যাইব,—কিছুরই স্থির ছিল না। লক্ষ্যহীন ভাবে কিছু দূর যাইতে সহসা পরিচিত কণ্ঠে আমার নাম শুনিয়া চমকিয়া চাহিলাম। এক জন পরিচিতের সহিত সাক্ষাৎ হইল ; তিনি একটা প্রীতিভোজনে আমাকে নিমন্ত্রণ করিতে যাইতেছিলেন।

সন্ধ্যার পরই প্রীতিভোজনে নিমন্ত্রিতগণ বন্ধুগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে আমার পূর্ব্ব সহাধ্যায়ী রমেশচন্দ্রের নিকট শুনিলাম—আর ছয় দিন পরেই তাহার সহিত হিমাংশুর বিবাহ। আমার চক্ষের সম্মুখে যেন আলোক নিবিয়া গেল। আমি ভাবিলাম,—এ জীবনে আমার সকল সুখ-আশা শেষ হইতে চলিল।

গভীররাত্রে নিমন্ত্রিতগণ বিদায় লইলেন; কেবল আমি—শরীর ভাল বোধ হইতেছে না বলিয়া, সেখানেই রাত্রিবাস করিলাম। দারুণ দুশ্চিন্তাপীড়িত হইয়া বন্ধুগৃহে অনিদ্রায় আমার রাত্রি কাটিল। প্রভাতে বন্ধুর নিকট হইতে বিদায় লইবার সময় তাঁহার টেবিল হইতে ইংরাজি দৈনিক প্রভাতীপত্র লইয়া উল্টাইয়া দেখিলাম। পত্রখানা রাখিবার সময় বিজ্ঞাপনের মধ্যে দেখিলাম,—জ্যেষ্ঠতাত আমাকে গৃহে ফিরিতে অনুরোধ করিয়া বিজ্ঞাপন দিয়াছেন। বিজ্ঞাপনটা দেখিয়া আমার অধরপ্রান্তে অভিমানতৃপ্তির হাসি জাগিয়া উঠিল। বন্ধুর নিকট বিদায় লইয়া আমি একটা ইংরাজী হোটেলে আশ্রয় লইলাম। সঙ্গে যাহা আনিয়াছিলাম, তাহাতে শীঘ্র আমার অভাব হইবার সম্ভাবনা ছিল না।

কয় দিন হোটেলে কাটাইলাম। রমেশের বিবাহের দিন সন্ধ্যার অন্ধকারে অস্থিরপদে পরিচিত পথে বাহির হইলাম। তখন আমার হৃদয়ে যাহা হইতেছিল, তাহা প্রকাশ করিতে পারি না, তাহা "শত ক্ষুদ্র সাগরের তরঙ্গ-উচ্ছ্বাস।" কিছু ক্ষণ পরে রমণী বাবুর আলোকোজ্জ্বল গৃহের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। তখন বর আসিয়াছে; গৃহমধ্যে কলরব উঠিয়াছে। একবার সেই গৃহের দিকে চাহিলাম,—একবার পার্শ্ববর্ত্তী পরিচিত গৃহের দিকে চাহিলাম; তাহার পর চিন্তাতাড়িত হৃদয়ে হোটেলে ফিরিয়া আসিলাম।

সেই দিন রাত্রে আমি পশ্চিম যাত্রা করিলাম। ট্রেণে সকল কথা ভাবিতে ভাবিতে শরীর অবসন্ন হইয়া আসিতে লাগিল। কয় রাত্রি অনিদ্রার পর আমি গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলাম। প্রভাতের রবিকরে যখন আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন শৈলসঙ্কুল প্রদেশের মধ্য দিয়া ট্রেণ ছুটিতেছে,—বঙ্গভূমির সমতল শ্যাম প্রান্তর পশ্চাতে রাখিয়া আসিয়াছি।

৭

তাহার পর সাত বৎসর দেশে দেশে ঘুরিয়াছি। শ্রম করিবার ইচ্ছা থাকিলে বঙ্গদেশের বাহিরে—ভারতবর্ষের মধ্যে লেখাপড়া-জানা বাঙ্গালী না খাইয়া মরে না। আমিও মরি নাই।

দিন এখানে, কিছু দিন ওখানে,—এমনই করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি ; স্থান-পরিবর্ত্তনে হৃদয়ের জ্বালা ভুলিবার বৃথা চেষ্টা করিয়াছি। ইতিমধ্যে কতবার মনে হইয়াছে—জনকতুল্য জ্যেষ্ঠতাতের ও জননী অপেক্ষাও গরীয়সী জ্যেষ্ঠ-তাতপত্নীর হৃদয়ে যে বেদনা দিয়া আসিয়াছি—আমার সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে কি ? তাঁহাদের পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাহিলে তাঁহারা কি ক্ষমা করিবেন না ? কিন্তু তখনই আবার মনে হইয়াছে, আজ যদি আমি ফিরিয়া যাই, তবে লোকে বলিবে, আমি সম্পত্তির আশায় ফিরিয়া আসিয়াছি,—অনাহারে শীর্ণো-দর সারমেয় প্রহৃত হইয়াও উচ্ছিষ্টমুষ্টির আশায় ফিরিয়া প্রভুর পদলেহন করিতে আসিয়াছে। আমি লজ্জায় ফিরিতে পারি নাই।

ক্রমে যখন অকালে যৌবন গত হইল—অকালবার্দ্ধক্যে মস্তকের কৃষ্ণ কেশরাশির মধ্যে শ্বেত রেখা দেখা দিতে লাগিল, তখন আমার মনে হইল, আমি পরলোকের যাত্রী, জাহাজ ছাড়িবার প্রথম ঘণ্টা পড়িয়াছে। তখন দেশে ফিরিবার ইচ্ছা মনে প্রবল হইতে লাগিল, যাঁহাদিগকে স্নেহ মমতার বিনিময়ে কেবল যাতনা দিয়া আসিয়াছি, তাঁহাদিগকে একবার দেখিবার ইচ্ছা সংবরণ করা কষ্টসাধ্য হইয়া উঠিতে লাগিল। কত দীর্ঘরজনী আমি আমার রুদ্ধকক্ষে পদচারণ করিয়া কেবল দূর অতীতের কথা ভাবিয়া কাটাই-য়াছি ! সকল কথা মনে হইলে আমি উন্মত্তবৎ হইতাম।

এই সময় এক দিন একখানা বাঙ্গালা সংবাদপত্র আমার হাতে পড়িল। তাহাতে দেখিলাম,—কোনও সদনুষ্ঠানে জ্যেষ্ঠতাতের কয় সহস্র মুদ্রা দানের কথা লিখিয়া সম্পাদক টীকা করিয়াছেন,—"দুঃখের বিষয়, দাতার শরীর বড় অসুস্থ। কিছু কাল পূর্ব্বে তাঁহার পুত্রপ্রতিম ভ্রাতুষ্পুত্র নিরুদ্দেশ হয়েন। সেই পারিবারিক দুর্ঘটনা হইতেই তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। এখন তাঁহার স্বাস্থ্যের অবস্থা আশঙ্কাজনক। ভগবান তাঁহাকে সুস্থ করুন।"

হায়—নির্ব্বোধ আমি কি করিয়াছি ! তবে আমিই কি তাঁহার মৃত্যুর কারণ হইব ! কুক্ষণে তিনি হৃদয়ের রত্নাগার শূন্য করিয়া এ পিশাচকে স্নেহ দান করিয়াছিলেন ;—কুক্ষণে তিনি এ কালসর্প হৃদয়ে ধরিয়া পুষ্ট করিয়াছিলেন,—তখন জানিতেন না—সেই তাঁহাকে দংশন করিবে,—তাহারই বিষে তাঁহাকে জর্জরিত হইতে হইবে। আমার এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি ?

আর থাকিতে পারিলাম না। সেই দিনই কলিকাতায় যাত্রা করিলাম।

[illegible] সমস্ত পথ অতিবাহিত হইল

৮

সাত বৎসর পরে সেই পরিচিত গৃহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। গৃহের সম্মুখে রাস্তার কয়খানি গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে—দেখিয়া বোধ হইল, চিকিৎসকের যান। গৃহ নিস্তব্ধ;—ঝড় উঠিবার পূর্ব্বে গুমটের মত যেন কোন দারুণ দুর্ঘটনার পূর্ব্ব লক্ষণ স্তব্ধতায় গৃহ সমাচ্ছন্ন। আশঙ্কায় আমার হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। আমি গৃহে প্রবেশ করিলাম।

প্রবেশকক্ষের দ্বারদেশেই জেঠামহাশয়ের বৃদ্ধ ভৃত্য ভগবান বসিয়াছিল; তাহার মুখ ম্লান,—চক্ষে জল। তাহাকে দেখিয়াই আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "ভগবান, খবর কি?"

ভগবান স্ত্রীলোকের মত কাঁদিয়া উঠিল; বলিল, "বুঝি আপনাকে দেখিবার জন্যই এখনও প্রাণ বাহির হয় নাই। কালও জ্বরের ঘোরে কেবল আপনার কথা বলিয়াছেন। যদি এক দিন আগে——"

আর শুনিতে পারিলাম না; উন্মত্তের মত দ্বিতলে উঠিয়া একেবারে জেঠামহাশয়ের শয়নকক্ষে ছুটিয়া চলিলাম। পথে একটা ঘরে দেখিলাম, কয় জন ডাক্তার বসিয়া আপনাদের মধ্যে গল্প করিতেছেন ও অনুচ্চ স্বরে হাসিতেছেন। আমাকে দেখিয়া জেঠাইমা কাঁদিয়া উঠিলেন,—"এত দিনে আসিলি বা? আর দেখা হইল না!"

আর অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলাম না। কাঁদিতে কাঁদিতে রোগীর শয্যার শিয়রে বসিয়া প্রাণের আবেগে ডাকিলাম,—"জেঠামহাশয়!" অশ্রুর উচ্ছ্বাসে আমার কণ্ঠস্বর অর্দ্ধস্ফুট ক্রন্দনের মত হইয়া আসিতেছিল। বুঝি সে স্বর সেই স্নেহময় হৃদয়ের রুদ্ধপ্রায় স্পন্দনতন্ত্রীতে আঘাত করিল,—বুঝি এ হতভাগ্যের কণ্ঠস্বর শুনিয়া তাঁহার বিলুপ্তপ্রায় মানসী শক্তি একবার সচেতন হইয়া উঠিল;—বুঝি তিনি আমাকে চিনিলেন। মুমূর্ষুর নয়নদ্বয় একটু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, তাঁহার একখানি হস্ত আসিয়া আমার ক্রোড়ে পড়িল। কিন্তু আর কথা ফুটিল না। আমি সেই হস্তখানি সযত্নে নিজ হস্তে তুলিয়া লইলাম।

তাহার পর সব ফুরাইল।

* * * * *

জেঠামহাশয়ের বাক্সে তাঁহার উইল পাইলাম। তাহার মর্ম্ম এই যে, জেঠাইমা কেবল নির্দ্দিষ্ট মাসহারা পাইবেন; আমিই সকল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। যদি আমার মৃত্যু হইয়া থাকে, তবে আমার পুত্রকন্যা থাকিলে তাহারাই সব

সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। যদি পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে আমার, বা আমার পুত্র কন্যা কাহারও সন্ধান না হয়, সম্পত্তি কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট সদনুষ্ঠানে ব্যয়িত হইবে।

এ সম্পত্তি লইয়া আমি কি করিব? যত দিন আমার জননীপ্রতিমা জেঠাইমা জীবিতা আছেন, তত দিন জীবনে আমার আকর্ষণ আছে—সংসারে আমার বন্ধন আছে। তাহার পর আমি সকল আকর্ষণহীন,—সর্ব্ববন্ধনবিহীন। তবে এ সম্পত্তি লইয়া আমি কি করিব?

এ সম্পত্তি জেঠামহাশয়ের কল্পিত সদনুষ্ঠানেই অর্পিত হইবে। যাহাতে তাঁহার সেই সকল কল্পিত অনুষ্ঠান কার্য্যে পরিণত করিয়া যাইতে পারি, আমি তাহাই করিব, এবং আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে যত দূর কুলায়, তাহাতেই সাহায্য করিব। আমি জানি,— সে বৃহদনুষ্ঠানে আমার মত অধমের সাহায্য সেতুবন্ধনে কাঠবিড়ালীর সাহায্যের অপেক্ষা অধিক হইবে না। তাহাতে সে অনুষ্ঠানের কোনরূপ অনুভবযোগ্য সাহায্য হইবে কি না সন্দেহ, কিন্তু জেঠামহাশয়ের সঙ্কল্পিত মহদনুষ্ঠানে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়াছি জানিলে, আমি আমার এই তাপতপ্ত জীবনের সায়াহ্নে কিছু তৃপ্তিলাভ করিতে পারিব না কি?

মহারাষ্ট্র সাহিত্য।

মধ্যকালের প্রারম্ভ বা একনাথের যুগ।

১৫৪৮—১৬১০।

জ্ঞানেশ্বরের "ভাবার্থদীপিকা" রচিত হইবার পাঁচ বৎসর পরে, মোসলমানদিগের পঙ্গপালসদৃশ তুরগসেনা মহারাষ্ট্রীয়দিগের স্বাধীনতাহরণের জন্য দাক্ষিণাত্যে অবতীর্ণ হইতে লাগিল; রামদেব রাও ও তাঁহার জামাতা হরপাল দেব স্বদেশের স্বাতন্ত্র্যরক্ষার জন্য কুড়ি বৎসর চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু পাঠানসেনা কর্ত্তৃক হরপালদেব বন্দীভূত ও পাঠানরাজের আদেশে অতি নির্দ্দয়রূপে নিহত হইবার পর, ১৩৪৭ খৃষ্টাব্দে বাহামণি রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়। এই রাজবংশ ১৭৫ বৎসর অক্ষুণ্ণপ্রতাপে মহারাষ্ট্র শাসন করিয়াছিল। বাহামণি রাজ্যের মহানুভাব সচিব মহাবীর মোহম্মদ গওয়ান কপটতাপূর্ব্বক নিহত হইলে উক্ত রাজ্যের বিলোপ ঘটে, এবং তাহার পরিবর্ত্তে পাঁচটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য মহারাষ্ট্র দেশে স্থাপিত হয়। পাঠানদিগের একতা বিনষ্ট হইয়াছে দেখিয়া, মারাঠাগণ মস্তকোত্তোলনের চেষ্টা করেন। বিজাপুর উক্ত রাজ্যপঞ্চকের অন্যতম। উহার প্রতিষ্ঠাতা ইউসুফ আদিলসাহ, মুকুন্দরাও নামক জনৈক মারাঠা সর্দ্দারের ভগিনীর রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া, তাহাকে হরণ করেন। এইরূপে বিজাপুর-রাজবংশে মহারাষ্ট্রশোণিত প্রবিষ্ট হয়, এবং তাহা মারাঠাদিগের

অন্ধকারময় যুগ।

অভ্যুদয়ের বিশেষ সহায়তা করে। বিজাপুরপতির অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া মুকুন্দরাওয়ের ভগিনী স্বদেশবাসীদিগকে বিস্মৃত হন নাই। তাঁহার চেষ্টায় মারাঠাগণ বিজাপুর রাজ্যে উচ্চ পদে নিযুক্ত হইতে লাগিলেন। পূর্ব্বে রাজদপ্তরের কার্য্য পারস্য ভাষায় নির্ব্বাহিত হইত; এই সময় হইতে তাঁহার আদেশে মারাঠী ভাষা পারশীর স্থান অধিকার করিল। বলা বাহুল্য, ইহাতে মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণগণের কারকুন-রূপে দরবারে প্রবেশের সুবিধা ঘটিল। অল্প দিনের মধ্যেই কার্য্যকুশলতাগুণে তাঁহারা বিজাপুরের সুলতানগণের সচিবের পদে উন্নীত হইলেন। বিজাপুরের ন্যায় আহম্মদনগর রাজ্যেও আর্য্যশোণিত প্রবেশলাভ করিয়াছিল। তিমাপ্পা বহিরু নামক এক ব্রাহ্মণসন্তান বিজয়নগরের যুদ্ধকালে মোসলমান কর্ত্তৃক বন্দী হন, এবং স্বীয় অলোকসাধারণ ক্ষমতাগুণে অহম্মদনগর রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া নিজাম উল্‌মুল্ক বহিরী নামে পরিচিত হন। এই স্বধর্ম্মভ্রষ্ট ব্রাহ্মণকুমারের স্থাপিত রাজ্যেও মারাঠাগণ ক্রমশঃ নানা বিষয়ে অগ্রণীত্ব লাভ করেন। নদনপন্ত নামক একজন ব্রাহ্মণ গোলকুণ্ডার সুলতানের সচিবপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। ফলতঃ, মোসলমান রাজদরবারে প্রবেশের সুবিধা পাইয়া মহারাষ্ট্রীয়গণ অনতিদীর্ঘকালের মধ্যেই আপনাদিগের নৈসর্গিক গুণগ্রামের বিকাশ সাধিত করিয়াছিলেন। এই সময়ে একনাথের ন্যায় সাধু পুরুষ ও কবিগণ জন্মগ্রহণ করিয়া, জাতীয় সাহিত্যের পুষ্টি-বিধান করায়, মারাঠাসমাজে নবশক্তির সঞ্চার হইল। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে শিবাজী ঐ শক্তির সদ্ব্যবহার করিয়া "স্বরাজ্য" স্থাপন করিয়াছিলেন।

একনাথস্বামী ১৫৪৭ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার প্রথম কার্য্য বিলুপ্তপ্রায় জ্ঞানেশ্বরীর পাঠসংশোধন পূর্ব্বক উহার বহুল প্রচার। তিনি রুক্মিণী-স্বয়ংবর (শ্লোকসংখ্যা ১৭১০) ভাবার্থরামায়ণ (৪০ সহস্র শ্লোক), স্বাত্মসুখ, চতুঃশ্লোকী ভাগবত, হস্তামলক, শ্রীমদ্‌ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের ভাষান্তর (২০ সহস্র শ্লোক) প্রভৃতি গ্রন্থ ও বহুসংখ্যক অভঙ্গ ও পদাবলী রচনা করেন। একনাথের রচনা অতি সরল, গম্ভীর ও প্রীতিপদ। তাঁহার কবিতা অপেক্ষা তাঁহার উপচিকীর্ষা, নির্ম্মল আচরণ, অপ্রতিম শান্তি, অসাধারণ ক্ষমা ও লোকাতীত ঔদার্য্য প্রভৃতি গুণে তিনি অনেকের পূজনীয় হইয়াছিলেন। তাঁহার সদাচারপ্রভাবে মহারাষ্ট্র সমাজের অন্তর্বল বর্দ্ধিত হইয়াছিল। সর্ব্বজাতীয় মারাঠাগণের মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞানবিস্তারের জন্য তিনি গ্রন্থরচনার এক অভিনব মনোরম পদ্ধতির অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই কারণে, আচণ্ডাল সকলে তাঁহার প্রাঞ্জল রচনা পাঠ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছিল।

একনাথ।

একনাথ নৃসিংহসরস্বতীর অনুশিষ্য ও দত্তাত্রেয়োপাসক ছিলেন। সুতরাং তাঁহার চেষ্টায় সে সময়ে মহারাষ্ট্র দেশের একাংশে দত্তোপাসনার বিশেষ প্রচার হয়। এ স্থলে একটি কথা বলা আবশ্যক যে, একনাথের "দত্ত-সম্প্রদায়," সমর্থের "রামদাসীসম্প্রদায়" প্রভৃতি সমস্ত সম্প্রদায়ই জ্ঞানেশ্বরের প্রচারিত ভক্তিবাদমিশ্রিত অদ্বৈত-মার্গের অনুসরণ করিয়াছিলেন। পণ্ঢরপুর সকলেরই মহাতীর্থ ছিল। সকল সম্প্রদায়েই ভক্তি-প্রধান অদ্বৈততত্ত্বের প্রাধান্যবশতঃ ভিন্নপথাবলম্বীদিগের মধ্যে বিবাদ বা বিরোধের অবকাশ অতি অল্পই ছিল।

অদ্বৈতবাদ।

নৃসিংহসরস্বতীর অন্যতম শিষ্য দাসোপন্ত একজন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার ছিলেন। তিনি শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার এক অতিবিস্তীর্ণ টীকার রচনা করেন। ঐ টীকার নাম "গীতার্ণব"। গীতার্ণব প্রকৃতপক্ষেই সাগরসদৃশ বিশাল গ্রন্থ। উহার শ্লোকসংখ্যা ১ লক্ষ ২৫ হাজার! এই অসাধারণ শক্তিশালী ব্যাসকল্প গ্রন্থকার ১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে সমাধিগ্রহণ করেন শিবাজীর পিতা রাজা শাহজীর গুরু আনন্দতনয়ও এই

গীতার্ণব।

যুগেরই কবি। তাঁহার নব নব ছন্দে রচিত কবিতাবলী নানা স্থানে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এই সময়ে হংসরাজ নামক আর এক প্রসিদ্ধ সাধু আবির্ভূত হন। তিনি "বাক্যবৃত্তি" ও "জ্ঞানেশ্বরে"র অমৃতানুভবের সরল ব্যাখ্যা রচনা করিয়াছেন। এই কালে এক জন প্রসিদ্ধ ভক্তচরিত-লেখক জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার নাম উদ্ধব চিদ্‌ঘন। আরও অনেক ছোট বড় কবি এই যুগে জন্মগ্রহণ করেন।

এই যুগে মারাঠী ভাষায় বহুপরিমাণে আরবী ও পারশী শব্দের প্রবেশ ঘটে। মহারাষ্ট্রীয়গণ মোসলমানদরবারে প্রতিপত্তি লাভ করায় যবনসাহচর্য্যে তাঁহাদিগের কথোপকথনে যাবনিক শব্দের বাহুল্য ঘটিয়াছিল। এই সময়ের কবিগণের মধ্যেও অনেকে পূর্ব্বে রাজসরকারে চাকরী করিতেন; পরে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বনপূর্ব্বক গ্রন্থরচনায় প্রবৃত্ত হন। শিবরাম স্বামী, একনাথস্বামী ও তাঁহার গুরু জনার্দ্দনস্বামী প্রভৃতি অনেকেই যবনদিগের অধীনতায় দেওয়ানি ফৌজদারী বিভাগে কার্য্য করিয়াছিলেন। এই সকল কারণে, তাঁহাদিগের রচনায় আরবী ও পারশী শব্দ বহুলপরিমাণে প্রবেশ লাভ করে। ভাষায় যে সকল গুণ থাকিলে উহা রাজসভায় ব্যবহারের উপযোগী হয়, আরবী ও পারশীর সংস্রবে মারাঠী ভাষা সেই সকল গুণে ভূষিত হয়। যাবনিক শব্দের সহযোগে মহারাষ্ট্রীয় ভাষা পরিপুষ্ট ও একপ্রকার বিশেষ ভঙ্গীযুক্ত, এবং অধিকতর বীরত্বব্যঞ্জক হইয়াছে। মারাঠী ভাষার এই বিশেষত্ব একনাথের রচনাতেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিস্ফুট।

ভাষার রূপান্তর।

মধ্যকাল, বা সমর্থের যুগ।

খৃঃ ১৬০৮ অব্দে রামদাস, তুকারাম, মুক্তেশ্বর ও বিঠ্‌ঠল কবির জন্ম হয়। ইহার পরবর্ত্তী বর্ষে একনাথ সমাধি গ্রহণ করেন। রাজনীতিক্ষেত্রে রাজা শাহাজী, এবং ধর্ম্ম ও সাহিত্যক্ষেত্রে একনাথ যাহা সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই, এই যুগে রামদাস প্রভৃতি সাধু পুরুষগণ এবং শিবাজী, তানাজী ও ময়ূরপন্ত প্রভৃতি বীরাগ্রগণ্য রাজনীতিবিদ্‌গণ তাহা সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন। এই সময়ে মারাঠাগণের সর্ব্ব প্রকার গুণের অপূর্ব্ব বিকাশ ঘটিয়াছিল। ইহার পর এক শতাব্দীর মধ্যে মহারাষ্ট্র দেশে যতগুলি পুরুষ-রত্নের আবির্ভাব হইয়াছিল, পৃথিবীর কোনও দেশে কখনও এত অল্প কালের মধ্যে সেরূপ হয় নাই। এইরূপ পুরুষ-রত্নের বাহুল্য না ঘটিলে কৃতান্তোপম অওরঙ্গজেবের [১২ লক্ষ সৈন্যের সহিত] ২৭ বৎসর কাল অবিশ্রাম যুদ্ধ করিয়া মহারাষ্ট্রীয়গণ কখনও আপনাদিগের স্বাতন্ত্র্যরক্ষায় সমর্থ হইতেন কি না সন্দেহ।

অভ্যুদয়।

খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে যে সকল গ্রন্থকার জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, পাঙ্গারকর মহোদয় তাঁহাদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে বিলাসপ্রিয় রাজযোগী রঙ্গনাথ স্বামীর উল্লেখ করিয়াছেন। ১৬০৬ অব্দে রঙ্গনাথ মানবলীলা সংবরণ করেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থকলাপের মধ্যে "বৃহদ্‌বাক্যবৃত্তি", ভগবদ্গীতার টীকা, এবং "যোগবাশিষ্ঠের" নাম উল্লেখযোগ্য। মধুর-পদ-বিন্যাস-গুণে তিনখানিই, বিশেষতঃ শেষোক্ত গ্রন্থখানি, অতিশয় সুপাঠ্য হইয়াছে। রঙ্গনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীধর মহারাষ্ট্র দেশের একজন লোকপ্রিয় কবি। তাঁহার রচিত পাণ্ডবপ্রতাপ, হরিবিজয়, রামবিজয়, শিবলীলামৃত ও জৈমিনীয়-অশ্বমেধ, এই পাঁচখানির একখানিও পাঠ করেন নাই, এরূপ মারাঠা অতি বিরল। অনেকে মনস্কামনাদিসিদ্ধির জন্য এই সকল গ্রন্থের পারায়ণ করিয়া থাকেন। মহারাষ্ট্র-রমণীসমাজে ও সংস্কৃত-ভাষানভিজ্ঞ পাঠকমণ্ডলীতে শ্রীধরের অপেক্ষা অধিকতর সমাদর আর কোনও কবির ভাগ্যে ঘটে নাই। শ্রীধরের রচিত গ্রন্থসমূহের শ্লোকসংখ্যা ৫০ সহস্রের ন্যূন নহে।

রঙ্গনাথ।

শ্রীধর।

একনাথের পৌত্র মুক্তেশ্বর, রামায়ণ ও মহাভারত অবলম্বনে দুইখানি স্বতন্ত্র কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার রচিত মহাভারতের চারিটির অধিক পর্ব্ব অদ্যাপি কাহারও হস্তগত হয় নাই। প্রবাদ এইরূপ যে, অবশিষ্ট পর্ব্বগুলি কোনও দুষ্ট কর্ত্তৃক ভস্মীভূত হইয়াছে। মুক্তেশ্বরের রামায়ণ তাদৃশ প্রশংসাযোগ্য গ্রন্থ নহে। কিন্তু মহাভারতে তাঁহার যে কবিপ্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা সমগ্র মহারাষ্ট্র-সাহিত্যে অতীব বিরল। অন্যান্য কাব্যগুণেও ইহা অনেক গ্রন্থের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সাধকপ্রবর 'বহিরা পিসা' এই সময়েই শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধ মারাঠীতে রূপান্তরিত করেন।

মুক্তেশ্বর।

এই যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি বামন পণ্ডিত। তিনি বহুসংখ্যক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। বামন পূর্ব্বে ঘোর দ্বৈতবাদী, কর্ম্মকাণ্ডের একান্ত পক্ষপাতী ও গোঁড়া বৈষ্ণব ছিলেন। দেবভাষা সংস্কৃত ভিন্ন অপর ভাষায় কথোপকথন করা তিনি পাপজনক বলিয়া মনে করিতেন। নানাদেশে পরিভ্রমণ করিয়া তিনি বহুসংখ্যক বিজয়পত্র সংগ্রহ করিয়াছিলেন,কিন্তু সমর্থ রামদাস স্বামীর নিকট তাঁহার দর্পচূর্ণ হয়; এবং তিনি অদ্বৈত মতের অবলম্বনপূর্ব্বক ভক্তিমার্গের প্রচারব্রত গ্রহণ করেন। সমর্থের উপদেশে তিনি মারাঠী ভাষায় গ্রন্থরচনা আরম্ভ করেন। তিনি মারাঠীতে "যথার্থ-দীপিকা" নামক গীতার যে টীকার রচনা করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে, তিনি কিরূপ অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন, তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। ষড়্‌দর্শন ও অষ্টাদশ পুরাণ তাঁহার করতলামলকবৎ ছিল। যথার্থ-দীপিকায় বিশেষদক্ষতাসহকারে তিনি সাংখ্য, বৌদ্ধ ও জৈন প্রভৃতি মতের খণ্ডন করিয়া, অদ্বৈতবাদ সিদ্ধ করিয়াছেন। জ্ঞানেশ্বরের ভাবার্থদীপিকায় প্রসাদগুণ যেরূপ ওতপ্রোতভাবে বিদ্যমান, যথার্থ-দীপিকায় সেইরূপ পাণ্ডিত্য ও তর্কবিচারের বাহুল্য দৃষ্ট হয়। নিগমসার, জীবতত্ত্ব, কর্ম্মতত্ত্ব, বেদতত্ত্ব, ব্রহ্মস্তুতি, নামসুধা, কৃষ্ণলীলা প্রভৃতি বিষয়ে তিনি স্বতন্ত্র (মৌলিক) গ্রন্থের রচনা করিয়াছেন। যথার্থদীপিকা ভিন্ন বামনের অন্যান্য রচনায় প্রসাদগুণ যথেষ্ট পরিলক্ষিত হয়। তাঁহার কৃত "শতকত্রয়ের" অনুবাদ, অনেক স্থলে ভর্ত্তৃহরির মূলগ্রন্থ অপেক্ষা অধিকতর সরস হইয়াছে। ফলতঃ, বামনের ন্যায় বিদ্বান্ ও উৎকৃষ্ট অনুবাদক "ন ভূতো ন ভবিষ্যতি।" সরলার্থপূর্ণ যমকরচনার চাতুর্য্য তাঁহার প্রতিভার প্রধান গুণ। বিঠ্‌ঠল কবি বামনের কিঞ্চিৎ পূর্ব্ববর্ত্তী, এবং মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় যমক, চিত্রকাব্য ও কূটশ্লোক-রচনার প্রথম পথপ্রদর্শক। তিনি বিল্বলচরিত, রসমঞ্জরী, বিল্বজীবন, সীতাস্বয়ম্বর, রুক্মিণীস্বয়ংবর প্রভৃতি এবং পদাবলীর রচনা করিয়া মহারাষ্ট্র সাহিত্যের সেবা করিয়াছেন। জয়রাম স্বামীর শান্তিপঞ্চীকরণ, এবং কেশব স্বামী, আনন্দ স্বামী ও মোরয়াদেব প্রভৃতির ভক্তিভাবপূর্ণ কবিতাবলীও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

বামন পণ্ডিত।

চিত্রকাব্য।

এক্ষণে তুকারাম ও রামদাসের নামোল্লেখ করিলেই এই মধ্যযুগীয় কবিগণের পরিচয় এক প্রকার পরিসমাপ্ত হয়। তুকারামের চরিত ও তাঁহার রচিত অভঙ্গের বিষয় বঙ্গীয় পাঠকবর্গের অবিদিত নহে। এই কারণে এ স্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তাঁহার অভঙ্গ পাঠ করিয়া বোম্বাইয়ের শিক্ষাবিভাগের অন্যতম ডিরেক্টার স্যার আলেক্‌জাণ্ডার গ্রাণ্ট মহোদয় বলিয়াছেন, "তুকারামের অভঙ্গ যাহারা পাঠ করেন, তাঁহাদিগের নিকট খৃষ্টীয় নীতিতত্ত্বের প্রশংসা করিতে যাওয়া বৃথা।" তুকারামের প্রায় ১১ হাজার অভঙ্গ মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহার নামানুসারে এই যুগের নামকরণ হইয়াছে, সেই সমর্থ রামদাস স্বামীর সংক্রান্ত আলোচনাও প্রবন্ধ-সংক্ষেপের অনুরোধে আমরা এখানে পরিত্যাগ করিলাম। তাঁহার

প্রসঙ্গ লইয়া আমরা উপস্থিত হইব ; তখন তাঁহার গ্রন্থাদির ও কবিপ্রতিভার বিষয় বিস্তারিত-রূপে আলোচিত হইবে।

আদ্যকালের ন্যায় একালেও কতিপয় ভক্ত-রমণী সাত্ত্বিক-ভাবপূর্ণ কবিতার রচনা করিয়া মহারাষ্ট্র-সাহিত্যকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন। শেখ মহম্মদ নামক এক মোসলমান ভক্ত-কবি "যোগসংগ্রাম" নামক গ্রন্থের রচনা করেন। তিনি তুকারামের ন্যায় বিঠ্ঠলের উপাসনায় দেহ মন সমর্পণ করিয়াছিলেন।

মোসলমান কবি।

এই যুগে মারাঠী ভাষায় গদ্য-গ্রন্থ-রচনার সূত্রপাত হয়। কৃষ্ণাজী অনন্ত সভাসদ্ নামে শিবাজীর এক কর্ম্মচারী সর্ব্বপ্রথমে গদ্যচ্ছন্দে "শিব-ছত্রপতির চরিত" নামধেয় বখর রচনা করেন। প্রসিদ্ধ যুদ্ধাদির বিজয়বার্ত্তা অবলম্বনে গীতিকবিতা রচনার প্রথাও এই সময়েই প্রবর্ত্তিত হয়। আফজল খাঁর হত্যা ও তানাজীর সিংহগড়-বিজয় প্রভৃতি গাথার রচনা করিয়া, রচয়িতারা শিবাজী ও তাঁহার জননীর নিকট পুরস্কার লাভ করিয়াছিল। পেশওয়াগণের মহারাষ্ট্র-শাসনকালে বখর ও ঐতিহাসিক গাথা-রচনার প্রথা বহুলরূপে প্রচলিত হয়। মহারাষ্ট্রসাহিত্যের এই তৃতীয় যুগের ইতিহাস এইখানেই সমাপ্য। এই কালকে মারাঠী ভাষার যৌবনকাল বলা যাইতে পারে।

গদ্য-রচনা।

বিজয়গীতি।

[মহারাষ্ট্র-সাহিত্যের এই যৌবনের ইতিহাস প্রধানতঃ সাত্ত্বিক ভক্তির উচ্ছ্বাস, অদ্বৈত-তত্ত্বের পরিপ্লাবন, বিমল জ্ঞানানন্দের তরঙ্গ-কল্লোল ও সদাচারের লীলাভিনয়ে পরিপূর্ণ। ইহাতে মহারাষ্ট্রীয় কবিতা-কামিনীর মদনবিকার-কলুষিত বিলোল দৃষ্টি, চঞ্চল ভ্রূভঙ্গীলীলা, কনককিঙ্কিণীর শিঞ্জন ও ঘর্ম্মরোমাঞ্চ-নর্ম্মাদির পরিস্ফুরণ দৃষ্ট হয় না। পক্ষান্তরে, তাহার অভূষণমনোহারী, যৌবনসুলভ, মনোজ্ঞ লাবণ্য, কৃতাভ্যাঙ্গস্নানা কনকমণিভূষাবিরহিতা কুঙ্কমকলঙ্কশূন্য উজ্জ্বল ললাটে সিন্দুরবিন্দুমাত্রধারিণী শ্বেতাম্বরা রাজমহিষীর পবিত্র সৌন্দর্য্যের সহিত তুলনীয়। তাহার কোথাও একটু কৌতুক-তরলিত দৃষ্টি, ক্বচিৎ উদ্দাম সৌন্দর্য্যের ঈষৎ চঞ্চল প্রভা, কোথাও যুবতীজনসুলভ মধুর স্মিত-ভাব, কোথাও অভিনবরাগরমণীর মুখকান্তি, কোনও স্থানে কবরীর চতুষ্পার্শ্বে সুগন্ধলুব্ধ ভ্রমর-কুলের মধুর গুঞ্জনে, দেবভাবের সহিত মানবীয় যৌবনবিভ্রমের পরিচয় প্রদান করিতেছে।]

সাহিত্যের স্বরূপ।

মধ্যযুগের অবসান, বা মোরোপন্তের যুগ।

পেশওয়েগণের উদয়কালে, মহারাষ্ট্র দেশের শ্রেষ্ঠ সংকীর্ত্তনকার "অমৃত রায়" (১৬৯৮ খৃঃ—১৭৫৩ খৃঃ) অবতীর্ণ হন। তিনি "ব্রহ্মবিদ্যাভরণ" নামক সংস্কৃত গ্রন্থের প্রণেতা, বারাণসী-নিবাসী অদ্বৈতানন্দ স্বামীর শিষ্য ছিলেন। তাঁহার রচিত বিবিধ উপাখ্যান, পদাবলী ও সীতা প্রভৃতির স্বয়ংবর কথা (পালা) সংকীর্ত্তনকারীদিগের মুখে শ্রুত হওয়া যায়। অমৃত রায়ের কবিতায় যথেষ্ট মাধুর্য্য আছে। রঘুনাথ পণ্ডিত অমৃত রায়ের সমসাময়িক। নলোপাখ্যান নামক তাঁহার একখানিমাত্র কাব্য প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। কি মনোহারিতায়, কি অন্যান্য কাব্যগুণে, এই গ্রন্থ মহারাষ্ট্র ভাষায় অদ্বিতীয়। সুন্দর বর্ণনা-কৌশল, শ্রুতিমধুর পদবিন্যাস, অলঙ্কারপ্রাচুর্য্য, অন্তঃকরণবৃত্তির বিশ্লেষণ এই গ্রন্থে যেরূপ দৃষ্ট হয়, মহারাষ্ট্র-সাহিত্যে অন্যত্র তাহা দুর্লভ। মুক্তেশ্বর ভিন্ন আর কোনও কবি, কাব্যকলায় রঘুনাথ পণ্ডিতের নিকটবর্ত্তী হইতে সমর্থ নহেন। "বলিদান" ও "রাবণগর্ব্বপরিহার"-রচয়িতা চতুর সাবাজীও এই সময়েই প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

অমৃত রায়।

রঘুনাথ।

তাহার পর মহীপতি। তিনি মহারাষ্ট্র দেশের সর্ব্বজনপ্রিয় গ্রন্থকার। শ্রীধরের ন্যায় মহীপতির গ্রন্থাবলীও মহারাষ্ট্রে আবালবৃদ্ধবনিতা ভক্তি ও আদর সহকারে পাঠ করিয়া থাকেন। ভক্তবিজয়, সন্তবিজয়, ভক্তলীলামৃত, সন্তলীলামৃত, নামক প্রকাণ্ড গ্রন্থচতুষ্টয়ে মহীপতি ভারতবর্ষের অধিকাংশ ভক্তের জীবনী অতি সরল ভাষায় ও সরলভাবে বর্ণিত করিয়াছেন। তাঁহাকে মহারাষ্ট্র দেশের ধর্ম্মেতিহাস-রচয়িতা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কথাসারামৃত নামক তাঁহার আর একখানি বৃহদ্‌গ্রন্থ আছে। ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে মহীপতির মৃত্যু হয়।

মহীপতি।

মহীপতির সঙ্গে সঙ্গে মহারাষ্ট্র সাহিত্যের বল-দর্প ও সৌভাগ্যশোভাদির বিলোপের সূত্রপাত হয়। মহারাষ্ট্রীয়দিগের শক্তিসাগরে তখন ভাঁটা আরম্ভ হইয়াছে। তাঁহাদিগের রাষ্ট্রীয় গৌরবসূর্য্য শেষ পেশওয়া মহারাষ্ট্রাধম বাজীরাওয়ের জঘন্য কার্য্যকলাপদর্শনে অধোমুখ হইয়াছেন। সমাজে বিলাসিতা ও স্বার্থপরতার প্রসারবৃদ্ধি হইতেছে। সত্বগুণপ্রধান ভাগবত ধর্ম্মের প্রভাব হ্রাস হইয়া তামসিক শাক্তসম্প্রদায়ের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

অবনতি।

এই সময়ে যে সকল কবি জন্ম-গ্রহণ করেন, শাক্তপ্রবর "রামজোশী" তাঁহাদিগের অগ্রগণ্য। তাঁহার ছড়া ছন্দ, লাওনী, ৪টি কুকুর, ৪টি বানর, ২টি ময়না, একটি অবিদ্যা ও তাহার জন্য রচিত রেশমী দোলা, নৃত্যকুশল বালক ও খঞ্জনী প্রভৃতি বাদ্য সহ তিনি রাওবাজীর সভায় বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার পদাবলীর মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া অনেকেই তাঁহার ভক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি সুপণ্ডিত, অসাধারণ ধীমান্ ও সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। "ছেকাপহ্নুতি" গ্রন্থে তাহার সংস্কৃত কাব্যজ্ঞানের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। মোরোপন্ত সেই যুগের আর এক জন প্রসিদ্ধ কবি। রামজোশী ভিন্ন সেকালে মোরোপন্তের সমকক্ষ আর কেহ ছিল না। মোরোপন্তের ধর্ম্মনীতিমূলক কবিতা বিবেকভ্রষ্ট অপথাচারী রামজোশীকে সৎপথে প্রবৃত্ত করিয়াছিল। কালক্রমে রামজোশী মোরোপন্তের একজন গোঁড়া ভক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। মোরোপন্তের সাহচর্য্যে তাঁহার কবিতার গতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। মূর্খ বাজীরাওয়ের হস্তে মোরোপন্ত নিগৃহীত ও তৎকর্ত্তৃক তাঁহার কবিতা অকিঞ্চিৎকর ও অপাঠ্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হইলে রামজোশী উহা সমগ্র মহারাষ্ট্র দেশে প্রচার করিবার ভার গ্রহণ করেন।

রামজোশীর পর অনন্তফন্দীর নাম লাওনীকার-কবিদিগের অগ্রগণ্য। উপস্থিতক্ষেত্রে কবিতা-রচনার শক্তি তাঁহার অসাধারণ ছিল। তাঁহার কবিতা শুনিবার জন্য ২০ ক্রোশ দূর হইতে লোকসমাগম হইত। তাঁহার সরস কবিতা শ্রবণ করিয়া ক্রোধসন্তপ্ত অহল্যা বাঈ প্রসন্নচিত্ত হইয়া তাঁহাকে এক জোড়া শাল উপহার দিয়াছিলেন। অনন্ত ফন্দী অতিশয় স্পষ্টবাদী ছিলেন। তিনি একদা প্রকাশ্য সভায় বাজীরাওয়ের কার্য্যপ্রণালীর তীব্রনিন্দাপূর্ণ কবিতা আবৃত্তি করিয়া সকলকে চমকিত করিয়াছিলেন। তিনি "মাধবনিধন" নামক কাব্যে মাধবরাওয়ের মৃত্যুকাহিনী বিবৃত করিয়াছেন। এই সময়ের লাওনীকার কবিদিগের মধ্যে হোনাজী, অনগভাউ, প্রভৃতি আরও অনেকের নাম উল্লেখযোগ্য।

অনন্ত ফন্দী।

এই সকল কবিতার অধিকাংশে আদিরসের ও অসারতার বাহুল্য দৃষ্ট হয়। সংস্কৃত নাটকাদির ও মম্মট প্রভৃতির রচিত কবিতাদির অশ্লীলতা এই সময়ে রাওজীর কল্যাণে মারাঠী সাহিত্যে প্রবেশ করে। এই সময়ে বীররসপরিপ্লুত সমরগীতিকাদিও বড় অল্প রচিত হয় নাই। পানিপথের যুদ্ধ, খার্ডার যুদ্ধ, পেশওয়ের সৈন্যবল ও মরাঠা সর্দ্দারদিগের বীরত্ব-মূলক বর্ণনা ঐ সকল গীতিকায় নিবদ্ধ হইয়াছে। এই গীতিকা রচয়িতাদিগের মধ্যে প্রভাকর দাতার সকলের শীর্ষস্থানীয়। পুণার নিকটস্থিত পার্ব্বতী-শৈলের বর্ণনা, পেশওয়েদিগের দানসাগরের বর্ণনা, দ্বিতীয় মাধবরাও-

প্রভাকর।

বাজীরাওয়ের দুরাচার, নানা ফড়নবীস ও ইংরাজদিগের বর্ণন, পুণাবাসীর নিগ্রহ, রাওবাজীর পলায়ন ও দুর্দ্দশা, ইংরাজদিগের লুণ্ঠন, সামান্য বণিকদিগের হস্তে মারাঠাদিগের ন্যায় বীর জাতির পরাজয়জনিত খেদ, বাজীরাওয়ের প্রত্যাবর্ত্তনের আশা ও পরিশেষে গম্ভীর তত্ত্বজ্ঞান-মূলক উপদেশ প্রভৃতি বিষয়ের বর্ণনায় প্রভাকর দাতার যে অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহার তুলনা অন্যত্র দুর্ল্লভ। এ পর্য্যন্ত প্রায় ৮০টি এইরূপ গীতিকবিতা প্রকাশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ১২টি প্রভাকরের রচিত।

কৃষ্ণাজী অনন্ত সভাসদ্ রচিত শিবাজীর জীবনমূলক বখরের বিষয় ইতঃপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। কৃষ্ণাজীর গ্রন্থের পর শিবদিগ্বিজয়, শিবাজীপ্রতাপ, পাণিপতের বখর, ভাউ সাহেবের বখর, মরাঠী সাম্রাজ্যের সংক্ষিপ্ত বখর, চিত্রগুপ্তকৃত বখর ও পেশওয়েদিগের বখর প্রভৃতি বিবিধ গদ্য ইতিহাস গ্রন্থ রচিত হয়। সাতারাধিপতি মহারাজের আদেশে মহ্লার রামরাও চিটনবীস প্রাচীন সরকারী কাগজপত্র অবলম্বনে শিবাজী, সম্ভাজী, রাজারাম ও শাহুর বিবরণ-সংক্রান্ত বখরগুলির ঐতিহাসিক যোগ্যতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। মহ্লার রামরাও রাজনীতিসম্বন্ধে একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। অধিকাংশ বখরের ভাষা ওজস্বিনী ও হৃদয়ের আনন্দ-বর্দ্ধিনী। বখরের ভাষায় যে compactness ও পরিপাটী আছে, আজকালকার গদ্যভাষায় তাহার সদ্ভাব দৃষ্ট হয় না।

পেশওয়েদিগের অধঃপতনকালে যে সকল কবির উদয় হয়, মোরোপন্ত তাহাদিগের শিরোভূষণস্বরূপ। তিনি আর্য্যাচ্ছন্দে (প্রায় তিন লক্ষ) কবিতা রচনা করিয়াছেন। আর্য্যাচ্ছন্দে কবিতা-রচনায় মোরোপন্তের যশোগৌরবের বৃদ্ধি হইয়াছে, অথবা মোরোপন্তের অমরলেখনী-স্পর্শে আর্য্যাচ্ছন্দের গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে। তাঁহার রচিত গ্রন্থের শেষ নাই বলিলেও বিশেষ দোষ হয় না। অষ্টাদশ পর্ব্ব মহাভারত, কৃষ্ণবিজয়, বৃহদ্দশম, মন্ত্র-ভাগবত ও মন্ত্ররামায়ণ (সংস্কৃত) প্রভৃতি গ্রন্থের আকার ক্ষুদ্র নহে। তদ্ভিন্ন অষ্টোত্তরশত প্রকারের রামায়ণ, সন্মণিমালা, কেকাবলী, প্রশ্নোত্তরমালা, সৎসঙ্গ, পণ্ঢরপুর-মাহাত্ম্য, নামসুধা, সন্মনোরথরাজি, সংশয়-রত্নমালা প্রভৃতি বহুসংখ্যক মনোরম বিষয়ে তিনি ক্ষুদ্র বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন তাঁহার বিভিন্ন দেবতা ও সাধুপুরুষগণের স্তুতিমূলক যে কত কবিতা আছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। যমক, অলঙ্কার ও অনুপ্রাসের জন্য তাঁহার কবিতা বিশেষ প্রসিদ্ধ। কথিত আছে, তিনি প্রত্যহ দেড় শত পর্য্যন্ত কবিতা আর্য্যাচ্ছন্দে রচনা করিতেন। তথাপি তাঁহার রচনায় মধুরতা ও বিচিত্র শোভা এবং কল্পনার কৌতুকক্রীড়া বহুলরূপে পরিলক্ষিত হয়। তিনি স্বীয় কবিতায় ভাষার ব্যাকরণগত দোষসমূহ পরিহারপূর্ব্বক ভাষা-সংস্কারের বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহার কাব্যে কবিজনসুলভ সাধারণ দোষসমূহও অধিকমাত্রায় বিদ্যমান নাই। তাঁহার কবিতার মনোহারিতা তাঁহার কাব্য না পাঠ করিলে বুঝাইবার উপায় নাই। অপরাপর কবির ন্যায় তাঁহার চিত্তসংযম ও তেজস্বিতাও যথেষ্ট ছিল। রাণী অহল্যা বাঈ ও পেশওয়ে বাজীরাও তাঁহাকে নিষ্কর ভূসম্পত্তি প্রদান করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন; কিন্তু স্বাধীনচেতা মোরোপন্ত তাহা গ্রহণ করেন নাই।

মোরোপন্ত।

তাঁহার রচনা শক্তি।

এইখানে মহারাষ্ট্র সাহিত্যের প্রাচীন ইতিহাস পরিসমাপ্ত হইল।

ইহার পর লেখক সংক্ষেপে আধুনিক সাহিত্যের অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন। প্রবন্ধবিস্তার-ভয়ে এবার সে প্রসঙ্গ ত্যাগ করিতে হইল।

শক্তিপ্রয়োগের নূতন ব্যবস্থা।

আধুনিক সভ্যতার অনুরোধে, কল-কারখানার বৃদ্ধির সহিত প্রাকৃতিক শক্তির সুলভ ভাণ্ডার ক্রমেই ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে;—কিন্তু এই ক্ষয়পূরণের কোনও আশু সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। এখন উপায় কি? এই গুরুতর প্রশ্নটি লইয়া আধুনিক দার্শনিকগণ বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। কথাটি বাস্তবিকই চিন্তনীয়,—আজকালকার রাজনৈতিক মহলের মুদ্রাসমস্যা অপেক্ষা বৈজ্ঞানিক জগতের উক্ত প্রশ্নটির গুরুত্ব অনেক অধিক। কয়লা ও মৃৎ-তৈল আমাদের কল-কারখানা এবং গার্হস্থ্য কার্য্যাদি পরিচালনের প্রধান অবলম্বন;—মহিমাময়ী প্রকৃতি, ভবিষ্য পার্থিব-সন্তানের জন্য, বহু যুগ ধরিয়া যে প্রভূত শক্তিরাশি ধরাবক্ষে সস্নেহে লুক্কায়িত রাখিয়াছিলেন, এখন অমিত-ব্যয়ী সন্তানগণ সেই লুক্কায়িত ধনের উদ্ধার করিয়া, ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা কার্য্যে তাহার অপব্যবহার করিতেছে। কিন্তু এই গুপ্ত শক্তিরও একটা সীমা আছে। আজ কাল নানা কার্য্যে যে প্রকার কয়লা ব্যয়িত হইতেছে, তাহাতে নিশ্চয়ই ভবিষ্যতে ভূগর্ভ অঙ্গারহীন হইয়া যাইবে;—আবার পৃথিবীর লোকসংখ্যা-বৃদ্ধি ও সভ্যতাবিস্তারের সহিত, ভূপৃষ্ঠস্থ বৃহৎ বৃহৎ অরণ্যমাত্রেরই যে প্রকার উচ্ছেদ দেখা যাইতেছে,—তাহাতে যে এখন বৃক্ষাদি ভূপ্রোথিত হইয়া পুনরায় নূতন কয়লা উৎপন্ন হইবে, এ প্রকার আশাও করা যায় না। এই সকল বিষয়ের আলোচনা করিয়া আজকাল অনেক পণ্ডিত অনেক কথা বলিতেছেন; কতক-গুলি দার্শনিক বলিতেছেন,—অক্ষম ব্যক্তির ন্যায়, ক্ষীয়মাণ পৈতৃক সম্পত্তির উপর আর লোলুপ দৃষ্টিপাত করিয়া কাজ নাই; এখন যাহাতে অপর প্রাকৃতিক শক্তি আমাদের ব্যবহারোপযোগী হইতে পারে, এখন হইতেই তাহার ব্যবস্থা করা উচিত;—সুলভ শক্তিভাণ্ডার শূন্য হইলে বর্ত্তমান সৃষ্টির বিনাশ অবশ্য-ম্ভাবী। দার্শনিকগণের এই উপদেশ শুনিয়া, অপর কোনও অসংযত স্বাভাবিক-শক্তি শৃঙ্খলিত করিয়া আমাদের কলকারখানা প্রভৃতির কার্য্যে প্রয়োগ করিবার জন্য, আজকাল অনেকেই সচেষ্ট রহিয়াছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এ পর্য্যন্ত কেহই কৃতকার্য্য হন নাই। আমেরিকার বিখ্যাত নায়েগ্রা জল-প্রপাতের বারিপতনশক্তি ব্যবহারোপযোগিনী করিবার বহুকালব্যাপী মহা আয়োজন কি প্রকারে ব্যর্থ হইয়াছিল, তাহা বোধ হয়, পাঠক পাঠিকাগণ

অবগত আছেন। কিন্তু সম্প্রতি ডোভার-নগর-নিবাসী ফ্লেচার নামক এক ইংরাজ শিল্পী, সমুদ্রতরঙ্গের শক্তি দ্বারা কয়েকটি যন্ত্রের পরিচালনে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আধুনিক বিজ্ঞানের কেন্দ্রস্থান মার্কিনের প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানবিদ্‌গণ বহু উদ্যোগে যাহা সম্পন্ন করিতে পারেন নাই,—ইংলণ্ডের এক জন অজ্ঞাতনামা যন্ত্রনির্ম্মাতা সেই মহৎ কার্য্য সুসাধিত করিবার উপক্রম করিয়াছেন।

ফ্লেচার সাহেব, যে উপায়ে উত্তাল সাগরতরঙ্গের শক্তি সুসংযত করিয়া, নানা যন্ত্রাদি পরিচালিত করিতেছেন, কিছু দিন হইল, তাহার বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। সমগ্র বিবরণটি কিঞ্চিৎ জটিল হইলেও, যে মূল উপায়ে সেই উচ্ছৃঙ্খল প্রাকৃতিক শক্তি সুনিয়ন্ত্রিত হইতেছে,—তাহা অতি সহজ। পাঠক-পাঠিকাগণ দেখিয়া থাকিবেন,—একটি অনতিদীর্ঘ কাষ্ঠখণ্ড লম্বভাবে জলমধ্যে প্রবেশিত করিলে, তাহাতে জলের বাধা অণুমাত্র অনুভব করা যায় না; কিন্তু উক্ত দণ্ডের এক প্রান্তে যদি এক খণ্ড প্রশস্ত কাষ্ঠ বা ধাতুফলক সংলগ্ন করিয়া, উহার সেই প্রান্ত আবার জলনিমজ্জিত করা যায়, তাহা হইলে, উক্ত কাষ্ঠ-ফলকের আয়তনানুসারে, জলের বাধা ক্রমেই অধিক হইয়া পড়ে। ফ্লেচারের যন্ত্রে, একটি দীর্ঘ ধাতব-নলের প্রান্তে এক খণ্ড বৃহৎ কাষ্ঠ বা ধাতুফলক উক্ত প্রকারে সংলগ্ন থাকে; যন্ত্রের এই অংশটির ভার অতীব লঘু বলিয়া, অবলম্বন-হীন হইয়াও, ইহা জলমধ্যে ভাসিতে পারে; সমুদ্রের উপরিভাগস্থ বৃহৎ তরঙ্গ-মালার ঘাত-প্রতিঘাতে ইহা অণুমাত্র বিচলিত হয় না। যন্ত্রের দ্বিতীয় অংশটি, অন্তঃশূন্য একটি ভাসমান ধাতুগোলক; উহা সমুদ্রতলের মৃত্তিকার সহিত শিথিল ভাবে শৃঙ্খলিত থাকিয়া, তরঙ্গাঘাতে সর্ব্বদাই আন্দোলিত হইতে থাকে। এখন প্রথমোক্ত স্থির অংশে সংলগ্ন একটি পিষ্টন্ (Piston), শেষোক্ত সচল গোলকে আবদ্ধ একটি নলের (Cylinder) সহিত সংযুক্ত করিয়া দিলেই, পিষ্টনটি সাধারণ পিচ্‌কারীর ন্যায়, নলের মধ্যে এক সরল পথে গমনাগমন করিতে পারে। পিষ্টনের এই গতি, নানা যন্ত্রে প্রযুক্ত করিয়া, ফ্লেচার সাহেব আজকাল অনেক কার্য্যসাধন করিতেছেন। আজকাল ডোভার-উপসাগরের নৌনিবাসে এই শ্রেণীর যে সকল যন্ত্র ব্যবহৃত হইতেছে, তাহাদের প্রত্যেকের ভার প্রায় দ্বাদশ টন্,—এবং তদ্দ্বারা বৈদ্যুতিক আলোকের উৎপাদন, জলোত্তোলন প্রভৃতি অনেক কার্য্য স্বল্পব্যয়ে ও অল্প লোকের সাহায্যে সুসম্পন্ন হইতেছে।

মুদ্রাবিভ্রাট।

রজতমুদ্রা ভারতে বহুদিন প্রচলিত। ইংরাজ-রাজত্বের প্রারম্ভে এই মুদ্রার অত্যন্ত আদর ছিল। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ভারত সাম্রাজ্যে ইংরাজ-রাজ মুদ্রাপ্রচলনের রীতিমত ব্যবস্থা করেন। বাণিজ্যের জন্য বিনিময় আবশ্যক; বিনিময়ের সুবিধার্থ মুদ্রার প্রচলন। রৌপ্যের স্থায়িত্ব, স্বকীয় মূল্য (Intrinsic value) প্রভৃতির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এবং প্রধানতঃ ভারতের সাধারণ লোকের অবস্থার সম্যক পর্য্যালোচনা করিয়া, ভারতসাম্রাজ্যে অন্যান্য ধাতুর অপেক্ষা রৌপ্যমুদ্রার প্রচলন বিশেষ উপযোগী বলিয়া স্থিরীকৃত হয়। ঘর সংসার চালাইবার জন্য অধিকাংশ লোকের যে সকল সামান্য ক্রয়-বিক্রয়ের আবশ্যক হইত, তাহা কড়ি ও পয়সার দ্বারা সহজে নির্ব্বাহিত হইত। কাজেই দরিদ্র ভারতে ধনশালী ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের ন্যায় স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন অন্ততঃ সে সময়ে সম্ভবপর ছিল না। সে সময়ে ভারতে বৈদেশিক বাণিজ্য এত দূর বিস্তৃতি লাভ করে নাই, এবং ভারতবাসীর বিলাস ও অভাব এতটা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় নাই বলিয়াই, রজতমুদ্রা অনায়াসে আপনার সার্থকতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল।

ক্রমে ক্রমে ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের সহিত ভারতের অবাধ বাণিজ্য বিস্তৃত হইতে লাগিল। আমাদের শিক্ষা ও সভ্যতার ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অভাব ও বিলাস বাড়িতে লাগিল; সেই সকল অভাব ও বিলাস পূর্ণ করিতে আমাদের অধিক পরিমাণে বৈদেশিক দ্রব্যের আবশ্যক হইতে লাগিল। বৈদেশিক দ্রব্যের আমদানি এত বাড়িতে লাগিল যে, সেই সকল দ্রব্যের বিনিময়ে, আমরা আমাদের ভারতজাত দ্রব্য দিয়া কুলাইয়া উঠিতে পারিলাম না। এইরূপে ক্রমে আমদানি দ্রব্যের মূল্য রপ্তানি দ্রব্যের মূল্য অপেক্ষা অধিক হওয়ায়, আমরা ইংলণ্ডের নিকট ঋণী হইতে লাগিলাম। ১৮৩৫ সাল হইতে ১৮৯৫ সাল পর্য্যন্ত আমরা এইরূপে যে ঋণজালে জড়িত হইয়াছি, তাহার আর্থিক পরিমাণ প্রায় ৫৮৬ ক্রোর মুদ্রা। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য কারণেও ভারত ইংলণ্ডের নিকট ঋণী হইয়া পড়িতেছে।

ভারত দরিদ্র। ভারতের আভ্যন্তরীণ উন্নতির জন্য যে সকল ব্যয় আবশ্যক, ভারত স্বয়ং তৎসমুদয় বহন করিতে সক্ষম নহে। সেই সকল ব্যয়নির্ব্বাহার্থ

বিস্তারের জন্য আমাদিগকে ইংলণ্ডের নিকট যে কত টাকা ঋণ গ্রহণ করিতে হয়, তাহার ইয়ত্তা করা সহজ নহে। আবার রাজার আদেশে আমাদের অন্যান্য অনেক ব্যয়ভার ইংলণ্ডে স্বর্ণমুদ্রায় বহন করিতে হয়। আমাদের রাজা আমাদিগের নিকট হইতে সাক্ষাৎসম্বন্ধে কোনও কর গ্রহণ করিয়া স্বদেশে লইয়া যান না বটে, কিন্তু ইংলণ্ডের সুবিধার জন্য আরব দেশের রাজপ্রতিনিধির বেতন, বোগদাদের কন্সলের খরচপত্র প্রভৃতি নানাবিধ ব্যয়ভার অকারণে ভারতের ঘাড়ে চাপাইয়াছেন। দিন দিন এই সকল ব্যয়ের পরিমাণ বর্দ্ধিত হইতেছে, এবং সেই ঋণভার ভারতের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে।

ইংলণ্ডে স্বর্ণমুদ্রা প্রচলিত; আমাদের পূর্ব্বোক্ত ঋণসমূহ পরিশোধ করিতে হইবে সেই স্বর্ণমুদ্রায়। আমাদের স্বর্ণমুদ্রা নাই, সুতরাং স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে আমাদিগকে রৌপ্যমুদ্রা দিতে হইবে।

স্বর্ণ ও রৌপ্য উভয় ধাতুরই স্বকীয় মূল্য আছে। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে উভয় ধাতুর স্ব স্ব স্বকীয় মূল্যের বড় হ্রাস বৃদ্ধি হইত না। এই জন্য,উভয় ধাতুর আনুপাতিক মূল্যের কতকটা স্থিরতা ছিল। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের পরেও স্বর্ণের স্বকীয় মূল্য পূর্ব্বে যাহা ছিল, তাহাই রহিয়া গেল; কিন্তু রৌপ্যের স্বকীয় মূল্য যাহা ছিল, তাহা অপেক্ষা অনেক কম হইয়া পড়িল। এক Sovereign স্বর্ণমুদ্রায় ১২৩. ২৭৪ গ্রেণ স্বর্ণ আছে। ১২৩. ২৭৪ গ্রেণ স্বর্ণের মূল্য পূর্ব্বে যাহা ছিল, এখনও প্রায় তাহাই আছে। কিন্তু আমাদের ১৲ টাকায় যে ১৮০ গ্রেণ রৌপ্য আছে, সেই পরিমাণ রৌপ্যের মূল্য পূর্ব্বে যাহা ছিল, এখন তাহা অপেক্ষা অনেক কম হইয়া পড়িয়াছে। এই প্রকারে উভয় ধাতুর আনুপাতিক মূল্যের তারতম্য ঘটিতেছে। পূর্ব্বে ভারতকে ১ পাউণ্ড স্বর্ণমুদ্রার ঋণ পরিশোধ করিতে হইলে ইংলণ্ডকে দশটি রজতমুদ্রা দিলেই চলিত। কিন্তু এক্ষণে স্বর্ণের স্বকীয় মূল্যের কোনও বিশেষ বৈলক্ষণ্য না হওয়ায়, এবং রৌপ্যের স্বকীয় মূল্যের হ্রাস হওয়ায়, এক পাউণ্ড স্বর্ণমুদ্রার ঋণপরিশোধার্থ আমাদিগকে অন্ততঃ সতেরটি রৌপ্য মুদ্রা দিতে হয়। এক্ষণে বোধ হয় সহজেই প্রতীয়মান হইবে যে, রৌপ্যের স্বকীয় মূল্যের হ্রাসই বর্ত্তমান মুদ্রাবিভ্রাটের অন্যতম কারণ। স্বর্ণের ন্যায় রৌপ্যের স্বকীয় মূল্য যদি সমভাবে থাকিত, তাহা হইলে আমাদিগকে অকারণে প্রত্যেক পাউণ্ড ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য সাতটি করিয়া বেশী টাকা দিতে হইত না। একে ত দিন দিন ভারতের ঋণের বৃদ্ধি, তাহার উপর

রৌপ্যের স্বকীয় মূল্যের হ্রাস কেন হইল? অন্যান্য দ্রব্যের মূল্য যে নিয়মের বশবর্ত্তী, রৌপ্যাদি ধাতুর স্বকীয় মূল্যও সেই সকল নিয়মের অধীন। পরিমাণ ও প্রয়োজনীয়তা অনুসারে দ্রব্যের মূল্য নির্দ্ধারিত হয়। ১৮৭০ সাল হইতে নূতন নূতন খনি আবিষ্কৃত হওয়ায় স্বর্ণ ও রৌপ্যের পরিমাণ পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বাড়িয়াছে। স্বর্ণের পরিমাণবৃদ্ধির সহিত উহার প্রয়োজনীয়তারও বৃদ্ধি হইয়াছে বলিয়াই, ঐ ধাতুর স্বকীয় মূল্যের হ্রাস বৃদ্ধি হয় নাই; আর রৌপ্যের পরিমাণবৃদ্ধির সহিত উহার আবশ্যকতা পূর্ব্বাপেক্ষা কমিয়া যাওয়ায় উহার স্বকীয় মূল্যেরও হ্রাস হইল। ভারতের ন্যায় জর্ম্মনি প্রভৃতি দেশে রৌপ্যমুদ্রার প্রচলন ছিল। বৈদেশিক বাণিজ্যের বিস্তৃতি ও বিদ্যাবুদ্ধিবলে ঐ সকল প্রদেশ ক্রমে ক্রমে ধনশালী হইয়া উঠিল। রৌপ্যমুদ্রার পরিবর্ত্তে এই সকল প্রদেশে স্বর্ণমুদ্রার আবশ্যক হইল। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে জর্ম্মণ সাম্রাজ্যে, এবং তৎপরেই ইউরোপখণ্ডের অন্যান্য প্রদেশে, রৌপ্যমুদ্রার স্থলে স্বর্ণমুদ্রা অভিষিক্ত হইল। সোনার আদর বাড়িল, রূপার আদর কমিল। মুদ্রা প্রস্তুত করিবার জন্যই রৌপ্যের বিশেষ প্রয়োজন। স্বর্ণের ন্যায় রৌপ্যের পরিমাণ বর্দ্ধিত হইল বটে, কিন্তু জর্ম্মণি প্রভৃতি রাজ্যে মুদ্রার জন্য আর রৌপ্যের আবশ্যকতা রহিল না। সুবর্ণের পরিমাণবৃদ্ধির সঙ্গে রাজ্যে সুবর্ণমুদ্রার প্রচলন হওয়ায়, সুবর্ণের গৌরব অক্ষুণ্ণ রহিল।

এই প্রকারে ক্রমে ক্রমে রৌপ্যের স্বকীয় মূল্যের যে হ্রাস হইয়াছে ও হইতেছে, তাহা ইংরাজ বণিকের এই দেশে ব্যবসায় করিবার পক্ষে বিশেষ হানিজনক হইয়া উঠিয়াছে। এ দেশে ব্যবসা করিতে হইলে, ইংরেজ বণিককে নিজের স্বর্ণমুদ্রা রৌপ্যমুদ্রায় পরিণত করিতে হইবে, এবং ব্যবসায়সমাপনান্তে গৃহে যাইবার সময় রৌপ্যমুদ্রাকে পুনরায় স্বর্ণমুদ্রায় পরিবর্ত্তিত করিতে হইবে। ব্যবসায়-প্রারম্ভে রৌপ্য ও স্বর্ণমুদ্রায় স্বকীয় মূল্যের যে আনুপাতিক বিভিন্নতা ছিল, ব্যবসায়-অন্তে সেই আনুপাতিক মূল্যের বিভিন্নতা আরও বাড়িয়া গেল। মনে করুন, এক ইংরেজ ধনী এক পাউণ্ড স্বর্ণমুদ্রা লইয়া ভারতে ব্যবসায় করিতে আসিলেন। ভারতে আসিয়া তদানীন্তন প্রচলিত স্বর্ণ ও রৌপ্যের আনুপাতিক মূল্যানুসারে এক পাউণ্ড স্বর্ণমুদ্রার পরিবর্ত্তে দশটি রজতমুদ্রা প্রাপ্ত হইলেন; দুই বৎসর কাল ভারতে ব্যবসায়ে ব্যাপৃত রহিলেন, এবং সেই দুই বৎসর কাল বাণিজ্য করিয়া আপনার আনীত মূলধনের উপর দুই টাকা লাভ পাইলেন। কিন্তু আমাদের পূর্ব্বোল্লিখিত নিয়মানুসারে, এই দুই বৎসর কালের মধ্যে রৌপ্যের

স্বকীয় মূল্যে আরও কম হইয়া পড়িয়াছে; এই কারণে দুই বৎসর পূর্ব্বে এক পাউণ্ডের পরিবর্ত্তে যেরূপ দশ টাকা পাইয়াছিলেন, এক্ষণে গৃহপ্রত্যাগমনের সময় দশ টাকার পরিবর্ত্তে এক পাউণ্ড স্বর্ণমুদ্রা আর পাইলেন না। তখন এক পাউণ্ড স্বর্ণমুদ্রার জন্য, বোধ হয়, তাঁহাকে চৌদ্দটি রৌপ্যমুদ্রা দিতে হইবে। এইরূপে ইংরাজ ব্যবসায়ী গৃহ হইতে মূলধন আনিয়া, সবিশেষ পরিশ্রমপূর্ব্বক ব্যবসায় করিয়া লাভবান হইলেন বটে, কিন্তু Exchangeএর দায়ে পড়িয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন। পাঠক স্মরণ রাখিবেন যে, উভয় ধাতুর স্বকীয় মূল্যের বিভিন্নতা ইংরাজব্যবসায়ীর কি প্রকারে অনিষ্ট সাধন করিতেছে, তাহা বুঝাইবার জন্যই এই উদাহরণের অবতারণা; উভয় ধাতুর স্বকীয় মূল্যের বিভিন্নতার যথার্থ পরিমাণ উহাতে প্রদর্শিত হয় নাই।

এই বিভ্রাটে ভারতের ইংরাজ রাজকর্ম্মচারিগণও বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। ইংরাজ রাজকর্ম্মচারিগণ বেতন পান রৌপ্যমুদ্রায়; অধিকাংশ ব্যয় কিন্তু তাঁহাদিগকে স্বর্ণমুদ্রায় করিতে হয়। যে ইংরাজ রাজকর্ম্মচারী বেতন পান মাসিক ১৫০০ টাকা, তাঁহাকে পুত্রকন্যার ভরণপোষণ ও শিক্ষার ব্যয়াদির নির্ব্বাহ জন্য ও ভবিষ্যৎসঞ্চয়ের জন্য, অন্ততঃ হাজার টাকা বিলাতে পাঠাইতে হয়। পূর্ব্বে বিলাতে হাজার টাকার পরিবর্ত্তে অন্ততঃ একশত পাউণ্ড পাইতেন; কিন্তু এক্ষণে এক হাজার টাকার পরিবর্ত্তে তিনি ষাট পাউণ্ডের বেশী পাইবেন না। ভারত গভর্মেণ্ট compensation allowance দিয়া ইংরাজ রাজকর্ম্মচারিগণের এই আর্থিক কষ্টের অনেকটা লাঘব করিয়াছেন সত্য বটে, কিন্তু দরিদ্র ভারতকে compensation allowance রূপ এক নূতন ব্যয়ভার বহন করিতে হইবে। আমাদের দেশে প্রচলিত মুদ্রার মধ্যে রৌপ্যমুদ্রাই শ্রেষ্ঠ, এই জন্য রৌপ্যমুদ্রা সম্বন্ধে এতগুলি কথা বলা হইল। রৌপ্যমুদ্রা মুদ্রার মধ্যে শ্রেষ্ঠ—ইহার তাৎপর্য্য এই যে, উহার ক্রয়শক্তির (Purchasing Power) উপর নির্ভর করিয়া ভারতের যাবতীয় বিনিময়োপযোগী দ্রব্যের মূল্য নির্দ্ধারিত হয়। সেই জন্যই ভারতে রৌপ্য Standard value হইয়াছে। কেবলমাত্র রৌপ্যের ক্রয়শক্তির উপর নির্ভর করিয়া ভারতে যাবতীয় দ্রব্যের মূল্য নিরূপিত হয় বলিয়াই রৌপ্যের এত প্রাধান্য। অন্যান্য ধাতুর যে সকল মুদ্রা (Subsidiary coins) প্রচলিত আছে, তাহারা কেবল রৌপ্যমুদ্রার প্রচলনের সুবিধার জন্য। সেই সকল মুদ্রার আকার, প্রকৃতি ও কার্য্যকারিতা রৌপ্যমুদ্রার তুলনায় নির্দ্ধারিত হয়; তাহাদের

স্বকীয় ক্রয়শক্তির উপর অন্যান্য মূল্য নির্ভর করে না। এই জন্য রৌপ্যের ক্রয়-শক্তির সহিত ব্যবসায়োপযোগী যাবতীয় দ্রব্যের মূল্যের অতি নিকট সম্বন্ধ। রৌপ্যের স্বকীয় মূল্যের হ্রাস হইলে রৌপ্যমুদ্রার ক্রয়শক্তিরও হ্রাস হয়, এবং রৌপ্যের ক্রয়শক্তির হ্রাস হইলে ভারতের যাবতীয় ব্যবসায়োপযোগী দ্রব্যের মূল্য বর্দ্ধিত হয়। যাবতীয় দ্রব্য মহার্ঘ হইলে নিশ্চয়ই ব্যয়বৃদ্ধি হইবে। রৌপ্যমুদ্রার ক্রয়শক্তির হ্রাস হইলে, পূর্ব্বে যাহার মাসিক ৫৲ টাকায় সংসার চলিত, তাহার সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার জন্য অন্ততঃ ৭৲ টাকার আবশ্যক হইবে। গবর্মেণ্ট অগ্রে যে ভৃত্যকে ৫৲ টাকা মাহিয়ানা দিতেন, জিনিসপত্র মহার্ঘ হইলে সে অন্ততঃ ৭৲ টাকা মাহিনার দাওয়া করিবে। এই জন্য রৌপ্যের স্বকীয় মূল্যের হ্রাস হওয়ায় গবর্মেণ্টের ব্যয়ের বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী।

এই ত গেল ব্যয়ের কথা। ভারত গবর্মেণ্টকে অধিকাংশ ব্যয় স্বর্ণমুদ্রায় করিতে হয়; আয় কিন্তু কেবল রৌপ্যমুদ্রায়। আবার সে আয় অধিক বর্দ্ধিত করিবার সম্ভাবনা নাই। দরিদ্র ভারত নূতন করের পীড়ন আর সহ্য করিতে পারিবে না, তাহা ভারতগভর্মেণ্ট বিলক্ষণ বুঝিয়াছেন। রাজস্ব হইতেই গভ-র্মেণ্টের প্রধান আয়—অনেক স্থলে সেই রাজস্বের পরিমাণবৃদ্ধি করিবার উপায় নাই। আয় সীমাবদ্ধ, ব্যয় অজস্র; এবং সেই জন্যই গভর্মেণ্ট বর্ত্তমান বিভ্রাটে বিশেষ চিন্তিত।

এই বিভ্রাট হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য ভারত গভর্মেণ্ট দুই একটি উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, কিন্তু তৎসমুদায় নিষ্ফল হইয়াছে। সম্প্রতি উপায়-নির্ণয়ের জন্য ইংলণ্ডে এক কমিশন বসিয়াছে। সেই কমিশন অনেক গণ্য মান্য অর্থনীতিবেত্তা পণ্ডিতের সাক্ষ্য গ্রহণ করিতেছেন। শীঘ্রই সেই কমিশন আপনার মন্তব্য প্রকাশ করিবেন। এই বিভ্রাট হইতে পরিত্রাণ পাইবার যে সকল উপায় অবলম্বিত হইতেছে, তৎসমুদয়ের বিশেষ বিবরণ বারান্তরে বলিবার ইচ্ছা রহিল।

সহযোগী সাহিত্য।

সাহিত্য।

রাডিয়ার্ড কিপ্‌লিং।

সম্প্রতি রাডিয়ার্ড কিপ্‌লিং মরণাপন্ন হইয়াছিলেন। সেই পীড়ার সময় ইংরাজী-পাঠক-সমাজ তাঁহার জন্য যেরূপ উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন, তাহা হইতেই কিপ্‌লিংএর আদর বুঝা যায়।

নিউইয়র্কের কোন হোটেলে রোগশয্যায় শয়ান কিপ্‌লিংএর জন্য লোকে যেরূপ চিন্তিত হইয়াছিল, রাজরাজেন্দ্রাদিপরিবেষ্টিত মরণাপন্ন রাজরাজেশ্বরের জন্যও লোক তত চিন্তিত হয় কি না সন্দেহ।

ইংরাজী সাহিত্যে কিপ্‌লিংএর আদরের একটু বিশেষত্ব আছে। তিনি যে স্থান অধিকার করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নাই—প্রতিযোগী হইবার মত কাহাকেও দেখি না। আজ কাল আংলোস্যাক্‌সন্ জাতির মনে যে নব "ইম্পিরিয়াল" ভাব সমুদিত হইয়াছে, তাহা কত দূর কিপ্‌লিংএর কার্য্য, সে বিষয়ে কোন স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব নহে। তবে এ কথা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে যে, এই "ইম্পিরিয়ালিস্‌মে"র জন্য তিনি যথেষ্ট করিয়াছেন। ব্যক্তিবিশেষসম্বন্ধে যাহাই হউক, এ কথা নিশ্চিত যে, কোন সম্প্রদায় বা জাতিকে নিরবচ্ছিন্ন যুক্তি তর্কে চালনা করা যায় না—ভাব ও সাময়িক উত্তেজনাই তাহাদিগকে পরিচালিত করিবার প্রকৃষ্ট উপায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ কিপ্‌লিংএর White Man's Burden বা "গৌরাঙ্গদিগের দায়িত্ব" ইতিশীর্ষক কবিতার উল্লেখ করা যাইতে পারে। আমেরিকায় এই কবিতা ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের অধিকারের স্বপক্ষে অব্যর্থ যুক্তি বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল; কেহ কেহ ইহাও বলেন যে, সেই সমস্যার সময় এই কবিতাটি প্রকাশিত না হইলে আমেরিকা স্পেনের সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিত কি না সন্দেহ। কিন্তু এ কবিতায় যুক্তির লেশমাত্র নাই। ইহা কেবল গত যুদ্ধে আমেরিকার করতলগত জাতিকে "সভ্য" করা রূপ পুরস্কারহীন মহৎ ব্রতগ্রহণের জন্য আমেরিকার সুসন্তানদিগকে উদ্দীপনাপূর্ণ আহ্বান। এ আহ্বান কি জন্য? অ্যাংলোস্যাক্‌সন জাতি সাহসের, প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের ও অপ্রতিহত সৌজন্যের গর্ব্ব করিয়া থাকেন। এবার সেই সকল গুণপরীক্ষার সময় উপস্থিত, তাই এই আহ্বান। ব্যবসাই আমেরিকার উন্নতির মূল; ব্যবসার হিসাবে দেখিতে গেলে, আমেরিকা এই রাজ্যবিস্তারকার্য্যে লিপ্ত হইলে, অন্তর্জাতীয় ঈর্ষ্যাবিদ্বেষজর্জ্জরিত সশস্ত্র ইয়ুরোপ তাহার ব্যবসায়ে ধনলাভকার্য্যে নানা বিঘ্ন উপস্থিত করিবে; তাই দূরদর্শী আমেরিকার স্বাধীনতাস্থাপয়িতৃগণ বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন,—"আর রাজ্য বাড়াইও না; গণ্ডীর বাহিরে যাইও না।" খ্রীষ্টান পরার্থপরতার ভিত্তির উপর কিপ্‌লিং তাঁহার উদ্দীপনাপূর্ণ আহ্বান স্থাপিত করেন নাই। সে আহ্বানের উদ্দেশ্য ইহাও নহে যে, গৌরাঙ্গগণ অন্যান্য জাতির সেবকের কার্য্য করুন। কর্ত্তব্যপালন, নিয়মপালন ও আত্মসংযমন—এই তিনের ফলে দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য পাওয়া যায়। তাই দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য করিবার জন্য—দায়িত্বগ্রহণের জন্য, কিপ্‌লিংএর এই আহ্বান।

ইম্পিরিয়ালিস্‌ম্।

কিন্তু খাস কবিতাটা পাঠ করিলে, তাহার যুক্তিবিন্যাস দেখিয়া হাস্যসংবরণ করা দুরূহ হইয়া উঠে। তাহাতে অ্যাংলোস্যাক্‌সন্ জাতির চিরবর্দ্ধনশীল স্বার্থবিজড়িত রাজ্যবিস্তারস্পৃহাকে মহৎ আত্মদান—স্বার্থসম্পর্কশূন্য শ্রম বলা হইয়াছে। নিতান্ত আত্মপ্রশংসাপ্রিয় অন্ধ নহিলে চতুর লেখকের সে বিকৃত ব্যাখ্যা দেখিয়া কেহ হাস্য সংবরণ করিতে পারিবে না। অ্যাংলোস্যাক্‌সনজাতি এমনই গর্ব্বান্ধ! সে কবিতা সম্বন্ধে আমরা কিছু বলিব না; কারণ গৌরাঙ্গপদপিষ্ট আমরাও, কিপ্‌লিংএর মতে, "Half devil and half child"; তবে ইংলণ্ডের "ট্রুথ" পত্রে এই কবিতার উত্তরে যে কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে; তাহার কয় স্থান উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। ইহার লেখকও ইংরাজ।—

"Pile on the brown man's burden,
And if ye rouse his hate,

With shells and Dumdum bullets
A hundred times make plain,
The brown man's loss must ever
Imply the white man's gain."

আবার—

"Reserve for home consumption
The Sacred 'sight of man'"

এ কবিতা তীব্র বিদ্রূপপূর্ণ। আর এক জন কবি কিপ্‌লিংএর উত্তরে কৃষ্ণকায়ের মুখ দিয়া গৌরাঙ্গকে যাহা বলাইয়াছেন, আমরা সাহস করিয়া তাহার দুইটি চরণমাত্র উদ্ধৃত করিলাম—

"You cheat us for your profit,
You damn us for your gain."

এই অবধি থাক। "বাইবেলের" সঙ্গে সঙ্গে "বিয়ারের" প্রচারকথা আর তুলিব না।

নূতন নীতি।

কিপ্‌লিংএর রচনায় নূতন ধরণের নীতি প্রকটিত হইয়াছে। সভ্যতানুমোদিত প্রচলিত নীতির উপর তাঁহার বড় আস্থা নাই। আংলোস্যাক্‌সন জাতি আবহমান কাল হইতে যে সকল বিষয়ে শ্রদ্ধা ও ভক্তি দেখাইয়া আসিতেছে, কিপ্‌লিংএর কবিতা ও গল্পে সে সকলের প্রতি অবজ্ঞার ভাব সুস্পষ্ট। এই কারণেই কিছু দিন পূর্ব্বে কোন কোন মধ্যবিত্ত ভদ্রসম্প্রদায়ে কিপ্‌লিংএর রচনা নীতিবিগর্হিত বলিয়া বিবেচিত হইত।

ইংরাজ-চরিত্র ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠা।

ভারতবর্ষসংক্রান্ত ক্ষুদ্র গল্পগুলিতে কিপলিং দেখাইয়াছেন যে, স্বদেশ ও স্বজাতি হইতে দূরে—বিজিত বিদেশীয় জাতির মধ্যে আসিয়া ইংরাজ অনেক সময় বাল্যকালের শিক্ষা ও সংযম কতকটা ভুলিয়া যায়। কিন্তু আবার সেই সকল গল্পেই তিনি বিশদরূপে দেখাইতে ভুলেন নাই যে, ভারতসীমান্তে, দুর্গম বনবাসে, ব্যাধি বিপত্তির বাত্যায় ইংরাজ ইংরাজই; তখন তাঁহারা ইংরাজের প্রকৃতিগত অবিকৃত ও অবিচলিত কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও ইংরাজের সুনামের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে ভুলেন না। মনুষ্যত্বই কিপলিংএর আদর্শ। প্রাচীন স্পার্টান মনুষ্যত্ব হইতে তাহা বিভিন্ন। কিপলিংএর মতে বিধাতার আশীর্ব্বাদ, শুভই হউক আর অশুভই হউক, বিনীতমস্তকে গ্রহণ করাই মনুষ্যত্বের পরাকাষ্ঠা, আর কর্ত্তব্যনিষ্ঠাই মানবের সর্ব্বোচ্চ আদর্শ। যাহার নিকট তাহার কর্ত্তব্য সুস্পষ্ট, কিপ্‌লিংএর মতে সেই সুখী। লোকে বহু চেষ্টায় আপনার কর্ত্তব্য বুঝিতে পারে। বুঝিতে পারিলে অবিচলিত অধ্যবসায়সহকারে সে কর্ত্তব্য সম্পন্ন করাই বিধি। সামাজিক ব্যবহার সম্বন্ধে কিপ্‌লিং বলেন যে, লোকের মতামতে কান দিবার আবশ্যক নাই—প্রত্যেকে স্ব স্ব বিবেকানুমোদিত কার্য্য করুক। কিপলিং তাঁহার পূর্ব্বলিখিত গল্পে ও গানে এই মতেরই প্রচার করিয়াছেন। এ শিক্ষা নূতন, সন্দেহ নাই। ইংরাজী ভাষার উপর অসাধারণ প্রভাব না থাকিলে, এরূপ মত প্রচার করিয়া কিপলিংএর ভাগ্যে যশোলাভ দূরে থাক্‌, প্রভূত ঘৃণা ও উপহাসলাভ ঘটিত, সন্দেহ নাই। কেবল ভাষাচাতুরীতে তাহা হয় নাই। ভাষা এমনই মহাস্ত্র!

কিপলিংএর শিক্ষা।

বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে কিপলিংএর স্বজাতীয়গণ তাঁহাকে জাতীয় গায়কের পদে অভিষিক্ত করিয়াছেন। তিনি জগতে আংলোস্যাকসন জাতির দায়িত্ব বুঝাইবার বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার দায়িত্বের ধারণা ভ্রান্ত হইতে পারে; কিন্তু তাঁহার চেষ্টা আন্তরিক। ব্যক্তিকে ছাড়িয়া তিনি এখন জাতিকে শিখাইবার চেষ্টা করিতেছেন। তিনি বুঝাইতে চাহেন যে, যদি এ কথা স্বীকার করিতে হয় যে, প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিগত কর্ত্তব্য আছে, তবে এ কথাও স্বীকার্য্য যে, প্রত্যেক

জাতির জাতীয় কর্ত্তব্য আছে। প্রত্যেকে বিধাতৃদত্ত ক্ষমতার সদ্ব্যবহার করিলে জাতীয় মনুষ্যত্বের পরিণতি হয়। সাধারণ লোকের পক্ষে ইহাই একমাত্র নিয়ম। ইংলণ্ডের যশঃসমুজ্জল ভূতকালের কীর্ত্তিকলাপের উল্লেখ করিয়া,—তাহার বর্ত্তমান কালে সুবিস্তৃত সাগরাম্বর সাম্রাজ্যের বর্ণনা করিয়া, ইংরাজদিগকে বিপদ ও আয়াস তুচ্ছজ্ঞান করিতে শিখাইতে হইবে; আর সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগকে শিখাইতে হইবে যে, আলস্য মহাপাপ, অলসতা সর্ব্বপাপজননী। ইংরাজগণ এ শিক্ষা বুঝে—এ শিক্ষার আদর করে, তাই কিপ্‌লিংএর কবিতার এত আদর। জুবিলির পরই কিপলিং যে কবিতা লেখেন, তাহাতে পাঠকসমাজ যেরূপ বিচলিত হইয়াছিল, কোন একটি কবিতাপাঠে পাঠকসমাজ আর কখনও সেরূপ বিচলিত হইয়াছিল কি না সন্দেহ। সেরূপ দৃষ্টান্ত নিতান্তই বিরল। —কবিতাটির ছন্দ দোষশূন্য। তাহার ভাব এই—তোমাদের সেনাবল যতই কেন অধিক হউক না, জাতীয় হৃদয় যদি প্রকৃত ভাবে ও অনুরাগে পরিচালিত না হয়, তবে সবই বৃথা। ইংরাজগণের পুরাকালের ঘটনাবলী বিস্মৃত হওয়া বা তাহা লইয়া নীচ জনের মত দন্ত করা উচিত নহে। তাহারা তাহাদের অধিকার ও প্রতাপ বজায় রাখিবেই কিপ্‌লিং এ সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা নূতন নহে; তবে তাঁহার ভাবপ্রকাশের ভঙ্গিটি নূতন।—তাঁহার ভাবপ্রকাশের ক্ষমতা অসাধারণ। যেমন বাদ্যকুশল বাদক অঙ্গুলিস্পর্শে যন্ত্র হইতে ইচ্ছামত নানা মধুর সুর বাহির করিতে পারেন, তেমনই কিপলিং স্বেচ্ছায় ভাষাকে নানাভাবপ্রকাশের উপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারেন। তাঁহার গীত পুরাতন, তবে তিনি সেই গীতে যে সুর লাগাইয়াছেন, তাহা নূতন ও মনোরম। কিপলিংএর এই ভাবপ্রকাশক্ষমতাই অসাধারণ। অ্যাংলোস্যাকসন জাতির মজ্জাগত ভাব ও বাসনা কিপ-লিংএর রচনায় যেমন ফুটিয়াছে, তেমন বোধ করি, আর কুত্রাপি ফোটে নাই।

সমাজ-তত্ত্ব।

ইংরাজ-চরিত্র সম্বন্ধে আমেরিকানের অভিমত।

হার্পার্স্ ম্যাগাজিনের মার্চ্চ সংখ্যায় মিঃ জুলিয়াস্ রাল্‌ফ "ইংরাজ-চরিত্রের বিশেষত্ব" ইতিশীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন। ঐ প্রবন্ধে ইংরাজ-চরিত্র সম্বন্ধে তাঁহার সংস্কার সংক্ষিপ্তভাবে লিখিত হইয়াছে। তিনি বলেন,—"রাজপ্রীতি, জাতির প্রতি ও প্রত্যেক রাজকীয় অনুষ্ঠানের প্রতি অবিচলিত ভক্তি, তাহাদের প্রকৃতিপ্রিয়তা, জীব জন্তুর প্রতি প্রীতি, পুষ্পে অনুরাগ, ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় শ্রদ্ধা, বক্তৃতাকালে যথাযথ-বাক্যনির্ব্বাচন, রক্ষণশীলতা, এবং যাহা কিছু স্বদেশীয় তাহাতেই অসীম বিশ্বাস, এইগুলিই ইংরাজ-চরিত্রের বিশেষত্ব। ইংরাজদিগের সহিত জর্ম্মনীর, আমেরিকার ও জাপানের বাণিজ্যবিষয়িণী প্রতিযোগিতায় শেষোক্ত গুণের জন্যই তাঁহারা পশ্চাতে পড়িয়া থাকিতেছেন।" মিঃ রাল্‌ফ বলেন,—'ইংরাজের 'হোমের' গর্ব্ব ও স্বাচ্ছন্দ্যের, ব্যায়ামে ও জলক্রীড়ায় অত্যন্ত অনুরাগের বিষয় উল্লেখ করিলেই, আমার বোধ হয়, ইংরাজ-চরিত্রের প্রধান বিশেষত্বের বিষয় সংক্ষেপে বর্ণনা করা হইল; কারণ, অনুসন্ধিৎসু বিদেশীয়ের নিকট বিশেষ গবেষণায় ইহাই প্রতীত হয়।

লণ্ডনের বড় বড় বাড়ীগুলির বাহ্যিক দৃশ্য অশোভন। বাক্সের-আকার সাদাসিধা মহলগুলি ধূলিমলিন কারখানা-বাড়ীর মত দেখায়। কিন্তু অভ্যন্তরভাগ প্রাসাদতুল্য। ইংরাজেরা প্রায়ই

সাধারণ। যখন কাহারও সহিত প্রথম আলাপ করেন, তখন তাঁহাদের সম্বন্ধে

তাঁহাদের স্বত্ব, কি স্বাধীনতা, অথবা সাচ্ছন্দ্যের কণামাত্রে আঘাত লাগে, তখন তাঁহাদের আচরণ নিতান্ত কর্কশ ও নীরস হইয়া উঠে। এই সকল ব্যবহারে তাঁহারা নিজের প্রতিই অবিচার করিয়া থাকেন। ইহা অশিষ্টাচার, অসামাজিকতা, অথবা নিজের প্রতি অতি-বিশ্বাসের ফল বলিয়া বোধ হয়। ইংরাজের মানসিক বৃত্তি আমাদের অপেক্ষা ধীর,—প্রত্যেক বিষয়েই ধীর; আমাদের অপেক্ষা তাহারা পরিণামদর্শী, অধিক সহিষ্ণু, অধিক চিন্তাশীল, অধিক কালাপেক্ষী এবং প্রত্যেক বিষয়ে আরাম-অন্বেষণার্থী।

উত্তম রাজপথ ও অবিরাম ভোজনব্যাপারের ব্যবস্থা দেখিয়া মিঃ রাল্‌ফ ইংলণ্ড দ্বীপকে অশ্বগণের পক্ষে স্বর্গরাজ্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। অশ্বগণকে অবিরত আহার প্রদত্ত হয়। জনসাধারণের ভোজনব্যাপারও এইরূপ। শয্যার ভিতর হইতেই চা-পান আরম্ভ হয়, তাহার পর ব্রেকফাষ্ট, মধ্যাহ্নে জলযোগ, বৈকালিক চা পান, সান্ধ্য-ভোজন এবং শয়নের পূর্ব্বে নৈশজলযোগের ব্যবস্থা থাকে। এইগুলির সংখ্যা ছয়টি মাত্র; ইহার মধ্যে চারিবার নিয়মিত আহার আপামর সাধারণের অভ্যস্ত।

অবিরাম ভোজন।

শ্রমজীবিগণ ও শিল্পিগণ পূর্ব্বাহ্নে ও অপরাহ্নে কিঞ্চিৎ আহার বা পান ও ধূমপানের জন্য কিয়ৎকাল কার্য্য বন্ধ করিয়া থাকে। তেজঃক্ষয়কারী জল বায়ুর প্রভাব ও লোকের মদ্যপানের অভ্যাসই ইহার কারণ। লণ্ডনবাসের প্রথম তিন মাসের মধ্যে আমার শরীর এক দিনের জন্যও বেশ গরম বোধ হয় নাই। অবশেষে একজন ব্যাঙ্কার আমাকে অপরাহ্নে স্পিরিট সেবন করিতে উপদেশ দিলেন। তিনি বলেন, উত্তেজক পানীয় ব্যতীত এ দেশে বাস করা অসম্ভব। গরিবদিগের মদ্যপানের ইহাই কারণ।"

রাল্‌ফ ইংলণ্ডের সর্ব্বত্রই শ্রেণীবিভাগ দেখিয়াছেন। যাঁহারা শ্রেণীবিভাগ উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব করেন, তাঁহাদের মধ্যেও তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি বলেন,—পৃথিবীর মধ্যে স্বাধীনতা ও অত্যাচার শাসনাধীন ইংলণ্ডে আমেরিকাবাসিগণ ইংরেজ অপেক্ষাও অধিকতর স্বাধীনতা উপভোগ করিয়া থাকেন।

জাতিবিভাগ।

ইংরাজগণ কেবলমাত্র তাঁহাদের নিজের দলে অথবা তাঁহাদের অপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর দলে মিশিতে পারেন; কিন্তু আমেরিকানগণ, উপযুক্ত হইলে, যে কোন ইংরাজ-দলে মিশিতে পান। একজন ইংরাজ তাঁহার পদমর্য্যাদা অনুযায়ী বাসস্থান ও জীবিকার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে বাধ্য হন, এক জন আমেরিকান সেখানে পর্ণকুটীরে বাস করিয়াও আপনার সামাজিক পদমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারেন তিনি তাঁহার অভিরুচি মত পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতে পারেন, ইচ্ছা করিলে নিমন্ত্রণসভায় তিনি বোহিমিয়ানগণের ব্যবহারের লক্ষণ দেখাইলেও ক্ষতি নাই, কেহই তাঁহার ভুল ধরে না, এবং তাঁহার খেয়াল তদীয় প্রকৃতিগত বিবেচনা না করিয়া, জাতিগত বিবেচনা করিয়া, সদয়ভাবে ক্ষমা করা হয়। আমি অনেকবার দেখিয়াছি যে, কোন ইংরাজ ইংলণ্ডপ্রবাসী কোন আমেরিকানের গৃহে অসাবধানভাবে ও আদব কায়দার অন্তরাল না রাখিয়া কথোপকথন করিতেছেন, কিন্তু তখনই যদি আর একজন ইংরেজ সেই গৃহে প্রবেশ করেন, তাহা হইলে ইংরেজের আর পূর্ব্বভাব থাকে না। ইংরাজ অজ্ঞাতকুলশীল স্বদেশবাসীর সহিত কিছুতেই ঘনিষ্ঠ হইতে সম্মত নহেন, কিন্তু সামান্যপদস্থ আমেরিকা-বাসীকেও সম্ভ্রম, সম্মান করিতে অসম্মত নহেন।

বিবিধ।

ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ও ডিকেন্স।

শ্রীমতী ওয়ার্ড হো তাঁহার ইংলণ্ড ও ইউরোপ ভ্রমণের সম্বন্ধে কয়েকটি কথা লিখিয়াছেন।— ৮৪২-৪৩ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীমতী হো ও তাঁহার স্বামী ডাক্তার হো বারিষ্টার ফষ্টার সাহেবের চেম্বর-গৃহে নিমন্ত্রিত হন। সেই নিমন্ত্রণস্থলে সাহিত্যরথী ডিকেন্স সাহেব সস্ত্রীক উপস্থিত ছিলেন; প্রসিদ্ধ চিত্রকর মাকলিসও সেখানে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। আহারান্তে বৈঠকখানায় বসিয়া কাফিপান চলিতেছিল। সেই সময়ে শ্রীমতী হো কোন কারণে তাঁহার স্বামীকে ডাকিবার সময় 'ডারলিং' বলিয়া সম্বোধন করেন। ডিকেন্স সাহেব এই সম্বোধন শ্রবণ করিয়া এমনই রহস্যবোধ করিয়াছিলেন যে, ঘরের মেঝেয় চিৎ হইয়া পড়িয়া, দুই পা শূন্যে তুলিয়া কেবলই বলিয়াছিলেন, "অ্যাঁ, স্বামীকে 'ডারলিং' বলিয়া সম্বোধন!" একজন ভদ্রমহিলাকে এ ভাবে ঠাট্টা করা কত দূর সুরুচিসঙ্গত বলিতে পারি না। ইংলণ্ডে না হইয়া যদি আমেরিকার কোন খাস ইংরেজরমণীর কোন একটা কথা শুনিয়া একজন আমেরিকাবাসী এমনই চিৎ হইয়া পড়িয়া পা দুখানি আকাশে তুলিয়া এই ভাবে রহস্য করিতেন, তাহা হইলে ডিকেন্স সাহেব হয় ত নানাপ্রকারে সেই ভদ্রলোকটির রুচির নিন্দাবাদ করিতেন।

আর এক দিন ডাক্তার হো কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য কবি-গৃহে গমন করিয়াছিলেন, এবং সেখানে তাঁহার কার্ড ও পরিচয় রাখিয়া আসিয়াছিলেন। সেই দিনই সন্ধ্যার সময়ে চা-পানের নিমন্ত্রণ আসিয়া পৌঁছিল। সন্ধ্যার সময়ে হো সাহেব সস্ত্রীক কবিগৃহে উপস্থিত হইলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহারা সেখানে আনন্দ অনুভব করিতে পারেন নাই; কারণ, কবির বিধবাকন্যা সেই দিন সংবাদ পাইয়াছিলেন যে, আমেরিকার এক সিকিউরিটি কোম্পানী দেউলিয়া হইয়াছে, এবং কবিদুহিতার অনেক টাকা মারা গিয়াছে। সে দিন ঐ ক্ষতির কথাই প্রধান আলোচ্য বিষয় হইয়াছিল। বাড়ীর সকলের মুখেই সেই কথা, সুতরাং নিমন্ত্রিত অতিথিগণকেও সেই আলোচনাতেই যোগ দিতে হইয়াছিল। শ্রীমতী হো বলিয়াছেন,—চা-পান হইল বটে, কিন্তু তাহাও টেবিলের কাছে বসিয়া নহে। বসিয়া বসিয়া শুধু সেই অর্থক্ষতির কথাই শুনিতে লাগিলাম। আমরা যখন চলিয়া আসি, তখন কবিবর যথোচিত ভদ্রতা প্রকাশ করিলেন। আমরা কিন্তু পর দিন প্রাতেই তাঁহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ না করিয়াই সে স্থান ত্যাগ করিয়াছিলাম।

টলষ্টি।

ইয়ংম্যান পত্রের এক জন লেখক কাউণ্ট টলষ্টির ভূতপূর্ব্ব সেক্রেটারী এবং বর্ত্তমানে এসেক্সে নির্ব্বাসিত মিঃ চার্টককের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন, এবং সেক্রেটারী মহোদয়ের সহিত কাউণ্টের পারিবারিক বিষয়ে কথোপকথন হইয়াছিল। গত মার্চ্চ মাসের পত্রে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা নিম্নে তাহার সারসঙ্কলন করিয়া দিলাম। সেক্রেটারী মহাশয় বলিয়াছিলেন,—আপনি স্মরণ রাখিবেন, টলষ্টির বর্ত্তমান মতসংগঠনের পূর্ব্বেই তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার স্ত্রী ধনশালিনী, এবং টলষ্টির মতের সহিত তাঁহার সহানুভূতি মোটেই নাই। লোকে কি বলিবে না বলিবে, সে দিকে অণুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করিয়া কাউণ্টেস্

বতী। বিবাহের অল্প দিন পরেই টলষ্টি তাঁহার কতকগুলি পুস্তকের স্বত্ব স্ত্রীকে লিখিয়া দেন; এখন সেগুলি বিশেষ আয়ের সম্পত্তি। মতপরিবর্ত্তনের পর টলষ্টি তাঁহার অনেকগুলি পুস্তকের সম্পর্ক ত্যাগ করেন, কারণ, সেগুলি তাঁহার বর্ত্তমান মতের বিরোধী। এবং পুস্তকবিক্রয়লব্ধ অর্থগ্রহণে তিনি সম্পূর্ণ অসম্মত। একবার তাঁহার পুস্তক বাহির হইলেই তাহা সাধারণের সম্পত্তি হইয়া যায়, যাঁহার ইচ্ছা, তিনিই সে সকল পুস্তক ছাপাইতে পারেন। তাঁহার মত-পরিবর্ত্তনের পর তিনি তাঁহার বহুপূর্ব্বের লিখিত ও স্ত্রীকে প্রদত্ত পুস্তক সকলের সম্বন্ধেও এই ব্যবস্থা করিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার স্ত্রী আপনার স্বত্ব ত্যাগ করিতে অস্বীকার করেন, এবং এখনও সেই সকল পুস্তকের বিক্রয়লব্ধ অর্থ গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাঁহার স্বামীর যে ইহা ইচ্ছা নহে, তাহা জানিয়াও তিনি অর্থগ্রহণ করিয়া থাকেন। ইহাতেই টলষ্টির পারিবারিক সুখশান্তির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

বিদেশী গল্প।

মহিলা ডিটেক্‌টিভ।

নবপ্রচারিত "হারম্‌স্‌ওয়ার্থ ম্যাগাজিন" হইতে নিম্নলিখিত গল্পটির মর্ম্মানুবাদ প্রদত্ত হইল—

কর্ণেল ম্যাথুরিণকে দুষ্কৃতকারীদিগের "সম্রাট" বলা যাইতে পারে। তাহার প্রকৃত নাম কেহ জানিত না; ম্যাথুরিণ নাম গ্রহণ করিয়াই সে ডেট্রইট নগরে ব্যাঙ্কে ডাকাতি করিয়াছিল। ঐ ডাকাতিতেই ব্যাঙ্কের কার্য্যাধ্যক্ষ মৃত্যুমুখে পতিত হন। পুলিসের কর্ত্তাদের বিশ্বাস ছিল, যে, রসিটিয়ার নাম লইয়া যে ব্যক্তি মেলবোর্ণ সহরে নানা দুষ্কার্য্য করিয়াছিল, সেই পরে ম্যাথুরিণ নাম গ্রহণ করে।

পুলিসের বহু চেষ্টা সত্ত্বেও ম্যাথুরিণ ধরা পড়ে নাই। লোকে জানিত, সে "মরিয়া"—জীবিতাবস্থায় তাহাকে ধরা অসাধ্য সাধন। কেহ সে কল্পনাও করিতে পারিত না। আবার সে স্বয়ং কখন কোথায় থাকিত, কেহ জানিত কি না সন্দেহ। যাহাদের দ্বারা সে অভিপ্রেত দুষ্কর্ম্ম করাইত, তাহারাও অনেকে তাহার চেহারা পর্য্যন্ত জানিত না।

কেবল দুই জন লোক তাহাকে দেখিয়াছিল; প্রথম, তাহার হস্তে নিহত ডেড্রইট ব্যাঙ্কের কার্য্যাধ্যক্ষ; অপর, ঘটনাস্থলে উপস্থিত তাহার বাগ্‌দত্তা প্রণয়িনী;—উভয়ের বিবাহ স্থির হইয়া গিয়াছিল। ব্যাঙ্কের কার্য্যাধ্যক্ষের এই প্রণয়িনী কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া ম্যাথুরিণ ফাঁসি-কাঠে আপনার পাপের প্রায়শ্চিত্ত

একদিন বেলা দেড়টার পর এক রমণী একখানি ভাড়াটিয়া গাড়ীতে লণ্ডন সহরের রিজেণ্ট ষ্ট্রীট দিয়া যাইতেছিলেন। গাড়ী দ্রুত চলিলে তাঁহার শরীর অসুস্থ হয় বলিয়া শকটচালকের প্রতি শকট ধীরে চালাইবার আদেশ ছিল। সূর্য্যোকরোজ্জ্বল রাজপথ জনকোলাহলে আনন্দময়; পুরুষেরা মাধ্যাহ্নিক আহারের চেষ্টায় ব্যস্ত। পথে মালিনী মেয়েরা "ভাল ভায়লেট, তাজা ভায়লেট, —এক তোড়া এক পেনি!" হাঁকিয়া যাইতেছে।—শকটারোহিণী মনোযোগ-পূর্ব্বক জনতা লক্ষ্য করিতেছিলেন। তিনি বিশেষ সুন্দরী নহেন; কেন না, তাঁহার দৃঢ়সম্বদ্ধ ওষ্ঠাধরে তাঁহার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের কিছু হ্রাস হইয়াছিল। তাঁহার কেশ কৃষ্ণবর্ণ, নয়ন নীল, ভ্রূযুগল ঋজু।

তখন "কাফে রয়ালের" বাহিরে ভিড় হইয়াছিল। রমণীর দৃষ্টি সেই সোপানশ্রেণীর উপর দণ্ডায়মান কয়টি মনুষ্যের প্রতি আকৃষ্ট হইল। তিনি গাড়ী থামাইয়া নামিলেন। শকটচালককে পুরস্কৃত করিয়া রমণী "কাফে"র দিকে অগ্রসর হইলেন। তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া শকটচালক প্রস্থান করিল। যাহারা হোটেলের সোপানে দাঁড়াইয়াছিল, একবার তাহাদের দিকে চাহিয়া রমণী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাহাদের মধ্যে এক জন আর এক জনকে বলিল, "ও মেয়েটি নিশ্চয়ই আমেরিকান। উহারা সব করিতে পারে।"

রমণীর অব্যবহিত পূর্ব্বে এক জন মুণ্ডিতগুম্ফশ্মশ্রু দীর্ঘাবয়ব পুরুষ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। উভয়ে ভোজনগৃহে উপনীত হইলেন। পুরুষটি দেখিয়া একটা নির্জন টেবিলের চেয়ারে বসিলেন। রমণী তাঁহার পশ্চাতে—তাহার পশ্চাদ্দিকে সম্মুখ করিয়া একটা বড় টেবিলের চেয়ারে বসিলেন। হোটেলের ভৃত্য আসিয়া মহিলাটিকে বলিল, "এ টেবিল চারি জন বসিবার।" রমণী বলিলেন, "তা" হোক। আমি এখানেই বসিব।" কিছু বক্‌সিস্ পাইয়া ভৃত্য আর উচ্চবাচ্য করিল না।

সে কক্ষে অনেক লোক ভোজনরত। কোন টেবিলে এক জন, কোনটায় দুই জন, কোনটায় বা এক দল বসিয়া আহার করিতেছিলেন। অনেকে মহিলাটিকে লক্ষ্য করিতেছিল। রমণী ও সেই মুণ্ডিতগুম্ফশ্মশ্রু পুরুষ—উভয়েই নীরবে আহার করিতেছিলেন। পুরুষটি আহারান্তে ভৃত্যকে মদ্য আনিতে বলিলেন। রমণী আপনার আহার্য্যের মূল্যের হিসাব ও এক টুকরা কাগজ চাহিলেন। কাগজ লইয়া রমণী তাহাতে কি লিখিলেন ও সেখানি যত্নসহকারে ভাঁজ

কিয়ৎক্ষণ পরেই আহার্য্যের মূল্য প্রদান করিয়া পুরুষটি প্রস্থানোদ্যত হইলেন। রমণীও দস্তানা পরিয়া প্রস্থানের জন্য প্রস্তুত হইলেন। পুরুষটির পশ্চাৎ পশ্চাৎ রমণীও কক্ষত্যাগ করিলেন। এই অপরিচিত যুগলের একত্র আবির্ভাব ও তিরোভাবে কাফের আর সকলে কিছু বিস্মিত হইল। কেহ বা আঁচাআঁচি করিয়া একটু হাসিল।

ভদ্রলোকটি বাহিরে সোপানে আসিতেই দ্বারবান জিজ্ঞাসা করিল, "গাড়ী চাহি কি?" তাহার পর রমণীকে দেখিয়া সে বলিল, "আপনারও কি গাড়ী দরকার?" সে শকটচালক ডাকিবার অভিপ্রায়ে বাঁশীতে ফুঁ দিল। তাহার পার্শ্বস্থিত পাহারাওয়ালা বন্ধু অর্দ্ধসমাপ্তগল্পে দাঁড়াইয়া রহিল।

ইত্যবসরে রমণী ক্ষিপ্রহস্তে ভদ্রলোকটির পকেট হইতে তাঁহার চুরুটের বাক্সটি চুরি করিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে দ্বারবান তাহা দেখিতে পাইল।

ভদ্রলোকটি ফিরিয়া বলিলেন, "আমার—"

দ্বারবান বলিল, "আপনার কিছু হারাইয়াছে? এই স্ত্রীলোকটি আপনার পকেটে হাত দিয়াছিল; আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি।"

পাহারাওয়ালা অগ্রসর হইল।

ভদ্রলোকটি বলিলেন, "আমার চুরুটের বাক্সটি লইয়াছে। বৃথা গোলে কাজ নাই। বাক্স ফিরাইয়া দিলে আমি আর কিছু বলিব না।"

রমণী প্রগাঢ়বিরক্তিব্যঞ্জকভাবে বলিলেন, "কে আপনার চুরুটের বাক্স লইয়াছে? আপনি কেন আমার এরূপ অপমান করিতেছেন?"

এতক্ষণে পাহারাওয়ালা রোষকষায়িতলোচনে বলিল, "ও সব চালাকীতে হইবে না। থানায় যাইতে হইবে।" তাহার পর সে ভদ্রলোকটিকে বলিল, "একখানা বড় গাড়ী লইয়া থানায় যাওয়া যাউক। কি বলেন, মহাশয়?"

ভদ্রলোকটি সম্মতিপ্রকাশ করিলেন।

গাড়ীতে উঠিবার সময় রমণী বিরক্তিব্যঞ্জকস্বরে বলিলেন, "আমি জীবনে আর কখনও এরূপ অপমানিতা হই নাই।"

সমস্ত পথ কেহ কোনও কথা কহিলেন না।

পাহারাওয়ালা সমস্ত পথ একদৃষ্টে রমণীর দিকে চাহিয়াছিল; ভয়—পাছে রমণী তাহার অজ্ঞাতসারে অপহৃত দ্রব্যটি পথে নিক্ষেপ করেন।

থানায় আসিয়া ভদ্রলোকটি রমণীর নামে নিয়মমত অভিযোগ করিলেন।

ন পোষাক অনুসন্ধানের জন্য তাঁহাকে পার্শ্বের কক্ষে অনুসন্ধানকারিণীর
় পাঠান হইল।

প্রকোষ্ঠের দ্বার রুদ্ধ হইবামাত্র রমণী পকেট হইতে অপহৃত চুরুটের বাক্স বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখিলেন ও অনুসন্ধানকারিণীকে অপর পকেট হইতে তাঁহার "মণিব্যাগ" বাহির করিতে বলিলেন। অনুসন্ধানকারিণী "মণি-ব্যাগ" বাহির করিয়া রমণীর নির্দ্দেশমত তন্মধ্য হইতে সেই কাগজখানা লইয়া পাঠ করিলেন। পাঠান্তে তিনি বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে রমণীর মুখপানে চাহি-লেন। কাগজে লেখা ছিল—

"গোলযোগ না করিয়া এই লোকটিকে থানায় লইয়া যাইবার জন্য আমি ইহার পকেট হইতে কিছু চুরী করিব। ইহার নাম কর্ণেল ম্যাথুরিণ—ওরফে রসিটি-য়ার—ওরফে ক্রণেল। এই ব্যক্তি ডেট্রইটে, নিউইয়র্কে, মেলবোর্ণে, কলম্বোয় ও লণ্ডনে নানা অপরাধ করিয়াছে;—আজও ধৃত হয় নাই। চারি জন লোককে ইহাকে অতর্কিতভাবে ধরিয়া ফেলিতে অনুমতি করুন। এ ব্যক্তি সশস্ত্র। আমি নিউইয়র্কের ডিটেক্‌টিভ্-সম্প্রদায়ভুক্ত— নোরা ভ্যান স্নুপ।"

অনুসন্ধানকারিণী বিস্মিত হইয়া চাহিলেন।

কুমারী স্নুপ কহিলেন, "দারোগাকে বলুন, আর বিলম্ব করিবেন না। ...র নিকটে আমার পুলিশ বিভাগের চিহ্ন আছে। সন্দেহ করিবেন না।"

অনুসন্ধানকারিণী কক্ষ হইতে বহির্গত হইলেন ও অল্পক্ষণ পরেই দারো-গাকে লইয়া পুনরায় সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

দারোগা কুমারী স্নুপকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই ব্যক্তিই যে সেই—তাহা আপনি কেমন করিয়া জানিলেন?"

কুমারী স্নুপ অধীরস্বরে বলিলেন, "বলেন কি! আমি কি স্বচক্ষে এই ব্যক্তি কর্ত্তৃক উইল ষ্টিভেন্সকে নিহত হইতে দেখি নাই!"

দারোগা চলিয়া গেলেন। কুমারী স্নুপ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। চার পাঁচ মিনিট পরে অপর কক্ষে গোলমাল শুনা গেল। তাহার পর দারোগা আসিয়া বলিলেন, "আপনার কথাই সত্য। এই ব্যক্তিই যে সেই, আমরা তাহার অনেক নিদর্শন পাইয়াছি। কিন্তু আপনি ইহাকে একেবারেই পুলিশের হাতে অর্পণ করেন নাই কেন?"

কুমারী স্নুপ বলিলেন, "আমি স্বয়ং ইহাকে ধরিব বলিয়াই ইহাকে প্রথমে

রমণী আর পারিলেন না
স্রোত তাঁহার হৃদয়ে বহিয়া যা
করিয়া টেবিলে মাথা রাখিয়
কাঁদিতে লাগিলেন।

ইহার আধ ঘণ্টা পরেই
কর্ত্তার নিকট তারযোগে স্বীয়

সংক্ষিং

শ্রীচৈতন্যভাগবত। শ্রীঅতুলকৃ
ভাগবত একখানি সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন বৈষ্ণ
সম্বন্ধে যে কয়খানি প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থ
চৈতন্যভাগবত সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। কৃষ্ণদ
চরিতামৃত-রচনার পূর্ব্বে, বৃন্দাবন দাস ঠাকুর ... । রচন।
শ্রীযুত দীনেশচন্দ্র সেন, তাঁহার "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে" লিখিয়াছেন, "
গণ নির্দ্দেশ করেন, ১৪২৯ শকে (১৫০৭ খৃষ্টাব্দে) শ্রীনিবাসের (শ্রীব
ভ্রাতা) কন্যা নারায়ণীর পুত্র বৃন্দাবন দাস নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। তা
হইলে চৈতন্য প্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণের দুই বৎসর পূর্ব্বে বৃন্দাবন দাসের আবির্ভাব হয়; * * * বৃন্দাবন দাস ৮২ বৎসর জীবিত ছিলেন, ১৫৮৯ খৃঃ অব্দে তাঁহার অদর্শন হয়; ১৫৩৫ খৃঃ অব্দে অর্থাৎ মহাপ্রভুর তিরোধানের ২ বৎসর পরে তিনি 'চৈতন্যভাগবত' ও ১৫৭৩ খৃঃ অব্দে 'নিত্যানন্দবংশমালা রচনা করেন।" ইহা হইতে জানা যাইতেছে, প্রায় চারি শত বৎসর পূর্ব্বে চৈতন্যভাগবত বিরচিত হইয়াছে। চৈতন্য দেবের আবির্ভাবে বঙ্গে যে নূতন যুগের উদয় হয়, বাঙ্গালীর পক্ষে তাহা মহনীয়, এবং বঙ্গ-সাহিত্যের পক্ষে তাহা চিরস্মরণীয়। প্রতিভার প্রবাহে সেই সময়ে বঙ্গদেশে অনেক অভিনব ভাবের, অভিনব পদার্থের আবির্ভাব হইয়াছিল। চৈতন্য দেবের পূর্ব্বে, প্রাচীন কবিগণের কাব্যে পৌরাণিক বা কাল্পনিক চরিত্র-চিত্র অঙ্কিত হইত, ঐতিহাসিক ব্যক্তির লৌকিক জীবনচরিত লিপিবদ্ধ করিবার প্রথা ছিল না। চৈতন্যদেবের মহনীয় রমণীয় চরিত্রে মুগ্ধ হইয়া, ভক্তগণ তদীয় কাহিনী বর্ণবদ্ধ করিতে আরম্ভ করেন। মুরারি গুপ্ত স্বরূপ গোস্বামী প্রভৃতির কড়চা চৈতন্যদেবের জীবনচরিত

ৃদ্ধ জীবনচরিত নহে; বোধ
ৈতন্যভাগবত, চৈতন্য-চরিতামৃত,
বাঙ্গালা গ্রন্থগুলি বিরচিত
াবত সর্ব্বপ্রথম। বৈষ্ণবশাস্ত্রে
ুরাং বৈষ্ণবগণের আদরের
উপযোগিতা বড় অল্প নহে।
রিত। ইহাকে এক হিসাবে
পূর্ব্বে বঙ্গদেশের অবস্থা কিরূপ
ও বিদ্যমান। তদানীন্তন সমাজের
দেদীপ্যমান। এই সকল কারণে,
ত দিন চৈতন্যভাগবতের উৎকৃষ্ট সংস্ক-
। মহাশয়, চৈতন্যভাগবতের বর্ত্তমান সংস্ক-
রম উপকার ও বাঙ্গালী পাঠককে কৃতজ্ঞতা-
ঙ্গালা গ্রন্থের এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ
দেখা যায় না। বর্ত্তমান সংস্করণে, ৫২০ পৃষ্ঠায় মূল গ্রন্থখানি সমাপ্ত
ছ। সম্পাদক যত্নসহকারে পাঠান্তরের বিচার করিয়াছেন; নিজের অভিমত
মূলে নিবিষ্ট করিয়া, পাদটীকায় পাঠান্তর ন্যস্ত করিয়াছেন। একটি বিস্তৃত
ূচী আছে। মুদ্রাঙ্কণ যেমন সুন্দর, তেমনই বিশুদ্ধ। মূল্যও অত্যন্ত সুলভ;—
৫২০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ পুস্তকের রাজসংস্করণের মূল্য ২॥০ টাকা, এবং সুলভ সংস্করণের মূল্য ১॥০ টাকা মাত্র। কলিকাতা, সিমলা, ১১ নং মহেন্দ্রনাথ গোস্বামীর লেনে সম্পাদকের নিকট প্রাপ্তব্য। আশা করি, প্রাচীনবঙ্গভাষানুরাগী পাঠকগণ গোস্বামী মহাশয়কে উৎসাহিত করিবেন। বিজ্ঞাপনে প্রকাশ, ভবিষ্যতে, গ্রন্থকারের জীবনী, প্রাচীন ও অপ্রচলিত শব্দসমূহের সংক্ষিপ্ত অভিধান, দুরূহ স্থলের ভাবব্যাখ্যা প্রভৃতি স্বতন্ত্র পরিশিষ্টখণ্ডে মুদ্রিত হইবে। এখন যাঁহারা গ্রন্থ ক্রয় করিবেন, তাঁহারা বিনামূল্যে ঐ পরিশিষ্ট পাইবেন। গোস্বামী মহাশয়ের সাধু সঙ্কল্প সফল হউক।

চট্টগ্রামের ইতিবৃত্ত। শ্রীতারকচন্দ্র দাস গুপ্ত কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি পড়িয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। এখানিকে যদিও চট্ট-গ্রামের 'ধারাবাহিক' সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত বলিয়া গণ্য করা যায় না, তথাপি ইহার উপযোগিতা অল্প নহে। এই গ্রন্থে চট্টগ্রামের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে

দেশের আভ্যন্তরীণ বিবিধ তথ্য অবগত হওয়া যায়। বঙ্গভাষায় এইরূপ গ্রন্থের অত্যন্ত অভাব। প্রত্যেক জেলার এইরূপ ইতিহাস লিখিত হইলে, দেশের একটি প্রকৃত অভাবের নিরাস হয়। বর্ত্তমান সংস্করণ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। অংশবিশেষ গাইড-বুকের মত। আশা করি, লেখক ভবিষ্যৎ সংস্করণে ইহার যথোচিত সংস্কার করিবেন, এবং চট্টগ্রামের ইতিহাস যাহাতে স্থায়ী ইতিহাসের অঙ্গীভূত হইবার যোগ্য হয়, সে বিষয়ে অবহিত হইবেন।

পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম। শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনুবাদিত। "ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম" পুস্তকখানি বিবিধ শাস্ত্রীয় বচনের সংগ্রহ। আর্য্যশাস্ত্রের অনেক উজ্জ্বল রত্ন এই সংগ্রহে সঙ্কলিত আছে। সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ হইলেও, "ব্রাহ্মধর্ম্ম" সাধা-রণের সুপাঠ্য। ভক্তিভাজন দ্বিজেন্দ্র বাবু এই গ্রন্থের অনুবাদ করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। "স্বপ্নপ্রয়াণে"র কবির ইঙ্গিতে ছন্দ নৃত্য করে; তাঁহার অনুবাদও অতুলনীয়। বর্ত্তমান অনুবাদেও তাহার পরিচয় আছে।

> "অনাদি অনন্ত যিনি মহান তিনিই সুখরূপ।
> অল্পে কভু নাহি সুখ! কোথায় সমুদ্র, কোথা কূপ!
> ভূমাই কেবল সুখ; ইচ্ছা কর জানিতে ভূমায়।
> কোথায় আছেন সেই ভগবান ?—নিজ মহিমায়!"

ইহা কি অনুবাদ বলিয়া বোধ হয় ?

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

স্বাস্থ্য। তৃতীয় খণ্ড, বৈশাখ। স্বাস্থ্য দুই বৎসর অতিক্রম করিয়া তৃতীয় বৎসরে পদার্পণ করিল। আমরা এই ক্ষুদ্র অথচ অত্যন্ত উপযোগী মাসিকের উত্তরোত্তর ক্রমোন্নতি দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছি। "স্বাস্থ্যপ্রসঙ্গ", "পল্লীগ্রামে জলকষ্ট", "ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন ডাক্তারের মত" প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি যথেষ্ট শিক্ষাপ্রদ। "স্ফোটক" প্রবন্ধে লেখক যে ভাবে স্ফোটকের চিকিৎসাদি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা সাধারণ পাঠকের বিলক্ষণ উপকারে আসিবে।

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা। বৈশাখ। বর্ত্তমান সংখ্যায় বৈষ্ণবগণের উপযোগী বিবিধ প্রবন্ধের সমাবেশ আছে। সাম্প্রদায়িক পত্রের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় প্রবন্ধাবলী সাধারণ পাঠকের উপযোগী হইতে পারে না; কিন্তু বর্ত্তমান সংখ্যার "চণ্ডীদাস" প্রাচীন সাহিত্যপ্রিয় পাঠকের প্রীতিপ্রদ হইবে।

ভারতী। বৈশাখ। "মৃত্যুচেষ্টা" প্রবন্ধের বক্তব্য ও উদ্দেশ্য কি, তাহা বুঝিতে পারি-লাম না। বোধ করি, মামুলি প্রথায় "ভারত-জাগানো"ই ইহার লক্ষ্য। এক স্থলে লেখক বলিতেছেন, "পৈতৃক প্রাণটা কোনরূপে রক্ষা করাটাই আমাদের পৌরুষ লক্ষণ। আর রান্নাবান্না ঘরকন্নার ন্যায় কথায় কথায় প্রাণত্যাগের ভারটা স্ত্রীলোকের উপর দিয়া

আমরা নিশ্চিন্ত। তাই আবঙ্কিম বঙ্গীয় লেখকেরা প্রায়ই গর্ব্ব করিয়া বলেন—'হিন্দুর মেয়ে মরিতে ডরায় না।' তাহাতে হিন্দু পুরুষের গৌরব কোথা বাড়িল? তোমরা হিন্দুর মেয়েকে চিরকাল মরিতে পাঠাইয়াছ তাই সে মরিতে ডরায় না, কিন্তু নিজেরা সে কসরৎ ত কোন দিন চর্চ্চা কর নাই। মুসলমানে বাঙ্গালা জয় করিলে যে যে স্ত্রীলোকের বেইজ্জত হইবার ভয় আছে তাহারা পুড়িয়া মরুক—বাস তার পর আমরা হিন্দু পুরুষেরা মাথায় দাসত্ব বহিয়া বেশ এক রকম নির্ব্বিবাদে দিন গুজরাণ করিব।" প্রাণদানের সামর্থ্যই যদি 'পৌরুষলক্ষণ' বা মনুষ্যত্বের চরম আদর্শ হয়, তাহা হইলে বাঙ্গালীর মেয়ের চরিত্রে তাহার পরিপূর্ণ বিকাশ দেখিয়া লেখকের এত আক্ষেপ কেন? বাঙ্গালী কাপুরুষ, মরিতে ডরায়, মরিবার 'কসরৎ' করে নাই;—কিন্তু বাঙ্গালীর মেয়ে মরিতে ডরায় না, মরিতে জানে;—তাই আমরা "মাথায় দাসত্ব বহিয়া বেশ এক রকম নির্ব্বিবাদে দিন গুজরান করি।" যখন 'বেইজ্জৎ' হইয়াও বাঙ্গালীর মেয়ে বাঁচিবার সাধ করিবে, তখন বাঙ্গালী জাতিকে নিশ্চয়ই মরিবার কসরৎ শিখিতে হইবে। ভারতরমণী 'মৃত্যুচর্চ্চা'য় অশিক্ষিতপটু,—তাহা পুরুষের স্বার্থপর নিয়মবন্ধনের ফল নহে। বাঙ্গালী যদি মৃত্যুভয়ভীত বলিয়া ঘৃণিত হয়, বাঙ্গালিনী মরণভয়াতীত বলিয়াই পূজার্হ, এবং সেই নারীধর্ম্মগৌরবের পুণ্যেই এখনও বাঙ্গালী জাতির অস্তিত্ব আছে, সে বিষয়েও সন্দেহ নাই। পরপদদলিত অন্তঃসারশূন্য বাঙ্গালী পুরুষের আত্মগ্লানির, আত্মতিরস্কারের যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান, সে বিষয়ে কাহারও মতভেদ নাই। কিন্তু, আত্মগ্লানির আতিশয্যে লুপ্তাবশিষ্ট জাতীয় মহত্ত্বের উচ্চ আদর্শ খর্ব্ব করিবার অধিকার কাহারও নাই। "সাতপুরুষের ক্রমে হিন্দুবিবাহ" একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ। "মারহাট্টা পানসুপারি" প্রবন্ধটির বিষয় চিত্তাকর্ষক—সুখপাঠ্য। ভাষা অদ্ভুত,—চলিত ভাষার খিচুড়ী,—তাও অর্দ্ধপক্ব। লেখক বলিতেছেন,—"আমাদের ভাল লাগুক না লাগুক নিদেন পক্ষে সহৃদয় ভাবে সব দেখ্‌তুম।" আবার অন্যত্র—"পরে গোলাপজল বা আতরের ছিটে, তাতে ত আমার একটি কাপড়ের রঙ্‌ মাটি হ'ল।" চমৎকার সহৃদয়তা! প্রবন্ধটি রোজনামচা হইতে উদ্ধৃত;—অনায়াসে যা' লেখা যায়, অসঙ্কোচে তা' ছাপানো উচিত নয়; সাধারণের কাছে পাঠাইবার আগে একবার তার বেশবিন্যাস আবশ্যক। "দুই না এক" থিওফিল গোটিয়েের মূল ফরাসী হইতে অনূদিত একটি সুন্দর গল্প।

প্রদীপ। বৈশাখ। প্রথমেই প্রসিদ্ধ উপন্যাসকার শ্রীযুত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের একখানি চিত্র আছে। "বেতুল" মধ্যভারতের একটি ক্ষুদ্র জেলা। শ্রীযুত অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত মহাশয় বর্ত্তমান প্রবন্ধে বেতুলের পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। "ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে" শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় ফ্রেজার সাহেবের রচিত উক্তনামধেয় গ্রন্থের পরিচয় দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। দুঃখের বিষয় এই যে, দীনেন্দ্র বাবুর এই অনধিকারচর্চ্চা সফল হয় নাই। শ্রীযুত রমণীমোহন ঘোষের "ঘুমপাড়ানিয়া মাসী" কবিতাটি মন্দ নহে। অনুকরণের প্রভাব অতিক্রম করিলে লেখকের কবিতা উৎকর্ষলাভ করিতে পারে। শ্রীযুত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার "বঙ্কিম বাবুর প্রসঙ্গে" বঙ্কিম বাবু সম্বন্ধে যে দুই চারিটি বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন, তাহা পড়িয়া সাধ মিটে না; কিন্তু বঙ্কিম বাবুর চরিত্র সাধারণের নিকট এত অজ্ঞাত যে, এই কয়টি কথাই কৌতূহলী পাঠকের প্রীতিবর্দ্ধন করে। "হিমানী" শ্রীযুত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের রচিত একটি রাবিশ,—গল্প। নামটিতে কবিত্ব আছে, কিন্তু হায়! লেখক যদি নাম ফাঁদিয়াই নিরস্ত হইতেন, তাহা হইলে আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ হইবার অবকাশ পাইতাম।

মুকুল। বৈশাখ। এই সংখ্যায় মুকুলের পঞ্চম বর্ষ আরম্ভ হইল। শ্রীযুক্ত

লের কথা" প্রবন্ধে লেখক পৃথিবীর লুপ্ত প্রাণীর বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বিষয়টি কৌতুকাবহ ও শিক্ষণীয় ; লেখকের বলিবার ভঙ্গী সুন্দর, ভাষা সহজ, কিন্তু স্থলবিশেষে গ্রাম্যতা-দোষে দুষ্ট। লুপ্ত প্রাণীর ছবিগুলিও বেশ হইয়াছে। "অনুতপ্ত সন্তান" পড়িয়া ও তাহার ছবি দেখিয়া মুকুলের বালক পাঠকগণ তুষ্ট হইবে। "বিনা তারে সংবাদপ্রেরণ" প্রবন্ধটি মন্দ হয় নাই।

পূর্ণিমা। বৈশাখ। বর্ত্তমান বর্ষে পূর্ণিমা সপ্তম বর্ষে পদার্পণ করিল। শ্রীযুত নিত্যকৃষ্ণ বসুর "নববর্ষ" নামক ক্ষুদ্র কবিতাটি উল্লেখযোগ্য। "যজ্ঞ" সুচিন্তিত ও সুলিখিত। "মৃত্যুর পর" একটি অতিবিস্তৃত প্রবন্ধ। বহুদিন হইতে প্রকাশিত হইতেছে। এই প্রবন্ধে প্রসঙ্গক্রমে আর্য্যশাস্ত্রীয় বিবিধ বিষয়ের আলোচনা উপস্থিত হইতেছে।

মহিলা। বৈশাখ। "পূর্ব্ববঙ্গের স্ত্রীআচার" প্রবন্ধটি কৌতুকাবহ ও সুখপাঠ্য। "স্ত্রীশিক্ষা কিরূপ হওয়া উচিত" উল্লেখযোগ্য।

(উদ্বোধন। বৈশাখ ; ৭ম ও ৮ম সংখ্যা। শ্রীযুত বিবেকানন্দ স্বামীর "বর্ত্তমান ভারত" চিন্তাপূর্ণ সুপ্রবন্ধ চিন্তাশীলের সুপথ্য। "তিব্বতভ্রমণ" চিত্তাকর্ষক, কিন্তু মাত্রায় অতি অল্প। ৮ম সংখ্যায় "পরমহংস দেবের উপদেশ" পরম রমণীয়।)

প্রয়াস। এপ্রেল। এই নূতন মাসিকের ক্রমোন্নতি দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছি। অনেক নূতন লেখক 'প্রয়াসে'র পরিচর্য্যায় ব্রতী ;—আশা করি, তাঁহাদের প্রয়াস সফল হইবে। শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ ঘোষের "স্বর্গীয়া কবি প্রমীলা নাগ" প্রবন্ধটি পড়িয়া আমরা তৃপ্ত হইয়াছি। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসুর "মূলধর্ম্ম একটি" উল্লেখযোগ্য। "বিবিধ প্রবন্ধে" বিবিধ বিষয়ের সমাবেশ আছে ; অধিকাংশ সুখপাঠ্য।

তত্ত্ববোধিনী। বৈশাখ। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "ভারতবর্ষীয় ধর্ম্মবিকাশ" একটি সুচিন্তিত সারগর্ভ দার্শনিক প্রবন্ধ।

বামাবোধিনী। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ। এই যুক্ত-সংখ্যায় আটাশটি রচনা প্রকাশিত হইয়াছে। "বিজ্ঞানরহস্য," "দেবলরাজ," "মশকের উপকারিতা", "রথ বা মহাবোধি মহোৎসব" প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি সুপাঠ্য।

নির্ম্মাল্য। বৈশাখ। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য ও তাহার ইতিহাসে যাঁহাদের অনুরাগ আছে, তাঁহাদের নিকট "আনন্দময়ী ও গঙ্গামণি" প্রবন্ধটি সমাদৃত হইবে। বড় আশা করিয়া শ্রীযুক্ত জলধর সেনের "একখানি পত্র" পড়িতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, কিন্তু কোনও বিশেষত্ব দেখিলাম না।

কবিতাকুঞ্জ।

নিশীথিনী।

অয়ি নিশীথিনী—অয়ি তপোবন মোর,
তোমার নিবিড় মৌন অতল গহনে
লভি আমি ধ্যানমগ্ন কৈবল্যের ক্রোড়,
পাই আমি দিবসের হারান আপনে।
ডুবে যায় ইন্দ্রিয়ের ছায়াবাজি-পোত
অয়ি অন্ধ আদি নিশি, তোমার বিভবে।
লোক হ'তে লোকান্তরে, দেবতা মানবে,
পশু পক্ষী লতা গুল্মে, ব্যাপ্ত অহরহ,
সে অখিল জীবনের নিস্তব্ধ স্পন্দন,
আমার এ হৃদয়ের দুরু দুরু সহ,
এক(ই) ছন্দে সমতালে, করিছে কম্পন।
অতুল অতলে তব নিশি-পারাবার,
আমি আর বিশ্বপ্রাণ—একা—একাকার।

উদ্দেশে।

১

কালি পোহাইলে রাতি নববর্ষ সনে
পুরাণ ব্যথার স্মৃতি জাগিবে আবার!
বৈশাখের কিশলয়-স্তবকের মাঝে
চিরতপ্ত অশ্রুকণা রয়েছে সঞ্চার!
সন্ধ্যায় পূরবী রাগে দিবামান প্রায়
অতীত বর্ষের স্মৃতি ধীরে ডুবে যায়।

২

নব বৈশাখের ভাবে ভরি ওঠে মন।
রৌদ্র-ছায়াময়ী মাতা প্রকৃতি আমার!
দূরে হিমগিরি, পদে শীর্ণা স্রোতস্বিনী
আঁকি বাঁকি বেড়ি যায় শ্যামল প্রান্তর।
তীরে ঘন আম্রবনে কুটীর-ছায়ায়
মনে পড়ে লক্ষ্মীপিতৃগৃহ মিথিলায়!

৩

মাগো, সুশীতলা তুই শান্তিস্বরূপিণী,
কি কালি করালী মূর্ত্তি দেখালি সে দিন!
অগ্নিময়, ঝঞ্ঝাময়, মত্ত মধ্যাহ্নের
রৌদ্র-জলধির যেন সংক্ষোভ সঙ্গীন!
নিদারুণ পিপাসায় বিশুষ্ক ভুবন,
মরুভূমে মরীচিকা-ছলনা যেমন।

৪

সে করাল দিনে সেই কুটীর-মাঝারে
অতৃপ্ত-পিপাসা-সুপ্ত "মানস" আমার!
স্তনক্ষীরে ভেসে গেল জননী-বসন
সিক্ত নাহি হলো তবু অধর বাছার!
তখনো ফোটেনি ভাষা, করুণনয়নে
চেয়েছিল বারিবিন্দু সে অন্তিম ক্ষণে।

৫

সে তীব্র অতৃপ্ত তৃষা সেই দিন হ'তে
অনিবার চোখে চোখে ঘুরিছে কেবল!
বিধাতার বিশ্বরাজ্য—অতৃপ্ত পিপাসা;
জলে স্থলে আর্ত্তস্বর—দে জল দে জল!
ইহকালে ধ্বনিতেছে সেই হাহাকার,
পরকালে তর্পণের অর্থ নাহি আর!

৬

শিখাতে কি এই বৎস! এসেছিলে তুমি

এ বৈশাখে আর্ত্তজনে জলদান করি
কথঞ্চিৎ করি তোর স্মৃতির তর্পণ!
তোর শোকে, জীবদুঃখে হৃদয় বিদরে,
সর্ব্ব-জীব-পাপ যেন নিতে পারি শিরে।

গান।

[বেলাবলী।]

শুধু দু'দিনেরই খেলা।
ঘুম না ভাঙ্গিতে, আঁখি না মেলিতে,
দেখিতে দেখিতে ফুরায় বেলা।
আশার ছলনে কত উঠি পড়ি,
কত কাঁদি হাসি, কত ভাঙ্গি গড়ি,
না বাঁধিতে ঘর, হাটের ভিতর,
ভেঙ্গে যায় মোর সাধেরই মেলা!
নয়নের অশ্রু নয়নে মিলায়,
মুখের হাসিটি মুখে রয়ে' যায়,
নেমে আসে রাতি, দু'দিনের ভাতি
মিশে যায় সেই আঁধারে হায়!
তৃণবৎ এ জগতে কোথা হোতে
এসে মিশে যাই ঘটনার স্রোতে,
কোথা হতে এসে, কোথা যাই ভেসে,
আবার যে একেলা—সে একেলা!

প্রেমের নিদ্রা।

মরে নাই—মরে নাই, কেঁদে কেঁদে আলা হ'য়ে
সুখে প্রেম ঘুমায়েছে।
বরষার ধরা হ'তে বসন্তের পিক সম
কোন দূর দেশে গেছে!
খুঁজিয়া প্রেমিক সারা, বুকে দিয়ে দুটি হাত
আকাশের পানে চায়।
ভাঙিছে সুখের স্বপ্ন, সজল বিহ্বল আঁখি,
বলে—"প্রেম সে কোথায়!"
নীরব নন্দনভূমে, পরিস্ফুট চন্দ্রালোকে,
অশোকের ম্লানচ্ছায়,
সে বুঝি শুইয়া আছে ধরার সকলি ভুলি,
সদ্য-ঝরা ফুল প্রায়।
অতিপরিশ্রান্ত-দেহে প্রেমিক শ্মশানে পড়ি,
চারিধার অন্ধকার।
মৃত্যুর কালিমা-ছায়া অলক্ষ্যে পড়িছে মুখে,
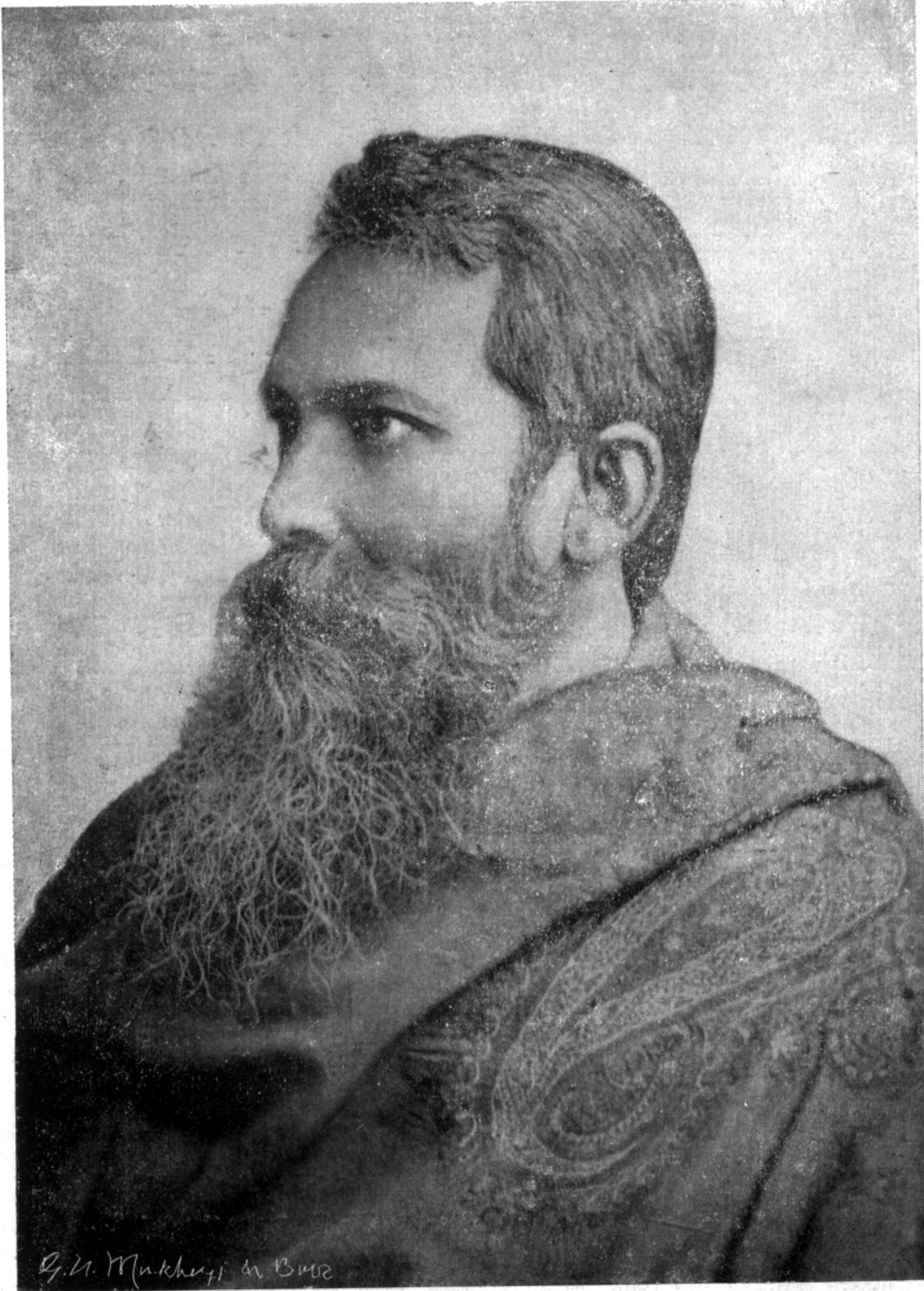
শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ।   *From a Faded Photo.*

বিবাহের উৎপত্তি।

প্রথম প্রস্তাব

সমাজতত্ত্বাধ্যায়ী পণ্ডিতদিগের মধ্যে অনেকের মত এই যে, মনুষ্যজাতির প্রাথমিক অবস্থায় বিবাহ-ব্যবস্থা ছিল না, অর্থাৎ যৌন-সম্মিলন-ব্যাপারে স্ত্রী বা পুরুষকে এক বা ততোধিক নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক সঙ্গী বা সঙ্গিনীতে আবদ্ধ থাকিতে হইত না। তখন স্ত্রী-পুরুষের সংগতি অবাধ ও নির্বিচার ছিল। ম্যাক্‌লেনান্, মরগ্যান্, সার্ জন্ লবক্, পোষ্ট্, উইলকেন, বেবেল্ প্রভৃতি মানব-বিজ্ঞানবিদেরা এই মতাবলম্বী। হর্বর্ট স্পেন্‌সরও প্রায় এইরূপ সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছেন ; তবে তিনি এইটুকু স্বীকার করেন যে, প্রাগৈতিহাসিক সময়ে যৌন-সম্মিলন-ব্যাপার সাধারণতঃ অবাধ ও নির্ব্বিচার হইলেও, ব্যক্তি-নিবদ্ধ যৌনসম্বন্ধ যে একেবারেই ছিল না, এরূপ নহে। তবে, তাহাও এত সামান্য ছিল যে, তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যে নহে।

তবে, একটা বাধা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। প্রাথমিক যৌন-সম্মিলন নির্ব্বিচার হইলেও, তাহা আপন সম্প্রদায় বা সমাজের মধ্যে নিবদ্ধ। পুরুষ বা স্ত্রী আপন ইচ্ছানুসারে অবাধে যাহাতে তাহাতে উপগত হইতে পারে বটে, কিন্তু স্ব-সম্প্রদায় বা সমাজের বহির্ভূত হইয়া পারে না। এই বাধা থাকায়, এইরূপ যৌন-সম্মিলন-পদ্ধতিও 'বিবাহ' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সার জন লবক্ ইহার নামকরণ করিয়াছেন—'সাম্প্রদায়িক বিবাহ।'* ইহাকে বিবাহ বলিতে হইলে 'বিবাহ' কথাটার নিতান্তই অপব্যবহার করা হয়, সন্দেহ নাই ; কিন্তু যাঁহারা অনুকম্পাপরবশ হইয়া এই উচ্ছৃঙ্খল যৌন-সম্মিলন-পদ্ধতিকে 'বিবাহ' আখ্যায় সম্মানিত করেন, তাঁহারা ইহাকে এইরূপ ভাবে দেখেন যে, এই সকল সমাজ বা সম্প্রদায়ের প্রত্যেক নারী সম্প্রদায়ভুক্ত পুরুষমাত্রেরই স্ত্রী ; প্রত্যেক পুরুষ সম্প্রদায়ভুক্ত নারীমাত্রেরই স্বামী ;—অর্থাৎ, ইহা বহুবিবাহ ও বহুপত্যাত্মক বিবাহের এক প্রকার উৎকট ও অদ্ভুত সংমিশ্রণ বা সমবায়।

---

* Communal marriage.

ইহাকে বিবাহ বলা যাউক বা না যাউক, যাঁহারা এই মতাবলম্বী, যাঁহারা বলেন যে, মনুষ্যজাতির এমন একদিন ছিল, যখন তাহাদের মধ্যে বিবাহ-বন্ধন ছিল না, স্ত্রী ও পুরুষ যথেচ্ছ পরস্পরে উপগত হইত, এবং সন্তানাদি লালন-পালনের ভার সমাজ গ্রহণ করিত, তাঁহারা এই সিদ্ধান্তের সমর্থনকল্পে নানাবিধ প্রমাণ ও যুক্তি প্রয়োগ করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে প্রধান প্রধান কয়েকটির উল্লেখ ও আলোচনা এইখানে করা আবশ্যক।

অনেক দেশেই এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত দেখা যায় যে, কোন নৃপতি, ক্ষমতাশালী পুরুষ, বা দেবতা, তত্তৎদেশে বিবাহপ্রথার প্রবর্ত্তন ও প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বহু যুগ পূর্ব্বে যে সকল জাতি সভ্যতা প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহাদের পুরাণাদিতেও এই মর্ম্মের বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। পৃথিবীর প্রায় প্রান্তবর্ত্তী লাপ্‌লাণ্ড দেশে এইরূপ কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে যে, নজ্যভিস্‌ এবং আতজিস্‌ নামক দুই মহাপুরুষ তথায় বিবাহপ্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়া কঠিন শপথাদির দ্বারা স্ত্রীগণকে সংযত হইতে বাধ্য করেন। মিশর দেশে মিনিস্‌ নামক এক মহাপুরুষ বিবাহানুষ্ঠান প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন বলিয়া কীর্ত্তিত আছে। গ্রীস দেশে বিবাহানুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠাতা কিক্রপ্‌স্‌; তাঁহার পূর্ব্বে গ্রীকদিগের মধ্যে দাম্পত্যনিয়ম ছিল না; স্ত্রী পুরুষ নির্ব্বিচারে ইন্দ্রিয়-লালসা পরিতৃপ্ত করিত, এবং এইরূপ স্বেচ্ছাচারোৎপন্ন সন্তানগণ মাতার উপাধি গ্রহণ করিতে বাধ্য হইত। এইরূপ অসংযত যৌন-সংমিলন যে বহুবিধ সামাজিক বিশৃঙ্খলার, সুতরাং সামাজিক অনর্থের নিদান, এথেন্‌স্‌বাসীদিগকে ইহা বুঝাইয়া দিয়া, কিক্রপ্‌স্‌ তাহাদের মধ্যে বিবাহপদ্ধতির প্রবর্ত্তন করেন। চৈনিক পুরাণেও এইরূপ বিবরণ দেখা যায়। তাহাতে লিখিত আছে যে, প্রাথমিককালে মনুষ্যের জীবন-প্রণালী ইতর জীবের ন্যায়ই ছিল। তাহারা বনে বনে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইত, যাহার যাহাতে ইচ্ছা, সে তাহাতেই অবাধে ও নির্ব্বিচারে উপগত হইত, এবং পিতৃ-নিরূপণ অসম্ভব বলিয়া সন্তানগণ কেবল মাতাকেই জানিত। সম্রাট ফোহি এই অনাচার বন্ধ করিয়া দিয়া বিবাহব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেন। ভারতবর্ষীয় আর্য্যদিগের মধ্যে উদ্দালক ঋষির পুত্র শ্বেতকেতু বিবাহ-নিয়মের প্রবর্ত্তক বলিয়া মহাভারতে পরিকীর্ত্তিত হইয়াছেন। এই সকল তথ্য হইতে এইরূপ সিদ্ধান্ত করা হইয়া থাকে যে, এক সময়ে মনুষ্যজাতির মধ্যে বিবাহ বা তদনুকল্প কোন প্রকার বন্ধন ছিল না। তখন মানুষ স্বেচ্ছা-বিহারী ছিল।

অতি প্রাচীন অনেক গ্রন্থে এমন কতকগুলি অসভ্য জাতির উল্লেখ দেখা

যায়, যাহারা স্বেচ্ছাবিহারী বলিয়া সেই সকল গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে। হেরোডোটস্ এবং ষ্ট্রাবোর গ্রন্থে মেসাজিটি অভিহিত একটি অসভ্য জাতির উল্লেখ আছে। ইহাদের মধ্যে প্রত্যেক পুরুষের স্বতন্ত্র স্ত্রী থাকিত বটে, কিন্তু সেই জাতির অন্য যে কোন পুরুষ তাহাতে উপগত হইতে পারিত। লাইবিয়া দেশে অস্কান্ নামক একটি জাতি ছিল ; হেরোডোটস্ বলেন, ইহাদের মধ্যে নারীগণ সাধারণের সম্পত্তিরূপেই গণ্য ও ব্যবহৃত হইত। গারসিলাসো ডি লা ভেগা লিখিয়াছেন যে, আমেরিকার পেরু দেশে, ইঙ্কাদিগের প্রভুত্বকালের পূর্ব্বে, কোন পুরুষেরই নিজস্ব স্ত্রী ছিল না।

আধুনিক ভ্রমণকারীরাও এমন অনেক অসভ্য জাতির উল্লেখ করেন, যাহাদের মধ্যে বিবাহের অনুরূপ কোন বন্ধন নাই। ফিট্‌জ্‌রয় সাহেব লিখিয়াছেন যে, ফিউয়েজিয়ানদিগের মধ্যে বিবাহ-নিয়ম নাই,—এক দল স্ত্রীলোক এক দল পুরুষের উপভোগ্যরূপে অবস্থান করে। অধ্যাপক উইল্‌কেন বলেন যে, সুমিত্রা দ্বীপের লুবু জাতি, বোর্ণিওর ওলোয়ৎ প্রভৃতি কতকগুলি জাতি, পোগী দ্বীপবাসিগণ, মলক্কার ওরাংসাকাই জাতি,এবং পেলিঙ্গের পর্ব্বতবাসীরা বিবাহ-নিয়ম আদৌ অবগত নহে। কেি [illegible] কুরুম্বা, আরায়ক এবং চট্টগ্রাম প্রদেশের কতকগুলি অসভ্য জাতির সম্বন্ধে [illegible] বাস্তিয়ান ঠিক এইরূপই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়ার ক [illegible] জাতির নিয়ম-অনুসারে এক সম্প্রদায়ের সমস্ত নারী অন্য সম্প্রদায়ে [illegible] যের স্ত্রী বলিয়া পরিগণিত হয়। দক্ষিণ আফ্রিকার বুশম্যানদিগে [illegible] াহ-নিয়ম সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। কুইন শার্লোটি দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীদি [illegible] গণ স্বজাতীয় যে কোন পুরুষে উপগত হইতে পারে। কালিফর্ণিয়া উপদ্বী [illegible] ধিবাসীদিগের ভাষায় 'বিবাহ' শব্দ পর্য্যন্ত নাই।

যৌন-সম্মিলন বিষয়ে কতকগুলি অদ্ভুত রীতি কোন কোন স্থলে প্রচলিত ছিল, এবং এখনও অনেক অসভ্য জাতির মধ্যে আছে। সার্ জন্ লবক্ বিবেচনা করেন যে, এই সকল রীতি পূর্ব্ব-প্রচলিত সাম্প্রদায়িক বিবাহের লোপাবশেষ বা নিদর্শন। হেরোডোটস্ বলেন যে, বেবিলোনিয়া প্রদেশে মাইলিতা নাম্নী দেবীর প্রসন্নতালাভের উদ্দেশ্যে প্রত্যেক স্ত্রীলোককে জীবনের মধ্যে এক দিন এই দেবীর মন্দিরে অপরিচিত পুরুষকে আত্ম-সমর্পণ করিতে হইত। সাইপ্রস্ দ্বীপের কোন কোন স্থলে এবং আর্ম্মেনিয়াতেও এক সময়ে এইরূপ রীতি

পূর্ব্বে কৌমার-মোচনের জন্য গমন করিত। লাইবিয়া প্রদেশের ওগিলে ও নাসামোলিয়ান জাতির মধ্যে বিবাহব্যাপারে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গের 'প্রথম নিশার অধিকার' * থাকিত। পেরু দেশের মণ্টা প্রদেশের সম্বন্ধে গার্সিলাসো ডি লা ভেগা লিখিয়াছেন যে, বিবাহকার্য্যে কন্যা প্রথমে বরের আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু বান্ধবের নিকট আত্মসমর্পণ না করিলে বিবাহ নিষ্পন্ন হইত না। কোন কোন স্থলে এই 'প্রথম নিশার অধিকার' ব্যক্তিবিশেষে নিবদ্ধ। দেশভেদে এই অধিকার রাজা, পুরোহিত, বা অন্য কোন প্রধান পুরুষে ন্যস্ত হইয়া থাকে। কিনিপেতো এস্কিমোদিগের মধ্যে প্রধান ধর্ম্মযাজক এই স্বত্বের অধিকারী। নিকারাগুয়া প্রদেশে কন্যাকে বিবাহের পূর্ব্ব-রজনী একজন পুরোহিতের সহিত যাপন করিতে হইত। পঞ্চদশ শতাব্দীতে টেনরিফের অধিবাসীদিগের মধ্যে যে স্ত্রীলোক এক নিশা সর্দ্দারের সহিত যাপন না করিয়াছে, তাহাকে কেহ বিবাহ করিত না। সামোরিনদিগের রীতি-অনুসারে নব-বিবাহিতা স্ত্রী প্রধান পুরোহিতের সহিত তিন রাত্রি যাপন করিয়া, তবে স্বামি-গৃহে গমন করিতে পাইত। ইউরোপীয়েরা যাহাকে 'মধ্য যুগ' বলেন, সেই সময়ে ফ্রান্সের কোন কোন প্রদেশে এই পৈশাচিক অধিকার প্রধান প্রধান ধর্ম্ম .জকদিগের ছিল। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে রাজা ষষ্ঠ ফিলিপ এবং ষষ্ঠ চার্লস চেষ্টা যত্ন করিয়াও আমিয়েন্সের বিশপ্‌দিগকে এই বীভৎস অধিকার গ করিতে সম্মত করিতে পারেন নাই।

এই সকল এবং এইরূপ অন্যান্য দৃঃ অনেক সমাজতত্ত্ববিদ্ নির্ব্বিচার যৌন-সম্মিলন-পদ্ধতির বা 'সাম্প্রদ. প্রাগস্তিত্ব প্রমাণিত করিয়া থাকেন। তাঁহাদের যুক্তি এই যে, ৫ নিজস্বভাবে আত্মসাৎ করিলে, সেই স্ত্রীতে সমাজভুক্ত সাধারণের যে অধিকার ছিল, তাহা কার্য্যতঃ অস্বীকার ও তাহাতে সাধারণকে বঞ্চিত করা হয়। সেই জন্য সমাজ, এইরূপ আত্মসাৎকারীকে অগ্রে সাধারণের অধিকার স্বীকার করাইতে বাধ্য করে, অর্থাৎ, স্ত্রীবিশেষকে নিজস্বভাবে পাইবার পূর্ব্বে তাহাকে আত্মীয় স্বজন ও নিমন্ত্রিত বন্ধুবর্গের উপভোগার্থ নিয়োগ দ্বারা সমাজের অধিকার কার্য্যতঃ স্বীকার করিতে হয়। যে সকল স্থলে এই অধিকার ব্যক্তিবিশেষে ন্যস্ত, সে সকল স্থলেও ইহা সমাজের অধিকারেরই রূপান্তর—সমাজভুক্ত সাধারণের অধিকার

সমাজের প্রতিনিধিস্বরূপ রাজা, ধর্ম্মযাজক, প্রভু, বা অন্য কোন প্রধান পুরুষ ব্যবহার করিয়া থাকেন।

ইংরেজাধিকৃত কলম্বিয়া প্রদেশের উপকূলবাসী কতকগুলি জাতির রীতি এই যে, গৃহাগত অতিথির ক্ষুৎপিপাসানিবারণের জন্য যেমন আহার্য্য ও পানীয় প্রদান করে, তেমনি তাহার ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য আপন স্ত্রীকে নিযুক্ত করে। উত্তর আমেরিকা, পলিনেশিয়া এবং আরও কোন কোন দেশের অসভ্য জাতিসমূহ প্রগাঢ় বন্ধুত্বের নিদর্শনস্বরূপ পরস্পরে স্ত্রীপরিবর্ত্তন করিয়া থাকে। গ্রীনলণ্ডবাসীদিগের মধ্যে যে সকল লোক অকুণ্ঠিতভাবে আপন স্ত্রীকে বন্ধুবর্গের তৃপ্ত্যর্থে নিয়োগ করিতে পারে, তাহারাই সমাজে মহৎ ও উদারচিত্ত বলিয়া পরিগণিত হয়। পূর্ব্ব-তিব্বতের সায়িন্দু প্রদেশের লোকেরা এমনও বিশ্বাস করে যে, এইরূপ স্ত্রী-নিয়োগের দ্বারা দেবতাদের প্রীতি লাভ করা যায়। পূর্ব্বোক্ত সমাজবিজ্ঞানবিদেরা বলেন যে, এই সকল ব্যবহার পূর্ব্ববর্ত্তী অবাধ উপগতি, বা সাম্প্রদায়িক বিবাহেরই নিদর্শন এবং লোপাবশেষ।

এমন অনেক সমাজের পরিচয় পাওয়া যায়, যেখানে এক পত্নী অপেক্ষা বারাঙ্গনার সমাদর অধিক। অন্ততঃ তাহারা সমাজে ঘৃণিত বা অবজ্ঞাত নহে। ভারতবর্ষের কোন কোন তীর্থে বা মন্দিরে 'দেবদাসী' বলিয়া এক শ্রেণীর স্ত্রীলোক দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা শিক্ষিতা, নৃত্যগীতনিপুণা, নানাবিধ কলাবিদ্যার অধিকারিণী। ইহারা বারবিলাসিনী; অথচ সমাজের গণ্যমান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ ইহাদের সংসর্গ স্পৃহনীয় মনে করেন, এবং ইহাদের সহিত সাহচর্য্যের জন্য ব্যগ্রতা প্রদর্শন করেন। গ্রীসের যখন অত্যুন্নত অবস্থা, সেই অতুলিত গৌরবের দিনে এথেন্স্ নগরের বারাঙ্গনাগণ বিশেষ সমাদরের পাত্রী ছিল—পেরিক্লিস্, সক্রেটিস্ প্রভৃতি সমাজের শীর্ষস্থানীয় এবং মানবজাতির শিরোমণিস্বরূপ মহাপুরুষেরা আগ্রহসহকারে ইহাদের গৃহে যাতায়াত করিতেন—এইখানে সমবেত হইয়া সমাজের প্রধান পুরুষেরা সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতির আলোচনা করিতেন। সমাজমধ্যে বারাঙ্গনার এই সমাদরের ব্যাখ্যা সার্ জন্ লবক্ এইরূপ করিয়াছেন। তিনি বলেন, ইহা পূর্ব্ববর্ত্তী সাম্প্রদায়িক বিবাহেরই পরিচায়ক এবং লোপাবশেষ।

সমাজে এইরূপ বিবাহ, অর্থাৎ নির্ব্বিচার যৌনসম্মিলনপদ্ধতি প্রচলিত, থানে নারীমাত্রই বহুজনভোগ্যা। কিন্তু যুদ্ধাদিতে জয়লাভ করিয়া বিজিত তির যে সকল স্ত্রীলোক অপহৃত হইয়া আনীত হয়, তাহারা যুদ্ধের নিয়মানু-

সারে অপহরণকারীর নিজস্ব সম্পত্তি হয়। ইহার ফল এই দাঁড়ায় যে, যে সকল স্ত্রীলোক একনিষ্ঠ. তাহারা ভিন্নজাতীয়, বিজয়লুণ্ঠিত, দাসীমাত্রস্থানীয় বলিয়া অনাদৃত এবং অবজ্ঞাত হয়; আর যাহারা বহুজনভোগ্যা, তাহারা স্বজাতীয়, স্বসমাজভুক্ত, হয় ত স্বসম্পর্কীয়, সুতরাং সমাজে বহুসমাদৃত হইয়া থাকে। কালে নির্ব্বিচারপ্রথার লোপ হইয়া যায়, কিন্তু তজ্জনিত সংস্কার তত শীঘ্র লুপ্ত হয় না। সংস্কারের পরিবর্ত্তন হইতে বহুকাল লাগে। বারাঙ্গনাগণ পূর্ব্বপ্রচলিত সাম্প্রদায়িক বিবাহের পত্নীর স্থান অধিকার করে। সেই জন্য অনেক প্রাচীন সভ্যসমাজেও তাহাদের সমাদর দেখা যায়।

শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়।

ভাগবতাচার্য্য।

পরিচয়।

শ্রীমদ্ভাগবত, মহাপুরাণ-পর্য্যায়ে পরিগণিত। প্রেমমূল বৈষ্ণব ধর্ম্মের পরতত্ত্বসমূহ এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট আছে। এই জন্য ইহা বৈষ্ণবগণের পরম পূজনীয় মহাগ্রন্থ। বৈষ্ণব ভিন্ন অপর সকলে এই গ্রন্থকে সাম্প্রদায়িক ভাবিয়া তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করেন না। কিন্তু ইহার ভাবমাধুর্য্য, বর্ণনাচাতুর্য্য ও রসপ্রাচুর্য্যের প্রতি কাহারও নিমেষমাত্র দৃষ্টি পড়িলে, ইহাকে একখানি মহাকাব্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইবেন। যদি রসাত্মক বাক্যের নাম কাব্য হয়, তবে শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ কাব্যরত্নাকর।

রামায়ণ ও মহাভারতে সাম্প্রদায়িক ভাব নাই। এই জন্য এই দুইখানি হিন্দুসমাজের সকল সম্প্রদায়েই সমাদৃত। এই কারণেই প্রদেশীয় ভাষার কবিগণের কৃপায় এই অমর গ্রন্থদ্বয় দরিদ্রের পর্ণকুটীরে ও ধনিকের অট্টালিকায় এবং অশিক্ষিত মুদীর দোকানঘরে ও সর্ব্ববিদ্যাবিভূষিত পণ্ডিতপ্রবরের গ্রন্থাধারে সযত্নে রক্ষিত হইয়া থাকে। শ্রীমদ্ভাগবত, রামায়ণ ও মহাভারতের পরেই সাধারণের আদরের সামগ্রী, তবে বৈষ্ণব হিন্দু ব্যতীত অপর সম্প্রদায়ীর নিকট শ্রীমদ্ভাগবত তত দূর লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইতে পারে নাই। এই কারণেই, শ্রীমদ্ভাগবত রামায়ণ ও মহাভারতের ন্যায়, হিন্দুর ঘরে ঘরে দেখিতে পাওয়া যায় না।

"ব্রতকথা" ও "মঙ্গলগানে" বাঙ্গালার প্রাচীন পদ্যগ্রন্থের উৎপত্তি হইয়াছে কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীরামের মহাভারত, কবিকঙ্কণের চণ্ডী, ভারতচন্দ্রের

অন্নদামঙ্গল, কবিকঙ্কণাদির মনসার ভাসান, এবং "সত্যনারায়ণ", "অষ্টলোক-পাল", "জীমূতবাহন", "আকলাই সঙ্কলাই", "লক্ষ্মী" ইত্যাদির ব্রতকথার সম্ভবতঃ এইরূপেই উৎপত্তি হইয়াছে। পুরাণ-কথকগণের কথকতায় অনেক সময় "মঙ্গল"-গীতগুলির প্রণয়নের সাহায্য করিয়াছে। ফলতঃ, প্রাচীন বঙ্গে কথকতা ও "মঙ্গল"-গানের প্রচলন না থাকিলে, সম্ভবতঃ আমরা বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রাচীন গ্রন্থগুলির দর্শন পাইতাম না। রামায়ণ মহাভারতের ন্যায়, শ্রীমদ্ভাগবতও বাঙ্গালা পয়ারাদি ছন্দে অনুবাদিত হইয়া, "মঙ্গল"-গীতের পালার বৃদ্ধি করিয়াছে।

কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীরামী মহাভারত, বাল্মীকির রামায়ণ ও সত্যবতী-সুতের মহাভারতের অনুবাদ নহে, তদবলম্বনে প্রণীত। আমরা বঙ্গভাষায় যে কয়েকখানি শ্রীমদ্ভাগবত দেখিয়াছি, তাহাও মূল সংস্কৃত শ্রীমদ্ভাগবতের অনুবাদ নহে। খানের শ্রীকৃষ্ণবিজয়, মাধবাচার্য্যের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল, শ্যামানন্দের গোবিন্দ-লীলামৃত, শ্রীমদ্ভাগবত অবলম্বনে রচিত; এবং এই সকল গ্রন্থের প্রণেতৃগণ শ্রীকৃষ্ণচরিত্রবর্ণন উদ্দেশ্য বলিয়া, শ্রীমদ্ভাগবতীয় দশমস্কন্ধকেই তাঁহাদের প্রধান অবলম্বন করিয়াছেন। সমগ্র দ্বাদশস্কন্ধ শ্রীমদ্ভাগবত বা তাহার সারাংশ তাঁহারা বঙ্গভাষায় পয়ারাদি ছন্দে প্রবর্ত্তিত করেন নাই। প্রাচীন কবিগণের মধ্যে এক ভাগবতাচার্য্য ব্যতীত অপর কেহ সম্পূর্ণ শ্রীমদ্ভাগবত বঙ্গভাষার পাঠক-গণকে অর্পণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, ইহা আমরা বহু অনুসন্ধানেও অবগত হইতে পারি নাই।

ভাগবতাচার্য্য-প্রণীত বাঙ্গলা শ্রীমদ্ভাগবতের হস্তলিখিত পুঁথি সম্প্রতি আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। পুরাতন মালদহের একটি বৈষ্ণব ব্রাহ্মণের বাটীতে ইহার দশমস্কন্ধ এবং গৃহস্থ বৈষ্ণবের বাটীতে অপর কয়েকটি স্কন্ধ অসম্পূর্ণ অবস্থায় প্রাপ্ত হইয়াছি। আমাদের হস্তগত পুঁথিগুলির মধ্যে পঞ্চম, ষষ্ঠ ও দশম স্কন্ধ সম্পূর্ণ; এবং চতুর্থ, সপ্তম, নবম ও একাদশ স্কন্ধ খণ্ডিত। আমরা ভাগবতাচার্য্য-বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের পূর্ণ দ্বাদশ স্কন্ধ প্রাপ্ত না হইলেও, প্রাপ্তাংশের আলোচনা করিয়া সাহসসহকারে বলিতে পারি যে, ভাগবতাচার্য্য সম্পূর্ণ দ্বাদশ স্কন্ধ শ্রীমদ্ভাগবত বাঙ্গলায় রচনা করিয়াছিলেন।

ভাগবতাচার্য্য উপাধি, ব্যক্তিবিশেষের নাম নহে। চৈতন্যভাগবত, চৈতন্য-চরিতামৃত, ভক্তিরত্নাকর ও গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় ভাগবতাচার্য্যের উল্লেখ আছে, কিন্তু কোন গ্রন্থেই তাঁহার নাম, বাসস্থান, বা তাঁহার জীবনের কোনও

বিবরণের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। চৈতন্যভাগবতে ভাগবতাচার্য্যের সহিত চৈতন্যদেবের সাক্ষাৎ হইবার একটু বিবরণ পাওয়া যায়। তাহা এই,—

"তবে প্রভু আইলেন বরাহনগরে।
মহাভাগ্যবন্ত এক ব্রাহ্মণের ঘরে॥
সেই বিপ্র বড় সুশিক্ষিত ভাগবতে।
প্রভু দেখি ভাগবত লাগিলা পড়িতে॥
শুনিয়া তাহার ভক্তিযোগের পঠন।
আবিষ্ট হইলা গৌরচন্দ্রনারায়ণ॥
বোল বোল বলে প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ রায়।
হুঙ্কার গর্জ্জন প্রভু করয়ে সদায়॥
সেই বিপ্র পড়ে পরানন্দে মগ্ন হইয়া।
প্রভুও করেন নৃত্য বাহ্য পাসরিয়া॥
ভক্তির মহিমা শ্লোক শুনিতে শুনিতে।
পুনঃ পুনঃ আছাড় পাড়েন পৃথিবীতে॥
হেন সে করেন প্রভু প্রেমের প্রকাশ।
আছাড় দেখিয়া সর্ব্বলোক পায় ত্রাস॥
এই মত রাত্রি তিন প্রহর অবধি।
ভাগবত শুনিয়া নাচিলা গুণনিধি॥
বাহ্য পাই বসিলেন শ্রীশচীনন্দন।
সন্তোষে দ্বিজেরে করিলেন আলিঙ্গন॥
প্রভু বলে ভাগবত এমত পড়িতে।
কভু নাহি শুনি আর কাহার মুখেতে॥
এতেকে তোমার নাম ভাগবতাচার্য্য।"

—চৈতন্যভাগবত, অন্ত্যখণ্ড, ৫ম অধ্যায়।

কবি কর্ণপূর গোস্বামীর কৃত শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা নামক চৈতন্যসম্প্রদায়ী বৈষ্ণবগণের পরিচয়গ্রন্থেও এক ভাগবতাচার্য্যের উল্লেখ আছে;—

"নির্ম্মিতা পুস্তিকা যেন কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী। শ্রীমদ্ভাগবতাচার্য্যো গৌরাঙ্গাত্যন্তবল্লভঃ॥"

—শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন সম্পাদিত গৌরগণোদ্দেশদীপিকা, ৪৯ পৃঃ।

আমরা উপরে ভাগবতাচার্য্য-বিরচিত যে শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণের উল্লেখ করিয়াছি, বোধ হয়, গৌরগণোদ্দেশদীপিকার উক্ত উদ্ধৃতাংশে তাহাকেই "কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী" বলিয়া লক্ষ্য করা হইয়াছে। কারণ, আমাদের প্রাপ্ত হস্তলিখিত গ্রন্থের ভণিতায়, "প্রেমতরঙ্গিণী" ও "কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী", এই উভয় নামেরই উল্লেখ আছে,—

"শ্রীভাগবত আচার্য্যের মধুরসবাণী। ভাগবত কৃষ্ণকথা প্রেমতরঙ্গিণী॥"
"কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী শুন সাবধানে।" "শ্রীভাগবত আচার্য্যের প্রেমতরঙ্গিণী।"
"শ্রীভাগবত আচার্য্যের মধুরসবাণী। গীতবন্ধে কৈল কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী।"

কেহ কেহ গৌরগণোদ্দেশদীপিকার ভাগবতাচার্য্য ও চৈতন্যভাগবতের ভাগবতাচার্য্যকে এক ব্যক্তি মনে করেন; কিন্তু এ বিষয়ে আমাদের গভীর সন্দেহ রহিয়াছে। কারণ, বৈষ্ণব গ্রন্থাদিতে, বিশেষতঃ চৈতন্যশাখাগণনায়, আমরা একাধিক ভাগবতাচার্য্যের উল্লেখ দেখিতে পাই।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ নবদ্বীপবাসী চৈতন্য-ভক্তগণের বর্ণনাস্থলে,—

"ভাগবতাচার্য্য, ঠাকুর সারঙ্গদাস॥
জগন্নাথ তীর্থ, বিপ্র শ্রীজানকীনাথ।
গোপাল আচার্য্য, আর বিপ্র বাণীনাথ॥
গোবিন্দ, বাসুদেব, মাধব, তিন ভাই।
যা'সবার কীর্ত্তনে নাচে চৈতন্য নিতাই॥
রামদাস অভিরাম সখ্যপ্রেমরাশি॥
ষোড়শাঙ্গের কাষ্ঠ যেই তাতে কৈল বাঁশী॥
প্রভু আজ্ঞায় নিত্যানন্দ গৌড়েরে চলিলা।

তাঁর সঙ্গে তিনজন প্রভু আজ্ঞায় আইলা॥ প্রভু সঙ্গে গোবিন্দ রহে পাইয়া সন্তোষ॥
শ্রীরামদাস, মাধব, বাসু ঘোষ। "ভাগবতাচার্য্য, চিরঞ্জীব, রঘুনন্দন।"।

—চৈতন্যচরিতামৃত, আদিলীলা, ১০ম পরিচ্ছেদ

পয়ারের এই দ্বাদশ পংক্তির মধ্যে দুই বারে, আমাদের বিশ্বাস মতে, দুই জন "ভাগবতাচার্য্যর" উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা হইতে অনায়াসে অনুমিত হইবে যে, নবদ্বীপে গৌরাঙ্গদেবের দুই জন ভক্ত "ভাগবতাচার্য্য" উপাধিতে পরিচিত ছিলেন।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ অদ্বৈতপ্রভুর শাখাবর্ণনস্থলেও এক ভাগবতাচার্য্যের উল্লেখ করিয়াছেন,—

"শ্রীযদুনন্দনাচার্য্য অদ্বৈতের শাখা। তাঁর শাখা উপশাখাগণের নাহি লেখা॥
বাসুদেব দত্ত তিঁহো কৃপার ভাজন। সর্ব্বভাবে আশ্রিয়াছে চৈতন্যচরণ॥
ভাগবতাচার্য্য আর বিষ্ণুদাসাচার্য্য। অসংখ্য অদ্বৈত শাখাকে করে গণন॥

* * * —চৈতন্যচরিতামৃত, আদিলীলা, ১২শ পরিচ্ছেদ।

"বড় শাখা গদাধর পণ্ডিত গোসাঞি" বলিয়া কবিরাজ গোস্বামী চৈতন্য-দেবের এক ভক্তের বিবরণ উল্লেখ করিয়াছেন। (চৈ. চ. আদি, ১০ পঃ)। আবার এই গদাধর গোসাঞির উপশাখার বর্ণনাস্থলেও এক ভাগবতাচার্য্যের উল্লেখ পাওয়া যায় ;—

"শ্রীগদাধর পণ্ডিত শাখাতে মহত্তম। তাঁর উপশাখা কিছু করি যে গণন॥
শাখাশ্রেষ্ঠ ধ্রুবানন্দ, শ্রীধর ব্রহ্মচারী। ভাগবতাচার্য্য, হরিদাস ব্রহ্মচারী॥"

—চৈতন্যচরিতামৃত, আদিলীলা, ১২শ পরিচ্ছেদ।

ঘনশ্যাম দাস ওরফে নরহরি চক্রবর্ত্তীর বিরচিত "ভক্তিরত্নাকর" গ্রন্থেও এক ভাগবতাচার্য্যের নাম পাইয়াছি,—

জয় শ্রীভাগবতাচার্য্য, মাধব শ্রীধর। জয় দাস বৃন্দাবন গুণের সাগর॥

—ভক্তিরত্নাকর, প্রথম তরঙ্গ।

এইরূপে আমরা চৈতন্যচরিতামৃতে চৈতন্য-শাখাগণনায় দুই, অদ্বৈতশাখা-বর্ণনায় এক, চৈতন্যের শাখাভুক্ত গদাধর পণ্ডিতের শাখা বা চৈতন্য দেবের-উপশাখানিরূপণে এক, এই চারি ; চৈতন্যভাগবতে এক, গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায় এক, এবং ভক্তিরত্নাকর নামক গ্রন্থে এক, একুনে এই সাত ভাগবতা-চার্য্যের উল্লেখ পাইতেছি। এই সাত ভাগবতাচার্য্য যে এক ব্যক্তি, তাহা বলিতে সম্ভবতঃ কেহই সাহসী হইবেন না। তবে এই সাত ভাগবতাচার্য্যই যে সাত

আমাদিগের হস্তগত হস্তলিখিত প্রেমতরঙ্গিণীতে ভাগবতাচার্য্য আপনার বিশেষ কোন পরিচয় দেন নাই। আমরা বহু অনুসন্ধানেও এখনও গ্রন্থের শেষভাগ সংগ্রহ করিতে পারি নাই। গ্রন্থের শেষভাগে গ্রন্থকারের পরিচয় থাকা সম্ভব। শেষভাগ না পাওয়া পর্য্যন্ত, আমাদিগের প্রাপ্তাংশ হইতে গ্রন্থকারের বিবরণ, যত দূর সম্ভব, নির্ণয় করিতে হইবে। প্রেমতরঙ্গিণী-কার স্থানে স্থানে আপনার পরিচয়সূচক এইরূপ ভণিতা দিয়াছেন ;—

"ধীরশিরোমণি শ্রীগদাধর জান। শ্রীভাগবত আচার্য্যের মধুরস গান॥"
"ভক্তিরসগুরু শ্রীগদাধর জান। শ্রীভাগবত আচার্য্যের মধুরস গান॥"
"শ্রীভাগবত আচার্য্যের মধুর ভারতী। চৈতন্য-পদারবিন্দে গদাধর গতি॥"
"শ্রীরঘুনাথ পণ্ডিতের মধুময় বাণী। গীতবন্ধে কহে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী॥"
"শ্রীরঘুনাথ পণ্ডিতের মধুর সম্ভাষা। কৃষ্ণ-গুণ শুন ভাই কৃষ্ণে কর আশা॥"

"শ্রীগদাধর ধীরশিরোমণি জান।
শ্রীভাগবত আচার্য্যের মধুরসগান॥"
"শ্রীগদাধর জান ধীরশিরোমণি।
শ্রীভাগবত আচার্য্যের মধুরসবাণী॥"
"রঘুনাথ পণ্ডিতের রচিত রসময়।
শুনিলে দুরিত হরে খণ্ডে ভবভয়॥"
"জান গুরু গদাধর ধীর শিরোমণি।
শ্রীভাগবত আচার্য্যের প্রেমতরঙ্গিণী।"
"শ্রীযুত গদাধর পদযুগ জান।
শ্রীভাগবত আচার্য্যের মধুরসগান।"
"পণ্ডিত মুকুট-মণি গদাধর জান।
শ্রীভাগবত আচার্য্যের মধুরস গান॥"
"পণ্ডিত গোসাঞি শ্রীগদাধর জান।
শ্রীভাগবত আচার্য্যের মধুরস গান॥"

উপরি-উদ্ধৃত ভণিতাগুলি হইতে আমরা জানিতে পারিতেছি যে, ভাগবতাচার্য্য-বিরচিত গ্রন্থের নাম "প্রেমতরঙ্গিণী", বা "কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী" ; তাঁহার নিজ নাম "শ্রীরঘুনাথ পণ্ডিত", এবং তাঁহার গুরুর নাম "শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোসাঞি"। উপরিস্থ তৃতীয় ভণিতায় প্রকাশিত হইতেছে যে, তাঁহার গুরু গদাধরের "চৈতন্যপদারবিন্দে গতি" ছিল।

প্রেমতরঙ্গিণীর এই প্রমাণ হইতে আমরা এখন জানিতে পারিতেছি যে, কৃষ্ণদাস কবিরাজের বর্ণিত চৈতন্যশাখায় যে দুই ভাগবতাচার্য্যের নাম পাওয়া যায়, প্রেমতরঙ্গিণী-কার তাহাদের অন্যতর নহেন ; তবে চৈতন্যচরিতামৃত-বর্ণিত গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর শাখাভুক্ত ভাগবতাচার্য্যের প্রেমতরঙ্গিণী-কার ভাগবতাচার্য্য হওয়া সম্ভব, এবং গৌরগণোদ্দেশদীপিকার ভাগবতাচার্য্যও ইনিই। গদাধর, চৈতন্যশাখাভুক্ত" এবং "পণ্ডিত গোসাঞি", এবং স্থলবিশেষে কেবল "গদাধর পণ্ডিত" বলিয়া চৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত হইয়াছেন। প্রেমতরঙ্গিণী-কার ভাগবতাচার্য্য তাঁহাকে "পণ্ডিতমুকুটমণি", "পণ্ডিত গোসাঞি" বলিয়া পরিচিত করিতেছেন, এবং "চৈতন্যপদারবিন্দে গদাধর গতি" বলিয়া তাঁহার চৈতন্যশাখাভুক্ত হওয়ার সম্ভবপরতা দেখাইতেছেন। সুতরাং চৈতন্য-

চরিতামৃতের গদাধরশাখাভুক্ত ভাগবতাচার্য্যের প্রেমতরঙ্গিণী-কার ভাগবতাচার্য্য হওয়ার সম্ভবপরতা নিশ্চয়তার দিকেই অগ্রসর হইতেছে।

ভক্তিরত্নাকরের উল্লিখিত ভাগবতাচার্য্যও সম্ভবতঃ প্রেমতরঙ্গিণী-কার ভাগবতাচার্য্য। কারণ, চৈতন্যভাগবত-প্রণেতা বৃন্দাবন দাসের সহিত ইঁহার নাম একই শ্লোকে নিবদ্ধ হইয়াছে, এবং ভাবতাচার্য্যগণের মধ্যে ইঁহাকেই লব্ধ-প্রতিষ্ঠ বলিয়া বোধ হইতেছে।

বৈষ্ণবগ্রন্থে গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর জীবনবৃত্ত অনুসন্ধান করিতে গেলে জানিতে পারা যায় যে, ইঁহার গুরু পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি ও গৌরাঙ্গ দেবের গুরু ঈশ্বরপুরী একই গুরু মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য ছিলেন (১) এবং সেই সম্বন্ধ ও চৈতন্যের প্রতি গদাধরের ঐকান্তিক নিষ্ঠা হেতু তিনি চৈতন্যদেবের পরম প্রীতিপাত্র ছিলেন, এবং চৈতন্য-প্রীতিবশে ইনি মহাপ্রভুর সহিত জীবনের শেষভাগ শ্রীক্ষেত্রেই যাপন করিয়াছিলেন। নীলাচলে অবস্থানকালে চৈতন্যদেব গদাধর পণ্ডিতের ভাগবত পাঠ শ্রবণ করিতেন। বৃন্দাবন দাস লিখিয়াছেন,—

"এই মত প্রভু প্রিয় গদাধর সঙ্গে।
তান্ মুখে ভাগবত শুনি থাকে রঙ্গে॥
গদাধর পড়েন সমুখে ভাগবত।
শুনিয়া প্রকাশে প্রভু প্রেমভাব যত॥
প্রহ্লাদ-চরিত্র আর ধ্রুবের চরিত্র।
শতাবৃত্তি করিয়া শুনেন সাবহিত॥
আর কার্য্যে প্রভুর নাহিক অবসর।
নামগুণ বলেন শুনেন নিরন্তর॥
ভাগবতপাঠে গদাধর মহাশয়।
দামোদর স্বরূপের কীর্ত্তন বিষয়॥"

—চৈতন্যভাগবত, অন্ত্যখণ্ড, দশম অধ্যায়।

অন্য বৈষ্ণব গ্রন্থের স্থানে স্থানেও গদাধর পণ্ডিতের ভাগবত-ব্যাখ্যা শুনিয়া গৌরাঙ্গদেবের প্রীতিলাভের উল্লেখ পাওয়া যায়,—

"মোর প্রভু গদাধর বসিয়া হেথায়।
পড়িতা শ্রীভাগবত বিহ্বল-হিয়ায়॥
শ্রীমুখ তুলিয়া যে সকল অর্থ কহে।
তাহে কত কত প্রেমানন্দনদী বহে॥
সে কথা শুনিতে সাধ কেবা নাহি করে।
যে শুনে বারেক কভু সে নাহি পাসরে॥
গদাধর প্রাণনাথ প্রভু গৌর হরি।
এথা বসি শুনিত সে ব্যাখ্যার মাধুরী॥"

—ভক্তিরত্নাকর, অষ্টম তরঙ্গ।

উক্ত উদ্ধৃতাংশগুলি হইতে দৃষ্ট হইবে যে, ভাগবতাচার্য্যের "ভক্তিরসময় গুরু" গদাধর পণ্ডিতের নিকট মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেব শ্রীভাগবতের মধুর ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া প্রেমদশাভাবে গদগদ হইতেন, এবং এই প্রমাণে আমাদের বিশ্বাস যে, মহাপ্রভুর নবদ্বীপ ও নীলাচল-লীলার নিত্যসঙ্গী গদাধর পণ্ডিত গোসাঞিই প্রেমতরঙ্গিণী-কার ভাগবতাচার্য্যের গুরু ও ভাগবতের উপদেষ্টা ছিলেন।

(১) গৌরগণোদ্দেশদীপিকা।

সম্ভবতঃ, গদাধর পণ্ডিতের ব্যাখ্যা শুনিয়াই তদনুগ্রহে রঘুনাথ পণ্ডিত প্রেমতরঙ্গিণীর রচনা করেন, এবং সেই জন্যই নিজ ইষ্টদেবের নিকট "ভাগবতাচার্য্য" উপাধি পান।

আমরা উপরে চৈতন্যভাগবত হইতে যে এক ভাগবতাচার্য্যের বিবরণ উদ্ধৃত করিয়াছি, উক্ত ভাগবতাচার্য্যকেও কেহ কেহ প্রেমতরঙ্গিণী-কার মনে করেন। (১) আমরা ঐরূপ মনে করিতে পারিলে ভাগবতাচার্য্যের বাসস্থান ও তাঁহার জীবনের একটি প্রধান ঘটনার উল্লেখ করিতে পারিলাম বলিয়া পরিতুষ্ট হইতে পারিতাম। কিন্তু প্রধানতঃ চারিটি কারণে চৈতন্যভাগবতের বরাহনগর-নিবাসী ভাগবতাচার্য্যকে আমরা প্রেমতরঙ্গিণী-কার বলিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না। উক্ত কারণ কয়েকটি এই,—

প্রথমতঃ, গদাধর পণ্ডিত, চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি মান্য বৈষ্ণবগ্রন্থের মতে পঞ্চতত্ত্বের অন্তর্গত অন্যতম তত্ত্ব, এবং তদ্রূপে সম্মানিত। বৈষ্ণবগ্রন্থকারগণ, কোন বৈষ্ণব গ্রন্থকার অথবা ভক্তের পরিচয়স্থলে প্রায়শঃই তাঁহাদিগের প্রণীত গ্রন্থাদির উল্লেখ করিয়া থাকেন। (২) বৃন্দাবন দাস স্বয়ং গদাধর পণ্ডিতের মুখে অনেক কথা শুনিয়া স্বীয় গ্রন্থে তৎসমস্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। (৩) এরূপ স্থলে, বরাহনগরবাসী ভাগবতাচার্য্য, গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য বা শাখাভুক্ত হইলে, বৃন্দাবন দাস তাঁহার, বা তৎপ্রণীত গ্রন্থের বিষয় অবশ্যই উল্লেখ করিতেন।

দ্বিতীয়তঃ, কবি কর্ণপূর গোস্বামী গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় "মহত্তম" ও "মহত্তর" ভক্ত বা মহান্তগণের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই চৈতন্যের সহিত একত্র পুনঃপুনঃ মিলিত হইতেন, বা অন্যরূপে খুব নিকট সংস্রব ছিল। ইহাঁরা হয় নীলাচলে চৈতন্যের সহিত অবস্থান করিতেন, অথবা নবদ্বীপলীলার সহায় ছিলেন, কিংবা অন্ততঃ প্রতি বর্ষে তাঁহার সহিত নীলাচলে গিয়া সাক্ষাৎ করিতেন, অথবা ইহাদিগের কাহারও অন্তরঙ্গ বা প্রিয়তম ভক্ত ছিলেন। বরাহনগরবাসী ভাগবতাচার্য্য গৌরগণোদ্দেশদীপিকার লক্ষণমতে মহত্তম, মহত্তর বৈষ্ণব, বা মহান্ত নহেন। ইনি যে চৈতন্যভক্ত, বা তাঁহার

---

(১) বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা, ৮ম বর্ষ, ভাদ্র, ৩৬১ পৃঃ।

(২) ভক্তিরত্নাকর, চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

(৩) "স্বরূপ কৃষ্ণের প্রিয়পাত্র বিদ্যানিধি। গদাধর শ্রীমুখের কথা কিছু লিখি।"

—চৈতন্যভাগবত, অন্ত্যখণ্ড, ১০ম অধ্যায়।

সহচর ছিলেন, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায় না, এবং চৈতন্যভাগবতেও চৈতন্যের সহিত তাঁহার একবারের অধিক সাক্ষাৎ হইবার বিবরণের অতিরিক্ত আর কিছু পাওয়া যায় না। এরূপ স্থলে সম্ভবতঃ গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় বরাহনগরনিবাসী ভাগবতাচার্য্যকে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণীর "নির্ম্মাতা" বলিয়া লক্ষ্য করা হয় নাই।

তৃতীয়তঃ, বরাহনগরবাসী ভাগবতাচার্য্য চৈতন্যের সহিত সাক্ষাৎকারের পর গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর শিষ্য হইয়াছিলেন, এবং তৎকারণেই চৈতন্যভাগবতে তাহার উল্লেখ নাই,—এরূপ বিশ্বাস করিবারও কোন কারণ নাই; যে হেতু গদাধর পণ্ডিত চৈতন্যদেবের সহিত বরাবর নীলাচলে ছিলেন, এবং বরাহনগরবাসী ভাগবতাচার্য্যের, নীলাচলে বা অন্যত্র, গদাধর পণ্ডিতের নিকট দীক্ষাগ্রহণের বা অধ্যয়নের কোন বিবরণ বৈষ্ণবগ্রন্থে পাওয়া যায় না।

চতুর্থতঃ, প্রেমতরঙ্গিণীতে স্থানে স্থানে চৈতন্যদেবের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। প্রেমতরঙ্গিণী-কারের সহিত চৈতন্যদেবের সাক্ষাৎ হইয়া থাকিলে, এই সকল স্থানের কোথাও না কোথাও উক্ত সাক্ষাতের বিষয় উল্লিখিত হইবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু প্রেমতরঙ্গিণীর উক্ত স্থানগুলির কোথাও তদ্রূপ উল্লেখ নাই।

চৈতন্যভাগবতে উল্লিখিত বরাহনগরনিবাসী ভাগবতাচার্য্যের প্রেমতরঙ্গিণী রচনা করিয়াছেন বলিয়া স্বীকার করিতে আমরা অক্ষম, সুতরাং প্রেমতরঙ্গিণী-রচয়িতার বাসস্থান বরাহনগরে ছিল বলিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না। অন্য প্রমাণ না পাওয়া পর্য্যন্ত, প্রেমতরঙ্গিণীকার রঘুনাথ পণ্ডিতের বাসস্থানাদি পরিচয়সম্বন্ধে আমাদিগকে অন্ধকারে থাকিতে হইতেছে।

ভাগবতাচার্য্যের প্রেমতরঙ্গিণী বাঙ্গালা ভাষার একখানি প্রাচীন গ্রন্থ। আমার নিকট যে কয়েকখানি হস্তলিখিত প্রেমতরঙ্গিণী আছে, তাহার সর্ব্বপ্রাচীনখানির বয়স দুই শত বৎসরের অধিক। এখানি বাঙ্গালা সন ১০৯০ সালে, বা ১৬০৪ শকাব্দায় লিখিত; লেখক "অনন্তরাম দেবশর্ম্মা" গ্রন্থের শেষে এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত প্রেতরঙ্গিণীর বয়স-নিরূপণের জন্য অন্যবিধ অভ্রান্ত উপায়ও আছে। গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় প্রেমতরঙ্গিণী ও ভাগবতাচার্য্যের উল্লেখ আছে। নিম্নলিখিত শ্লোকে কবি কর্ণপূর গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় তাহার রচনাকালের উল্লেখ করিয়াছেন,—

"শাকে বসুগ্রহমিতে মনুনৈব যুক্তে, গ্রন্থোহয়মাবিরভবৎ কতমস্য বক্ত্রাৎ।"

ইহা হইতে বসু=৮, গ্রহ=৯, মনু=১৪ ধরিয়া এবং "অঙ্কস্য বামাগতিঃ" এই নিয়মানুসারে ১৪৯৮ শকাব্দায় গৌরগণোদ্দেশদীপিকার রচনাকাল পাওয়া যাইতেছে। প্রেমতরঙ্গিণী এই সময়ের একখানি বিখ্যাত গ্রন্থ না হইলে গৌর-গণোদ্দেশদীপিকা রচনার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে প্রেমতরঙ্গিণী রচনা করিয়াছিলেন, ইহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

আমার নিকট ভাগবতাচার্য্যের গ্রন্থের যে যে অংশ আছে, তাহাতে কেবল সেই সময়ের চৈতন্যদেব ও তাঁহার গুরুদেব গদাধর পণ্ডিতের নাম ভিন্ন অন্য ভক্ত, বা মহান্তগণের, এমন কি, নিত্যানন্দ বা অদ্বৈতের নামও পাওয়া যায় না। ইহা হইতে অনুমিত হয় যে, নিত্যানন্দাদির ঈশ্বরত্ব বা মাহাত্ম্য-সংস্থাপনের পূর্ব্বেই প্রেমতরঙ্গিণী রচিত হইয়াছিল। নিত্যানন্দকে গৌরাঙ্গ-দেব নীলাচল হইতে গৌড়দেশে প্রেমভক্তিপ্রচারের জন্য প্রেরণ করেন, এবং তৎপরেই নিত্যানন্দ ও মহাপ্রভুর অপর ভক্তগণ সর্ব্বসাধারণের নিকট দেব-সম্মান পাইতে থাকেন। এই সময়ের পর যে সকল বৈষ্ণব গ্রন্থ রচিত হয়,—তাহাতে নিত্যানন্দ, অদ্বৈত ও অপর ভক্তগণের বন্দনাদি দেখিতে পাওয়া যায়। নিত্যানন্দ সম্ভবতঃ মহাপ্রভুর তিরোভাবের, অর্থাৎ ১৪৫৫ শকাব্দার অল্প পূর্ব্বে গৌড়ে প্রেমভক্তিপ্রচারের জন্য প্রেরিত হন; মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পর সম্ভবতঃ বৃন্দাবন দাসই বাঙ্গলায় সর্ব্বপ্রথম গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার সর্ব্বপ্রথম গ্রন্থ চৈতন্যভাগবত ১৪৫৭ শক, বা ১৫৩৮ খৃষ্টাব্দে (১) রচিত হয়; ইহা হইতে ভাগবতাচার্য্য ১৪৫০ শকাব্দায় বা ১৫২৮ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণীর রচনা করেন, এরূপ অনুমান করিলে, সম্ভবতঃ গুরুতর ভ্রম হইবে না। এই হিসাবে দেখা যাইতেছে যে, এক শ্রীকৃষ্ণবিজয় ব্যতীত অপর কোন বৈষ্ণব গ্রন্থ প্রেম-তরঙ্গিণীর পূর্ব্বে বিরচিত হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণবিজয় ১৪০২ শকাব্দায় সমাপ্ত হয় (২)।

গৌরাঙ্গ দেবের উপদেশ এই যে, বৈষ্ণবগণকে তৃণ হইতেও সুনীচ, বৃক্ষ-পেক্ষাও সহিষ্ণু ও মানহীনের মানদাতা হইতে হইবে। চৈতন্যদেবের সমসাময়িক বৈষ্ণব অপেক্ষা তৎপরবর্ত্তী সময়ের বৈষ্ণবগণের হৃদয়ের অন্তরতম স্তর পর্য্যন্ত এই উপদেশ প্রবেশ করিয়াছিল। তাই কৃষ্ণদাস কবিরাজের,—

---

(১) দীনেশ বাবুর বঙ্গভাষা ও সাহিত্য।

(২) "তের শ" পঁচানই শাকে গ্রন্থ আরম্ভন।
চতুর্দ্দশ দুই শাকে হল সমাপন॥"—শ্রীকৃষ্ণবিজয়।

"আমার লিখন যেন শুকের পঠন।"

* * * *

" দাবন দাসের পাদপদ্ম করি ধ্যান।
। আজ্ঞা লঞা লেখি তাহাতে কল্যাণ॥"

* * * *

"মূর্খ, নীচ, ক্ষুদ্র, মুই বিষয় লালস।
বৈষ্ণবাজ্ঞাবলে করি এতেক সাহস॥"

চৈতন্য চরিতামৃত, আদিলীলা, ৮ম পরিচ্ছেদ।

"চৈতন্যচরিতামৃত যেই জন শুনে।
তাহার চরণ ধুঞা করোঁ মুই পানে॥
শ্রোতার চরণরেণু করোঁ মস্তকভূষণ।
তোমরা এ অমৃত পিলে সফল হয় শ্রম॥"

—চৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্যলীলা, ২০শ পরিচ্ছেদ।

উক্তিগুলি তাঁহার নিরতিশয় দীনতার পরিচায়ক ; এই ভাবাত্মক শ্লোক চৈতন্যদেবের সমসাময়িক বা পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণের রচনাতে দৃষ্ট হয় না। বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবতেও কৃষ্ণদাস কবিরাজের উক্ত শ্লোকগুলির অনুরূপ দৈন্যব্যঞ্জক শ্লোকের একান্ত অসদ্ভাব। কিন্তু অপরদিকে ভাগবতাচার্য্য রঘুনাথ প্রেমতরঙ্গিণীর স্থলে স্থলে যেরূপ গর্ব্বসূচক ভণিতার সন্নিবেশ করিয়াছেন, তাহার নমুনা এই,—

"শ্রীভাগবত আচার্য্যের প্রবন্ধ রসময়।
সুখে যেন সর্ব্বলোক বুঝে অতিশয়॥"
"শ্রীভাগবত আচার্য্যের পয়ার-রচনা।
সুখে যেন ভাগবত বুঝে মূর্খ জনা॥"
"রঘুনাথ পণ্ডিতের রচিত রসময়।
শুনিলে দুরিত হরে খণ্ডে ভবভয়"॥
"রাম হৃষীকেশ, রঙ্গভূমি-পরবেশ
রঘুনাথ পণ্ডিতে ভণে।"
"শ্রীভাগবত আচার্য্যের সরস বচন।
সুখে যেন ভাগবত বুঝে সর্ব্বজন॥"

ভাগবতাচার্য্য ভণিতাস্থলে ক্বচিৎ আপন নাম ব্যবহার করিয়াছেন, এবং অধিকাংশ ভণিতাতেই কেবল শ্রীভাগবতাচার্য্য এই শ্রী-যুক্ত পদবী প্রয়োগ করিয়াছেন। নাম-ব্যবহারকালে পণ্ডিত কথাটির প্রয়োগ করিতে কোন স্থানেই বিস্মৃত হন নাই, এবং তাঁহার কবিতা যে "রসময়", "মধুময়", "সরস", তাহা প্রায় প্রত্যেক ভণিতাতেই পাঠকগণকে স্মরণ করাইয়াছেন। ইহা বৈষ্ণব কবির পক্ষে প্রাচীনতাজ্ঞাপক একটি সুদৃঢ় প্রমাণ। পরবর্ত্তী বৈষ্ণব কবিগণ জাতি, বিদ্যা ও গুণবোধক উপাধি অপেক্ষা "দাস" উপাধির অন্তরালে থাকিয়া আত্মগোপন করিবার চেষ্টায় প্রায়ই সাফল্য লাভ করিয়াছেন।

তুলনায় সমালোচনা।

প্রাতঃকালে বাতায়নপথে বসিয়া সম্মুখে বহুদূরবিস্তৃত কোমল শস্য-শ্যামল ভূমিখণ্ড দেখিতেছিলাম। আকাশ সুনীল ও সম্পূর্ণ মেঘশূন্য। দ্বারের নিকট উচ্চ হাস্যধ্বনি শুনিয়া ফিরিয়া চাহিলাম—গৃহিণী একখণ্ড পত্র হস্তে হাসিতে হাসিতে আসিতেছেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ব্যাপার কি? ভাবিতে-

ছিলাম, বাহিরের প্রকৃতি বুঝি স্থধু সস্মিতবদনা, কিন্তু বাসগৃহও আজ হাস্যধ্বনি-মুখরিত। গৃহিণী রাঁধিতে রাঁধিতে চলিয়া আসিয়াছিলেন, পত্রখানিও বেশ্ হরিদ্রারঞ্জিত হইয়াছিল।

পত্রখানি মেয়ে হাতের। বাঙ্গালীর মেয়ের চিরপরিচিত সেই বাঁকা বাঁকা পাকা অক্ষর। হাতে খড়ি দিয়াই পাকা লেখক হইবার আশা বাঙ্গালীর মেয়ের হৃদয়ে বলবতী হইয়া উঠে। দুরু দুরু হিয়ায় বালিকা যখন স্বামীর প্রথম পত্র খোলে, তখনই একটু ধরিয়া ধরিয়া ভাল করিয়া একখানি জবাব লিখিবার ইচ্ছা হয়। ভ্রাতাদের সাধ্যসাধনা করিয়া একটা যেমন তেমন দোয়াত কলম সংগ্রহ হইলে, বৈকালে ছাদের এক কোণে অলিন্দের ছায়ায়, বা নিশীথে নির্জ্জন গৃহে প্রদীপসম্মুখে, বিকাশোন্মুখ ক্ষুদ্র হৃদয়ের গোটাকতক কথা বালিকা কাগজের উপরে প্রতিফলিত করে। দুই চারিটা কথাতেই দুই পৃষ্ঠা কাগজ পুরিয়া যায়। দক্ষিণ হস্তের চম্পক-অঙ্গুলি মসীকৃষ্ণ হইয়া উঠে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্মের সহিত অলকগুচ্ছ জড়াইয়া যায়। অনেক পরিশ্রমে একবার কাটিয়া একবার পুঁছিয়া একটু কালি ফেলিয়া অবশেষে ব্লটিংএর ন্যায় অঞ্চল দিয়া ছাপিয়া পত্র সমাপ্ত হয়। তাহার পর স্বামী আসিয়া আদর করিয়া যখন বলেন, লেখা বড় ভাল হইয়াছে,—বিশেষতঃ গান্‌টা, তখন বালিকার আহ্লাদে হৃদয় পুরিয়া উঠে, হস্তাক্ষরের প্রতি মনোযোগ দিবার অবসর থাকে না।

পত্রখানি এই,—

শ্রীচরণ কমলেষু,

আপনি আমার পত্র দেখিয়া একটু আশ্চর্য্য হইবেন, আমার সহিত যে কখনও আপনার আলাপ পরিচয় আছে, ইহা মনে করিতে পারিবেন না। আমার স্বামী গত বৈশাখ মাসে কলেজের ছুটি হইলে যখন বাটী আসিতেছিলেন, রেলগাড়াতে পথে আপনার সহিত তাঁহার আলাপ হইয়াছিল। আপনি তখন বাপের বাটীতে যাইতেছিলেন। এখন বোধ হয় চিনিতে পারিবেন আমি কে?

বাটী আসিয়া পর্য্যন্ত আমাকে দেখিতে পারেন না, প্রতিকার্য্যেই আমার খুঁত দেখেন। আমি লেখাপড়া জানি না, কথা বলিতে পারি না, আমি একটা পশু। আমি যথাসাধ্য তাঁহার মনের মতন হইবার চেষ্টা করি, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার মন পাই না। এক দিন নিমন্ত্রণ খাইতে যাইব বলিয়া ভাল কাপড় জামা পরিয়া তাঁহার সম্মুখ দিয়া যাইতেছিলাম; ভাবিয়াছিলাম, পূর্ব্বের মতন আমাকে দেখিয়া তিনি একটু খুসি হইবেন। তিনি বলিলেন, যাহারা ভাল করিয়া কাপড়

পরিতে না জানে, তাহাদের ভাল কাপড় না পরাই উচিত। আমি রাগ করিয়া নিমন্ত্রণ খাইতে গেলাম না। ননদ জিজ্ঞাসা করিলে বলিলাম, অসুখ হইয়াছে। রাত্রে আসিলে কাঁদিয়া কাটিয়া বলিলাম, আমি কি জন্য এত অপরাধী হইলাম।

তিনি তাহার পর আপনার সহিত সাক্ষাতের কথা এবং আপনার শিক্ষা, কথাবার্ত্তা ও চালচলনের কথা বলিলেন। আপনার তুলনায় আমি যে একটা জানোয়ার, তাহাও বলিতে ভুলিলেন না। কি করিলে আপনার মতন হইতে পারে? আমি যে কালো, তাহা এত দিন মনে করি নাই। কিন্তু এখন সুন্দরী হই নাই বলিয়া নিজেকে ধিক্কার দিয়া থাকি। কি করিলে আপনার মতন হইতে পারি?

স্নেহাকাঙ্ক্ষিণী শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী দেবী।

আপনি আমার প্রণাম জানিবেন। গুরুজনদিগকে প্রণাম দিবেন। আমার ছেলেমানুষি মার্জ্জনা করিবেন।”

বোধ হইল, পত্রখানিতে দুই এক ফোঁটা চখের জলও পড়িয়াছিল। আমি বলিলাম, “কিছু কিছু বুঝিয়াছি, কিন্তু সমস্তটা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলাম না।” প্রিয়তমা বলিলেন, “তবে গল্পটা শুন।—

“গত বৈশাখ মাসে তোমায় অনেক সাধ্যসাধনা করিয়া বাপের বাড়ীতে যাইবার হুকুম পাইলাম। তোমাদের শরীরে দয়া মায়ার লেশ নাই। দুই তিন বৎসর বাপ মাকে দেখি নাই, তবুও বাপের বাড়ী যাইবার অনুমতি পাই না। পরজন্মে পরমেশ্বর যেন তোমাদের রমণী করিয়া পাঠান।

“তুমি আমাকে ষ্টেশনে রাখিয়া চলিয়া আসিলে। মনটা কেমন আঁধার হইয়া গেল। ভাবিলাম, তুমি একলা থাকিবে।”

আমি বলিলাম, “তবু ভাল। এই নিষ্ঠুর দয়ামায়াহীন লোকটাকে যে একবার মনের ক্ষুদ্র এক প্রান্তে আনিয়াছিলে, ইহা আমার পরম সৌভাগ্য বলিতে হইবে।”

“বাবা বলিলেন, ‘মেয়েদের গাড়ীতে যে প্রকার অত্যাচার শুনিতে পাওয়া যায়,—তুমি আমার গাড়ীতে এস।’ আমি তাঁহার গাড়ীতেই উঠিলাম। ক্ষুধার্ত্ত মক্ষিকার ন্যায় একশত দৃষ্টি আমার উপর আসিয়া পড়িল। দেখিয়া বোধ হইল, যেন আমাদের জাতি তাহাদের নয়নপথে কখন পড়ে নাই। আমি সসম্ভ্রমে গাড়ীতে উঠিয়া বাঁচিলাম। তাড়াতাড়ি গাড়ীতে উঠিতে গিয়া আমার আঁচলে পা বাধিয়া আঁচল ছিঁড়িয়া গেল। এমন বিপদেও মানুষ পড়ে।”

"বিপদ তোমাদের না আমাদের? আমরা বেশ নিশ্চিন্ত হইয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসি—কোথা হইতে দুটি উজ্জ্বল চক্ষু বা এক গুচ্ছ অলক আসিয়া আমাদের হৃদয়কে অশান্ত করিয়া তুলে;—আমাদের নিরাপদে বসিতে দেয় না।"

"আমাদের কাম্‌রায় তিনজনমাত্র লোক,—আমি, বাবা ও আর একটি ছেলে। ছেলেটির বয়স সতেরো আঠার হইবে।

"আমার গাড়ীতে উঠিয়া মনে হইতেছিল, কত ক্ষণে রাজবাঁধ ষ্টেশনে পৌছিব। পথ যেন আর কিছুতেই ফুরায় না। অন্য বার গাড়ীতে যাইতে যাইতে দুই ধারে মাঠ, নদী, চাষাদের ছোট ছোট বাড়ী দেখিতে কত আমোদ হইত। কিন্তু এবার মনে পড়িতেছিল,—বাপের বাড়ীর শিবের মন্দিরের নীচে দীঘির কাল জল। অনেকক্ষণ পরে মুখ তুলিয়া দেখি, ছেলেটি আমার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে। কিন্তু আমি মুখ তুলিতেই সে চোখ নামাইয়া লইল। নববিবাহিতা বধূর ন্যায় তাহার চোখ মুখ লজ্জায় লাল হইয়া আসিল। গাড়ীর জানালা হইতে মুখ বাড়াইয়া সেই প্রখররৌদ্রতপ্ত ভূমিখণ্ডের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিলাম। বিশেষ কিছু দেখিতেছিলাম না। কিন্তু তবুও অলস দৃষ্টি সেই দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল। অনেকক্ষণ পরে তাকাইয়া দেখি, অপরিচিতের দৃষ্টি আমার উপর। এবার চোখচোখি হইতেই সে যেন কিছু অপ্রতিভ হইয়া মুখ ফিরাইয়া লইল। অতি আগ্রহের সহিত একখানা পুস্তক পড়িতে অভিনিবিষ্ট হইল। আমি মনে মনে একটু হাসিলাম।"

"তোমার বর্ণনা শুনিয়া আমার মনটা বড় খারাপ হইতেছে। আমি সেখানে থাকিলে হয় ত একটা রক্তারক্তি হইয়া যাইত।"

"এ প্রকার সমালোচনা আরম্ভ করিলে আমি কিন্তু গল্প এখানে বন্ধ করিয়া রন্ধনশালায় যাইব।—

"যে প্রকার রৌদ্র, গলা শুকাইয়া আসিতেছিল। বর্দ্ধমানের আগে একটা ষ্টেশনে পৌছিয়া বাবাকে পানের কথা বলিলাম। কিন্তু গাড়ী তখন প্রায় ছাড়ে। চীৎকার করিয়াও পানওয়ালার দর্শন মিলিল না। বোধ হয়, আমাদের ডাক শুনিতে পায় নাই;—গাড়ীর অপর প্রান্তে পান বেচিতেছিল। ছেলেটি গাড়ী হইতে নামিয়া 'আমি পান আনিয়া দিতেছি' বলিয়া নক্ষত্রবেগে ছুটিল। গাড়ী ছাড়িয়া দিল। হাঁপাইতে হাঁপাইতে কোন ক্রমে সে গাড়ীতে আসিয়া উঠিল। আমার জন্য এই প্রকার কষ্ট ভোগ করিতে দেখিয়া তাহাকে কৃতজ্ঞতা-সূচক ধন্যবাদ দিবার খুব ইচ্ছা হইল, কিন্তু মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না।"

কেন, তোমাদের ধন্যবাদ কি সুধু ভাষায়? একবার বিস্ফারিত-নেত্রে চাহিলেই আমরা কৃতার্থ হইয়া যাই। তোমরা একবার অপাঙ্গে দৃষ্টিপাত করিলে, পান আনা কেন, নন্দনের পারিজাত, স্বর্গের অমৃত আনিয়া হাজির করিতে পারি।"

"বকো'না, এমন করিয়া বাধা দিলে আমার গল্প বলা হয় না। যাই, আমার বেলা হইতেছে।"

এই বলিয়া গৃহিণী ত্রস্তপদে গৃহের বাহির হইবার উদ্যোগ করিলেন। কিন্তু দুই এক পা অগ্রসর হইয়াই হাসিয়া ফিরিতে হইল। পূর্ব্বেই তাঁহার অঞ্চলখণ্ড আমার টেবিলের পায়ার সহিত বাঁধিয়া রাখিয়াছিলাম। গৃহিণী বলিলেন, "তোমাকে পারিয়া উঠা ভার। এখন বন্ধন খুলিয়া দাও।" আমি বন্ধনমোচন করিয়া বলিলাম, "গল্পটা সমাপ্ত না করিলে এখান হইতে যাইতে দিতেছি না।"

"তাহার পর বাবার সহিত আলাপ হইলে শুনিলাম, যুবকের বাটী ঢাকা অঞ্চলে। কলেজের ছুটীতে এক জন সহপাঠীর নিমন্ত্রণে বর্দ্ধমান অঞ্চলে সুহৃদ্‌গৃহে গমন করিতেছিল। সেখানে দশ বার দিন থাকিয়া বাটী ফিরিবে।

"তুমি দেখিয়াছ, বাবা লোক দেখিলেই তর্ক করিতে প্রস্তুত। বিশেষতঃ কলেজের ছেলে দেখিলেই তাঁহার তর্ক-প্রবৃত্তিটা বিশেষ প্রবল হইয়া উঠে। তিনি কলেজের ছেলেদের তর্ক করিবার রীতি দেখিয়া অনেক সময় বেশ আমোদ পাইয়া থাকেন। তিনি বলেন, উচ্ছৃঙ্খল বিচারশক্তির উপমা কলেজের ছাত্রদের নিকট যথেষ্ট পাওয়া যায়।"

এই কথা বলিয়া গৃহিণী একবার অপাঙ্গে আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। আমি দুর্ভাগ্যবশতঃ কিছুদিন কলেজে পড়িয়াছিলাম। অনেক দিন চেষ্টা করিয়াও আমার এ কলঙ্কটা কিছুতেই ঘুচিল না।

"ছেলেটির হাতে একখানি কবিতাগ্রন্থ ছিল। বাবা সেইখানি অনেকক্ষণ পড়িয়া বলিলেন, 'ভাল লাগিল না।' সুপ্তসিংহের মত যুবক জাগিয়া উঠিয়া বলিল,—'এই সমালোচনা নূতন শুনিলাম। আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ কবির এমন সুন্দর লেখা আপনার ভাল লাগিল না?' আমি ভাবিলাম, এইবার বাবার উপযুক্ত শীকার মিলিয়াছে। বাবা ঘুরিয়া বসিলেন। একটু হাসিয়া বলিলেন, 'সকলেরই কি এক জিনিস ভাল লাগিতে হয়? শতকরা পঁচাশি জন লোকের একখানি ছবি দেখিতে ভাল লাগে, সেই জন্য আমারও কি সেই ছবিখানি দেখিতে ভাল লাগিবে? ইহার কি কোন একটা অখণ্ড নিয়ম আছে?

তোমাদের শ্রেষ্ঠ কবির কবিতা যদি আমার ভাল না লাগে, সে কি আমার অপরাধ? রুচি ভিন্ন হইতে পারে। বয়সের সহিত রুচিরও অনেক পরিবর্ত্তন হয়। প্রথম বয়সে জয়দেবের ললিতপদাবলির কোমল ঝঙ্কারে মুগ্ধ হইয়া যাইতাম; কিছু বেশী বয়সে কবিগুরু বাল্মীকির অনুষ্টুভের গুরু গম্ভীরধ্বনিই ভাল লাগে।' তিনি আরও কিছু বলিতে যাইতেছিলেন, সমস্ত বলিতে না বলিতে যুবকের বাক্যস্রোতে সমস্ত ভাসিয়া চলিল। বাবার কথা দু' একটা উপলখণ্ডের ন্যায় স্রোতের মুখে আসিয়া পড়িতেছিল মাত্র, কিন্তু সে স্রোত অবিরাম ছুটিয়াছিল। শুধু তর্কস্রোত নহে, মধ্যে মধ্যে কবিতার আবৃত্তিও হইতেছিল। ঝড়ের মত কবিতার আবৃত্তি শুনিয়া আমার বেশ আমোদ হইতেছিল। আমি অনেক কষ্টে হাসি চাপিয়া রাখিয়াছিলাম।

"হঠাৎ যুবকের দৃষ্টি আমার উপর পড়িল। একটা কবিতা আবৃত্তি করিতে করিতে মাঝখানে থামিয়া গেল। আমার হাসি দেখিয়া যেন একটু অপরাদ্ধভাবে জড়সড় হইয়া বসিল। সে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ম্লানকণ্ঠে কহিল, 'আপনার কাহার কবিতা ভাল লাগে?'

"বাবা বলিলেন, 'মধুসূদনের কবিতা। মধুসূদনের কবিতা মৃতের সমাধিপূর্ণ, সুধু কথার তাজমহল নয়। মধুসূদন-নির্ম্মিত সেই সৌধের স্থানে স্থানে ইষ্টক বাহির হইয়াছে। ভিত্তিভেদ করিয়া হয় ত বটবৃক্ষ উঠিয়াছে, কিন্তু প্রাঙ্গন হইতে জীবন্ত মানবের কোলাহলধ্বনি আইসে। মধুসূদন প্রাণহীন মর্ম্মর-প্রতিমা গড়েন নাই—গড়িয়াছেন যৌবনবিকশিতা সুন্দরী মানবী। মধুর কবিতা গৌড় জনের সুখ দুঃখের বারতা বহিয়া আনে—মধুর কবিতা মধুর মধুর হৃদয়ের প্রতিবিম্ব'।"

আমি হাততালি দিয়া বলিলাম, "সাবাস! সাবাস! তোমাকে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের কাব্যশাস্ত্রের অধ্যাপক করা উচিত।"

"তুমি আমাকে ঠাট্টাই কর আর যাই কর, তোমাদের এই নূতন প্যান্‌পেনে কবিতা আমার ভাল লাগে না।

"যাহা হউক, গল্পটা শীঘ্র শেষ করিয়া যাই, না হইলে আজ কবিতা আহার করিয়াই থাকিতে হইবে। জগতে সুখের পর দুঃখ। এতক্ষণ হাসিতেছিলাম, এখন মহা বিপদ উপস্থিত হইল। বাবা বলিলেন, 'উমা! তোর মাইকেলের অনেক কবিতা মুখস্থ আছে, চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলীর একটা কবিতা বল্‌তো।' আমি চুপ্ করিয়া থাকিলাম। বাবা বলিলেন, 'ইহাতে আর লজ্জা কি?' বার

বার অনুরোধ করায় বাবার কথা এড়াইতে পারিলাম না। অনেক কষ্টে গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া কোন প্রকারে দুইটা চতুর্দ্দশপদী কবিতার আবৃত্তি করিলাম। জানি না, সীতার অগ্নিপরীক্ষাও এত কঠিন হইয়াছিল কি না!

"কাব্যশাস্ত্রের আলোচনা বেশীক্ষণ চলিল না; গাড়ী শীঘ্রই বর্দ্ধমানে আসিয়া পৌঁছিল। বর্দ্ধমানে গাড়ী অনেকক্ষণ থামে। বাবা কিছু জলখাবার কিনিবার জন্য নামিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, কিন্তু যুবক বলিল, 'আমি একজন মিঠাইওয়ালাকে ডাকিয়া আনিয়া দিতেছি, আপনি বসুন।'

"কিছুক্ষণ পরে সে এক চাঙ্গারি খাবার লইয়া আসিল। বাবা পোর্টমাণ্ট খুলিয়া টাকা দিতে যাইয়া দেখেন, যুবক অন্তর্হিত হইয়াছে। তিনি সমস্ত প্লাটফরম্ খুঁজিয়া আর তাহাকে পাইলেন না। ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, 'ছেলেটির অদৃষ্টে অনেক দুঃখ আছে দেখিতেছি। এক দিনের আলাপে এত নিঃস্বার্থপর হইলে তাহাকে পৃথিবীতে অনেক ঘা খাইতে হয়।'

"আমার কথাটি ফুরা'ল, নটে গাছটি মুড়া'ল। এখন মহাশয় একটা ভাল জবাবের খস্‌ড়া করিয়া দেন দেখি।"

"আমার খসড়া বোধ হয় তোমার পছন্দ হইবে না। কিন্তু হেমাঙ্গিনীর স্বামীকে আমার এই মর্ম্মে একখানি পত্র লিখিতে ইচ্ছা হইতেছে।" এক টুকরা কাগজে লিখিলাম,—"ভাই হে! দূর হইতে সমস্তই সুন্দর দেখায়। কিন্তু কাছে থাকিলে অনেক সময় মোহ অপস্থত হয়। আমাদের বিদুষী ভার্য্যা লইয়া অনেক সময়ে অস্থির হইয়া পড়ি। মনে হয়, বরং তোমরা আছ ভাল।"

সহধর্ম্মিণী কাগজ টুকরা খণ্ড খণ্ড করিয়া বলিলেন, "তোমাদের সুখ কোন স্থানেই নাই। আমরা যদি নিরক্ষর হই, তোমাদের গঞ্জনায় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধির প্রতাপে আমরা যেন চোরের মত হইয়া যাই। আবার লেখাপড়া শিখিলেও দেখিতেছি নিস্তার নাই। বাঙ্গালীর ছেলেরা সুধু খেয়ালের উপর চলে, কিছুতেই ধ্রুব বিশ্বাস নাই।"

আমি বলিলাম, "সমালোচনা করিয়া অপরাধ হইয়াছে। এখন বলিতেছি, 'তোমরা সবাই ভাল—কেউ বা গৌর, কেউ বা কাল।"

গৃহিণী বাহুলতা দ্বারা আমার গলদেশ বেষ্টন করিয়া বলিলেন, "প্রাণাধিক! এই গুণেই আমি তোমার কেনা।" বলা বাহুল্য, তাঁহার হস্তের হরিদ্রা রঙ্গে আমার গাত্র রঞ্জিত হইল।

বঙ্গদেশে নূতন ইতিহাসচর্চ্চা।

আজ কাল বোধ হইতেছে যে, আমাদিগের দুর্ব্বল ইতিহাসানুরাগ একটু প্রবল হইয়া উঠিতেছে। সাময়িক পত্রে নানা প্রবন্ধ হইতে স্বতন্ত্র ঐতিহাসিক পত্রপ্রচার পর্য্যন্ত নানা দিকে সে অনুরাগ আত্মপ্রকাশ করিতেছে। ইহা শুভ লক্ষণ—সন্দেহ নাই। যাঁহারা এই সকল শুভকার্য্যে সেবক বা সহায়, তাঁহারা আমাদিগের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। কিন্তু এ প্রদেশে এইরূপ বহু অনুষ্ঠানে এরূপ বহ্বারম্ভে লঘু ক্রিয়া দেখা গিয়াছে যে, প্রথমেই আশঙ্কা হয়— পাছে উচ্চ কেকানিনাদে ঘোষিত ঐতিহাসিক আলোচনার এই দুর্ব্বল প্রারম্ভ অচিরে বিনষ্ট হয়।

শুভ কার্য্যের সূচনাকালেই তাহার ভবিষ্যৎ আশঙ্কায় ভীত না হইয়া, তাহার বর্ত্তমান কার্য্যপ্রণালীর সমালোচনাতেই অধিক উপকারলাভের সম্ভাবনা। আমাদিগের ক্ষুদ্র শক্তি অনুসারে আমরা সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইব।

"ইতিহাস কি?"—এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, ইতিহাস জাতীয় বিবর্ত্তের বিশদ বিবরণ। ব্যক্তিসমষ্টি লইয়াই জাতি। এই জন্যই ইতিহাস কোন ব্যক্তিবিশেষের জীবনচরিত নহে; এই জন্যই এক জনকে লইয়া ইতিহাস হয় না, সাধারণকে লইয়া হয়; এই জন্যই প্রধানতঃ প্রজাই ইতিহাসের বিষয়,—রাজা কচিৎ। সিরাজদ্দৌলা অত্যাচারী ছিলেন কি না, আরঙ্গজেব স্বয়ং মদ্যপান করিতেন কি না—ইহার অপেক্ষা সিরাজদ্দৌলার সময়ে প্রজাসাধারণের অবস্থা কিরূপ ছিল, আরঙ্গজেবের সাম্রাজ্যে সাধারণ জনগণের মধ্যে মদ্যপান প্রচলিত ছিল কি না,—এই সকল প্রশ্নের ঐতিহাসিক মূল্য অধিক। সাধারণতঃ প্রজাই ইতিহাসের বিষয়। তবে যেখানে রাজার নিয়োগে প্রজার সাহিত্যে বা সম্পদে কোন নূতন স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে, যেখানে রাজার শাসননীতির ফলে প্রজার জাতীয় জীবনে উন্নতির বা অবনতির সূত্রপাত হইয়াছে, যেখানে রাজার আজ্ঞায় প্রজার বাণিজ্য সম্বন্ধে বা প্রজাসাধারণের মধ্যে জ্ঞানবিস্তার সম্বন্ধে কোন বিশেষ পরিবর্ত্তন সঙ্ঘটিত হইয়াছে, সেখানে রাজার শাসননীতি সমালোচ্য—সুতরাং রাজা ইতিহাসের বিষয়। আরঙ্গজেবের হিন্দুবিদ্বেষের অনুকূল পবন না পাইলে মহারাষ্ট্রীয়দিগের জাতীয় উন্নতির তরণী

আকার ধারণ করিত কি না, বলা যায় না ; সুতরাং আরঙ্গজেবের শাসননীতি ইতিহাসের বিষয়—আরঙ্গজেব ইতিহাসের বিষয়ীভূত।

মোহনলাল সিরাজদ্দৌলাকে ভগিনীদান করিয়াছিলেন কি না, সেই বিষয় লইয়া মধ্যে একটা ছোট-খাট তর্কের বাত্যা উঠিয়াছিল। সে আলোচনায় লেখকগণের অনুসন্ধিৎসার বিশেষ প্রশংসা করিতে হয়। কিন্তু সে আলোচনার অপেক্ষা—আকবরের পূর্ব্বে কোন মুসলমান সম্রাট হিন্দুর সহিত বিবাহসম্বন্ধ সংস্থাপিত করিয়াছিলেন কি না, এবং আকবরের পর আর কোন মুসলমান সম্রাটের সময় ঐরূপ সম্বন্ধসংস্থাপন করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল কি না,—এরূপ আলোচনার মূল্য ঐতিহাসিক হিসাবে অধিক। তাহাতে হিন্দু মুসলমানের প্রচলিত আচার ও মনোভাব প্রকাশিত হয় ; জনসাধারণের বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

আমাদিগের দেশে যাঁহারা ঐতিহাসিক আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহারা এই কথাটিই সময় সময় ভুলিয়া যান ; তাই তাঁহারা সাধারণের স্থানে ব্যক্তিবিশেষকেই উজ্জ্বল করিয়া তুলেন,—তাই তাঁহাদের রচিত ঐতিহাসিক রচনা অনেক স্থলে জীবনচরিতের এক এক অধ্যায়মাত্র।

ইতিহাসে ও উপন্যাসে প্রভেদ প্রভূত। উপন্যাসে কল্পনার প্রাধান্য,—প্রকৃত ঘটনাই ইতিহাসের একমাত্র ভিত্তি। ঐতিহাসিককে পদে পদে সত্যনির্দ্ধারণের চেষ্টা করিতে হয়,—পদে পদে সত্য ঘটনার জন্য আপনার উচ্ছৃঙ্খল কল্পনা সংযত করিতে হয়,—পদে পদে প্রমাণবিচারে প্রবৃত্ত হইতে হয়। আমাদিগের ঐতিহাসিক প্রবন্ধলেখকগণ কল্পনার ঝোঁক হইতে সকল সময় আপনাদিগকে মুক্ত করিতে পারেন না। তাই তাঁহাদিগের ইতিহাসে উপন্যাসের ছায়াপাত লক্ষিত হয়। ক্ষুদ্রের সহিত বৃহতের তুলনা করিলে যদি দোষ না হয়, তবে বলা যাইতে পারে, এ বিষয়ে তাঁহারা মেকলের পদাঙ্কানুসারী। মেকলের বর্ণনাচাতুরী, তাঁহার ভাষার বেগ ও উচ্ছ্বাস, তাঁহার রচনাপ্রণালী তাঁহার রচিত ইতিহাসে মাধুরীসঞ্চার করিয়াছে—তাঁহার গ্রন্থখানিকে অমর করিয়াছে। বর্ণনাচাতুরীতে মেকলের নিকট স্কট ও হুগো প্রভৃতি ঔপন্যাসিকগণও অনেক স্থলে পরাজিত। কোন বিখ্যাত সমালোচক মেকলের ইতিহাস সম্বন্ধে বলিয়াছেন—সে ইতিহাস ঐতিহাসিক দলিল দস্তাবেজ হইতে সঙ্কলিত ঐতিহাসিক উপন্যাসমাত্র। তদ্রূপ পুস্তক পাঠকের মানসরঞ্জক, কোন কোন পাঠকের পক্ষে উপকারীও বটে, কিন্তু ইতিহাস

কিন্তু আপনার ইতিহাসে তিনি কবিতার পরিবর্ত্তে শব্দচিত্রণের ও দর্শনের স্থানে কিম্বদন্তীর আশ্রয় লইয়াছেন। তাঁহার ইতিহাস ঐতিহাসিক উপন্যাসের ও জীবনচরিতের মিশ্রণমাত্র।

আমাদিগের ঐতিহাসিক প্রবন্ধলেখকদিগের সম্বন্ধেও এই সকল কথা প্রযোজ্য। তাই তাঁহাদের রচনায় অনেক বাজে বকুনি, অনেক বেতালা বুকনি, অনেক অনাবশ্যক হাহুতাশ, অনেক অর্থশূন্য আক্ষেপোক্তি লক্ষিত হইয়া থাকে। সে সকল ঐতিহাসিক রচনায় স্থান পাইবার উপযুক্ত নহে।

ঐতিহাসিককে পাদ পদে প্রকৃত ঘটনার উপর নির্ভর করিতে হয়, পদে পদে প্রমাণপরীক্ষা করিতে হয়—সাক্ষ্যবিচার করিতে হয়। জীবনচরিতপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, অনেক যুরোপীয় ঐতিহাসিক (এমন কি ঔপন্যাসিকও) যুদ্ধাদি বর্ণনা করিবার পূর্ব্বে ঘটনাস্থলে গিয়া উপস্থিত বর্ণনার বিচার করেন, সাক্ষ্যের পরীক্ষা করেন, যুদ্ধস্থল দেখিয়া,—স্থানের পরিমাণ করিয়া, ভিন্ন ভিন্ন সেনাদলের কার্য্যস্থলনির্দ্দেশের জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করিয়া পরে যুদ্ধবর্ণনে হস্তক্ষেপ করেন। অস্মদ্দেশীয় ঐতিহাসিক প্রবন্ধলেখকগণ এইরূপ শ্রমস্বীকার আবশ্যক মনে করেন না; করিলে, তাঁহাদিগের পুস্তকে সময় সময় অনবধানতাজাত নানা ভ্রম লক্ষিত হইত না। একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিতেছি। সিংহাসনলাভের পরেই ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে সিরাজদ্দৌলা সসৈন্যে সওকৎজঙ্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। তিনি স্বয়ং এক দল সৈন্য লইয়া রাজমহলের দিক দিয়া অগ্রসর হয়েন; অপর সৈন্যদল মোহনলালের অধীনে গঙ্গা পার হইয়া সোমদহ, হায়েৎপুর ও বসন্তপুর গোলার দিক হইতে শত্রুসৈন্য আক্রমণ করিতে আদিষ্ট হয়। ষ্টুয়ার্ট ভ্রমক্রমে সোমদহের স্থানে "সরদহ" পাঠ করেন। "সিরাজদ্দৌলা"-লেখক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় সরদহের উল্লেখ পাইয়া তাহাতে "রাণী ভবানীর জমিদারী" যোগ করিয়া দিয়াছেন। "মুর্শিদাবাদ হইতে পূর্ণিয়া যাইতে হইলে, রাজসাহীর দক্ষিণ সরদহ পাওয়া যায় না। হিয়াৎপুর ও সোমদহ—মালদহ ও পূর্ণিয়া জেলার সীমান্তভাগে।" * মানচিত্র লইয়া সেনাদলের গমনপথের ও কর্ম্মক্ষেত্রের স্থাননির্দ্দেশের চেষ্টা করিলে সহজেই এইরূপ ভ্রমের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যাইতে পারে।

প্রমাণপরীক্ষার ফলে অনেক সময় ইতিহাস ভিন্নরূপ ধারণ করে। যে লেখক যে প্রমাণে বিশ্বাস করেন, তিনি সেই প্রমাণ অবলম্বন করিয়াই পরবর্ত্তী সকল

* ১৩০৫ সালের "সাহিত্য" [illegible]

ঐতিহাসিক ঘটনার কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধনির্ণয়ে প্রবৃত্ত হন। কাজেই কোন সাক্ষ্য সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইবার পূর্ব্বে লেখকের পক্ষে তাহার সত্যাসত্যনির্দ্ধারণের জন্য সবিশেষ শ্রমস্বীকার করা আবশ্যক। কোন ঐতিহাসিক বিষয়ে কোন প্রবন্ধাদির রচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে, তাহার কোন সমসাময়িক বিবরণ থাকিলে, লেখকের তাহা পাঠ করা উচিত, তদ্ভিন্ন যে সকল ইতিহাসে সেই বিষয়ের বিবরণ বা আলোচনা আছে, সেই সকল ইতিহাস ও সেই সকল ইতিহাসের সমালোচনা পাঠ করাও লেখকের পক্ষে বিশেষ আবশ্যক, নহিলে সত্যনির্দ্ধারণের সম্ভাবনা সুদূরপরাহত হয়। কেবল গ্রন্থবিশেষ অবলম্বন করিলে দুইটি বিপদ উপস্থিত হয়। প্রথমতঃ, মহাভারতের মত বৃহৎ গ্রন্থ হইতে কোন চরিত্রবিশেষের বিবরণ সংগ্রহ করা যেরূপ আয়াসসাধ্য, কোন বৃহৎ ইতিহাস হইতে কোন বিশেষ বিষয়ের বিবরণ সংগ্রহ করাও তদ্রূপ কষ্টসাধ্য। লেখক একটু অমনোযোগী হইলেই প্রবন্ধের ধারাবাহিক একতাসূত্র বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, আলোচনা অঙ্গহীন হইয়া পড়ে। ঐতিহাসিককে সর্ব্বদাই গ্রীক পুরাণে বর্ণিত জাগ্রতচক্ষু রক্ষী দানবের মত সতর্ক থাকিতে হয়; মুহূর্ত্তের অমনোযোগে বিপদের সম্ভাবনা। দ্বিতীয়তঃ, অবলম্বিত গ্রন্থের ভ্রমগুলি সংশোধিত হয় না। সেই জন্য অস্মদ্দেশের ঐতিহাসিক প্রবন্ধলেখকদিগের রচনায় সময় সময় নানা ভ্রম লক্ষিত হয়।

ঐতিহাসিক সত্যনির্দ্ধারণের জন্য ইয়ুরোপীয় সাহিত্যসেবকগণ কিরূপ শ্রমস্বীকার করেন, তাহার দৃষ্টান্তের জন্য আমাদিগকে অধিক দূরও যাইতে হইবে না। অল্প দিন হইল, একখানি পুরাতন "কলিকাতা রিভিউ" পত্রে দেখিতেছিলাম, একখানি ইতিহাসের সমালোচনার সূচনায় লেখক বলিয়াছেন যে, যে সকল পুস্তক অবলম্বন করিয়া সমালোচ্য পুস্তকখানি রচিত হইয়াছে, সকলগুলিই তিনি সংগ্রহ করিতে পারেন নাই; পুস্তকখানির পরীক্ষার জন্য পঞ্চাশখানি গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছেন—সকল পুস্তক সংগৃহীত হয় নাই। এই সত্যানুসন্ধিৎসা য়ুরোপীয় ঐতিহাসিকদিগের মূল মন্ত্র।

অস্মদ্দেশে অল্প সাহিত্যসেবকই ইতিহাসের চর্চ্চা করিয়া থাকেন; সেই জন্য এখানে ঐতিহাসিক প্রবন্ধলেখকের পক্ষে যশঃ সহজপ্রাপ্য—সাধারণের করতালি সুলভ। এই সহজপ্রাপ্য যশে অন্ধ না হইয়া,—এই অনায়াসলভ্য করতালির রোলে আপনাদিগকে অভ্রান্ত বিবেচনা না করিয়া, আমাদিগের দেশের লেখকগণ যদি ঐতিহাসিক সত্যনির্দ্ধারণে প্রকৃত ঐতিহাসিকোচিত প্রকৃত শ্রম

স্বীকার করেন, তবেই আমাদিগের ঐতিহাসিক সাহিত্যের প্রকৃত উন্নতি হইবে—নহিলে নহে।

এ দেশে ঐতিহাসিক প্রবন্ধলেখকদিগের আর একটি রোগ গালি দেওয়া। বিচারে বা তর্কে, যুক্তির অভাবে গালি ব্যবহৃত হয়; এ দেশে পণ্ডিতদিগের তর্কই তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। দুঃখের বিষয়, আমাদিগের ঐতিহাসিক প্রবন্ধ-লেখকদিগের মধ্যে এই রোগের আবির্ভাব লক্ষিত হইতেছে। এই গালি সাধারণতঃ অস্মদ্দেশীয় ঔপন্যাসিক ও কবিগণের প্রতি, এবং বিদেশীয় ঐতিহাসিক-দিগের প্রতি অকারণে বর্ষিত হইয়া থাকে। "সীতারাম" প্রবন্ধে শ্রদ্ধেয় অক্ষয় বাবু সাহিত্যগুরু বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি যে কটাক্ষ করিয়াছেন, তাহা না করিলে প্রবন্ধের কোনরূপ গৌরবহানি হইত না, পরন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি সম্মান শ্রদ্ধা অক্ষুণ্ণ থাকিত। তাহার পর, "সিরাজদ্দৌলা"য় তিনি কবিবর নবীন বাবুকে লইয়া নাস্তানাবুদ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। নবীন বাবু স্বয়ং বলিয়াছেন—"পলাশির যুদ্ধ" কাব্য, ইতিহাস নহে। তথাপি তাঁহার নিষ্কৃতি নাই। লেখক বলিতেছেন, "তাঁহার ন্যায় স্বদেশভক্ত কৃতবিদ্য সাহিত্য-সেবক যে সর্ব্বথা স্বকপোলকল্পিত অযথা কলঙ্কে সিরাজদ্দৌলার আপাদমস্তক কলঙ্কিত করিয়া কাব্যরসের অবতারণা করিবেন, তাহা সহসা ধারণা করিতে সাহস না পাইয়া, অনেকেই তাঁহার 'পলাশির যুদ্ধ কাব্যকে' ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন!" ইহা নিতান্তই গায়ে পড়িয়া ঝগড়ার মত শুনায় না কি? কেহ জিদ করিয়া নবীন বাবুর কাব্যকে ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করিলে তাহার জন্য কি নবীন বাবু দায়ী? কাব্য বা উপন্যাস হইতে অনেক পাঠক ঐতিহাসিক জ্ঞান-সঞ্চারের আশা রাখেন, ইহা বোধ হয় না। সেক্সপীয়ারের ঐতিহাসিক নাটক পাঠ করিয়া যে কোন ইংরেজ দেশের ইতিহাস জানিয়াছেন, বা জানিবার চেষ্টা করিয়াছেন, এ কল্পনা নিতান্তই হাস্যোদ্দীপক নহে কি? এরূপ কল্পনা আমাদের মস্তিষ্কেরই উপযোগী বটে! সে কথার আলোচনা পরে করিব। ঐতিহাসিক সত্যের উদ্ধারই যখন লেখকের একমাত্র উদ্দেশ্য, তখন কাব্যকারকে বা ঔপ-ন্যাসিককে গালি দেওয়া যে তাঁহার পক্ষে নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ঐতিহাসিক হিসাবে তাহা যেমন অনাবশ্যক, তেমনই মূল্যহীন।

ইহার পর "ভারতী"তে "মীরকাসিম" প্রকাশিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রকে গালি দিয়াই সে রচনার আরম্ভ; অথচ সে গালি নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক। এই প্রবন্ধে লেখক ও প্রবন্ধের ভূমিকায় সম্পাদিকা মহাশয়া যে ভাষার ব্যবহার করিয়াছেন,

াং বিস্মিত ও ব্যথিত হইতে হয়।* লেখক বলিয়াছেন,—"এদেশের
;, লোকেরও তদ্বিষয়ে অনুরাগ নাই ;—এরূপ অবস্থায় যিনি যেরূপে
ইতিহাসকে বিকৃত করিয়াছেন। ইহা কুরুচি। সত্যানুরোধে
ন বঙ্কিম ইহার শিক্ষাগুরু।" ইহার পর লেখক সহানুভূতিলাভাশায়
ালা ধরিয়া কাঁদিয়াছেন ; বলিয়াছেন,—"বঙ্কিম মুসলমানবিদ্বেষী
* তিনি ইতিহাস লিখিলে যে কি লিখিতেন, বুঝিতেই পারা
নাই বলিয়া ইতিহাস লেখা ঘটে নাই, অবসর হইয়াছিল বলিয়া
হইয়াছিল ;—সুতরাং 'নেড়ে বেটাদের' শ্রাদ্ধটা তাহাতেই
হইয়াছে!" ইহা বড় বিষম অভিযোগ। ব্রাহ্মণতনয় বঙ্কিমচন্দ্র
প্রযুক্ত হিন্দু-আচারানুমোদিত শ্রাদ্ধটা মুসলমানেরই করিয়া থাকেন,
বিশেষ অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন, তাহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই।
ীয় একতার সংস্থাপনকল্পে এত চেষ্টা করিতেছি, বঙ্কিমচন্দ্র
দিগের মধ্যে বিরোধভাব প্রবল করিবার চেষ্টা করিয়া তাহার
া গিয়াছেন! সৌভাগ্যের বিষয়, তখনও নূতন "সিডিশন"
ল বঙ্কিমচন্দ্রকে বিচারাসন হইতে নামিয়া কারাগারে
। কিন্তু এ ক্ষেত্রে লেখক যাঁহাদিগের কণ্ঠসংলগ্ন হইয়া ক্রন্দন
, তাঁহাদিগের নেত্রে অশ্রু ঝরিবার সম্ভাবনা নাই। কারণ, বঙ্কিমচন্দ্র
তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন উপন্যাসে মুসলমান-মহিলাজীবনের যে পবিত্র আদর্শ অঙ্কিত
করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া কাহারও মনে এ কথা উদিত হইতে পারে না যে,
বঙ্কিমচন্দ্র "মুসলমান-বিদ্বেষী" ছিলেন। বরং "চন্দ্রশেখরে" তিনি হিন্দুকুল-
বধূকে মলিন করিয়া মুসলমান-মহিলাকে উজ্জ্বল করিয়াছেন। তাঁহার প্রতিভা-
রবিকরে মুসলমান নবাবের বিলাসপাপপঙ্কিল অন্তঃপুরে যে শতদল প্রস্ফুটিত
হইয়াছে, তাহার তুলনা কোথায়?

এখানে আমরা বিষম সংশয়ে পড়িয়াছি। লেখক বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার ভিন্ন
ভিন্ন স্থান হইতে মুসলমানদিগের সম্বন্ধে যে সকল উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন,
স্থান, কাল ও পাত্র বিবেচনা করিলে লেখক সে সকল উক্তি লইয়া তাঁহাকে দোষ

* সম্পাদিকা মহাশয়ার ভূমিকার শেষ এইরূপ—"সত্যের শাসন অতি কঠোর—বঙ্কিমের মৃত আত্মার প্রতি আমাদের ইহা ছাড়া আর কিছু বক্তব্য নাই।" ইহা পাঠ করিলে বহু দিন পূর্ব্বে "নব্যভারতে" প্রকাশিত শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের কৃত বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি তীব্র আক্রমণের কথা মনে পড়ে।—লেখক।

দিতে পারিতেন কি না সন্দেহ। অথচ আমরা কি ভাবিব, বুঝিতে
না। লেখক যে বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থসমূহ পাঠ করেন নাই, এমন
পারি না; কেন না, শিক্ষিত বাঙ্গালীর পক্ষে, বিশেষতঃ, বিখ্যাত সা
পক্ষে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা পাঠ করেন নাই বলা গালিবিশেষ; আ
রচনা পাঠ না করিলেই বা তিনি কেমন করিয়া পূর্ব্বোক্ত
করিলেন? আবার তিনি যে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাসমূহ পাঠ ক
বলিতে সাহস হয় না, কারণ, সে সকল রচনা পাঠ করিয়াও
চন্দ্রের সম্বন্ধে ঐরূপ লিখিয়া থাকেন, তবে তিনি মুতাক্ষরীণ সম্ব
যে কথা বলিয়াছেন, তাঁহাকেও সেই কথা বলিতে হয়;—তি
করিয়াছেন। বোধ করি, অসাবধানতাই এইরূপ আক্রমণের হেতু।

"রাজসিংহের" চতুর্থ সংস্করণের বিজ্ঞাপনে বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং লি
"আমি পূর্ব্বে কখন ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখি নাই। দুর্গেশ
শেখর বা সীতারামকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা যাইতে পা
ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিলাম। এ পর্য্যন্ত ঐতিহাসিক উপন্য
লেখকই সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। আমি
বলা বাহুল্য।" ইহাতেও বঙ্কিমচন্দ্রের নিষ্কৃতি নাই! বঙ্কিমচন্দ্রে
সমালোচনার স্থান এ নহে। তবে এখানে এই পর্য্যন্ত বলিয়া রাখি
আক্রমণে বঙ্গসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের সিংহাসন বিচলিত হইবার সম্ভাবনামাত্র
নাই।

উপসংহারে কৃতাঞ্জলিপুটে জিজ্ঞাসা করি, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার উপন্যাসসমূহে যে সকল ঐতিহাসিক ব্যক্তির ও স্থানের উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহার গ্রন্থসমূহ প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে কয় জন সে সকল ব্যক্তির ও স্থানের নাম শুনিয়াছিলেন? বঙ্কিমচন্দ্রের "সীতারাম" প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে কয় জন সীতারামের কথা শুনিয়াছিলেন? বঙ্কিমচন্দ্রের "সীতারাম" পাঠ করিয়াই যে অক্ষয় বাবুর মনে সীতারামের ইতিহাস-উদ্ধারের ইচ্ছা হয় নাই, এ কথা কেমন করিয়া নিশ্চয় জানিব? বঙ্কিমচন্দ্র "সীতারাম" উপন্যাস রচনা করিয়াছেন। অক্ষয় বাবুকেও কি প্রমাণাভাবে সীতারামের অস্পষ্ট এবং অসম্পূর্ণ ঐতিহাসিক ছায়ামাত্র অঙ্কিত করিয়াই নিরস্ত হইতে হয় নাই?

তাহার পর অক্ষয় বাবু যাহা বলিয়াছেন, তাহার ভাবার্থ এই যে, য়ুরোপে সাহিত্যসেবকগণ সর্ব্বদাই ইতিহাস মানিয়া চলেন। সেক্সপীয়ার য়ুরোপীয়

্যসেবকদিগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তাঁহার ঐতিহাসিক নাটকসমূহ সম্বন্ধে এক
খ্যাত সমালোচক ও ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাসলেখক বলিয়াছেন,—
: historic dramas show how he could free his mind from
mels imposed by the necessity of adhering to real
d persons". তিনি ইহা বিশেষ প্রতিভার পরিচায়ক বলিয়াই বিবে-
য়াছেন। এ সম্বন্ধে কয়টি দৃষ্টান্ত দিতেছি। আমাদিগের স্থানাভাব, সেই
খানিমাত্র পুস্তক হইতে কয়টি দৃষ্টান্ত দিব ; Richard II না৷
লে রিচার্ডের পত্নীর বয়স নয় বৎসর হইতে একাদশ বৎসরের মধ্যে ,
ার তাঁহাকে দিয়া যে সকল কথা বলাইয়াছেন,বালিকার পক্ষে সে সক
মসম্ভব ; প্রৌঢ়া, অন্ততঃ যুবতী নহিলে সে সকল কথা স্ত্রীলোক বলিতে
সেক্সপীয়ার বালিকার বালিকাত্ব রক্ষা করা আবশ্যক বিবেচনা
—নাটকের জন্য তাঁহাকে যুবতী সাজাইয়াছেন। নরফোকের মৃত্যু
তিনি কোন ইতিহাসের অনুসরণ করিয়াছেন কি না সন্দেহ।
া সিংহাসনে আরোহণ করেন, সেক্সপীয়ার সোমবারকে বুধবার
াহার পর সেক্সপীয়ার অমারলের বিমাতাকে তাঁহার জননীরূপে
়। ইত্যাদি,—ইত্যাদি।

ঐতিহাসিক "ভ্রমের" জন্য কেহ সেক্সপীয়ারকে নিন্দা করেন না।
ীনচন্দ্র দুর্ভাগ্যপ্রযুক্ত যে দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সে দেশে
করিতে যত তৎপর, প্রশংসা করিতে তত সম্মত নহে। এ দেশে
পাঠকের উপর প্রভাব সংস্থাপন করে না—সাহিত্যের কোন
লেখক যাহা ইচ্ছা লিখিয়া যাইতে পারেন, কেহ তাহার
রিশ্রমও স্বীকার করিতে চাহেন না।

হাসিক প্রবন্ধলেখকগণের আর এক বিষম দোষ—
দিগকে গালি দেওয়া। অস্মদ্দেশীয় লেখকদিগের সকল
ইংরাজী পাদটীকায় কণ্টকিত। সেই সকল পাদটীকায়
দশীয় লেখকদিগের রচনার উপর নির্ভর করিয়াই
। অথচ তাঁহারা মনে করেন, কি
ট ...

দিগের এত গর্ব্ব,—যে মুতাক্ষরীণ লইয়া সাহিত্যগুরু বঙ্কিমচন্দ্র এত ।
সেই মুতাক্ষরীণের মূল কয় জন পাঠ করিয়াছেন ? বিদেশীয় লেখকগণ
পরিশ্রম স্বীকার করিয়া তাহার অনুবাদ না করিলে মুতাক্ষরীণের সহিত
দের কোন পরিচয় হইত কি না সন্দেহ। আমরা মূল পাঠ করিব
স্বীকার করিতেও প্রস্তুত নহি। সে অনুবাদও যত্নসহকারে পাঠ কি
দহের স্থানে সরদহ লেখা সম্ভব হইত না। সাত নকলে আসলকে চেনা
জন বিদেশীয় ঐতিহাসিক যে ভুল করিয়াছেন, তাহার সা
, বিদেশীয় ঐতিহাসিক,—এক জনের যুক্তি লইয়া অপরের যু
রা হয়। অথচ গুরু-মারা বিদ্যার প্রভাবে বিদেশীয় ঐতিহা
তিরস্কৃত ! এক জন বিদেশীয় ঐতিহাসিকের পক্ষে কোন বিষয়ে ই
সত্যের অপলাপ করাও যেমন সম্ভব, বিদেশের ইতিহাসচর্চ্চায় সতর্ক
নিষ্ঠাসত্বেও ভ্রমে পতিত হওয়া যে তেমনই সম্ভব, ইহা আমাদের
প্রবন্ধলেখকগণ স্বীকার করেন না ; করিলে যে বিচারে সত্যাস
একমাত্র উদ্দেশ্য—সে বিচারে গালির স্থান হয় না।

যেখানে কোন বিদেশীয় লেখকের কথা আমাদের ম
সেখানেই আমরা তাঁহার কথা ফেনাইয়া ফুলাইয়া আপন
ইতে চাহি। যেখানে দুই জন লেখকের পরস্পরবিরোধী
আমাদের মনঃপূত না হয়, সেখানে আমরা উভয়কেই গালি দিয়া
রূপ মীমাংসা করিতে প্রায়ই সাহস করি না। যেখানে কোন
কোন মীমাংসা করিয়াছেন—আমরা সেখানে মীমাংসায় উপনীত
পূর্ব্বে কেহ কোনরূপ মীমাংসা করেন নাই, সেখানে বাজে ক
আসল কথাটা চাপা দিতে পারিলে আমরা আর মীমাংসা
করিতে চাহি না—সাক্ষ্যবিচারে প্রবৃত্ত হইতে স্বীকৃত
দিগের মৌলিকতা। তদ্ভিন্ন অস্মদ্দেশীয় ঐতিহাসিক
এক দোষ এই যে, তাঁহারা মীমাংসাবিশেষকে ভ্রান্ত সপ্র
কোন মীমাংসায় উপনীত হইতে সহজে প্রস্তুত নহে
দিতে বিমুখ। তাঁহাদিগকে প্রাচী

ঃ যেমন অত্যল্পকাল মধ্যে ও অত্যল্প স্থানে সুদীর্ঘ লূতাতন্তু বিস্তার
াদিগের ঐতিহাসিক প্রবন্ধলেখকগণও তেমনই একটি সীমাবদ্ধ
সময় লইয়া অতিবিস্তৃত বহু প্রবন্ধের রচনা করিয়া থাকেন। সুলি-
াসে যাহা কেবলমাত্র এক বা দুই অধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট হ-বার যোগ্য—
াইয়া শতশতপৃষ্ঠাব্যাপী করিয়া তুলা হয়। তাহাতে
দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, পাঠকের তেমনই ধৈর্য্যচ্যুতি হয়।
ণ নূতন উদ্যমে ইতিহাসচর্চ্চার এখন আরম্ভমাত্র। এখন
ত্রুটি থাকিবারই কথা। কারণ, প্রায় কোন বৃহদনু-
হয় না। অভিজ্ঞতার ফলেই ভ্রম ও ত্রুটির নিরাস হইয়া
সকল ভ্রম ও ত্রুটি সংশোধিত হইবার সম্ভাবনা,—এই
মান প্রবন্ধ লিপিবদ্ধ করিলাম। এই প্রবন্ধে অস্ম-
লেখকদিগকে দুই একটি অপ্রিয় কথা বলিতে হই-
তে। আমরা যে উদ্দেশ্যে ও যে ভাবে সেই সকল
রি, তাহা বুঝিয়া তাঁহারা আমাদিগকে ক্ষমা করি-
অর্থ ব্যয় করিয়া আমাদিগের দেশের অনাদৃত ইতি-
মনোযোগী হইয়াছেন, তাঁহারা আমাদিগের বিশেষ কৃতজ্ঞতার
াদিগের চেষ্টায় সুফল ফলিবে, এরূপ আশা করি। বর্ত্তমান প্রবন্ধে
যে সকল বিষয়ের আলোচনা করিয়াছি, তাঁহারা অবহিত হইয়া সেই সকল
বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখেন, ইহাই আমাদিগের প্রার্থনা।

ইংরেজের জয় ও অন্যান্য গ্রন্থ।

[সমালোচনা।]

বাঙ্গালা সাহিত্যক্ষেত্রে বিহারী বাবু সুপরিচিত। সমালোচ্য পুস্তকগুলিও অনেক
দিন হইল প্রকাশিত, এবং ভিন্ন ভিন্ন সাপ্তাহিক ও মাসিকপত্রে সমালোচিত
হইয়াছে, সুতরাং এই সকল পুস্তকের যে আর নূতন করিয়া পরিচয় দিবার
প্রয়োজন আছে, এরূপ বোধ হয় না। তথাচ সমালোচনার্থ যখন উপ-
স্থিত এই সকল পুস্তক সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিয়া দুই

বিহারী বাবুর যে কোন পুস্তকই পাঠ করা যাউক, তাহাতেই তঁ
বিশেষ গুণ বিশিষ্টরূপে পরিস্ফুট দেখা যায়। সেটি তাঁহার অকপট
সাহিত্যানুরাগ। আজ কাল বাঙ্গালা সাহিত্যক্ষেত্রে যে একটা প্রকা
দারি দেখিতে পাওয়া যায়, বিহারী বাবুতে তাহার লেশমাত্র নাই।
কিছু লিখিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার আন্তরিকতা
রিকতা আছে বলিয়াই এই সকল পুস্তকের প্রণয়নে
ত্যাগস্বীকার করিতে হইয়াছে, তাহা তিনি পারিয়া
বিষয়ে বিহারী বাবু এক জন প্রকৃত সাধক—সৌ
সাহিত্যিক কপটতা ও ফড়েমির মধ্যে ইহা বড় অল্প ও

'ইংরেজের জয়ে' দুইটি প্রবন্ধ আছে,—'আরকট-
এই দুইটি প্রবন্ধই প্রথমে 'জন্মভূমি' নামক মাসিকপ
তার পর সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া পুস্তকাকা
আরকট-অবরোধের ফলেই ভারতবর্ষে ইংরেজের
এবং সৌভাগ্যের সূত্রপাত হয়। সুতরাং এই ঘটনা
বর্ণনীয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই প্রবন্ধে বিহ
প্রয়াস পাইয়াছেন যে, ক্লাইব অসমসাহসিক,
সৌভাগ্যশালী। এ প্রয়াসে যে তিনি কৃ অবসরাভিজ্ঞ, অ
যায়। "পলাশী' প্রবন্ধের প্রতিপ কার্য্য হইয়াছেন, তাহা
লিখিত ইতিহাসে সিরা দ্য প্রধানতঃ দুইটি বিষয়। প্রথম, ইংরেজে
উদ্দৌলা যেরূপ নরপিশাচরূপে চিত্রিত হইয়া
তিনি তাহা ছিলেন না। দ্বিতীয়, "অন্ধকূপ হয় নাই; অন্ধকূপের কথা
অলীক।" এই দুই বিষয় প্রতিপন্ন করিতেও বিহারী বাবু সক্ষম হইয়াছেন।
ইহার জন্য যে বিহারী বাবুকে অনেক অনুসন্ধান, অনেক পরিশ্রম করিতে
হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না; কেন না, এ ক্ষেত্রে বিহারী
বাবুই সকলের অগ্রণী। সিরাজদ্দৌলা সম্বন্ধে উৎকৃষ্টতর গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদি
এক্ষণে আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি বটে; কিন্তু ১২৯৯ সালের 'জন্মভূমি'তে যখন
'পলাশী' প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, তখন এ সকলের নামগন্ধও সূচিত হয়
ইহা অনায়াসে বলা যাইতে পারে যে, এ বিষয়ে বিহারীলাল কা
ঋণী নহেন; যে যৎসামান্য ঋণে তিনি প্রকৃতপক্ষ
অকুণ্ঠিতভাবে স্বীকৃত

প্রীতি

াসাগর' গ্রন্থেও বিহারী বাবুর প্রভূত পরিশ্রম, অক্লান্ত গবেষণা এবং
সাহিত্যানুরাগের প্রচুর পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু দুঃখের সহিত
িতেছে যে, যতটা কষ্ট, শ্রম ও অর্থব্যয় তিনি করিয়াছেন, গ্রন্থখানি
াদেয়, তেমন সুখপাঠ্য, হয় নাই। ইহা বিহারী বাবুর দোষ নহে;
যেরূ স্থা, তাহাতে ইহা অবশ্যম্ভাবী। শব্দের লালিত্য, রচনার চাতুর্য্য,
ভাষার ধুর্য্যাদির কথা আমি বলিতেছি না; কিন্তু এই গ্রন্থ যে উপাদেয় হয়
নাই, তাহার কারণ এই যে, বিদ্যাসাগরের জীবনী লিখিবার বিহারী বাবু অধিকারী নহেন। যে নায়কের জীবনের প্রধান প্রধান কার্য্যের সহিত যাঁহার সহানুভূতি নাই, তিনি যদি সেই নায়কের জীবনী লিখিতে যান, সেটা এক প্রকার অনধিকারচর্চ্চাই হয়। অনধিকারচর্চ্চার ফল কখনও উপাদেয় হইতে পারে না। বস্‌ওয়েলের লিখিত ডাক্তার জনসনের জীবনী যে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট জীবনী বলিয়া সমাদর লাভ করিয়াছে, তাহার কারণ এই যে, বস্‌ওয়েল সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার নায়কের উপাসক ছিলেন। শিশির বাবুর 'অমিয়নিমাই-চরিতের' ঐতিহাসিক মূল্য অতি সামান্য, কিন্তু উপাসকের ভক্তির উচ্ছ্বাস বলিয়া ইহা অতি উপাদেয়, অতি সুখপাঠ্য হইয়াছে। বিহারী বাবুও যে অন্ধ উপাসক হইলে ভাল হইত, এমন কথা বলিতেছি না,—অন্ধতা সর্ব্বথা এবং সর্ব্বতোভাবে পরিবর্জ্জনীয়। আমার বক্তব্য এই যে, বিদ্যাসাগর ও বিহারী বাবু মানসিক ও নৈতিক গঠন, প্রকৃতি ও পরিণতি বিষয়ে এতই পৃথক্, এতই পরস্পর-বিরুদ্ধধর্ম্মী, এতই দুস্তর পারাবারের বিপরীত-উপকূলাশ্রয়ী, এতই অনন্তব্যবহিত-দিগন্ত-অবস্থিত যে, বিহারী বাবুর দ্বারা বিদ্যাসাগরের যথাযথ, সুখপাঠ্য, শিক্ষাপ্রদ, হৃদয়গ্রাহী জীবনচরিত লিখিত হইতে পারে না। নায়ক-নির্ব্বাচনে বিহারী বাবুর ভুল হইয়াছে। আমার বোধ হয়, বিহারী বাবু এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ না করিলেই ভাল করিতেন। বিদ্যাসাগরের অনেক অনন্যসাধারণ গুণ এবং তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার অনেক পরিচয় এই গ্রন্থে পাওয়া যায়, সত্য; কিন্তু বিহারী বাবুর গ্রন্থপ্রকাশের পূর্ব্বেই লোকে তাহা অন্যত্র পাইয়াছিল। তবে একটা গুরুতর কর্ত্তব্যপালন বাকি ছিল বটে—বিদ্যাসাগরকে 'অহিন্দু' বলা হয় নাই। তা' সে জন্য একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধই যথেষ্ট হইত—এত বড় একখানি গ্রন্থ কেন?

আর একটা কথা। অন্য কেহ গ্রন্থকার হইলে এ কথা বলিবার প্রয়োজন হইত না। বিহারী বাবু না কি প্রচলিত হিন্দু আচার ব্যবহার রীতি নীতির

নিরতিশয় পক্ষপাতী, অর্থাৎ এক জন নিষ্ঠাবান হিন্দু, তাই এ কথাটা
হইতেছে। বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তাবিষয়ক বাদানুবাদ বিচারবিতর্ক
বিহারী বাবু বিদ্যাসাগরকে 'ভ্রান্ত' 'বিপথগামী' প্রভৃতি বিশেষণে
করিয়াছেন। আমি জিজ্ঞাসা করি, ব্রাহ্মণ বিদ্যাসাগর যে শাস্ত্রার্থ নি
য়াছেন, তাহা ভ্রান্ত কি না, শূদ্র বিহারী বাবুর সে বিচার করিবার ের
কি? ব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণে শাস্ত্রার্থনির্ণয়ের বিচারস্থলে শূদ্র বিহারী বাবু যে গং ভাবে
মীমাংসকরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন—এটা কোন্ দেশের হিন্দুয়ানি? একটু
স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিলে বিহারী বাবু নিজেই বুঝিতে পারিবেন যে, বিদ্যা-
সাগর অহিন্দু নহেন। এ স্থলে অহিন্দু যদি কেহ হয় ত সে বিহারী বাবু নিজে।
ব্রাহ্মণ যে কেবল শাস্ত্র ও আচারের রক্ষাকর্ত্তা, তাহা নহে; নূতন ব্যবস্থা-
প্রণয়ণের ও প্রচলিত আচার পরিবর্ত্তন করিবারও তিনি সম্পূর্ণ অধিকারী।
এই বাঙ্গালা দেশেই অল্পকালপূর্ব্বেই রঘুনন্দন তাহা করিয়া গিয়াছেন।
পরাশরসংহিতায় যদি বিধবাবিবাহের ব্যবস্থা নাও থাকিত, তাহা হইলেও
সমাজমধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত করিবার চেষ্টা করিয়া বিদ্যাসাগরকে অহিন্দু
হইতে হইত না; কেন না, তিনি ব্রাহ্মণ, সুতরাং নূতন ব্যবস্থা করিবার অধি-
কারী। ব্রাহ্মণেরা চিরকাল ইহা করিয়া আসিয়াছেন। যদি বল, এক্ষণে আর
ব্রাহ্মণের সে ক্ষমতা ও অধিকার নাই, তাহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, এখন দেশে
আর ব্রাহ্মণ নাই। ব্রাহ্মণ যদি না থাকে, তাহা হইলে হিন্দুসমাজও আর নাই।
কেন না, কানু-ছাড়া কীর্ত্তনও যা, ব্রাহ্মণ-ছাড়া হিন্দুসমাজও তাই। সুতরাং
হিন্দুত্ব বজায় রহিল কি না, এরূপ কথা কোন স্থলেই উঠিতে পারে না।

এই মন্তব্য অযথা দীর্ঘ হইয়া পড়িতেছে; সেই জন্য বিহারী বাবুর আর
দুইখানি পুস্তকের এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করিতে হইতেছে। উপরে বিহারী
বাবুর যে সকল প্রশংসনীয় ও অনুকরণীয় গুণের উল্লেখ করিয়াছি, 'শকুন্তলা-
রহস্যে' এবং 'তিতুমীরে'ও সে সকলের প্রচুর পরিচয় পাওয়া যায়। রচনার
উৎকর্ষবিষয়ে 'শকুন্তলারহস্য'ই বিহারী বাবুর গ্রন্থাবলীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহার
ভাষা সরল, প্রাঞ্জল, মধুর; রচনায় কোথাও শিথিলতা পরিলক্ষিত হয় না।
ভাবনিচয়ও বিলক্ষণ হৃদয়গ্রাহী এবং সুকৌশলবিন্যস্ত। তবে 'নিজস্ব ও পরস্ব'-
শীর্ষক মুখবন্ধ বা কৈফিয়ৎটা না থাকিলেই ভাল হইত। তিতুমীরের জীবনী
লিখিবার যে কি প্রয়োজন ছিল, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। বিহারী বাবু
বলিয়াছেন—"তিতু বহুগুণসম্পন্ন ছিল।" গুণের মধ্যে ত বিহারী বাবুর

দেখি—হিন্দু মুসলমানের উপর অত্যাচার, পরস্বলুণ্ঠন, নিরীহ
গৃহ, কুলবধূর সতীত্বনাশ, হিন্দুর দেবগৃহ কলঙ্কিত করা, জোর
গণের মুখে গোমাংস গুঁজিয়া দেওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি। এই পাপিষ্ঠ
আবার জীবনচরিত কেন? তবে এই পুস্তকে যে সকল গান ও
ছড়া ...লিত হইয়াছে, যদি বাঙ্গালা সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস কখনও
লিখিত হয়, তখন এগুলি কাজে লাগিবে।

বিহারী বাবুকে আর একটা কথা বলিতে ইচ্ছা করে। প্রচলিত হিন্দু-য়ানির বিহারী বাবু যে পরম ভক্ত, এবং অকপট ভক্ত, তাহা জানি; কিন্তু তাই বলিয়া ধর্ম্ম গায়ে মাখিয়া বেড়ান কেন? ধর্ম্ম কি গায়ে মাখিবার জিনিষ! বিহারী বাবুর ধর্ম্মবিশ্বাস সম্বন্ধে আমার কোনই বক্তব্য নাই—কাহারও থাকিতে পারে না; কিন্তু তাঁহার রচিত সাহিত্যেরও মাথায় টিকি, কপালে তিলক, গায়ে নামাবলী দেখিয়া বাস্তবিকই বড় দুঃখ হয়। 'তিতুমীরে' বিহারী বাবু এক স্থলে লিখিতেছেন,—"কৃষ্ণদেব তখন নিরু-পায় হইয়া, একান্তমনে ভবভয়হারী শ্রীমধুসূদনের নাম জপ করিতে লাগি-লেন। জয়োল্লাসে উন্মত্ত তিতুর লোকেরা তাঁহাকে আদৌ দেখিতে পায় নাই। একান্তে নাম-সাধনার ইহা একটা প্রত্যক্ষ ফল।" এ সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে—প্রথমতঃ, মধুসূদনের নামই হউক বা অন্য কোন নামই হউক, নামমাত্র কখন ভবভয়হারী হইতে পারে না; দ্বিতীয়তঃ, বিপন্ন কৃষ্ণদেব মনে মনে মধুসূদন বলিয়াছিলেন, কি অন্য কোন নাম করিয়াছিলেন, তাহা বিহারী বাবু কেমন করিয়া জানিলেন? তৃতীয়তঃ, নামের ফল প্রত্যক্ষের বিষয় নহে। বিহারী বাবু নিজেই ত অন্য কারণের, এবং যথেষ্ট কারণের, নির্দ্দেশ করিয়াছেন—তিতুর লোকেরা জয়োল্লাসে উন্মত্ত হইয়া তাঁহাকে দেখিতে পায় নাই। তবে এই হিন্দুয়ানির অভিনয় কেন? এইরূপ অনেক আছে; কিন্তু দৃষ্টান্তবাহুল্যের আর স্থান নাই, প্রয়োজনও নাই। বিহারী বাবুর বুঝা উচিত যে, এইরূপ অযথা ধর্ম্মবিশ্বাসের অভিনয়ে ধর্ম্ম এবং সাহিত্য উভয়েরই মর্য্যাদার হানি হয়। বিহারী বাবুকে আমি আন্তরিক স্নেহ ও শ্রদ্ধা করি, সাহিত্যে তাঁহার প্রতিষ্ঠা নিষ্কলঙ্ক হয়, ইহা দেখিতে ইচ্ছা করি; সেই জন্যই তাঁহার ত্রুটিপ্রদর্শন করা কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ করিলাম।

শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়।

নবীন পান্থ।

অনিন্দ্য পেলব ক্ষুদ্র অবয়ব ;
অনিন্দ্যসুন্দর কোমল আস্ত ;
ক্ষুদ্র কণ্ঠে তোর কলকণ্ঠরব,
ক্ষুদ্র দন্তে তোর মোহন হাস্য ;
কচি বাহু দুটি প্রসারিয়া ছুটি
আসিস্‌ ঝাঁপিয়া আমার বক্ষে ;
ক্ষুদ্র মুষ্টি তোর ক্ষুদ্র করপুটে ;
দুষ্ট দৃষ্টি তোর উজ্জ্বল চক্ষে ,
ক্ষুদ্র দুটি ওই চরণবিক্ষেপে
কক্ষ হ'তে কক্ষান্তরে প্রলম্ফ ;
ধরিয়া আমার অঙ্গুলিটি চেপে
সোপান হইতে সোপানে ঝম্প।

আমি স্বপ্রকোষ্ঠে বসি একা, দূরে
করি শুষ্ক কার্য্য নিবিষ্টচিত্তে ;
তুই এসে সব দিস ভেঙ্গে চুরে
ও মনোমোহন মধুর নৃত্যে ;—
ফেলি উলটিয়া মসীপাত্র, সুখে
লেখনীটি ভাঙি, ধরিয়া দন্তে,
হাতে মসী মাখি', মসী মাখি' মুখে,
পাড়িয়া ছিঁড়িয়া কাগজ গ্রন্থে,
উলটি পালটি সাপটিয়া রোষে
ফেলিস্‌ ছুঁড়িয়া, তুই, নৃশংস!
নাদিরের মত, পরম সন্তোষে
চাহিয়া দেখিস্‌ স্বকৃত ধ্বংস!

ব্যস্ত হয়ে ডাকি জননীরে তোর,
"দেখ এসে, মোর স্বর্গের সূত্র
পুত্ররত্ন করে অত্যাচার ঘোর,
—নিয়ে যাও এসে তোমার পুত্র
তুই কিন্তু বসি' মেজের উপরে
নির্ভীক প্রশান্ত স্থির ঔদাস্যে
গান ধরে' দিস হর্ষে তারস্বরে,
মুগ্ধ করে' দিস চাহনি হাস্যে

উপহাস করি পিতা জন
বারণ তাড়ন করিয়া

কোথা হ'তে পেলি বল বৎস মোর,
মোর পরিবারে দখলী পাট্টা?
মায়ের সহিত নিত্য এই জোর,
বাপের সহিত নিয়ত ঠাট্টা?
ইঙ্গিতে করিস বিবিধ আদেশে
যেন আমি তোর অধীন ভৃত্য,
পরাভব দেখি খল খল হেসে
করতালি দিয়া করিস নৃত্য!
ও দুর্ব্বল দুটি সুকোমল করে
ভুবনবিজয়ী কার সাহায্যে?
উড়ে এসে জুড়ে বসি' বক্ষ'পরে
কেড়ে কুড়ে নিস প্রেমের রাজ্যে?

করি' দিবসের শুষ্ক কার্য্য, হায়
দাসত্বের ধূলি মুছিয়া অঙ্গে
ফিরি গৃহে বৎস! উৎসুক আশায়
করিব আলাপ তোমার সঙ্গে ;—
বর্ষায় চড়িয়া বক্ষোপরি ফিরে,
চাহিয়া শুনিবি জীমূতমন্দ্রে ;
বসন্তে গাহিবি মলয়সমীরে ;
শরতে হাসিয়া ডাকিবি চন্দ্রে ;
উচ্চারিবি ধীরে অমিয়সম্ভার
সম্বোধনে, মিষ্ট বচনখণ্ডে,
শুধু প্রশ্নে দিবি উত্তর কথার,
দিবি সিক্ত চুমা ভরিয়া গণ্ডে।

ভাঙিবি চূরিবি পাত্র দ্রব্য সব,
দংশিবি নাসিকা, মারিবি পৃষ্ঠে,
মনুর মস্তিষ্কে নিত্য অভিনব
প্রচুর অনিষ্ট করিবি সৃষ্টি।
আমি যদি যাই ধেয়ে পানে তোর,

হল দুটি সজল নেত্রে।
ভুলিয়া সব উপদ্রব
ই করি' আর কোন প্রতীক্ষা,
হ-পাদপদ্ম বক্ষে তুলে লব,
নে চুম্বনে মাগিব ভিক্ষা।

। বন্ধনে তুই বেঁধেছিস্ মোরে,
এড়াতে পারি না এ চিরদাস্যে;
কি ক্রন্দনে তুই সর্ব্বজয়ী, ওরে
ক্ষুদ্র বীর!—ওকি মোহন হাস্যে
করিস আলাপ; কি ভাষা অস্ফুট
শিখেছিস, ও কি মধুর ছন্দ;
চরণে কমল, হস্তে মুঠো মুঠো
কমল, আননে কমলগন্ধ,
নিত্যই নূতন, নিত্যই সুন্দর;—
সঙ্গীতময় ও চরণভঙ্গে
বেড়াস্ গৃহের চন্দ্র, প্রিয়বর
আপনার মনে আপন রঙ্গে!

দেখেছি সন্ধ্যার শান্ত হৈমকরে
রঞ্জিত মেঘের গরিমা দীপ্ত;
দেখেছি উষার নীল সরোবরে
অমল কমল শিশিরলিপ্ত;
নিদাঘে নির্ম্মেঘ প্রভাতের ছটা,
বসন্তের নব শ্যামল কান্তি;
বর্ষার বিদ্যুতে দীর্ণ ঘন-ঘটা;
শরতে চন্দ্রের স্বপনভ্রান্তি;—
এ বিশ্বে সৌন্দর্য্য যেই দিকে চাই
রাশি রাশি রাশি হয়েছে সৃষ্ট—
তেমন সৌন্দর্য্য কিন্তু দেখি নাই
শিশুর হাসিটি যেমন মিষ্ট!

আমরা পতিত বিশুষ্ক নিরাশ
অন্ধকারময় গভীর গর্ত্তে;
পরী-পদক্ষেপে তুই চলে' যাস্
কিরণময় ও শ্যামল মর্ত্ত্যে;
গান গেয়ে গেয়ে পাপিয়ার মত
নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে, নিরবরুদ্ধ
নীলাম্বরে, ঊর্দ্ধ হতে ঊর্দ্ধে, রত,
নিমগ্ন, বিমুগ্ধ, বিভোর, শুদ্ধ
আপন সঙ্গীতে। দেখিস কেবল
দিগন্ত বিতান সুনীল শান্ত,
স্নিগ্ধ সূর্য্যরশ্মি, উদ্ভাসি নির্ম্মল
গগন হইতে গগনপ্রান্ত!

আমরা পড়িয়া রহি পদতলে
মলিন, নিলীন ধূলায়, ত্যক্ত,
দ্বন্দ্বরত, মগ্ন মিথ্যাকোলাহলে,
ভীত, শীর্ণ, ব্যগ্র, বিষয়াসক্ত;
এইরূপে দিন চলে' যায় ধীরে,
ক্রমে ঘনাইয়া আসে সে রাত্রি,—
থমকি' দাঁড়ায় যে ঘন তিমিরে
সকল পথিক সকল যাত্রী।—
আমাদের লীলা সাঙ্গ হয়ে যায়,
এখন তুই রে মধুর কান্ত
প্রিয়তম, তুই নেচে নেচে আয়
জীবন-পথের নবীন পান্থ!

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

সাহজাহানের মৃত্যু।

সাহজাহানের সময়ে দিল্লী ও আগরার অবস্থা অতি উন্নত। কেবল দিল্লী ও আগরা নহে, আর্য্যাবর্ত্তের ও দাক্ষিণাত্যের অনেক স্থানে মোগলের বিজয়-বৈজয়ন্তী অব্যাহতভাবে উড্ডীয়মান। দেশীয় সামন্ত নরপতিগণ, দৃপ্ত রাজপুতগণ, মোগলরাজসংসারে কেহ সেনাপতিপদে নিযুক্ত, কেহ বা বৈবাহিক-

সম্বন্ধে দিল্লীর বাদশাহের অন্তরঙ্গ আত্মীয়রূপে পরিগণিত। রাজ
গণের মধ্যে যাঁহারা তখনও বলদৃপ্ত ছিলেন, তাঁহারা বিনা কা:
মোগলের সহিত বিবাদে অগ্রসর হইতেন না। আপনাদের ক্ষুদ্র রা
স্বাধীনতা, বংশাগত চিরপ্রচলিত রীতিনীতির সম্মানরক্ষা ও
আভ্যন্তরিক বলবৃদ্ধি, এই লইয়াই তাঁহারা সন্তুষ্ট থাকিতেন। সুতরাং ।
মধ্যে বাহ্যিক অশান্তি তখন অতি অল্পই ছিল। রাজকোষই রাজার প্রধা.
শক্তি। সাহজাহানের সময় রাজকোষের অবস্থা অতি উন্নত। আকবরের সময়ে রাজকোষ ক্রমাগত যুদ্ধবিগ্রহে শূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। আকবরের এক সময়ে এত দূর অর্থকৃচ্ছ্রতা উপস্থিত হইয়াছিল যে, নিতান্ত প্রয়োজনীয় স্থলে তিনি মুসলমান হইয়াও মস্‌জিদ প্রভৃতি ভাঙ্গিয়া তাহার পীরোত্তর বাজেয়াপ্ত করিয়াও অর্থসংগ্রহ করিয়াছিলেন। জীবনের শেষাবস্থায় আকবর সাহ শূন্য কোষ পূর্ণ করিয়া যান। সে পূর্ণতা তখনও কিন্তু কানায় কানায় ভরিয়া উঠে নাই। তার পর জাহাঙ্গীরের আমলে রাজকোষের বিশেষ পূর্ণতার লোপ না হইয়া বরং বৃদ্ধি হইয়াছিল।

সাহজাহানের রাজত্বে দেশে দুর্ভিক্ষ ছিল না, বিদ্রোহ অশান্তি ছিল না—ছিল কেবল প্রচুর রাজস্ব, আর প্রজার অখণ্ড সুখ। রাজকোষে সঞ্চিত হইয়াছিলও অনেক। অত বড় ময়ূরসিংহাসননির্ম্মাণের ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়াও রাজকোষের এক-দশমাংশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় নাই। অত শিল্পসৌন্দর্য্যময় তাজমহল, অত সুন্দর মতি ও জুমা মস্‌জিদ ও প্রকাণ্ড আমখাস্ দেওয়ান নির্ম্মাণের ব্যয়নির্ব্বাহ করিয়াও রাজকোষের পূর্ণতার হ্রাস হয় নাই।

আগরা দিল্লীর পথ তখন জনকোলাহলপূর্ণ। প্রকাণ্ড বিপণিসমূহ পণ্যপূর্ণ। রাজপথ সৈনিকের অস্ত্রঝঞ্ঝনায় নিয়ত প্রতিধ্বনিত। দুর্গপ্রাকারে মোগলের রক্তবর্ণ পতাকা সদম্ভে বায়ুভরে উড্ডীয়মান। আমীর ওমরাহগণের গগনস্পর্শী অট্টালিকাসমূহে নগরী পরিশোভিত। প্রহরে প্রহরে নহবত, প্রাতে সন্ধ্যায় রণবাদ্য, নাগরিকের গৃহে গৃহে আনন্দকোলাহল, রাজপথে বহুমূল্যবস্ত্রপরিহিত অশ্বারোহীর করে কৃপাণফলকের শোভা, ওমরাহবৃন্দের সদর্প পদবিক্ষেপ, এই সমস্ত দিল্লী ও আগরার ঐশ্বর্য্য জ্ঞাপন করিত।

পরিপূর্ণ রাজভাণ্ডার, শান্তিময় রাজ্য, প্রতিদ্বন্দ্বিবিহীন সিংহাসন, এই সমস্ত লইয়াও সাহজাহান আন্তরিক সুখী হইতে পারেন নাই। রাজকুমারদের জন্যই তাঁহার এই অশান্তি। চাঘটাই-বংশীয়েরা ইতিপূর্ব্বে বিনা শোণিতপাতে ও বিনা

বিগ্রহে কখনও সিংহাসনাধিরোহণ করেন নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় পুত্রেরা যে সিংহাসন লইয়া একটা ভয়ানক সংঘর্ষণ উপস্থিত করিবে, এবং সেই সংঘর্ষণফলে এই বিশাল মোগলরাজ্য যে বিধ্বস্ত হইয়া যাইতে পারে, এ সন্দেহও তিনি বর্জ্জন করিতে পারেন নাই। বাদশাহ কোন্ রাজকুমারকে অধিক স্নেহ করিতেন, তাহা বুঝিবার যো ছিল না। দারা সর্ব্বদা পিতার কাছে কাছে থাকিতেন; জ্যেষ্ঠ বলিয়াই তাঁহার এই অধিকার জন্মিয়াছিল। বাদশাহ যে তাঁহাকে আন্তরিক স্নেহ করিতেন না, তাহাও নহে। জ্যেষ্ঠ রাজ-কুমার দারা পিতার প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন বলিয়া, অন্যান্য শাজাদাগণ তাঁহার নামে জ্বলিয়া উঠিতেন।

দারার আপন ব্যবহারও বড় ভাল ছিল না। তাঁহার বেগমমহলে দুই এক জন ইউরোপীয় বেগম ছিলেন। দারা ইঁহাদের বিবাহ করেন নাই, কিন্তু দিবারাত্র ইঁহাদের সঙ্গে একত্র আহারবিহারাদিতে মত্ত থাকিতেন। এই সকল বেগম পূর্ব্বে খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিনী ছিলেন। দারার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিবার পর তাঁহারা কল্মা পড়িয়া অবশ্য মুসলমানী হন নাই। এই জন্য অন্যান্য শাহজাদারা দারাকে "নাস্তিক" "খৃষ্টান" বলিয়া উপেক্ষা করিতেন। বাহ্যিক উপেক্ষাটা সুলতান সুজাই একটু বেশী করিয়া দেখাইতেন,—মুরাদ এ সব হাঙ্গামে বড় একটা থাকিতেন না। শিকার, দুই চারি পেয়ালা মদিরা, গোটা-কতক তোষামোদ বাক্য—আর কতকগুলি "প্রেমপ্রিয়" হইলেই তাঁহার সমস্ত চিন্তা ডুবিয়া যাইত।

দারাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ঘৃণা করিতেন কুমার আরঙ্গজেব। শাজাদাগণের মধ্যে কুমার আরঙ্গজেবই বেশী ধর্ম্মের ভান করিতেন। দিবারাত্র কোরাণ-পাঠ, মৌলবীগণের সহবাস ইত্যাদিই তাঁহার প্রিয় বস্তু ছিল। রাজ্য ঐশ্বর্য্য কিছুর দিকেই তাঁহার দৃষ্টি ছিল না। আরঙ্গজেবকে এইরূপ বীতস্পৃহ দেখিয়া, অনেকে তাঁহাকে "স্থূলবুদ্ধি" বিবেচনা করিয়া, মনে মনে অত্যন্ত হৃষ্ট হইতেন, বাদশাহ সাহজাহান কিন্তু এ বিষয়ে অন্যরূপ বুঝিতেন।

সুজা মদগর্ব্বিত উচ্ছৃঙ্খলপ্রকৃতির লোক ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে সাহস ছিল। দৃঢ়হস্তে তরবারি ধরিয়া শত্রুসেনা নিপাত করিবার বাহুবল তাঁহার যথেষ্ট ছিল বটে, কিন্তু তদুপযুক্ত স্থিরবুদ্ধি ও ভবিষ্যৎদৃষ্টির বড় অভাব ছিল। এই দুটি শেষোক্ত গুণের অভাবেই তিনি ভবিষ্যতে সিদ্ধকাম হইতে পারেন নাই।

পিতার সঙ্গে সঙ্গে থাকিবার অবসর ঘটায়, দারার স্কন্ধে অনেক সময় রাজ্যের অনেক কাজকর্ম্ম পড়িত। সাহজাহানের মনের কথা জানিবার অবসরও তাঁহার অনেক সময় ঘটিত। তিনি অন্যান্য সহোদরদিগকে তাঁহার প্রতিদ্বন্দী ভাবিয়া তাঁহাদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। "ভ্রাতৃস্নেহ" কথাটি অনেক দিন হইতেই মোগলসম্রাটবংশের নিকট বিদায়গ্রহণ করিয়াছিল।

শাহজাদাগণের এই মনোমালিন্য পরিণামে যে অশুভ ফল প্রসব করিবে, তাঁহার অবর্ত্তমানে সিংহাসনের জন্য যে অনর্থক শোণিতপাত ও নরহত্যা হইবে, সম্রাট দিব্যচক্ষে তাহা দেখিতে পাইলেন। সেই ভবিষ্যৎ যুদ্ধবিগ্রহের পরিণাম-চিন্তায় বাদশাহ সময়ে সময়ে বড়ই চঞ্চল হইয়া উঠিতেন।

অনন্যোপায় হইয়া সাহজাহান পুত্রদিগকে রাজধানী হইতে দূরে রাখিবার সঙ্কল্প করিলেন। এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য তিনি কুমার শাহ সুজাকে বঙ্গদেশে, কুমার মুরাদকে গুজরাটে, এবং আরঙ্গজেবকে দাক্ষিণাত্যে প্রেরণ করিলেন। যাঁহার উপর তাঁহার যত বেশী অবিশ্বাস ছিল, যাঁহাদের তিনি অধিক ক্ষমতাবান বলিয়া বিবেচনা করিতেন, তাঁহাদিগকেই তিনি অধিকতর দূরবর্ত্তী স্থানে প্রেরণ করেন। কোন এক জন সমসাময়িক ঐতিহাসিক বাদশাহের মনোভাবের প্রতি লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন,—* "সাহজাহান তাঁহার পুত্রদিগকে দূরদেশে, কর্ত্তব্যব্যপদেশ প্রেরণ করিয়াছিলেন—এই ঘটনা হইতেই তাঁহার ভবিষ্যৎ রাজনীতির আভাষ গ্রহণ করা যাইতে পারে। বঙ্গদেশ তখন অস্বাস্থ্যকর স্থান, অতএব তিনি শাহসুজাকে বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা করিয়া পাঠাইয়া দেন। বাদশাহের মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত ব্যক্তির হস্তেই সিংহাসনের ভার পড়িবে। আরঙ্গজেবকেই তিনি সকলের অপেক্ষা উপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করিতেন, এই জন্যই সিংহাসন হইতে দূরে রাখিবার জন্য

* The Emperor's future policy was vindicated in his attempt to place Shah chujah at the Govt. of Bengal, a District far away from the capital and full of pestilential diseases. His Majesty was confident in the innermost recesses of his heart that the throne will fall into the grasp of the cleverest, so he placed Auranzebe in Deccan, investing him with full military powers of a commander of the Imperial Army. That he kept Dara Sheko always at his elbow, though the prince,was then contemptuously regarded as an 'infidel', conclusively proves that the Emperor had a predeliction for the eldest prince and had confidence in the ability and manliness of his grandson Suliman Sheko, Son of Dara.—Bernier's Letters.

তিনি কুমারকে দাক্ষিণাত্যে বাদশাহী সেনাদলের অধিনায়ক করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা দূর দেশে প্রেরণ করেন। দারাকে লোকে তখন "নাস্তিক" বলিয়া উপেক্ষা করিলেও, বাদশাহ তাঁহাকে নিজের সমীপবর্ত্তী করিয়া রাখেন। তাঁহার পৌত্র রাজকুমার সলিমান অতিশয় বুদ্ধিমান ও কার্য্যকুশল ছিলেন। বাদশাহ এই কুমারের শক্তির উপর যথেষ্ট বিশ্বাস করিতেন।

রাজকুমারগণকে দূরদেশে পাঠাইয়া সাহজাহান অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেন। পুত্রেরা তাঁহার নিকট হইতে সিংহাসন কাড়িয়া ই　এ ভয় কখনও তাঁহার চিত্তকে আন্দোলিত করে নাই। সে স্পর্দ্ধা ও সে ক্ষমতা কাহারও হইবে না, তাহা তিনি মনে বেশ জানিতেন। নানা অত্যাচারে তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া আসিতেছিল; ভীষণ রোগের পূর্ব্বলক্ষণসমূহ প্রকাশিত হইতেছিল; পাছে তাঁহার পীড়ার প্রবল অবস্থায় পুত্রেরা সিংহাসন লইয়া একটা অনর্থ ঘটায়, পীড়ার চিন্তা অপেক্ষা এই চিন্তাই তাঁহার হৃদয়ের নিভৃত স্থান অধিকার করিল।

সম্রাট ভয়ানক পীড়িত হইয়া পড়িলেন। পীড়াটা আর কিছুই নহে, কঠিন মূত্রকৃচ্ছ্র। বিলাসিতার অপব্যবহারে, দুষ্পাচ্য মশলা ও ঘৃতসংযুক্ত প্রচুর খাদ্যাদিগ্রহণে পীড়া ক্রমে ক্রমে সাংঘাতিক ও প্রবল হইল। দরবারে বসা ক্রমশঃ রহিত হইল। প্রকাশ্য দরবার বন্ধ করিয়া দিয়া নিতান্ত আবশ্যক কার্য্যগুলি কেবল "দেওয়ান খাসের" নিভৃত কক্ষে সম্পাদিত হইতে লাগিল। শেষে উপায়ান্তর না দেখিয়া বাদশাহ রাজকার্য্যের সহিত সমস্ত সংস্রব ত্যাগ করিয়া নিভৃত কক্ষের আশ্রয় লইলেন। *

রাজধানীর মধ্যে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। দিল্লীশ্বর পীড়িত, তাঁহার জীবন সংকটাপন্ন, আমীর ওমরাহেরা সর্ব্বদাই সন্ত্রস্ত; রাজপরিবারে একটা মহা উত্তেজনা। সকলেই উৎকণ্ঠিতচিত্তে বাদশাহের দৈনিক অবস্থা জানিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু প্রকৃত কথা জানিবার কোনও উপায় নাই।

এক দিন রাজাদেশ প্রচারিত হইল, বাদশাহ অনেকটা ভাল আছেন। মৌলানা ও মৌলবীদের উপর মস্‌জিদে প্রার্থনার আদেশ হইল। সাধারণ জনস্রোতে মস্‌জিদ্ ও প্রার্থনাগারসমূহ পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। গভীর নিশীথে

* The effects of long enjoyed luxury and continued dissipated habits, absence of abstemeousness in food and drink told heavily on the Emperor's health and the pains of stricture reappeared; which compelled him to keep himself within the walls of his private chambers, giving up all concern for public business. Manouchis Translation.

রাজপথে ধার্ম্মিক ও সাধুগণ ঈশ্বরের নাম সংকীর্ত্তন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কিসে বাদশাহ্ শীঘ্র আরোগ্য হন, তাহার জন্য রাজ্যের বড় বড় হকীমেরা ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

হকীমের ঔষধ খাটিল না! কোন ঔষধেই কোন উপকার হইতেছে না। পীড়ার যন্ত্রণা ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিতেছে। রাজকক্ষের মধ্যে কাহারও প্রবেশ করিবার আদেশ নাই। দ্বারে দ্বারে প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে প্রহরী রক্ষিত হইয়াছে। বাদশাহের গৃহের মধ্যে কেবল যুবরাজ দারা ও পৌত্র সলিমান যাইতে সক্ষম। শাহজাদী জাহানারা ও রশিনারা অনবরত পরিশ্রম করিয়া পিতার পরিচর্য্যা করিতেছেন।

বড় লোকের সম্বন্ধেই অধিক জনরব উঠে। সেখানকার সঠিক সংবাদ সহসা পাইবার উপায় নাই। এক দিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে জনরব উঠিল, সংসারের সকল যন্ত্রণার অবসানের সঙ্গে বাদশাহ ইহলোক হইতে অপসৃত হইয়াছেন।

কোথা হইতে এ জনরব নগরীতে প্রচারিত হইল, তাহা কেহই ধরিতে পারিল না। প্রজ্বলিত গৃহাগ্নি যেরূপ প্রখর বায়ুর সংযোগে গৃহ হইতে গৃহান্তরে পরিব্যাপ্ত হয়, জনরবও সেইরূপ প্রত্যেক প্রহরে প্রহরে ভীষণ ভাব ধারণ করিয়া সাধারণের নিকট উপস্থিত হইতে লাগিল। কেহ বলিল, যুবরাজ দারা বিষপ্রয়োগে বাদশাহকে মারিয়া ফেলিয়াছেন; কেহ বলিল, হকীমের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া অন্যান্য যুবরাজেরা বাদশাহের জীবন হরণ করিয়াছেন। এই সমস্ত জনরবের বাণী অস্ফুট ও অপরিব্যক্ত। সাহস করিয়া মুখ ফুটিয়া কেহ কিছু বলিতে পারে না; যাহা শুনে, নীরবে বিশ্বাস করিয়া যায়।

বাস্তবিকই বাদশাহ্ ইহলোকে নাই। তাহাই অন্ততঃ লোকের বিশ্বাস। কিন্তু প্রকাশ্য রাজপথে শবাধার না দেখিলে কেহ স্থিরবিশ্বাস করিতে পারিতেছে না। তিন দিন শবদেহ নানাবিধ সুগন্ধিতে পরিপূর্ণ করিয়া রাখিবার একটা প্রথা মোগল রাজসংসারে প্রচলিত ছিল; লোকে এই তিন দিন মহা-উৎকণ্ঠায় যাপন করিতে লাগিল।

বাদশাহের প্রকাণ্ড পুরীর মধ্যবর্ত্তী লোকে যাহা জানিল না, বন্দোবস্তের গুণে সেই সংবাদ বাঙ্গলায় সাহ সুজার নিকট ও দাক্ষিণাত্যে আরঙ্গজেবের শিবিরে পঁহুছিল। রাজসভায় কুমারদের প্রণিধি ছিল। রাজান্তঃপুরেও শাহাজাদীরা এক এক ভ্রাতার পক্ষ সমর্থন করিতেন। তাঁহাদের সহায়তায় সংবাদটা অতি শীঘ্র দৌলতাবাদে ও রাজমহলে পঁহুছিল।

দারা—বিশ্বাসঘাতক দারা, বিষপ্রয়োগে পিতার অপমৃত্যু ঘটাইয়াছে, সেই অমিততেজা লোকেশ্বর সাহজাহান সিংহাসনলোভী দারার নিষ্ঠুরতায় প্রাণ হারাইয়াছেন, এই সংবাদে সুজা অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন। দারার হস্ত হইতে রাজদণ্ড কাড়িয়া লইবার জন্য তিনি সসৈন্যে রাজধানীর দিকে অগ্রসর হইলেন। পিতৃশোক ভুলিয়া গিয়া সুজা সিংহাসনলোভে অবিশ্রান্তভাবে সসৈন্যে পথের পর পথ অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

এ দিকে দৌলতাবাদে মহা হুলস্থুল কাণ্ড। আরঙ্গজেব তখন যুদ্ধযাত্রায় উদ্যত; সসৈন্যে দৌলতাবাদের প্রান্তরে শিবিরসন্নিবেশ করিয়াছেন। মোগলের বিপুল স্কন্ধাবার সেই সুবিস্তীর্ণ প্রান্তরের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া আছে। সৈনিকের বলদৃপ্ত অস্ত্রঝঞ্ঝনা, অশ্বের হ্রেষারব, মাতঙ্গের ঘন ঘন বৃংহিতধ্বনি মৃদু পবনে শিবিরশীর্ষস্থ মোগল রাজপতাকা-সমূহের ঘনসঞ্চালন সেই নির্জ্জন প্রান্তরকে ক্ষুদ্র নগরে পরিণত করিয়াছিল।

প্রণিধি আসিয়া দিল্লীর সংবাদ দিবামাত্রই আরঙ্গজেব এক নূতন খেলা খেলিলেন। পিতার মৃত্যুসংবাদে তিনি শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়িলেন। সকলের সহিত দেখাসাক্ষাৎ বন্ধ করিয়া দিলেন। সমস্ত মোগল স্কন্ধাবার কৃষ্ণবর্ণ পতাকায় মণ্ডিত হইল। মোগল সৈনিকেরা কুমারের আদেশে কৃষ্ণপরিচ্ছদ পরিধান করিল। প্রত্যেক শিবিরের চিহ্নবিজ্ঞাপক ঘোরলোহিত আলোক-মালার পরিবর্ত্তে নীল আলোক পটমণ্ডপসমূহের শীর্ষদেশ অধিকার করিল। প্রহরে প্রহরে নহবৎ বন্ধ হইল। কেবল নহবৎ আদি যন্ত্রের শোকময় সঙ্গীতের উচ্ছ্বাসে সেই নিস্তব্ধ প্রান্তর ক্ষণে ক্ষণে বিকম্পিত হইতে লাগিল।

আরঙ্গজেব কাহারও সহিত দেখা করেন না। নিতান্ত বিশ্বস্ত অনুচর ব্যতীত আর কেহ তাঁহার সাক্ষাৎ পায় না। প্রধান সেনাপতি গজপতি সিংহ ও দিলবার খাঁ কুমারের নিকট হইতে এরূপ আদেশ পাইলেন যে, দ্বিতীয় আজ্ঞা ব্যতীত যেন তাঁহারা শাহজাদার কাছে না আসেন।

এক দিন গভীর নিশীথে দিল্লী হইতে বিশ্বস্ত দূতের মুখে নূতন সংবাদ পাইয়া আরঙ্গজেব সেনাপতি গজপতি সিংহকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। গজপতি সিংহকে ডাকিবার উদ্দেশ্য এই, সাহজাহান নিজে এই বিশ্বাসী অনুরক্ত রাজপুতকে কুমারের অধীনে সেনানায়কত্বে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। আরঙ্গজেব মনে মনে বুঝিয়াছিলেন, তাঁহার গতিবিধি মতিগতি গোপনে পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্যই বাদশাহ তাঁহার বিশ্বাসী অনুচর গজপতিকে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে রাখিয়া দিয়াছেন।

গজপতি সিংহ কুমারের আহ্বানের মর্ম্ম পূর্ব্ব হইতেই অনুভব করিয়া লইয়াছিলেন। তিনি শিবিরে প্রবেশমাত্রই দেখিতে পাইলেন, আরঙ্গজেব পট-মণ্ডপের নিভৃত কক্ষে উত্তেজিতভাবে পাদচারণ করিতেছেন। রাজপুতকে দেখিয়া রাজকুমার বিষণ্ণমুখে অভিবাদন করিলেন। তাঁহার নেত্রযুগল অশ্রু-পরিপূর্ণ হইল। চক্ষুঃপ্রবাহিত এই অশ্রুধারা কপটদুঃখসম্ভূত হইলেও, উদারহৃদয় রাজপুত, কুমারের এই শোকচিহ্নে অতিশয় ব্যথিত হইলেন। আরঙ্গজেব বলিলেন, "দেখুন! আপনাকে একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় পরামর্শের জন্য ডাকি-তেছি। পিতা বাদশাহ ত ইহলোকে নাই; আজ দিল্লী হইতে সংবাদ পাইয়াছি, হতভাগ্য বিশ্বাসঘাতক দারা বিষপ্রয়োগে পিতাকে বিনষ্ট করিয়াছে। এই ঘৃণিত কার্য্য করিবার পরও দারা যে বিনা বিবাদে সিংহাসনে বসিবে, তাহা আমি সহ্য করিতে পারিব না। আমি সিংহাসনের প্রার্থী নহি। অপর কোন উপযুক্ত রাজকুমারকে সাহায্য করাই আমার উদ্দেশ্য। এরূপ স্থলে আপনি আমার সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন কি না?"

গজপতি সিংহ রাজপুত-তেজোদৃপ্ত নিমকের চাকর। তাঁহার মনের বিশ্বাস, সাহজাহান মরেন নাই। আরঙ্গজেবকে তিনি উত্তমরূপে জানিতেন। সুতরাং প্রকাশ্যে বলিলেন, "শাহজাদা! ঈশ্বর করুন, বাদশাহ দীর্ঘজীবী হউন। আমার বিশ্বাস, তিনি কঠিন পীড়ায় শয্যাগত, এখনও ইহলোক ত্যাগ করেন নাই। দিল্লী হইতে আমিও যে সংবাদ পাইয়াছি, তাহাতে বাদশাহের পীড়ার সংবাদই পাইয়াছি, মৃত্যুসংবাদ পাই নাই। তিনি জীবিত থাকিতে আপনার রাজধানীতে গমন করা যুক্তিসঙ্গত নহে। এরূপ করিলে আপনি রাজদ্রোহী হইবেন— রাজদ্রোহীকে সাহায্য করিতে এ রাজপুত কখনই প্রস্তুত নহে। যদি দুর্ভাগ্য-ক্রমে সেই অতুলশক্তিসম্পন্ন সম্রাট সত্যই ইহলোক ত্যাগ করিয়া থাকেন, তাহা হইলেও সিংহাসনে আপনার অধিকার কি?"

আরঙ্গজেব এই কর্ত্তব্যপরায়ণ রাজপুতের প্রকৃতি জানিতেন। যখন দেখি-লেন যে, সেনাপতি তাঁহাকে কোনরূপেই সাহায্য করিতে প্রস্তুত নহেন— তখন গম্ভীরস্বরে আদেশ করিলেন, "সেনাপতি! দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ আপনি আমার সাহায্যার্থ অগ্রসর হইলেন না। এখন আপনি আমার শত্রু, আপনাকে স্বাধীনতা দেওয়া আমি যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করি না। এই মুহূর্ত্ত হইতে আপনি আমার বন্দী।"

ক্রোধে, লজ্জায়, ঘৃণায়, গজপতি সিংহের মুখমণ্ডল আরক্তিমভাব ধারণ

করিল। তিনি মোগল বাদশাহের সরকারে সৈনাপত্য কার্য্যে চুল পাকাইয়াছেন। মোগলের কার্য্যে শরীরপাত করিয়া স্বজাতির বিরুদ্ধেও অস্ত্রচালন করিয়াছেন। সাহজাহান তাঁহাকে সম্মান করেন বলিয়াই কুমারের অভিভাবকরূপে তাঁহাকে দাক্ষিণাত্যে পাঠাইয়াছেন। আরঙ্গজেবের কৃত এ অপমান তিনি সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি গভীর চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন, সুতরাং সম্মুখে দৃষ্টিক্ষেপ করেন নাই। সহসা মুখ তুলিয়া দেখিলেন যে, কুমার সেখান হইতে চলিয়া গিয়াছেন।

তাঁহার অশ্ব সজ্জিত ছিল। রাজপুত আজ্ঞার অপেক্ষা না করিয়াই তাহাতে আরোহণ করিলেন। কেহ কোন বাধা দিল না। ত্বরিতপদে শিবিরের বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, চারি দিকে মোগলসেনা। সেনাপতি এইবার প্রকৃত ঘটনা বুঝিলেন। উত্তেজিত অশ্বকে প্রচণ্ড কশাঘাত করিয়া তিনি এক অংশের মোগল সেনা ভেদ করিলেন – অশ্ব দ্রুতবেগে তাঁহাকে এক প্রান্তরে আনিয়া উপনীত করিল। এই প্রান্তরেও অসংখ্য লোক সমবেত হইয়াছে। তাহারা তাঁহাকে দেখিবামাত্র "সেনাপতির জয়" শব্দ উচ্চারণ করিল। মুহূর্ত্তমধ্যে সেনাপতি চিনিলেন,—তাঁহার নিজ-অধীনস্থ রাজপুত সেনারা তাঁহার বিপদের কথা শুনিয়া সাহায্যার্থ অগ্রসর হইয়াছে। সৈন্যবৃন্দ সহ তিনি প্রান্তর অতিক্রম করিতে লাগিলেন; পশ্চাৎ পশ্চাৎ মোগল সৈন্য অনুধাবন করিতে লাগিল।

কিন্তু শেষে এক ভয়ানক সংকটাপন্ন অবস্থায় উপস্থিত হইয়া সেনাপতির গতিরোধ হইল। সম্মুখে তরঙ্গায়িত নদী। নদী পার না হইলে আর অগ্রসর হইবার উপায় নাই। পশ্চাতে ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের ন্যায় অসংখ্য মোগল সেনা আসিতেছে। অগ্র ও পশ্চাৎ উভয় দিকেই মৃত্যু,—কিন্তু নদী পার হইতে না পারিলে গত্যন্তর নাই। সেনাপতি মুহূর্ত্তমধ্যে সমস্ত অবস্থা তাঁহার সেনাগণকে বুঝাইয়া দিলেন। সমগ্র রাজপুত সৈন্য নদীতে নামিল, এবং অনায়াসে নদী পার হইয়া গেল। সেই প্রবল তরঙ্গও রাজপুতের প্রবল শক্তি ও অদম্য উদ্যমে বাধা দিতে পারিল না। পশ্চাৎ হইতে মোগল সেনা রাজপুতের এই অসীম ক্ষমতা ও অদ্ভুত কীর্ত্তি পর্য্যবেক্ষণ করিল।

রাজপুত সেনানীর সহায়তায় বর্জ্জিত হইয়া আরঙ্গজেব গুজরাটের দিকে সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন। মুরাদ তখন গুজরাটে। মুরাদকে হস্তগত করিতে পারিলে সহজেই উদ্দেশ্যসিদ্ধি হইবে, তার পর মুরাদকে পদাঘাতে সিংহাসন হইতে ফেলিয়া দিলেই চলিবে, এই চিন্তায় উদ্ভ্রান্ত হইয়া আরঙ্গজেব মুরাদকে

বিদ্রোহে উত্তেজিত করিবার জন্য গুজরাটে উপস্থিত হইলেন। এ দিকে দিল্লীতে ঈশ্বরের কৃপাবশে ঘটনাস্রোত ভিন্ন দিকে ফিরিয়া গেল। সুদক্ষ চিকিৎসকের নৈপুণ্যে বাদশাহ সাহজাহান আরোগ্য লাভ করিলেন। ক্রমশঃ বলসঞ্চয় করিয়া সর্ব্বপ্রথমে ঝরোকায় আসিয়া প্রজাবৃন্দকে দর্শন দিলেন। "বাদশাহ দীর্ঘজীবী হউন", "আল্লা সেলামত রহে" বলিয়া প্রজাবৃন্দ বাদশাহকে সানন্দে অভিবাদন করিল।

সাহজাহান পুত্রদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্যই নিজের মৃত্যু রটনা করিবার আদেশ দিয়াছিলেন। পরীক্ষা সফল হইল। তিনি সংবাদ পাইলেন, সাহসুজা বাঙ্গালা ছাড়িয়া দ্রুতপদে সসৈন্যে রাজধানীর অভিমুখে অগ্রসর। আরঙ্গজেবও দৌলতাবাদ ছাড়িয়া গুজরাটে আসিয়া জুটিয়াছেন। তিনি স্বহস্তে নিম্নলিখিত পত্রখানি কুমারদের নিকট যথাস্থানে প্রেরণ করিলেন।—

"বৎস! জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ দিই, আমি এ যাত্রা রক্ষা পাইয়াছি; তোমরা যে পিতৃবৎসল, তাহা তোমাদের কার্য্যেই পরিচয় পাইলাম। আমাকে দেখিবার জন্য তোমাদের কষ্ট স্বীকার করিয়া রাজধানীতে আসিবার প্রয়োজন নাই। তোমরা স্ব স্ব শাসনকেন্দ্রস্থানে প্রতিগমন কর। দুষ্ট লোকে চক্রান্ত করিয়া আমার মৃত্যু কথা রটাইয়াছিল। তোমাদের বিশ্বাস হইবে না বলিয়াই আমি স্বহস্তে পত্র লিখিলাম।—সাহজাহান।"

পত্র পাইয়া সুজা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন। বুঝিলেন, এও দারার চক্রান্ত। তিনি বাঙ্গালায় সহসা ফিরিলেন না। আরঙ্গজেবও গুজরাটে মহাসমস্যায় পড়িলেন। ইহার পরের ঘটনা বারান্তরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

বলা বাহুল্য, সাহজাহানের মৃত্যু-রটনা প্রকৃত নহে। এই সামান্য ঘটনা উপলক্ষ করিয়া বাদশাহ স্বীয় পুত্রদের পিতৃস্নেহের পরিমাণ বুঝিয়া লইলেন।

শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।

সহযোগী সাহিত্য।

জীবনচরিত।

ডাক্তার লিট্‌নার।

অল্প দিন হইল, সুপ্রসিদ্ধ ভাষাবিদ্ ডাক্তার লিট্‌নারের মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার মত ভাষাবিদ্ সচরাচর দেখা যায় না। ডাক্তার লিট্‌নার পঁচিশটি ভাষায় লিখিতে পড়িতে এবং অনর্গল কথা

কহিতে পারিতেন। কার্ডিনাল মেজোফ্যান্টি পঞ্চাশটি ভাষায় কথা কহিতে পারিতেন, কিন্তু ল্যাটীন, ইটালীয়ান, ও আরবী ভাষা ছাড়া অন্য ভাষায় ডাক্তার লিট্নারের মত তাঁহার পাণ্ডিত্য ছিল না। ডাক্তার লিটনারের জীবনে উল্লেখযোগ্য বিশেষ ঘটনা বড় নাই; তবুও তাঁহার মত পণ্ডিত লোকের জীবনী আমাদের সকলেরই নিকট আদরণীয়। বিশেষতঃ তিনি ভারতবাসীর সহিত বিশেষরূপে পরিচিত ছিলেন। তিনি জীবনের কয়েক বৎসরকাল ভারতবাসীর শিক্ষাকার্য্যে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। পঞ্জাব প্রদেশ সে সময় তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র ছিল।

অসাধারণ ভাষাজ্ঞান।

গটলিয়েব উইলিয়াম লিট্নার এম্. এ. পি. এচ্. ডি. ১৮৩০সালের ১৪ই অক্টোবর তারিখে হঙ্গেরির রাজধানী পেস্ত নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতামাতা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধিবাসী বলিয়া আপনাদিগকে পরিচিত করিতেন; সুতরাং এই হিসাবে ডাক্তার লিট্নার ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধিবাসী। যে সময় ডাক্তার লিটনার জন্মগ্রহণ করেন, সে সময় ইংলণ্ডে তাঁহার অনেকগুলি আত্মীয় স্বজন বাস করিতেন। কনষ্টাণ্টিনোপল, ব্রুসা, মাল্টা ও লণ্ডনে কিংস্ কলেজ, এই কয় স্থানে তিনি প্রথমে শিক্ষালাভ করেন। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে রুসীয় যুদ্ধে তিনি ইংরাজ কমিশেরিয়েট বিভাগে প্রথম শ্রেণীর অনুবাদকের পদে নিযুক্ত হইয়া গমন করেন। ইহার পর ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে তিনি লণ্ডন কিংস্ কলেজে আরবী, টার্কিস ও প্রচলিত গ্রীকভাষার শিক্ষকের পদ প্রাপ্ত হন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে তিনি উক্ত কলেজে মুসলমান আইন ও আরবী অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। এই সময়ে তিনি এই কলেজে একটি প্রাচ্য বিভাগ স্থাপিত করেন। ১৮৬২ সালে ফ্রিবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে এম. এ. ও পি. এচ্. ডি. উপাধি প্রদান করেন।

শিক্ষা ও কার্য্য।

শিক্ষক।

বাল্যকাল হইতেই তিনি রচনাকার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। তিনি রুসীয় যুদ্ধে যাইবার পূর্ব্বে ল্যাগোডি কমোর একখানি উপন্যাস ইটালীয় ভাষায় অনূদিত করেন, এবং টার্কি ভাষায় কবিতা রচনা করিতে আরম্ভ করেন; জর্ম্মান্ ভাষায় একখানি নাটক রচনাও করেন। অধিকন্তু তিনি ইংরাজী ভাষায় বক্তৃতা রচনা করিতে আরম্ভ করেন। অষ্টাদশ বৎসর বয়সের সময় তিনি ওইসিন সম্বন্ধে "লিটারারি রিভিউ" পত্রে একটি প্রবন্ধ লেখেন। উনবিংশ বৎসর বয়সে তিনি "ব্রিটিশ রেকর্ড" আফিস হইতে প্রকাশিত ১৪০৪ খৃষ্টাব্দে স্পানিস ভাষায় লিখিত কাগজপত্র পড়িতে সক্ষম হইয়াছিলেন। স্পানিস ঐতিহাসিক সভা এই সকল কাগজপত্র উদ্ধার করিতে না পারিয়া এই চেষ্টা হইতে বিরত হইয়াছিলেন। হিংস্টন সিরিজের জন্য তিনি হস্তলিখিত পর্টুগিজ পুঁথির অনুবাদ করেন, এবং বিশ বৎসর বয়সে তুরস্ক ভাষা এবং জাতি সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহা ভিন্ন তিনি জিপ্সী এবং রুসীয় যুদ্ধ সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ রচনা করেন। একুশ বৎসর বয়সের সময় তিনি "পবলিক্ ওপিনিয়ন" নামক সংবাদপত্রের বিদেশীয় সম্পাদক, এবং কিংস্ কলেজের অধ্যাপক এবং ডিন নিযুক্ত হন; এই সময়ে তাঁহার ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে অনেকে ভারতীয় সিবিল সার্ব্বিস্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, এবং তাঁহার উপদেশানুসারে অনেকেই প্রাচ্য ভাষায় পুস্তক রচনা করেন। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে তিনি গেটের জাতির (জর্ম্মান্) পক্ষ হইয়া সেক্সপিয়ারের জাতি ইংরাজকে সেক্সপিয়ারের জন্মের তিন শত বৎসর পূর্ণ হওয়ায় আনন্দ জ্ঞাপন করিয়া একখানি অভিনন্দনপত্র প্রদান করেন। এই কার্য্য দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করিয়াছিলেন বলিয়া, তিনি বিশেষরূপে প্রশংসিত হন।

রচনা।

নানা কার্য্য।

এই বৎসর নভেম্বর মাসে তিনি লাহোর কলেজের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হইয়া ভারতে

আগমন করেন, এবং উর্দ্দু ভাষায় শিক্ষাসম্বন্ধে একটি ওজস্বিনী বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতার ফলে পঞ্জাব ইউনিভার্সিটী কলেজ, ওরিয়েণ্টাল কলেজ প্রভৃতি অনেকগুলি বিদ্যালয় ও সাহিত্যিক সমিতি স্থাপিত হয়। তিনি ইংরাজী, আরবী ও উর্দ্দু ভাষায় ছয়খানি মাসিকপত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে তিনি দার্দ্দিস্থানের জাতি ও ভাষা সম্বন্ধে অনেক তথ্যের আবিষ্কার করেন; তাঁহার অনুসন্ধানপ্রসূত প্রবন্ধ সকলে কাবুল, কাশ্মীর, ও বাদাক্সানে প্রচলিত ভাষা সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। * ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে ভিয়েনা ইউনিভার্সেল প্রদর্শনীতে তিনিই ইংলণ্ডের পক্ষ হইতে উপস্থিত ছিলেন।

ভারতে আগমন।

ঐ প্রদর্শনীতে নানাদেশের পণ্ডিতমণ্ডলী উপস্থিত ছিলেন, অনেক রাজকর্ম্মচারীও ছিলেন। কিন্তু ডাক্তার লিট্‌নারই শিক্ষাবিস্তারের জন্য প্রদত্ত সম্মানসূচক প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। প্রথমে তিনিই প্রথম ইয়ারকন্দি, প্রথম সিয়াপোসকালির ও মধ্য এসিয়ার পুরাকালের দর্শনীয় চিহ্নগুলি ইউরোপে আনয়ন করেন। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে তিনি গ্রীক ও বৌদ্ধদিগের সংঘর্ষসময়ের অনেকগুলি বৌদ্ধ প্রতিমূর্ত্তি মৃত্তিকাগর্ভ হইতে বাহির করেন। এই সকল অবলম্বন করিয়া তিনি বীরবর আলেক্‌জান্দারের সময়ের গ্রীসের সহিত বৌদ্ধধর্ম্মের ও বৌদ্ধশিল্পের সম্বন্ধের আবিষ্কার করেন। ডাক্তার লিট্‌নারই, মহারাণীর "কৈসরী হিন্দ" উপাধির সৃষ্টিকর্ত্তা, এবং ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে মহারাণী ভারতসম্রাজ্ঞী উপাধি লইবার অনেক পূর্ব্বে তিনি এই উপাধির সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তিনি সোয়াত প্রদেশে ভূগর্ভ খনন করিয়া অনেকগুলি বৌদ্ধ গ্রীকপ্রতিমূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং ইহার দ্বারা তিনি প্রমাণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন যে, এক সময়ে গ্রীক শিল্প এই প্রদেশে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তাঁহার সংগৃহীত পুরাকালের অনেক চিহ্ন ইণ্ডিয়া মিউজিয়মে আছে। ডাক্তার লিট্‌নার লাহোর গবর্মেণ্ট কলেজ ও লাহোর ওরিয়েণ্টাল কলেজের অধ্যক্ষ, এবং পঞ্জাব ইউনিভার্সিটীর রেজিষ্ট্রার ছিলেন। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে রাজনৈতিক, সামাজিক এবং শিক্ষাসংক্রান্ত সংস্কারের জন্য তিনি "আঞ্জুমানি পাঞ্জাব" নামক সমিতির প্রতিষ্ঠা করেন। তিনিই এই সভার সভাপতি ছিলেন। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে ফ্লোরেন্সে প্রাচ্য ভাষাবিদ্‌দিগের যে সভা হয়, তিনি তাহাতে উপস্থিত ছিলেন। তিনি নানা ভাষায় নানাবিষয়ক বহু পুস্তক রচনা করেন।

পুরাতত্ত্ব।

এরূপ যশস্বী ও সম্মানভাজন ভাষাবিদের নিকট আমরা ভাষাশিক্ষাসম্বন্ধে উপদেশ লাভ করিতে পারি। ইঁহার মতে, কোন শিশুকে নানা ভাষাবিদ্ করিতে হইলে, প্রথমে কেবলমাত্র মাতৃভাষা শিক্ষা দিলে চলিবে না। অন্ততঃ দুইটি বিসদৃশ ভাষা এক সঙ্গে শিক্ষা করাইতে হইবে। বিদেশীয় ভাষা শিক্ষা করিতে হইলে বিদেশীয় রীতি, নীতি ও চিন্তা ভালরূপ লক্ষ্য করা ও সেই সকলের সহিত সহানুভূতিও থাকা চাই। তাহার পরে স্মরণশক্তি ও তর্কশক্তি দ্বারা সেই ভাষা নিজস্ব করিয়া লওয়া যাইতে পারে। সেণ্টপিটার্সবর্গ, ভিয়েনা ও কনষ্টাণ্টিনোপল প্রভৃতি যে সকল স্থানে একাধিক ভাষা প্রচলিত, সেই সকল স্থানেই দেখা যায়, শিশুরা কেবল শুনিয়া একাধিক ভাষা আয়ত্ত করিয়া লয়। ডাক্তারের মতে, ভাষাশিক্ষার ক্ষমতা সকলেরই আছে, এবং অতি অল্প আয়াসে কেবলমাত্র মনোযোগ ও অল্প শিক্ষার দ্বারা দুই তিনটি ভাষা আয়ত্ত করা যাইতে পারে।

তাঁহার মত।

ডাক্তার লিট্‌নার পুরাকালের অনেক চিহ্ন সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন। তাহার অনেকগুলি "ওকিং ওরিয়েণ্টাল ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে" রক্ষিত আছে। তাঁহার আশা ছিল। পুরা-

* ১৩০১ সালের কার্ত্তিক মাসের "সাহিত্য" দ্রষ্টব্য।

কালের অনেকগুলি চিহ্নের সাহায্যে তিনি পুরাকালের অনেক কাহিনী জগতের সমক্ষে উদ্ভাসিত করিবেন। কিন্তু তাঁহার সে আশা পূর্ণ হয় নাই। য়ুরোপে ভাষাবিদ্ উৎসাহী পণ্ডিতের অভাব নাই; কালে যে তাঁহার সংগৃহীত চিহ্ন হইতে বহু নূতন তত্ত্ব প্রচারিত হইবে, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই।

শেষ কথা।

ডাক্তার লিট্নারের নিকট ভারতবাসী ঋণী। তিনি ভারতবাসীর শিক্ষাবিস্তারবিষয়ে যেরূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন, কোনও ভারতবাসী সেরূপ করিয়াছেন কি না সন্দেহ। এতদ্ভিন্ন তিনি ভারত সম্বন্ধে অনেক পুরাতন তত্ত্বের প্রচার করিয়াছেন; সেই সকল তত্ত্ব প্রকাশিত হওয়ায় ভারত সম্বন্ধে বিদেশীয়দিগের অনেক কুসংস্কার দূরীভূত হইয়াছে। লিট্নারের জীবনে আমাদের শিক্ষণীয় বিষয় অনেক আছে। আমরা জ্ঞানার্জ্জনের জন্য শিক্ষা করি না। লিট্-নারের জীবন আলোচনা করিলে আমরা বুঝিতে পারি যে, যখন আমরা কেবলমাত্র অর্থো-পার্জ্জনের জন্য শিক্ষা না করিয়া জ্ঞানোপার্জ্জনের জন্য শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিব, তখনই আমাদের জাতীয় উন্নতির সূত্রপাত হইবে।

ভ্রমণবৃত্তান্ত।

তিব্বত।

রোমের ইতিহাসপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, তদ্দেশীয় আহত সৈনিকগণ সাধারণের সহানু-ভূতিলাভের আশায় "ফোরমে" স্ব স্ব "অস্ত্রলেখা" সকল দেখাইত। আধুনিক কালে তিব্বত-ভ্রমণকারী মিষ্টার হেনরী সাভেজ লাণ্ডর, ইংরাজ পাঠকসাধারণের নিকট তদ্রূপ স্বীয় তিব্বতীয় যাতনার বিবরণ স্থাপন করিয়াছেন। সুললিত বর্ণনা, প্রাঞ্জল রচনা ও সুন্দর চিত্রের সাহায্যে সে কাহিনী বিশেষ প্রস্ফুট ও চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। আমরা তাহা হইতে কয়েকটি কথা সংগ্রহ করিয়া দিলাম।

কুমায়ুন-নিবাসী "রাওট" অথবা "রাজিস"দিগের গ্রামে তজ্জাতীয় এক জন বৃদ্ধের সহিত লেখকের সাক্ষাৎ হয়। ভ্রমণকারীর পথপ্রদর্শকের সহিত কথোপকথনকালে সে বলিয়াছিল, "কোন শ্বেত মনুষ্য কখনও আমাদের গৃহে পদার্পণ করে নাই, কখনও করিতে পারিবেও না। পর্ব্বতবাসী দেবযোনিগণ তাহাদের আগমনে বাধা দিবেন। আগন্তুকদিগকে অনেক যাতনা সহ্য করিতে হইবে।" ভ্রমণকারী তাহার হস্তে একটি টাকা প্রদান করিলে সে কিছু চিন্তা করিয়া মৃদুস্বরে কহিল, "আপনি যাইতেছেন। কিন্তু আপনাকে পরে অনুতাপ করিতে হইবে। আপনার ভাগ্যে অনেক কষ্ট আছে।" তিনি তখন এ কথায় কর্ণপাত করেন নাই; কিন্তু পরে এই সকল বিষয় তাঁহার মনে পড়িয়াছিল।

ভবিষ্যৎবাণী।

মিষ্টার লাণ্ডর ভারতীয় এংলো-ইণ্ডিয়ানদিগকে বড় স্নেহের চক্ষে দেখেন না। ভারত-বাসীদিগের প্রতি তাহাদিগের ব্যবহার দেখিয়া তিনি বড় বিস্মিত ও ব্যথিত হইয়াছিলেন। এক এংলো-ইণ্ডিয়ানের শিবিরের নিকটে তিনি ভ্রমণকারীর উপযোগী অত্যল্প-উচ্চতা-বিশিষ্ট স্বীয় পার্ব্বত্য পটবাস স্থাপিত করেন। কিন্তু ইহাতে অবস্থান করা এংলো-ইণ্ডিয়ান কর্ম্মচারীর পক্ষে অপমানজনক। তাঁহারা শিবিরের সংখ্যা ও সাজসজ্জাদি দেখিয়া তদধিকারীর পদমর্য্যাদার নিরূপণ করেন। তাঁহাদের সান্নিধ্যে ভ্রমণকারীর এই শিবির-সংস্থাপনে তাঁহারা যে প্রীত হন নাই, এ কথা বলা বাহুল্য! পরে তথা হইতে স্থানা-ন্তরে গমন করিতে অনুজ্ঞাত হইয়া তিনি জনৈক সম্ভ্রান্ত ভারতীয়ের প্রদত্ত গৃহে বাস করেন।

ঔদ্ধত্য।

দ্রব্যাদিবহনের জন্য কুলি সংগ্রহ করিতে তাঁহাকে অনেক কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। বৃটিশ-রাজের অধিকারস্থ "শোকা" জাতি তিব্বতীয়গণের অনেক অত্যাচার সহ্য করে। নামতঃ তাহারা ইংরাজের প্রজা, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিব্বতীয়গণ তাহাদের রাজা। ইংরাজ-রাজ তাহাদিগের উপদ্রব হইতে শোকাগণকে রক্ষা করিবার কোন উপায় বিধান করেন না। শোকাগণের বিবাহপ্রথায় কোন প্রকার আচার-আড়ম্বর নাই।

শোকা জাতি।

বিবাহের পূর্ব্বে যুবকযুবতীগণের পরস্পরের পরিচয়ের জন্য প্রত্যেক গ্রামে একটি করিয়া সাক্ষাৎ-স্থান আছে। সে গুলি "রামবাং" নামে পরিচিত। এগুলি কোন গ্রামের মধ্যস্থানে, অথবা দুই গ্রামের মধ্যবর্ত্তী কোন স্থানে অবস্থিত। গ্রামের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ এইগুলির পৃষ্ঠপোষক। ভ্রমণকারী অনেক বার 'রাম বাং' পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। তাহাদের সাধারণ বর্ণনা এইরূপ ;—একখানি প্রশস্ত গৃহ ও তাহার মধ্যস্থলে একটি অগ্নিকুণ্ড। যুবকেরা স্ব স্ব প্রণয়িণী সমভিব্যাহারে তাহার নিকটে বসিয়া গল্প করে, অথবা সুতা কাটে। তথায় তাহাদিগের ব্যবহারে আপত্তিজনক কিছুই দেখা যায় না। রজনীর অধিকাংশ সময় এইরূপে অতিবাহিত হয়। ক্রমে নিশাশেষে তাহারা কিছু বেশী "সেন্টিমেণ্টাল" হইয়া পড়ে, এবং যন্ত্রের সাহায্য বিনা গান গাহিতে আরম্ভ করে। তাহাদের সমবেত স্বরলহরীর উত্থান ও পতন বড় মধুর, বড় শ্রুতিসুখকর। গৃহপ্রাচীরসংলগ্ন কয়েকটি কাষ্ঠের মশাল ও গৃহমধ্যবর্ত্তী নির্ব্বাপিতপ্রায় অগ্নিকুণ্ডের ক্ষীণ আলোকে গৃহমধ্যস্থিত অন্ধকার কিয়ৎপরিমাণে দূরীভূত হয়। পরে ক্রমে উষাসমাগমে তাহারা ক্লান্ত হইয়া পড়ে, এবং তখন বেশপরিবর্ত্তন না করিয়াই স্ব স্ব প্রণয়ী অথবা প্রণয়িণী সমভিব্যাহারে শষ্পশয্যায় নিদ্রাসুখ লাভ করে।

ভ্রমণব্যপদেশে মিষ্টার লাণ্ডর যতই উচ্চতর স্থানে আরোহণ করিতে লাগিলেন, তাঁহার পরিচারকবর্গের দুর্দ্দশা ততই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। বায়ুর অল্পতাবশতঃ তাহারা শীঘ্রই ক্লান্ত ও অবশ হইয়া পড়িতে লাগিল। অবশেষে ১২০০০ ফিট আরোহণের পর তিনি একাকী অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ২২০০০ ফিট ঊর্দ্ধে উঠিয়া তিনিও অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। তথায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম করেন। তথাকার প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনা এইরূপ।—"নক্ষত্রমালা অত্যন্ত উজ্জ্বল দেখাইতেছিল। স্নিগ্ধ চন্দ্রকিরণে

প্রকৃতির শোভা।

চতুষ্পার্শ্বস্থ দৃশ্যাবলী স্বপ্নদৃষ্ট বলিয়া বোধ হইতেছিল। নির্জ্জন, তৃণগুল্মহীন পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যে ভীষণ নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতেছিল। কিন্তু তাহার সৌন্দর্য্যাকর্ষণে আমি বিহ্বল হইয়াছিলাম। আমার দক্ষিণে মুক্ত জ্যোৎস্নাবিধৌত তুষারমণ্ডিত অভ্রভেদী গিরিশৃঙ্গমালা দণ্ডায়মান, এবং উত্তর দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গিরিমালায় বিভক্ত, প্রশস্ত, নিম্নোচ্চ তিব্বতীয় উপত্যকা, যত দূর দৃষ্টি যায়, ততদূর বিস্তৃত। তাহার পশ্চাতে গিরিশৃঙ্গের তুষারমুকুট হিমজ্যোৎস্নায় উজ্জ্বল জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিতেছিল। নিদ্রামগ্না প্রকৃতির এই বিরাট সৌন্দর্য্য সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে না করিতে আর এক অভিনব ঘটনা আমাকে বিস্মিত করিল। সহসা আমার চতুর্দ্দিকে ঘন কুজ্ঝটিকার একখানি শুভ্র যবনিকা বিস্তৃত হইয়া গেল। সেই কুহেলিকাবরণমধ্যে আলোকবৃত্তবেষ্টিত এক দীর্ঘকায় কৃষ্ণবর্ণ বিরাট মূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম। বালক যেমন দর্পণমধ্যে স্বীয় প্রতিমূর্ত্তি প্রতিফলিত দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্টনেত্রে চাহিয়া থাকে, আমিও সেইরূপ মোহাবিষ্টের ন্যায় কিছু ক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া বুঝিলাম, এ আমারই ছায়ামাত্র। আমি চন্দ্রকরোৎপন্ন এক বিচিত্র ইন্দ্রধনুর মধ্যে দণ্ডায়মান রহিয়াছি, ও আমার ছায়া কুজ্ঝটিকায় প্রতিফলিত হইয়া এই বিরাটমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। এ বিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ হইবার জন্য আমি অঙ্গচালনা করিয়া দেখিলাম, ছায়াতেও সেই সেই অবয়ব চালিত হইতেছে।

মষ্টার লাণ্ডর প্রথমে ত্রিশ জন পরিচারক ও অনুচর সহ ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন। কিন্তু ক্রমে তাহা দুই জন সহচরমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। তাহারাও শীঘ্র পলায়ন করিয়া তিব্বতীয়গণের হস্তে তাঁহাকে সমর্পণ করিবার বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিল।

ভৃত্য। একবার তিনি চারি জন লোককে খাদ্যদ্রব্যাদি ক্রয় করিতে পাঠান। তাহারা বাজারে যাইয়া শুনিল, মিষ্টার লাণ্ডরকে ধৃত করিবার জন্য পাঁচ শত মুদ্রা পারিতোষিকস্বরূপ ঘোষিত হইয়াছে। তাহারা এই অসম্ভাবিত লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া তাঁহাকে শত্রুহস্তে অর্পণ করিবার সঙ্কল্প করে, কিন্তু তাহাদের চক্রান্ত বিফল হইয়াছিল।

তিব্বতে প্রথম পদার্পণ হইতে বন্দী হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহার বিপদসঙ্কুল অবস্থার উল্লেখ করিয়া অনেকে তাঁহাকে সাবধান হইতে বহুবার উপদেশ দিয়াছিল; কিন্তু তিনি সে সকল কথা গ্রাহ্য

বিপদ। করেন নাই। তদীয় অনিচ্ছাপরিহিত ছদ্মবেশ অতি সহজেই ধরিতে পারা যাইত। বহুবার তাঁহার শিবিরমধ্যে গুপ্তচরগণ ধৃত হইয়াছিল। তদ্দেশীয়গণের সহিত কথোপকথনকালে তিনি জ্ঞাত হইয়াছিলেন যে, সশস্ত্র সৈন্যদল তাঁহাকে ধৃত করিবার জন্য চারি দিকে ভ্রমণ করিতেছে। দেশবাসিগণও তাঁহাকে ধরাইয়া দিতে সমুৎসুক রহিয়াছে। কেবল শত্রুগণের অভাবনীয় কাপুরুষতায় তাঁহাকে ধৃত করিতে এত বিলম্ব হইয়াছিল। একবার ভিক্ষুকের বেশে দুই জন তাঁহার শিবিরে আগমন করে; তাহারা অত্যন্ত ঔদ্ধত্যসহকারে ব্যবহার করায় ভ্রমণকারীর দুই জন পরিচারক তাহাদিগকে যথেষ্ট প্রহার করিয়া নদীতীরবর্ত্তী দুরারোহ গিরিগাত্র হইতে গড়াইয়া দেয় এবং তাহাদের উপর প্রস্তরবৃষ্টি করে। বৃটিশ রাজ্যাধিকার ত্যাগ করিবার পূর্ব্বেই টাকালকোট-নিবাসী জংপেনের এক-জন অনুচর এক দিন তাঁহার কক্ষে প্রবেশ করিয়া অতি উচ্চৈঃস্বরে ও অঙ্গভঙ্গীসহকারে কথা কহিতে আরম্ভ করে। তাহা দেখিয়া তাঁহার শোকা-জাতীয় অনুচরবর্গ অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়ে। সে গর্ব্বিতভাবে বলিতে লাগিল, "তুমি যে ভূখণ্ডে অবস্থান করিতেছ, উহা ইংরেজাধিকারভুক্ত নহে, তিব্বতের শাসনাধীন। ইংরাজেরা ভীরু, কাপুরুষ। তিব্বতীয়েরা ইচ্ছা করিলেই তাহাদিগকে এ স্থান হইতে বিতাড়িত করিতে পারে। তাহারা তিব্বতীয়গণের ভয়ে সদা শঙ্কিত। সেই জন্য শোকাগণের উৎপীড়ন করিলেও তাহার কোন প্রতিকারসাধনে সমর্থ হয় না।" এই সকল কথা শুনিয়া তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে কিঞ্চিৎ শিক্ষা দিবার সঙ্কল্প করেন। সহসা তাহার মুণ্ডিত মস্তকের দীর্ঘবেণী আকর্ষণ করিয়া তিনি ভীষণ প্রহার আরম্ভ করিলেন। তখন সে ক্রন্দন করিতে করিতে ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিল। শোকাগণের অসম্ভব তিব্বতভীতির দূরীকরণমানসে তিনি উপস্থিত অনুচরবর্গসমক্ষে তাহাকে পাদুকালেহন করাইয়া ছাড়িয়া দেন। ইহার পর সে পলায়নের চেষ্টা করিলে, তিনি তাহাকে পুনরায় প্রহার করিয়া বিদায় দিয়াছিলেন।

লামাগণ অথবা তিব্বতীয় ধর্ম্মমঠগুলি সম্বন্ধে তিনি কোন নূতন কথা বলেন নাই। লামাগণের চরিত্রদোষ ও লাম্পট্য পূর্ব্বতন ভ্রমণকারিগণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মিষ্টর লাণ্ডর তিব্বতের বিবাহ ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্বন্ধে কতকগুলি কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য লিখিয়াছেন। তিব্বতের সর্ব্বত্র স্ত্রীজাতির সংখ্যার অল্পতা দেখিয়া লেখক বিস্মিত হইয়াছিলেন। তাহারা অন্তঃপুরবাসিনী বলিয়া যে এরূপ বোধ হইয়াছিল, তাহা নহে। পরন্তু এই "নিষিদ্ধ দেশে"

মহিলাসমাজ। অবলাকুল সম্পূর্ণ স্বাধীন। পুরুষগণের সহিত সংখ্যাতুলনায় শত-করা ছয় জন স্ত্রীলোক, সুতরাং দেশের সর্ব্বত্র বহুপত্যাত্মক বিবাহ প্রচলিত। তবে কোন কোন সমৃদ্ধ পরিবারে বহুপত্ন্যাত্মক বিবাহও দেখা যায়।

কোন বালিকা উদ্বাহসূত্রে কেবল স্বামীর সহিত বিবাহিত হয় না। পরন্তু নিম্নলিখিতরূপে তৎপরিবারস্থ সকল ভ্রাতার সহিত বিবাহিত হয়। যদি কোন পরিবারের জ্যেষ্ঠপুত্র অন্য কোন পরিবারের জ্যেষ্ঠা কন্যাকে বিবাহ করে, তাহা হইলে বিবাহিত বধূর ভগিনীগণও তাহার পত্নীত্ব প্রাপ্ত হয়। সে যদি দ্বিতীয়া ভগিনীকে বিবাহ করে, তাহা হইলে অবশিষ্ট কনিষ্ঠা ভগিনীগণ তাহার পত্নী হইয়া থাকে। যদি সে তৃতীয়াকে বিবাহ করে, তাহা হইলে তন্নিম্নাবশিষ্টা ভগিনীগণ তাহার পত্নীত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এদিকে আবার বিবাহিত ব্যক্তির যদি কোন ভ্রাতা থাকে, তাহা হইলে সে ভ্রাতৃজায়া ও তদীয় ভগিনীগণের সহিত সহবাস করিয়া থাকে। ইহাতে তাহাদের মধ্যে কোন বিবাদ অথবা মনোমালিন্য উপস্থিত হয় না। লেখক কথাপ্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, জ্যেষ্ঠা ভগিনী অবিবাহিতা সত্বেও যদি কেহ দ্বিতীয়া ভগিনীকে বিবাহ করে ও সেই সূত্রে নিম্নাবশিষ্টা ভগিনীগণের স্বামিত্ব পায়, এবং অপর একজন জ্যেষ্ঠা ভগিনীকে বিবাহ করে, তাহা হইলে জ্যেষ্ঠার পতি সকলের স্বামিত্ব প্রাপ্ত হয় কি না? ইহার উত্তরে তাহারা বলে যে, দ্বিতীয়-ব্যক্তি, অর্থাৎ জ্যেষ্ঠা-পতির একজনমাত্র পত্নী হইবে। কিন্তু যদি দ্বিতীয়া ভগিনী বিধবা হয়, ও তাহার স্বামীর কোন ভ্রাতা জীবিত না থাকে, তাহা হইলে তাহারা সকলেই জ্যেষ্ঠার পতির পত্নীত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

বিবাহ।

উল্লিখিত বিবাহপ্রথা হইতে কেহ মনে করিবেন না যে, তিব্বতীয় স্ত্রীপুরুষগণের মধ্যে কখন মনোমালিন্য ঘটে না। কিন্তু তিব্বতীয় স্ত্রীলোকের বুদ্ধিপ্রাখর্য্যে ও চতুরতায় তাহা কদাচ পরিবারিক শান্তির প্রতিষেধক হয়।

তিব্বতীয় রমণীর স্বামীর যদি একাধিক ভ্রাতা থাকে, তাহা হইলে সে তাহাদিগকে পশু-পালন বা বাণিজ্যের ব্যপদেশে দূরবর্ত্তী স্থানে পাঠাইয়া দেয়; একজনমাত্র গৃহে অবস্থান করে ও তাহার স্বামিত্ব প্রাপ্ত হয়। পরে অন্য এক জন প্রত্যাগত হইলে সেও পূর্ব্বোক্তরূপে কিছু দিন বাস করিয়া আবার পত্নীত্যাগ করিয়া অবিবাহিতরূপে বাস করে।

তিব্বতীয়দিগের বিবাহপ্রথা সর্ব্বপ্রকার বাহুল্যবর্জিত। বিবাহার্থী যুবক পিতা মাতা সমভিব্যাহারে "হৃদয়রঞ্জিনীর" গৃহে উপস্থিত হয়। তথায় সাধারণ শিষ্টাচার ও প্রণামাদির পর যুবকের পিতা পুত্রের জন্য কন্যার পাণি প্রার্থনা করে। অভীষ্ট উত্তর পাইলে যুবক বাগ্‌দত্তা কন্যার ললাটে য়্যাক্-দুগ্ধে প্রস্তুত নবনীত অর্পণ করে। কন্যাও সেইরূপে যুবকের ললাটে নবনীত স্থাপন করে। ইহাতেই বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইয়া যায়।

তাহাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অতি ভয়ানক ও বীভৎসরসের উদ্দীপক। মৃতব্যক্তির শবদেহ কোন গিরিশিখরে বাহিত হইলে লামাগণ তথায় মন্ত্রপাঠ ও মৃতের আত্মার শান্তির জন্য প্রার্থনা করিয়া থাকে। পরে আত্মীয়গণ শবদেহের চতুর্দ্দিকে প্রদক্ষিণ করিয়া কিছু দূরে যাইয়া অবস্থান করে। ইতিমধ্যে কুকুর ও মাংসাশী পক্ষিগণ শবদেহ ছিন্ন ভিন্ন করে। যদি শবের অধিকাংশ কেবলমাত্র পক্ষিগণের দ্বারা ভক্ষিত হয়, তাহা হইলে ইহা মৃতের ও তদীয় আত্মীয়বর্গের সৌভাগ্যচিহ্ন বলিয়া পরিগণিত হয়। কুকুর ও অন্য বন্য পশুতে আহার করিলে বুঝিতে হইবে, এ ব্যক্তি জীবিতাবস্থায় অনেক পাপ করিয়াছে। পরে উপযুক্ত সময়ে পুরোহিতগণ ও আত্মীয়বর্গ মন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে ভুক্তা-বশিষ্ট শবদেহের নিকট উপস্থিত হইয়া, বাম দিক হইতে সাত বার প্রদক্ষিণ করিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে উপবেশন করে, এবং স্ব স্ব ছুরিকা দ্বারা শবদেহ হইতে এক এক খণ্ড মাংস কাটিয়া লয়। তখন উপস্থিত পুরোহিতগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তি মন্ত্রপাঠ করিতে করিতে স্বকর্ত্তিত মাংসখণ্ড ভক্ষণ করিলে অবশিষ্ট পুরোহিতগণ ভোজন আরম্ভ করেন। তৎপরে

অন্ত্যেষ্টি।

মৃতের আত্মীয়বর্গ দেহাবশিষ্ট মাংস ভক্ষণ করে। তাহাদের বিশ্বাস, এরূপ করিলে মৃতের আত্মা তাহাদের বন্ধুভাবে অবস্থান করিবে। যদি পশু ও পক্ষিগণ মৃত দেহ ভক্ষণ করে, তাহা হইলে আত্মীয়বর্গ নিঃসংশয়ে তদীয় মাংস ভক্ষণ করে। কিন্তু যদি তাহা এরূপ গলিত হইয়া পড়ে যে, পশু অথবা পক্ষিগণ তাহা স্পর্শ করে না, তাহা হইলে তাহা লামাগণ কর্তৃক ভুক্ত হইয়া থাকে। এ স্থলে আত্মীয়েরা মনে করে যে, জীবিতাবস্থায় তৎকৃত কোন মহাপাপের জন্য ঈশ্বর ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, এবং লামাগণ ঈশ্বরকে শান্ত করিবার উপযুক্ত পাত্র। লামারা বলে, এইরূপ শবদেহ ভক্ষণ করিলে তাহাদের দৈহিক বল ও ধীশক্তি পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। তাহারা এরূপ নরশোণিতলোলুপ যে, অনেক সময় সুস্থকায় ব্যক্তিকে আহত করিয়া তাহার রক্ত পান করে। ধর্ম্মমঠে শোণিতপূর্ণ নরকপালনির্ম্মিত পানপাত্র সকল রক্ষিত হয়, এবং লামাগণ সেই পানীয় সাগ্রহে পান করিয়া আপনাদের পৈশাচিক তৃষ্ণার তৃপ্তি করে।

মিষ্টার লাণ্ডর বন্দী হইয়া তিব্বতীয়দিগের হস্তে অনেক যাতনা ভোগ করিয়াছিলেন, তাহার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। তাঁহাকে অশ্বপৃষ্ঠে তীক্ষ্ণশলাকাযুক্ত একটি পর্য্যাণের উপর বসাইয়া কশাঘাতে অশ্বকে দ্রুত ধাবিত করিত। গমনের বেগে শলাকাগুলি তাঁহার শরীরে বিদ্ধ হইয়া যাইত। এইরূপ অশ্বারোহণে এক দিবারাত্রি যাপনের পর "ধালসোইস" নামক স্থানে উপনীত হইয়া তিনি অবগত হইলেন যে, শীঘ্রই তিনি নিহত হইবেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁহাকে একটি ত্রিকোণ কাষ্ঠখণ্ডে যথাসম্ভব বিভক্ত-পদে বন্ধন করা হইল ও এক ব্যক্তি দৃঢ়মুষ্টিতে তাঁহার কেশরাশি ধারিয়া রহিল। পরে একটি লৌহদণ্ড অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া লোহিতবর্ণ হইলে ভীষণমূর্ত্তি ঘাতুক তাহা লাণ্ডরের সম্মুখে ঘুরাইতে লাগিল, এবং তদ্দ্বারা তাঁহার চক্ষু অন্ধ করিয়া দিবার ভয় দেখাইতে লাগিল। তিনি লিখিতেছেন, "আমি একদৃষ্টে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম। কিন্তু সে তখন মুখ ফিরাইয়া ছিল। নিকটে দণ্ডায়মান লামাগণ তাহাকে এই নৃশংস কার্য্যে উৎসাহিত করিতে লাগিল। কিন্তু বোধ হইল, সে এ কার্য্যে অনিচ্ছুক। তৎপূর্ব্বদিন আমি আপনাকে একজন ধর্ম্মচারী পথিক ও ভ্রমণকারী বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলাম। তাহা লক্ষ্য করিয়া সে বলিল, তুমি দেশ দেখিতে আসিয়াছ, তাহার জন্য তোমার এই শাস্তি। এই বলিয়া সেই উত্তপ্ত লৌহখণ্ড আমার চক্ষুর অতি নিকটে সমান্তরাল ভাবে ধরিয়া রহিল। প্রচণ্ড উত্তাপে আমার মুখ দগ্ধ হইয়া যাইতে লাগিল। আমি দৃঢ়ভাবে চক্ষু মুদ্রিত করিলাম; বোধ হয়, ত্রিশ সেকেণ্ডমাত্র সে এই ভাবে লৌহদণ্ড ধরিয়াছিল, কিন্তু আমার একযুগ বোধ হইতেছিল। অবশেষে আমি চক্ষুরুন্মীলন করিলে পার্শ্বস্থ যাবতীয় পদার্থ লোহিত কুজ্ঝটিকায় আবৃত বোধ হইতে লাগিল। আমার বাম চক্ষে অসহ্য যন্ত্রণা হইতেছিল। দক্ষিণ নেত্রে দেখিলাম, সেই লৌহদণ্ড আমার নিকটে আর্দ্রভূমিতে পড়িয়া সোঁ সোঁ করিতেছে।

"ইহার পর আমার মস্তকের নিকট দিয়া একটি বন্দুক ছোড়া হইয়াছিল। আমি তাহাতে বড় ভয় (?) পাইয়াছিলাম। পরে ঘাতুক একখান তীক্ষ্ণধার ভীষণ অসি হস্তে অগ্রসর হইল। সে তাহা ঊর্দ্ধে উত্তোলন পূর্ব্বক ধীরে আমার স্কন্ধ পর্য্যন্ত অবনমিত করিল। বোধ হইল, যেন দূরত্ব নিরূপণের জন্য সে এরূপ করিল। পরে পুনরায় ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া আমার স্কন্ধ লক্ষ্য করিয়া যথাসাধ্য বেগে পুনরায় অসি নামাইল। কিন্তু আমার শরীরে কোন আঘাত লাগিল না। আমি নির্ব্বাক, নিস্পন্দভাবে দণ্ডায়মান রহিলাম। তখন সে এই নৃশংস কার্য্য হইতে নিরস্ত হইল। পার্শ্বস্থ লামাগণ ও উপস্থিত জনতা চীৎকার করিয়া ও উন্মত্তবৎ অঙ্গভঙ্গিসহকারে তাহাকে বারংবার উত্তেজিত করিতে লাগিল। তখন ঘাতুক নিতান্ত অনিচ্ছা সহকারে পুনরায় অসি উত্তোলন করিল। তখন আমি ভাবিলাম, এবার আর

বন্দী।

নিস্তার নাই। কিন্তু পুনরায় তাহার চেষ্টা বিফল হইল। এবার তাহার অসি আমার শরীরের অর্দ্ধ ইঞ্চি মাত্র ব্যবধানে চলিয়া গেল।"

লাণ্ডরের মতে তিব্বতীয়েরা অত্যন্ত ভীরু। সাহস তাহাদের মধ্যে কাহারও নাই। অতি সাবধানতার অভাবে তাহাদের তাঁহাকে ধৃত করিবার সকল চেষ্টা বিফল হইয়াছিল। যখন তাহারা তাঁহাকে লইয়া সীমান্তাভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল, তখন তিনি লুম্পিয়া-পাস নামক পার্ব্বত্য পথ দিয়া গমনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তাহা জং পেনের অধিকারভুক্ত। সে কিছুতেই তাঁহাকে তন্মধ্য দিয়া গমন করিবার অনুমতি প্রদান করিল না। তৎসমভিব্যাহারী তিব্বতীয়গণ ঘৃণাসহকারে বলিল, "জং পেনের সৈন্যদল অতিশয় ভীরু। তাহাদের সহিত আমাদের যুদ্ধক্ষেত্রে সাক্ষাৎ হইলে আমরা তাহাদের সকলকেই হত্যা করিব।" এমন সময়ে শত্রুদলের অশ্বগলাবলম্বিত ঘণ্টারব শ্রুত হইল। তৎক্ষণাৎ তাহাদের বীরত্বপূর্ণ আস্ফালন থামিয়া গেল। পরে শত্রুদল দৃষ্টিগোচর হইলে একটি অদ্ভুত দৃশ্য দৃষ্ট হইল। উভয় দল স্ব স্ব অস্ত্র সকল ভূমিতে রাখিয়া উভয়ের দিকে অগ্রসর হইয়া সাগ্রহে পরস্পরের মিত্রতা স্বীকার করিল।

ভীরুতা।

কালনিদ্রা।

দরিদ্র বিনোদ শেষবার ডেপুটিগিরি পরীক্ষা দিয়া অবধি আপনার ভবিষ্যৎ জীবন ঘোর অন্ধকারময় দেখিতেছিলেন। অদৃষ্টপরীক্ষার যদি কোনও বিশিষ্ট উপায় থাকে, তবে সে ডেপুটিগিরি পরীক্ষা। বিনোদ নিজের পুরুষকারের বলে এক একটি করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ উপাধি পর্য্যন্ত লাভ করিয়াছেন, কিন্তু দুইবার ডেপুটি পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হওয়ার পর বিনোদ বেশ বুঝিয়াছেন যে, এখানে আপনার পুরুষকার ব্যতীত আর কোনও বল না থাকিলে কৃতকার্য্য হওয়া যায় না।

বহুদিনের পর শ্বশুরালয়ে নিরীহ কমলাকে দেখিতে যাইবার সাধ বড়ই প্রবল হইয়াছে, কিন্তু কি একটা অনির্দ্দিষ্ট আতঙ্কে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইতেছিল—বিনোদ সভয়ে শ্বশুরবাড়ীতে পদার্পণ করিয়া দেখিলেন, শ্বশুর মহাশয় বহির্বাটীতে বসিয়া আছেন, তাঁহার মুখ বড় গম্ভীর। তাঁহার মনে হইল, যেন সেই স্থির গাম্ভীর্য্যের পশ্চাতে কি একটা ঘোর ঝঞ্ঝাবায়ু আপনার প্রবল বেগ অতি কষ্টে সংবরণ করিয়া রহিয়াছে।

সেই দিন বিনোদের শ্বশুর তাঁহার কোন বন্ধুর নিকট হইতে সংবাদ পাইয়াছেন, বিনোদ এবারও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তোমার অদৃষ্টফল তুমি ভিন্ন আর সকলেই জানিয়াছে, সকলেই মনে মনে তোমার প্রতি কৃপা প্রকাশ করিয়া মুখে শূন্যগর্ভ আশ্বাসবাণীর প্রয়োগ করিতেছে, এবং সেই শূন্য-

বায়ুতে তোমার হৃদয় ঈষৎ ভাসমান হইয়া উঠিয়া লোকের করুণামাত্র আকর্ষণ করিতেছে, এ বড় বিষম অবস্থা। মুখে ও কথায় মিল নাই, সে কথা যেন তোমার হৃদয়ে একটা ক্রূর আঘাত করিয়া ফিরিয়া আসে মাত্র। বিনোদ শ্বশুরের কথাবার্ত্তায় বেশ বুঝিতে পারিলেন না, কিন্তু অন্তরে একটা বিষম বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন।

রাত্রে শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, কমলা শিশু কন্যাকে বুকের কাছে লইয়া নিদ্রামগ্না, কমলার রুগ্ন শরীর নিদ্রায় অতি কাতর ভাব ধারণ করিয়াছে, তাহার ম্লান মুখ অতিশয় করুণাব্যঞ্জক। শিশু কন্যার দেহে শীর্ণ বাহু সংলগ্ন রহিয়াছে, ঘুমের ঘোরেও যেন জননীর স্নেহ সন্তানকে বাঁধিয়া রাখিতে চাহে। বিনোদ কমলাকে জাগাইলেন না, তাহার শিয়রে নিস্তব্ধভাবে বসিয়া রহিলেন, কমলার ধীর বিশ্রান্ত শ্বসিত তনুর আন্দোলন নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ বিনোদ শুনিলেন, পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষে কে বলিতেছে,—

"চুপ্ কর, চুপ্ কর"।

"চুপ্ করিব কেন? বড় যে লেখাপড়া জানা ছেলে খুঁজিয়াছিলে। লেখা পড়ায় ত সব হবে। বই পড়ে পড়ে ছেলেগুলা সব মাটি হইল, না পারে ছুটো চোটপাট কথা কহিতে, না জানে হাস্‌তে. না জানে কাঁদ্‌তে, বই পোড়ে সব বোবার দল। কথা না কহিতে পারিলে কি সাহেব পছন্দ করে?—সাহেব পছন্দ না ক'রলে কিছু হ'বার আশা আছে!"

"তা এখন কি হ'বে? সাহেবদেরই ত পাশ; ছেলেরা পাশ ত দিচ্চে, সাহেবেরা দেখেও গ্রাহ্য ক'রবে না তা কি হ'বে।"

"লেখাপড়া শিখে পয়সা না রোজকার ক'রতে পারে, আমার এমন লেখাপড়ায় দরকার নাই,—পয়সা চাই,—শিমুলফুল চাইনে।"

"তা ব'লে যা'কে মেয়ে দিয়েছ, তা'র সঙ্গে অমন ব্যবহার ক'রতে নাই; ছেলেমানুষ, এখনই কি পয়সা রোজগারের সময় গেছে?"

"ছেলেমানুষ! পঁচিশ বৎসরের মধ্যে যদি একটা স্থিত হ'ল ত হ'ল, না হলে সেই খানেই খতম। পঁচিশ বৎসরই হ'ল আজকালকার ছেলের জীবনের সন্ধিস্থল। আমি ও সব বুঝিনে, ওকে বল'—সুখে স্বচ্ছন্দে সংসার করবার মত অবস্থা না হ'লে আমার মেয়ে আমারই থা'কবে।"

এইখানেই কথার শেষ হইল। বিনোদের কর্ণে সেই নিস্তব্ধ নিশীথ অতি

কোলাহলপূর্ণ বোধ হইতে লাগিল। ঝিল্লীমুখরিত নৈশজগৎ যেন একটা কর্কশ ঝঙ্কারে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। বিনোদ অতি কাতরভাবে শয্যায় শুইয়া পড়িলেন।

বিনোদের হৃদয় ঘৃণায়, লজ্জায়, দুঃখে, আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। তাঁহার মনে হইতে লাগিল, তিন বৎসর পূর্ব্বে ত এমন ছিল না। যখন পিতা বর্ত্তমান ছিলেন, ছাত্রজীবন সবেমাত্র শেষ হইয়াছে, তখন কত আশা, কত উদ্যম, কত আদর; অতীতে কত গৌরব, ভবিষ্যতে কত জ্যোতিঃ। পিতা হঠাৎ চলিয়া গেলেন; ছোট ছোট ভাইভগিনীগুলির করুণ মুখ, তাহাদের ভরণ-পোষণের জন্য ব্যস্ততা; অবশেষে একটা স্কুলমাষ্টারি পাইয়া, সকল আশায় জলাঞ্জলি দেওয়া, তাহাতেও কত সুখ। সেই সংসারভার বহন করিতে করিতে তিন বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, কিন্তু তিন বৎসরে কি পরিবর্ত্তন! এখন বন্ধু নাই, গৌরব নাই, আত্মীয়ের ভালবাসা, তাহাও নাই। যাহা এইমাত্র শুনিলেন, তাহাতে অণুমাত্র সহানুভূতিও নাই; সুধু একটা নীরস বিশীর্ণ জীবনের খোলসমাত্র পড়িয়া রহিয়াছে। বিনোদ ভাবিলেন, সকলই গিয়াছে, কমলার স্নেহও কি বাকি আছে?—তবে আর কি, জীবনের উদ্দেশ্য হারাইয়া গিয়াছে, জীবনটা মূল্যহীন।

দীর্ঘ রাত্রিজাগরণের পর অতি প্রত্যূষে বিনোদলাল শয্যাত্যাগ করিয়া নিদ্রাভিভূতা কন্যা ও কমলার মুখের দিকে সাগ্রহে দৃষ্টিপাত করিলেন, পরে অন্তর্গূঢ় হৃদয়বহ্নির জ্বালাস্বরূপ একটি গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কক্ষ হইতে বহির্গত হইলেন। পরক্ষণেই গৃহের বাহিরে আসিলেন। দ্বারে সম্মার্জ্জনী-হস্তে দণ্ডায়মানা ঝি বিদ্রূপসহকারে বলিল,—"জামাই বাবু চোরের মত পালাচ্চ যে?"—বিনোদ কোন উত্তর করিলেন না, উত্তর করিবার তাঁহার সামর্থ্য ছিল না। কিছু দূর গিয়া শুনিলেন, ঝি বলিতেছে,—"যেন কেমনতর, কাহারও সঙ্গে দেখা করা নেই, কিছু বলা নেই, কওয়া নেই, অমনি চল্লেন।" ঝিটাও জামাই বাবুর খাতির করিতে ভুলিয়া গিয়াছে।

পর দিন সন্ধ্যার সময় বিনোদ পথিপার্শ্বস্থ আপনার কক্ষের বাতায়নের কাছে বসিয়া আছেন। মুখ অপেক্ষাকৃত স্থিরতাব্যঞ্জক; হৃদয়ের সে উদ্দাম আন্দোলনের শেষ হইয়া খরস্রোতে চিন্তালহরী চলিয়াছে। সন্ধ্যার মৃদুতর জনকোলাহল তাঁহার কর্ণে প্রবিষ্ট হইতেছে মাত্র; এমন সময় নিকটস্থ জমিদার-বাড়ীর বৈঠকখানায় একটি হারমোনিয়মের সুরের সঙ্গে কানাড়া রাগিণীতে

কে গান গাহিয়া উঠিল ; গানের বিশ্লিষ্ট অংশমাত্র বিনোদ শুনিতে পাইতে-ছিলেন ; তিনি স্থির হইয়া শুনিতে লাগিলেন। গায়ক উচ্চকণ্ঠে গাহিল,—

কত আশা ছিল মনে ; ভালবাসা ছিল প্রাণে।
সে আশা-জলধি শুকায়ে গিয়েছে, মরমে লেগেছে ব্যথা !

পুনরায় তাঁহার স্মৃতি জাগরিত হইয়া উঠিল, নৈরাশ্য ও দুঃখ যুগপৎ তাঁহার হৃদয় অধিকার করিল ; গানের সুরগুলি নির্দ্দয়ভাবে তাঁহার মর্ম্মে গিয়া আঘাত করিতে লাগিল। "গানটা কি থামিবে না ?" বিনোদলাল উঠিয়া আপনার ক্ষুদ্র কক্ষ মধ্যে পিঞ্জরাবদ্ধ বন্য পশুর ন্যায় ঘন ঘন পাদচরণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে গান থামিয়া গেল ; তখন তাঁহার মনে হইল, গানটা না থামিলে ভাল ছিল। গানের সুরের সহায়ে তাঁহার চিন্তালহরী একতানে বহিয়া চলিয়াছিল ; একটা অবলম্বন পাইয়া হৃদয়ের তন্ত্রীগুলি অবলীলাক্রমে ঝঙ্কৃত হইতেছিল ; হঠাৎ অবলম্বরহিত হইয়া হৃদয়বেগ উচ্ছৃঙ্খল হইয়া দিশে-হারা হইয়া ছুটিতে লাগিল।

পুনরায় সেই যন্ত্রণাময়ী স্মৃতি তাঁহার হৃদয় উদ্বেলিত করিতে লাগিল। অবশেষে বিনোদলাল বসিয়া পড়িলেন, ভাবিলেন, এখন কমলা কি করিতেছে ? কি আর করিবে, তাঁহারই পরাভব স্মরণ করিয়া তাঁহাকে কত ধিক্কার দিতেছে ; অপদার্থ পুরুষ কি কখন রমণীর স্নেহ অথবা কৃপা আকর্ষণ করিতে পারে !

তাহাতে আর কি—এখনই সব শেষ হইবে,—একটু সাহসমাত্র আবশ্যক—সম্মুখস্থ খোলা বাক্সের ভিতর একটি দিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল, তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। এই কি পরিণাম ! এত চেষ্টা, এত উদ্যম, এত আশার এই পরিণাম ! তা' বই আর কি ? কিসের জন্য জীবন ? শূন্যগর্ভ অকর্ম্মণ্য যন্ত্র লইয়া কি হইবে ? চিরদিন জগতের সিংহদ্বারে ভিক্ষুকের বেশে কৃপার প্রত্যাশায় থাকিয়া কি ফল ? কঠোর জীবন-সংগ্রামে জয়ী হও, সকলেই তোমার যশোগান করিয়া বিজয়গৌরবের অংশ গ্রহণ করিবে, আর পরাজিত হও, তোমাকে একাই পরাভবদুঃখ উপভোগ করিতে হইবে, কেহ তোমার দিকে করুণার চক্ষে একবার চাহিয়াও দেখিবে না। এই ত জগৎ ! জয়-পরাজয়ের এই বিসদৃশ পার্থক্য চিন্তা করিয়া বিনোদলাল যেন একটু হাসিলেন। এই ত জগৎ !

দৃষ্টি পড়িল ; তিনি ভাবিলেন,—এইগুলিই যত অনর্থের মূল ; এইগুলিতেই আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছে ; ইহারাই উচ্চাভিলাষের উদ্দীপক, কিন্তু তাহার সাধনের কোন উপায় বলিয়া দেয় নাই ; ইহারাই আত্মাভিমান বলিয়া একটা মনোবৃত্তির পরিপোষণ করিয়াছে, কিন্তু তাহার চরিতার্থতার কোন উপায় বলিয়া দেয় নাই ; ইহারাই আশা দিয়াছে, কিন্তু নৈরাশ্যকে বাধা দিতে পারে নাই ; এগুলিতে জীবনের একটা অতি ভ্রান্ত ছবি প্রদান করিয়াছে, বাস্তবিক জীবনের কঠিন সমরে যুঝিবার উপযোগী হৃদয়ের বল দেয় নাই, মনে শিক্ষা দেয় নাই, শরীরে তেজ প্রদান করে নাই।

হঠাৎ বায়ুর বেগে বাক্সের ডালাখানা ঝনাৎ করিয়া পড়িয়া গেল ; বিনোদলাল যেন বুঝিতেই পারিলেন না। বাক্সটি পুনরায় খুলিলেন। সেই শিশিটি বাহির করিয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার মনে হইল, কে এ শিশি এ বাক্সে রাখিয়াছিল। বহুদিন পূর্ব্বে কমলা একদিন শিশিটি দেখিয়া বিনোদকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল,—"এটা কিসের ঔষধ ?" বিনোদলাল অন্যমনস্কভাবে বলিয়াছিলেন,—"হ্যাঁ ঔষধ—ওটা ঘুমের ঔষধ।" কমলা ঔষধের শিশিটা সযত্নে নিজের বাক্সে তুলিয়া রাখিয়াছিল। বিনোদলাল আজ সেই ঘুমে সকল যন্ত্রণার অবসান করিতে উদ্যত হইয়াছেন। তাঁহার একবার মনে হইল, কমলা শুনিয়া কি করিবে ? কি আর করিবে, পিতার কন্যা পিতারই থাকিবে।

উদ্ভ্রান্ত মনুষ্য-হৃদয় এক মুহূর্ত্তে এত বহুলপরিমাণে ন্যায়ের ফাঁকির সৃষ্টি করিতে পারে, কোন কূট নৈয়ায়িক দীর্ঘকালেও তাহা আয়ত্ত করিয়া উঠিতে পারেন না।

বিনোদলাল সেই নির্ব্বিরোধী শিশিটির শীতল স্পর্শ অনুভব করিলেন,—পরক্ষণে সেটা মুখের কাছে তুলিলেন, কিন্তু মনে পড়িল, কমলার সহিত দেখা করিয়াছি, কথা কহিয়া আসি নাই, দুইটা শেষ কথা লিখিয়া রাখিয়া যাই। একখানা কাগজে কম্পিতহস্তে কি গোটা কতক কথা লিখিয়া, পুনরায় শিশিটি উত্তোলন করিয়া ঘুমের ঔষধ সমস্ত নিঃশেষ করিয়া পান করিলেন। শিশিটা হাত হইতে মেজের উপর পড়িয়া চুরমার হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল।

বিনোদলাল শয্যায় আসিয়া শয়ন করিলেন। তখন চাঁদ উঠিয়াছে ; দূরে সেই সঙ্গীতলহরী নৈশবায়ুভরে ভাসিয়া আসিতেছে ; কিন্তু বিনোদলালের হৃদয়ে বিষম আন্দোলনের মধ্যে তাহার একটি সুরও ঝঙ্কৃত হইতেছে না। গান শেষ হইয়া গেল। তখন বিনোদের হৃদয়তন্ত্রীও স্পন্দনরহিত হইয়া গিয়াছে।

পরদিন প্রাতঃকালে ডাকওয়ালা দুইখানি পত্র দিয়া গেল। একখানি ছোটলাটের আফিস হইতে—তাহাতে বিনোদ ডেপুটি মনোনীত হইয়াছেন, এই সংবাদ আছে। বিনোদের শ্বশুরের বন্ধু ভুল সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন। আর একখানিতে লেখা আছে,—

"প্রিয়তম,

"আমি কাল-নিদ্রায় অভিভূত ছিলাম, তুমি আসিয়াছ, চলিয়া গিয়াছ, আমায় জাগাও নাই কেন? তুমি এবারও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হও নাই শুনিয়া বাবা বড়ই অসন্তুষ্ট হইয়াছেন, তোমার কতই না নিন্দা করিতেছেন। আমরা দরিদ্র, চিরদিন দরিদ্রই থাকিব; কিন্তু আর তোমার লাঞ্ছনা সহিতে পারি না। তুমি আমায় সত্বর তোমার কাছে লইয়া যাও, সহস্র দুঃখের মাঝেও দুই জনে সুখে থাকিব।

তোমার কমলা।"

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

স্বাস্থ্য। জ্যৈষ্ঠ। "স্বাস্থ্যপ্রসঙ্গে" বিবিধ আবশ্যক বিষয়ের আলোচনা আছে। "অম্লাজীর্ণ" প্রবন্ধে উক্ত ব্যাধির প্রতিষেধক ঔষধের ব্যবস্থা আছে। রোগের কারণনির্দ্দেশ ও পথ্যাপথ্যের ব্যবস্থা থাকিলে আরও উপকারে আসিত। "গ্রীষ্মের অস্বাস্থ্যকারিতা" প্রবন্ধে লেখকের বিশেষজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রীষ্মকালে যে যে কারণে শরীর অসুস্থ হইয়া থাকে, লেখক তাহার বৈজ্ঞানিক কারণের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "ছাগদুগ্ধ" প্রবন্ধটি উপাদেয়। ছাগদুগ্ধের উপকারিতা প্রতিপন্ন করিয়া উপসংহারে লেখক বলিয়াছেন,— "ছাগদুগ্ধে কেজিন ও নবনীতের অংশ মাতৃদুগ্ধ অপেক্ষা বেশী। ছাগদুগ্ধ রুগ্ন শিশুর সুপথ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ। ক্ষয়রোগে শরীরের পুষ্টিসাধনের প্রয়োজন হইলে আমরা কড্‌লিবার অয়েলের ব্যবস্থা করিয়া থাকি। কড্‌লিবার অয়েলে যে কার্য্য সাধিত হয়, অনেকাংশে ছাগদুগ্ধে তাহা সাধিত হইতে পারে। কারণ, ছাগদুগ্ধে যে ভাবে নবনীত আছে তাহা সহজে পরিপাকযোগ্য।" "দুগ্ধ—পথ্য ও ঔষধ" একটি উৎকৃষ্ট ও উপকারী সন্দর্ভ। প্রত্যেকের পঠনীয়। "স্বাস্থ্যের" একটি গুণের জন্য আমরা তাহার অত্যন্ত পক্ষপাতী। স্বাস্থ্য-সম্পাদক ইংরাজী স্বাস্থ্যতত্ত্বের চর্ব্বিতচর্ব্বণে প্রবৃত্ত নহেন। এ দেশের প্রাকৃতিক অবস্থা, অধিবাসীদের রীতি প্রকৃতির বিবিধ বৈচিত্র্যের অনুশীলন ও পর্য্যালোচনা করিয়া, বৈজ্ঞানিক নিয়মের ভিত্তির উপর আমাদের দেশের উপযোগী স্বাস্থ্যতত্ত্বের বিধিব্যবস্থার

তিনি বিজ্ঞ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের মত উপদেশ দিয়াই নিরস্ত হন না,—সঙ্গে সঙ্গে কার্য্য-কারণের অর্থ বুঝাইয়া, তাঁহার বক্তব্য বিষয় পাঠকের মনে মুদ্রিত করিয়া দিবার চেষ্টা করেন। ইহাই প্রকৃত পথ বলিয়া মনে হয়।

প্রয়াস। মে ; পঞ্চম সংখ্যা। প্রথমে স্বর্গীয় অমর কবি বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর রচিত একটি খণ্ডকবিতা "নিশীথ-সঙ্গীত"। আশা করি, বহুকাল পরে সারদামঙ্গল-প্রণেতার এই অপ্রকাশিতপূর্ব্ব কবিতাটি পড়িয়া তাঁহার ভক্তগণও আমাদের ন্যায় আনন্দলাভ করিবেন। "তরঙ্গ ও তারহীন তাড়িতবার্ত্তাবহ" প্রবন্ধটি উল্লেখযোগ্য। লেখকের ভাষা এখনও জড়তা অতিক্রম করিতে পারে নাই, কিন্তু তাঁহার গুছাইয়া লিখিবার ক্ষমতা আছে। বৈজ্ঞানিক বিষয়ে কলম ধরিতে পারেন, এমন লেখকের সংখ্যা অতি অল্প। এ দিকে নূতন লেখকগণের দৃষ্টি বাঞ্ছনীয়। প্রয়াসের চেষ্টায় নূতন লেখকগণ যদি বৈজ্ঞানিক রচনার অনুশীলন করেন, তাহা হইলে বিলক্ষণ সুফললাভের সম্ভাবনা। শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ ঘোষের "স্বর্গীয় কবি প্রমীলা নাগ", এখনও চলিতেছে। শ্রীযুক্ত নন্দলাল গুপ্তের "রাজপুতদিগের মধ্যে বিধবাবিবাহ" প্রবন্ধটি উল্লেখযোগ্য। শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ সেনের "অপূর্ব্বমিলন" নামক ক্ষুদ্র গল্পে কোনও বিশেষত্ব দেখিলাম না। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সরকার, "আধুনিক নাট্যশালা ও প্রহসন" প্রবন্ধে, বঙ্গীয় রঙ্গভূমির বর্ত্তমান দুর্দ্দশার আলোচনা করিয়াছেন। লেখকের সহিত এ বিষয়ে অনেকেই একমত হইবেন।

পন্থা। তৃতীয় ভাগ, প্রথম সংখ্যা ; বৈশাখ। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় "আমাদের তৃতীয় বৎসর" ইতিশীর্ষক ভূমিকায় যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, আমরা তাহার অর্থবোধ বা মর্ম্মগ্রহ করিতে পারিলাম না। বুঝাইবার জন্যই ত ধর্ম্মকথার অবতারণা ; যদি সাধারণের বুদ্ধিগম্য না হয়, তাহা হইলে এরূপ নিগূঢ় বা অবোধ্য তথ্যের প্রচারে ফল কি? শ্রীযুত হীরেন্দ্রনাথ দত্তের "নিষ্কাম ধর্ম্ম" প্রবন্ধটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ, শিক্ষাপ্রদ। লেখক শাস্ত্র হইতে নিষ্কাম ধর্ম্মের পোষক প্রমাণগুলির সংগ্রহ ও তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রীযুত পূর্ণেন্দু-নারায়ণ সিংহের "পৌরাণিক কথা" আর একটি উল্লেখযোগ্য সুপ্রবন্ধ। শ্রীযুত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী 'পন্থায়' "ঈশোপনিষৎ"এর সম্পাদন করিতেছেন। প্রথমে মূল, পরে মূলের সংস্কৃত ব্যাখ্যা, তাহার পর অনুবাদ ও পরিশেষে ভাবব্যাখ্যা প্রদত্ত হইতেছে। গোস্বামী মহাশয়ের প্রযত্নে ঈশোপনিষৎ উপাদেয় হইতেছে।

ঋষি। জ্যৈষ্ঠ। এই সংখ্যায় 'ঋষির' প্রথম বৎসর সম্পূর্ণ হইল। আয়ুর্ব্বেদ ও ধর্ম্মনীতির প্রচারের জন্য ঋষির আবির্ভাব। "দ্রব্যগুণবিচার" নামক আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রীয় প্রবন্ধটি লোকহিতকর বটে। এই ধারাবাহিক প্রবন্ধে বিবিধ দ্রব্যের গুণ আনুপূর্ব্বিক বর্ণিত হইতেছে। এইরূপ হিতকারী প্রবন্ধের আধিক্য দেখিলে আমরা আনন্দিত হইব।

মহিলা। বৈশাখ। নামেই পাঠক বুঝিতে পারিতেছেন, এই মাসিকপত্রখানি মহিলাদের জন্য কল্পিত। ইহাতে স্ত্রীজাতির উপকারী ও আবশ্যক বিবিধ বিষয়ের অল্পবিস্তর আলোচনা থাকে। বর্ত্তমান সংখ্যায় "পূর্ব্ব বঙ্গের স্ত্রী-আচার" প্রবন্ধটি সাধারণেরও তৃপ্তি-বিধান করিবে। বঙ্গদেশের বিভিন্ন প্রদেশে সামাজিক অনুষ্ঠানের বিবিধ বিভিন্ন রূপ

প্রচলিত আছে। সেই সমস্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইলে, 'মানব-তত্ত্ব-বিজ্ঞানে'র যথেষ্ট উপকারে আসিতে পারে।—বৈদেশিক বৈজ্ঞানিকগণের অনুগ্রহে আমরা সাইবীরিয়ার অধিবাসীদের দৈনিক জীবনযাত্রার সম্পূর্ণ বিবরণ অবগত হইতে পারি, কিন্তু আমাদের জন্মভূমি বঙ্গদেশের বিভিন্ন প্রদেশের সামাজিক অনুষ্ঠান ও আচার ব্যবহারের বিন্দুমাত্র বিবরণ জানিবার উপায় নাই। মফস্বলবাসী লেখকগণ এ বিষয়ে অবহিত হইলে সুফললাভের আশা করা যায়। "শিশুর খাদ্যের পরিমাণ" প্রসূতিগণের অবশ্যজ্ঞাতব্য বিবিধ তথ্যে পরিপূর্ণ। গৃহলক্ষ্মীগণ এই সকল পরীক্ষাসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক নিয়ম পালন করিয়া চলিলে শিশুদের অকালমৃত্যুর অনেক হ্রাস হইতে পারে।

উদ্বোধন। জ্যৈষ্ঠ; ৯ম ও ১০ম সংখ্যা। শ্রীম—কথিত "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত" উপাদেয়। "তিব্বত ভ্রমণ" কৌতূহলের উদ্দীপক, কিন্তু হায়! লেখক প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তিনি পাঠকের উদ্বুদ্ধ কৌতূহল কখনই চরিতার্থ করিবেন না! শ্রীযুত বিবেকানন্দ স্বামীর "বর্ত্তমান ভারত" নামক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের অতি অল্পমাত্র দশম সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীযুত গিরীশচন্দ্র ঘোষের "বাঙ্গাল" একটি ক্ষুদ্র গল্প,—বিশেষত্ব আছে।

পুণ্য। পৌষ ও মাঘ। "স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে অবলম্বনীয় পন্থা" শ্রীযুত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত। লেখক ধর্ম্মহীন শিক্ষার বিরোধী; যে শিক্ষায় স্ত্রীজাতির চরিত্রে পবিত্রতার সঞ্চার হয়, সেইরূপ শিক্ষার পক্ষপাতী। শ্রীযুত ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরীর "মঙ্গলসূত্র" বৌদ্ধধর্ম্মবিষয়ক সুরচিত প্রবন্ধ। "তাম্বুরু ও কালীপ্রসন্ন সিংহ" প্রবন্ধে তানপুরার ইতিহাস কথিত হইয়াছে। লেখক বলিতেছেন,—"একজন বিশিষ্ট গায়কের মুখে শুনিয়াছি যে বিখ্যাত মহাভারতের অনুবাদক ৺ কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় স্বাভাবিক অলাবুর তুম্বের অনুকরণে কাগজের তুম্ব প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। * * * এই হেতু সঙ্গীতের দিক হইতে তাঁহাকে সম্মান দিবার জন্য এই সঙ্গীতপ্রবন্ধের সঙ্গে তাঁহার একটি চিত্রও সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশ করিলাম।"—সঙ্গীতের দিক হইতে সিংহ মহোদয়ের সম্মানবিধান করিয়া লেখক আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। কিন্তু পরিশেষে 'সঙ্গীতসমাজে'র প্রসঙ্গ উত্থাপিত না করিলেই ভাল ছিল। তানপুরা হইতে কালীপ্রসন্ন সিংহের অবতারণা প্রসঙ্গসঙ্গত ও বিধিসম্মত, কিন্তু কালীপ্রসন্ন সিংহ হইতে তাঁহার বাড়ী, ক্রমে তাহা হইতে সেই বাড়ীর ভাড়াটিয়া সঙ্গীতসমাজ,ক্রমে সঙ্গীতসমাজের প্রসঙ্গে তত্রত্য দ্বন্দ্বকোলাহলের উল্লেখ ও তদুপলক্ষে লেখক মহাশয়ের অযাচিত উপদেশ নিতান্তই খাপছাড়া ও অপ্রাসঙ্গিক হইয়াছে। গল্প আছে, পূর্ব্ববঙ্গের অধিবাসী পিতা পুত্রকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। পুত্রের নাম রামকান্ত। পিতৃদেব পুত্রকে বলিলেন, 'রামকান্ত! ডালে বেশী করিয়া লঙ্কা দিস্।' রামকান্ত লঙ্কা দিল বটে, কিন্তু পিতার জিহ্বায় তাহার ঝাল পঁহুছিল না। খাইতে বসিয়া পিতৃদেবতা চটিয়া আগুণ! 'পিতৃবাক্য লঙ্ঘন! লঙ্কা দিস নি?' পুত্র বলিল, 'দিয়াছি ত।' যেমন বলা, অমনই বারুদের গাদায় আগুন লাগিল। বৃদ্ধ পদাঘাতে ভোজনপাত্র দূরে নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন,— "তুই লঙ্কা দিয়াছিস্, আমি বলিতেছি—না। তবে আমি মিথ্যাবাদী, বেঠিক বকিতেছি। ভুল বকে কে? মাতাল।—তবে আমি মাতাল; যে মাতাল [illegible] সনে মাত্লামী করে,

সে মাতালের ধাড়ী। প্রকারান্তরে তবে তুই আমাকে পাকা মাতাল বলিলি।—আচ্ছা, অমন ছেলের মুখদর্শন করিব না; আজ থেকে তুই আমার ত্যজ্যপুত্র।" ইত্যাদি। দুর্ভাগ্য বালকের পিতা যে ন্যায়সূত্রে এতখানি অগ্রসর হইয়াছিল, এবং হিতেন্দ্র বাবু যে ক্রমসূত্রে তানপুরা হইতে সঙ্গীতসমাজে অবতীর্ণ হইয়াছেন, উভয়ে বোধ করি বিশেষ প্রভেদ নাই। স্বর্গীয় হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "জড়ের সাধারণ গুণ", "পুষ্পের বিবাহ," বাঙ্গালা ও আসামী ভাষা অভিন্ন নহে" প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি পাঠযোগ্য। শ্রীযুক্ত ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "দেবপূজা ও যজ্ঞের উৎপত্তি" একটি সুরচিত, সুচিন্তিত, প্রত্নতত্ত্ববিষয়ক প্রবন্ধ।

উৎসাহ। ১৩০৫ সালের শেষ সংখ্যা। মাসের নাম নাই, সংখ্যার অঙ্ক নাই;—নূতনতর বটে! শ্রীযুত গোবিন্দচন্দ্র দাসের "ভোলাবাবু ঘুম যায়" কবিতাটি মন্দ নহে। শ্রীযুত রাধেশচন্দ্র শেঠের "রাজা রামানন্দ রায়" নামক উৎকৃষ্ট সন্দর্ভটি এই সংখ্যায় সমাপ্ত হইল। এ সংখ্যায় উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধের একান্ত অভাব।

পূর্ণিমা। জ্যৈষ্ঠ। শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরীর "আর্য্যসমাজে নারীজাতির অবস্থা" ও শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহের "যজ্ঞ" উল্লেখযোগ্য সুপ্রবন্ধ। "মাসিক সাহিত্য সমালোচনা"য় হিন্দু ধর্ম্মের গোঁড়ামি থাক, মুন্‌সিয়ানাও যথেষ্ট আছে; পাকা হাতের ওস্তাদী, সে বিষয়ে মতভেদ হইবার সম্ভাবনা নাই।

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা। জ্যৈষ্ঠ, ১ম পক্ষ। এই সংখ্যা হইতে বিষ্ণুপ্রিয়া পাক্ষিক হইল। এবার সাম্প্রদায়িক বিবাদে ও বাদপ্রতিবাদে বিষ্ণুপ্রিয়া পরিপূর্ণ। "শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরী" প্রবন্ধের লেখক বলেন,—শূদ্রও ব্রাহ্মণের গুরু হইতে পারে, ঈশ্বর পুরী শূদ্র হইলেই বা ক্ষতি কি? এ বিবাদে বিশেষ ইষ্টাপত্তি দেখিতেছি না। দলাদলির অবসান দেখিলেই আমরা সুখী হই।

মুকুল। জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়। "সে কালের কথা"য় লেখক অতি সহজ ভাষায় ভূতত্ত্বের দুই চারিটি কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার বলিবার ভঙ্গী সুন্দর, রচনার প্রণালী প্রাঞ্জল,—আমোদের সঙ্গে কেমন করিয়া শিক্ষা দিতে হয়, তাহা তিনি জানেন। "ভেনিস্" সুখপাঠ্য। "বাঙ্গালী ক্রিকেট খেলোয়াড়"দের ছবি দেখিয়া সুখী হইলাম—ভাষা বুঝিতে পারিলাম না। যাহারা খেলা জানে, তাহারা হয় ত বুঝিতে পারিবে। "জ্যোতিষের কথা" বেশ হইয়াছে। "ইউরিসিমো তারো" একটি অসমাপ্ত গল্প; গল্পটির আপাদমস্তক কবিত্বে পরিপূর্ণ; যথা,—"তখনো গ্রীষ্মের দিবসগুলি এখনকার মতনই ছিল, এমনই নিদ্রাতুর স্নিগ্ধ নীলবর্ণ," দিবসগুলি শুধু নিদ্রাতুর নয়,আবার নীলবর্ণ! কি উৎকট 'কাব্যি'! "স্বপ্নমুদ্রিত সমুদ্র", "বসন্তের প্রথম নিশ্বাসের মত", "চিরনিদ্রিত স্বপ্নসমুদ্রের উপর দিয়া ভাসিয়া চলিল" ইত্যাদি কবিত্ব বা হেঁয়ালি মুকুলের পাঠকেরা বুঝিতে পারিবে ত?

ভারতী। জ্যৈষ্ঠ। প্রথমে "অশেষ" ইতিশীর্ষক একটি মনোজ্ঞ কবিতা। কবি প্রারম্ভে বলিতেছেন,

"জাগায়ে মাধবীবন চলে গেছে বহুক্ষণ
প্রত্যূষ নবীন,

প্রখর পিপাসা হানি পুষ্পের শিশির টানি
গেছে মধ্য দিন।
মাঠের পশ্চিম শেষে অপরাহ্ণ ম্লান হেসে
হ'ল অবসান,
পর পারে উত্তরিতে পা দিয়েছি তরণীতে
আবার আহ্বান ?"

এ আহ্বান 'মানসী'র। "ভুল-ভাঙ্গা" একটি ক্ষুদ্র গল্প। আখ্যানবস্তু অত্যন্ত অস্বাভাবিক, তথাপি গল্পটি পড়িয়া বোধ হয়, লেখকের গল্প লিখিবার ক্ষমতা আছে। অনুশীলন করিলে তিনি সফল হইবেন। "কেরাণী" একটি নক্সা,—কেরাণী-জীবনের অনেক কথা জানা যায়। "বরোদা" একটি ভ্রমণকাহিনী। "প্রত্যেক মা ছেলেদের জন্য যাহা করিতে পারে" প্রবন্ধটি পঠনীয়। কিন্তু ভাষা অদ্ভুত।

প্রদীপ। জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়। প্রথমেই শ্রীযুক্ত হরিসাধন মুখোপাধ্যায়ের "সেলিনা বেগম" ইত্যভিধেয় একটি গল্প। লেখক গল্পরচনায় অকৃতকার্য্য হইয়াছেন। তাঁহার নায়িকার প্রেম তিনি নিজে ব্যক্ত করিয়া গল্পটির রসভঙ্গ করিয়াছেন ; নায়িকার কথায়, কার্য্যে, সেই প্রেম কোথাও পরিস্ফুট ও পরিব্যক্ত হয় নাই। সুতরাং গল্পটি অবলম্ববিহীন ও শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। কেমন করিয়া প্যারাগ্রাফ্ ফেনাইয়া প্রবন্ধে পরিণত করিতে হয়, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় তাঁহার রচিত "বালি দ্বীপে হিন্দুরাজ্য" প্রবন্ধে তাহার আদর্শ দেখাইয়াছেন। "তাতার প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়" প্রবন্ধটি বেশ হইয়াছে। "গুর্জ্জরকাহিনী" প্রবন্ধে লেখক শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় গুজরাটীদের যে সব কুৎসিত চরিত্র-লক্ষণ প্রকাশ করিতেছেন, তাহা পড়িলে বিস্মিত হইতে হয়। লেখক মাস পাঁচ ছয় বরোদায় থাকিয়া তত্রত্য প্রত্যেক জাতির সম্বন্ধে যেরূপ অভিজ্ঞতার সঞ্চয় করিয়া আসিয়াছেন, সহসা তাহার উপর নির্ভর করিতে আমাদের ভরসা হয় না। এই অভিজ্ঞতা লেখকের পর্য্যবেক্ষণের ফল, না কোনও শ্বেতাঙ্গের পূর্ব্বলব্ধ অভিজ্ঞতার বঙ্গীয় পুনরাবৃত্তি ? লেখক গুজরাটী সাহিত্য সম্বন্ধে অনেক মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার সত্য মিথ্যা নির্ণয় করিবার আমাদের সামর্থ্য নাই। কিন্তু ইহা জানি, গুজরাটী সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধির জন্যে গুজরাটবাসীর যথেষ্ট চেষ্টা বিদ্যমান। শ্রীযুত নারায়ণ হেমচন্দ্র নামধেয় একজন গুজরাটী আত্মত্যাগী স্বদেশী সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধিকল্পে আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন,—তিনি গুজরাটী ভাষার পরিপুষ্টির জন্য অনেক উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা পুস্তকের গুজরাটী অনুবাদ প্রচারিত করিয়াছেন, তাহা আমরা জানি। লেখক গুজরাটে ছিলেন, কিন্তু এ সব তথ্য জানেন না দেখিতেছি। তাঁহার চোখের চশমাখানিতে বিদ্বেষের রঙ্গ কিছু ঘোরাল—স্বদেশী ভ্রমণকারীর রচনায় আমরা সহানুভূতি দেখিবার প্রত্যাশা ক । সহানুভূতির অভাব, জাতীয়-চরিত্র-নির্ণয়ের প্রধান প্রতিবন্ধ, সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের "সোনার ছবি" একটি অতিসুন্দর, আন্তরিকতাপূর্ণ, স্নেহস্নিগ্ধ মধুর কবিতা। ভাষার আড়ম্বর নাই, অনুপ্রাসের কোলাহল নাই, উজ্জ্বল বর্ণের বাহুল্য নাই ; সহজ ভাষায়, শাদা কথায়, আপনার মনে কবি গাহিয়া গিয়াছেন ;

অথচ এই সহজসুন্দর কবিতাটির মধ্যে বাৎসল্যরসের একটি কমনীয় ছবি ধীরে ধীরে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। "গ্রন্থ-সমালোচনায়" সিদ্ধান্তদর্পণ নামক জ্যোতিষশাস্ত্রীয় পুস্তকের পরিচয়প্রসঙ্গে, সমালোচক গ্রন্থপ্রণেতা মহামহোপাধ্যায় সামন্ত শ্রীচন্দ্রশেখর সিংহের জীবনকাহিনীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ভারতবর্ষের এই প্রতিভাশালী জ্যোতিষীর জীবন যেমন অপূর্ব্ব, তেমনই আড়ম্বরহীন। পাঠকগণ পড়িয়া নিশ্চিত মুগ্ধ হইবেন। শ্রীযুক্ত জলধর সেনের "সমাজচিত্র" একটি সুলিখিত সুখপাঠ্য সামাজিক গল্প। এবারকার 'প্রদীপের' শেষ পৃষ্ঠায় "একটি প্রশ্ন" মুদ্রিত হইয়াছে। প্রশ্নটি একটুকরা কাগজে স্বতন্ত্র মুদ্রিত ও প্রদীপের পৃষ্ঠায় সংলগ্ন। প্রশ্নকর্ত্তার জিজ্ঞাসা—লক্ষ্মীধরের বাড়ী কোথায়? কিন্তু বন্ধুজনের অনুগ্রহে পরিশেষে জানিতে পারিলাম, 'প্রদীপের' "প্রশ্ন" একটি বুজরুকী। প্রশ্নের পশ্চাতে একটি অপরূপ কবিতা মুদ্রিত আছে, তাহার নাম "একটি কুকুরের প্রতি।" স্বাক্ষরের স্থলে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় নামক এক ব্যক্তির নাম মুদ্রিত আছে। প্রথম দৃষ্টিতে "প্রশ্ন" ভিন্ন আর কিছু দৃষ্টিগোচর হয় না বটে, কিন্তু একটু চেষ্টা করিয়া দেখিলে নিম্নলিখিত কবিতাটি সহজে পড়া যায়,—

"একটি কুকুরের প্রতি।

"চিরদিন পৃথিবীতে আছিল প্রভু
কুকুর চীৎকার করে চন্দ্রোদয় দেখি,
আজি এ কলির শেষে অপরূপ একি
কুক্কুরের মতিভ্রম বিষম প্রমাদ!
চিরদিন চন্দ্রপানে চাহিয়া চাহিয়া
এতদিনে কুকুর কি হইল পাগল?
ভাসিছে নবীনরবি নভঃ উজলিয়া
তাহে কেন কুকুরের পরাণ বিকল?
নাড়িয়া লাঙ্গুলখানি উর্দ্ধপানে চাহি
ঘেউ ঘেউ ভেউ ভেউ মরে ফুকারিয়া,
তবু ত রবির আলো ম্লান হোল নাহি,
নাহি হোল অন্ধকার জগতের হিয়া!
হে কুকুর ঘোষ কেন আক্রোশ নিষ্ফল
অত উর্দ্ধে পোঁছে কি কণ্ঠ ক্ষীণবল?

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।"

পাতা-ঢাকা ফুল, ঘোমটা-দেওয়া মুখ প্রভৃতির প্রতি কুতূহলী দৃষ্টি সহজে ও আগে আকৃষ্ট হয়, তাই প্রদীপ পাতলা কাগজে ছাপা প্রশ্নের আবরণ দিয়া কবিতাটির আকর্ষণীশক্তির বৃদ্ধি করিয়াছেন। প্রদীপের ও কবিপুঙ্গব প্রভাতের এই অপূর্ব্ব কীর্ত্তি "সাহিত্যে" উদ্ধৃত করিলাম। কবিতাটির 'রবি' ও 'ঘোষ' এই দুইটি শব্দে বেশ বুঝা যায়, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমালোচক কোনও ঘোষ (শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ?) ইহার লক্ষ্য। এই ব্যক্তিগত গালাগালির বিষয়ে বাক্যব্যয় করিয়া আমরা "সাহিত্য" কলঙ্কিত করিব না। সাহিত্যসমাজে 'মোসাহেবির' এমন সুন্দর দৃষ্টান্ত অতি বিরল। চন্দ্রের প্রতি চাহিয়া কুকুর চীৎকার করে কি না, তাহা আমাদের সাহিত্যিক 'চন্দ্র'গণই বলিতে পারেন; এবং এই শ্রেণীর মোসাহেবগণ জীবতত্ত্বের কোন্ অধ্যায়ে নিবিষ্ট, তাহার মীমাংসার ভার শ্রীযুক্ত রামব্রহ্ম সান্যাল মহাশয়ের প্রতি অর্পণ করিয়াই নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। কিন্তু পবিত্র সাহিত্যক্ষেত্রে এইরূপ মোসাহেবি ও মেছুনীর ভাষার যুগপৎ আবির্ভাব দেখিয়া শঙ্কা হয়, আবার কি কবির গান বাঙ্গালা সাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হইবে? ভগবান্ রবি বাবুকে এই 'ভক্তের' হস্ত হইতে রক্ষা করুন।

84.58 10-1900

মহারাজ হর্ষবৰ্দ্ধন।

পুষ্পভূতি (পুষ্যভূতি) বর্ত্তমান থানেশ্বর নগরে বর্দ্ধন রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত করেন। 'স্থাণু' নামে মহাদেবের এক প্রস্তরনির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি এই স্থানে অতি প্রাচীন কালে প্রতিষ্ঠিত ছিল। দেবাদিদেব মহাদেবের প্রিয়তম-আবাসস্থান বলিয়া, ইহা স্থাণ্বীশ্বর নামে পরিচিত হয়। স্থানেশ্বর ও থানেশ্বর নাম তাহা হইতে কালক্রমে প্রচলিত হইয়াছে। স্থাণ্বীশ্বর অতি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ স্থান। ইহা হিন্দুদিগের পরম পবিত্র মহাতীর্থ।

স্থানেশ্বর সরস্বতী নদীর বাম তীরে অবস্থিত। এই পুণ্যসলিলা সরস্বতীর উল্লেখ ঋগ্‌বেদে পাওয়া যায়। পঞ্জাব প্রদেশের অন্তর্গত অম্বালা জেলায় থানেশ্বর অবস্থিত। অম্বালা নগর হইতে ২৫ মাইল দক্ষিণে থানেশ্বরের ভগ্নাবশেষ বর্ত্তমান রহিয়াছে। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের জনসংখ্যায় থানেশ্বরে ৬০০৫ জন অধিবাসী গণিত হয়। তন্মধ্যে দ্বিতৃতীয়াংশ হিন্দু। হিন্দুদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণের সংখ্যাই অধিক। তাঁহারা হিন্দু যাত্রীদিগের প্রদত্ত অর্থের দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। পূর্ব্বকালে স্থানেশ্বরে সূর্য্য ও চন্দ্রগ্রহণের সময় পাঁচ লক্ষেরও অধিক লোক সমবেত হইত। বর্ত্তমান সময়ে তাহার একদশমাংশ যাত্রী স্থানেশ্বরের পবিত্র তীর্থে সমাগত হয় কি না সন্দেহস্থল। স্থানেশ্বরের চতুষ্পার্শ্বে ৩৬০টি তীর্থ বর্ত্তমান ছিল। ১০১১ খৃষ্টাব্দে গজনীর সুবিখ্যাত সুলতান মামুদ থানেশ্বর আক্রমণ ও লুণ্ঠন করেন। হিন্দুধর্ম্মের বিষম বিদ্বেষী মামুদ থানেশ্বরের সমুদয় দেবমন্দির বিনষ্ট ও দেবমূর্ত্তি চূর্ণীকৃত করিয়া, থানেশ্বরের যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করেন। সর্ব্বপ্রধান দেববিগ্রহ 'চক্রস্বামী' গজনী নগরে নীত হইয়া, রাজপথে পদদলিত হইতে থাকে। পথিকগণের পদধূলি দ্বারা হিন্দুর প্রধান দেবমূর্ত্তি নিগৃহীত ও অপমানিত হইয়া, সুলতান মামুদের হিন্দুধর্ম্মবিদ্বেষের পরিচয় দিতে থাকে। এক দেবমন্দির বিধ্বস্ত হইলে, তন্মধ্য হইতে এক প্রকাণ্ড ও বহুমূল্য প্রস্তরমণি আহরিত হয়। লুক্কায়িত ধনরত্নের সংগ্রহের আশায় সুলতান মামুদ যাবতীয় দেবমন্দির ও তীর্থস্থল বিনষ্ট ও বিধ্বস্ত করিবার আদেশ প্রদান করেন। এইরূপে মহাতীর্থ স্থানেশ্বরের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সাধিত হয়। সুলতান মামুদ জয়োল্লাসে ও পুলকিতচিত্তে গজনীতে প্রত্যাবৃত্ত

হন। ধ্বংসাবশিষ্ট স্থানেশ্বর হিন্দুবিদ্বেষী সম্রাট আরঙ্গীবের হস্তে পুনরায় লাঞ্ছিত ও নিপীড়িত হয়। এই নিমিত্ত হিন্দুর প্রধান তীর্থ স্থানেশ্বরে প্রাচীন দেবমন্দির ও দেবমূর্ত্তির চিহ্ন পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায় না। কতিপয় বৌদ্ধ ও জৈন মূর্ত্তির ভগ্নাবশেষ স্থানেশ্বরের বিভিন্ন স্থানে আবিষ্কৃত হইয়া,স্থানেশ্বরের প্রাচীনত্ব বিঘোষিত করিতেছে।

স্থানেশ্বরের দক্ষিণাংশে সরস্বতী নদীর গর্ভে এক প্রকাণ্ড সরোবর বিদ্যমান আছে। এই সরোবর অতি পবিত্র ও প্রাচীন। পূর্ব্ব-পশ্চিমে ইহা ৩৫৪৬ ফুট দীর্ঘ ও উত্তর দক্ষিণে ১৯০০ ফুট প্রশস্ত। সরোবরের মধ্যভাগে এক দ্বীপ বর্ত্তমান আছে। এই দ্বীপের চতুষ্পার্শ্বে সোপানাবলী বিদ্যমান থাকিয়া, সরোবরের তটপ্রদেশ হইতে যাত্রীদিগের যাতায়াত নির্ব্বাহিত করিত। পশ্চিমদিগের সোপান বর্ত্তমান আছে। অপর তিন পার্শ্বের সোপানাবলী ভগ্নস্তূপে পরিণত হইয়াছে। উক্ত দ্বীপের মধ্যভাগে "চন্দ্রকূপ" নামে পবিত্র কূপের চিহ্ন বিদ্যমান আছে। প্রবাদ আছে যে, চন্দ্রগ্রহণের সময় এই কূপের জল দুগ্ধে পরিণত হইয়া চতুর্দ্দিকে উচ্ছ্বসিত হইত। চন্দ্রগ্রহণের কালে স্থানেশ্বরের পবিত্র সরোবরে হিন্দুদিগের সর্ব্বতীর্থ সম্মিলিত হইত। সরোবরের তীর হইতে প্রস্তরনির্ম্মিত চন্দ্রকূপে যাতায়াতের পথ বিনষ্ট হইয়াছে। মোগলাধিকারে এই চন্দ্রকূপ সীসক দ্রাবিত করিয়া বদ্ধ করা হয়। মহারাষ্ট্রীয়-জাতির প্রাধান্যলাভের সময়ে গোলা বারুদ প্রয়োগ পূর্ব্বক চন্দ্রকূপের চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত করা হইয়াছে।

ঋগ্বেদে স্থানেশ্বরের পবিত্র সরোবর 'সর্য্যনাবৎ' নামে উল্লিখিত হইয়াছে। প্রবাদ আছে যে, মহর্ষি দধীচি জীবিতকালে অসুর জাতির সবিশেষ ভীতিস্থল ছিলেন। দধীচির মৃত্যুর পর অসুরগণ মস্তক উত্তোলন করে, এবং দেবতাদিগের প্রতি নানারূপে উপদ্রব করিতে থাকে। মৃত্যুর পর অসুরদিগের দ্বারা দধীচির মস্তক অপহৃত হয়। বিদ্যাশিক্ষার উদ্দেশ্যে আগমন করিয়া যুগলরূপী অশ্বিনীকুমারেরা দধীচির মস্তকবিহীন মৃতদেহ এই পবিত্র সরোবরের তীরে দেখিতে পান। শীর্ষহীন মৃতদেহে অশ্বিনীকুমারেরা অশ্বশির সংলগ্ন করিয়া দেন। চিরশত্রু অসুরজাতির উপদ্রবে দেবগণ অস্থির হইয়া উঠেন। দেবরাজ ইন্দ্রের আদেশে দধীচির মৃতদেহের অনুসন্ধান হয়। পূর্ব্বোক্ত 'সর্য্যনাবৎ' সরোবরের তীরে অশ্বমুখ দধীচির মৃতদেহ আহরিত হয়। মহর্ষি দধীচির অস্থির দ্বারা দেবরাজ ইন্দ্রের প্রসিদ্ধ অস্ত্র 'বজ্র' নির্ম্মিত হয়। এই বজ্রের

আঘাতে দানবরাজ বৃত্রাসুর এই সরোবরের তটে দেবরাজের হস্তে নিহত হন। *

এই সরোবরের তীরে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা তপস্যা করিয়া সিদ্ধি লাভ করেন। তদবধি ইহা 'ব্রহ্মসর' নামে পরিচিত হয়। মহর্ষি পরশুরাম ক্ষত্রিয়জাতির শোণিতপাত করিয়া যে পঞ্চহ্রদ নির্ম্মিত করেন, তাহা 'স্যমন্তপঞ্চক' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। এই ব্রহ্মসরে স্নান করিয়া, পরশুরাম ক্ষত্রিয়জাতির উন্মূলনজনিত পাপ হইতে বিমুক্ত হন। তদবধি ব্রহ্মসর 'রামহ্রদ' নামে পরিচিত হয়। এই সরোবরের তীরে মহারাজ পুরুরবা আপনার প্রণয়িনী উর্ব্বশীকে পুনরায় প্রাপ্ত হন। এই ঘটনা অবলম্বনে, মহাকবি কালিদাসের 'বিক্রমোর্ব্বশী' নাটিকা রচিত হয়। এই সরোবরের তীরে দেবশ্রেষ্ঠ বিষ্ণু ভীষ্মের প্রতি কোন কারণে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া, সুদর্শন চক্রের দ্বারা তাঁহাকে বধ করিতে উদ্যত হন। তদবধি ইহা 'চক্রতীর্থ' নামে বিখ্যাত হয়। পুরুরবার বংশধর চন্দ্রবংশীয় কুরুরাজ এই সরোবরের তীরে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন থাকেন, এবং তপস্যাবলে মুক্তি লাভ করেন। তদবধি ইহার চতুর্দ্দিকস্থ প্রদেশ 'ধর্ম্মক্ষেত্র' ও 'কুরুক্ষেত্র' নামে বিখ্যাতি লাভ করে। কুরুর বংশধর শান্তনু কৌরব ও পাণ্ডবদিগের পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া মহাভারতে উল্লিখিত হইয়াছেন। এই শান্তনু ও দেবাপির কথোপকথন ঋগ্‌বেদের দশম মণ্ডলে (১০।৯৮) বর্ণিত হইয়াছে। ঋক্‌সংহিতা লিখিত ও পুস্তকাকারে পরিণত হইবার পূর্ব্বে কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই কুরুক্ষেত্রের ভীষণ যুদ্ধকাণ্ডে ভারতীয় বিভিন্ন প্রদেশের ক্ষত্রিয় নরপতিগণ নির্ম্মূলপ্রায় হন। কুরুপাণ্ডবগণের এই ঐতিহাসিক যুদ্ধঘটনা বিস্তারিতভাবে 'মহাভারতে' চিত্রিত হইয়াছে। মহাভারতের একচতুর্থাংশে এই ঘটনার আমূল বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বরাহমিহির ও 'রাজতরঙ্গিণীর' মতে, খৃষ্টের আবির্ভাবের ২৪৪৮ বৎসর পূর্ব্বে কুরুক্ষেত্রের ঐতিহাসিক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। কুরু ও পঞ্চাল দেশে ভারতীয় ধর্ম্ম,সাহিত্য ও সভ্যতার সূত্রপাত হয়। কুরু ও পাঞ্চাল জাতির দ্বারা তাহা ভারতবর্ষে প্রসারিত হয়। কুরু ও পাঞ্চাল জাতির অভ্যুদয়কালে ঋক্ ও সামবেদসংহিতার মন্ত্রগুলি একত্র সংগৃহীত হইয়া, বর্ত্তমান আকারে পরিণত হয়। ঐতরেয় ও শাংখ্যায়ন নামে দুইখানি ঋগ্‌বেদীয় অতি প্রাচীন ব্রাহ্মণগ্রন্থ সঙ্কলিত হয়।

---

* এই পৌরাণিক আখ্যায়িকা অবলম্বনে বঙ্গের বিখ্যাত কবি শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'বৃত্রসংহার' নামক বাঙ্গলা মহাকাব্য রচনা করিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছেন।

নৈমিষারণ্যে যে মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, শাংখ্যায়ন ব্রাহ্মণে ও মহাভারতে তাহার বিস্তারিত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। সামবেদীয় তাণ্ড্য ব্রাহ্মণে কুরুক্ষেত্রে অনুষ্ঠেয় নানাবিধ যাগযজ্ঞের বিবরণ সবিশেষ বর্ণিত হইয়াছে। কুরু ও পাঞ্চাল জাতির অধঃপতনের পর কাশী, কোশল ও বিদেহ দেশে তিনটি স্বতন্ত্র ও মহাপরাক্রান্ত রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তাণ্ড্য ব্রাহ্মণে বিদেহ দেশের নামোল্লেখ দেখা যায়। কোশল ও বিদেহ জাতির অভ্যুদয়সময়ে কৃষ্ণ ও শুক্ল যজুর্ব্বেদসংহিতা সংগৃহীত হইয়া পুস্তকের আকারে পরিণত হয়। বিদেহ দেশে উপনিষদ ও দর্শনশাস্ত্রের চর্চ্চা আরব্ধ হইয়া, কালক্রমে সমস্ত জগৎকে আলোকিত করিতে থাকে। কুরুক্ষেত্র ভারতীয় ধর্ম্ম, সাহিত্য ও সভ্যতার প্রসূতিভূমি।

সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীর মধ্যবর্ত্তী প্রদেশকে ভগবান মনু স্বীয় সংহিতায় 'ব্রহ্মাবর্ত্ত' নামে উল্লেখ করিয়াছেন। এই ব্রহ্মাবর্ত্তে হিন্দু ধর্ম্ম, সাহিত্য, সভ্যতা, শিল্প, বিজ্ঞান, গণিত ও জ্যোতিষ সর্ব্বপ্রথম অঙ্কুরিত হইয়া, কালক্রমে সমগ্র ভারতবর্ষে পরিব্যাপ্ত হয়। মনুর মতে, কুরুক্ষেত্র ব্রহ্মর্ষিদেশের অন্তর্গত।

> "সরস্বতী-দৃষদ্বত্যোর্দেবনদ্যোর্যদন্তরম্।
> তং দেবনির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে ॥ ১৭ ॥
> কুরুক্ষেত্রঞ্চ মৎস্যাশ্চ পঞ্চালাঃ শূরসেনকাঃ।
> এষ ব্রহ্মর্ষিদেশো বৈ-ব্রহ্মাবর্ত্তাদনন্তরং ॥ ১৯ ॥
> এতদ্দেশপ্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ।
> স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরণ্ পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবাঃ" ॥ ২০ ॥
>
> —মনুসংহিতা, দ্বিতীয় অধ্যায়।

> "দক্ষিণেন সরস্বত্যা দৃষদ্বত্যুত্তরেণ চ।
> যে বসন্তি কুরুক্ষেত্রে তে বসন্তি ত্রিবিষ্টপে ॥"
>
> —মহাভারত, বন পর্ব্ব।

'মহাভারত' ও 'বামনপুরাণে' স্থানেশ্বর ও কুরুক্ষেত্রের মাহাত্ম্য সবিশেষ বর্ণিত হইয়াছে। কুরুক্ষেত্রের যাবতীয় ৩৬০ তীর্থের বিবরণ 'কুরুক্ষেত্রপ্রদীপ' নামক একখানি গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। মহেশ মিশ্রের পুত্র বনমালী মিশ্রের দ্বারা এই গ্রন্থ রচিত হয়। বনমালী আপনাকে ভট্টোজী দীক্ষিতের শিষ্য বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে কান্যকুব্জের রাজসভায় ভট্টোজী দীক্ষিত ও শ্রীহর্ষ বিদ্যমান ছিলেন। ভট্টোজী দীক্ষিত 'সিদ্ধান্তকৌমুদী', এবং শ্রীহর্ষ 'নৈষধচরিত' একই সময়ে রচনা করেন। অতএব ভট্টোজী দীক্ষিতের শিষ্য বনমালী মিশ্র খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে

'কুরুক্ষেত্রপ্রদীপ' সংগৃহীত করেন। বনমালী গ্রন্থারম্ভে কৃষ্ণদত্ত নামে পরিচয় দিয়াছেন।

"বামনাদিপুরাণেভ্য ইতিহাসাদিতস্তথা।
কুরুক্ষেত্রস্য মাহাত্ম্য-সংগ্রহঃ শিষ্যসম্মতঃ॥
কৃষ্ণদত্তেন মিশ্রেণ যথাবুদ্ধ্যনুসারতঃ।
ক্রিয়তেঽত্যল্পবিস্তারো ভূষণীয়ো দ্বিজাতিভিঃ॥"
—কুরুক্ষেত্রপ্রদীপ।

পূর্ব্বোক্ত সরোবরের পূর্ব্বোত্তর ভাগে 'সুনেৎসর' নামে ক্ষুদ্রতর এক জলাশয় অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। ঋগ্‌বেদীয় 'সর্য্যনাবৎ' শব্দ কালক্রমে 'সুনেৎ' শব্দে পরিণত হইয়া থাকিবে। এই উভয় জলাশয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থান কালক্রমে মৃত্তিকাপূর্ণ হইয়া, পবিত্র সরোবরকে দুই পৃথক্ জলাশয়ে বিভক্ত করিয়া থাকিবে। হিন্দুর মহাতীর্থ কুরুক্ষেত্র এক্ষণে মহাশ্মশানে পরিণত হইয়াছে। কুরুক্ষেত্রের মধ্যভাগে সরস্বতী নদীর বাম তীরে স্থানেশ্বর অবস্থিত। স্থানেশ্বর এক্ষণে সামান্য গণ্ডগ্রামে পরিণত হইয়াছে। অম্বালার সেনানিবাসের ২৫ মাইল দূরে ও সেরশাহের নির্ম্মিত বিখ্যাত রাজবর্ত্মের পশ্চিম ভাগে স্থানেশ্বরের ভগ্নাবশেষ অবস্থিত থাকিয়া, তাহার অতীত গৌরব মাহাত্ম্যের অনন্ত কাহিনী পথিকের স্মৃতিপথে উদিত করিতেছে।

বিখ্যাত গ্রীক ভূগোলবিৎ টলেমি ১৪০—১৬০ খৃষ্টাব্দে স্বরচিত ভূগোল ও জ্যোতিষগ্রন্থের রচনা করেন। তিনি 'বটন-কৈসর' নামে স্থানেশ্বরের উল্লেখ করিয়াছেন। ৫০৪—৫৮৭ খৃষ্টাব্দে, বরাহমিহির উজ্জয়িনী নগরে বিদ্যমান ছিলেন। স্বপ্রণীত 'বৃহৎসংহিতায়' তিনি স্থানেশ্বরের পবিত্রতার উল্লেখ করিয়াছেন। গজনীর বিখ্যাত সুলতান মামুদের সভাসদ আবুরিহান আলবিরুণী বরাহমিহিরের পূর্ব্বোক্ত উক্তি স্বরচিত ভারতবর্ষের বিবরণে খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে সংগৃহীত করিয়াছেন।

৬৩৫ খৃষ্টাব্দে সুবিখ্যাত চৈনিক পর্য্যটক হিয়াংসাঙ মথুরা হইতে স্থানেশ্বরে উপনীত হন। তখন স্থানেশ্বর কনোজের মহারাজ হর্ষবর্দ্ধনের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। রাজধানীর পরিধি চারি মাইল ও রাজ্যের আয়তন ১১৬৭ মাইল (৭০০০ লি) বলিয়া হিয়াংসাঙ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রের আয়তন বিশ ক্রোশ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সম্রাট আকবরের সময়ে ধর্ম্মক্ষেত্রের আয়তন দ্বিগুণিত হয়। আবুল ফাজেলের মতে কুরুক্ষেত্র ৪০ ক্রোশ স্থান ব্যাপিয়া অবস্থিত।

মহারাজ পুষ্পভূতি কর্ত্তৃক স্থানেশ্বরে বর্দ্ধন নামে বাইশ ক্ষত্রিয়বংশের আধি-

পত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। স্থাণ্বীশ্বর বা স্থানেশ্বরের প্রাচীন নাম শ্রীকণ্ঠ। শ্রীকণ্ঠ নামক ভীষণকায় সর্পের অবস্থিতি হেতু, সুপ্রাচীন স্থানেশ্বর শ্রীকণ্ঠ নামে পরিচিত হয়। মহারাজ পুষ্পভূতি পরম শৈব ছিলেন। তাঁহার গুরুর নাম ভৈরবাচার্য্য। ভৈরবাচার্য্য দক্ষিণাপথ হইতে আগমন পূর্ব্বক, রাজা পুষ্পভূতিকে তান্ত্রিক ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। একদা কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী নিশিতে গুরু ভৈরবাচার্য্য বিদ্যাধরত্ব-লাভের কামনায় মহাশ্মশানে মন্ত্রসাধনে প্রবৃত্ত হন। রাজা পুষ্পভূতি তাঁহার রক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত হন।

অকস্মাৎ সেই শ্মশানভূমি বিদীর্ণ করিয়া এক ভীষণকায় পুরুষ উত্থিত হয়, এবং আপনাকে শ্রীকণ্ঠ নাগ নামে পরিচিত করে। শ্রীকণ্ঠ নাগ পূজার্চ্চনার অভাবে একান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া, ভৈরবাচার্য্য ও রাজা পুষ্পভূতিকে সংহার করিতে উদ্যত হয়। পুষ্পভূতি অসমসাহসিকতাসহকারে শ্রীকণ্ঠের সহিত বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। রাজার সহিত বাহুযুদ্ধে শ্রীকণ্ঠ পরাজিত হয়। নাগরাজের পরাজয়ে, লক্ষ্মীদেবী পরিতুষ্ট হইয়া ভৈরবাচার্য্যকে বিদ্যাধরত্ব প্রদান করেন। রাজা পুষ্পভূতির বংশে হর্ষনামে মহারাজচক্রবর্ত্তী জন্ম গ্রহণ করিবেন, নরপতিকে এই বরদান করেন।

মহারাজ হর্ষবর্দ্ধনের সভাসদ বাণভট্টের 'হর্ষচরিতে' পুষ্পভূতির প্রাগুক্ত আখ্যায়িকা বর্ণিত রহিয়াছে। এই পুষ্পভূতির বংশে মহারাজ নরবর্দ্ধন জন্মগ্রহণ করেন। নরবর্দ্ধন ও তাঁহার অধস্তন বংশধরেরা সূর্য্যদেবের উপাসক ছিলেন। বজ্রিণী দেবীর গর্ভে নরবর্দ্ধনের পুত্র রাজ্যবর্দ্ধনের জন্ম হয়। মহারাজ রাজ্যবর্দ্ধনের মহিষীর নাম অপ্সরা দেবী। রাজ্যবর্দ্ধনের পুত্রের নাম আদিত্যবর্দ্ধন। আদিত্যবর্দ্ধন মগধের মহারাজ দামোদর গুপ্তের তনয়া মহাসেনগুপ্তার পাণিগ্রহণ করেন। দামোদর গুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র মহাসেন গুপ্ত মগধে রাজত্ব করেন। মহাসেনগুপ্তার গর্ভে আদিত্যবর্দ্ধনের পুত্র প্রভাকরবর্দ্ধনের জন্ম হয়। প্রভাকরবর্দ্ধনের পত্নীর নাম যশোমতী দেবী। যশোমতীর গর্ভে মহারাজ প্রভাকরবর্দ্ধনের দুই পুত্র ও এক কন্যা জন্মে। এই দুই পুত্রের মধ্যে রাজ্যবর্দ্ধন জ্যেষ্ঠ ও হর্ষবর্দ্ধন কনিষ্ঠ। তাঁহাদের ভগিনী রাজ্যশ্রী কনোজের রাজকুমার গ্রহবর্ম্মনের সহিত পরিণীতা হন। প্রভাকরবর্দ্ধন, তাঁহার পত্নী ও সন্ততির নাম বাণভট্টের 'হর্ষচরিতে' প্রদত্ত হইয়াছে। হর্ষচরিতে প্রভাকরবর্দ্ধন সূর্য্যদেবের উপাসক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। প্রভাকরবর্দ্ধনের পূর্ব্বতন তিন জন নরপতির নাম হর্ষচরিতে পাওয়া যায় না।

মহারাজ প্রভাকরবর্দ্ধনের সময়ে স্থানেশ্বর রাজ্যের অধিকার চতুর্দ্দিকে প্রসারিত হয়। হর্ষচরিতের মতে, প্রভাকরবর্দ্ধন হূণ, গান্ধার, সিন্ধু, লাট, গুর্জ্জর ও মালব দেশের নরপতিগণকে পরাজিত করিয়া, আপনার অধিকার প্রসারিত করেন। লাট ও গুর্জ্জররাজের পরাজয় দ্বারা প্রভাকরবর্দ্ধনের আধিপত্য সিন্ধু, ভরৌচ ও রাজপুতানা পর্য্যন্ত কিয়ৎকালের জন্য বিস্তারিত হয়। হিয়াংসাঙের স্বরচিত ভ্রমণবৃত্তান্ত দৃষ্টে কানিংহাম সাহেব অনুমান করিয়াছেন, পঞ্জাবের দক্ষিণ ভাগ ও রাজপুতানার পূর্ব্বভাগ পর্য্যন্ত স্থানেশ্বর রাজ্যের অধিকারভুক্ত ছিল। হিয়াংসাঙ্ ৬৩৫ খৃষ্টাব্দে স্থানেশ্বরের আয়তন ১১৬৭ মাইল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

পূর্ব্বোক্ত বিভিন্নদেশীয় নৃপতিগণ সম্পূর্ণরূপে প্রভাকরবর্দ্ধনের করায়ত্ত ও পদানত হন নাই। বাণভট্টের হর্ষচরিত হইতেই তাহা স্পষ্টাক্ষরে উপলব্ধ হয়। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে প্রভাকরবর্দ্ধন স্বকীয় জ্যেষ্ঠপুত্র রাজ্যবর্দ্ধনকে হূণজাতির বিদ্রোহদমনার্থ উত্তর দিকে প্রেরণ করেন। হর্ষবর্দ্ধন হিমালয় পর্ব্বতের পাদমূল পর্য্যন্ত সসৈন্যে জ্যেষ্ঠভ্রাতার অনুগমন করেন। জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে বিদায় দিয়া, হর্ষবর্দ্ধন মৃগয়া উপলক্ষে উক্ত পার্ব্বত্য প্রদেশে কিছু কাল অবস্থিতি করেন। এই সময়ে কুরঙ্গক নামে বার্ত্তাবহ স্থানেশ্বর হইতে হর্ষবর্দ্ধনের সমীপে উপনীত হয়। তাহার মুখে হর্ষবর্দ্ধন পিতার প্রবল দাহজ্বরের বিষয় অবগত হইয়া, ব্যাকুলচিত্তে জ্যেষ্ঠভ্রাতার নিকটে এই অশুভ সংবাদ প্রেরণ পূর্ব্বক দ্রুতগতি রাজধানী স্থানেশ্বরে প্রত্যাগত হন। তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তনের পর মহারাজ প্রভাকরবর্দ্ধন মানবলীলা সংবরণ করেন। তাঁহার মাতা পতি-বিয়োগের অব্যবহিত পূর্ব্বে অনলে প্রবেশ পূর্ব্বক প্রাণ বিসর্জ্জন করেন। যুগপৎ পিতামাতার বিয়োগে হর্ষ বর্দ্ধন অত্যন্ত শোকাকুল হইয়া উঠেন, এবং জ্যেষ্ঠভ্রাতার প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষায় উদ্বিগ্নচিত্তে কালযাপন করিতে থাকেন।

প্রভাকরবর্দ্ধনের মৃত্যুসংবাদ প্রচারিত হইবামাত্র মালবের অধীশ্বর দেবগুপ্ত স্বাধীনতা অবলম্বন পূর্ব্বক বিদ্রোহী হইয়া উঠেন। দুর্বৃত্ত মালবরাজ অবিলম্বে কান্যকুব্জ আক্রমণ করিয়া মৌখরীবর্ম্মনবংশীয় রাজা গ্রহবর্ম্মার প্রাণ সংহার করেন। মালবপতি কান্যকুব্জরাজের মহিষী রাজ্যশ্রীকে কারারুদ্ধা করিয়া, কান্যকুব্জের সিংহাসন বলপূর্ব্বক অধিকার করেন। জয়োল্লাসে উন্মত্ত হইয়া, তিনি স্থানেশ্বর আক্রমণের আয়োজন করিতে থাকেন। *

রাজ্যশ্রী স্থানেশ্বরে এই সংবাদ প্রেরণ করেন। সংবাদকের নিকট এই বার্ত্তা অবগত হইয়া, শোকবিহ্বল রাজ্যবর্দ্ধন অবিলম্বে মালবরাজের বিরুদ্ধে সসৈন্যে কান্যকুব্জ অভিমুখে প্রস্থান করেন। মালবরাজ দেবগুপ্ত মহারাজ রাজ্যবর্দ্ধনের সহিত রণে পরাজিত ও নিহত হন। মালবপতির মিত্র গৌড়েশ্বর নরেন্দ্র গুপ্ত মহারাজ রাজ্যবর্দ্ধনের শিবিরে বন্ধুভাবে আগমন করিয়া, অতি-ঘৃণিত জম্বুকবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক রাজ্যবর্দ্ধনকে নিহত করেন। রাজ্যবর্দ্ধনকে বিশ্বাসঘাতকতাসহকারে নিহত করিয়া, গৌড়েশ্বর মালবরাজের মৃত্যুর প্রতি-শোধ লইয়া স্বরাজ্য অভিমুখে পলায়ন করেন। রাজ্যবর্দ্ধনের মৃত্যুসংবাদশ্রবণে হর্ষবর্দ্ধন শোকে একান্ত বিহ্বল হন। অবিলম্বে তিনি গৌড়দেশ অভিমুখে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে রাজ্যবর্দ্ধনের বিশ্বস্ত সহচর ভাণ্ডী সসৈন্যে হর্ষবর্দ্ধনের সহিত সম্মিলিত হন, এবং মালব হইতে অপহৃত দ্রব্যসামগ্রী উপহার দেন। রাজমাতা যশোমতীর ভ্রাতুষ্পুত্র ভাণ্ডী রাজ্যবর্দ্ধন ও হর্ষবর্দ্ধনের সহিত আশৈশব (অষ্টম বৎসর বয়সের সময় হইতে) লালিত পালিত হইয়া,তাঁহাদের উভয়ের অতি বিশ্বস্ত বন্ধু হইয়াছিলেন। ভাণ্ডী ভিন্ন, বৈদ্যপুত্র রসায়ন, মাধব গুপ্ত ও কুমার গুপ্ত রাজকুমারদ্বয়ের প্রধান সহচর ছিলেন, 'হর্ষচরিত' হইতে ইহা জানা যাইতেছে।

ভাণ্ডীর নিকট হর্ষবর্দ্ধন গৌড়েশ্বরের পলায়নবার্ত্তার বিবরণ অবগত হন। পলায়িত গৌড়েশ্বরের অনুসরণে অগ্রসর হইতে ভাণ্ডীকে আদেশ দিয়া হর্ষবর্দ্ধন স্বীয় ভগিনীর অনুসন্ধানে বিন্ধ্যারণ্য অভিমুখে যাত্রা করেন। ভাণ্ডীর নিকট তিনি রাজ্যশ্রীর বিন্ধ্যারণ্যে পলায়নের সংবাদ প্রাপ্ত হন। বৌদ্ধযতী দিবাকর মিত্রের আশ্রয়ে হর্ষবর্দ্ধন আশ্রয় গ্রহণ করেন। তথায় অবস্থানকালে হর্ষবর্দ্ধন এক রূপবতী রমণীর চিতানলে প্রবেশোদ্যোগের সংবাদ পাইয়া উদ্বিগ্নমনে চিতার সমীপে উপনীত হন। হর্ষবর্দ্ধন রাজ্যশ্রীকে আসন্নমৃত্যুর গ্রাস হইতে হইতে রক্ষা করিয়া, তাঁহাকে দিবাকর মিত্রের আশ্রমে আনয়ন করেন। এই

মধুবনের শাসনলিপিতে দেবগুপ্তের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। পশ্চাৎ এই তাম্রশাসনের বিবরণ প্রদত্ত হইবে।

" পিশাচানামিব নীচাত্মানাং চরিতানি ছিদ্রপ্রহারীণি প্রায়শো ভবন্তি। যতো যস্মিন্নহন্ত-বনিপতিরুপরতঃ ইত্যভূদ্ বার্ত্তা তস্মিন্নেব দেবো গ্রহবর্ম্মা দুরাত্মনা মালবরাজেন জীবলোক-মাত্মনঃ সুকৃতেন সহ ত্যাজিতঃ। ভর্তৃদারিকাপি রাজ্যশ্রীঃ কালায়সনিগড়যুগলচুম্বিতচরণা চৌরাঙ্গনেব সংযতা কান্যকুব্জে কারায়াং নিক্ষিপ্তা। কিংবদন্তী চ যথা কিলানায়কং সাধনং মত্বা জিঘৃক্ষুঃ সুদুর্ম্মতিরেতামপি ভুবমাজিগমিষতীতি।"—হর্ষচরিত।

বৌদ্ধমতী রাজ্যশ্রীর পতি গ্রহবর্ম্মণের পরম বন্ধু বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন। হর্ষবর্দ্ধনের সহিত গমন পূর্ব্বক সংসারাশ্রমে পুনঃপ্রবিষ্টা হইতে রাজ্যশ্রী অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। তদনন্তর তিনি উক্ত বৌদ্ধাচার্য্যের আশ্রমে যোগিনীর বেশে সংযতচিত্তে অবস্থিতি করিতে থাকেন। হর্ষবর্দ্ধন গঙ্গাতীরে স্বীয় সেনার সহিত সম্মিলিত হন।

বিন্ধ্যারণ্যে ভগিনী রাজ্যশ্রীর সহিত সম্মিলনের সহিত 'হর্ষচরিত' সমাপ্ত হইয়াছে। ইহার সপ্তম উচ্ছ্বাসে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের (বর্ত্তমান গৌহাটীর) কুমার ভাস্করবর্ম্মার পরাজয়বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। বাণভট্টের 'হর্ষচরিতে' সমসাময়িক বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়া, ইহার ঐতিহাসিক মূল্য সবিশেষ বৃদ্ধি করিয়াছে। হর্ষবর্দ্ধনের প্রদত্ত তাম্রশাসনাদি ও হিয়াংসাঙের ভ্রমণবৃত্তান্ত হইতে 'হর্ষচরিতে'র বিবরণের সত্যতা নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রতিপাদিত হইতেছে। 'হর্ষ-চরিত' অসম্পূর্ণ গ্রন্থ। ইহাতে হর্ষবর্দ্ধনের বিস্তারিত জীবনী লিখিত হয় নাই। হর্ষবর্দ্ধনের রাজত্বের আরম্ভ পর্য্যন্ত ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

এই হর্ষবর্দ্ধন বর্দ্ধনবংশের সর্ব্বপ্রধান নরপতি। এই হর্ষবর্দ্ধনের অসম্পূর্ণ জীবনী বাণভট্ট হর্ষচরিতে লিপিবদ্ধ করেন। স্বীয় রাজ্যারম্ভকাল হইতে মহারাজ হর্ষবর্দ্ধন যে অব্দ প্রচলিত করেন, তাহা 'হর্ষাব্দ' নামে উত্তর ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে প্রচলিত হয়। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে আবু রিহান আলবিরুনী এই হর্ষাব্দ উত্তর ভারতে প্রবহমান দর্শন করেন। হর্ষবর্দ্ধন ৬০৬ খৃষ্টাব্দে স্থানেশ্বরের সিংহাসনে আরূঢ় হন। গ্রহবর্ম্মার মৃত্যুর পর হর্ষবর্দ্ধনের রাজধানী কান্যকুব্জে নীত হয়। স্থানেশ্বরের শাসনভার প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তার হস্তে সমর্পিত হয়। সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তে মহারাজ হর্ষবর্দ্ধনের আধিপত্য বিস্তারিত হয়। ঠকুরীবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজ অংশুবর্ম্মন হর্ষবর্দ্ধনের করদরূপে নেপাল শাসন করিতে থাকেন। এই ঠকুরীবংশের আধিপত্যপ্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে নেপালে গুপ্তাব্দের পরিবর্ত্তে হর্ষাব্দ প্রচলিত হয়। 'নেপালের পুরাতত্ত্ব' প্রবন্ধে তাহা বিস্তারিতভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে।

হর্ষবর্দ্ধন ৬০৬ খৃষ্টাব্দে সম্রাটের পদে অভিষিক্ত হন। তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা রাজ্যবর্দ্ধন কয়েক মাসমাত্র নামে রাজত্ব করেন। ইহা হইতে অনুমিত হইতে পারে, ৬০৫ খৃষ্টাব্দে মহারাজ প্রভাকরবর্দ্ধনের রাজত্বের অবসান হয়। প্রভাকর-বর্দ্ধনের সময়ে কান্যকুব্জ স্থানেশ্বরের পদানত হয় নাই। অবন্তীবর্ম্মণ ও গ্রহবর্ম্মণ স্বাধীনভাবে কান্যকুব্জে রাজত্ব করিতেছিলেন। বাণভট্টের হর্ষচরিত

হইতে ইহা জানা যায়। যে সময়ে বর্দ্ধনবংশ স্থানেশ্বরে রাজত্ব করিতেছিলেন, সেই সময়ে মৌখরী বর্ম্মন বংশ স্বাধীনভাবে কান্যকুব্জ শাসন করিতেন, হর্ষচরিত হইতে ইহাও স্পষ্টাক্ষরে জানা যায়। হর্ষবর্দ্ধনই স্থানেশ্বরের ও কান্যকুব্জের শাসনদণ্ড সম্মিলিত করিয়া, স্বীয় ভাবী সাম্রাজ্যের সূত্রপাত করেন। লাসেনের মতে, ৫৮০ খৃষ্টাব্দে কান্যকুব্জে বর্দ্ধনবংশের রাজত্ব আরব্ধ হয়।

হর্ষবর্দ্ধন হইতে তাঁহার বৃদ্ধপ্রপিতামহ নরবর্দ্ধন তিন পুরুষ অন্তর। এই নরবর্দ্ধন হইতে হর্ষবর্দ্ধন পর্য্যন্ত ধারাবাহিক বংশাবলী মধুবনের তাম্রশাসন হইতে পাওয়া যাইতেছে। পাঁচ পুরুষে এক শতাব্দী গণনা করিয়া, স্থানেশ্বরের বর্দ্ধনরাজবংশের সময় অনুমানবলে অবধারিত হইতে পারে।

(স্থানেশ্বর)	(কান্যকুব্জ)
নরবর্দ্ধন (৫২৫—৪৫ খৃষ্টাব্দ)	ঈশানবর্ম্মণ
(১) রাজ্যবর্দ্ধন (৫৪৫—৬৫ খৃঃ)	সর্ব্ববর্ম্মণ
আদিত্যবর্দ্ধন (৫৬৫—৮৫ খৃঃ)	সুস্থিতবর্ম্মণ
প্রভাকরবর্দ্ধন (৫৮৫—৬০৫ খৃঃ)	অবন্তীবর্ম্মণ
(২) রাজ্যবর্দ্ধন (৬০৫ খৃঃ) হর্ষবর্দ্ধন (৬০৬—৫০ খৃঃ) রাজ্যশ্রী +	গ্রহবর্ম্মণ
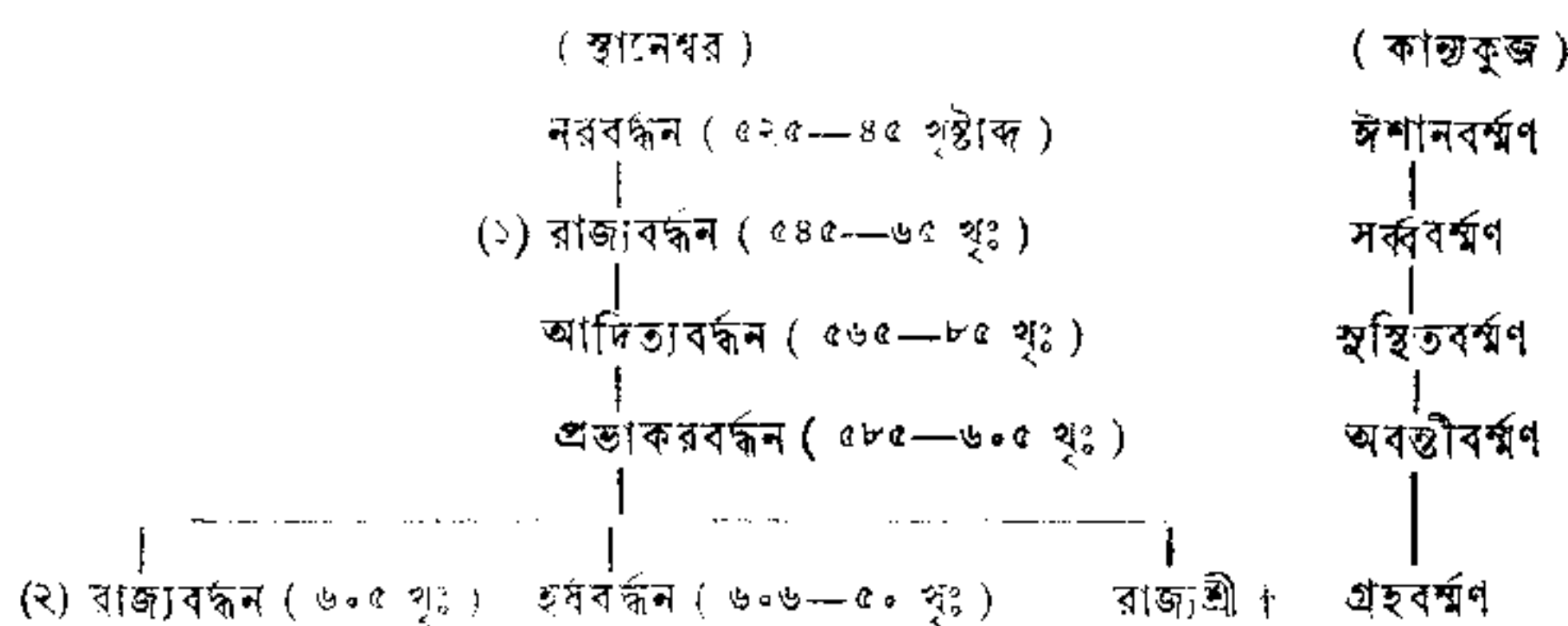
১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ভূমিকর্ষণ করিতে করিতে এক কৃষক মধুবন নামক গ্রামে একখানি তাম্রশাসন প্রাপ্ত হয়। এই মধুবন নথুপুর পরগণায় সগ্রী তহশীল কাছারীর অন্তর্ভুক্ত। আজিমগড় জিলার অন্তর্গত মধুবন গ্রাম, আজিমগড় নগরের ৩২ মাইল উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। আজিমগড়ের কালেক্টরের নিকট ডাক্তার ফুরের সাহেব এই তাম্রশাসন প্রাপ্ত হইয়া, লক্ষ্ণৌ নগরীর চিত্রশালিকায় তাহা প্রেরণ করিয়াছেন। এই তাম্রশাসনের পরিমাণ ২০½ × ১৩½ ইঞ্চি। হর্ষবর্দ্ধনের রাজত্বের পঞ্চবিংশ বর্ষে (৬৩১ খৃষ্টাব্দে) এই তাম্রশাসন গুর্জ্জর দ্বারা উৎকীর্ণ হয়। পিন্থিকার শিবির হইতে পৌষ মাসের কৃষ্ণা ষষ্ঠীতে সামন্ত মহারাজ ঈশ্বর গুপ্তের আদেশে খোদিত হয়। ঈশ্বর গুপ্ত মহারাজ হর্ষবর্দ্ধনের রাজকীয় শাসনপত্রাদির রক্ষকতাকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি 'মহাক্ষপটলাধিকরণাধিকৃত' বলিয়া শাসনপত্রে বর্ণিত হইয়াছেন। 'মহাপ্রমাতৃ' ও 'মহাসামন্ত' স্কন্ধ-গুপ্ত এই দানপত্র অনুসারে দানগ্রহীতৃদ্বয়কে অধিকার দেওয়াইতে আদিষ্ট হন। রামরথ্য নামে ব্রাহ্মণ কূট (জাল) শাসনপত্রের দ্বারা শ্রাবস্তী ভুক্তির (প্রদেশের) ও কুণ্ডধানী বিষয়ের (পরগণার)

অন্তর্গত সোমকুণ্ডিকা গ্রাম প্রবঞ্চনাক্রমে উপভোগ করিতেছিল। এই প্রতারক ব্রাহ্মণের হস্ত হইতে উক্ত গ্রাম গ্রহণ করিয়া, মহারাজ হর্ষবর্দ্ধন আপনার পিতামাতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্বর্গকামনায় সাবর্ণিগোত্রজ সামবেদীয় ভট্ট বাতস্বামী ও বিষ্ণু বৃদ্ধগোত্রীয় ঋগ্‌বেদীয় ভট্ট শিবদেবস্বামীকে তাহা নিষ্কর উপভোগের জন্য প্রদান করেন।

পূর্ব্বোক্ত স্কন্দগুপ্ত হর্ষচরিতে রাজ্যবর্দ্ধনের হস্তিশালার অধ্যক্ষ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। রাজ্যবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর তিনি হর্ষবর্দ্ধনকে যে উপদেশ প্রদান করেন, তাহাতে আপনার প্রবীণতা ও লোকচরিত্রাভিজ্ঞতার সবিশেষ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

এই শাসনপত্রে হর্ষবর্দ্ধন আপনাকে 'পরমমাহেশ্বর' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা হইতে জানা যাইতেছে যে, হর্ষবর্দ্ধন ৬৩১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্তও শৈব ছিলেন। রাজ্যবর্দ্ধন পরোপকারী 'পরমসৌগত' ছিলেন। রাজ্যবর্দ্ধন বৌদ্ধ ও হর্ষবর্দ্ধন শৈব ছিলেন। তাঁহাদের পিতা প্রভাকরবর্দ্ধন সৌর ছিলেন। এই শাসনপত্র তাহা স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিতেছে। সোনপতের মোহরের শীর্ষদেশে নন্দীর মূর্ত্তি দৃষ্টে হর্ষবর্দ্ধনের শিবানুরক্তির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। *

হর্ষবর্দ্ধনের রচিত তিনটি কবিতা এই তাম্রশাসনে পাওয়া যাইতেছে। হর্ষবর্দ্ধন সুকবি ছিলেন। তাঁহার রচিত কবিতা হইতে তাঁহার ভ্রাতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা সূচিত হইতেছে। যিনি এরূপ সুকবি ছিলেন, তাঁহার পক্ষে অন্যের সাহায্যনিরপেক্ষ হইয়া, 'রত্নাবলী', 'নাগানন্দ' ও 'প্রিয়দর্শিকা' নামে তিন খানি নাটকের রচনা করা বিচিত্র নহে। 'নেপালের পুরাতত্ত্বে' আমরা মহারাজ জয়দেব ও প্রতাপমল্লের রচিত কবিতা শিলালিপিতে উৎকীর্ণ দেখিয়াছি। হর্ষবর্দ্ধনের রচিত 'রত্নাবলী'কে তাঁহার সভাসদ ধাবক বা বাণভট্টের প্রণীত বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে, আমরা কোনও ক্রমে সম্মত নহি। রাজ্যবর্দ্ধনের মৃত্যুর ২৫ বর্ষ পরে হর্ষবর্দ্ধন অতি দুঃখিতচিত্তে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজ্যবর্দ্ধনের মৃত্যুকাহিনী শার্দ্দূলবিক্রীড়িত ছন্দে জ্ঞাপন করিয়াছেন।

---

* হিয়াংসাঙ্‌ হর্ষবর্দ্ধনকে রাজ্যাভিষেককাল হইতে বৌদ্ধ বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। এক বোধিসত্ত্ব তাঁহার রাজ্যাভিষেককালে হর্ষবর্দ্ধনের সমীপে আবির্ভূত হইয়া, তাঁহাকে কুমার উপাধিতে ভূষিত করেন। হিয়াংসাঙের এই আখ্যায়িকা অসত্য ও অমূলক। —Epigraphia Indica, I. 71.

"রাজানো যুধি দুষ্টবাজিন ইব শ্রীদেবগুপ্তাদয়ঃ
কৃত্বা যেন কশাপ্রহারং বিমুখাঃ সর্ব্বে সমং সংযতাঃ।
উৎখায় দ্বিষতো বিজিত্য বসুধাং কৃত্বা প্রজানাং প্রিয়ং
প্রাণানুজ্ঝিতবানরাতিভবনে সত্যানুরোধেন যঃ॥"

ইহা হইতে জানা যায় যে, রাজ্যবর্দ্ধন মালবের অধীশ্বর দেবগুপ্তকে পরাজিত ও নিহত করিয়া ভগিনীপতি গ্রহবর্ম্মণের অপমৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। ডাক্তার বুলার অনুমান করেন যে, এই মালব পঞ্জাবের অন্তর্গত ও স্থানেশ্বরের সন্নিহিত। আমাদের বিবেচনায় দেবগুপ্ত মধ্যভারতের অন্তর্গত মালবের অধীশ্বর ছিলেন। প্রবলপরাক্রান্ত রাজা না হইলে, তিনি সুদূরবর্ত্তী গৌড়দেশের অন্তর্গত কিরণসুবর্ণের অধিপতি শশাঙ্ক গুপ্তদেবের মিত্রতা লাভ করিতে পারিতেন না। গৌড়েশ্বর রাজ্যবর্দ্ধনকে স্বরাজ্যে মিত্রভাবে আহ্বান করেন। তদনুসারে রাজ্যবর্দ্ধন নিঃশঙ্কচিত্তে গৌড়দেশাভিমুখে গমন করেন। কিন্তু রাজ্যবর্দ্ধন শশাঙ্কগুপ্তের শিবিরে বন্ধুভাবে আমন্ত্রিত হইয়া, গৌড়েশ্বর দ্বারা নিহত হন। হর্ষচরিতের মতে, রাজ্যবর্দ্ধন গৌড়েশ্বর নরেন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক নিহত হন। হিয়াংসাঙের মতে, কিরণসুবর্ণের অধিপতি শশাঙ্ক গুপ্তদেব রাজ্যবর্দ্ধনকে নিহত করেন। এই কিরণসুবর্ণ তাম্রলিপ্তির ৭০০ লি (১১৭ মাইল) উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত ছিল। কানিংহাম সাহেবের মতে, কিরণসুবর্ণ সিংহভূমে অবস্থিত। ডাক্তার ওয়েডেলের মতে, ইহা বর্দ্ধমানের সন্নিহিত কাঞ্চননগর, এবং বেভারিজ সাহেবের মতে, মুরশিদাবাদ জেলার অন্তর্গত রাঙ্গামাটী হইতে অভিন্ন। ইহার নিকটে গোকর্ণ অবস্থিত। লুয়াড সাহেবের মতে ইহা মুরশিদাবাদের ১২ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত ছিল। ফারগুসন সাহেবের মতে, বীরভূমের অন্তর্গত 'নগর' নামক স্থানই প্রাচীন কিরণসুবর্ণ। কানিংহাম সাহেব সমতট ও কিরণসুবর্ণের স্থাননির্দ্দেশে একান্ত ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। মুঙ্গেরের অন্তর্গত খরকপুরের ক্ষত্রিয় রাজা শশাঙ্ক ৯১০ ফসলী সনে (১৫০২ খৃঃ) নিহত হন।

শশাঙ্ক গুপ্তদেব পশ্চিম বঙ্গে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিতেন। কিরণসুবর্ণে তাঁহার রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। তিনি হিন্দুধর্ম্মে একান্ত অনুরক্ত ছিলেন। এই প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি বৌদ্ধধর্ম্মের পরম বিদ্বেষ্টা ছিলেন। রোটসগড়ে শশাঙ্কের নামাঙ্কিত শিলালিপি ও বাহরায় শশাঙ্কের নামে এক সরোবর বিদ্যমান আছে। তিনি

বোধগয়ার মহাবোধী দ্রুম বিনষ্ট করেন। তাহার অব্যবহিত পরে মগধের অধিপতি বৌদ্ধ পূর্ণবর্ম্মণ, বোধগয়ার বিখ্যাত মন্দিরের চতুর্দ্দিকে প্রস্তরনির্ম্মিত ২৪ ফুট উচ্চ প্রাচীর গ্রথিত করাইয়া, ভবিষ্যতে বোধিদ্রুমের বিনাশের পথ রুদ্ধ করেন। বোধিদ্রুম বিনষ্ট করিয়া, মহারাজ শশাঙ্কগুপ্ত আপনার এক মন্ত্রীকে বুদ্ধের মূর্ত্তি দূরীভূত করিবার আদেশ প্রদান করেন। মন্ত্রী বুদ্ধের স্থলে মহাদেবের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিবার আদেশ পান। বৌদ্ধধর্ম্মে অনুরক্ত মন্ত্রী এই রাজাদেশে বিষম শঙ্কটে পতিত হন। তিনি বুদ্ধমূর্ত্তির সম্মুখভাগ প্রাচীর দ্বারা গ্রথিত করিয়া, নবীনপ্রকোষ্ঠমধ্যে মহাদেবের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাজাদেশ পালন করেন। কানিংহাম সাহেবের মতে, ৬১০ খৃষ্টাব্দে শশাঙ্ক গুপ্তের দ্বারা বোধিদ্রুম বিনষ্ট ও উৎপাটিত হয়। শশাঙ্কের মন্ত্রী নূতন শিবমন্দিরের অন্ধকার দূর করিবার জন্য প্রদীপাধার সংস্থাপিত করেন। *

রাজ্যবর্দ্ধন বৌদ্ধ ছিলেন। অতএব পরম হিন্দু শশাঙ্ক গুপ্ত তাঁহাকে অকুণ্ঠিতচিত্তে স্বহস্তে হত্যা করিয়া থাকিবেন। ৬০৫ খৃষ্টাব্দে শশাঙ্কের দ্বারা রাজ্যবর্দ্ধন নিহত হন। লাসেনের মতে, ৬১৪খৃঃ রাজ্যবর্দ্ধন নিহত হন, এবং শিলাদিত্য হর্ষবর্দ্ধন কান্যকুব্জের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। ৬১০ খৃষ্টাব্দে শশাঙ্ক গুপ্ত দেবের আদেশে বোধিদ্রুম উন্মূলিত ও বিনষ্ট হয়। বোধিদ্রুম-বিনাশের পর শশাঙ্কগুপ্ত পাটলীপুত্রে গমন পূর্ব্বক মহারাজ অশোকের প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধদেবের পদচিহ্নাঙ্কিত প্রস্তর বিনষ্ট করিবার চেষ্টা করেন। ইহা হইতে অনুমিত হয়, হর্ষবর্দ্ধনের দ্বারা শশাঙ্ক দেব গুপ্তের ক্ষমতা পর্য্যুদস্ত হয় নাই। হর্ষবর্দ্ধনের রাজত্বকালের ষষ্ঠ বর্ষে তিনি সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত আপনার পদানত করেন। শশাঙ্ক সম্ভবতঃ ৬১২ খৃঃ কালগ্রাসে পতিত হন। বেভারিজ সাহেবের মতে, তিনি আদিশূরের বংশধর শশধর হইতে অভিন্ন।

পূর্ব্বোক্ত শাসনপত্রের শেষভাগের দুইটি শ্লোক অপর কোনও শাসনলিপিতে দেখা যায় নাই। এই নিমিত্ত ইহা মহারাজ হর্ষবর্দ্ধনের রচিত বলিয়া অনুমিত হয়। হর্ষবর্দ্ধনের ভণিতা দৃষ্টে ইহা তাঁহার রচিত বলিয়া স্পষ্ট উপলব্ধি হয়।

"অস্মৎকুলক্রমমুদারমুদাহরদ্ভিঃ
অন্যৈশ্চ দানমিদমভ্যনুমোদনীয়ং।
লক্ষ্মাস্তড়িৎসলিলচঞ্চলায়া

* Cunningham's 'Archæologic Survey Report, III. 80—100. Dr. Mittra's "Bodh-Gaya" (1878. 71).

দানং ফলং পরযশঃপরিপালনঞ্চ ॥
কর্ম্মণা মনসা বাচা কর্ত্তব্যং প্রাণিনো হিতং।
হর্ষেনৈতৎ সমাখ্যাতং ধর্ম্মার্জ্জনমনুত্তমং ॥"

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে সাজাহানপুর জেলায় হর্ষবর্দ্ধনের নামাঙ্কিত আর একখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হয়। ৩২ হর্ষাব্দের (৬৩৮ খৃষ্টাব্দের) কার্ত্তিকী কৃষ্ণা প্রতিপদে এই দানপত্র বর্দ্ধমান কোটী শিবির হইতে বহির্গত হয়। বাঁশখেরা গ্রামের এক কৃষক ভূমিকর্ষণকালে এই তাম্রশাসন প্রাপ্ত হয়। এই বাঁশখেরা সাজাহানপুরের ২৫ মাইল দূরে অবস্থিত। ইহা দ্বারা অহিচ্ছত্র (রামনগর) ভুক্তির অন্তর্গত 'গঙ্গাদীর্ঘ' বিষয়ের 'মরচক্র' গ্রাম ভরদ্বাজগোত্রীয় ঋগ্‌বেদীয় ভট্ট বালরুদ্র ও সামবেদীয় ভট্ট ভূস্বামী দান প্রাপ্ত হন। এই শাসনলিপি এক্ষণে লক্ষ্ণৌ মিউজিয়মে অবস্থিত রহিয়াছে।

হর্ষবর্দ্ধনের শাসনপত্র ও মোহর হইতে তাঁহার শাসনকালের বিবরণ ও বংশাবলী সংক্ষেপে সংগৃহীত হইল। বাণভট্টের রচিত হর্ষচরিতের ঐতিহাসিকতা ও প্রামাণিকতা ইহা হইতে স্পষ্টাক্ষরে নিরূপিত হইতেছে। সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত হর্ষবর্দ্ধনের শাসনদণ্ডের পদানত হয়। তাঁহার প্রচলিত হর্ষাব্দ নেপাল পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট হয়। একাদশ শতাব্দীর আর্য্যাবর্ত্তে হর্ষাব্দের প্রচলন ছিল বলিয়া আবুরিহান আলবিরুণী নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার সময়ে দক্ষিণাপথের অন্তর্গত কল্যাণনগরে চালুক্যবংশীয় সম্রাট দ্বিতীয় পুলকেশী রাজত্ব করিতেছিলেন। দক্ষিণাপথে সাম্রাজ্যবিস্তারের চেষ্টা মহারাজ পুলকেশীর ভুজবীর্য্যে নিরুদ্ধ হয়। হর্ষবর্দ্ধনের বিজয়িনী গতির নিরোধ করিয়া, পুলকেশী অত্যন্ত আহ্লাদিত ও গৌরবান্বিত হন। সেই সময় হইতে পুলকেশী ও তাঁহার বংশধরেরা আপনাদের শাসনলিপিতে হর্ষবর্দ্ধনের পরাজয়কাহিনীর উল্লেখ করিয়া, চালুক্যবংশের শ্রেষ্ঠত্ব ও গৌরব প্রতিপাদিত করিতে থাকেন।

হরিদত্ত নামে হর্ষবর্দ্ধনের এক অমাত্য গবীধূমৎ (বর্ত্তমান কুদারকোট) প্রদেশের শাসনকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন।

"আসীৎ শ্রীহরিদত্তাখ্যঃ খ্যাতো হরিরিবাপরঃ।
শ্রীহর্ষেণ সমুৎকর্ষং নীতোহপি বিকৃতো ন যঃ॥"

এই হরিদত্তের পুত্র হরিবর্ম্মা। তিনি মম্ম নামে পরিচিত ছিলেন। হরিবর্ম্মার পুত্র পিতার জীবিতকালেই তক্ষদত্ত যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেন। *

* Epigraphia Indica. (I. 179.)
Sir W. W. Hunter's "Imperial Gazetteer." (VII. 329.)

পতঞ্জলির মহাভাষ্যে এই গবীধূমতের উল্লেখ আছে। তদনুসারে গবীধূমৎ সাঙ্কাশ্যার চারি যোজন দূরে অবস্থিত। প্রবাদ আছে, গবীধূমৎ হইতে কনোজ নগর পর্য্যন্ত এক সুড়ঙ্গ পথ ছিল, ফরাক্কাবাদের অন্তর্গত সঙ্কিশা হইতে কুদারকোট ৩৮ মাইল অন্তর। কুদারকোট ইটোয়া জেলায় অবস্থিত। ইটোয়া নগর হইতে কুদারকোট চব্বিশ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত।

ভ্রম-সংশোধন।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

জমীদার ত্রিপুরাচরণ বাবুর পুত্রকন্যা দুটিকে দেখিয়া এক পিতামাতার সন্তান বলিয়া মনে হইত না। পুত্রটির নাম গণেশ এবং কন্যার নাম ইন্দুমতী। ইন্দু গণেশ অপেক্ষা দুই বৎসরের ছোট। গণেশকে তাহার ঠাকুরদাদা শৈশবাবস্থায় 'গোবর গণেশ' বলিয়া ডাকিতেন, তাহার মেধার অভাবের নিমিত্ত অথবা তাহার উদরে 'ভুঁড়ি' নামক রক্তমাংসময় বর্ত্তুল পদার্থটির প্রাচুর্য্যবশতঃ তাহার সেই সারবান নামটি প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহার পিতামহই তাহা বলিতে পারেন। বয়োবৃদ্ধিসহকারে ভেকশিশুর লাঙ্গূলের ন্যায় তাহার নাম হইতে গোবরাংশ খসিয়া গিয়াছিল, অতঃপর সকলে তাহাকে শুধু 'গণেশ' বলিয়াই ডাকিত; আমাদের এই দ্বিভুজ গণেশটি সিদ্ধিদাতা চতুর্ভুজ গণেশের পদানুসরণ করিবার কখন চেষ্টা করে নাই, তবে এক বিষয়ে সে দেব গণপতির অনুকরণে কৃতকার্য্য হইয়াছিল,—তাহার উদরদেবতার পূজা সর্ব্বাগ্রে সম্পন্ন হইত।

তাহার ভগিনী ইন্দুমতী রহস্যময়ী বালিকা। তাহার নাম ও চেহারায় আশ্চর্য্য সমতা লক্ষিত হইত। তাহাকে দেখিলে মনে হইত, শরতের একখণ্ড নির্ম্মল অভ্রশুভ্র মেঘ তরল জ্যোৎস্নাজালে আবৃত হইয়া বায়ুভরে ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইতেছে; সে বিদ্যুতের ন্যায় চঞ্চল, অত্যন্ত মুখরা, নিরতিশয় সুন্দরী। ইন্দু যে নিতান্ত শীর্ণদেহা, তাহা নহে; কিন্তু বিস্তারের অনুপাতে তাহার দৈর্ঘ্য অধিক ছিল বলিয়া তাহাকে কৃশ দেখাইত।

ইন্দু তাহার ঠাকুরদাদার নয়নের আনন্দস্বরূপিণী ছিল; বৃদ্ধ রামকান্ত বাবু পুত্রের হাতে জমীদারী এবং সংসারপর্য্যবেক্ষণের সমস্ত ভার সমর্পণ করিয়া

এই বালিকাটিকে তাঁহার বার্দ্ধক্যের একমাত্র অবলম্বনযষ্টির ন্যায় গ্রহণ করিয়াছিলেন; তিনি সংসারের অন্য সকল বন্ধন হইতে মুক্ত হইলেও, এই বালিকার মায়াবন্ধনে অধিকতররূপে বিজড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এক এক সময় তিনি ইন্দুকে আদর করিয়া বলিতেন, "তুই আমার ভরতরাজার মৃগশিশুর মত, তোর জন্যে আমি ধর্ম্ম কর্ম্ম সব ত্যাগ করিয়াছি।" ইন্দু এক-দিন তাহার সুকোমল বাহুদ্বয়ে দাদামহাশয়ের গ্রীবা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "মৃগশিশু কাকে বলে দাদামশায়?" দাদামহাশয় বলিলেন, "এই হরিণের ছা।" "ছি দাদা মশায়, তোমার এত বয়স হোল, তবু একটু বুদ্ধি হ'লো না, হরিণের মত কি আমার সিং আছে?" ইন্দু এমন গম্ভীরভাবে দাদামহাশয়কে এ কথা জিজ্ঞাসা করিল, যেন তাঁহার বুদ্ধির পরিপক্কতা সম্বন্ধে সে সকল আশা ছাড়িয়া দিয়াছে! দাদামহাশয় স্নেহপূর্ণদৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ক্রমে সিং হবে ইন্দু, তখন তুই এই বুড়োদাদামশায়টাকে দূরে ফেলে কোথায় চলে যাবি।" "তা আমি কক্‌খনো যাব না দাদা মশায়, আমি কি তোমায় ফেলে যেতে পারি?" এই বলিয়া ইন্দু সস্নেহে তাঁহার পিঠ চাপড়াইতে লাগিল। "যাবি রে যাবি বুড়ী, বিয়ে হ'লে কি আর এই বুড়োটাকে মনে থাক্‌বে?" ইন্দুর এখন একটু বয়স হইয়াছে, বিবাহের কথায় কিছু লজ্জিত হইয়া "যাও দাদামশায় তুমি বড় দুষ্টু!" বলিয়া তাঁহাকে ধাক্কা দিয়া সেখান হইতে ছুটিয়া পলাইল।

বস্তুতঃ এই বালিকা ও এই বৃদ্ধ উভয়ের মধ্যে চরিত্রগত অনেকখানি সাদৃশ্য ছিল। পুষ্পমঞ্জরীর ন্যায় সুকোমল, সারল্যময়ী, সংসারজ্ঞানানভিজ্ঞা এই বালিকা, এবং জীবনোপান্তোপবিষ্ট সেই পক্বকেশ জীর্ণ বৃদ্ধের মধ্যে চরিত্র-গত সাদৃশ্যের কল্পনা করা কঠিন বটে, কিন্তু প্রকৃতির রাজ্যে এরূপ সাদৃশ্য অস্বাভাবিক নহে; হিরণ্ময়-বর্ণ-বিভাসিত, বিকাশোন্মুখ ঊষার তরুণরাগ অস্তমান অংশুমালীর স্তিমিতপ্রায় সন্ধ্যারুণলেখার ন্যায়ই প্রতীয়মান হয়। ইন্দু কথায় কথায় তাহার দাদামহাশয়ের উপর রাগ করিত বটে, কিন্তু দুই দণ্ডের মধ্যে একটা নূতন ছল করিয়া তাঁহার কাছে আসিয়া আদরের অত্যাচারে তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিত। রামকান্ত বাবু তাঁহার সমস্ত সম্পত্তির পর্য্যবেক্ষণভার পুত্রের হস্তে সমর্পণ করিয়া, কেবল তাঁহার পরিপক্ব মস্তকটি পৌত্রী ইন্দুমতীকে 'ইজারা' দিয়াছিলেন। ইন্দু এই ইজারালব্ধ মহলখানির সুবন্দোবস্ত ও পরিদর্শনবিষয়ে কখন ঔদাসীন্য প্রকাশ করিত না। কিন্তু

তাহার কি কাজের অন্ত আছে? সকালে স্নানসমাপনান্তে সিক্ত এলোচুলে সে তাহার ঠাকুরদাদার হাত ধরিয়া তাহার খেলাঘরে টানিয়া আনিত, এবং তাঁহাকে পরিদর্শককার্য্যে নিযুক্ত করিয়া সঙ্গিনীগণকে মাটির ভাত, সুরকীর চচ্চড়া, কাদার দই এবং বালির চিনি পরিবেশন করিতে করিতে পরম গম্ভীর-মুখে পরিবেশনপরায়ণা সহৃদয়া প্রৌঢ়া গৃহিণীর মত জিজ্ঞাসা করিত, "তোমরা সব ভাল করে খাচ্ছ না কেন? রান্না বুঝি ভাল হয় নি? আর কিছু দিব কি?" সে সময় তাহাকে দেখিয়া সত্যই মনে হইত, ভগবতী অন্নপূর্ণা বুঝি বালিকাবেশে ক্ষুধিতকে অন্নব্যঞ্জনবিতরণের জন্য করুণাময়ীমূর্ত্তিতে মুক্তহস্তে দণ্ডায়মান হইয়াছেন; হর্ষাপ্লুতহৃদয়ে বৃদ্ধ রামকান্ত মনে মনে বলিতেন, "দিদি আমার যেন স্বয়ং লক্ষ্মী।"

দন্তের অভাবে রামকান্ত বাবুকে ছেঁচা পান ব্যবহার করিতে হইত, কিন্তু ইন্দু স্বয়ং পান ছেঁচিয়া না লইয়া গেলে তাঁহার মনঃপূত হইত না। যখন রৌদ্রপ্রদীপ্ত স্তব্ধ মধ্যাহ্নে একটি সুশীতল কক্ষে শয্যাতলে বসিয়া ইন্দু তাহার দাদামহাশয়ের কেশবিরল মস্তকের পাকা চুল তুলিতে তুলিতে মৃদু গুঞ্জিত সুকোমল কম্পিত স্বরে ছেলে ঘুম পাড়াইবার ছড়া আবৃত্তি করিত, তখন অতি সহজেই বৃদ্ধের অলস চক্ষু তন্দ্রাভরে ভাঙ্গিয়া পড়িত; যেন সেই ক্ষুদ্র বালিকা কোন মায়ামন্ত্রবলে মুহূর্ত্তের জন্য জননী-জীবন লাভ করিয়াছে,তাই সংসারের সকল কাজ সম্পন্ন করিয়া সে তাহার অবোধ শিশুসন্তানটিকে বক্ষের সন্নিকটে লইয়া সযত্নে তাহাকে ঘুম পাড়াইতেছে, এবং তাহার কোমল কণ্ঠের ললিত রাগিণীতে বিমুগ্ধ বিশ্বের নিদ্রা আপনার স্বপ্নময় কুহকজালে বেষ্টিত হইয়া এই সঙ্গিহীন, কর্ম্মশ্রান্ত, অবসন্ন বৃদ্ধের নয়নদ্বয় আচ্ছন্ন করিতেছে।

ঠাকুরদাদার নিদ্রাকর্ষণ হইলেই ইন্দু ধীরে ধীরে উঠিয়া মায়ের ঘরে আসিত, সেখানে বাটা হইতে একটা পান লইয়া তাহা চিবাইতে চিবাইতে সমস্ত দুপরটা বাড়ীর সন্নিকটবর্ত্তী খালের ধারে, ফুলের বাগানে, তমালতলায়, পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়াইত; মায়ের গালাগালির ভয়ে যেদিন বাহিরে না যাইত, সেদিন নিদ্রিত দরোয়ান বৃদ্ধ ধরমসিংএর সুদীর্ঘ পাকা গোঁফ জোড়াটায় কালি লেপিয়া দিত, কুসী ওরফে কুসুম ঝি অঞ্চল বিছাইয়া ঘুমাইতেছে দেখিলে তাহার চুলের সহিত দড়ির বেণী পাকাইয়া তক্তপোষের 'খুরো'র সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিত। তাহার অত্যাচারে সমস্ত গৃহ সশঙ্ক।

গণেশের একটি প্রাইভেট টিউটার ছিল। গণেশের মত ইন্দুও তাহার

কাছে পড়া শুনা করিত। বয়স একটু বেশী হইলে দেখা গেল, গণেশ অপেক্ষা ইন্দুমতীর স্মরণশক্তি ও মর্ম্মগ্রহণক্ষমতা উভয়ই অনেক অধিক। ইন্দু পড়িবার বিষয়গুলি ব্লটিংকাগজে নিক্ষিপ্ত মসী বিন্দুর মত এক নিশ্বাসে আয়ত্ত করিয়া লয়, আর গণেশের স্মৃতিশক্তি তৈলনিষিক্ত কদলীপত্রের মত, তাহার সম্মুখে যে কিছু শিক্ষার বিষয় রাখা যাউক, সমস্তই 'নলিনীদলগত জলবৎ' গোটাটি রহিয়া যায়। ইন্দু ক্রমে একাদশ ছাড়াইয়া দ্বাদশে পড়িল, নবনারী ছাড়িয়া সীতার বনবাস ধরিল। দাদামহাশয় বলিলেন, মেয়ে ছেলের আর বেশী লেখাপড়ার আবশ্যক করে না, অনেক হয়েছে। কাজেই মাষ্টারের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ ফুরাইল।

বয়স হইল বটে, কিন্তু ইন্দুর পুরুষসুলভ স্বাধীনতাপ্রীতি ঘুচিল না, ত্রিপুরাচরণ বাবু কিছু রক্ষণশীল প্রকৃতির লোক ছিলেন, তিনি ইন্দুকে বাহিরে দেখিলে এক একদিন ভৎর্সনা করিয়া বলিতেন, "যা, যা, বাড়ীর মধ্যে যা; গেছো মেয়ে হয়েছে, তবু যদি একটু তরিবৎ শিখ্‌লে, বাবাই ওর মাথাটা খেলেন।" অনেক সময় মা বলিতেন, "দেখ্ ইন্দু! এখন ডাগরটি হয়েছিস্ পথে ঘাটে বেরুস্‌নে, লোকে নিন্দে করবে।" কিন্তু মায়ের অনুরোধ শুনিতে ইন্দুর ত ঘুম নাই! খালের উপরেই তাহাদের বাড়ী, খাল দিয়া ষ্টীমার যাতায়াত করে, যাত্রিপূর্ণ ছোট ষ্টীমারে দূর হইতে 'বাঁশি' দিলেই সে তাহার দশমাসের ছোট ভাইটিকে কোলে লইয়া মাটিতে অঁাচল লুটাইতে লুটাইতে গোটাকত লোহার কাঁটা সমেত উন্মুক্ত বেণীটি দুলাইতে দুলাইতে ছুটিয়া আসিয়া খালের ধারে দাঁড়াইত, এবং অনিমিষদৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিত, কেমন করিয়া ছোট ষ্টীমারখানির মাথার দিকে দাঁড়াইয়া শততালিবিশিষ্ট অপরিষ্কার নীল ইজের ও জীর্ণ জামাপরা খালাসী একগাছা দড়ি ফেলিয়া জল মাপিতেছে, যাত্রীরা কেহ বসিয়া কেহ শুইয়া আছে, কেহ বা ঘটিতে সরু দড়ি বাঁধিয়া খাল হইতে জল তুলিতেছে। ষ্টীমারখানা ধূম উড়াইতে উড়াইতে অনেক দূর চলিয়া গেলেও সে একদৃষ্টে সেই দিকে চাহিয়া থাকিত। আবার সন্ধ্যার অন্ধকারে তাহাদের গ্রামখানি আচ্ছন্ন হইলে যখন গাভীগুলি মাঠ হইতে গৃহমুখে ফিরিয়া আসিত, অদূরে খালের অপর পারে যূথভ্রষ্ট মাতৃহারা গোবৎস একাকী ব্যাকুলস্বরে চীৎকার করিত, নিকটস্থ হাটের মধ্যে ক্ষুদ্র দোকানগুলিতে মৃৎপ্রদীপ জলিয়া উঠিত, প্রতিদিনের পুরাতন নক্ষত্রগুলি একে একে নীরবে গগনপ্রাঙ্গণে সমাগত হইয়া খালের স্বচ্ছ সলিলদর্পণে

আপনাদের প্রতিকৃতি নিরীক্ষণ করিত, এবং স্তূপীকৃত অন্ধকারের ক্রোড়ে শ্যামল বিটপিশাখা সুমন্দ সমীরণহিল্লোলে মর্ম্মরিত হইয়া সেই সৌম্য শান্ত স্তব্ধ সন্ধ্যার অভ্যর্থনা করিত, তখন বালিকা বাতায়নসন্নিকটে বসিয়া তাহার ছোট ভাইটিকে ঢুলাইতে ঢুলাইতে মুক্ত বাতায়নপথে সেই স্তব্ধ প্রকৃতির গম্ভীর মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিত। তাহার কোমল চপল শিশুপ্রকৃতি নৈশ অন্ধকার-সমাগমের সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর ও অচঞ্চল হইয়া উঠিত। যেন তাহার হৃদয় একখানি দর্পণমাত্র, তরুণরবিকরপ্রমোদিত পুলকময় প্রভাতে, প্রখর-ময়ূখসন্তপ্ত জ্বালাময় মধ্যাহ্নে, এবং ঈষদুষ্ণ মৃদুসমীরণনিষেবিত অলসতা-বিজড়িত উদাসীন সন্ধ্যায়, প্রকৃতি তাহার স্বচ্ছ হৃদয়দর্পণে আপনার ছায়া নিক্ষেপ করিয়া তথায় আপনার প্রতিকৃতি পরিস্ফুট করিয়া তুলিত। এমনি করিয়া ইন্দুর জীবনের ত্রয়োদশ বৎসর অতীত হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

"যার বে তার মনে নাই" এই সর্ব্বজনবিদিত বঙ্গীয় প্রবচনটি হিন্দু বাঙ্গালীর মেয়ে সম্বন্ধে যেমন খাটে, এমন আর কোথাও নয়। ইন্দুও এ দলের বাহিরে নহে; ছেলেবেলায় চারি বৎসর বয়সের সময় এক এক দিন সে 'শশুল বালি' যাইবার জন্য অস্থির হইয়া উঠিত। ইহার একটু ইতিহাস আছে; বাবু বামা-চরণ মিত্র ধনিয়াথালির এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন, প্রতিবেশী বলিয়া তাঁহার স্ত্রীর সহিত ত্রিপুরা বাবুর সহধর্ম্মিণী প্রভাবতীর আত্মীয়তা হইয়াছিল। প্রথম যে দিন প্রভা-বতী ইন্দুকে লইয়া ডাক্তারবাবুর বাড়ী বেড়াইতে যান, সে দিন ডাক্তারপত্নী আদরমণি ইন্দুকে কোলে লইয়া তাহার দুই হাতে দুটি সন্দেশ দিলেন। ইন্দু গ্রীবাভঙ্গীসহকারে মাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মা সন্দে কাব?" মা বলিলেন, "খাও।"—ভোজন শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত ইন্দুর মুখ বন্ধ ছিল, আহারান্তে ইন্দু আদরমণির ক্রোড় হইতে নামিয়া বলিল, "বালো সন্দে, এ কে মা?" হাস্যমুখী মাতা উত্তর দিলেন, "শাশুড়ী।" ইন্দু প্রশংসমান চক্ষে আদরমণির দিকে চাহিয়া বলিল, "কাসা শাশুলি—মালে না।" আদরমণি শুনিয়া হাসিয়া গড়াইয়া পড়িলেন, ইন্দুর মাকে বলিলেন, "দেখ ভাই, আমি বামুন হলে আমার ননীর সঙ্গে ইন্দুর বে দিতুম, আমি কি ইন্দুর মত বৌ পাব?"—ইন্দুর মা বলিলেন, "তা কায়েতের ঘরে সুন্দর মেয়ের অভাব কি? ননী বেঁচে

থাক ; যা হোক, আজ হতে তুমি না হয় আমার সখের বেয়ান হলে। তোমার মেয়ে সরোজবাসিনীর সঙ্গে ইন্দুর সই পাতিয়ে দেব, দুটিই ত একবয়সী।” আদরমণি আহ্লাদের সহিত এ প্রস্তাবের অনুমোদন করিলেন।

সেই সময় ইন্দুর দিনকত শ্বশুরবাড়ীর প্রতি আকর্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহার পর একটু জ্ঞান হইলে সে বুঝিল, শ্বশুরবাড়ী যায়গাটা বিশেষ মনোরম নহে, সেখানে রাত্রিদিন ঘোমটা দিয়া থাকিতে হয়, এবং ইচ্ছামত সকল কাজ করা যায় না, তখন সে ভুলিয়াও আর শ্বশুরবাড়ীর নাম মুখে আনিত না; এখন বড় হইয়া ইন্দু ভাবে, যাহাদের শ্বশুরবাড়ী যাইতে না হয়, তাহারা কি ভাগ্যবতী! ইদানীং এক এক সময় কুশী ঝির উপর অত্যাচার করিলে সে ইন্দুকে ভয় দেখাইয়া বলিত, “একদিন এর শোধ উঠ্‌বে, শাশুড়ী মাগীর জ্বালায় নাকের জলে চোখের জলে এক হবে।” ইন্দু মাথা নাড়িয়া বলিত, “আমি বিয়ে করচি কি না?”—“বিয়ে করবি না ত কি আইবুড়ো হয়ে থাকবি?”—“থাকবই ত, আর তোর মুখে চুন কালী দিয়ে তোকে অস্থির করবো।” শুনিয়া “আচ্ছা তা দেখা যাবে” বলিয়া দাসী নিজকার্য্যে প্রস্থান করিত।

ইন্দু যাহাই ভাবুক, প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ ব্যর্থ হইবার নহে; শুভদিনে মহা সমারোহপূর্ব্বক ইন্দুর বিবাহ হইয়া গেল। ইন্দুর স্বামী আশুতোষ ধনাঢ্যের সন্তান নহে, এণ্ট্রেন্স পাশ করার পর তাহার পিতার মৃত্যু হওয়ায় এবং সাংসারিক অবস্থা স্বচ্ছল না থাকায় অগত্যা তাহাকে লেখাপড়া ছাড়িয়া চাকরীর চেষ্টা দেখিতে হইয়াছিল; এখন সে স্বরূপপুরের মাইনর স্কুলের সেকেণ্ড মাষ্টার। তাহার প্রধান সম্পত্তি কুল, কুলগৌরবে সে অতি শ্রেষ্ঠ ছিল, তাই রামকান্ত বাবু পুত্র ও পুত্রবধূর অনিচ্ছা সত্ত্বেও আশুতোষের সঙ্গে পৌত্রীর বিবাহ দিলেন। একে দরিদ্র, তাতে ‘দোজবরে’; দুই বৎসর পূর্ব্বে আশুতোষের প্রথমা পত্নীর মৃত্যু হইয়াছিল, তাই বলিয়া আশুর বয়স বেশী হয় নাই, পঞ্চবিংশতিবর্ষীয় যুবকের সহিত ত্রয়োদশবর্ষীয়া বালিকার বিবাহ অসমান নহে। দোজবরে জামাই এবং বিদ্যা ও অর্থের অভাব প্রযুক্ত আশু শ্বশুর শাশুড়ীর প্রসন্নতা লাভ করিতে পারিল না। প্রভাবতী প্রায় সর্ব্বসমক্ষেই বলিতেন, “ঠাকুর বেছে বেছে কি ছেলের হাতেই আমার সোনার প্রতিমাকে সঁপে দিলেন, কুল নিয়ে ধুয়ে খাব কি না?” বিবাহের পর কুসী ঝি ইন্দুর সঙ্গে গিয়া তাহার শ্বশুরবাড়ী দেখিয়া আসিল। প্রভাবতী তাহাকে জিজ্ঞাসা

করিলেন, "কেমন লো কুসী, বেয়ানের ঘর বাড়ী কেমন দেখ্‌লি?" কুসী বলিল, "ঘর না কুঁড়ে, ও রকম ঘরে আমরা সাত জন্ম বাস করতে পারি নে, ঘর থেকে বেরোতে হলে ব'সে বেরোতে হয় এমনি খাটো দুয়োর।" শুনিয়া ইন্দুর মা বসিয়া পড়িলেন, ভাবিলেন, সত্যই ইন্দুকে তিনি জলে ফেলিয়াছেন; সংকল্প করিলেন, প্রাণ থাকিতে তিনি ইন্দুকে আর শ্বশুরবাড়ী পাঠাইবেন না।

আশুতোষ শ্বশুর শাশুড়ীর প্রথমবারের ব্যবহারেই বুঝিয়াছিল, দরিদ্র বলিয়া সে তাঁহাদের উপেক্ষাভাজন হইয়াছে। মানুষ সকল আঘাত সহিতে পারে, কিন্তু তাহার দরিদ্রতার উপর কেহ আঘাত করিলে তাহা একেবারে অসহ্য হয়, বিশেষতঃ তাহা যদি শ্বশুর শ্বাশুড়ীর নিকট পাওয়া যায়। তাহার ন্যায় রুক্ষ মেজাজের নব্য যুবক এরূপ শ্বশুর শ্বাশুড়ীকে সম্মান বা ভক্তি করিতে পারে না, স্নেহের অভাব হইলে ভক্তিরও অভাব ঘটে। কিন্তু তথাপি আশুতোষ কথন কথন শ্বশুরবাড়ী আসিত; কারণ, তাহার দাদাশ্বশুর তাহাকে মহা কুলীনের পুত্র বলিয়া গুরুপুত্রের ন্যায় সম্মান করিতেন। তিনি নিজে চেষ্টা করিয়া এই বিবাহ দিয়াছেন, সুতরাং আশুর প্রতি তাঁহার বিশেষ স্নেহ ছিল; আশু তাঁহার প্রাণপ্রতিমা পৌত্রী ইন্দুর স্বামী, এ জন্য আশুর প্রতি তাঁহার সমাদরেরও অন্ত ছিল না। আশুও তাঁহার অবাধ্য হইতে পারিত না। বোধ করি, সেই সরলহৃদয়, সৎকুলানুরাগী, স্নেহশীল বৃদ্ধ এত দিন জীবিত না থাকিলে শ্বশুর জামাতার সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইত।

বিবাহের পর দুই বৎসর অতিবাহিত হইল। ইতোমধ্যে আশুর মা পুত্রবধূকে গৃহে আনিবার চেষ্টা করেন নাই; বধূকে বিবাহের পর তিন দিনমাত্র দেখিয়াছেন, কিন্তু বধূর প্রতি তাঁহার অপরিসীম স্নেহ; কোন্ পুত্রবৎসলা শ্বাশুড়ীই বা বধূকে স্নেহ না করেন? কিন্তু আশুর শ্বাশুড়ী যে বধূকে বড় লোকের মেয়ে ও পুত্রবধূ বলিয়াই স্নেহ করিতেন, তাহা নহে; তিনি একটি পুত্রবধূ হারাইয়াছিলেন, একটি জিনিস হারাইয়া তাহার পরিবর্ত্তে আর একটি পাইলে শেষেরটির প্রতি স্বভাবতই অধিক মমতা হয়; প্রথম পুত্রবধূটিকে হারাইয়া সেই বিধবার উচ্ছ্বসিত মাতৃস্নেহ শতধারায় ইন্দুর প্রতি উৎসারিত হইয়া উঠিয়াছিল। মধ্যে মধ্যে তিনি পুত্রবধূকে দেখিবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইতেন, কিন্তু তিনি একা মানুষ, বধূ এখনও বালিকা, পাছে তাহাকে

জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতেন না। কোন প্রতিবেশিনী যদি কোনদিন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিত, "হ্যাঁ মা! আজ দু'বছর হোল ছেলের বিয়ে দিয়েছ, বৌটিও বড় হয়ে উঠলো, তা তাকে আনবার নাম কর না কেন?" তাহা হইলে তিনি উত্তর দিতেন, "বৌমা কচি ছেলে বই ত নয়, আরও কিছু দিন থাক, স্বামীর ঘর কি জিনিস বুঝুক, তার ঘরকন্না সে করবে, তার আর কথা কি মা? আমার সংসারে লোক জন নেই, ছেলেমানুষ এসে কষ্ট পাবে বৈ ত নয়।"—শুনিয়া প্রকাশ্যে কেহ কিছু বলিত না বটে, কিন্তু তাঁহার অসাক্ষাতে পাঁচ জনে বলাবলি করিত, "বামন হয়ে চাঁদ ধরতে গেলে ঐ রকমই হয়, ক্ষমতা নেই ত বড়লোকের ঘরে ছেলের বিয়ে দিয়েছিল কেন? মেয়ে পাঠাবার জন্যে ত তাদের ঘুম নেই, গুমোর করে' আবার বলা হয়, 'বৌমা বড় হলে আসবে!' পনের বছরের সোমত্ত মাগী, বড় হ'তে আবার বাকি আছে কি না!"—আশুর মা এ সকল কথা শুনিয়াও তাহাতে কর্ণপাত করিতেন না।

জ্যৈষ্ঠ মাসে জামাইষষ্ঠীর কয়েক দিন পূর্ব্বে রামকান্ত বাবু আশুকে পত্র লিখিলেন, "দাদা, গ্রীষ্মের ত ছুটী হয়েছে, একবার বুড়োর সঙ্গে দেখা কর্ত্তে ভুলো না, কবে ম'রে যাব, যে ক'দিন আছি, তোমাদের সঙ্গে আমোদ আহ্লাদ করে নিই। আমি দুই এক দিনের মধ্যে পাল্‌কী বেহারা পাঠাচ্ছি, তুমি প্রস্তুত হয়ে থাক।"—আশুর যে বিশেষ অনিচ্ছা, তা বোধ হয় না, তবে মায়ের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করা উচিত। মা বলিলেন, "যাও বাবা, একবার সব দেখে শুনে এসগে, আর বৌমাকে যদি আনবার সুবিধা বোঝ, তারও চেষ্টা ক'রো; পাড়ার মাগীগুলো যে কত কথাই বলছে, বড়লোকের ঘরে বেটার বিয়ে দিয়েছি, এ আর কারও সহ্য হচ্ছে না। তা সবারই অসহ্য হয় হোক, ভগবানের যেন অসহ্য না হয়।"

যথাসময়ে পালকী বেহারা উপস্থিত হইলে আশু জামাইষষ্ঠীর নিমন্ত্রণ রাখিতে গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ইন্দু বড় লজ্জাবতী মেয়ে; ডাক্তার বাবুর কন্যা তাহার সখী সরোজবাসিনী

এক হাটে কিনিয়া আর এক হাটে বেচিতে পারিত ; শান্তিপুরে বিবাহ হওয়ায় এই বিদ্যায় সে বিশেষ পারদর্শিনী হইয়াছিল। ইন্দুর স্বামী আসিলে সে ঠাট্টায় ঠাট্টায় তাহার হাড় জ্বালাইয়া তুলিত ; এবারও আশুতোষের আগমন-সংবাদ পাইবামাত্র সে ইন্দুদের বাড়ী আসিয়া আড্ডা করিল, এবং আশুর নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার সুশাণিত বাক্যবাণগুলি নিতান্ত নির্দ্দয়ের ন্যায় আশুতোষের প্রতি নিক্ষেপ করিতে লাগিল ; আশুও পরিহাসে অনভ্যস্ত নহে, কিন্তু সে কিছু সঙ্কুচিত হইয়া কথা কহিত, পাছে কোন কথা অসাবধানতার সহিত বলিয়া সরোজবাসিনীকে মর্ম্মাহতা করে। আজও আশু প্রথমে অতি সাবধান হইয়াই কথা কহিতেছিল, কিন্তু যখন দেখিল, এ মুখরা যুবতীর মুখ বন্ধ করিতে না পারিলে আর স্বস্তি নাই, তখন আশু বলিল, "তোমার সই ত লজ্জাবতী লতা, তুমি এমন হাড়জ্বালানে রসিকতা কোথায় শিখেছ বল ত! একি শান্তিপুরের আমদানী ?"—সরোজ চক্ষু ঘুরাইয়া বলিল, "আমদানী যেথাকারই হোক, স্বরূপপুরে' নয়, কোন কোন জানোয়ার কেবল কাপড়ের বোঝা বয় না, চিনির বস্তাও বয়, কিন্তু রস-আস্বাদনের সুখ তার কোন কালেই ঘটে না।"—আশু এবার একটু শক্ত জবাব দিল ; বলিল, "এখনই কেবল ময়লা কাপড়ের বোঝা বহিয়া মরিতেছি, কিন্তু এক সময় যখন চিনির বস্তা বহিয়াছি, তখন সে রসেও বঞ্চিত ছিলাম না, বিধাতা এখনই আমাকে তাহা হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন।"—উত্তরটা বাস্তবিকই কঠিন হইয়াছিল। সরোজ মুখভার করিয়া বলিল, "যা হোক এতক্ষণে স্বরূপ-পুরে রসিকতার নমুনা পাওয়া গেল, তা জামাই বাবু, আক্ষেপের দরকার কি ?—এ ময়লা কাপড়ের মোট ফেলে চিনির বস্তার সন্ধানেই যাও, নগদা মুটেরা তোমার মত বলদ আদর ক'রে নেবে। তুমি আমার সখীর যোগ্য নও।"—চক্ষে উপেক্ষার বিদ্যুৎ খেলাইয়া, অধরপ্রান্তে মৃদুহাস্যের মধ্যে বিষের ঝলক প্রবাহিত করিয়া হতভম্ব আশুতোষের সম্মুখ হইতে সরোজ-বাসিনী প্রস্থান করিল।

সরোজবাসিনী আশুতোষের সহিত রসিকতা শেষ করিয়া অন্য ঘরে গিয়া ইন্দুর চুল বাঁধিতে বসিল। ইন্দুর সম্মুখে দর্পণ, সিন্দূরপূর্ণ কারুকার্য্যখচিত কৌটা, সুদৃশ্য কাচপাত্রে তৈল, 'কুন্তলীন' কি না বলিতে পারি না, তবে স্নিগ্ধ মধুর গন্ধবিশিষ্ট অতি স্বচ্ছ তৈল বটে, নানা আকারের চারিখানি চিরুণী, স্বর্ণনির্ম্মিত মূল্যবান মস্তকাভরণ, আরও কত কি, আমরা গরীব পুরুষ

গ্রন্থকার, নবযৌবনা, চম্পকদামগৌরী, যুবতী জমীদার-নন্দিনী দীর্ঘকাল পরে আজ স্বামিসম্ভাষণে যাইবে, তাহার কেশ ও বেশবিন্যাসের জন্য কত উপকরণের আবশ্যক, তা' আমরা কেমন করিয়া বলিব ?

সেই সুদীর্ঘ কুসুমদামতুল্য সুকোমল, সজল জলদের ন্যায় নিবিড়, সুমন্দ বসন্তানিলসংস্পর্শে মৃদু হিল্লোলিত সুগভীর স্বচ্ছ সরসীসলিলের ন্যায় তরঙ্গায়িত, সুচিক্কণ কেশজাল সরোজ কত সাবধানে কত যত্নের সহিত মার্জ্জনা করিতেছে, চিরুণীর মুখে একটি কেশ উঠিয়া আসিলে তাহার প্রাণে যেন শেল বিদ্ধ হইতেছে। দুই ঘণ্টার পরিশ্রমে যদি বা বেণীরচনা সমাপ্ত হইল, তখন খোঁপার পরিধি লইয়া তাহার নিজের মনের মধ্যেই নানা প্রকার মতদ্বৈধ উপস্থিত হইল, কোন রকমই তাহার মনঃপুত হয় না ; কিন্তু এ দিকে ইন্দুর সহিষ্ণুতা সীমা অতিক্রম করিয়া উঠিয়াছে। ইন্দু বলিল, "সই, তোমার কি আর চুল বাঁধা শেষ হবে না ? এ ছাই চুলের জন্যে এত পরিশ্রম করাই বা কেন ?" সরোজ হাসিয়া বলিল, "যে কখন মিষ্টান্ন কেমন জানে না, তার পাতে যা তা দেওয়া চলে, কিন্তু যে বাগবাজারের রসগোল্লা আস্বাদন করিয়াছে, গুড়েমোণ্ডা দিলে সে সে দিকে ফিরিয়াও চাহিবে না, পাতের এক কোণে ফেলিয়া রাখিবে, তাকে ভুলাইবার জন্য বর্দ্ধমানের সীতাভোগ ও মিহিদানা আমদানী করিতে হয়।" অন্যদিন হইলে সরোজ এ প্রকার উপমা দিত কি না সন্দেহ, কিন্তু আজ আশুতোষের রসিকতা তাহার বিদ্ধ হৃদয়ে পুনঃপুনঃ প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। ইন্দু এত কথা জানিত না, সরোষে মুখ ফিরাইয়া সরোজের প্রতি তীব্রকটাক্ষপাতপূর্ব্বক বলিল, "তুই মর, এক্ষুণি মর, সন্দেশ আর ভালবাসা! আগে তোর বর আসুক, আমি তোর দুই হাতে দুটো রসগোল্লা দিয়ে আর একটা ঘরে তোকে বন্ধ করে রাখ্‌ব।"—সরোজ তাহার ভ্রুকুটীতাড়নায় কিছুমাত্র সঙ্কুচিত না হইয়া সহাস্যে বলিল, "আমি ত মান রেখেই বল্লেম লো, আর তোর রসিক নাগরটি যে একটু আগে ধোবাবাড়ীর ময়লা কাপড়ের গাঁঠরির সঙ্গে পীরিতের তুলনা দিচ্ছিলেন, তাঁর কাছে তো তুই লজ্জাবতী লতাটি !" চুলবাঁধা শেষ করিয়া তখন সরোজ মধ্যাহ্নের রসিকতার ইতিহাস বেশ সালঙ্কারে সখীর কর্ণগোচর করিল, আশু বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণের মত তাহার 'লজ্জাবতী লতাটির' পা ধরিয়া অভিমান ভাঙ্গায়, ইহাই সরোজের আন্তরিক ইচ্ছা ; তাই সে নিজেই যে ধোপার গাধার সঙ্গে আশুর

মুখকান্তি সন্ধ্যার সুরঞ্জিত আকাশে জলদোদয়বৎ অতি গম্ভীরভাব ধারণ করিল; কেশবিন্যাসের পর চিরপ্রথানুসারে যখন সে সখীর সীমন্তে সিন্দূরবিন্দু সংস্থাপন করিতে গেল, তখন ক্ষোভে তাহার করকমল বাতবিক্ষুব্ধ কমলদলের ন্যায় কাঁপিতে লাগিল। সরোজ ইন্দুর মনের ভাব বুঝিতে পারিল, কিন্তু দুঃখিত হইল না; ভাবিল, ইন্দু শেয়ানা, প্রতিশোধ লইতে পারিবে।

সন্ধ্যা হইয়াছে দেখিয়া সরোজ গৃহে চলিয়া গেল। গৃহে গৃহে সন্ধ্যাদীপ জ্বলিয়া উঠিল, দেবমন্দিরে কাঁশর ঘন্টা নিনাদিত হইতে লাগিল, এবং সন্ধ্যা কর্ত্তৃক অনাদি অনন্ত বিশ্বেশ্বরের বিজয়বন্দনার ন্যায় ধূপ ও চন্দনের স্নিগ্ধ সৌরভে তরল অন্ধকার ও উন্মুক্ত আকাশ আচ্ছন্ন হইল।

আজ কত দিন পরে আশুতোষের সঙ্গে ইন্দুর সাক্ষাৎ। কিন্তু ইন্দুর মুখে বিন্দুমাত্রও প্রফুল্লতা নাই, নির্ম্মল চক্ষু বাষ্পভারাক্রান্ত, যেন আলোকপ্রদীপ্ত সুনীল আকাশ তরল মেঘে সমাচ্ছন্ন হইয়াছে। অপরাহ্নের লোহিত তপন সহস্র বর্ণে সুরঞ্জিত মেঘমালা বিদীর্ণ করিয়া পদতলের স্থির শান্ত সুনীল মহা-সমুদ্রের সীমান্তরেখা পর্য্যন্ত সুবর্ণকিরণে আলোকিত করিয়া যেমন অস্তা-চলে গমন করেন, তেমনি ইন্দু সুপরিচ্ছন্ন সুচিত্রিত পট্টবস্ত্র ও শিল্পচাতুর্য্য-ময় সমুজ্জ্বল ভূষণরাজির অভ্যন্তর হইতে তাহার পরিপূর্ণ যৌবনমহিমা-বিকশিত নিরুপম মোহিনী মূর্ত্তিতে চারি দিক উদ্ভাসিত করিয়া শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল।

তাহার পদপ্রান্তে নূপুরের মৃদু গুঞ্জন শুনিয়া আশু অবনত মস্তক উত্তোলন করিল, হরিণ বংশীরবে যেমন মস্তক উর্দ্ধে তুলিয়া উৎকর্ণ হইয়া প্রসারিত-নেত্রে শব্দের গতি লক্ষ্য করে, আশু তেমনি ভাবে দ্বারের দিকে চাহিল, কিন্তু এ কি মূর্ত্তি! ইন্দুর গম্ভীর অপ্রসন্ন মুখচ্ছবি দেখিয়া আশু কিছু ক্ষুব্ধ, কিছু বিস্মিত হইল; মনে মনে ভাবিল, "এত বেশভূষা, এত পারিপাট্য, কিন্তু প্রফু-ল্লতা কৈ? বুঝিয়াছি, হৃদয়ে প্রেম না থাকিলে নারীর মনে প্রফুল্লতা জন্মে না; আমি আজন্ম দরিদ্র, আমি ইহার ভালবাসার যোগ্য নহি, সরোজও ত আমাকে সেই কথা বলিয়া গিয়াছে, তখন বুঝিতে পারি নাই। ইন্দু বুঝি, আমাকে তাহার ঐশ্বর্য্য দেখাইতে আসিতেছে, তাহার পিতৃগৃহের অলঙ্কারে আমার দারিদ্র্যকে উপহাস করিতেছে! দরিদ্রের সন্তান হইয়া ধনীর কন্যার পাণিগ্রহণ কি বিড়ম্বনা!"—আশু প্রকাশ্যে একটি কথাও বলিল না, যেমন বসিয়াছিল, তেমনি বসিয়া রহিল। ইন্দু ভাবিল, "এতকাল পরে আমাকে

দেখা দিতে আসিয়াছেন,তা মুখে কি একটা কথাও নাই ? এই কি ভালবাসা ? কুলীনের ছেলের আবার ভালবাসা ! সখী যাহা বলিয়াছে, তাহা মিথ্যা নয়, আমি বুঝি ইহার কাছে ময়লা কাপড়ের মতই ঘৃণিতা, কিন্তু আমি ত কোন অপরাধ করি নাই।"—হায়, কেহ কাহাকেও বুঝিতে পারিল না, উভয়েই স্ব স্ব সূক্ষ্ম বুদ্ধির তন্তুজাল রচনা পূর্ব্বক রেশম-কীটের ন্যায় তন্মধ্যে আপনাকে বিজড়িত করিতে লাগিল। সংসারে এই রূপই দেখা যায়, মানুষের ক্রূর বুদ্ধি তাহার নিজের অসন্তোষের গতি অব্যাহত রাখিবার জন্য কল্পনাবলে একটা জটিল পথ নির্ম্মাণ করিয়া লয়, অবশেষে ঘটনাচক্রের সংঘর্ষণে সেই পথ প্রশস্ত হইয়া তাহার দুঃখের মাত্রা পূর্ণ করে। সেই রাত্রে যদি উভয়ে পরস্পরকে প্রেমভরে আহ্বান করিয়া মিলনের অশ্রুধারায় আপনাদের বিরহ-তপ্ত হৃদয় শীতল করিত, তাহা হইলে কাহারও মনে কোন সন্দেহ স্থান পাইত না। কিন্তু প্রেমের প্রতি সন্দেহ খৃষ্টানশাস্ত্রোল্লিখিত জ্ঞানবৃক্ষের ফলের মত; বিধাতার নিষেধ সত্ত্বেও আদিম দুর্ব্বলতাবশতঃ মানুষ তাহা আস্বাদন করে; ইহাতে বড় দুঃখ, কখন কখন মৃত্যুরও অধিক যন্ত্রণা পাইতে হয়; মৃত্যু ত যন্ত্রণার অবসানমাত্র।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

অনেক ক্ষণ পরে আশুতোষ মুখ তুলিয়া বলিল, "ছবির মত দাঁড়িয়ে রৈলে যে, জানালাগুলা খুলে দিয়ে শুতে হয় ত শোও, এই গরমে দরজা জানালা সমস্ত বন্ধ রেখে থাকা যায় না।"—কথার শ্রী দেখ, স্ত্রীর সহিত এই কি প্রথম সম্ভাষণ ? আশুতোষ স্কুলমাষ্টার বটে, এবং তাহাকে ছেলেদের কবিতা পড়াইতে হয়, কিন্তু সে কবি নহে, নিজে ষোলআনা গদ্য, তাহা না হইলে সে-কালের কবির কথায় সে বলিত,

"জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু নয়ন না তিরপিত ভেল।"

না হয় এ কালের কবির ভাষায় বলিত,

"জনম অবধি বিরহে দগধি
এ পরাণ হয়েছিল ছাই,
তোমার অগাধ প্রেমপারাবার
জুড়াইতে আমি এনু তাই।
বল একবার, আমিও তোমার
তোমা ছাড়া কারে নাহি চাই!"

তা না বলিয়া বলিল,"জানালাগুলা খুলে দাও।" সখীর অভিযোগ তখনও ইন্দুর মনে জাগিতেছিল, একটু ঝগড়া করিবার ইচ্ছাও যে না ছিল তাহা নহে, হঠাৎ তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল,—"আমি ত আর দরজা জানালা খুলবার জন্যে দাসী নই।"

ইন্দুর কথা শুনিয়া আশুর পূর্ব্ব বিশ্বাস দৃঢ় হইল। সে বিরক্ত হইয়া বলিল, "জানালা খুলিলেই কি দাসী হয়, আর স্ত্রী স্বামীর দাসী ভিন্ন কি? সতী স্ত্রীরা আপনাদিগকে স্বামীর দাসী ভাবিয়া গৌরব বোধ করিতেন, তুমি বড়-লোকের মেয়ে, আমার একটা কথা শুনিতে তোমার অপমান বোধ হইল। আমার পূর্ব্ব স্ত্রী গ্রীষ্মের সময় সমস্ত রাত্রি বসিয়া আমাকে পাখা করিয়াছে, যেটি যায়, তেমনটি আর হয় না।"

অতি নিষ্ঠুর আঘাত। আশুতোষ ভাবিয়াছিল, হৃদয়ে বেদনা দিয়া স্ত্রীর মন পরিবর্ত্তিত করিবে, কিন্তু স্ত্রীর হৃদয়ও যে মনুষ্য-হৃদয়, এবং আঘাত পাইলে পশুর ন্যায় তাহা আজ্ঞানুবর্ত্তী না হইয়া প্রতিঘাত করে, মাষ্টার মহাশয়ের সে জ্ঞান ছিল না। সে তাহার পাঁচ বৎসরের কার্য্য-জীবনের অভিজ্ঞতায় দেখিয়াছে যে, সৎ উপদেশের মহিমা অপেক্ষা বেত্রের মহিমায় বেশী ফল পাওয়া যায়, তাই সেই বেত্রনীতির অবলম্বন করিয়া ইন্দুকে এ কথাগুলা বলা হইল।

ইন্দু দুই হাতে দ্বার চাপিয়া ধরিয়া আশুর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "যেমনটি গিয়াছে তেমন না হয়ে থাকে আর একটা আনগে, আমি ত আর সাধিয়া তোমার গলায় মালা দিতে যাই নাই।"

ক্রোধে অপমানে আশুর মুখ লাল হইয়া উঠিল, বলিল, "তুমি সাধ নাই, তোমার বাপ আমার পায়ে ধরিয়া তোমাকে সম্প্রদান করিয়াছিলেন, আমাকে গরীব দেখিয়া এখন তোমাদের ঘৃণা হইয়াছে।"

ইন্দু কোন উত্তর করিল না; সরোষে গৃহ ত্যাগ করিয়া একবারে তাহার বিধবা পিসির শয্যায় গিয়া শুইয়া পড়িল, এবং বালিশে মুখ গুঁজিয়া কাঁদিতে লাগিল।

পিসি জিজ্ঞাসা করিলেন,"কিলো ইন্দু কাঁদিস্ কেন? জামাইএর সঙ্গে ঝগড়া করেছিস বুঝি? এ তোর বড় অন্যায়, কত দিন পরে এসেছে! যদি বা দু'কথা ব'লে থাকে তা শুনে কি রাগ কর্ত্তে হয়?"

ইন্দু কোন উত্তর করিল না, তাহার দুঃখের কথা কাহারও নিকট প্রকাশ

করিতে সে লজ্জা বোধ করিল, কাঁদিয়া কাঁদিয়া অনেক ক্ষণ পরে ঘুমাইয়া পড়িল।

পর দিন প্রভাতে দেখা গেল, আশুতোষ কাহাকেও কিছু না বলিয়া শ্বশুরালয় পরিত্যাগ করিয়াছে। সকলেই, বিশেষতঃ রামকান্ত বাবু অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন, কিন্তু এ কথা লইয়া আর কোন উচ্চবাচ্য হইল না; ইন্দুর মা গম্ভীরমুখে বলিলেন, "তখনই জানি, এ জামাই নিয়ে কখন সুখ হবে না, আমার একটি বই মেয়ে নয়, তাকেও এমন জামায়ের হাতে দিতে হয়েছে; ঠাকুরই কেবল কুল কুল ক'রে অস্থির হয়েছিলেন; কথায় কথায় রাগ, এমন গোঁয়ার জামাই কি ভদ্রলোকের হয়?"—কিন্তু জামাইএর রাগের কারণ কেহই জানিতে পারিল না, ইন্দুর সইও না। তবে সরোজবাসিনীকে ফাঁকি দেওয়া ইন্দুর সাধ্য নয়, সে ইন্দুর মনের কথা কিছুতে বাহির করিতে না পারিলেও হাসিয়া বলিল, "বুঝেছি সই, লেবু বেশী ক'রে রগড়াতে গিয়েই তিত ক'রে ফেলেছিস্, বুঝ্‌তে পারিস্ নি, পুরুষ জাতটে ঠিক ময়দার মত ভাই, শুকনো থাক্‌তে কিছুতেই তাদের কায়দা করা যায় না। কিন্তু একটু আদরের জল ঢেলে দিব্বি ক'রে ডলে নিলে, তাতে দেবতাই গড় আর বানরই গড়, রুটি, লুচি, চাপাটি সব তৈয়ার করা যায়।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

আশুতোষ তাহার ছোট কার্পেটের ব্যাগটি হাতে লইয়া পরিশ্রান্তভাবে পরদিন সন্ধ্যার সময় ধীরে ধীরে গৃহপ্রাঙ্গনে প্রবেশ করিল। আশুর মা তখন দাওয়ায় বসিয়া দীপসংস্কারকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, আশুকে সহসা ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া তাঁহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না, উদ্বেগের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বাবা আশু, যেতে মাত্র ফিরে এলে যে?"

আশু কোন উত্তর করিল না, কূপ হইতে জল তুলিয়া নিবিষ্টচিত্তে পা ধুইতে লাগিল। মা পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে, কথা বলিস্‌নে যে? সব ভাল ত, বৌমা ভাল আছেন?"

"হুঁ"—এই মাত্র সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়া আশু শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল। সন্ধ্যা ক্রমে গভীর হইয়া আসিল। আশু শুইয়া কত কথা ভাবিতে লাগিল, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ভাবিতে ভাবিতে অনেকদিনের একখানি বিস্মৃতপ্রায়

মুখ তাহার নয়নসমক্ষে বিকশিত হইয়া উঠিল, কোমল অলকদাম শ্যামল কিশলয়দলের ন্যায় সেই প্রফুল্ল মুখখানি বেষ্টন করিয়া আছে, অতি স্নিগ্ধ মধুর হাসি, দৃষ্টি প্রখরতাশূন্য, নীল আকাশে স্থির নক্ষত্রের মত উজ্জ্বল এবং অচঞ্চল! যেন বালিকা গৃহকর্ম্মের অবসানে তাহার পাশে আসিয়া বসিয়াছে, এবং প্রেমপূর্ণ উৎসুক দৃষ্টিতে তাহার মুখখানি নিরীক্ষণ করিতেছে। আশু স্বীয় কপোলে তাহার উষ্ণ নিশ্বাসপতনের শব্দ অনুভব করিল;—স্নেহময়ী, পরলোকগতা, সুশীলা পত্নী শান্তমণির কথা আজ তাহার মনে পড়িয়াছে।

সহসা চক্ষু মেলিয়া আশু কোথাও কিছু দেখিতে পাইল না। নৈশবায়ু বাতায়নপথে প্রবেশ করিয়া তাহার ব্যথিত কপোলে বীজন করিতেছে, এবং ঊর্দ্ধাকাশ হইতে নক্ষত্রবধূ স্থির নেত্রালোক প্রসারিত করিয়া যেন তাহার চিন্তাক্লিষ্ট, অভিমানম্লান, অন্ধকারপূর্ণ হৃদয়খানির অন্তর্দ্দেশে বেদনার উৎসানুসন্ধানে নিযুক্ত আছে।

এমনই করিয়া বুকে বেদনা বহিয়া আশুর ছয় মাস কাটিয়া গেল। পূজার সময় দাদাশ্বশুর নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন,আশু একটা মিছা ওজর করিয়া শ্বশুরবাড়ী গেল না; পূজার তত্ত্ব আসিল, সে কিছুতেই তাহা লইবে না, ফেরত পাঠাইতে প্রস্তুত, কিন্তু মা কিছুতেই ফেরত দিতে দিলেন না, তিনি বলিলেন, "আলস্য, নিদ্রা,আর বিবাদ যত বাড়ান যায়, ততই বাড়িয়া উঠে,হাজার হোক তুই তাদের জামাই, তুই তাদের সঙ্গে মন্দ ব্যবহার করিলে কি তারা বড় সুখী হবে?" আশুতোষ বলিল, "আর তারা আমার সঙ্গে বড় ভাল ব্যবহার করে?"—"তাই তুই তাদের মনে কষ্ট দিয়া প্রতিশোধ লইবি, এত লেখা পড়া শিখে তোর এই জ্ঞান জন্মিয়াছে?"—আশু আর কোন উত্তর করিল না।

অগ্রহায়ণ মাস আসিল। অল্প অল্প শীত পড়িয়াছে। রাত্রে আশু বিছানায় বসিয়া পুস্তক পড়িতেছে, এমন সময় মা আসিয়া বলিলেন, "বাবা লোকে নিন্দা করবে, আর ত বৌকে বাপের বাড়ী রাখা উচিত নয়, তাঁকে আন্‌তে পাল্কী পাঠান যা'ক্।"—আশু পুস্তকের দিকে চাহিয়া অনেকক্ষণ কি চিন্তা করিল। মা বলিলেন, "কথা কস্‌নে যে।" আশু গম্ভীরমুখে বলিল, "সে বড়লোকের মেয়ে গরীবের ঘর করবে—তা বোধ হয় না; যদি পালকী বেহারা ফেরত আসে ত অপমান রাখবার স্থান থাকবে না, আমরাও লজ্জায় কাকেও মুখ দেখাতে পারবো না।" মা বলিলেন, "বিয়ের আগে ত আর আমাদের

জমীদারী ছিল না, জেনে শুনেই ত বিয়ে দিয়েছে, মেয়ে তাদের বটে, বৌ ত আমারই, গরীবের পুত্রবধূ হয়ে মালক্ষ্মী গরীবকে ঘৃণা করবেন, আমার ঘরে আসবেন না, এ আমি কিছুতে বিশ্বাস করিনে। আশু, আমি মানুষ চিনি, তিন দিনেই আমি বুঝেছি—বৌমার আমার গুণের সীমা নেই।"—আশু অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া বলিল, "বুড়ো হয়ে তুমি তামা কি সোনা কিছু বুঝতে পার না, সব এক রকম বোধ হয়। আমার শাশুড়ী বড় সহজ লোক নয়।" কিন্তু মা কিছুতেই ছাড়িবেন না, অগত্যা একটা দিনস্থির করিয়া আশু তাহার বাড়ীর ঝির সঙ্গে মায়ের জবানী একখানি পত্র দিয়া পাল্কী বেহারা পাঠাইয়া ছিল।

ইন্দুর পিতামহ বাড়ী থাকিলে হয় ত তিনি ইন্দুকে পাঠাইতে অমত করিতেন না, কিন্তু তিনি তীর্থপর্য্যটনে গিয়াছিলেন, ইন্দুর বাপও তখন মফঃস্বলে। ইন্দুর মা গৃহকর্ত্রী, ইচ্ছা করিলে তিনি কন্যাকে পাঠাইতে পারিতেন,পাঠাইতে অনিচ্ছা থাকিলেও তিনি ভদ্রভাবে শ্বশুর ও স্বামীর অনুপস্থিতির ওজর করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি জামাতার উপর হাড়ে চটিয়াছিলেন। বোধ করি, আশুর অবিনীত ব্যবহারই তাঁহার রোষবৃদ্ধির কারণ। তিনি ত পাল্কী ফেরত পাঠাইলেনই, ঝিকেও দশ কথা শুনাইয়া দিলেন, বেয়ানকে লিখিলেন, "আপনার বৈবাহিক গৃহে থাকিলে তিনিই উত্তর লিখিতেন,— আমার মেয়ে পথে বসিয়া নাই যে, আপনি পালকী পাঠাইলেন, আর আমি তাহাকে তাহাতে তুলিয়া বিদায় করিলাম। পূর্ব্বে আমাদের এ কথা জানান উচিত ছিল। বিশেষতঃ আমার কন্যাকে আমি কখন বনবাস দিতে পারিব না, আপনার পুত্রকে বলিবেন—আগে যেন আমার কন্যার বাসের উপযুক্ত গৃহ নির্ম্মাণ করে, তাহার পর লইয়া যাইবার চেষ্টা করে।"

স্ত্রীলোকের কি কঠোর ভাষা! একটু ভদ্রতা নাই, একটু চক্ষুর্লজ্জা নাই। ধনগর্ব্ব কি মানুষকে এমনি অন্ধ করিয়া ফেলে?—আশু এই পত্র পাইয়া এবং ঝির মুখে সকল কথা শুনিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল, রাগের ঝোঁকে মাকে কতকগুলা তিরস্কার করিল। মা কোন উত্তর করিলেন না, কেবল তাঁহার চোখ দিয়া কয়েক ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া বিবর্ণ শুষ্ক গণ্ডস্থল সিক্ত করিল; শেষে তিনি কাতরভাবে বলিলেন, "ছেলের বৌ নিয়ে সংসারধর্ম্ম কর্ত্তে পেলাম না, অদেষ্টে নেই, দোষ দেব কার?"

দুশ্চিন্তায় আশুর দিবারাত্রি কাটিতে লাগিল, তাহার মনে প্রতিশোধ-

গ্রহণের কামনা আগুণের মত জ্বলিয়া তাহার মানসিক সুখশান্তি দগ্ধ করিতে লাগিল। একবার সে মনে করিল, আর একটা বিবাহ করিয়া এ অপমানের প্রতিশোধ দিই। শেষে ভাবিয়া দেখিল, ইহাতে নিজেরই অধিক ক্ষতি; বেদনার উপর ব্লিষ্টার বসাইলে বেদনার প্রকোপ কম হয় বটে, কিন্তু ব্লিষ্টারের জ্বালায় জীবনসংশয় ঘটে।

ফাল্গুন মাসে আশুর মা কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইলেন। ব্রাহ্মণের বিধবা, তাহাতে বৃদ্ধার জীবনের প্রতি মমতা ছিল না, সংসারে তিনি একাকিনী, এবং সাংসারিক শ্রমও অল্প নহে; শরীরের প্রতি উপেক্ষাবশতঃ প্রথমে তিনি রোগের কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করেন নাই, অবশেষে যখন দেহ অবসন্ন হইয়া পড়িল, তখন একেবারে শয্যা গ্রহণ করিলেন। আশু কবিরাজ ডাকিল, দিবারাত্রি প্রাণপণে মায়ের সেবা করিতে লাগিল; তাহার স্কুলের কাজ এক রকম বন্ধ। ভাগ্যে এক দূরসম্পর্কীয়া মাসী গ্রামে বাস করিতেন, এ দুর্দ্দিনে আসিয়া তিনি আশুকে দুবেলা দুটি ভাত রাঁধিয়া না দিলে তাহাকে অনাহারে থাকিতে হইত।

একদিন মা বলিলেন, "বাবা! তুই যতই প্রাণপণে আমার সেবা কর, এবার আর আমি বাঁচবো না, আমার শেষ কালের একটা কথা রাখ, বৌমাকে একবার দেখা।"

আশু নতমস্তকে বলিল, "আমার কি তাতে অসাধ মা? কিন্তু তারা যে পাঠাইবে না। তোমার বৌ যদি ঘৃণা করে না আসে, বারে বারে আমার আর অপমানিত হবার ইচ্ছে নেই।"

বৃদ্ধা উত্তর করিলেন, "তারা মানুষ ত? আমার অবস্থার কথা লিখে দেখ্—আমার এই শেষ ইচ্ছাটা অপূর্ণ রাখিস্ নে।"

আশু বলিল, "মা, তোমার জন্য আমি সকল অপমান স্বীকার করতে প্রস্তুত; ইচ্ছা ছিল না যে, সেই অহঙ্কারী বড়লোকের কাছে আমি আবার ভিক্ষুকের মত স্ত্রী ভিক্ষা চাব; যা হোক, কালই পালকী পাঠিয়ে দেব।"

আশুর মা আশ্বস্তা হইলেন। বহুকাল পরে একদিন সন্ধ্যার প্রাকালে সহসা একবার রুদ্ধ গৃহ উন্মুক্ত হইলে যেমন অস্তমান তপনের অন্তিম রশ্মি গৃহ-প্রাচীরবিলম্বিত লূতাতন্তুসমাচ্ছাদিত ধূলিধূসরিত জীর্ণ চিত্রপটখানি মুহূর্ত্তের জন্য সজীব ও উজ্জ্বল করিয়া তোলে, আশুর কথা শুনিয়া তাহার মাতার

রোগকাতর পাণ্ডুর মুখচ্ছবি ক্ষণকালের জন্য সেইরূপ সজীব ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি আশুকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "চিরজীবী হও বাবা, তুই আমার কথা অগ্রাহ্যি করবিনে তা জানি, আমি ত বৈতরণীর কিনারায় দাঁড়িয়েছি, আমার জন্যে ভাবিনে, তোকে যে একা সংসারে ভাসিয়ে যাচ্ছি, এই ভেবে আমার মরণেও শান্তি নেই।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

আশু রাগ করিয়া চলিয়া যাইবার পর হইতে ইন্দুর মনে আর সুখ নাই; সর্ব্বদাই তাহার মনে হইত, কেন অভিমান করিলাম, কেন রাগ করিয়া কঠিন কথা বলিলাম, কেন তাঁহার পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাহিলাম না? তিনি ত সত্যই বলিয়াছিলেন,স্ত্রীলোক স্বামীর দাসী ভিন্ন আর কিছু নয়,সীতা,সাবিত্রী,দময়ন্তী, সকলেই নিজেকে স্বামীর দাসী বলিয়া মনে করিতেন, আর আমি হতভাগিনী রূপের গৌরবে, অহঙ্কারের মোহে অন্ধ হইয়া স্বামীকে তাচ্ছীল্য করিলাম, কেন আমার এমন কুমতি হইল, সই আমার যত নষ্টের গোড়া, তার কথা শুনিয়াই ত আমি মন খারাপ করিয়া বসিয়াছিলাম।

আবার এক এক সময় ইন্দু ভাবিত, আমি তাঁহাকে পত্র লিখি, কাতরভাবে পত্র লিখিলে তিনি আমাকে ক্ষমা না করিয়া থাকিতে পারিবেন না; কিন্তু তখনই দুর্জ্জয় অভিমান আসিয়া বাধা দিত। হায়, নারী-অভিমান! হৃদয় বিদীর্ণ হইলেও রমণী তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারে না। ইন্দু মনে মনে বলিত, "আমি দাসী হইতে পারি, কিন্তু তাই বলিয়া কি নিতান্তই অবহেলার যোগ্য? আমি এতই পর যে, তিনি একবার আমার খোঁজ লওয়াও দরকার মনে করেন না?"

সেবার যখন ইন্দুর শাশুড়ী তাহাকে লইয়া যাইবার জন্য পালকী পাঠাইয়াছিলেন, তখন ইন্দুর যাইবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু মায়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কথা বলিতে পারে নাই, আর পাঁচ জনই বা তাহার মনের কথা শুনিলে কি বলিবে? লজ্জার অনুরোধে ইচ্ছাসত্ত্বেও আশুর ঝিকেও একটা কথা বলিতে পারে নাই; সই শ্বশুরবাড়ীতে, তাহার সঙ্গেও কোন পরামর্শ করিতে পারে নাই। কিন্তু পালকী বেহারা ফিরিয়া গেলে তাহার মনের অশান্তি আরও বাড়িয়া উঠিল, সে আপনার অতুল রূপরাশি লইয়া পিতৃগৃহে ফুটিয়া রহিল

ঘটে, কিন্তু তাহার মুখের হাসি ওষ্ঠপ্রান্তে মিলাইয়া গেল; চক্ষের জল চক্ষেই শুকাইতে লাগিল। কত দিন সে লোকমুখে পীড়িতা শাশুড়ীর কাতরতা, স্বামীর কষ্ট ও অসুবিধার কথা শুনিয়াছে, অন্ধকার গৃহে অনিদ্রভাবে শয্যায় পড়িয়া কত রাত্রি ছট্‌ফট্‌ করিয়াছে, এবং তাহার অশ্রুপ্রবাহে উপাধান সিক্ত হইয়াছে, কেহ তাহা দেখে নাই; অথবা বুঝি কেবল এক জন তাহার এ নিদারুণ অন্তর্জ্জালা দেখিয়াছিলেন, যিনি দিবারাত্রি অতন্দ্র থাকিয়া বিশাল সংসারের প্রত্যেক কার্য্য সুনিয়ন্ত্রিত করিতেছেন; ইন্দুমতীর এই গভীর হৃদয়োচ্ছ্বাস তাঁহার অজ্ঞাত রহিল না। মা জিজ্ঞাসা করেন, "হ্যাঁলো ইন্দু! তুই দিন দিন ওরকম হচ্ছিস্ কেন?" ইন্দু নতমস্তকে আঙ্গুলে অঞ্চল জড়াইতে জড়াইতে উত্তর দেয়, "কেমন আবার হচ্ছি?"—মাতার আদরের দাসী কুসী বলে, "দিদিমণি, তোমার এত সুখ, এত ঐশ্বর্য্য, তবু যেন কিছুতে তোমার মন উঠে না।" ইন্দু হাসিয়া বলে, "গোয়ালার মেয়ে, তোর ত ভারি বুদ্ধি! সুখ ঐশ্বর্য্যের মুখে আগুণ।"

অবশেষে শেষবার পাল্কী ও বেহারা লইয়া এক ঝি ইন্দুর বাপের বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। এবার আশু স্বয়ং তাহার দাদাশ্বশুরকে পত্র লিখিয়াছিল। বৃদ্ধ চশমা জোড়াটা খাপ হইতে খুলিয়া ভাল করিয়া মুছিলেন, অনন্তর তাহা চোখে লাগাইয়া শুভ্র ভ্রূ জোড়াটা আকুঞ্চিত করিয়া পড়িলেন, "দাদামহাশয়, আমার অসংখ্য প্রণাম জানিবেন। সম্প্রতি আমার মা সংশয়াপন্ন কাতর, বাঁচেন কি না সন্দেহ, তিনি তাঁহার পৌত্রীকে দেখিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, এ জন্য পাল্কী ও বেহারা পাঠাইলাম, যাহা কর্ত্তব্য বোধ হয় করিবেন। ইতঃপূর্ব্বে আর একবার পাল্কী পাঠান হইয়াছিল, আপনি বাড়ী ছিলেন না, শুনিয়া থাকিবেন, আমার শাশুড়ী পাল্কী বেহারা ফেরত দিয়াছিলেন; এবার আপনি গৃহে থাকিলে আশা করি সেরূপ হইবে না। ভগবানের আশীর্ব্বাদে আপনি অর্থশালী; কিন্তু পৃথিবীর সকলেই ধনী নহে, আমার শাশুড়ী ঠাকুরাণীর পৈতৃক অবস্থার কথা বোধ করি এক্ষণে স্মরণ নাই; কারণ দরিদ্র পিতামাতার কথা মনে থাকিলে দরিদ্র জামাতার প্রতি অবহেলা প্রকাশ করা তিনি কর্ত্তব্য বোধ করিতেন না। সকল কথা ঝির মুখে শুনিবেন, অধিক কথা লিখিবার অবসর নাই, আমি বড়ই বিপন্ন।"

পত্র পড়িয়া কর্ত্তা একটু হাসিয়া বলিলেন, "ভায়া বড় উষ্মা প্রকাশ করে-

ছেন। তা হতেই পারে, ইংরাজীনবীশ কি না; মেজাজ একটুতেই গরম হয়ে উঠে।" তাহার পর ইন্দুকে ডাকিয়া বলিলেন, "দিদি! আর তো তোমায় রাখ্‌তে পারিনে; দ্বারকা হতে রথ এসেছে, এখন যদি গোল করি ত এ শিশুপাল বেটারই মরণ!"— ইন্দু গর্জ্জন করিয়া বলিল, "যাও দাদামশায়, তোমার সকল সময়ই রঙ্গ।"

কিন্তু ভিতরে কিছু কঠিন রঙ্গ বাধিয়া উঠিল। পত্রখানি কেমন করিয়া ইন্দুর মার হাতে আসিয়া পড়িল। তিনি পত্র দেখিয়া তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিলেন। লঘু গুরু জ্ঞান নাই, এত অহঙ্কার?—তিনি বাঁকিয়া বসিলেন, কিছুতেই মেয়ে পাঠাইবেন না। শ্বশুরের ত কাণ্ডজ্ঞান নাই; তিনি যদি জোর করিয়া পাঠান, তবে গৃহিণী আত্মহত্যা করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন। সমস্ত দিন গৃহিণীর গর্জ্জনে সেই বৃহৎ অন্তঃপুর প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। সন্ধ্যার পর ত্রিপুরা বাবু কাছারী হইতে আসিলে ইন্দুর মা সরোষে পত্রখানি তাঁহার সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া মেয়ে পাঠান সম্বন্ধে তাঁহার কি মত জানিতে চাহিলেন, এবং তাঁহার মত শুনিবার পূর্ব্বেই বলিলেন, "এমন অসভ্য জামাই। ভদ্দোরলোকের ছেলে কি কখন এমন চাষা হয়? বিষের সঙ্গে খোঁজ নেই কুলো পানা চক্কোর। মেয়েকে বিষ খাওয়াতে হয় সেও স্বীকার, এমন জামাইকে কখন মেয়ে দেবোনা, তা তোমরা যে যাই বল। আমার অপমান, আমার মা বাপ তুলে কথা বলা!"—গৃহিণী একেই কিছু স্থূলকায়া, ক্রোধে ফুলিয়া বিশ্বম্ভর-মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। ত্রিপুরাচরণ বলিলেন; "আমার হ'য়েছে সাপের ছুঁচো-ধরা; বাবা মেয়েটা জলে ভাসিয়েছেন, এখন আক্ষেপ করে কি করবো?"—তিনি জানিতেন, পিতা মেয়ে পাঠাইতে বলিলে তিনি কখন ইন্দুকে রাখিতে পারিবেন না, অথচ গৃহিণীর আবদার উপেক্ষা করাও কঠিন; এখন ত্রিপুরাচরণ বাবুর অবস্থা অনেকটা

"না ধরিলে রাজা বধে ধরিলে ভুজঙ্গ
সীতার হরণে যথা মারীচ কুরঙ্গ।"

ইন্দু আজ সমস্ত দিন ঘোর অন্যমনস্কা। আজ তাহার অদৃষ্টের নির্দ্দয়, নির্ম্মম পরীক্ষা আরম্ভ হইয়াছে। সে বুঝিয়াছিল, আজ তাহার সম্বন্ধে তাহার পিতামাতার মধ্যে নিশ্চয়ই কথাবার্ত্তা হইবে, তাই সন্ধ্যাকালে পিতাকে গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়া বাতায়নসন্নিকটে দাঁড়াইয়া সে সকল কথা শুনিতে-ছিল। ইন্দু দাঁড়াইয়াছিল, সকল শুনিয়া ধীরে ধীরে সে অবলম্বনবিচ্যুত ছিন্ন-

তার ন্যায় অবশ ভাবে বসিয়া পড়িল; মুহূর্ত্তের মধ্যে নিজের বর্ত্তমান ও বষ্যৎ সকল অবস্থা বুঝিতে পারিল; তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল; তাহার মনে হইল, ইহার পর হয় ত তাহার পতিগৃহের পথ চিররুদ্ধ হইবে, পিতৃগৃহে সে শূন্যপ্রাণে, উদ্দেশ্যহীনভাবে ভিখারিণীর ন্যায় কেমন করিয়া এই দীর্ঘ জীবন বহন করিবে? এই বিপুল পৃথিবীতে কোথাও বুঝি আর তাহার স্থান নাই। কিয়দ্দিন হইতে সে এই কথাই ভাবিয়া আসিতেছে; আজ মাতার কঠোর প্রতিজ্ঞা শুনিয়া তাহার বোধ হইতে লাগিল, এই আলোক ও অন্ধকারচিত্রিত সুখদুঃখময়ী, আনন্দবিষাদসমাচ্ছন্না, বিশাল বিস্তৃত বসুন্ধরা তাহার বক্ষোলগ্ন অনন্ত কোটী জীবের বৈচিত্র্যময় জীবনপ্রবাহ লইয়া যেন ধীরে ধীরে তাহার পদতল হইতে অপসৃত হইয়া যাইতেছে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

স্বামীর নিকট অনুকূল উত্তর না পাইয়া ইন্দুর মা সরোষে গৃহ হইতে বাহির হইলেন, সম্মুখেই দেখিতে পাইলেন, জানালার নীচে কে যেন মাথা গুঁজিয়া বসিয়া আছে। সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও কে!"—কোন উত্তর নাই। তিনি পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখানে কে বসে?" তথাপি ইন্দু নিরুত্তর। তখন প্রভাবতী অধিকতর বিস্ময়ের সহিত বলিলেন, "কুসী! ল্যাম্পটা একবার এখানে আনতো।" কুসী তাড়াতাড়ি একটা হরিকেন ল্যাম্প হাতে লইয়া সেখানে উপস্থিত হইলে, দীপালোকে ইন্দুর মা দেখিলেন, ইন্দু নতমুখে, ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে!—কন্যাকে এমনভাবে এমন অবস্থায় দেখিবেন, ইহা তিনি মনেও করেন নাই। স্নেহার্দ্র মধুরস্বরে বলিলেন, "কে ইন্দু? আজ তোর কি হয়েছে মা? ভয় নেই, আমি তোকে স্বরূপপুরে পাঠাচ্ছিনে, তুই কি ভেবেছিস্ আমাদের প্রাণ থাক্‌তে তোকে ভাসিয়ে দেব, তা কখন হবে না।" মায়ের স্নেহগর্ভ কথা শুনিয়া ইন্দুর শোকাবেগ শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল, সে ঊর্দ্ধমুখে দীননয়নে মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "মা, আমাকে বিষ দাও—তাই খেয়ে মরি, আর তোমাদের ভাল কথার দরকার নেই, আমি তোমার অভাগিনী মেয়ে, তোমাদের সৌভাগ্যের সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নেই।"

রমণী-হৃদয়ের রহস্য কে বুঝিবে? দরিদ্র বলিয়া যে স্বামীকে ইন্দু একদিন উপেক্ষা করিয়াছে, আজ সেই স্বামী তাহার মাতা কর্তৃক উপেক্ষিত হওয়ায়

ভগ্নবাঁধ জলস্রোতের ন্যায় তাহার দুর্জ্জয় অভিমানের অশ্রুপ্রবাহে সঙ্কোচের বন্ধন ছিন্ন হইয়া গেল। সত্য, সেও একদিন তাহার স্বামী অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়াছিল, কিন্তু তখন সে তাহার নিজের হৃদয় বুঝিতে পারে নাই, তাই প্রথম যৌবনের দর্পে, পিতৃগৃহের ধনের ও আদরের অহঙ্কারে সে প্রেমের প্রতি উপহাস করিয়াছিল; কিন্তু সেই অপমানিত ক্ষুব্ধ প্রেম পদাহত সর্পের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া তাহাকে এমন দংশন করিল যে, সহসা সে তাহার রূপযৌবন ও ধনগৌরবের সুখসুপ্তি হইতে জাগ্রত হইয়া দেখিল, তাহার বুভুক্ষিত নারীহৃদয় সমস্ত বাসনা ও বেদনা লইয়া ভিখারিণীবেশে দীনভাবে রোদন করিতেছে। তাই এত দিন পরে আজ সে মায়ের সম্মুখে আর আত্ম-গোপন করিতে পারিল না। ধীরে ধীরে দণ্ডায়মান হইয়া কাতর স্বরে বলিল, "মা! যে দরিদ্রের হাতে তোমরা আমাকে সঁপিয়া দিয়াছ, আমার সকল সুখ দুঃখ তাহারই উপর নির্ভর করিতেছে, তাহার কাছেই আমাকে পাঠাইয়া দাও। আর যদি তোমাদের সম্মানের কাছে আমায় বলি দিতেই চাও, তবে আমাকে আগে মারিয়া ফেল।"

হরি, হরি, "যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর!"—যে কন্যার সুখের অনুরোধে প্রভাবতী এত দিন তাহাকে স্বামিগৃহে পাঠান নাই, জামাতার দারিদ্র্য স্মরণ করিয়া তিনি যে কন্যাকে রত্নালঙ্কারে সাজাইয়া তাহার মনোব্যথা ঘুচাইবার চেষ্টা করিতেছেন, সেই আজ নিজে ইচ্ছা করিয়া শ্বশুরগৃহের দারিদ্র্যের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িতে চায়! তিনি অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

ধনাঢ্যের পত্নীত্বলাভে শুধু অহঙ্কারে স্ফীত না হইয়া প্রভাবতী যদি মনুষ্যচরিত্রের মর্ম্মগ্রহণের কখন চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে তিনি বুঝিতেন, রমণীহৃদয় মাটী কিংবা কাঠ নহে; বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত থাকিয়াও প্রেমহীন উৎকট সুখভোগের মধ্যে সে হৃদয়ের পূর্ণ পরিতৃপ্তিলাভ কখন সম্ভবপর নহে। প্রজাপতি নির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত আপনার ক্ষুদ্র জন্মকোটরের অভ্যন্তরে নিশ্চেষ্টভাবে কালাতিপাত করে, কিন্তু যখন তাহার সর্ব্বাবয়ব পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, যখন সে তাহার ক্ষুদ্র বক্ষের মধ্যে জীবনের স্পন্দন অনুভব করে, তখন সে আর তাহার সেই নিরাপদ তরুশাখালগ্ন আরামকোটরটিতে আবদ্ধ থাকিতে পারে না, নিশ্চেষ্ট জড়তা পরিত্যাগ পূর্ব্বক তখন সে তাহার চিত্রিত বর্ণবিচিত্র সুদৃশ্য লঘু পক্ষদ্বয় প্রসারিত করিয়া কনককিরণপ্লাবিত উষাকাশে

মূল লুপ্ত হয়, এবং বিশ্বের সৌন্দর্য্যের মধ্যে আপনাকে মগ্ন করিয়া ফেলে। পুরুষের হৃদয় কঠোর লৌহ হইলেও, নারী হৃদয় চুম্বকবৎ, সে কখন অনাকৃষ্ট থাকে না, শত বাধা ব্যাহত করিয়া স্বাভাবিক আকর্ষণশক্তির প্রভাবে সেই লৌহের সহিত সম্মিলিত হয়, ইহাতেই তাহার জীবনের সার্থকতা, ইহাই তাহার স্বাভাবিক ধর্ম্ম।

প্রভাবতী অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চিন্তা করিলেন, তাহার পর ইন্দুর হাত ধরিয়া তাহাকে তাঁহার গৃহমধ্যে লইয়া গেলেন, বলিলেন, "মা, আমার মেয়ে হইয়া তোমার এত দুর্ম্মতি হইবে, তাহা কখন স্বপ্নেও ভাবি নাই; তা যাহা হোক, তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি তোমাকে ঘরে রাখিতে চাহি না, কালই তোমায় শ্বশুরবাড়ী পাঠাইয়া দিব; আজ রাত্রেই তোমার জিনিসপত্র গুছাইয়া রাখ।"

রাত্রে প্রভাবতী স্বামীকে সকল কথা খুলিয়া বলিলেন; শেষে নিশ্বাস-ত্যাগ পূর্ব্বক মন্তব্য প্রকাশ করিলেন, "মেয়ে কখন যে আপনার হয় না, তা আজ জান্‌তে পারলাম।" ত্রিপুরাচরণ বাবু এতক্ষণে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচি-লেন, পিতার অনুরোধ এবং গৃহিণীর আবদার, কোন্‌টা পালন করা কর্ত্তব্য, এতক্ষণ তাহা স্থির করিতে না পারিয়া তিনি ফাঁপরে পড়িয়াছিলেন। এত-ক্ষণ পরে তিনি প্রশান্তচিত্তে গৃহিণীকে বলিলেন, "মেয়ে যে আপনার নয়, তা যেদিন তাকে পরের হাতে সম্প্রদান করেছি, সেই দিনই জেনেছি।"

পরদিন ইন্দু শ্বশুরবাড়ী চলিল। চারি বৎসর পরে সে শ্বশুরবাড়ী যাইতেছে। গৃহিণী আজ তাহাকে চোখের জলে বিদায় দিতেছেন; আসন্ন কন্যাবিচ্ছেদ-সম্ভাবনায় তাঁহার মাতৃহৃদয় আজ আকুল হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু ইন্দু অনেকটা স্থির, প্রচণ্ড ঝটিকার পর প্রকৃতি যেমন স্থির হয়, তেমনি স্থির। প্রথম চারি দণ্ড বারবেলা, তাহার পর এক প্রহরের মধ্যে যাইবার সময়; ইন্দুর মা স্বহস্তে কন্যাকে সাজাইতে বসিলেন, ভাল করিয়া চুল বাঁধিয়া, ভ্রূমধ্যে সুন্দর একটি ছোট টিপ কাটিয়া, সর্ব্বাঙ্গে যেখানে যত অলঙ্কার ধরে তাহা দিয়া, সাজাইয়া দিলেন। কিন্তু ইন্দু যাত্রার পূর্ব্বে গহনাগুলা খুলিয়া ফেলিল, মনে মনে ভাবিল, আমি ত ঐশ্বর্য্য দেখাইতে যাইতেছি না, সে গর্ব্ব আর আমার নাই; আমি আমার পীড়িতা শাশুড়ীর ও দরিদ্র স্বামীর সেবা করিতে যাই-তেছি। আমার এত গহনার আড়ম্বরে দরকার কি? কিন্তু তাহার মনের কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিল না, মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁলো

গহনাগুলা এরই মধ্যে খু'লে'ফেল্‌লি!" ইন্দু বলিল, "পথ ভাল নয়, গহনা গায়ে রাখিতে সাহস হয় না।" প্রতিবেশিনীদের দুই এক জন মেয়ে বিদায় দেখিতে আসিয়াছিল, তাহারা ইসারায় পরস্পর বলাবলি করিল, "মেয়েটা গরীবের ঘরে পড়েছে কি না, ভাল মন্দ তুতোলা পরতে তাই এত অসাধ, তা পরমেশ্বর কি সকলকেই ভালমন্দ খাওয়া পরার মত অদেষ্ট দেন?"

ইন্দু সকলের নিকট বিদায় লইয়া মঙ্গলঘটের সম্মুখে ও ঠাকুরদালানে প্রণাম করিয়া তাহার ঠাকুরদাদার কাছে বিদায় লইতে গেল। পিতামহের সহিত নাতিনীর কি স্নেহমধুর কোমল সম্বন্ধ, তাহা যে সৌভাগ্যবতী বাল্যে পিতামহ-হীন হন নাই, কেবল তিনিই জানেন। সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল বলিয়া রাম-কান্ত বাবু একবার ভিতর একবার বাহির করিতেছিলেন, তা মেয়ে বিদায় করা কি সহজে হয়? অবশেষে ইন্দু যখন রূপ-পরিমলভার-বিনম্র প্রস্ফুটিত অশোকস্তবকের ন্যায় পিতামহের পদপ্রান্তে মস্তক নত করিয়া তাঁহার নিকট বিদায় প্রার্থনা করিল, তখন সেই পক্বকেশ, স্নেহশীল, সরল বৃদ্ধের কোটরগত চক্ষু দুটি জলে পুরিয়া আসিল; ইন্দুর চক্ষুও শুষ্ক ছিল না, সে তাহার ঠাকুরদাদার মুখের দিকে চাহিতেও পারিল না। রামকান্ত বাবু দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া ইন্দুর মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক স্নেহবিগলিত স্বরে বলিলেন, "যাও দিদি, দীর্ঘজীবিনী হও—স্বামী নিয়ে সুখে সংসারধর্ম্ম কর, আশু বড় সুছেলে, যেমন মহাকুলীন, তেমনি সচ্চরিত্র। তুমি জান্‌তে পারবে, তোমার বুড়োদাদা তোমায় জলে ফেলেনি।" তাহার পর একটু থামিয়া বলিলেন, "আমার মরার আগে আর একবার দেখা দিস্‌, ইন্দু!"

ইন্দু আর অশ্রু গোপন করিতে পারিল না, কাঁদিয়া তাহার ঠাকুর-দাদার শিরাবহুল শীর্ণ হাতখানি ভাসাইয়া দিল, বলিল, "দাদামহাশয়, তোমাকে ছেড়ে আমি কেমন করে থাকবো?" বৃদ্ধ বাম হাতে নিজের চক্ষু মুছিয়া বলিলেন, "ইন্দু, তোর ঠাকুমাকে ছেড়েও ত আমি বেঁচে আছি, সময়ে সব সহ্য হয়! যাবার সময় আর মায়া বাড়াস্‌ নে, এর পরে অদিন হবে, এখন পালকীতে ওঠ।"

ইন্দু পালকীতে উঠিল, ঝি দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল, বেহারা পালকী উঠা-ইল, আশুর বাড়ীর ঝি আর রামকান্ত বাবুর দুই জন দরওয়ান পালকীর সঙ্গে সঙ্গে ছুটিল; যত ক্ষণ পালকী দেখা গেল, তত ক্ষণ বৃদ্ধ মন্ত্রমুগ্ধবৎ সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

সেইদিন অপরাহ্নে ইন্দু শ্বশুরবাড়ী পৌঁছিল। জমীদারের মেয়ে শ্বশুরবাড়ী আসিয়াছে, বেহারাদের ভৈরব হুঙ্কারের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত গ্রামের মধ্যে যেন ডঙ্কা বাজিয়া উঠিল। গ্রামের মেয়েরা ছুটিয়া ইন্দুকে দেখিতে আসিল; কিন্তু হায়, তাহারা যাহা দেখিবার আশা করিয়া আসিয়াছিল, তাহার কিছুই দেখিতে পাইল না। ইন্দুর গায়ে একখানিও গহনা নাই, পরিধানে একখানি সাধাসিধা শাড়ীমাত্র; দেখিয়া কাহারও মনে তৃপ্তি জন্মিল না। পথে ফিরিয়া যাইতে যাইতে ইন্দুর এই "গরিবিয়ানার" একটা ব্যাখ্যা বাহির হইল। অনেকে এক-বাক্যে সিদ্ধান্ত করিল, আশু পাছে গহনাপত্র বিক্রয় করিয়া খায়, এই ভয়ে বৌর সঙ্গে তাহারা একখানা গহনাও পাঠায় নাই। কিন্তু পার্লিয়ামেণ্টের ইলেক্‌সন হইতে পল্লীগ্রামের মিউনিসিপালিটীর নির্ব্বাচন পর্য্যন্ত সর্ব্বপ্রকার বিতণ্ডাক্ষেত্রেই মতদ্বৈধ দেখা যায়; এখানেও সেই সনাতন বিধির ব্যতিক্রম হইল না। কোন কোন পুরনারী পূর্ব্বোক্ত মতের প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, "তা কি আর হয়? তবে পাড়া গাঁ, মেটে বাড়ী, চোর ডাকাতের ভয়ে গহনাপত্র সঙ্গে আনেনি।"—অশিক্ষিতা প্রৌঢ়া বঙ্গরমণীগণ, বিশেষতঃ নিষ্কর্ম্মা গৃহিণী-সম্প্রদায় একটা সামান্য ঘটনা দেখিয়া অতি সহজে তাহার অতি সুসঙ্গত কারণ বাহির করিতে পারেন; কল্পনাশক্তির এমন দুর্লভ উর্ব্বরতা আর কোথাও আশা করা যায় না।

ইন্দু পালকী হইতে নামিয়া একেবারে তাহার শাশুড়ীর শয্যার পাশে পদপ্রান্তে গিয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিল; আনন্দে আশুর মার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। তিনি বধূর মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিবার জন্য হাত উঠাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু শরীর অতি দুর্ব্বল, হাত উঠিল না, কাতর স্বরে বলিলেন, "বৌমা এসেছ, আমার সাত রাজার ধন মাণিক, আমার দরিদ্রের লক্ষ্মী, তোমার সঙ্গে যে দেখা হবে, সে আশা আমার একটুও ছিল না। লোকে ব'লতো,—বৌমা আমার ঘর করবে না,গরীব শাশুড়ীকে ভুলে গিয়েছে, আমি জানি বৌমা আমার লক্ষ্মী।"—ইন্দু অবগুণ্ঠনের অভ্যন্তর হইতে অশ্রুপাত করিতে লাগিল, কোন কথাই বলিতে পারিল না। যেমন করিয়া দিবসাবসানে দিনকর ক্ষীণপ্রভ রশ্মিজালে লতাপত্রভূষিতা ধরণীর শ্যামাঙ্গে আপনার নির্ব্বাপিত প্রায় অন্তিম মহিমার উত্তাপহীন লোহিত রেখাটুকু প্রসারিত করিয়া দেন,

তেমনি করিয়া রোগকাতরা অবসন্না বিধবার ম্লান চক্ষু দুইটি একদৃষ্টে নির্নিমেষ ভাবে ইন্দুর মুখের প্রতি প্রসারিত হইয়া তাঁহার অন্তিমকালের উচ্ছ্বসিত স্নেহাশীর্ব্বাদ প্রেরণ করিতে লাগিল। আশুর ক্লান্ত হৃদয় আজ অনেকটা স্থির।

তাহার পর আশু ও ইন্দু, স্বামী স্ত্রী, দুজনে ক্রমাগত সপ্তাহকাল ধরিয়া দ্বারসমাগত যমদূতগুলার সঙ্গে দিবারাত্রি যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিল, পুত্র ও পুত্রবধূর শুশ্রূষাগুণে আশুর মা এ যাত্রা বাঁচিয়া গেলেন, কয়েক দিনের মধ্যে তিনি পথ্য পাইলেন, ধীরে ধীরে তাঁহার শরীরে বল ফিরিয়া আসিল।

আশু নিশ্চিন্ত হইল, কিন্তু ইন্দু,কি জন্য বলা যায় না, এখনও সর্ব্বদা বিমর্ষ। আশু ইহা লক্ষ্য করিয়াছিল, কিন্তু কারণ বুঝিতে পারে নাই; ইতিমধ্যে সে ইন্দুর গুণ বুঝিতে পারিয়াছিল, সুতরাং গরিবের ঘরে আসিয়া যে ইন্দুর মনোকষ্ট হইয়াছে,এ কথা আর তাহার মনে হইল না; ভাবিল,তাহার পিতামাতা ও দাদামহাশয়ের জন্য ইন্দু এত কাতর হইয়া পড়িয়াছে। একদিন সন্ধ্যার পর আশু ঘরে আসিয়া দেখিল, ইন্দু বিছানায় বসিয়া কাঁদিতেছে, আশু ধীরে ধীরে ইন্দুর বলয়বেষ্টিত হাত দুখানি ধরিয়া তাহাকে আপনার বক্ষে টানিয়া লইয়া, কোমল স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "ইন্দু কাঁদিতেছ কেন?"—ইন্দু স্বামীর স্কন্ধে মস্তক স্থাপন করিয়া নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল। আশু বিষম বিপদে পড়িল, অশ্রু মুছাইয়া কাতর স্বরে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিল, "কি হইয়াছে বল।"—ইন্দু গাঢ় স্বরে বলিল, "আমি এথনো তোমাকে সুখী করিতে পারিলাম না, এই আমার আক্ষেপ; তোমার সুখের জন্য আমি ত সকলই করিতে পারি!" আশু, আবেগের সহিত বলিল, "ইন্দু,-আর আমি অসুখী নই, আমার একমাত্র দুঃখ—আমি দরিদ্র; কিন্তু তোমার মত রত্ন ঘরে পাইয়া আমার সে দুঃখও দূর হইয়াছে; একবার আমার ভুল হইয়াছিল, আমি তোমাকে চিনিতে পারি নাই, তাই নিজেও কষ্ট পাইয়াছি, তোমাকেও কত কষ্ট দিয়াছি; ইন্দু, আমাকে ক্ষমা কর।" ইন্দু আশুর স্কন্ধ হইতে মস্তক না তুলিয়াই বলিল, আমিও তোমাকে চিনিতে পারি নাই, আমি আপনাকেও চিনিতাম না, তাই বুঝি এত অহঙ্কার হইয়াছিল, তা সেটুকু অহঙ্কার কেন তুমি ক্ষমা করিলে না, আজ তোমার দাসীর সকল দোষ মার্জ্জনা কর।"—তখন গভীর প্রেমপূর্ণ প্রগাঢ় চুম্বনে বহুদিন পরে উভয়ের তৃষিত ক্লিষ্ট ব্যথিত হৃদয়ের মধ্যে শান্তিময় সন্ধি স্থাপিত হইল। অনেকক্ষণ পরে আশু বলিল, "ইন্দু, গহনাগুলা একবার গায়ে দাও, মা কয় দিন হইতে তোমাকে সাধিতেছেন; লোকে কলঙ্ক রটাইতেছে যে,

আমি তোমার গহনা বেচিয়া খাইব বলিয়া তোমার মা গহনা সঙ্গে দেন নাই, এ অপবাদ সহ্য হয় না।” ইন্দুর অশ্রু তখনও শুকায় নাই, কিন্তু এবার সে হাসিল, বলিল, “একবার গহনা পরিয়া তোমাকে হারাইতে বসিয়াছিলাম, আবার গহনা? আমি দরিদ্রের বধূ, অলঙ্কার আমায় মানাইবে না, আমি গহনা পরিব না।” বর্ষার বারি-ধারা-সিক্তা নবপুষ্পিতা ঘনপল্লবিতা লতায় বর্ষণান্তে মেঘমুক্ত রৌদ্রকর যেমন ঝক্ ঝক্ করিয়া উঠে, সাশ্রুলোচনা নতমুখী ইন্দুমতীর মুখে মধুর হাসি তেমনি শোভা ধারণ করিল। আশু সহাস্যে বলিল, “আমি ত বলিয়াছি আমার ভুল ভাঙ্গিয়াছে, তোমাকে গহনা পরিতেই হইবে, না পরিলে কিছুতেই ছাড়িব না।”—ইন্দু গহনা পরিল না।

অবশেষে আশু ইন্দুর ষ্টীলের গহনার বাক্সটার চাবি তাহার অঞ্চল হইতে কাড়িয়া লইয়া গহনাগুলি বাহির করিল,এবং জোর করিয়া ইন্দুর গায়ে পরাইতে লাগিল; প্রথমে দু'জনের মধ্যে ভারি একটা কাড়াকাড়ি পড়িয়া গেল, কিন্তু অবশেষে ইন্দুকে হারি মানিতে হইল। সমস্ত গহনা পরান শেষ হইলে আশু বলিল, “অনেক দিন আগে আমি যে ভ্রম করিয়াছিলাম, আজ স্বহস্তে সেই **‘ভ্রম সংশোধন’** করিলাম।”

“আর তোমার ভুল ভাঙ্গিয়াছে, এত দিন পরে এ কথা আজ বিশ্বাস করিয়া বাঁচিলাম।” বলিয়া ইন্দু তাহার অপূর্ব্ব কারুকার্য্যখচিত তারকারাজি-বিজড়িত প্রভাময় সুদীর্ঘ সুবর্ণশৃঙ্খল আপনার কণ্ঠ হইতে উন্মোচিত করিয়া আশুর গলায় জড়াইয়া দিল। এমন সময়ে অদূরবর্ত্তী নদীবক্ষ হইতে এক জন মাঝি নৌকা বাহিতে বাহিতে চন্দ্রকিরণপ্লাবিত নৈশ নীরবতা ভঙ্গ করিয়া গাহিয়া উঠিল,—

“আমার এই প্রেম-গোহালে, রাজার হালে,
বধূ, বাঁধা থাক বার মাস।”

সমাপ্ত।

এ মাসের বহি।

চিত্ত-বিকাশ।*

প্রথম যখন হেমচন্দ্রের কবিতা পাঠ করি, তখন তাহার উন্মাদকরী উত্তেজনায় মুগ্ধ হইয়াছিলাম; কবির প্রতিভা যে ভীরুকে বীর ও বীরকে কাপুরুষ করিতে পারে, তাহা বিশ্বাস করিয়াছিলাম; প্রাচীন গ্রীস হইতে রাজপুতানা পর্য্যন্ত নানা স্থানে সাধারণ জনগণের উপর কবিদিগের প্রবল প্রভাবের কারণ বুঝিতে পারিয়াছিলাম। তাহার পর যখন হেমচন্দ্রের কবিতা পাঠ করি, তখন সে সকল কবিতা অত্যাচারী সমাজের ও জাতির বিরুদ্ধে রণঘোষণার উন্মাদকর গম্ভীর ভেরীনিনাদ বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিল। তখন বুঝিয়াছিলাম, হেমচন্দ্রের কবিতায় জাতীয় সুখে যে আনন্দোচ্ছ্বাস ও জাতীয় দুঃখে যে বিষাদের ছায়া দেখিয়াছিলাম, বাঙ্গালা কবিতায় তাহা আর কোথাও দেখি নাই। তখন বুঝিয়াছিলাম, হেমচন্দ্রের কবিতা কোথাও ঘনস্তনিতের মত গভীর ও গম্ভীর, আবার কোথাও অপ্সরোনূপুরনিক্কণের মত তরল স্বরলহরীর মাধুরী। সমাজের কুপ্রথার বিরুদ্ধে তিনি যখন বজ্রকণ্ঠ উপদেষ্টার মত যুদ্ধঘোষণা করিয়াছেন, বা অত্যাচারীকে যখন তিনি তিরস্কার করিয়াছেন, তখন তাঁহার কবিতা অশনিরই মত কঠোর;—আবার যখন তিনি প্রকৃতির শোভা বর্ণনা করিয়াছেন, বা নিপুণ চিত্রকরের মত মানবের কোমল বৃত্তি সকলের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তখন তাঁহার কবিতা মৃদুমন্দানিলের মত কোমল ও কমনীয়। আবার জাতীয় গৌরবে তিনি যে দর্প দেখাইয়াছেন—জাতীয় দুর্গতিতে যে দুঃখাশ্রুমোচন করিয়াছেন, তাহার তুলনা কোথায়? এই প্রেমগীতের দিনে, এই নারীসুলভ কোমলতাবহুল সাহিত্যে আর কথনও "ভারতসঙ্গীত", "ভারতভিক্ষা", বা "ভারত বিলাপ"—হেমচন্দ্রের এই সকল কবিতার মত তেজোব্যঞ্জক কবিতা দেখিতে পাইব কি? হেমচন্দ্র জাতীয় কবি। মধুসূদনের মৃত্যুর পর বঙ্গের সাহিত্যগুরু সত্যই বলিয়াছিলেন যে, হেমচন্দ্র জীবিত থাকিতে "বঙ্গ-কবি-সিংহাসন" শূন্য হইবে না।

---

* চিত্তবিকাশ—শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। শ্রীঅনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।—ভেলপুরা, বেনারস সিটি। মূল্য ছয় আনা মাত্র।

কঠোর কর্ম্মক্লান্ত জীবনের সায়াহ্নে দুর্ভাগ্যের তাড়নায় দৃষ্টি হারাইয়া হেমচন্দ্র এখন কাশীধামে দিনাতিপাত করিতেছেন। যিনি এই জাতির দুঃখে অশ্রুবর্ষণ করিয়াছেন,—এই অকৃতজ্ঞ জাতি কি আজ তাঁহার দুঃখে অশ্রুবর্ষণ করিবে না? আজ যে হেমচন্দ্র কবিতাকে সম্বোধন করিয়া মনোদুঃখে লিখিতেছেন,—

"না লভিনু ধন, না সাধিনু পণ,
দু' কূল ভাসিয়া গেল।
এবে নহে সাধে পড়িয়া বিপদে
আবার তোমারে ডাকি,
হয়োনা নিদয় কর দাসে দয়া,
ভক্ত ব'লে মনে রাখি।"

আবার,—

"ধন নাই বন্ধু নাই, কোথায় আশ্রয় পাই,"

বাঙ্গালী পাঠকের নয়নে এই সকল কথায় কি অশ্রু ঝরিবে না? বাঙ্গালী পাঠকের অকৃতজ্ঞতা-অপবাদ কি ঘুচিবে না?

"চিত্ত-বিকাশ" হেমচন্দ্রের নবপ্রকাশিত কবিতাপুস্তক। ভূমিকায় হেমচন্দ্র লিখিয়াছেন যে, তাঁহার শরীর অসুস্থ—মনে সুখ নাই। বোধ করি, এই দুই কারণেই চিত্ত-বিকাশের অধিকাংশ কবিতায় বিষাদের ছায়া-ব্যাপ্তি লক্ষিত হয়। ইহার মধ্যে কয়টি কবিতা ব্যক্তিগত। যে ভাবে গীতিকবিতা ব্যক্তিগত, সে ভাবে নহে।—সেই সকল কবিতায় কবির বর্ত্তমান অবস্থা ও মনোভাব বুঝা যায়। যাঁহার প্রতিভালোকে বঙ্গসাহিত্য সমুজ্জ্বল, তিনি আজ জগতের আলোক হইতে বঞ্চিত। তাই তিনি "ঝটিকা ঝাপটে" ভূমিবিলুণ্ঠিত তরুর সহিত আপনার তুলনা করিয়া মনোদুঃখে বলিয়াছেন,—

"এখন আপনি হেলে পড়েছি ধরায়।
স্বগণ আশ্রিত জন কাঁদিয়া বেড়ায়,
কে দেখে আমারে আজ ফিরায়ে নয়ন,
হের ঐ তরুটির কি দশা এখন।"

ইহা বড় বেদনার কথা—বড় মর্ম্মভেদী হাহাকার। কিন্তু এই বেদনায় কবিকে বলিতে পারি, তাঁহার বীণা "গভীর নিনাদে করিয়ে ঝঙ্কার" যাহাদিগের সুখে আনন্দধ্বনি করিয়াছে, যাহাদিগের দুঃখে মর্ম্মভেদী বিষাদের সুর তুলিয়াছে, তিনি যাহাদিগের জন্য "স্বর্গ মর্ত্ত্য ধরাতলে" নানা চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, সেই বঙ্গবাসীরা কখনও তাঁহাকে ভুলিতে পারিবে না।

যে কবি একদিন গাহিয়াছিলেন,—

"অই যে অবনীতলে পরশ মাণিক জ্বলে—
বিধাতানির্ম্মিত চারু মানব-নয়ন।
পরশমণির সনে লৌহ-অঙ্গ-পরশনে
সে লৌহ কাঞ্চন হয়, প্রবাদ-বচন,—
এ মণি পরশে যায়, মাণিক ঝলসে তায়,
বরিষে কিরণধারা নিখিল ভুবন।
কবির কল্পিত নিধি মানবে দিয়াছে বিধি,
ইহারি পরশগুণে মানব-বদন
দেবতুল্য রূপ ধরি আছে ধরা আলো করি,
মাটীর অঙ্গেতে মাখা সোণার কিরণ!"

তিনিই এখন লিখিয়াছেন,—

"আমার সম্বল মাত্র ছিল হস্ত পদ নেত্র,
অন্য ধন ছিল না এ ভবে,
সে নেত্র করে হরণ, হরিলে সর্ব্বস্ব ধন,
ভাসাইয়া দিলে ভবার্ণবে।
"চৌদিকে নিরাশা ঢেউ, রাখিতে নাহিক কেউ,
সদা ভয়ে পরাণ শিহরে,
যখনি আগের কথা মনে পড়ে, পাই ব্যথা,
দিবানিশি চক্ষে জল ঝরে।
* * * *
"প্রতিদিন অংশুমালী সহস্র কিরণ ঢালি,
পুলকিত করিবে সকলে
আমারি রজনী শেষ হবে নাকি ? হে ভবেশ!
জানিব না দিবা কারে বলে।
"আর না সুধার সিন্ধু, আকাশে দেখিব ইন্দু,
প্রভাতে শিশির-বিন্দু জলে,
শিশির বসন্তকাল, আসে যাবে চিরকাল,
আমি না দেখিব কোন কালে।
"বিহঙ্গ পতঙ্গ নর, জগতের সুখকর,
তাও আর হবে না দর্শন,
থাকিয়া সংসারক্ষেত্রে পাব না দেখিতে নেত্রে
দেবতুল্য মানববদন।
"নিজ পুত্র কন্যা মুখ, পৃথিবীর সার সুখ,
তাও আর দেখিতে পাব না,
অপূর্ব্ব ভবের চিত্র থাকিবে স্মরণে মাত্র,
স্বপ্নবৎ মনের কল্পনা।
"কি নিয়ে থাকিব তবে কি সাধনা সিদ্ধ হবে,
ভবলীলা ঘুচেছে আমার ;
বৃথা এবে এ জীবন হয় না কেন এখন,
বৃথা রাখা ধরণীর ভার।
"ধন নাই বন্ধু নাই, কোথায় আশ্রয় পাই,
তুমিই হে আশ্রয়ের সার ;
জীবনের শেষকালে সকলি হরিয়া নিলে,
প্রাণ নিয়া দুঃখে কর পার—
বিভু! কি দশা হ'বে আমার।"

এ মর্ম্মব্যথার কাহিনী বড় করুণ। তবে এ কথা বলিতে পারি যে, কবির যে প্রতিভালোকে বঙ্গসাহিত্য সমুজ্জ্বল, অর্থের বা দৃষ্টির অভাবে তাহার দীপ্তি নির্ব্বাপিত হইবার নহে ; তাঁহার যে কল্পনা ইচ্ছায় স্বর্গ বা নরকের চিত্র অঙ্কিত করিয়া পাঠকের নয়নসমক্ষে আনিয়াছে, নয়নের দৃষ্টির অভাবে তাহার গতিরোধ হয় না। তিনি আপনিও বলিয়াছেন, কল্পনার প্রসাদ পাইলে "কি দুঃখ এ জগতের ভুলিতে না পারি ?" কিন্তু এ কথা লইয়া অধিক কিছু বলিতে যাওয়া দুঃসাহসের কার্য্য,—দৃষ্টির অভাব প্রথমে কবির নিকট বড়ই দুর্ব্বিষহ বলিয়া বোধ হইয়াছে। তদ্ভিন্ন "বৃত্রসংহারে" কন্দর্পের মুখ দিয়া তিনি বলাইয়াছেন,—

"সুখ দুঃখ ইন্দ্রপ্রিয়া, সকলি বাসনা নিয়া
যুকতির আয়ত্ত সে নয়।"

ইহার পর কবি ভক্ত দার্শনিকোচিত বিচারের ফলে যেখানে উপনীত হইয়াছেন, সেখানে ভক্তির উচ্ছ্বসিত স্রোতে বিষাদ ও বেদনা, সংশয় ও শঙ্কা ভাসিয়া

যায়; সংশয় সংযমে মগ্ন হইয়া যায়; শঙ্কা শান্তিতে পরিণত হয়। তিনি গাহিয়াছেন,—

"কোথা আজি সেই অযোধ্যাধাম,
কোথা পূর্ণব্রহ্ম সীতাপতি রাম।
কোথা আজি সেই পাণ্ডবের সখা,
কোথায় মথুরা, কোথায় দ্বারকা!

"কে পারে খণ্ডিতে অদৃষ্টশৃঙ্খলে,
ঘটেছে আমার যা ছিল কপালে।
কে পারে রাখিতে বিধাতা কাঁদালে,
বৃথা কেন তবে কাঁদিয়া মরি।

"এস ভগবান, কর ধৈর্য্যদান,
কর শান্তিময় অশান্ত পরাণ।
সৌভাগ্য অভাগ্য ভাবিয়া সমান
নিজ কর্ম্ম যেন সাধিতে পারি।

* * * *

"আপনারই দোষে আপনি হারাই,
বিধাতারে কেন সে দোষে জড়াই।
এ সান্ত্বনা কেন পরাণে না পাই,
নিজকর্ম্মফল অদৃষ্ট কেবল।"

ইহার পরই,—

"হেরে বিশ্বরূপ যাঁর ভয়ে কাঁপে চরাচর,
প্রকৃতি প্রণতি করি করয়ে অর্চ্চন,
চমকিত বিশ্ববাসী করে দরশন।"

কবি তাঁহারই অর্চ্চনা করিয়াছেন। ব্যথিতহৃদয় ভক্তের এ ভক্তিভরা ভজন বড় মধুর—বড় প্রাণস্পর্শী।

জগৎ শোভার ভাণ্ডার। সংসারসংঘাতে, জীবনসংগ্রামের তাড়নায় ও যাতনায়, নানা প্রবল প্রবৃত্তির উন্মাদকরী উত্তেজনায় আমরা সে সকল লক্ষ্য করিবার অবকাশ পাই না। কবির প্রতিভা সে সকলকে পরিস্ফুট করিয়া তুলে। সৃষ্টির প্রভাতে যে দিন আদিম মানব নগ্ন সরলতায় বিস্ময়বিস্ফারিত-নেত্রে জগতের দিকে চাহিয়া দেখিয়াছিল, সে দিন স্নেহময়ী প্রকৃতি তাহার নয়নসমক্ষে কি সৌন্দর্য্যরাশি মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন, অন্ধকবি মিল্‌টন তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। আজ দৃষ্টি হারাইয়া কবির নিকট সেই সকল সৌন্দর্য্য দ্বিগুণ সুন্দর বোধ হইতেছে; সেই ভাব তাঁহার "কৌমুদী," "খদ্যোত," "আলোক," "প্রজাপতি" প্রভৃতি কবিতায় প্রকাশিত। প্রজাপতির শোভায় মুগ্ধ কবি বিহ্বলহৃদয়ে বলিয়াছেন,—

"কিছুই না পাই ভেবে আদি অন্ত সীমা,
সকলি আশ্চর্য্য তব,
অদ্ভুত তোমার ভব,
কে জানে, মহিমাময়, তোমার মহিমা।"

মনী মহাপুরুষ বেকন এক স্থানে বলিয়াছেন যে, সৃষ্টিবিধানে বিধাতার

প্রথম কার্য্য জড় জগতের আলোক, শেষ কার্য্য জ্ঞানের আলোক,—এখনও তিনি আধ্যাত্মিক আলোক বিস্তার করিয়া থাকেন। ইন্দ্রিয়ভোগ্য জড় জগতের আলোক হইতে বঞ্চিত হইয়া কবি হেমচন্দ্র গাহিয়াছেন,—

"জগতে কি আছে
অমূল্য পদার্থ হেন কিছু আর
আলোকের সহ তুলনা যাহার।"

সত্যই তমোহর আলোকের সহিত জগতে আর কিসের তুলনা হইতে পারে?

এ দেশে লোক কথায় বলে, "কানু বিনা গীত নাই"; এ দেশে বিদ্যাপতি হইতে বহু কবি রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা গান করিয়াছেন। সে প্রেমকাহিনী বাঙ্গালীর বড় প্রিয়; ইহাকে "দুর্ব্বলতা" বলিতে হয় বল। জাতীয় কবি হেমচন্দ্রের কবিতায় এ "দুর্ব্বলতার" চিহ্ন দেখিয়াছি; "সুহৃৎ-সমাগম" শীর্ষক কবিতায় পড়িয়াছি—"শ্যামের বাঁশীতে যমুনা উজান,—বহিল উল্লাসে ভাসায়ে কূল।" "চিত্ত-বিকাশে" একাধিক কবিতায় এই "জাতীয় দুর্ব্বলতা" প্রকাশিত হইয়াছে;—

"মোহন মুরতি চিকণ কালা,
রূপের ছটায় জগ উজালা।
যাহার মধুর বাঁশীর তানে,
যমুনার জল চলে উজানে।"

* * * *

তাহারই গীত গীত হইয়াছে।

এই পুস্তকে কবি কল্পনার অতি মোহন চিত্র আঁকিয়াছেন,—

চাঁদের মণ্ডল হ'তে
উঠিছে আকাশপথে,
অসীম মাধুরী অঙ্গে পড়িতেছে ঝরি।

* * * *

"বিচিত্র বসন গায়,
ইন্দ্রধনু শোভা পায়,
বিবিধ বরণে ফুটে কিরণে খেলায়।
"যেখানে উদয় হয়,
সুগন্ধি মলয় বয়,
অঙ্গের সৌরভে দিক আমোদে পূরায়।"

তাঁহার অসাধারণ প্রভাব। কবি বলিয়াছেন,—

"এহেন প্রভাব যার
প্রসাদ লভিলে তার
কি দুঃখ এ জগতের ভুলিতে না পারি!
"প্রতিদিন কল্পনারে
পাই যদি পূজিবারে,
নিরানন্দ মাতৃভূমি চিরানন্দ করি।

"এ চির মনের সাধ
মিটিল না, অপরাধ
লয়োনা দুঃখিনী মাগো, দৈব প্রতিকূল,
"কমলা ঠেলিলা পায়,
রোষ কৈল সারদায়,
শুষ্ক আশা-তরু মম বিনা ফল ফুল।"

কল্পনা তাঁহাকে প্রসাদ হইতে বঞ্চিত করেন নাই, পরন্তু যে পার্থিব

ধন” দিয়াছেন, “রাজ্য বিনিময়ে আহা! কেহ নাহি পায় তাহা”। কবি তাহার সদ্ব্যবহার করিয়া তাঁহার প্রদেশবাসীদিগকে প্রচুর আনন্দ দান করিয়াছেন। আশা করি, এখন এই কর্ম্মশ্রান্ত জীবনের নানা কার্য্য হইতে অবসর লইয়া তিনি কবিতার সেবায় তাঁহার নিরানন্দ মাতৃভূমি চিরানন্দময় করিবেন।

যাঁহারা মনে করিবেন যে, এ পুস্তকে হেমচন্দ্রের পূর্ব্বের কবিতার গম্ভীর ও উত্তেজক ভেরীনিনাদ নাই, তাঁহারা ভ্রান্ত। বর্ত্তমান পুস্তকের অধিকাংশ কবিতায় সে জ্বালাময় অগ্নিশ্বাসী ভাব না থাকিলেও, সেই ভেরীনিনাদের প্রতিধ্বনি ধ্বনিত হইয়াছে ;—সে ধ্বনি বড় মধুর—বড় চিত্তবিমোহক। “বৃত্রসংহারে” হেমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন,—

“কে আছে ত্রিলোক মাঝে প্রাণী হেন জন
সুদূর প্রবাস ছাড়ি বহুদিন পরে
আসি ফিরি নিজ দেশে—কিবা মরু আর
গিরিকূট, অরণ্যানী—নিরখি পূর্ব্বের
পরিচিত গৃহ, মাঠ, তরু সরোবর,
নদী, খাত, তরঙ্গ, নির্ঝর, প্রাণিকুল,
নাহি ভাসে উল্লাসে, না বলে মনোসুখে
‘এই জন্মভূমি মম !’—”

“চিত্ত-বিকাশে” তিনি লিখিয়াছেন,—

“জগতে জননী জনম-ভুবন,
গুরুত্ব গৌরবে তুই অতুলন,
স্বরগ(ও) নিকৃষ্ট তুয়ের(ই) কাছে।

* * * *

“কে আছে এমন মানবসমাজে,
হৃদি-তন্ত্রী যার আনন্দে না বাজে,
বহুদিন পরে হেরি স্বদেশ।
না বলে উল্লাসে প্রফুল্ল-অন্তরে,
প্রেম-ভক্তি-মোহঅনুরাগ-ভরে
এই জন্মভূমি—আমার দেশ।

“তুমি বঙ্গমাতা এত হীনপ্রাণা,
এত যে মলিনা, এত দীনহীনা.
তোমার(ও) সন্তান স্বদেশে ফিরে,
হেরে তব মুখ মনে ভাবে সুখ
প্রাণের আবেগে হইয়া সোৎসুক
নিজ জন্মদেশ আনন্দে হেরে।

“হে জগৎপতি, এ দাস মিনতি,
রেখো এই দয়া বঙ্গমাতা প্রতি,
বঙ্গবাসী যেন কখন(ও) কেহ
যেখানেই থাক্, যেখানেই যা'ক্,
যতই সম্মান যেখানেই পাক্,
না ভুলে স্বদেশ ভকতি স্নেহ।”

বঙ্গভূমির প্রতি এমন ভক্তিভরা স্নেহের কথা কবিতায় বহুদিন পাঠ করি নাই।

“বৃত্রসংহারে” কবি লিখিয়াছিলেন,—

“জগত-কল্যাণ হেতু নরের সৃজন,
নরের কল্যাণ নিত্য পরের পালনে।”

“চিত্ত-বি[illegible] [illegible]বি লিখিয়াছেন,—

“সাধিতে জগ[illegible] [illegible]-সৃজন।
বিধাতা তাদে[illegible] [illegible]হন ধন,
জগতের সুমঙ্গল করিয়া মনন।
এ কথা যে বুঝে, মর্ত্ত্যে দেবতা সে জন।”

ইহা পাঠ করিলে কবি সাশ্রুনয়নে আপনার কথায় যাহা বলিয়াছেন, তাহাই মনে পড়ে,—

"নিজপর ভাবি নাই, অনন্তউপায়—
যে এসেছে আশা ক'রে, দিয়েছি তাহায়।"

এই পুস্তকে একটি কবিতায় প্রবল "পেসিমিষ্টিক" সুর দেখিয়া আমরা ব্যথিত ও আশঙ্কিত হইয়াছি। যিনি একদিন যে প্রেমে—

"পরাণে পরাণ বাঁধা প্রণয়ের ডরে,
পরিপূর্ণ পরিতোষ প্রেমীর অন্তরে"

সেই প্রেমের মধুর গীত গাহিয়াছেন, তিনিই বর্ত্তমান পুস্তকে বলিতেছেন—

"এ যে ভালবাসা ভরা দেখি এ সংসার,
ভালবাসা নয় ইহা স্বার্থের বিকার,
স্নেহ দয়া মায়া আর যাহা কিছু বল—
ভালবাসা কিন্তু তবু নহে এ সকল।

"ভালবাসা বলি যারে পরাণে ধেয়াই,
সে ভালবাসারে হায় কোথা গেলে পাই ?
পরাণের বিনিময়ে পরাণ বিকাই,
এ ভালবাসা কি তবে পৃথিবীতে নাই !

* * * *

প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়িতেছে ; আর একটিমাত্র কবিতার কথা বলিয়া আমরা প্রবন্ধ শেষ করিব। "কবিতাসুন্দরী" পুস্তকের শেষ কবিতা। কবি কবিতাসুন্দরীকে প্রাচীন কাব্যকারদিগের প্রিয় মঞ্জরিত অশোকের তলে বসাইয়াছেন। তাঁহার চারি পাশে কেবল বিকচ কুসুমের শোভা, মৃদুমন্দানিলে পাদপপত্রের মর্ মর্, বিহগের গীত ও কুসুমের মধুগন্ধ। অদূরস্থিত উদ্যানের বর্ণনা পাঠ করিতে করিতে "স্বর্গারোহণে" বর্ণিত "কবিকুঞ্জের' কথা মনে পড়ে।

এই মধুর কবিতার শেষাংশ বড় করুণ, বড় বিষাদময়। ভক্তকবি বিপদে—বিষাদে আরাধ্যা কবিতাকে বলিতেছেন,—

"অয়ি নিরুপমে, মম হৃদিধামে,
বাসনা আছিল কত;
তব আরাধনা, তোমারে সাধনা,
করিব জীবনব্রত।
ভুলে নিজ ভ্রমে, বৃথা পরিশ্রমে,
জীবন ফুরায়ে এল ;
না লভিনু ধন, না সাধিনু পণ,
দু কূল ভাসিয়া গেল।

এবে নহে সাধে, পড়িয়া বিপদে,
আবার তোমারে ডাকি ;
হয়ো না নিদয়া, কর দাসে দয়া—
ভক্ত বলে মনে রাখি।
তুমি ক্ষেমঙ্করী, [illegible]র,
ভুল না [illegible]
ক্ষমি অপরা[illegible] পুরাইও সাধ,
দি[illegible]য়া।"

মধুসূদনের জন্য বিলাপগীতিতে কবি বলিয়াছিলেন,—

"হায় মা ভারতী, চিরদিন তোর, যে জন সেবিবে, ও পদযুগলে,
কেন এ কুখ্যাতি ভবে? সেই সে দরিদ্র হবে!"

আমরাও কবির কথায় কবিতাদেবীকে বলি,—

"কেমনে কহগো দেবী, অনলের তাপে
তাপিবে ও কলেবর আশৈশব নিরন্তর,
স্নেহে ভিজায়েছ যায়?"

শারীরিক কষ্ট বা দারিদ্র্যপীড়ন জগতের যাতনা—প্রতিভা স্বর্গের আলোক। জগতের যাতনায় স্বর্গের আলোক হীনপ্রভ হয় না। অন্ধকবি মিল্‌টন হৃদয়ের ভাব "কবিতা তরঙ্গে ঢালি" বিশ্ববাসীকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। কবি বলিয়াছেন,—কবিতার প্রসঙ্গ পাইলে "নিরানন্দ মাতৃভূমি চিরানন্দ করি।" আশা করি, কল্পনার প্রসাদে তাঁহার সে বাসনা পূর্ণ হইবে।

বোধ করি, কবি দেখিয়া দিতে পারেন নাই বলিয়া পুস্তকখানির মুদ্রাঙ্কণে কতকগুলি ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে। বিরামচিহ্নসংস্থাপনে যে সকল ভ্রম আছে, তাহাতে পাঠকালে রসভঙ্গের সম্ভাবনা। ভরসা করি, প্রকাশক মহাশয়ের যত্নে ভবিষ্যৎ সংস্করণে এই সকল ত্রুটি সংশোধিত হইবে। ইংলণ্ডে গভর্মেণ্টের তহবিল হইতে দুঃস্থ কোবিদ ও সাহিত্যসেবকদিগকে বৃত্তি দিবার প্রথা আছে। আমাদের গভর্মেণ্ট কি সেইরূপ কোন ব্যবস্থা করিতে পারেন না? *

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

কৃত্রিম-হীরক।

জড়-বিজ্ঞানের বহু শাখার মধ্যে, রসায়নশাস্ত্র অতি প্রাচীন।—বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে,আরবদেশবাসিগণ জড় পদার্থের বিবিধ গুণ ও ধর্ম্ম পরিজ্ঞাত হইয়া, এই শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। তার পর রাষ্ট্রবিপ্লব, যুদ্ধবিগ্রহ, প্রভৃতি নানা কারণে, রসায়নশাস্ত্রের আর উন্নতি হয় নাই। কীটদষ্ট সহস্র আরব্য হস্তলিপি-

* বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার বৈঠকে বজেট উপলক্ষে তাহিরপুরের মাননীয় রাজা বাহাদুর স্বর্গীয় মধুসূদনের ও কবিবর হেমচন্দ্রের কথা তুলিয়া এ বিষয়ে গভর্মেণ্টের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিলেন; সে জন্য বঙ্গবাসিমাত্রেই তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

সমূহের মধ্যে জীর্ণ রসায়নশাস্ত্রখানি বহুকাল গুপ্ত ছিল। প্রাচীনতার অনুপাতে আজকাল যেমন অপরাপর শাস্ত্রের আশেষবিধ উন্নতি হইয়াছে,—বোধ হয়, পূর্ব্বোক্ত কারণে, রসায়নশাস্ত্রে তাহার কোনও লক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে না। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে পদার্থবিশ্লেষণের উপযোগী বিবিধ যন্ত্রাদি আবিষ্কৃত হওয়ায়, উপেক্ষিত শাস্ত্রটির প্রতি যেন আজকাল বিজ্ঞানবিদ্‌গণের একটু দৃষ্টি পড়িয়াছে। আমাদের দৈনিক আহার, পান প্রভৃতি জীবনের অত্যাবশ্যক ব্যাপারের সহিত রসায়ন শাস্ত্রের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। এই জন্য আজকাল অনেকেই বুঝিতেছেন যে, আমাদের জীবনধারণের জন্য যে সকল বস্তু নিতান্তই আবশ্যক, রসায়ন শাস্ত্রের সাহায্যে সেই সকল বস্তু সুপ্রাপ্য ও সুলভ করিতে না পারিলে, উপায়ান্তর নাই। বোধ হয়, এই সকল কারণেই আজকাল কৃত্রিম উপায়ে নানা প্রয়োজনীয় পদার্থ উৎপন্ন করিবার চেষ্টা হইতেছে।

অল্প দিন হইল, এক জন য়ুরোপীয় রসায়নবিৎ কলকারখানার পরিত্যক্ত আবর্জ্জনা হইতে তণ্ডুল বা গোধূমের মত এক প্রকার পুষ্টিকর খাদ্য উৎপাদনের উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত, বিজ্ঞাবিদ্‌গণের চেষ্টায়, রেশম, মদ্য ও হীরকাদি বহুমূল্য পদার্থ উৎপন্ন করিবার প্রথাও আবিষ্কৃত হইয়াছে। রসায়ন শাস্ত্রের সাহায্যে বিবিধ আবশ্যক বস্তুর উৎপাদনপদ্ধতি আবিষ্কৃত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে জনসাধারণের বিশেষ উপকার হইতেছে না; কারণ, রাসায়নিক প্রথায় পদার্থগুলির উৎপাদন করিতে আজকাল যেরূপ শ্রম ও অর্থ ব্যয়িত হইতেছে,—স্বভাবজাত পদার্থ সংগ্রহ করিতে তদনুরূপ শ্রম ও অর্থব্যয় আবশ্যক হয় না। সুতরাং জনসাধারণের পক্ষে বহুমূল্যে কৃত্রিম পদার্থ ক্রয় করা অপেক্ষা সুলভ স্বাভাবিক পদার্থের ব্যবহারই প্রশস্ততর। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, পণ্ডিতগণ প্রাকৃতিক পদার্থের অনুরূপ নানা বস্তুর উৎপাদনের জটিল রীতির আবিষ্কার করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; এখন যাহাতে স্বল্প ব্যয়ে ও সহজ পদ্ধতিতে উৎপন্ন করিয়া, কৃত্রিম পদার্থগুলিকে জনসাধারণের ব্যবহারোপযোগী করা যায়, সে বিষয়ে অনেকেই অবহিত হইয়াছেন।

হীরক ও অঙ্গার একই পদার্থ, এই সিদ্ধান্ত হইবার পর হইতেই অনেক বিজ্ঞানবিদ্ কৃত্রিম হীরক প্রস্তুত করিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হন নাই। কয়েক বৎসর হইল, এক জন ফরাসী রসায়নবিদ্ (M. Moissan) হীরক-উৎপাদনের এক উপায়ের কথা প্রচার করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার উদ্ভাবিত অভিনব প্রণালী অতীব জটিল ও ব্যয়সাধ্য; এবং নূতন

উপায়ে নির্ম্মিত হীরকগুলির আকারও অতি ক্ষুদ্র হইত; এই জন্য এ পর্য্যন্ত কেহ উক্ত পদ্ধতিক্রমে হীরকের উৎপাদনে সাহসী হন নাই। সম্প্রতি "নেচার" (La Nature) নামক প্রসিদ্ধ ফরাসী বিজ্ঞানপত্রে কৃত্রিম হীরক উৎপাদনের এক নূতন প্রথার আবিষ্কারবার্ত্তা ঘোষিত হইয়াছে।

কিছু দিন হইল, ভিলার্ড সাহেব কতকগুলি সহজ পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করিয়াছিলেন যে, বাষ্পীয় পদার্থে কঠিন বস্তু অনায়াসে মিশ্রিত হইতে পারে। বৈদ্যুতিক দীপের কাচাবরণে বায়ু প্রবেশিত করিয়া যদি তন্মধ্যস্থ বায়ুর চাপের বৃদ্ধি করা যায়, তাহা হইলে দীপ ক্রমেই ম্লানজ্যোতিঃ হইয়া পড়ে। ভিলার্ড সাহেব পূর্ব্বকথিত মতবাদ অবলম্বন করিয়া ইহার কারণও আবিষ্কৃত করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, দীপাবরণে যেমন অধিক বায়ু সঞ্চিত হইতে থাকে, দীপের অঙ্গারক-শলাকা (Corbon-Pencil) হইতে, অঙ্গার ততই বায়ুর সহিত অধিক মিশ্রিত হয়। এই প্রকারে অধিক অঙ্গারভারগ্রস্ত হইয়া পড়িলে, আবদ্ধ বায়ু ক্রমে অস্বচ্ছ হইয়া, অধিক আলোক হরণ করিতে থাকে, সুতরাং দীপালোক ক্রমেই ক্ষীণ হইয়া পড়ে। উইলসন্ ও ফিজেরাল্ড নামক দুই জন বিজ্ঞানবিদ্ এই পরীক্ষা প্রত্যক্ষ করিয়া, বায়ুচাপযুক্ত দীপাবরণটি সহসা চাপযুক্ত করিলে, বায়ুমিশ্রিত অঙ্গারকণাগুলির অবস্থা কি হয়, জানিবার জন্য বিশেষ কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছিলেন, এবং উভয়ে বহু চিন্তা করিয়াছিলেন,—আবদ্ধ বায়ু হৃত-চাপ হইলে, ইহার অঙ্গার-ধারণ-শক্তির নিশ্চয়ই হ্রাস হইয়া যাইবে, এবং মুক্ত অঙ্গার সম্ভবতঃ আবরণগাত্রে সঞ্চিত হইতে থাকিবে। বৈজ্ঞানিকদ্বয় বহু পরিশ্রমে সম্প্রতি তাঁহাদের পরীক্ষা শেষ করিয়া দেখিয়াছেন যে, তাঁহাদের পূর্ব্ব অনুমান বাস্তবিকই সত্য,—কিন্তু আবরণগাত্রে যে বায়ুমুক্ত অঙ্গার সঞ্চিত হইয়া থাকে, তাহা সাধারণ অঙ্গার নয়,—হীরক।

হীরক-উৎপাদনের এই নূতন পদ্ধতি সম্বন্ধে, বিখ্যাত রসায়নবিদ্গণের মন্তব্য অদ্যাপি প্রচারিত হয় নাই;—তবে বিবরণপাঠে প্রক্রিয়াটি যেরূপ সহজ ও স্বল্পব্যয়সাধ্য বলিয়া বোধ হইতেছে, তাহাতে মনে হয়, অদূর ভবিষ্যতে এই নবপ্রথাজাত হীরক স্বভাবজ হীরকের স্থান অধিকার করিতে পারিবে।

সহযোগী সাহিত্য।

জীবনচরিত।

সার মোনিয়র মোনিয়র উইলিয়মস্।

সাহিত্য জাতীয় জ্ঞানসম্পদের সারসংগ্রহ, জাতীয় সভ্যতার,—জাতীয় উন্নতির সাক্ষ্য। প্রাচীন গ্রীক ও লাটিন সাহিত্যের ভাণ্ডারের সন্ধান না পাইলে আজ আমরা প্রাচীন গ্রীক ও রোমক সভ্যতার, সেই দুই জাতির উন্নতির পরিচয় পাইতাম না। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যই প্রাচীন ভারতের সমুজ্জ্বল সভ্যতার সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাক্ষ্য। সাহিত্য প্রাচীন ও নবীনের সম্মিলন; সাহিত্য প্রাচীনের জীবন্ত চিত্র;—সাহিত্য অতীতের অন্ধকার যবনিকা উদ্ঘাটন করিয়া দেয়—আমাদের নয়নসমক্ষে অন্ধকার অতীত গহ্বরে আলোক দেখাইয়া তত্রত্য দুষ্প্রাপ্য দ্রব্যাদি প্রদর্শিত করে। ইতিহাসে যাহার পরিচয় পাই না, কল্পনা যেখানে পরাস্ত, সেই ঘন-কুহেলিকাচ্ছন্ন অতীত কেবল সাহিত্যে বর্ত্তমান। সাহিত্যের সহায়তা ভিন্ন আমরা অন্ধকার অতীতগহ্বরে চলিতে পারি না, পদে পদে পদস্খলন নিবারণ করিতে পারি না। অতীত ভারতের ইতিহাস নাই। কিন্তু প্রাচীন ভারত যে সভ্যতায় ও শিক্ষায় বিশেষ সমুন্নত ছিল, তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। ধর্ম্মে, দর্শনে, কাব্যে, এমন কি, বিজ্ঞানের বিবিধ বিভাগেও প্রাচীন ভারত সবিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিল। অর্চ্চনার সময়নিরূপণের জন্য গ্রহ-তারকাদির গতিবিধি নিরীক্ষণ করিতে হইত—তাহা হইতে জ্যোতিষশাস্ত্রের উৎপত্তি; বেদী-নির্ম্মাণের জন্য কোন নির্দ্দিষ্ট প্রণালীর আবিষ্কারচেষ্টা হইতেই জ্যামিতি শাস্ত্রের উৎপত্তি। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যভাণ্ডার যদি বিলুপ্ত হইয়া যাইত, তবে অতীতিহাস যুগে ভারতবাসী আর্যাদিগের এই সভ্যতার ইতিহাস, এই জ্ঞানোন্নতির প্রমাণ আজ আর পাইবার কোনও উপায় থাকিত না। এখন প্রাচীন কাব্য ও নাটকাদি হইতে প্রাচীন ভারতের সভ্যতার ও সমাজের চিত্র উদ্ধার করিবার চেষ্টা হইতেছে। অনেক স্থলে পণ্ডিতগণের অসাধারণ অধ্যবসায় ফলপ্রদও হইয়াছে। যখন সার উইলিয়ম জোন্স প্রতীচ্য সমাজে "শকুন্তলার" পরিচয় প্রদান করেন, তাহার পর য়ুরোপে সংস্কৃতচর্চ্চায় যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। এখন বহু য়ুরোপীয় পণ্ডিত সংস্কৃত-চর্চ্চায় মনোযোগ দিয়াছেন। বেদ হইতে উপনিষদ, রামায়ণ হইতে কুমারসম্ভব, মেঘদূত হইতে গীতগোবিন্দ—নানা সংস্কৃত পুস্তক য়ুরোপীয় কোবিদগণ কর্তৃক ভাষান্তরিত হইয়া সেই বিদেশে ভারতবাসীর সাহিত্যের ও সভ্যতার পরিচয় দিতেছে। অল্প দিন হইল, আমাদের পরমশ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় মহাভারতের গল্পাংশ ইংরেজীতে পরিণত করিয়াছেন।

যে সকল য়ুরোপীয় পণ্ডিত সংস্কৃতচর্চ্চায় বিশেষ মনোযোগ দিয়াছিলেন ও দিয়াছেন, সার মোনিয়র মোনিয়র উইলিয়মস তাঁহাদের অগ্রণী। অল্প দিন হইল, সার মোনিয়রের মৃত্যু

হইয়াছে। আমরা অদ্য তাঁহার সম্বন্ধীয় দুই চারিটি কথা পাঠকদিগকে উপহার দিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

১৮১৯ খৃষ্টাব্দে বোম্বাইয়ে সার মোনিয়রের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা বোম্বাইয়ে রাজকার্য্যে লিপ্ত ছিলেন। তিনি লণ্ডনে কিংস কলেজে ও অক্সফোর্ডে বালিয়ল কলেজে শিক্ষিত হয়েন, এবং তদানীন্তন ভারতগামী 'সিভিলিয়ান'দিগের শিক্ষাক্ষেত্র হালিবারি কলেজে যাইয়া প্রাচ্য পাঠ্য বিষয়ের সর্ব্ববিভাগেই প্রথম পুরস্কার লাভ করেন। কোন পারিবারিক কারণে ভারতবর্ষে চাকরী না লইয়া তিনি অক্সফোর্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সেখানে পাঠ সমাপ্ত করিয়া তিনি ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে হালিবারি কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপকপদে প্রতিষ্ঠিত হয়েন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে উক্ত কলেজ উঠিয়া যায়। তখন পর্য্যন্ত তিনি সেই পদেই নিযুক্ত ছিলেন। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে তিনি অক্সফোর্ডে সংস্কৃতের অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েন। ইহার পর অধ্যাপকের ভাগ্যে সম্মানলাভের অভাব হয় নাই। তিনি নানা-দেশের পণ্ডিতমণ্ডলী কর্ত্তৃক বিশেষরূপে সম্মানিত হইয়াছিলেন। নানা বিশ্ববিদ্যালয় অতি সম্মানজনক উপাধিভূষণে তাঁহাকে ভূষিত করিয়াছিল। দেশে বিদেশে তাঁহার সম্মানের সীমা ছিল না। তিনি য়ুরোপে ও ভারতবর্ষে সংস্থাপিত প্রায় সকল প্রাচ্যসমিতিরই সভ্য ছিলেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহার ভাগ্যে রাজদত্ত সম্মানেরও অভাব হয় নাই—ভারত-সম্রাজ্ঞী তাঁহাকে "সার্" উপাধিতে ভূষিত করিয়া প্রতিভার সম্মান করেন।

জীবন-কথা।

সার মোনিয়র জীবনে তিন বার ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের প্রাচীন সাহিত্যচর্চ্চাই তাঁহার জীবনের সর্ব্বপ্রধান কীর্ত্তি; কাজেই ভারতবর্ষের সর্ব্ব বিষয়েই তিনি বিশেষ মনোযোগ দিতেন। এই সর্ব্ব বিষয়ে মনোযোগ যে সময় সময় তাঁহাকে অনধিকারচর্চ্চায় প্রবৃত্ত করাইত, পাঠক পরে তাহার পরিচয় পাইবেন। মানুষ যে সর্ব্বজ্ঞ নহে—তাহা ভুলিয়া সময় সময় তিনি আপনার অভিজ্ঞ-তার বহির্ভূত কার্য্যেও হস্তক্ষেপ করিতেন। সে কথা পরে বলিব। ইংলণ্ডে একটি Indian Institute স্থাপন ও অক্সফোর্ডে একটি ভারতীয় বিদ্যাচর্চ্চার শিক্ষাগারের প্রতিষ্ঠাকল্পে শিক্ষিত ভারতবাসীদিগের সহিত পরামর্শ ও তাঁহাদের সাহায্য প্রার্থনা করিবার জন্য অধ্যাপক ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে আগমন করেন। ইহা ভিন্ন বর্ত্তমান ভারতের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে নানা বিষয় জানিবার ইচ্ছাও তাঁহাকে ভারতবর্ষে আকৃষ্ট করিয়াছিল। পর বৎসর অধ্যাপক পুনরায় ভারতবর্ষে আগমন করেন। ইহার পর ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে তিনি আর একবার ভারতবর্ষে আগমন করেন। সেবার তিনি তৎকালীন বড় লাট লর্ড রিপণের অতিথি ছিলেন।

ভারত-ভ্রমণ।

মস্তিষ্ক ভিন্ন মানবের আরও একটা জিনিস আছে—সেটা হৃদয়। জ্ঞানে মানবের গৌরব সন্দেহ নাই; কিন্তু সহৃদয়তাও মানবের কম গৌরবের নহে। ভারতবাসীদিগের সম্বন্ধে অধ্যাপক যে মতামত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার এই সহৃদয়তার বিশেষ অভাব লক্ষিত হয়। ভারতবর্ষে আসিয়া, ভারতবাসীদিগের সহিত পরিচিত হইয়াও শিক্ষিত ভারতবাসী-দিগের সম্বন্ধে তাঁহার ভ্রান্ত ধারণা দূর হয় নাই। তাঁহার সমসাময়িক সংস্কৃত-পণ্ডিত অধ্যা-

পক ম্যাক্সমুলার যে সহৃদয়তার প্রভাবে ভারতবাসিমাত্রেরই ধন্যবাদার্হ, অধ্যাপক সার মোনিয়র মোনিয়র উইলিয়মসের সেই সহৃদয়তার সবিশেষ অভাব ছিল। সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য কেহ অস্বীকার করিতে পারে না; কিন্তু যে সহৃদয়তা ভিন্ন কোন ভিন্ন জাতির রীতি, নীতি, আচার, ব্যবহার, সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করা অসম্ভব, সেই সুকোমল সহৃদয়তার অভাব অধ্যাপক সার মোনিয়রের নানা কার্য্যে প্রকাশ পাইয়াছে।

মতামত, জ্ঞানগরিমা ও অহংত্ব।

আজ কাল যে সকল য়ুরোপীয় একবারমাত্র ভারতবর্ষ দেখিয়া (কেহ বা না দেখিয়াই) ভারতবর্ষ সম্বন্ধে পুস্তক লিখিয়া সাহিত্যসমাজে পরিচিত হইবার লোভ সংবরণ করিতে পারেন না, অধ্যাপক সার মোনিয়র মোনিয়র উইলিয়মস্ তাঁহাদের দলের নহেন। তিনি অসীম উৎসাহসহকারে ভারতবর্ষসম্বন্ধীয় সকল বিষয়েই সবিশেষ অবহিত হইতেন। এই উৎসাহাতিশয্যেই সময়ে সময়ে অনধিকারচর্চ্চায় প্রবৃত্ত হইতেন। তিনি ভারতের সাহিত্য হইতে ভারতের শাসননীতি পর্য্যন্ত সকল বিষয়েরই সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতেন। ভারতবর্ষের আয় ব্যয়, ভারতবর্ষের জমী-বন্দোবস্ত, ভারতবর্ষের পূর্ত্তবিভাগ প্রভৃতি সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতা ছিল না, তথাপি তিনি Contemporary Review পত্রে প্রকাশিত তাঁহার ভারতের উন্নতিবিষয়ক প্রবন্ধসমূহে এই সকল বিষয়েও মুরুব্বির মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাহা ছাড়া অধ্যাপক রচনায় ভাষার সংযম জানিতেন না, ভাবের উচ্ছৃঙ্খলতানিবারণের চেষ্টা করিতেন না। আজকালকার কলেজে শিক্ষিত ভারতবাসীদিগের সম্বন্ধে অধ্যাপক লিখিয়াছেন,——"তাহাদের চিন্তার একতা নাই, তাহাদের কথাবার্ত্তা কেবল উপর চটকে প্রশংসা পাইবার মত, তাহাদের রচনা ভ্রম-সঙ্কুল। তাহাদের কার্য্য পর্য্যালোচনা করিলে মনে হয় না যে, তাহাদের কোন স্থির মত আছে; তাহাদের কথায় ও রচনায় দায়িত্বহীনতার ভাব বড় সুস্পষ্ট।" এইরূপ মন্তব্য আংলো-ইণ্ডিয়ানদের মুখরোচক রচনা বটে, কিন্তু প্রকৃত সমালোচনা নহে। ইহার সহিত অধ্যাপক ম্যাক্সমুলারের সহৃদয়তার তুলনা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। ইংরাজ সমালোচক সার মোনিয়র ইংরাজ ও ভারতবাসীর সম্বন্ধ দৃঢ় করেন নাই,—শিথিল করিয়াছেন; আর জর্ম্মান ভাষাবিৎ অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার সহানুভূতির সাহায্যে উভয় জাতির মধ্যে প্রীতির বন্ধন দৃঢ় করিয়াছেন।

শিক্ষা সম্বন্ধে মত-প্রকাশ।

শিক্ষা সম্বন্ধে অধ্যাপক সার উইলিয়ম যে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা বিবেচনার যোগ্য। তিনি ভারতবাসীদিগের মাতৃভাষার উন্নতিকল্পে চেষ্টা করিবার জন্য গবমেণ্টকে উপদেশ দিয়াছিলেন। যত দিন বিদেশীয় ভাষাই শিক্ষার উপায় থাকিবে, তত দিন শিক্ষা সম্বন্ধে ভারতবাসীদিগের উন্নতির পথ সহজ হইবে না। বিদেশীয় ভাষায় প্রকাশিত ভাব গ্রহণ করাও যেমন কষ্টকর, বিদেশীয় ভাষায় মনোভাব প্রকাশ করাও তেমনই দুরূহ। বিদেশীয় ভাষায় ভাবপ্রকাশ দুঃসাধ্য—তাই ভাষার দিকে মনোযোগ দিতে গিয়া ভাবের স্ফূর্ত্তি হয় না। ইংরাজগণ প্রায়ই বলিয়া থাকেন যে, আমাদের মৌলিকতা নাই—মৌলিক চিন্তা আমাদের মস্তিষ্কে স্থান পায় না; আমরা কেবল তোতাপাখীর মত মুখস্থ-বিদ্যায় পারদর্শী, (শুভঙ্করী টাকাতেও আমাদের বিশেষ বাহাদুরী।) উঁহারা বুঝেন না যে, বিদেশীয় ভাষায় মৌলিকতা প্রকাশ প্রায় অসাধ্য সাধন। দৃষ্টান্তস্বরূপ

বলা যাইতে পারে যে, লাটীন ভাষায় ইংরাজ কখনও বিশেষ মৌলিকতার পরিচয় প্রদান করিতে পারেন নাই; এ দেশে ইংরাজী ভাষা চিরদিনই শিক্ষিতসমাজে সমাদৃত থাকিবে,; ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশবাসীদিগের মধ্যে মনোভাবপ্রকাশের জন্যও ইংরাজী ভাষার বিশেষ আদর থাকিবে। কিন্তু এ কথা নিশ্চিত যে, ইংরাজী ভাষা কখনও ভারতবাসীদিগের মাতৃভাষায় পরিণত হইবে না। যদি তাহা হইত, তবে এই ইংরাজী শিক্ষার তরঙ্গতাড়িত হইয়াও বাঙ্গালা ও মহারাষ্ট্রীয় ভাষা এত উন্নতি লাভ করিতে পারিত না।

অধ্যাপক সার মোনিয়র স্পষ্টই বলিতেছেন যে, ভারতবর্ষে প্রচলিত ভিন্ন ভিন্ন ভাষাগুলির উন্নতিসাধনে চেষ্টিত হওয়া ভারত গভমেণ্টের একান্ত কর্ত্তব্য। যাহাতে অনাদরে দেশীয় ভাষাগুলি শীর্ণ ও ইংরাজী বিজ্ঞান বুঝাইবার অনুপযোগী হইয়া না দাঁড়ায়, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। যাঁহারা Director of Public Instruction, বা কোন কলেজের বা স্কুলের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইবেন, তাঁহাদের পক্ষে ভারতবর্ষে প্রচলিত দুইটি দেশীয় ভাষায়—হিন্দী ও আর কোন একটি ভাষায়—অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যক। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীর পক্ষে ইংরেজী ভাষায় অভিজ্ঞতালাভের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া—দেশীয় ভাষায় বিদ্যালয়লব্ধ বিদ্যাপ্রকাশই যথেষ্ট বিবেচনা করিলেই ভাল হয়। হিন্দীর আদর যাহাতে বর্দ্ধিত হয়, তাহাই করা কর্ত্তব্য। কারণ, ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে পণ্ডিতদিগের পক্ষে যেমন সংস্কৃত ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ সম্ভব—যাহাতে সাধারণ লোকের পক্ষে হিন্দীতে মনোভাব প্রকাশ তেমনই সম্ভব হয়, তাহা করিলে দেশের বিশেষ উন্নতির আশা আছে।

অধ্যাপক যাহা বলিয়াছেন, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা সকলেরই কর্ত্তব্য। যাঁহারা শিক্ষা-বিভাগে কার্য্য করেন, তাঁহারা ছাত্রদিগের মাতৃভাষায় অভিজ্ঞ থাকিলে যে বিশেষ সুবিধা হয়, তাহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই। ইংরাজের নিকট নহিলে ইংরাজী শিক্ষা ভাল হয় না, কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে ইংরাজ অধ্যাপকের অপেক্ষা দেশীয় অধ্যাপকেরই উপযোগিতা অধিক।

এখানে এ কথা বলাই বাহুল্য যে, দেশীয় ভাষার উন্নতি দেশীয়দিগের হস্তে। তাঁহাদের আন্তরিক যত্ন ও চেষ্টা ব্যতীত দেশীয় ভাষার উন্নতিসম্ভাবনা নিতান্তই সুদূরপরাহত।

সমাজনীতি।

কাবুলে নারীজীবন।

মহিলা-চিকিৎসক কুমারী হামিল্টন বহু দিন কাবুলে বাস করিয়াছেন। কাবুল আমাদের দেশসীমান্তে অবস্থিত—কাবুলের সহিত আমাদের রাজনৈতিক সম্বন্ধ আরও ঘনিষ্ঠ। কাবুলের সামাজিক জীবন আমাদের পক্ষে যেমন কৌতূহলোদ্দীপক, তেমনই রহস্যকুহেলিকাচ্ছন্ন। মহিলা-চিকিৎসক কুমারী হামিল্টন আমীরের শতরক্ষিরক্ষিত, অপর পুরুষের পদধূলিপাতহীন, বিলাসলালসাপূর্ণ অন্তঃপুরেও অবাধে গমনের অধিকার পাইয়াছিলেন। তিনি "লেডীস্ পিকটোরিয়াল্" পত্রে যে সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, সে সকল হইতে কাবুলের নানা কথা

কাবুলের সামাজিক জীবনের একাংশের সহিত পরিচিত করিবার চেষ্টা করিয়াছি। * আজ তাঁহার আর একটি প্রবন্ধ হইতে কাবুলী সমাজের উচ্চ স্তরের মহিলা-জীবনের চিত্র অঙ্কিত করিবার প্রয়াস পাইব।

কি কার্য্যে কাবুলে মহিলাদিগের সময় অতিবাহিত হয়, এ প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা দুরূহ ব্যাপার। সমাজের উচ্চ স্তরে—"বড় ঘরে"—আভিজাত্য-গৌরবে গর্ব্বিতা মহিলাদিগের

কার্য্যাভাব, অবসর-প্রাচুর্য্য ও আলস্য।

কাজই নাই; কাজেই কি কাজে তাঁহাদের সময় কাটে, বলা দুরূহ ব্যাপার। কাবুলে "বড় ঘরে" দুই চারি জন মহিলা লিখিতে ও পড়িতে পারেন। রাজধানীর বাহিরে স্ত্রীশিক্ষার নামগন্ধও নাই। লেখাপড়ার গৌরব আছে; এখন রাজকন্যারা ও আরও অনেক বালিকারা লেখাপড়া শিখিতেছেন। কিন্তু তাঁহারা বিদ্যার চর্চ্চা করিবেন না,—কাজেই জীবনে তাঁহাদের জ্ঞানসম্পদ কোনও কাজেই আসিবে না। বর্ত্তমান সুলতানা মোল্লার দুহিতা। তিনি একটু লিখিতে পারেন, আরবী ভাষায় লিখিত কোরাণ পড়িতেও পারেন, কিন্তু তিনি তাহার অর্থ বুঝেন না।

একজন য়ুরোপীয়া মহিলা যতই কেন অলস হউন না, তিনি কিছুতেই সারা দিন হাত গুটাইয়া কোমল সুখদ লেপ ও বালিশে বেষ্টিতা হইয়া বসিয়া থাকিতে পারেন না। কাবুলে এইরূপ আলস্যেই সম্ভ্রম; কার্য্য অপমানজনক! কাবুলে মহিলারা যে ইচ্ছা করিলে কাজ করিতে পারেন না, এমনও নহে; কিন্তু তাঁহারা কাজ করেন না। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে, তাঁহারা করিয়াও থাকেন। সুলতানা লেখিকাকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি বন্দুক ছুঁড়িতে মজবুৎ—সিদ্ধলক্ষ্য। তাঁহার কক্ষে ভাল ভাল বন্দুকও আছে। কিন্তু লেখিকা কখনও সেগুলি ব্যবহৃত হইতে দেখেন নাই। আমীর লেখিকাকে বলিয়াছেন যে, সুলতানা মধ্যে মধ্যে তাঁহার প্রিয় আহারীয় প্রস্তুত করিয়া পাঠাইয়া থাকেন। কিন্তু লেখিকা দেখিয়াছেন, আমীর সে সকল "প্রিয় খাদ্য" স্পর্শও করেন না। আবার অন্তঃপুরে গিয়া লেখিকা দেখিয়াছেন, সেই খাদ্য-রন্ধনকালে সুলতানা রন্ধনশালার ত্রিসীমায়ও নাই; তিনি তখন হয় বহুমূল্য শয্যায় গড়াইতেছেন, নহে ত তাঁহার বহুসময়সাধ্য বেশবিন্যাসে ব্যস্ত।

একবার গ্রীষ্মকালে সুলতানা রাজধানীর বাহিরে মনোরম উদ্যানবাটিকায় অবস্থান করিতেছিলেন। সেই উদ্যানবিহারকালে একদিন কুমারী হামিল্টন সুলতানকে আমীরের সেই প্রশংসাবাদের কথা বলিয়া তাঁহার নিকট সেই খাদ্যরন্ধনপ্রণালী শিক্ষা করিতে চাহিলেন।

রন্ধন ও খাদ্য।

আফগানের খাদ্য বড় মধুর—আবার আমীরের শুদ্ধান্তে রাঁধা খাদ্যে যে অমৃতের স্বাদ, সে মধুর স্বাদ আর কোথাও রাঁধা খাদ্যে নাই। তখন কাবুলে গ্রীষ্মসমাগমে—চারিদিকে সুমনসুষমা; সেই কুসুমসুবমাকুল উদ্যানে এক স্থানে রন্ধনের বন্দোবস্ত ছিল—অর্থাৎ ভূমিতে গর্ত্ত খনন করিয়া উনান প্রস্তুত করা ছিল। সেই উনানে কাঠ দিয়া অগ্নি জ্বালান হইল। যখন ধূম বিদূরিত হইল—অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল, তখন লেখিকাকে সঙ্গে লইয়া সুলতানা সেখানে উপস্থিত হইলেন। তখন ক্রীতদাসীরা রন্ধন

---

* ১৩০৫ সালের আষাঢ় মাসে "সাহিত্য"—১৯০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

আরম্ভ করিয়াছে—রন্ধনের সব সরঞ্জাম আনীত হইয়াছে। লেখিকা ও সুলতানা বসিয়া রন্ধন দেখিতে লাগিলেন; রন্ধনকালে খাদ্য চাকিতে লাগিলেন, আর অধিক ফুটিলে পাত্র উনান হইতে নামাইতে বলিতে লাগিলেন। লেখিকা বলিয়াছেন,—ইহার পূর্ব্বে তিনি কখনও সুলতানাকে গৃহকর্ম্মে এতটুকু সামান্যরূপে যোগদান করিতেও দেখেন নাই।

কাবুলীদের খাদ্য প্রায়ই ভাজিয়া সিদ্ধ করা হয়। কাবুলী খাদ্যে হরিদ্রার ও জলপাই তৈলের বড় ব্যবহার। কাবুলে শাকসবজিও মাংসের সহিত, বা আমিষসিদ্ধ জলে রন্ধন করা হয়। ইহার উপর আবার খাদ্যে মাখমের বাহুল্য। এরূপ খাদ্যের ফলে কাবুলী মহিলারা যে বিশেষ তন্বঙ্গী নহেন, তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই। কাবুলের ফল বড় মধুর। কাবুলীরা ফল রক্ষা করিতে জানে,—অনেক সময় তাহা মাংসের সহিত পাকে দেওয়া হয়। কাবুলে ভাত রাঁধারও বিশেষত্ব আছে; কখন চাউল স্নেহপদার্থে আংশিক রূপে সিদ্ধ করা হয়, কখন বা চাউল আংশিকরূপে ভাজিয়া লইয়া পরে জলে সিদ্ধ করা হয়। কাবুলীদের খাদ্য প্রস্তুত হইয়া বহুক্ষণ থাকিলেও নষ্ট হয় না। লেখিকা দেখিয়াছেন,—আমীর যখন তখন খাদ্য চাহিলেই পাচক বলে, খাবার বহুক্ষণ যাবৎ প্রস্তুত হইয়া আছে। বাস্তবিক কাবুলীদের আহারের কোন নির্দ্দিষ্ট সময় নাই; পুরুষেরা সুবিধামত যখন তখন আসিয়া আহার করেন; কাজেই খাবার যাহাতে শীঘ্র প্রস্তুত হয় ও বহুক্ষণ থাকিলেও নষ্ট না হয়, এইরূপ ব্যবস্থা আছে।

শীতকালে দিনকতক কাবুলে শীত বড় প্রখর; তখন কুসুমকুলকুন্তলা ধরণী তুষারাছন্না—আনন্দপ্রবাহবিহীনা। লোকে মনে করিতে পারে যে, হিমের অত্যাচারে যখন গৃহের বাহির হওয়া অসম্ভব হইয়া উঠে, তখন অবশ্য কাবুলী-মহিলারা গৃহ-রুদ্ধ জীবনের একঘেয়ে ভাব দূর করিবার অভিপ্রায়ে—কোন না কোন কার্য্য করিয়া সময় অতিবাহিত করিয়া থাকেন। কিন্তু আসল ব্যাপার তাহা নহে। তাঁহারা শীতকালে "সান্দালী"র আশ্রয়ে আলস্যে দীর্ঘ দিবস যাপন করেন। কেবল চা আসিলে বা খোসগল্প আরম্ভ হইলে তাঁহারা একটু আলস্য পরিহার করেন—একটু 'সজাগ' হইয়া উঠেন। সহরে ইন্ধন দুর্ম্মূল্য; প্রাচীন প্রণালীতে নির্ম্মিত উন্মুক্ত অগ্নিকুণ্ডে অগ্নি রক্ষা করা ধনী ব্যতীত অপরের সাধ্যাতীত। আমীর রুশিয়া হইতে দেখিয়া আসিবার পর হইতে, এখন কোন কোন গৃহে য়ুরোপীয় প্রথায় অগ্নিকুণ্ড প্রস্তুত হইয়া থাকে। গরিবের পক্ষে "সান্দালী" না থাকিলে যে বড় কষ্ট হইত, তাহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই। এই বহুপ্রশংসিত "সান্দালী" জিনিসটা কি, তাহা বুঝাইতে হইবে;—ঘরের মেজে মাটীর হইলে তাহার মধ্যস্থলে একটি ক্ষুদ্রায়তন গর্ত্ত খনন করা হয়; মেজে কাষ্ঠনির্ম্মিত হইলে তাহার মধ্যস্থলে একখানি ধাতুপাত্র স্থাপন করিয়া তদুপরি একটি মাটীর গামলা রাখা হয়। সেই গর্ত্তে বা সেই গামলায় উষ্ণ কয়লা দিয়া তাহার উপর একখানি অনতি-উচ্চ টেবিল স্থাপন করা হয়। টেবিলের চারি দিকে মেজের উপর লেপ, গদি প্রভৃতি থাকে। গৃহস্থের অবস্থানুসারে মূল্যবান শাল হইতে মেষলোমপূর্ণ লেপ তোষক পর্য্যন্ত নানা উপকরণ ব্যবহৃত হয়। তাহার

হিম ঋতু ও অগ্নির ব্যবহার।

পর টেবিল ও শয্যা সব আচ্ছাদন করিয়া একখানি বৃহৎ লেপ থাকে। গৃহবাসীরা সেই লেপের আশ্রয় লইয়া থাকেন ;—ব্যয় অধিক হয় না, সকলেরই সুবিধা হয়।

যে পুরু তোষকাদি নিশায় শয়নার্থ ব্যবহৃত হয়, দিবাভাগে সেগুলি উপাধানের সহিত জড়াইয়া আস্তরণে আচ্ছাদিত করিয়া রাখা হয়। বলা বাহুল্য, ধনীর গৃহে এই আস্তরণ জরীর কাজ করা—বহুমূল্য। দিবাভাগে সেগুলি তাকিয়ার কাজ করে—গৃহবাসীরা আলস্যভরে সেখানে গড়াইয়া থাকেন। রাত্রিতে আবার সেগুলি বিছাইয়া শয্যা রচনা করা হয়। একটা "সান্দালী"তে অল্প কয়লা দিলেই কক্ষে বেশ উত্তাপ বোধ হয়। আবার এক "সান্দালী"র নিকটে, অর্থাৎ একই কক্ষে অনেকে শয়ন করিয়া থাকে। ইহাতে সময় সময় বিষম বিপদ হয়। একদিন প্রভাতে লেখিকা তাঁহার গৃহদ্বারে তিনখানি নরবাহিত খাট দেখিতে পাইলেন ; সেই তিনখানি খাটে দুইটি যুবক, তাহাদের জনক ও তাহাদের পাচক, এই কয় জনের শবদেহ শায়িত। তাহারা লেপ দিয়া মুখ অবধি ঢাকিয়া ঘুমাইয়াছিল ; তাই "সান্দালী"র ভুক্তাবশিষ্ট দূষিত বায়ু নিশ্বাস লওয়াতেই তাহাদের মৃত্যু হইয়াছে। কে বলিবে, আপনার স্বার্থের জন্য কোন পাপিষ্ঠ সেই সুখসুপ্ত হতভাগ্যদিগের মুখের উপর লেপ টানিয়া দেয় নাই ? বলিতে কষ্ট হয়, কাবুলে এরূপ পাপাচার বিরল নহে।

গ্রীষ্মকালে কাবুলে সমাজের উচ্চ স্তরে মহিলাদিগের দৈনন্দিন কার্য্যে একটু সজীবতা লক্ষিত হয়। তখন তাঁহারা মধ্যে মধ্যে উদ্যানে ভ্রমণ করেন, বাতায়নসম্মুখে উপবেশন করিয়া উদ্যানের বিকচ কুসুমশোভা সন্দর্শন করেন, সময় সময় ভারতবর্ষের মহিলাদিগেরই মত পালকী করিয়া পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎ করিতেও গমন করিয়া থাকেন। বলা বাহুল্য, ইহাতে মনের স্ফূর্ত্তি হয়, শরীরও অনেকটা ভাল থাকে।

নানা কথা।

শুদ্ধান্তের কর্ম্মলেশহীন অলস জীবন নিত্যনূতনকর্ম্মপ্রার্থিনী, কর্ম্মপ্রিয়া, য়ুরোপীয় মহিলার পক্ষে কষ্টকর। তাই শুদ্ধান্তে গমনকালে লেখিকা পুস্তক ও "সেলাইয়ের কাজ" লইয়া যাইতেন। সেখানে তিনি হয় পাঠ করিতেন, নয় ত সেলাই করিতেন। এক দিন সূচিবিদ্যায় স্বীয় পারদর্শিতাপ্রদর্শনের অভিপ্রায়ে সুলতানা এক জন দাসীকে তাঁহার "সেলাইয়ের কাজ" আনিতে বলিলেন। দাসী কান্দাহারের চিরমনোরম সূচিকার্য্যের কারুকার্য্যখচিত এক খণ্ড বস্ত্র আনয়ন করিল। সেখানি বড় সুন্দর। সুলতানা সেলাই আরম্ভ করিলেন। তিনি সেলাই জানেন ; কিন্তু তিনি যে রূপে সূচিচালনা করিতে লাগিলেন, তাহাতে স্পষ্টই বুঝা গেল যে, সে কার্য্যে তাঁহার পারদর্শিতার সম্পূর্ণ অভাব।

লেখিকা বলেন, তিনি কাবুল সমাজের উচ্চ স্তরের মহিলাদিগের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, কেবল দুই জন মহিলার পক্ষে তাহা প্রযোজ্য নহে। তাঁহারা উভয়েই সুচারুরূপে সংসারের কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের এক জন স্বয়ং রেশমী বস্ত্র বুনিয়া—তাহা হইতে আপনার ও আপনার সন্তানদিগের পরিধেয় ছাঁটিয়া—কলে সেই সকল পরিধেয় সেলাই করিতে পারেন। অপরা সাহিত্যানুরাগিণী, জীবনের উদ্দেশ্যাদি সম্বন্ধে তাঁহার সমুন্নত সংস্কার বিশেষ প্রশংসনীয়। লেখিকা বলেন, তিনি সমস্ত কাবুলে মহিলাদিগের মধ্যে কেবল তাঁহাকেই

একান্তে অধ্যয়নরতা দেখিয়াছেন। তাঁহার স্বামী উচ্চ রাজপদে অধিষ্ঠিত। লেখিকা বলেন, বিপদে পড়িলে তিনি কাবুলে কেবল দুই জন লোকের উপর নির্ভর করিতে পারেন;—ইনি সেই দুই জনের অন্যতমা!

যে সকল কথা বলা হইল, সে সকল সমাজের উচ্চ স্তরের মহিলাদিগের সম্বন্ধে প্রযোজ্য। কাবুলে ও কান্দাহারে দুই প্রকার অতি সূক্ষ্ম সুন্দর সূচিশিল্প হইয়া থাকে। তাহা দরিদ্র মহিলাদিগের দ্বারা রচিত হয়। পার্ব্বত্য জাতির মধ্যে ও যাযাবর জাতির মধ্যে মহিলারা নানা গৃহকার্য্যে ব্যাপৃতা থাকেন। সমাজের উচ্চ স্তরে গৃহকার্য্য ক্রীতদাসীদিগের দ্বারা ও নিঃস্ব আত্মীয়া ও কুটুম্বিনীদিগের দ্বারাই নিষ্পন্ন হয়—কাজেই আর সকলে অলস জীবন যাপন করেন। কাজ করা তাঁহাদের পক্ষে অপমানজনক বলিয়া বিবেচিত হয়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত।

আজ রবিবার। এইমাত্র ভোগারতির সময় সানাই বাজিতেছিল। ঠাকুর-ঘর বন্ধ হইল। শ্রীরামকৃষ্ণও প্রসাদপ্রাপ্তির পর কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিতেছেন। বিশ্রামের পর সেই মধ্যাহ্নকালে শ্রীশ্রীপরমহংসদেব তাঁহার ঘরে ছোট তক্তপোষের উপর বসিয়া আছেন। এমন সময়ে মাষ্টার আসিয়া প্রণাম করিলেন। পরমহংসদেব তাঁহাকে বসিতে অনুজ্ঞা করিলেন ও অনেক কুশলপ্রশ্ন করিলেন। কিয়ৎক্ষণপরে তাঁহার সঙ্গে বেদান্ত সম্বন্ধে কথা হইতে লাগিল।

বেদান্তবাদীদিগের মত।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (মাষ্টারের প্রতি)। "দেখ! অষ্টাবক্রসংহিতায় আত্মজ্ঞানের কথা আছে। আত্মজ্ঞানীরা বলেন সোঽহং, অর্থাৎ 'আমিই সেই পরমাত্মা।' এ সব বেদান্তবাদী সন্ন্যাসীর মত, সংসারীর পক্ষে এ মত ঠিক নয়। সবই করা যাচ্ছে অথচ 'আমিই সেই নিষ্ক্রিয় পরমাত্মা' এ কিরূপে হতে পারে?

"বেদান্তবাদীরা বলে আত্মা নির্লিপ্ত। সুখ দুঃখ পাপ পুণ্য এ সব আত্মার কোনও অপকার করতে পারে না—তবে দেহাভিমানী লোকদের কষ্ট দিতে পারে। যেমন ধোঁয়া দেয়াল ময়লা করে কিন্তু আকাশের কিছু করতে পারে না। "কৃষ্ণকিশোর বল্‌তো আমি 'খ'—অর্থাৎ আকাশবৎ। তা সে পরমভক্ত, তার মুখে ও কথা বরং সাজে, কিন্তু সকলের মুখে নয়।"

পাপ পুণ্য।

বল্‌তে সে মুক্ত হয়ে যায়। আবার 'আমি বদ্ধ' 'আমি বদ্ধ' এ কথা বল্‌তে বল্‌তে সে ব্যক্তি বদ্ধ হয়ে যায়।" যে কেবল বলে 'আমি পাপী' 'আমি পাপী' সেই শালাই পড়ে যায়। বরং বল্‌তে হয় আমি তাঁহার নাম করেছি আমার আবার পাপ কি, বন্ধন কি!

মায়া না দয়া?

শ্রীরামকৃষ্ণ। (মাষ্টারের প্রতি)। দেখ আমার মনটা বড় খারাপ হয়েছে—হৃদে * চিঠি লিখেছে তার বড় অসুখ। একি মায়া না দয়া?

মাষ্টার কি বলিবেন স্থির করিতে না পারিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। মায়া কাকে বলে জান? বাপ মা ভাই ভগ্নী স্ত্রী পুত্র ভাগিনা ভাগ্‌নী ভাইপো ভাইঝি এই সব আত্মীয়ের প্রতি ভালবাসা। আর দয়া মানে সর্ব্বভূতে ভালবাসা। আমার এটা কি হলো, মায়া না দয়া? "হৃদে কিন্তু আমার অনেক করেছিল—অনেক সেবা করেছিল—হাতে করে করে গু পরিষ্কার কর্‌তো। আবার তেমনি শেষে শাস্তিও দিয়েছিল, এত শাস্তি দিত যে পোস্তার উপর গিয়ে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে দেহত্যাগ কর্‌তে গিছ্‌লুম কিন্তু অনেক করেছিল—এখন কিছু (টাকা) গেলে আমার মনটা স্থির হয়!-কিন্তু কোন্ বাবুকে আবার বল্‌তে যাব? কে বলে বেড়ায়?

(অধর সেন ও বলরামের প্রবেশ।)

বেলা দুটা তিনটার সময় ভক্তবীর শ্রীযুত অধরচন্দ্র সেন ও শ্রীযুত বলরাম বসু আসিয়া উপনীত হইলেন ও পরমহংসদেবকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কেমন আছেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, 'হাঁ শরীর ভাল আছে তবে আমার মনে একটু কষ্ট হয়ে আছে।' তিনি হৃদয়ের পীড়া সম্বন্ধে কোন কথারই উত্থাপন করিলেন না।

বড়বাজারের মল্লিকদের সিংহবাহিনী নামক দেবীবিগ্রহের কথা পড়িল।

শ্রীরামকৃষ্ণ। সিংহবাহিনী আমি দেখ্‌তে গিছ্‌লুম। চাষাধোপা পাড়ার এক

* হৃদয় মুখোপাধ্যায় পরমহংসদেবের অনেক দিন ধরিয়া—১৮৮১ সাল পর্য্যন্ত—দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে সেবা করিয়াছিলেন। সম্পর্কে তাঁহার ভাগিনেয়। তাঁহার জন্মভূমি হুগলী জেলাস্থিত শিয়ড় গ্রামে। এই গ্রাম শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের জন্মভূমি। কামারপুকুর হইতে দুই ক্রোশ। ১৩০৬ সালে বৈশাখমাসের মাঝামাঝি—প্রায় দ্বিষষ্টি বৎসর বয়ঃক্রমে

জন মল্লিকদের বাড়ীতে ঠাকুরকে দেখলুম। পড়ো বাড়ী। তারা গরীব হয়ে গেছে। এখানে পায়রার গু, ওখানে শেওলা, এখানে ঝুর ঝুর করে বালি সুরকি পড়্ছে; অন্য মল্লিকদের বাড়ীর যেমন দেখেছি এ বাড়ীর সে শ্রী নাই। (মাষ্টারের প্রতি) আচ্ছা এর মানে কি বল দেখি?

মাষ্টার চুপ করিয়া রহিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কি জান, যার যা কর্ম্মের ভোগ আছে, তা তার কর্‌তে হয়। সংস্কার, প্রারব্ধ, এ সব মান্‌তে হয়।

'মৃণ্ময় আধারে চিন্ময়ী দেবী'।

(মাষ্টারের প্রতি) আর পোড়ো বাড়ীতে দেখ্‌লুম যে সেখানেও সিংহবাহিনীর মুখের ভাব জ্বল্ জ্বল্ কর্‌ছে। আবির্ভাব মান্‌তে হয়।

আমি একবার বিষ্ণুপুরে গিছ্‌লুম। রাজার বেশ সব ঠাকুরবাড়ী আছে। সেখানে ভগবতীর মূর্ত্তি আছে, নাম মৃণ্ময়ী। ঠাকুরবাড়ীর সম্মুখে বড় দীঘি। (মাষ্টারের প্রতি) আচ্ছা দীঘিতে আঁব-আঠার * গন্ধ পেলুম কেন বল দেখি? আমি ত জানতুম না যে মেয়েরা মৃণ্ময়ীদর্শনের সময় আঁব-আঠা তাঁকে দেয়। আর দীঘির কাছে আমার ভাবসমাধি হল—তখন বিগ্রহ দেখিনি, আবেশে সেই দীঘির কাছে মৃণ্ময়ী-দর্শন হল—কোমর পর্য্যন্ত।"

ভক্ত ও সুখদুঃখ।

এত ক্ষণে আর সব ভক্ত আসিয়া জুটিতে লাগিলেন। কাবুলের রাজবিপ্লব ও যুদ্ধের কথা উঠিল। এক জন বলিলেন যে, ইয়াকুব খাঁ সিংহাসনচ্যুত হইয়াছেন। তিনি পরমহংসদেবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, মহাশয়, ইয়াকুব খাঁ কিন্তু এক জন বড় ভক্ত।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কি জান, সুখ দুঃখ দেহধারণের ধর্ম্ম। কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতে আছে যে, কালু বীর জেলে গিছ্‌লো। তার বুকে পাষাণ দিয়ে রেখেছিলো। কিন্তু কালু বীর ভগবতীর বরপুত্র। দেহধারণ কর্‌লেই সুখ দুঃখ ভোগ আছে।

শ্রীমন্ত বড় ভক্ত। আর তার মা খুল্লনাকে ভগবতী কত ভালবাসিতেন, কিন্তু সেই শ্রীমন্তের কত বিপদ। মশানে কাট্‌তে নিয়ে গিছ্‌লো। এক জন কাঠুরে—পরম ভক্ত—ভগবতীর দর্শন পেলে—তিনি কত ভালবাস্‌লেন—কত কৃপা করিলেন। কিন্তু তার কাঠুরের কাজ ঘুচলো না।

মাষ্টার। শুধু কারাগার ঘোচা কেন? দেহই ত যত জঞ্জালের গোড়া, দেহটা ঘুচে যাওয়া উচিত ছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কি জান, প্রারব্ধ কর্ম্মের ভোগ। তাই যে ক'দিন আছে, দেহ ধারণ করতে হয়। যেমন এক জন কানা গঙ্গাস্নান করলে। তার পাপ সব ঘুচে গেল। কিন্তু কানা চোক আর ঘুচ্‌লো না। পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মভোগ।

মাষ্টার। যে বাণটা ছোড়া গেছে সে বাণের উপর আর কোনও আয়ত্ত থাকে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। দেহের সুখ দুঃখ যাই হোক ভক্তের জ্ঞান ও ভক্তির ঐশ্বর্য্য থাকে, সে ঐশ্বর্য্য কখনও যাবার নয়। দেখ না,—পাণ্ডবদের অত বিপদ। কিন্তু এ বিপদে তারা চৈতন্য একবারও হারায় নাই। তাদের মত জ্ঞানী ভক্ত কোথায়?

কাপ্তেন ও বিবেকানন্দের প্রবেশ।

এমন সময় নরেন্দ্র (বিবেকানন্দ) ও শ্রীযুত বিশ্বনাথ উপাধ্যায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিশ্বনাথ নেপালের রাজার Resident রাজপ্রতিনিধি। পরমহংসদেব তাঁহাকে কাপ্তেন বলিতেন। বিবেকানন্দের বয়স বছর বাইশ; B. A. পড়িতেছেন। মাঝে মাঝে, বিশেষতঃ রবিবারে দর্শন করিতে আসেন। তাঁহারা প্রণাম করিয়া উপবিষ্ট হইলে পরমহংসদেব নরেন্দ্রকে গান গাইতে অনুরোধ করিলেন। ঘরের পশ্চিম ধারে তানপুরাটি ঝুলান ছিল, বিবেকানন্দ সেই তানপুরাটি লইয়া তাহার কান মলিয়া সুর বাঁধিতে লাগিলেন। সকলে একদৃষ্টে গায়কের দিকে চাহিয়া রহিলেন; বাঁয়া ও তবলায় সুর বাঁধা হইতে লাগিল;—কখন গান হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিবেকানন্দের প্রতি)। দেখ্, এ আর তেমন বাজে না।

কাপ্তেন। পূর্ণ হয়ে বসে আছে, তাই শব্দ নাই। পূর্ণকুম্ভ।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (কাপ্তেনের প্রতি)। কিন্তু নারদাদি?

কাপ্তেন। তাঁহারা পরের দুঃখে কথা কয়েছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, নারদ, শুকদেব এঁরা সমাধির পর নেবে এসেছিলেন— দয়ার জন্য, পরের হিতের জন্য তাঁরা কথা কয়েছিলেন।

বিবেকানন্দ গান আরম্ভ করিলেন। গাইলেন,

সত্যং শিব সুন্দর রূপ ভাতি হৃদি-মন্দিরে।

নিরখি নিরখি অনুদিন মোরা ডুবিব রূপসাগরে।
জ্ঞান-অনন্তরূপে পশিবে নাথ মম হৃদে,
অবাক্ হইয়ে অধীর মন শরণ লইবে শ্রীপদে।
আনন্দ-অমৃত-রূপে উদিবে হৃদয়-আকাশে,
চন্দ্র উদিলে চকোর যেমন ক্রীড়য়ে মন হরষে,
আমরাও নাথ তেমনি করে মাতিব তব প্রকাশে।
শান্তং শিব অদ্বিতীয় রাজরাজ-চরণে,
বিকাইব ওহে প্রাণসখা সফল করিব জীবনে।
এমন অধিকার কোথা পাব আর স্বর্গ-ভোগ জীবনে (সশরীরে)।
শুদ্ধমপাপবিদ্ধং রূপ হেরিয়ে নাথ তোমার,
আলোক দেখিলে আঁধার যেমন যায় পলাইয়ে সত্বর,
তেমনি নাথ তোমার প্রকাশে পলাইবে পাপ-আঁধার।
ও হে ধ্রুবতারা-সম হৃদে জ্বলন্ত বিশ্বাস হে,
জ্বালি দিয়ে দীনবন্ধু পুরাও মনের আশ,
আমি নিশিদিন প্রেমানন্দে মগন হইয়ে হে,
আপনারে ভুলে যাব তোমারে পাইয়ে হে।
(সে দিন কবে হ'বে)॥

'আনন্দ অমৃতরূপ' এই কথা বলিতে না বলিতে শ্রীরামকৃষ্ণ গভীর ভাব-সমাধিতে নিমগ্ন হইলেন। আসীন হইয়া করযোড়ে বসিয়া আছেন। পূর্ব্ব আস্য। দেহ উন্নত। আনন্দময়ীর রূপসাগরে নিমগ্ন হইয়াছেন। লোক বাহ্য একেবারে নাই। শ্বাস বহিছে কি না বহিছে। স্পন্দহীন। নিমেষশূন্য। চিত্রার্পিতের ন্যায় বসিয়া আছেন। যেন এ রাজ্য ছাড়িয়া কোথায় গিয়াছেন।

সমাধিভঙ্গের পর।

সমাধি ভঙ্গ হইল। ইতিপূর্ব্বে বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধিদৃষ্টে কক্ষ ত্যাগ করিয়া পূর্ব্ব দিকের বারাণ্ডায় চলিয়া গিয়াছেন। সেখানে হাজরা মহাশয় কম্বলাসনে হরিনামের মালা হাতে করিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার সঙ্গে বিবেকানন্দ আলাপ করিতে লাগিলেন। এ দিকে ঘরে একঘর লোক হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিভঙ্গের পর ভক্তদের মধ্যে দৃষ্টিপাত করিলেন। দেখেন যে, বিবেকানন্দ নাই। শূন্য তানপুরা পড়িয়া রহিয়াছে। আর ভক্তগণ সকলে তাঁর দিকে ঔৎসুক্যের সহিত চাহিয়া রহিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আগুণ জ্বেলে গেছে এখন থাক্‌লো আর গেল।

সচ্চিদানন্দলাভের উপায়।

(ভক্তদিগের প্রতি) চিদানন্দ আরোপ কর, তোমাদেরও আনন্দ হবে। চিদানন্দ আছেই—কেবল আবরণ ও বিক্ষেপ। বিষয়াসক্তি যত কমবে, ঈশ্বরে রতিমতি তত বাড়বে।

কাপ্তেন। কলিকাতার বাড়ীর দিকে যত আসবে, কাশী থেকে তত তফাৎ হবে। আবার কাশীর দিকে যত যাবে, বাড়ী থেকে তত তফাৎ হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। শ্রীমতী যত কৃষ্ণের দিকে এগুচ্ছেন, ততই কৃষ্ণের দেহ-গন্ধ পাচ্ছিলেন। ঈশ্বরের নিকট যত যাওয়া যায়, ততই তাঁতে ভাবভক্তি হয়। সাগরের নিকট নদী যতই যায়, ততই তাঁতে ভাব ভক্তি হয়। সাগরের নিকট নদী যত যায়, ততই জোয়ার ভাঁটা দেখা যায়।

জ্ঞানী ও ভক্তের প্রভেদ।

শ্রীরামকৃষ্ণ। জ্ঞানীর ভিতর একটানা গঙ্গা বহিতে থাকে। তাহার পক্ষে সব স্বপ্নবৎ। তিনি স্ব স্ব রূপে সর্ব্বদা থাকেন। ভক্তের ভিতর একটানা নয়—জোয়ার ভাঁটা হয়। হাঁসে কাঁদে নাচে গায়। ভক্ত তাঁর সঙ্গে বিলাস কত্তে ভালবাসে—কখন সাঁতার দেয়, কখন ডুবে, কখন উঠে—যেমন জলের ভিতর বরফ 'টাপুর টুপুর,' 'টাপুর টুপুর' করে।

সচ্চিদানন্দ ও সচ্চিদানন্দময়ী—ব্রহ্ম ও শক্তি।

"কিন্তু বস্তুতঃ ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ—যিনি সচ্চিদানন্দ তিনিই সচ্চিদানন্দময়ী। যেমন জ্যোতিঃ ও মণি; জ্যোতিঃ বল্লেই মণি বুঝায়, মণি বল্লেই জ্যোতিঃ বুঝায়। তুমি মণি না ভাব্‌লে জ্যোতিঃ ভাবতে পার না—জ্যোতিঃ না ভাবলে মণি ভাব্‌তে পার না।

"এক সচ্চিদানন্দ শক্তিভেদে উপাধি ভেদ—তাই নানা রূপ—'সেতো তুমিই গো তারা'। যেখানে কার্য্য (সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়) সেইখানেই শক্তি। কিন্তু জল স্থির থাকলেও জল—তরঙ্গ ভুড়ভুড়ি হলেও জল। সেই সচ্চিদানন্দই আদ্যাশক্তি—যিনি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করেন। যেমন কাপ্তেন যখন কোন কাজ করেন না তখনও যিনি, আর কাপ্তেন পূজা করছেন তখনও তিনি, আর কাপ্তেন লাট সাহেবের কাছে যাচ্ছেন তখনও তিনি—কেবল উপাধি বিশেষ।

কাপ্তেন। হাঁ, মহাশয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আমি এই কথা কেশব সেনকে বলেছিলুম।

কাপ্তেন। মহাশয়, কেশব সেন ভ্রষ্টাচার, স্বেচ্ছাচার—তিনি বাবু—তিনি সাধু নন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (ভক্তদের প্রতি)। কাপ্তেন আমায় বারণ করে কেশব সেনের ওখানে যেতে।

কাপ্তেন। তা আপনি যাবেন তা আর কি করবো ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। তুমি লাট্ সাহেবের কাছে যেতে পার টাকার জন্য, আর আমি কেশব সেনের কাছে যেতে পারি না ? সে ঈশ্বরচিন্তা করে—হরিনাম করে! তবে না তুমি বল 'ঈশ্বর-মায়া-জীবজগৎ'—যিনি ঈশ্বর, তিনিই এই সব জীব, জগৎ হয়েচেন!

এই বলিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ হঠাৎ ঘর হইতে উত্তর-পূর্ব্বের বারাণ্ডায় চলিয়া গেলেন। কাপ্তেন ও অন্যান্য ভক্তেরা ঘরেই বসিয়া তাঁর প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কেবল মাষ্টার তাঁহার সঙ্গে বাহিরে ঐ বারাণ্ডায় আসিলেন।

উত্তর-পূর্ব্বের বারাণ্ডায় বিবেকানন্দ হাজরার সহিত কথোপকথন করিতে-ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ জানেন হাজরা বড় শুষ্ক জ্ঞানবিচার করে—বলে 'জগৎ স্বপ্নবৎ—পূজা-নৈবেদ্য এ সব মনের ভুল—কেবল স্বরূপকে চিন্তা করাই উদ্দেশ্য। আর আমিই সেই'।

জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (হাসিতে হাসিতে)। কিগো! তোমাদের কি সব কথা হচ্চে।

বিবেকানন্দ। (হাসিতে হাসিতে)। আমাদের কত কি কথা হচ্চে—'লম্বা' 'লম্বা' কথা।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (হাসিতে হাসিতে)। কিন্তু শুদ্ধ জ্ঞান আর শুদ্ধ ভক্তি এক। শুদ্ধজ্ঞান যেখানে নিয়ে যায়, শুদ্ধভক্তিও সেইখানে নিয়ে যায়! ভক্তিপথ বেশ সহজ পথ!

বিবেকানন্দ। 'আর কাজ নাই জ্ঞানবিচারে, দে মা পাগল ক'রে।' (মাষ্টারের প্রতি) দেখুন Hamiltonএ পড়্‌লুম—লিখ্‌ছেন 'A learned ignorance is the end of philosophy and the beginning of religion'.

শ্রীরামকৃষ্ণ। এর মানে কিগা!

বিবেকানন্দ। ফিলজফি (দর্শনশাস্ত্র) পড়া শেষ হলে মানুষটা পণ্ডিত-মূর্খ হয়ে দাঁড়ায়, তখন ধর্ম্ম ধর্ম্ম করে। তখন ধর্ম্মের আরম্ভ হয়!

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে)। Thank you! Thank yau!

(সকলের হাস্য)

কিয়ৎক্ষণ পরে সন্ধ্যা আগতপ্রায় দেখিয়া অধিকাংশ লোক বাটী গমন করিলেন। বিবেকানন্দও বিদায় হইলেন।

ক্রমে বেলা পড়িয়া আসিতে লাগিল। সন্ধ্যা হয় হয়। ঠাকুরবাড়ীর ফরাস চারি দিকে আলোর আয়োজন করিতে লাগিল। কালীর ঘরের ও বিষ্ণুঘরের দুই জন পূজারি গঙ্গায় অর্দ্ধনিমগ্ন হইয়া বাহ্ন ও অন্তর শুচি করিতেছেন, কেন না শীঘ্র গিয়া আরতি ও ঠাকুরদের রাত্রিকালীন শীতল দিতে হইবে। দক্ষিণেশ্বরগ্রামবাসী যুবকবৃন্দ—কাহারও হাতে stick, কেহ বন্ধু সঙ্গে—বাগান বেড়াইতে আসিয়াছে। তাহারা পোস্তার উপর বিচরণ করিতেছে ও কুসুমগন্ধবাহী নির্ম্মল সন্ধ্যাসমীরণ সেবন করিতে করিতে শ্রাবণ মাসের খরস্রোত ঈষৎবীচিবিকম্পিত গঙ্গাপ্রবাহ দেখিতেছিল। তন্মধ্যে হয় ত একজন অপেক্ষাকৃত চিন্তাশীল পঞ্চবটীর বিজনভূমিতে পাদচারণ করিতেছে। ভগবান রামকৃষ্ণও পশ্চিমের বারাণ্ডা হইতে কিয়ৎকাল গঙ্গা দর্শন করিতে লাগিলেন।

সন্ধ্যা হইল। ফরাস আলোগুলি জ্বালিয়া দিয়া গেল। পরমহংসদেবের ঘরে আসিয়া দাসী প্রদীপ জ্বালিল ও ধূনা দিল। এ দিকে দ্বাদশমন্দিরে শিবের আরতি আরম্ভ হইল। তৎপরেই বিষ্ণুঘরের ও কালীঘরের আরতি আরম্ভ হইল, কাঁসর, ঘড়ি ও ঘণ্টা মধুর ও গম্ভীর নিনাদ করিতে লাগিল—মধুর ও গম্ভীর—কেন না মন্দিরের পার্শ্বেই কলকলনিনাদিনী গঙ্গা।

শ্রাবণের কৃষ্ণা দ্বিতীয়া। কিয়ৎক্ষণ পরেই চাঁদ উঠিল। বৃহৎ উঠান ও উদ্যানস্থিত বৃক্ষশীর্ষ ক্রমে চন্দ্রকিরণে প্লাবিত হইতে লাগিল। এ দিকে জ্যোৎস্নার স্পর্শে ভাগীরথীসলিল যেন কত আনন্দ করিতে করিতে প্রবাহিত হইতে লাগিল।

সন্ধ্যার পরেই শ্রীরামকৃষ্ণ জগন্মাতাকে নমস্কার করিয়া হাততালি দিয়া হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। কক্ষমধ্যে অনেকগুলি ঠাকুরদের ছবি—শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্কীর্ত্তনের ছবি, যশোদা ও গোপালের ছবি, বাগ্‌বাদিনীর ছবি, ধ্রুবপ্রহ্লাদের ছবি, রামরাজার ছবি, মা কালীর ছবি, রাধাকৃষ্ণের ছবি—তিনি সকল ঠাকুরকে উদ্দেশ করিয়া ও তাঁহাদের নাম করিয়া প্রণাম করিতে লাগি-

লেন। আবার বলিতে লাগিলেন, 'ব্রহ্মাত্মা' ভগবান-ভাগবৎভক্ত-ভগবান ব্রহ্ম-শক্তি শক্তি-ব্রহ্ম, বেদপুরাণ তন্ত্র গীতা গায়ত্রী। শরণাগত শরণাগত; নাহং নাহং তুঁহু তুঁহু আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী ইত্যাদি। নামের পর করযোড়ে জগন্মাতার চিন্তা করিতে লাগিলেন।

দুই চার জন ভক্ত সন্ধ্যাগমে উদ্যানমধ্যে ও গঙ্গাতীরে বেড়াইতেছিলেন। তাঁহারা ঠাকুরদের আরতির কিয়ৎক্ষণ পরে পরমহংসদেবের ঘরে ক্রমে ক্রমে আসিয়া জুটিতে লাগিলেন।

পরমহংসদেব খাটে উপবিষ্ট। মাষ্টার, অধর, কিশোরী ইত্যাদি নীচে সম্মুখে বসিয়া আছেন।

বিবেকানন্দের কত গুণ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)। নরেন্দ্র (বিবেকানন্দ), রাখাল, ভবনাথ, এরা সব নিত্যসিদ্ধ। এদের শিক্ষা কেবল বাড়ার ভাগ। দেখ না নরেন্দ্র কাহাকেও care (গ্রাহ্য) করে না। আমার সঙ্গে কাপ্তেনের গাড়ীতে যাচ্ছিল—কাপ্তেন ভাল জায়গায় বসতে বল্লে—তা চেয়েও দেখলে না। আমারই অপেক্ষা রাখে না। আবার যা জানে তাও বলে না—পাছে আমি লোকের কাছে বলে বেড়াই যে নরেন্দ্র এত বিদ্বান্। মায়া মোহ নাই—যেন কোন বন্ধন নেই। খুব ভাল আধার। একাধারে অনেক গুণ—গাইতে বাজাতে লিখতে পড়তে—এ দিকে জিতেন্দ্রিয়—বলেছে বিয়ে করবে না। নরেন্দ্র আর ভবনাথ দু'জনে ভারি মিল—যেন স্ত্রীপুরুষ। নরেন্দ্র বেশী আসে না। সে ভাল। বেশী এলে আমি বিহ্বল হই।

কবিতা-কুঞ্জ।

বর্ষা।

সজল জলদ স্নিগ্ধ-বসনে
এসেছে আবার বরষা;
মৃদু গুরু গুরু ঘন-গরজনে
জাগায়ে তুলিছে বিরহিণী-মনে
প্রিয় সমাগম ভরসা।
যূথিকা ঢালিছে সুরভি বাতাসে,
উচ্ছ্বসি নদী উঠিছে উলাসে,
শীকরশীতল সমীর নিশ্বাসে

পরাণে জাগায়ে লালসা।
এসেছে আবার বরষা।
নীপ-শাখে শাখে ফুটিয়াছে ফুল
বরষা পবন-পরশে,
সৌরভে বায়ু হয়েছে আকুল,
গুঞ্জরি তাই ফিরে অলিকুল
মধু আহরণ-রভসে।
পল্বল-কূলে ডাকিছে দাদুরী,
কেকারব করে ময়ূর ময়ূরী,

ধরার অঙ্গে জাগিছে মাধুরী,
নব-যৌবন-হরষে ;
বরষা-বারিদ বরষে।

ঢাকি তনুখানি হরিৎ দুকূলে
কেতকী উঠেছে ফুটিয়া ;
কেতকীকুঞ্জে তটিনীর কূলে
বরষা-সমীর খেলে কুতূহলে
পরিমল রেণু লুটিয়া !
স্নান-অবসানে সিক্ত-বসনে
ফিরিছে যাহারা আপন ভবনে,—
তাদের কপোলে, তাদের আননে
কেতকীপরাগ মাখিয়া
যেতেছে পবন বহিয়া।

আজ মনে পড়ে রামগিরি পরে
নব ঘন আসে ছাইয়া ;
পাঠাতে বারতা প্রেয়সীর তরে
যক্ষ জলদে অনুনয় করে
কুটজ-অর্ঘ্য রচিয়া,
মানসমোহিনী হরিণীনয়না,
জগতে শ্রেষ্ঠ মাধুরী-রচনা
তারে ছাড়ি করি বরষ যাপনা
আঁখিজল পড়ে ঝরিয়া,
পরাণ উঠিছে কাঁদিয়া।

আজ মনে পড়ে যমুনাপুলিনে
বিরহবিধুরা বালিকা ;
শূন্য ভবনে বিজন বিপিনে
অশ্রু ঝরিছে নয়ন-নলিনে,
গলে ম্লান ফুলমালিকা,
মিশাইছে শ্বাস বরষা-পবনে,
প্রেমের বেদনা জাগি উঠে মনে ;
সাধ যায় কারে সঁপিতে যতনে
প্রণয়-কুসুম-কলিকা।
বিরহবিধুরা বালিকা।

চরাচরে যেন উঠেছে জাগিয়া
সুপ্ত প্রণয় সহসা ;
দামিনী যেমন সহসা ফুটিয়া
জলদ-হৃদয় তুলে উজলিয়া
আসিলে নবীন বরষা।
জাগি যেন কার প্রণয়স্বপনে
প্রকৃতি হেরিছে আপন নয়নে
যৌবনরাশি উছলে সঘনে,
পরাণে উথলে লালসা।
এসেছে আবার বরষা।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

তাপহরা।

দারুণ নিদাঘতাপে তপ্ত অতিশয়
যেমনি পুলিনে তোর প্রভাত-সময়
বসিলাম, হে জাহ্নবী জননী আমার,
অমনি করিয়া স্নিগ্ধ সমীরসঞ্চার
প্রসারি' পরশরাশি অমৃতসমান,
আনন্দে প্লাবিয়া দিলে সর্ব্ব দেহখান,
বিচিত্র তরল তানে তরঙ্গ-বাঁশীতে
অস্ফুট কল্যাণ-গীত লাগিলে গাহিতে,
অলক্ষিতে সান্ত্বনার যবনিকা টেনে
কোথা হ'তে দুই চক্ষে ঘুম দিলে এনে,
তাই আজি ভাবিতেছি অন্তিমে যখন
ও চির-সৈকত-শয্যা করিব গ্রহণ,
প্রাণের সন্তাপরাশি পাপের পশরা
এইরূপে হরিবে কি মাতা তাপহরা !

শ্রীনিত্যকৃষ্ণ বসু।

শ্মশান।

গ্রামের সুদূর প্রান্তে—ভগ্ন দেবালয়
তাহার চরণে লগ্ন—বিস্তীর্ণ শ্মশান
নীরব-নির্জ্জন।—যেন আপনারে লয়
করিয়াছে প্রেত-ভূমি সমর্পিয়া প্রাণ

শিয়রের দেবী-পদে—ধ্যান-নিমগনা
ঊর্দ্ধে দেখে শুধু সেই এক নভঃ—আর
মন্দিরের মহাভয়—লেলিহ-রসনা—
মরণের ক্ষুদ্র ভয়ে করিছে সংহার।

আমার জীবন হোক শ্মশান প্রখর
দাঁড়াও পাবনী তাহে একা—একেশ্বরী
পুড়ুক নিয়ত তাহে যা' কিছু নশ্বর
পাপ যাহা—মৃত্যু যাহা—যাহা মৃত্যুকরী
তোমাতে নিমগ্ন—লুপ্ত—তুমি প্রাণ-ময়
বিশ্বের সে চির চিতা ধরিবে হৃদয়।

শ্রীপ্রিয়নাথ সেন।

স্মরণে।

যবে সখি! আষাঢ়ের প্রথম দিবসে,
মেঘমেদুরিতাম্বরে চপলা প্রকাশে,
কুটজকুসুম-গন্ধী সমীর মধুর—
বাড়ায় বিরহব্যথা বিরহিবিধুর,
জলধরে মুগ্ধদৃষ্টি পথিক-বনিতা
ধীরে অশ্রু মুছে ভাবি প্রিয়জনকথা,
দীর্ঘ-সন্ধ্যা-অবসানে স্তিমিত আলোকে,
পূর্ব্ব প্রেমনিশি গড়ি নীরবে নির্ব্বাকে,
কবরীতে কুন্দকলি, কর্ণে শোভে নীপ,
গৃহে গৃহে কুমারীরা জ্বালে সন্ধ্যা-দীপ,
সেই বরষার দিন সুদূর প্রবাসে,
যবে প্রিয়ে মুহুর্মুহুঃ জলদ নির্ঘোষে,
কঠোর মধুর হয় তোমার পিরিতি—
জীবনসায়াহ্নে যথা যৌবনের স্মৃতি।

শ্রীনলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায়।

হৃদয়াসীনা।

আমার শূন্য হৃদয়-আসনে
কে তুমি আসীনা আজি?
ছিল এ চিত্ত জড় অচেতন,
নিদ্রিত সাধ বাসনা বেদন,
আজি সেথা একি রাগিণী নূতন
আপনি উঠিছে বাজি।
শূন্য হৃদয়-আসনে আমার
কে তুমি আসীনা আজি?

আমার গোপন মনোমন্দিরে
কে তুমি দেবতা অয়ি!
আমার এ চির-আঁধার ভবন
আলোকরশ্মি দেখেনি কখন,
সহসা কি শুভ কিরণমগন
করিলে জ্যোতির্ম্ময়ি!
আমার প্রাণের মন্দির মাঝে
কে তুমি আসীনা অয়ি?

আমার শুষ্ক হৃদয়-মরুতে
কে তুমি প্রেমের নদি?
ভরা বরষায় ভরি কূলে কূলে
যৌবনাবেগে আপনায় ভুলে
উছলি রঙ্গে তরঙ্গ তুলে
ছুটিতেছ নিরবধি;
আমার শুষ্ক হৃদয়-মরুতে
কে তুমি অমৃত-নদী?

কে তুমি আমার হৃদয়কুঞ্জে
নব-বসন্ত-রাণি?
চরণ-পরশে ধরণী আকুল
দিতেছে অর্ঘ্য শত কোটী ফুল,
বিহরে মলয়, গাহে পিককুল
অবসাদ নাহি মানি,
আমার হৃদয়-নিকুঞ্জ-বনে
অয়ি বসন্ত-রাণি!

কে তুমি আমার মানস-রাজ্যে
চির-সুষমার খনি!
ঊষা গোধূলির রঙ্গীন্ আকাশে
ইন্দু-কিরণে, তারকার হাসে,

কোথা হ'তে আজি নবশোভা আসে
কে তুমি পরশমণি ?
আমার এ দীন হৃদয়রাজ্যে
তুমি সুষমার খনি।

কে তুমি আমার অন্তরে থাকি
সুধীরে বাজাও বীণা ?
দিবানিশি শুধু গাহি সুমধুর
সান্ত্বনাভরা স্বরগের সুর,
পরাণের যত ব্যথা কর দুর
আমার হৃদয়াসীনা।
অন্তর-মাঝে থাকি' নিশিদিন
কে তুমি বাজাও বীণা ?

শ্রীরমণীমোহন ঘোষ।

গান।

[মুলতানী।]

মনেরই বাসনা মনে বুঝি রয়ে যায়;
পথ চেয়ে চেয়ে শুধু বেলা যে বয়ে যায়।
আসে শুধু সমীরণ করুণ মর্ম্মর তানে,
'আসেনি আসেনি সে'—এ বারতা কয়ে যায়,
ফিরে চায় শূন্য ঘরে বিরহ হুতাশে,
ধীরে ডুবে যায় রবি, সন্ধ্যা হয়ে আসে;
ধিক ধিক এ জীবন, ধিক এ যৌবন মোর,
এত সাধ বুঝি সব বিফল হয়ে যায়।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

কে দুঃখী ?

কে দুঃখী ; কিসের তরে ? সংসার-জননী
মোরে দিয়াছে বিদায়—মমতা পাশরি।
নিরানন্দ গৃহে মোর দিবস রজনী
বহে অশান্তির বায়ু, নির্ব্বাপিত করি
হৃদয়-আনন্দ-দীপ ;—ঘৃণা-উপহাস-
রাশি উঠে ফুটি সদা পরশে আমার ;—
তাই বলে' দুঃখী আমি ? দুঃখ বলি তার,
আপন অন্তর যারে করে না বিশ্বাস ;
দুঃখী সেই—প্রাণ হ'তে যার ব্যথা লয়
টানি হেন কেহ নাই। মোর তুমি আছ
সখা, হৃদয়-দেবতা,—অন্ধকারময়
এ চিত্ত-আকাশে চন্দ্র তুমি, রহিয়াছ
পূর্ণ করি করুণা-কিরণালোকে। যায়
নিভে শতকোটি-তারা কি ক্ষতি তাহায় ?

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চী।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

তত্ত্ববোধিনী। আষাঢ়। এ সংখ্যায় উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধের একান্ত অভাব। এবার শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "আর্য্যধর্ম্ম এবং বৌদ্ধধর্ম্মের পরস্পর ঘাতপ্রতিঘাত এবং সংঘাত" নামক প্রবন্ধের অতি অল্পমাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। উল্লিখিত প্রবন্ধটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

নব্যভারত। বৈশাখ। সম্পাদক মহাশয়ের "আসা এবং যাওয়ার পথ" একটি উৎকৃষ্ট হেঁয়ালি। প্রবন্ধের বক্তব্য কি, তাহা বুঝিলাম না। শ্রীযুত ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্যের

"জীমূতবাহন" প্রবন্ধে গবেষণা ও পাণ্ডিত্যের অভাব নাই। কিন্তু প্রত্নতত্ত্ব কি সাধারণের উপযোগী ও সরস করা যায় না? শ্রীম-কথিত "পরমহংস রামকৃষ্ণের কথামৃত" সুপাঠ্য ও শিক্ষাপ্রদ। "আমাদের জাতীয় কলঙ্ক এবং ইংরাজের মহত্ত্ব" প্রবন্ধে যথেষ্ট 'হা হুতাশ' ও 'হা হতোঽস্মি' বিদ্যমান। আমাদের জাতীয় কলঙ্ক অপরিমিত, এবং তাহা অবলম্বন করিয়া ততোধিক প্রবন্ধ রচিত হইতে পারে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই;—বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের লেখক মহাশয়ও পুনঃপুনঃ তাহার প্রমাণ দিয়াছেন। কিন্তু এমনতর বাক্যফেনময় প্রবন্ধ-তরঙ্গে সে কলঙ্ক-কালিমার ক্ষালন সম্ভব কি না, ভাবিয়া দেখিলে হয় না? বাক্যসার বাঙ্গালীর বচনবৈভবও একটা জাতীয় কলঙ্ক—সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই। অতএব, বাঙ্গালীর বচন-বাণ অন্ততঃ দিনকতক তূণীরবদ্ধ থাকিলে মন্দ হয় না। শ্রীযুত অক্ষয়কুমার বড়ালের "মনোরমা" একটি গাথা,—সুখপাঠ্য। "সাহিত্য-সংবাদে" শ্রীযুত ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী ভারতবর্ষের প্রাচীন ভূগোলের পরিচয় দিয়াছেন।

নব্যভারত। জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়। শ্রীম-কথিত "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত" বেশ হইয়াছে। শ্রীযুত যোগেন্দ্রকুমার ঘোষের "ডুবিতেছি না ভাসিতেছি?" পড়িতে পড়িতে আমাদের মনেও ঠিক ঐ প্রশ্নটির উদয় হইয়াছে। একটা কথা আছে, শালগ্রামের শয়ন-উপবেশন বোঝা যায় না,—"ডুবিতেছি না ভাসিতেছি" সম্বন্ধেও সেই কথা। "ঐতিহাসিক আবুল ফাজেলের পূর্ব্বপুরুষ" শ্রীযুত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি রচিত। ঐতিহাসিক তথ্য অল্প, কিন্তু লেখক ভাষায় তাহা ঢাকিয়া দিয়াছেন। শ্রীযুত ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্যের "শূলপাণি ভট্টাচার্য্য" প্রবন্ধটি পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক—কিন্তু সাধারণ পাঠকের দিকে শূল উদ্যত করিয়া আছে। শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন সিংহের "চন্দ্রভাগা-দর্শন" একটি সুখপাঠ্য, সুরচিত ভ্রমণ-কাহিনী। শ্রীযুত নিত্যকৃষ্ণ বসুর "বিদায়-গীতি" নামক কবিতাটি পড়িয়া আমরা নিরাশ হইয়াছি। "বিদায়-গীতি" নিত্যকৃষ্ণ বাবুর যোগ্য হয় নাই।

উদ্বোধন। আষাঢ়; ১১শ ও ১২শ সংখ্যা। আষাঢ়ের প্রথম সংখ্যায় শ্রীযুত গিরিশচন্দ্র ঘোষের "গোবরা" নামক ক্ষুদ্র গল্পটি উল্লেখযোগ্য। বোধ করি, ঘটনাসমাবেশে লেখকের দৃষ্টি ছিল না,—তাই কোনও কোনও ঘটনা অসম্ভব ও অদ্ভুত বলিয়া মনে হয়;—কিন্তু বাগ্‌দিনীর চরিত্রচিত্রে লেখক সফল হইয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দের "বর্ত্তমান ভারত" এবারও আছে। আষাঢ়ের দ্বিতীয় সংখ্যায় "শ্রীরামানুজচরিত" উল্লেখযোগ্য। ভাষার দারিদ্র্যে শ্রীযুত কিরণচন্দ্র দত্তের অনুবাদিত "কারিষ্ট্র" গল্পটি মাটী হইয়াছে।

ঋষি। আষাঢ়। "পিপাসার জল" শ্রীযুত জলধর সেনের রচিত একটি সুখপাঠ্য ক্ষুদ্র গল্প। শ্রীযুত ব্যোমকেশ মুস্তোফী "পতি দেবতা" প্রবন্ধে গোঁড়ামির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছেন। সত্যযুগের পতির প্রাপ্যে কলিযুগের স্বামীর অধিকার আছে কি?

স্বাস্থ্য। আষাঢ়। "স্বাস্থ্যপ্রসঙ্গে" "অজীর্ণতা বহু রোগের মূল" ও "মকরধ্বজ" সাধারণের জ্ঞাতব্য। "বর্ষা ও তাহার কর্ত্তব্যতা", সময়োপযোগী সদুপদেশ। "দেশীয় পথ্য-পরীক্ষা" ও "আয়ুর্ব্বেদসম্মত জ্বরচিকিৎসা" সকলের আলোচনার যোগ্য।

তত্ত্বমঞ্জরী। মে ও জুন. ১ম ও ২য় সংখ্যা। শ্রীম-কথিত "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথা-

মৃত" উল্লেখযোগ্য। "ভালবাসা" ও "মায়া" নামক পদ্য দুটি কেন প্রকাশিত হইল, বলিতে পারি না।—অক্ষম রচনার উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

ভারতী। আষাঢ়। "আহিতাগ্নিকা" একটি কবিতা; সংস্কৃত অভিধান হইতে বাছিয়া বাছিয়া কতিপয় দুরূহ শব্দের সঙ্কলন করিয়া কবি এই কবিতাটি রচিয়া থাকিবেন। অতি কষ্টে শব্দের অর্থ সংগ্রহ করা যায়, কিন্তু মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়াও ইহার মর্ম্ম অনুধাবন করিতে পারিলাম না।—প্রথমে নিজের বুদ্ধির অল্পতায় মর্ম্মাহত হইয়া হাল ছাড়িয়া দিয়াছিলাম, কিন্তু যখন দেখিলাম, ইণ্ডিয়া ক্লবের পাঠাগারে কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও অঙ্কশাস্ত্রবিৎ মহেন্দ্রনাথ রায় সম্মুখে "অহিতাগ্নিকা" লইয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া আছেন, এবং এ ক্ষেত্রে উভয়ের দুর্দ্দশাই সমান,—তখন আশ্বস্ত হইলাম; বুঝিলাম, কি কবিপ্রতিভা, কি অঙ্কসমুজ্জ্বলা মনীষা, কি বিধিব্যবস্থার সারগ্রাহিণী সেমুষী (আমরাও সংস্কৃত শব্দের লোভ ছাড়িতে পারিলাম না।) "আহিতাগ্নিকার" অগ্নিপরীক্ষায় সবই দগ্ধ হইয়া গেল! কিন্তু কবির রচনা সার্থক,—"আহিতাগ্নিকা"র আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে পাঠকসমাজে যে তুমুল সংক্ষোভ দেখিয়াছিলাম, তাহা ভুলিবার নহে। কবির নিরাশ হইবার কারণ নাই,—"কালোহয়ং নিরবধির্বিপুলা চ পৃথ্বী"—এ যুগে কেহ তাঁহার কবিতা বুঝিতে না পারুক,—ভবিষ্যতে সমজদার-লাভের আশা আছে। "কুড়ানো মেয়ে" একটি ক্ষুদ্র গল্প। গল্পটির তৃতীয় পরিচ্ছেদ পড়িয়া মনে হয়, লেখকের গল্প লিখিবার ক্ষমতা আছে।—এই ক্ষমতার অধিকতর বিকাশ প্রার্থনীয়। "বরোদার জাতিতত্ত্ব," "অধ্যাপক-চিত্র" প্রভৃতি অবশিষ্ট প্রবন্ধে কোনও বিশেষত্ব নাই।

প্রয়াস। জুলাই। "রাজা ও রাণী—অনুশীলন" শ্রীযুত শৈলেন্দ্রনাথ সরকারের রচিত একটি সমালোচনা। কোনও বিশেষত্ব নাই। "পত্র বিনিময়ে" একটি চলনসই ক্ষুদ্র গল্প। "বিলাতের পত্রে" জ্যাঠামির মাত্রা একটু অধিক। স্বর্গীয়া প্রমীলা নাগের "লেভেনিয়া শৈল" মাত্রায় অতি অল্প, কিন্তু কবির শেষ সৌন্দর্য্য রচনা,—সাহিত্যের হিসাবে যাহাই হউক, স্মৃতিচিহ্ন বলিয়াও আদরণীয়।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা। ষষ্ঠ ভাগ; প্রথম সংখ্যা। "পীতাম্বর দাসের রস-মঞ্জরী" প্রবন্ধে গ্রন্থখানির পরিচয় আছে, এবং সমগ্র কাব্যখানিও মুদ্রিত হইয়াছে। পরিষৎ পত্রিকায় এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাব্যগুলি ক্রমশঃ মুদ্রিত হইলে বঙ্গ ভাষার প্রকৃত উপকারের সম্ভাবনা। "গোপীনাথপুরের প্রাচীন শিলালিপি" একটি উল্লেখযোগ্য উৎকৃষ্ট রচনা। "বাঙ্গলা পুঁথির সঙ্ক্ষিপ্ত বিবরণ" আর একটি আবশ্যক বিষয়। ইহাতে প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্যের ভাবী ইতিহাসের রেখাপাত হইতেছে। পরিষৎ-পত্রিকার পূর্ব্ব গৌরব অক্ষুণ্ণ দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি।

FROM A PAINTING

নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ।

12/5/1900

মুক্তি।

মুক্তি শব্দটা নানা অর্থে প্রচলিত আছে। এই জন্য অনেক ভ্রমের গোলযোগ ও বাক্‌বিতণ্ডার উৎপত্তি হয়।

আজ কাল অনেকে খ্রীষ্টানদের salvation শব্দ ও আমাদের মুক্তি শব্দ এক অর্থে প্রয়োগ করিতেছেন ; যথা, "সালবেশন আর্মি" অর্থাৎ মুক্তি ফৌজ। খ্রীষ্টানি সালবেশন কিরূপ ? মনুষ্য জাতির আদিম পিতামহ আদমের পাপে তাঁহার সন্তান সন্ততি সকলেই পাপগ্রস্ত ; শয়তান আদমের সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত মনুষ্যমাত্রকেই ফুসলাইয়া বিপথে লইবার চেষ্টা করিতেছে ও সমর্থও হইতেছে। এই কারণে মনুষ্যমাত্রই পাপী। ঈশ্বর করুণাময় ; তাঁহার সন্তান তৎপ্রেরিত হইয়া সমগ্র মনুষ্যজাতির প্রতিনিধিস্বরূপে নিজের শোণিতপাত দ্বারা মনুষ্যজাতির পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন। যে মনুষ্য পূর্ণবিশ্বাসসহকারে যীশু খ্রীষ্টের আশ্রয় লয়, সে সেই প্রায়শ্চিত্তবলে সেই পুরাতন পাপ হইতে মুক্তিলাভের অধিকারী। মনুষ্যমাত্রের একটা করিয়া আত্মা আছে ; ইতর জীব তাহাতে বঞ্চিত। মৃত্যুর পর সেই আত্মা শেষ বিচারের দিনের অপেক্ষায় থাকে ; কোথায় কি অবস্থায় থাকে, ঠিক জানি না। শেষ বিচারের দিন—বোধ হয় বর্ত্তমান পৃথিবীর ধ্বংসের পর কোন দিন, মনুষ্যাত্মাগুলির বিচার আরম্ভ হইবে। যে যে যীশুখ্রীষ্টের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, সে বিচারে খালাস পাইবে ; তাহাদের পুরস্কার স্বর্গবাস। যে সকল পাপী খ্রীষ্টের শরণ লয় নাই, তাহারা দণ্ডিত হইয়া নরকে প্রেরিত হইবে। স্বর্গ কোথায় ও নরক কোথায় ও সে স্থলে কিরূপ পুরস্কার ও দণ্ড ঘটে, সে সম্বন্ধে কিছু দিন পূর্ব্বে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভিন্ন অথচ প্রত্যেকের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট মত প্রচলিত ছিল। নরকে গন্ধকের আগুনে পুড়িতে হয়, ইত্যাদি। আজ কাল বোধ হয় ততটা পরিষ্কার করিয়া কেহ নির্দ্দেশ করিতে সাহস করে না ; সম্ভবতঃ, এত দিন গন্ধক প্রভৃতি জড় পদার্থের কোনরূপ আধ্যাত্মিক তাৎপর্য্য বাহির হইয়া থাকিবে। বিচারের পর কাহারও ভাগ্যে চিরকাল স্বর্গবাস, কাহারও ভাগ্যে চিরকাল নরকবাস ; তবে পুরস্কারের বা তিরস্কারের ব্যক্তিভেদে তারতম্য থাকিতে পারে। মোটের উপর স্বর্গবাসে সুখ ও নরকবাসে ক্লেশ ঘটে ; কিন্তু

সে সুখটাই বা কিরূপ, আর ক্লেশটাই বা কিরূপ, তাহা ঠিক করিয়া বলা দায়। মুসলমানদের স্বর্গে যথেষ্ট আরামের ব্যবস্থা আছে; খ্রীষ্টানদের স্বর্গে ব্যবস্থাটা কিরূপ, ঠিক জানি না।

ফলে, যীশুখ্রীষ্টের বিচারে ও করুণায় পাপীর পাপ-ফল হইতে অব্যাহতি-লাভের নাম সালবেশন। ঈশ্বরতনয় যীশুখ্রীষ্ট স্বয়ং মুক্তিদাতা। দুর্ব্বল মনুষ্যদিগকে শয়তানের প্ররোচনা হইতে রক্ষা করিবার জন্য পৃথিবীতে চর্চ্চের বন্দোবস্ত; চর্চ্চের কর্ম্মচারীরা পুলিশের ও স্ক্যাবেঞ্জারের কাজ করেন। নৈতিক রাস্তাঘাটের আবর্জ্জনা সরাইয়া ফেলেন; গৃহস্থকে শয়তানের অনুচরগণের প্ররোচনা হইতে সতর্ক করিয়া দেন। রোমক চর্চ্চের নেতা এক ব্যক্তি, তাঁহার নাম পোপ, তিনি ঈশ্বরের নিয়োজিত পুরুষ,তাঁহার হস্তেই একরূপ স্বর্গ নরকের চাবি। তাঁহার প্রদত্ত সার্টিফিকেট বিচারের দিন ঈশ্বর-পুত্রের কাজ অনেকটা হালকা করিয়া দেয়। মনুষ্যাত্মার প্রতি তাঁহার অতিরিক্ত অনুগ্রহ; আত্মার সদ্গতির জন্য তিনি আগে দেহটার অগ্নিজানীকরণে—বৈয়াকরণ মহোদয়েরা ক্ষমা করিবেন—দ্বিধা করিতেন না; আজ কাল অবশ্য ততটা অনুগ্রহপ্রকাশ তাঁহার সাহসে কুলায় না। রোমক চর্চ্চের বাহিরে কোন পোপ নাই; কিন্তু প্রত্যেক ক্ষুদ্র চর্চ্চের নিরূপিত বিধান আছে; সেই বিধানে থাকিতে পারিলে বিচারের দিনে অনেকটা সুবিধা ঘটে।

ফলে, স্থূলতঃ খ্রীষ্টানি সালবেশনের বা পরিত্রাণের তাৎপর্য্য,—বিচারের ফলে পাপমোচন ও স্বর্গপ্রাপ্তি। যীশুখ্রীষ্ট ব্যতীত পরিত্রাণকর্ত্তা দ্বিতীয় নাই।

হিন্দু শাস্ত্রে পাপমোচন ও স্বর্গলাভকে ঠিক্ মুক্তি বলে না। হিন্দু-সমাজের লোকেও স্বর্গ নরকে বিশ্বাস করে; মনুষ্যের আত্মায় বিশ্বাস করে; প্রায়শ্চিত্তে বিশ্বাস করে; পাপমোচনের বিবিধ প্রণালীতে ও পন্থায় বিশ্বাস করে। কিন্তু খ্রীষ্টানির সহিত সর্ব্বত্র ঠিক্ মিলে না। যাগযজ্ঞাদির সম্পাদন করিলে স্বর্গ-লাভ ঘটে; সেখানে মনুষ্য দেবত্ব লাভ করিয়া আরামে কিছু দিন বাস করে; সেই স্বর্গেও পারিজাত-পুষ্প আছে, মন্দাকিনী নদী আছে, অপ্সরা আছে। স্বর্গের মধ্যেও আবার বিবিধ প্রকার ভেদ আছে; বৈকুণ্ঠ বা বিষ্ণুলোক,কৈলাস বা শিবলোক ইত্যাদি। পাপীদিগের স্থিতি নরকে; সেখানে কুম্ভীপাকাদির ব্যবস্থা খ্রীষ্টানী নরকের ব্যবস্থার নিকট হারি মানে না। যাগযজ্ঞাদি সম্পন্ন করিলে স্বর্গে বা দেবলোকে গতি ঘটে; বিষ্ণুভক্তি দ্বারা বিষ্ণুলোকে, শিবভক্তি দ্বারা শিবলোকে গতি ঘটে; এমন কি, ক্ষেত্রবিশেষে কোনরূপে মরিতে

পারিলে আর যমদূতে টানিয়া লইয়া যাইতে পারে না। তৎক্ষণাৎ বিষ্ণুদূত বা শিবদূত আসিয়া যমদূতদের সঙ্গে তুমুল হাঙ্গাম বাধাইয়া দেয়। যমদূতদের পরাজয় ও রণে ভঙ্গ অবশ্যম্ভাবী।

কিন্তু এই স্বর্গপ্রাপ্তি বা বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি বা শিবলোকপ্রাপ্তিকে হিন্দুশাস্ত্রে ঠিক্ মুক্তি বলে না। মুক্তির অর্থ অন্যবিধ।

প্রচলিত হিন্দুমতে মনুষ্য-জীবনের থিওরিটা কতকটা এইরূপ। খ্রীষ্টানি মতে মনুষ্যের যেমন আত্মা আছে, হিন্দু মতেও মনুষ্যের সেইরূপ একটা কি আছে। সেটাকে আত্মা না বলিয়া সূক্ষ্মশরীর, লিঙ্গশরীর, কারণশরীর প্রভৃতি গোছ একটা কিছু নাম দিলেই ভাল হয়; কোন্ নামটা ঠিক্ শাস্ত্রসঙ্গত হইল, তাহা আমি নিশ্চয় বলিতে পারি না; কিন্তু আমার বোধ হয়, মৃত্যুর পর যেটা বর্ত্তমান থাকে ও এলোক ওলোক যাতায়াত করে ও কর্ম্মফলাদি ভোগ করে, সেটা ঠিক্ আত্মা নহে; তাহার ঐরূপ একটা নাম দেওয়াই ভাল। ইংরাজি soul শব্দ ও আমাদের আত্মা শব্দ এক অর্থে প্রযুক্ত হইয়া মহান্ অনর্থের সৃষ্টি করিয়াছে। ইংরাজি soulটা ঠিক্ সাকার না হইলেও একরকম সঙ্কীর্ণ সীমা-বদ্ধ বা ব্যক্তিত্ব-যুক্ত সূক্ষ্ম পদার্থ; আমাদের শাস্ত্রের আত্মা সেরূপ সঙ্কীর্ণ শরীর-বান্ পদার্থ নহে; বিশেষতঃ তাহার ভোক্তৃত্বাদি গুণবিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। শাস্ত্রে পুনঃপুনঃ উক্ত হইয়াছে, আত্মার কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি নাই। বড় জোর তাহার দ্রষ্টৃত্ব বা সাক্ষিত্বমাত্র স্বীকৃত হইয়াছে। সুতরাং ইংরাজী soul-এর অনুবাদে 'আত্মা' না বলাই ভাল। তৎপরিবর্ত্তে সূক্ষ্মশরীর বা লিঙ্গশরীর এইরূপ একটা সঙ্গতমত শব্দ নির্দ্দেশ করিলে ভাল হয়।

যাহাই হউক, মনুষ্যের এই অংশ, যাহা স্থূল জড়শরীর হইতে বিভিন্ন, সেটা জড়শরীরের ধ্বংসান্তেও বর্ত্তমান থাকে। এবং সে পুনঃপুনঃ দেহের পরিবর্ত্তন করে। "জীর্ণানি বাসাংসি যথা বিহায়" ইত্যাদি শ্লোক সকলেরই জানা আছে। আত্মা যেমন স্থূলশরীর আশ্রয় করিয়া থাকে, সেইরূপ সেই সূক্ষ্মশরীর আশ্রয় করিয়াও থাকে। বর্ত্তমান দেহের অন্তের পর অন্যবিধ দেহ আশ্রয় করিয়া এ দেশ ও দেশ ঘুরিয়া বেড়ায়।

হিন্দুর এই জন্মান্তরবাদ লইয়া অনেক গণ্ডগোল চলিয়া থাকে। জন্মান্তর-বাদটা মোটামুটি এই রকমে দেখা চলে। মনুষ্য হইতে কীট পর্য্যন্ত, এমন কি, তৃণ লতা উদ্ভিদ্ পর্য্যন্ত বিবিধ জীব বর্ত্তমান। অন্যান্য জীব মনুষ্যের নিম্নে, মনুষ্য অপেক্ষা নীচ। তদ্ভিন্ন মনুষ্যের ঊর্দ্ধে আরও বিবিধ জীব বর্ত্তমান

আছে। গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, যক্ষ, দেবতা প্রভৃতি। তাহাদের ক্ষমতা অনেক বিষয়ে মনুষ্যের অপেক্ষা অধিক ; তাহারা সচরাচর মনুষ্যের অদৃশ্য ; মাঝে মাঝে মনুষ্যবিশেষকে দেখা না দেয়, এমন নহে। তাহাদের অধিবাস কখনও পৃথিবীতে, কখনও পৃথিবীর বাহিরে। তাহাদের পরমায়ু মানুষের অপেক্ষা হয় ত অনেক বেশী। তাহাদের জীবনধারণের প্রণালী অন্যবিধ। দেবতারা স্বর্গে বাস করেন, সেখানে তাঁহারা দিব্য আরামে আছেন ; তাঁহাদের কাহারও কাহারও হাতে ক্ষমতা যথেষ্ট ; এক এক জন জগতের এক এক ডিপার্টমেণ্টের কর্ত্তা। মনুষ্যের ভাগ্যনিয়মনেও তাঁহাদের যথেষ্ট প্রভুত্ব আছে ; ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু এই সকল দেবতা ও উপদেবতা মনুষ্য হইতে ভিন্নপ্রকৃতিক প্রাণী হইলেও, তাঁহারাও দেহী ; তাঁহারাও কেহই চিরজীবী নহেন। বড় বড় দেবতা, যাঁহারা মনুষ্যের উপাস্য, তাঁহারাও কল্পারম্ভে জন্মিয়াছেন ও কল্পান্তে তাঁহাদেরও বিলয় হইবে। কিন্তু তাঁহারাও চিরজীবী নহেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা মনুষ্য অপেক্ষা শক্তিশালী হইলেও এক হিসাবে মনুষ্য ও অন্যান্য ইতর জীবের সমানপর্য্যায়ভুক্ত দেহী জীব।

হিন্দু মতের ঐতিহাসিক আলোচনা করিলে হয় ত আমার উল্লিখিতরূপ নির্দ্দেশ সর্ব্বত্র সঙ্গত হয় না। বৈদিক যুগে দেবতাগণের সম্বন্ধে যেরূপ বিশ্বাস প্রচলিত ছিল, পৌরাণিক যুগে ঠিক্ সেইরূপ বিশ্বাস ছিল না। বৈদিক ইন্দ্র ও পৌরাণিক ইন্দ্র, বৈদিক যম ও বরুণ ও পৌরাণিক যম ও বরুণ ঠিক্ সমান ক্ষমতাশালী নহেন। পৌরাণিক কালে দেবতাদের ক্ষমতা অনেকটা কমিয়া গিয়াছিল ; তাঁহাদের দেবত্ব অনেকাংশে মনুষ্যত্বের সমীপস্থ হইয়া আসিয়াছিল। বৌদ্ধগণের হাতে তাঁহারা আরও নীচে নামেন ; বৌদ্ধেরা দেবতাগণের অস্তিত্বে অবিশ্বাস করিতেন না ; কিন্তু তাঁহাদের নিকট দেবতারা কেবল মনুষ্যাপেক্ষা অধিক শক্তিশালী জীবমাত্র।

মনুষ্যের অদৃশ্য, অতিমানুষ-প্রকৃতি-সম্পন্ন জীব প্রকৃত অস্তিত্বসম্পন্ন কি না, তাহা আমরা জানি না। তাঁহাদের অস্তিত্ব অসম্ভব, এ কথা কেহ বলিতে পারে না। মনুষ্যের নীচে নানাবিধ জীব আছে, উচ্চে বিবিধ দেবতা থাকিবে না, তাহা কে বলিল ? সেকালের সিদ্ধপুরুষেরা এইরূপ অতিমানুষ-ক্ষমতাপন্ন জীবের দেখা পাইতেন ; একালের থিয়সফিষ্টরা তাঁহাদের দেখা পান। তাঁহারা বিশ্বাস করেন। আমরা দুর্ভাগ্য হীনশক্তি মানুষ ; আমরা তাঁহাদের দর্শনলাভে বঞ্চিত ; আমরা তাঁহাদের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতে সহসা চাহি না। কিন্তু

তাই বলিয়া তাঁহারা নাই, কিরূপে বলিব। এখন তাঁহারা আমাদের অদৃশ্য ; অণুবীক্ষণ যন্ত্রে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কীটাণু কত নূতন নূতন দেখা যাইতেছে। লিক্ মানমন্দিরের দূরবীণেও কোন দেবতার অদ্যাপি সন্ধান মিলে নাই। কিন্তু আগামী শতাব্দী শেষ না হইতেই রঞ্জগেনের আলোকের সাহায্যে তাঁহাদের দেখা পাওয়া যাইবে কি না, কে বলিতে পারে ?

সে যাহাই হউক, হিন্দুসমাজের অধিকাংশ লোকেই দেবতার ও উপদেবতার অস্তিত্বে বিশ্বাসবান্। তাঁহাদের ক্ষমতা প্রচুর—তাঁহাদের উপাসনায় ক্ষতির সম্ভাবনা, লাভ থাকিতেও পারে ; কিন্তু তাঁহারা সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন, স্বয়ং মনুষ্যাদির ন্যায় সৃষ্ট পদার্থ, সুতরাং যে সকল হিন্দু তেত্রিশ কোটির পূজা করেন, তাঁহাদিগকে গালি দেওয়া চলে না। খ্রীষ্টানেরাও অসংখ্য এঞ্জেলের ও পিশাচের অস্তিত্বে বিশ্বাসী ; তাঁহাদের উপাসনাও না করেন, এমন নহে ; এঞ্জেল ও পিশাচের অস্তিত্ব অস্বীকার করিলে গোটা বাইবেল গ্রন্থখানা ভিত্তিহীন হইয়া পড়ে। স্বয়ং যীশুখ্রীষ্ট ভূতের ওঝাগিরিতে অত্যন্ত নিপুণ ছিলেন ; ভূতাবিষ্ট শূকরের পাল বিনাশ করিয়া তাঁহার যতটা প্রতিপত্তি হইয়াছিল, Sermon on the Mount এ তাঁহার ততটা প্রতিপত্তি ঘটে নাই। খ্রীষ্টানের এঞ্জেল ও হিন্দুর দেবতায় বিশেষ মৌলিক পার্থক্য দেখা যায় না। খ্রীষ্টান একেশ্বরবাদী বলিয়া বাহবা লয়, আর হিন্দু বহুদেবোপাসক বলিয়া গালি খায়, এ অতি অদ্ভুত বিচার।

যাহাই হউক, মনুষ্য এ জীবনে যে কাজ করে, তাহার ফলের বিনাশ নাই। মনুষ্যের দেহান্ত ঘটে ; কিন্তু তাহার কর্ম্মফল অবিনাশী। তাহা রহিয়া যায়। সদসদ্ভেদে কর্ম্ম মনুষ্যের ভবিষ্যতের নিয়ামক। কর্ম্মভেদে মনুষ্যের পরকালের ব্যবস্থা বিভিন্নরূপ হয়। যে ভাল কাজ করে, সে পরজীবনে স্বর্গে যায় ; কিছু দিন দেবতা সাজিয়া দেবলোকে বাস করে। যে মন্দ কাজ করে, সে হয় ত নরকে গিয়া কঠোর দণ্ড ভোগ করে। অথবা হয় ত ইতর-জীবরূপে জন্মিয়া পূর্ব্বজন্মের কৃত কর্ম্মের ফল ভোগ করে। বর্ত্তমান জীবন পূর্ব্বতন জীবনসমষ্টিতে সম্পাদিত কর্ম্মসমষ্টির ফলে প্রাপ্ত। পূর্ব্বতন কর্ম্মসমষ্টিতে বর্ত্তমান জীবনের কর্ম্ম যুক্ত হইয়া পরবর্ত্তী জীবনের ব্যবস্থা করিবে। চিরকাল দুঃখভোগও নাই ; চিরকাল সুখভোগও নাই। ভাল কাজের ফলে ভবিষ্যতে সুখ, মন্দ কাজের ফলে ভবিষ্যতে দুঃখ। কর্ম্মফলে ভবিষ্যতে কিছু দিন দুঃখ বা কিছু দিন সুখ ভোগ করিতে হয়। অসৎকর্ম্মের ফলে নরক,

কর্ম্মের ফলে কিছুকাল দেবত্ব বা বিদ্যাধরত্বপ্রাপ্তি। সংসারে ফাঁকি দিবার উপায় নাই। প্রকৃতির রাজ্যে যেমন নিয়মের বিধান আছে, সে নিয়ম কেহ লঙ্ঘন করিতে পারে না, সেইরূপ নৈতিক রাজ্যের এই সনাতন নিয়ম অলঙ্ঘ্যনীয়। মৎকৃত কার্য্যের ফলটুকু আমাকে ভোগ করিতেই হইবে। ইহজন্মেও হইবে, পরজন্মেও হইবে। কোন্ কার্য্যের ফল কি, ও সেই ফল কত দিন ধরিয়া ভোগ করিতে হইবে, তাহার বাঁধা নিয়ম আছে। স্বর্গ, বৈকুণ্ঠ, শিবলোক, কর্ম্মফলে পাওয়া যাইতে পারে; কিছু দিন ধরিয়া এই সকল লোকে বাস করিয়া ভোগ ফুরাইলে আবার মর্ত্ত্যলোকে ফিরিতে হয়। আবার কর্ম্মের সঞ্চয় ও সেই কর্ম্মের ফলপ্রাপ্তি। এইরূপে মনুষ্যাত্মা সূক্ষ্মশরীর ও তৎসঙ্গে বিবিধ স্থূলশরীর আশ্রয় করিয়া আপনার কর্ম্মফল ভোগ করিয়া ভবসংসারে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়ায়। কর্ম্মপাশে মনুষ্যের আত্মা আবদ্ধ; এই বন্ধন হইতে মুক্তির উপায় কি, পরে দেখা যাইতেছে।

খৃষ্টানের মতে মনুষ্যের বিচারপ্রণালীটা যত সহজ, হিন্দুর মতে ততটা সহজ নহে, দেখা গেল। খ্রীষ্টান-মতে মনুষ্য কেবল আত্মকর্ম্মের জন্য দায়ী নহে; আপনার পূর্ব্বপিতামহ আদমের কর্ম্মের জন্যও দায়ী। এবং আত্মকর্ম্ম ও পিতৃকর্ম্ম উভয়তঃ সেই নরকে যাইতে বাধ্য। তবে ঈশ্বরপুত্রের শরণ লইয়া সে নরক হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারে। মৃত্যুর পর কিছু দিন অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে; তৎপরে বিচার; হয় এ পার, নয় ও পার। বোধ করি, আর আপীল বা পুনর্ব্বিচার নাই। হিন্দুমতে কর্ম্মফল হইতে অব্যাহতি নাই। কর্ম্মের ফল অবশ্যম্ভাবী। কেহ করুণাপ্রকাশে অব্যাহতি দিবার অধিকারী নহে। মৃত্যুর পর কোন বিচারক বসিয়া আপন খেয়ালমতে অপরাধীকে খালাস দিতে পারেন না। যমরাজের যে কর্ত্তৃত্বটুকু আছে, সেও আইনমত কর্ত্তৃত্ব, তিনি executive officer মাত্র, কর্ম্মানুসারে ফলবিধান করেন মাত্র; আইন উল্টাইবার তাঁহার কোন ক্ষমতা নাই। আবার কেবল ইহজন্মের কর্ম্মফল ভুগিয়া নিস্তার নাই; পরজন্মেও কর্ম্ম করিতে হইবে, সেই কর্ম্মের ফল ভুগিতে হইবে। কাজেই কর্ম্মেরও শেষ নাই, কর্ম্মফলভোগেরও অবধি নাই; চিরদিন এইরূপ চলিবে, কখনও সুখভোগ, কখনও দুঃখভোগ করিয়া, কখনও কীটরূপে, কখনও মনুষ্যরূপে, কখনও দেবতারূপে, কখনও মর্ত্ত্যে, কখনও অন্তরিক্ষে বা স্বর্গে, কখনও নরকে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইবে। ততদিন পর্য্যন্ত, যতদিন পর্য্যন্ত জগৎ আছে, যদি না মুক্তি ঘটে। মুক্তির কথা পরে।

স্বর্গবাস সৎকর্ম্মের ফল হইলেও তাহা কর্ম্মপাশে বন্ধনের ফল; তাহাকে মুক্তি বলে না। মুক্তির পর আর জন্মান্তরগ্রহণ ঘটে না। আত্মা তখন কর্ম্ম-বন্ধন হইতে একবারে চিরকালের মত মুক্ত হয়। তখন আর তাহাকে স্বর্গে থাকিতে হয় না, মর্ত্ত্যেও আসিতে হয় না, নরকের ভয়ও থাকে না। তখন আর তাহাকে সূক্ষ্মশরীর বা স্থূলশরীর কিছুই আশ্রয় করিতে হয় না, তখন সে বন্ধনমুক্ত। স্বর্গবাস মুক্তি নহে; সেও বন্ধন; হয় ত সোনার শিকলে বন্ধন, কিন্তু তথাপি বন্ধন। বিষ্ণুলোকে বাসের অধিকার পাইলেও মুক্তি ঘটিল না; কেন না সেও বন্ধন; সেই কর্ম্মফলে লব্ধ; কিছু দিন বিষ্ণু-লোকে বাসের অধিকার পাইলেও ভোগান্তে আবার লোকান্তরপ্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকিয়া যায়। ডামক্লীসের তরবারি মস্তকের উপর হইতে সরিয়া যায় না। কাজেই ইহাকে মুক্তি বলে না।

তবে মুক্তি কি? এ সম্বন্ধে প্রচলিত হিন্দুমত এইরূপ। পাঠক সাবধান হইবেন, আমি সাধারণমধ্যে প্রচলিত মতের কথাই বলিতেছি। দার্শনিক অর্থ কি, তাহা বলিতে চাহিতেছি না। উপরে কর্ম্মফল ও জন্মান্তরবাদ সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিয়াছি, তাহাও সাধারণপ্রচলিত মত। সাধারণের বিশ্বাস এইরূপ। এই সাধারণের বিশ্বাস দ্বৈতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। আজ-কাল যাঁহারা অদ্বৈতবাদী বলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহারাও প্রকৃতপক্ষে ঘোর দ্বৈতবাদী। আমি তাঁহাদের মধ্যে প্রচলিত মুক্তিতত্ত্ব কি, তাহাই এখানে বলিতেছি।

প্রচলিত অর্থে মনুষ্যদেহ আত্মার স্থূল আশ্রয়। আত্মার দুইটা নাম আছে, পরমাত্মা ও জীবাত্মা। উভয়েই এক, অথচ বিভিন্ন। পরমাত্মা ও জীবাত্মা একই পদার্থে নির্ম্মিত; সেই পদার্থ চিন্ময় পদার্থ অথবা কোন অনির্দ্দেশ্য পদার্থ। কিন্তু পরমাত্মা অনন্ত, অসীম, অসঙ্কীর্ণ; ও জীবাত্মা সান্ত, সসীম ও সঙ্কীর্ণ। সমুদ্রের সমগ্র জলভাগের সহিত তাহার কিয়দংশ জলের যেরূপ সম্বন্ধ, মহাকাশের সহিত ঘটাকাশের যেরূপ সম্বন্ধ, পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার সেইরূপ সম্বন্ধ। উভয়ে একাত্মক, একপ্রকৃতিক, অথচ বিভিন্ন। উভয়ের মধ্যে একটা দারুণ ব্যবধান; কেন না, একে অনন্ত, অপরে সান্ত। জীবাত্মা অবিদ্যাযুক্ত হইয়া পরমাত্মা হইতে বিভিন্ন হইয়া থাকে; পরমাত্মা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিয়া আপনার স্বতন্ত্র লীলাখেলা আরম্ভ করে। তখন সে সূক্ষ্ম বা স্থূলশরীর আশ্রয় করিয়া সংসারে লোক হইতে লোকান্তরে বিচরণ

করিয়া থাকে। এই অবিদ্যাচ্ছন্ন অবস্থায় সে আপনার সহিত পরমাত্মার প্রকৃত সম্বন্ধ জানিতে পারে না ; আপনার যথার্থ প্রকৃতিরও উপলব্ধি করিতে পারে না। স্বয়ং পরমাত্মারই অংশস্বরূপ হইলেও আপনাকে পরমাত্মা হইতে বিভিন্ন, স্বতন্ত্র, অসদৃশপ্রকৃতিক মনে করে। কখনও আপনার সূক্ষ্ম দেহকে, কখনও বা স্থূলদেহকেই সর্ব্বস্ব ভাবে। পাশবদ্ধ হইয়া সে কর্ম্মের বন্ধনে বিজড়িত হয় এবং বিবিধ লোকে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। সাধনার ফলে যখন তাহার প্রকৃত জ্ঞানোদয় হয়, তখনই সে মুক্তিলাভ করে। জ্ঞানোদয়ে যখন সে আপনার প্রকৃত স্বরূপ জানিতে পারে, যখন পরমাত্মার স্বরূপ জানিতে পারে, পরমাত্মার সহিত আপনার সম্বন্ধ জানিতে পারে, তখন তাহার অজ্ঞান মোহ দূর হয়, তখন সে মুক্ত হয়। অর্থাৎ কি না দেহান্তের পর আর তাহাকে অন্য দেহ আশ্রয় করিতে হয় না, অন্য লোকে প্রবেশ করিতে হয় না, স্বর্গে বা মর্ত্ত্যে বা অধোভুবনে যাইতে হয় না। তখন সে পরমাত্মায় লয় প্রাপ্ত হয়। অবিদ্যাবলে যে স্থান হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আসিয়াছিল, বিদ্যার বা জ্ঞানের উদয়ে, ভ্রান্তির বা মায়ার অপগমে, পুনর্ব্বার সেই স্থানে লীন হয়। জলের বিম্ব যেমন জলে উদয়লাভ করিয়া কিছু ক্ষণ পরে আবার সেই জলেই বিলীন হয়, সেইরূপ জীবাত্মা কিছু কাল পরমাত্মা হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিয়া আপনাকে স্বতন্ত্র ভাবিয়া আপনার স্বাধীন অস্তিত্ব যাপন করিয়া শেষ পর্য্যন্ত আবার পরমাত্মায় সংযুক্ত ও লীন হইয়া যায়। তখন আর তাহার স্বাতন্ত্র্য থাকে না। মহাসাগরের জল মহাসাগরের জলেই মিলিয়া যায়। তখন আর তাহাকে পৃথক করিয়া চিনিবার উপায় থাকে না।

মুক্তি শব্দের প্রচলিত ব্যাখ্যা এইরূপ। মুক্তি, মোক্ষ, নির্ব্বাণাদি শব্দ প্রায়ই প্রচলিত শাস্ত্রে ও ধর্ম্মগ্রন্থে ও নৈতিক গ্রন্থে এইরূপে ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে। জগতের মধ্যে যত জীব, তত আত্মা। প্রত্যেক আত্মা এক একটা শরীর আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে ; কখনও তৃণ, কখন কীট, কখন মানুষ, কখনও দেবতা বা উপদেবতা ; অবিদ্যাবশে ও মোহবশে আত্মা দেহবদ্ধ ও পরমাত্মা হইতে স্বতন্ত্র ; মোহবলে সে কর্ম্মসাধন করে, ও আপনার কর্ম্মে আপনি আক্রান্ত হয়। যতদিন না জ্ঞানোদয় হয়, ততদিন কর্ম্ম তাহাকে আক্রমণ করিয়া থাকে, সে এক দেহ ছাড়িয়া দেহান্তর লাভ করে। কিন্তু কর্ম্ম তাহাকে ছাড়ে না ; সঙ্গে সঙ্গে চলে, ও যতদিন নির্দ্দিষ্ট ভোগ পূর্ণ না হয়, ততদিন তাহাকে ঘুরাইয়া বেড়ায়। যদি চিরকালই তাহার অজ্ঞান থাকে,

চিরকালই তাহার কর্ম্মে প্রবৃত্তি থাকে, তাহাকে চিরকালই এইরূপ ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে। কখনও বা সুখভোগ, কখনও বা দুঃখভোগ। আত্মা অবশ্য স্বয়ং অবিকারী, স্বয়ং সুখদুঃখের ভোক্তা নহেন; কিন্তু তিনি যে দেহ আশ্রয় করিয়া থাকেন, সেই দেহে সুখদুঃখভোগ ঘটে, আত্মাকে হয় ত তাহার সাক্ষী বা দ্রষ্টা থাকিতে হয়। আত্মার এই অবনতিটুকু অপরিহার্য্য। যতদিন জ্ঞানোদয় না হয়, ততদিন তাহার এই দুরবস্থা। অবশেষে সাধনার ফলে জ্ঞানের উদয় হইলে তখন কর্ম্ম ধ্বংস পায়। জ্ঞানাগ্নি সর্ব্ব কর্ম্মকে ভস্মসাৎ করিয়া দেয়; তখন বন্ধনবিমুক্তি বা মোক্ষ ঘটে; আর দেহ ধরিয়া ঘুরিতে হয় না, তখন সে পরমাত্মায় মিশিবার অবকাশ পায়। পরমাত্মা হইতে আর বিচ্ছেদ ঘটে না। তখন আর তাহার স্বর্গ-নরক-বাসের সম্ভাবনা থাকে না; বৈকুণ্ঠধামও তাহার নিকট তুচ্ছ হয়। সুখ দুঃখ উভয়ই তাহার নিকট তুল্যমূল্য হয়। সে অবস্থায় কোনও স্থূল বা সূক্ষ্ম স্বতন্ত্র দেহ নাই; কাজেই সুখ দুঃখ উভয়েরই অস্তিত্ব নাই।

মুক্তির এই প্রচলিত ব্যাখ্যা। মুক্তির সাধন জ্ঞান; জ্ঞানোদয় ভিন্ন মুক্তি নাই। জ্ঞানের অর্থ অবিদ্যার লোপ, অর্থাৎ পরমাত্মার সহিত আপনার ভেদ-রূপ যে ভ্রম, তাহার লোপ। মূলতঃ জীবাত্মা ও পরমাত্মা অভিন্ন, জীব ও ব্রহ্মে অসাদৃশ্য নাই; উভয়েরই এক স্বরূপ, কেবল মাঝে অবিদ্যা, অজ্ঞান, মায়া আসিয়া কিছু দিনের জন্য এই ভেদজ্ঞানের ভ্রান্তি ঘটায়। সাধনাবশে জ্ঞানের পুনরায় উদয় হয়। তাহার ফল নির্ব্বাণ, মুক্তি, পরমাত্মায় লয়।

জীবাত্মার এই পরিণতি সকলের ভাল লাগে না। খ্রীষ্টানেরা এইরূপ মুক্তির উপর খড়্গাহস্ত। তাঁহাদের মতে, এইরূপ মুক্তির নামান্তর annihilation, শূন্যতাপাদন। বৌদ্ধমতে নির্ব্বাণ অনেকটা শূন্যতাপাদনের কাছাকাছি; কেন না, বৌদ্ধেরা পরমাত্মার অস্তিত্বে অবিশ্বাসী। কিন্তু এ স্থলে বৌদ্ধ-মতের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইব না। তাহা হইলে কাহিনী ফুরাইবে না। হিন্দুমতে মুক্তি শূন্যতাপাদন না হইলেও খ্রীষ্টানাদির রুচিকর নহে। খ্রীষ্টান প্রথমতঃ সৃষ্টিকর্ত্তা ও সৃষ্ট এতদুভয়ের সাদৃশ্য, একস্বরূপত্ব স্বীকার মহাপাপ জ্ঞান করেন। পর-মাত্মা ও জীবাত্মা শব্দ খ্রীষ্টানদের মধ্যে প্রচলিত নাই—কিন্তু তৎস্থলীয় ঈশ্বর ও জীব প্রচলিত আছে; কিন্তু উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য নাই, সমস্তই পার্থক্য। ঈশ্বর মনুষ্যকে আপনার সদৃশ মূর্ত্তি দিয়াছিলেন, এইরূপ একটা বাক্য আছে; কিন্তু তাহার প্রয়োগ ও তাৎপর্য্য অন্যরূপ। ঈশ্বর স্রষ্টা, জীব সৃষ্ট; উভয়ের কখন

সম্মিলন হইতে পারে না, জীব কখনও ঈশ্বরে লীন হইতে পারে না। তবে জীব সুকৃতিবলে অর্থাৎ খ্রীষ্টের করুণার ফলে ঈশ্বরের সান্নিধ্যলাভ করিতে পারে মাত্র। ঈশ্বরের সান্নিধ্যলাভের নাম স্বর্গলাভ; কেন না, ঈশ্বর স্বয়ং স্বর্গে রত্নবেদীতে পারিষদবর্গবেষ্টিত হইয়া উপবিষ্ট আছেন; এঞ্জেলগণ সেখানে নিয়ত তাঁহার স্তুতিগীত গাহিতেছে; মনুষ্য শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার সান্নিধ্যলাভ করিয়া তাঁহার ঐশ্বর্য্যদর্শন করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারে; সেই তাহার পরমার্থ।

জীবেশ্বরের সাদৃশ্য বা একত্ব খ্রীষ্টানেরা স্বীকার করিবেন না, আবার মুক্তি বা লয় তাঁহাদের নিকট নিতান্ত লোমহর্ষণ পরিণাম। হিন্দুর নিকট মুক্তাত্মা সুখদুঃখবর্জ্জিত। তাঁহার যেমন দুঃখও নাই, তেমনি সুখও নাই। খ্রীষ্টান কাজেই এই পরিণামে বিরূপ। যে পরিণামে সুখ নাই, তাহা কিরূপে প্রার্থনীয় হইতে পারে? অবশ্য সুখ বলিলেই কিছু শারীরিক বা ঐন্দ্রিয়িক সুখ বুঝিব না; তাহার পরিবর্ত্তে পরানন্দ বা ভূমানন্দ গোছ একটা কিছু বলিতে পার। কিন্তু পরিণামে যদি সেইরূপ একটা আনন্দ না থাকে, তাহা হইলে সে পরিণামে কিছুই প্রার্থনার বিষয় থাকিতে পারে না। যদি মুক্তির পর কোন আনন্দের সম্ভাবনা থাকিল না, এমন কি, স্বতন্ত্র অস্তিত্ব পর্য্যন্ত থাকিল না, তখন সে মুক্তিতে খ্রীষ্টানের কোনরূপ লোভ নাই। সেই মুক্তি, সেই পরিণাম, খ্রীষ্টান প্রার্থনা করেন না।

কেবল খ্রীষ্টান সেরূপ মুক্তি চাহেন না, এমন নহে; ঘরের ঢেঁকিও আছেন। ভক্তিমার্গানুগামী শাক্তের ও বৈষ্ণবের নিকটও এইরূপ মুক্তি স্পৃহণীয় নহে। রামপ্রসাদ বলিয়াছেন, আমি চিনি হ'তে চাহি না, চিনি খেতে ভালবাসি। বৈষ্ণবেরাও মুক্তির ভয়ঙ্কর বিরোধী। বৈষ্ণবেরা পরমাত্মাকে টানিয়া যথাসাধ্য খ্রীষ্টানের ঈশ্বর বা খোদার নিকট লইয়া গিয়াছেন। খ্রীষ্টানের খোদা ও বৈষ্ণবের ঈশ্বর উভয়ই ঐশ্বর্য্যবান্ ও বিভূতিবান্; উভয়ই Personal God. নির্গুণ, অনির্ব্বাচ্য, অনির্দ্দেশ্য, বিভূতিহীন ব্রহ্ম উভয়েরই ভক্তি বা প্রীতি উৎপাদনে অসমর্থ। বৈষ্ণব হিন্দুর ঘরে জন্মিয়াছেন, খ্রীষ্টানের মত জীব ও ব্রহ্মে মৌলিক পার্থক্য স্বীকারে সাহস করেন না; তবে জীব যে কখনও ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইবে, ইহা স্বীকারে তিনি কুণ্ঠিত। ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তির সম্ভাবনা যদিও কখন স্বীকার করেন, সেই পরিণামকে স্পৃহণীয় বলিয়া স্বীকার করিবেন না। বৈষ্ণব মোক্ষান্বেষী নহেন; তিনি ঈশ্বরের সান্নিধ্য পাইলেই পরিতৃপ্ত। বৈষ্ণবের শাস্ত্রে মোক্ষ শব্দের প্রচলন থাকিতে পারে, কিন্তু সেখানে মোক্ষের অর্থ ঈশ্বরের

সালোক্য বা সামীপ্যলাভ, অথবা ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্যদর্শনের বা প্রীতিলাভের বা ঈশ্বরকে সেবা করিবার অবকাশপ্রাপ্তিমাত্র; ঈশ্বরত্বপ্রাপ্তি নহে। জীব ঈশ্বরের সন্নিধানে থাকিয়া তাঁহার ঐশ্বর্য্য দর্শন করিয়া অনুপম আনন্দ অনুভব করিবে, অনন্যাসক্ত হইয়া নিষ্কামভাবে তাঁহার সেবার অবসর পাইবে, ইহাই তাঁহার অভিপ্রেত। এ বিষয়ে তাঁহার সহিত খ্রীষ্টানের এক মত। ঈশ্বরের সহিত ভক্তের উপাস্য-উপাসক-সম্বন্ধ চিরদিন বজায় থাকুক, ভক্ত ঈশ্বর হইতে চাহেন না, ঈশ্বরে মিশিতে চাহেন না, তাঁহার সন্নিধানে অথবা তাঁহা হইতে দূরে থাকিয়া তাঁহার ঐশ্বর্য্যের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাঁহার বিভূতি দর্শন করিয়া পরিতৃপ্ত হইতে চাহেন। তাঁহার চরণারবিন্দ সেবা করিবার অধিকার কামনা করেন। সালোক্য, সামীপ্য, সাযুজ্য ও নির্ব্বাণ, এই চারিটা ধাপের মধ্যে, শেষটা ভক্ত বৈষ্ণবের শিরঃপীড়া-উৎপাদক, তৃতীয়টাও আকাঙ্ক্ষণীয় নহে; প্রথম দুইটাই যথেষ্ট। তিনি মুক্তি চাহেন না; কিন্তু তাঁহারও salvation বাঞ্ছা আছে; সেই salvationএর অর্থ ঈশ্বরের সালোক্য ও সামীপ্য প্রাপ্তি; সেই লাভ ঘটিলে আর তাঁহাকে জন্মান্তরবাদের ভোগ স্বীকার করিতে হইবে না। একবার কোনরূপে ভগবদাশ্রয়লাভ পাইলে তিনি যমকে ফাঁকি ও কর্ম্মফলকে ফাঁকি দিতে পারেন, তাঁহার এইরূপ সাহস।

ভগবানের সহিত ভক্তের সম্বন্ধ প্রীতির ও অনুরাগের ভিত্তির উপর স্থাপনা করিয়া বৈষ্ণব খ্রীষ্টান অপেক্ষা অনেক উচ্চতর ধাপে আরোহণ করিয়াছেন। খ্রীষ্টানের মতে ভক্তের তরফে বিশ্বাস ও ভক্তি, ভগবানের তরফে করুণা; উভয়ের মধ্যে এইরূপ সম্বন্ধ। বৈষ্ণবের মতে ভক্তের তরফে সর্ব্বস্বদক্ষিণ একানুগ প্রেম, ও ঈশ্বর-তরফ হইতেও সেই প্রেমের প্রতিদান। প্রেমের তান সপ্তমে উঠিয়া মহাভাবে পরিণত। খৃষ্টানদের সম্প্রদায়বিশেষের মধ্যে ভক্তিকে উচ্চতর স্তরে উঠিয়া প্রেমে, এমন কি, মহাভাবসদৃশ ভাবে পরিণত করিবার চেষ্টা না আছে, এমন নহে; বিশেষতঃ, রোমান চর্চ্চের মধ্যে এরূপ উদাহরণ যথেষ্ট আছে। কিন্তু বৈষ্ণব এইখানে যত সহজে যত দূর উঠিয়াছেন, খ্রীষ্টান তত দূর উঠিতে পারিয়াছেন, তাহা বোধ হয় না।

মূল প্রসঙ্গ ছাড়িয়া দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। মুক্তির অর্থ লইয়া কথা। স্বর্গবাসকে মুক্তি বলে না; খ্রীষ্টানের salvationও মুক্তি নহে; ভক্তের ভগবৎসান্নিধ্যলাভের নামও মুক্তি নহে। মুক্তি ভক্তের প্রার্থনীয় না হইতে পারে;

কিন্তু তথাপি মুক্তির একটা নির্দ্দিষ্ট অর্থ আছে। প্রচলিত অর্থ কি, তাহা উপরে বলিয়াছি। হিন্দুসমাজের বহুলোক ঐরূপ মুক্তির কামনা করেন; কোনরূপে আপনার স্বাতন্ত্র্য পরব্রহ্মে লোপ করিয়া দিবার জন্য অনেকেই উৎসুক; জন্মান্তরগ্রহণের আশঙ্কা হইতে এই ঔৎসুক্যের উৎপত্তি। সংসারের দুঃখবাহুল্য এই ইচ্ছার নিদান। এই মুক্তিলাভের জন্য নানা উপায় প্রচলিত আছে। সকল উপায় শাস্ত্রসঙ্গত কি না, ঠিক জানি না।

আজকাল যাঁহারা হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে বিচার করিতে বসেন, তাঁহারা সচরাচর কোন্ শব্দটা কি অর্থে ব্যবহৃত হওয়া উচিত, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক বোধ করেন না; এই জন্য অকারণ বিতণ্ডার উৎপত্তি হয়। আমরা ছেলেবেলা হইতে ইংরাজী অভিধানে মুখস্থ করিয়া আসিয়াছি,—soul = আত্মা, salvation = মুক্তি, God = ঈশ্বর; priest = পুরোহিত, religion = ধর্ম্ম; সুতরাং ঐ ঐ ইংরাজী শব্দ ও ঐ ঐ দেশী শব্দ একার্থবোধক ধরিয়া লইয়া বিচার বা অবিচারের উৎপাদন করিতে দ্বিধা করি না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে একের সম্বন্ধে যাহা প্রয়োজ্য, অন্যের পক্ষে তাহা নহে। একটু তলস্পর্শ করিলেই দেখা যাইবে, এ দেশে দার্শনিক বা ধর্ম্মসম্বন্ধীয় যে সকল বিচারবিতণ্ডা হইয়া থাকে, তাহার মূলে সর্ব্বত্রই ঐরূপ অর্থবিভ্রাট বর্ত্তমান। সেই জন্য ঐরূপ বিচারের ফলও সর্ব্বদাই ভয়ঙ্কর।

ভক্তিপন্থী বৈষ্ণবেরা মুক্তিপ্রিয় না হইলেও ব্রাহ্মণের শাস্ত্রে মুক্তিলাভই পরম পুরুষার্থ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কাজেই মুক্তির অর্থ ও মুক্তির সাধনোপায় কি, তাহা না জানিলে, ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের তাৎপর্য্য বুঝা যায় না। বৈদিক যাগ যজ্ঞে, বা পৌরাণিক দেবদেবীপূজায় মুক্তিলাভ ঘটে, ব্রাহ্মণের শাস্ত্রে এরূপ কথা নাই; যাগযজ্ঞ দ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক যশোলাভ ও শ্রেয়োলাভ ঘটে, দেবপূজা দ্বারাও স্বর্গাদিলাভ ঘটে; এমন কি, দীক্ষাগ্রহণের পর ইষ্টদেবতার সাধনা দ্বারা যে সিদ্ধিলাভ ঘটে, তাহাকেও মুক্তি বলা যাইতে পারে কি না সন্দেহের স্থল। ভক্তিবলে মুক্তিলাভ ঘটিবার কোন সম্ভাবনাই নাই; ভক্তেরা মুক্তির প্রার্থনাই করেন না; তাঁহারা ভগবৎসান্নিধ্য চাহেন; ভগবদুপাসনার অধিকার চাহেন; তাঁহারা আনন্দ চাহেন; নিরানন্দ শুষ্ক মুক্তি তাঁহাদের স্পৃহার বিষয় নহে। যাঁহারা তীর্থমাহাত্ম্য ও ক্ষেত্রমাহাত্ম্য প্রণয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা সেই সেই স্থানে বাস বা মৃত্যুকে অনেক সময় মুক্তির উপায় বলিয়া বর্ণনা করিতে কুণ্ঠিত হয়েন না; কিন্তু তাঁহাদের নিকট মুক্তি শব্দ সদ্গতির

নামান্তরমাত্র, মুক্তির অর্থ লয়প্রাপ্তি নহে। যাঁহারা হিন্দুয়ানিকে গালি দিবার অবসর খুঁজিয়া বেড়ান, তাঁহারা মুক্তির অর্থ যাহা নহে, সেই অর্থ ধরিয়া, ও মুক্তির উপায় যাহা নহে, তাহাকেই তাহার উপায়স্বরূপ উল্লেখ করিয়া, গালি দেন। কিন্তু ছায়ার সহিত যুদ্ধ করিলে পরিশ্রমটা যে একান্তই ব্যর্থ হয়, সেটা তাঁহার মনে রাখিতে ভুলিয়া যান।

এই অর্থে মুক্তির সাধনোপায় জ্ঞান; কর্ম্মে মুক্তি নাই,ভক্তিতে মুক্তি নাই; জ্ঞান দ্বারা কর্ম্ম ভস্মসাৎ না করিলে মুক্তির সম্ভাবনা থাকে না। কর্ম্মমার্গ, ভক্তি-মার্গ ও জ্ঞানমার্গ, এই তিনটা প্রচলিত পন্থা বর্ত্তমান আছে; মনুষ্যের কোন পন্থায় যাওয়া উচিত, সে বিষয়ে কোন কথা হইতেছে না; কোন্ মার্গ প্রশস্ত মার্গ, তাহা লইয়াও বিচার হইতেছে না; জ্ঞানমার্গকে ভক্তিমার্গের উর্দ্ধে স্থান দেওয়াও এই প্রস্তাবের আদৌ উদ্দেশ্য নহে। এই পর্য্যন্ত বলা যাইতেছে যে, জ্ঞানমার্গ ভিন্ন অন্য কোন মার্গ মুক্তিতে পৌঁছাইতে পারে না; সেই মার্গ সকলের আশ্রয়ণীয় কি না, মুক্তির অন্বেষণই মনুষ্যের কর্ত্তব্য কি না, তৎসম্বন্ধে কোন কথাই এখানে নাই। যে ব্যক্তি মুক্তির অন্বেষণ করেন, তাঁহাকে জ্ঞান-মার্গে চলিতে হইবে। তাঁহার অন্যতর গতি নাই।

মুক্তির অপপ্রযুক্ত অর্থ ও মুক্তির প্রচলিত ব্যাখ্যা উভয়েরই উল্লেখ করা গেল। একশ্রেণীর ব্যাখ্যা অনভিজ্ঞতা হইতে উৎপন্ন; অন্য শ্রেণীর ব্যাখ্যাও, বলিতে ভয় হয়, অন্যবিধ মূঢ়তা হইতে উৎপন্ন। মহানর্থকর দ্বৈতবাদ এই ভ্রান্তির জন্য দায়ী।

ত্রিভুজের দুই ভুজের সমষ্টি তৃতীয় ভুজের অপেক্ষা বৃহৎ, ইউক্লিড প্রমাণ করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, ইউক্লিড অনর্থক ক্লেশ স্বীকার করিয়া-ছেন; গাধাতেও এই প্রতিজ্ঞাটার তথ্য বুঝে। সম্মুখে ঘাসের বোঝা রাখিলেই দেখিতে পাইবে,—গাধাও বাঁকাপথ ছাড়িয়া সোজা পথে চলিবে। গাধার পক্ষে যাহা স্বতঃসিদ্ধ, তাহা বুঝাইবার জন্য ইউক্লিডের এতটা প্রয়াসশ্রম পণ্ডিতো-চিত হয় নাই।

গাধা সোজা পথে যায়; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে মানুষের বুদ্ধি সর্ব্বদা সোজা পথে যায় না। কেন যায় না, বলিতে পারি না ও বুঝিতে পারি না; কিন্তু যায় না, ইহা নিয়ত প্রত্যক্ষ ঘটনা। এই মুক্তিতত্ত্বেই তাহার পরিচয়।

অপপ্রযুক্ত অর্থ ছাড়িয়া দিয়া মুক্তির প্রচলিত অর্থ কি,উপরে তাহা বলিয়াছি। সহস্র সহস্র পণ্ডিত চিরকাল সেই অর্থ গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন; দ্বৈত

মতের উপর এই অর্থের প্রতিষ্ঠা, কিন্তু আমার বোধ হয়, সরল পথে গেলে সে অর্থে পৌছান যায় না। অদ্বৈতবাদের রাস্তা সোজা রাস্তা; দ্বৈতবাদের রাস্তা বাঁকা রাস্তা। মানুষ অদ্বৈতবাদের রাস্তা ছাড়িয়া দ্বৈতবাদের রাস্তায় চলে; সরল পথ ছাড়িয়া বাঁকা পথে চলে; মানুষের সহিত কাহার তুলনা দিব?

সোজা কথায় অদ্বৈতবাদের অর্থ আমা ভিন্ন আর পদার্থ দ্বিতীয় নাই। আমিই সব, একমেবাদ্বিতীয়ম্। সেই আমার নাম আমি, ভাল কথায় আত্মা, আরও ভাল কথায় ব্রহ্ম। ব্রহ্ম বলিলে আর কিছু বুঝায় না। আমিই ব্রহ্ম, অহং ব্রহ্মাস্মি—সোঽহম্। বেদান্ত শাস্ত্র অত্যন্ত সরলভাবে মোটা কথায় একবারে সাদাসিধা বলিয়া ফেলিয়াছেন, অহং ব্রহ্মাস্মি। আমি ভিন্ন আর দ্বিতীয় ব্রহ্ম কিছুই নাই; আমি ভিন্ন আর কোন কিছুই নাই। দ্বৈতবাদীরা কোথা হইতে একটা পরমাত্মা আর কতকগুলা জীবাত্মা খাড়া করেন; আর বলেন, জীব ব্রহ্মে অভেদ, এই বাক্যের অর্থ জীব ও ব্রহ্ম একাত্মক; জীব ও ব্রহ্ম এক পদার্থে নির্ম্মিত; জীব ব্রহ্মের অংশ। প্রত্যেক জীবই এক পরব্রহ্মের খণ্ডীকৃত অংশ; যেমন মহাকাশের অংশ ঘটাকাশ। অদ্বৈতবাদের নিকট এই সকল বাক্যের কোন অর্থ নাই। পরমাত্মা বলিয়া কোন পদার্থ নাই। আমি পরমাত্মার অংশ, পরমাত্মা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আসিয়াছি, আমি ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত, আবার ব্রহ্মে লয় পাইব; এ সকল কথার অর্থ নাই। আমাকে ছাড়িয়া অপর ব্রহ্ম নাই। আমিই ব্রহ্ম—অহং ব্রহ্মাস্মি। এত সরল কথার অর্থ কিরূপে বিকৃত হয়, তাহা বোঝা শক্ত।

অদ্বৈতবাদ সত্য কি মিথ্যা, বর্ত্তমান প্রবন্ধে সে কথার আলোচনায় দরকার নাই; কিন্তু আমার বোধ হয়, অদ্বৈতবাদের সরল অর্থ ইহাই। তদ্ভিন্ন অন্য অর্থ নাই। উপনিষদের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া অনেকে দেখান, উপনিষদের ঋষিগণ পরব্রহ্মের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন, পরব্রহ্মের ও জীবের সাদৃশ্য, একাত্মকত্ব স্বীকার করিলেও উভয়ের মধ্যে ব্যবধান অস্বীকার করিতেন না। উভয়কে এক—identical—বলিয়া স্বীকার করিতেন না। যত দোষ শঙ্কর-স্বামীর; তিনিই কোথা হইতে উপনিষদের বাক্যে এই নূতন অর্থ আরোপ করিয়া জীব ব্রহ্মের ঐক্যরূপ আজগুবি কথার অবতারণা করিয়াছেন। কিন্তু উপনিষদেই আছে 'তত্ত্বমসি'—ইহাই উপনিষদের মহাবাক্য—তত্ত্বমসি—তুমিই সেই—ওহে শ্বেতকেতু—তুমি ভিন্ন আর দ্বিতীয় ব্যক্তি, দ্বিতীয় ব্রহ্ম, দ্বিতীয় আত্মা, দ্বিতীয় জগৎ কেহই নাই, কিছুই নাই--ইহাই সমগ্র বেদান্ত শাস্ত্রের

সারকৃত অঙ্গীকৃত মহাবাক্য। এই মহাবাক্য অযথার্থ অসত্য অপ্রামাণ্য হইতে পারে, সে বিষয়ে আমি তর্ক তুলিতেছি না; কিন্তু ইহাই বেদান্তের সার কথা।

জীবব্রহ্মের ঐক্য—কথাটা আজগুবি সন্দেহ নাই; জীব—অধম, পাপিষ্ঠ, সসীম, বিকারী, নশ্বর, সঙ্কীর্ণ জীব, সে আবার আপনাকে অনাদি, অনন্ত, নির্ব্বিকার ব্রহ্ম বলিতে চায়, কথাটা চিরকালই আজগুবি; পৃথিবীর দেড় শত কোটি লোক কথাটা শুনিলেই কর্ণে হাত দিবেন। এ কি পাপ কথা—জীব ও ব্রহ্ম এক? আমি ছাড়া আর কিছুই নাই—এ কি বাতুলের প্রলাপ?

কেহই কথাটা মানিতে চায় না,—কিন্তু বেদান্ত বলেন না মানাই স্বাভাবিক; কেন না, মানুষ অবিদ্যাচ্ছন্ন, অজ্ঞানাবৃত। বর্ত্তমান অবস্থায় আপনাকে চিনিবার শক্তি মানুষের কোথায়? মানুষ যদি জানিত, আমিই সব, আমা ছাড়া কিছুই নাই, আমিই ব্রহ্ম ও আমিই জগৎ, তাহা হইলে কি আর মানুষের এত ক্লেশ থাকিত, জরামরণ ভয়ব্যাধি থাকিত; কর্ম্মপাশে বন্ধন থাকিত, সুখদুঃখ, হর্ষকোলাহল, যাতানার মুর্ম্মুরধ্বনি এই সকল ভেদ থাকিত, শীতাতপ দ্বন্দ্ব থাকিত, চন্দ্র সূর্য্য ক্ষিতি ব্যোম থাকিত, এই বিশ্বজগৎ-রূপ স্বপ্নটিই কি থাকিত? মানুষ অবিদ্যার ঘোরে আপনাকে চিনে না, তাই এই প্রকাণ্ড ভোজবাজীটা আজ পর্য্যন্ত চলিতেছে। ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় নাই। মনুষ্য দ্বৈতবাদী, আমা ছাড়া স্বতন্ত্র জগৎ বিদ্যমান আছে—মনুষ্য ইহা বিশ্বাস করে, কেন না, মনুষ্য ভ্রান্ত, অজ্ঞানান্ধ।

ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা—এই বাক্য আজি কালি সকলেই একনিশ্বাসে অবলীলাক্রমে উচ্চারণ করেন। কিন্তু ইহার তাৎপর্য্য কত দূর হৃদয়ঙ্গম করেন, তাহা সংশয়ের বিষয়। ব্রহ্ম অনশ্বর অবিকারী, জীব ও জগৎ বিকারী, পরিবর্ত্তনশীল, ভঙ্গুর, নশ্বর, সাধারণ সংস্কার কতকটা এইরূপ। কিন্তু প্রকৃত তাৎপর্য্য অন্যবিধ।

সকলে এই কথার যাথার্থ্যও স্বীকার করেন না। জগৎ মিথ্যা—অর্থ কি? জগতের যেরূপ যে মূর্ত্তি আমরা দেখিতেছি, তাহা প্রকৃত রূপ, প্রকৃত মূর্ত্তি নহে; এই অর্থে জগৎ মিথ্যা, অনেকেই স্বীকার করেন। কিন্তু জগৎ কেবল একটা কল্পনামাত্র, একটা স্বপ্নমাত্র, মরীচিকাদৃষ্ট নগরের ন্যায়, দর্পণে প্রতিবিম্বিত মনুষ্যমূর্ত্তির ন্যায়, ইহার বাহ্যমূর্ত্তির অভ্যন্তরে কোন সৎপদার্থ নাই, এ কথা অনেকেই মানিবেন না। আজকাল দার্শনিকগণের অনেকেই

পরিদৃশ্যমান, তাহা ঠিক নহে ; তাহা phenomenon মাত্র ; কিন্তু এই বাহ্য বিকাশের অন্তস্তলে একটা কিছু সৎ পদার্থ আছে ; একটা substance, একটা noumenon আছে ; তাহার স্বরূপটা আমি ঠিক নির্দ্দেশ করিতে পারি না বটে, কিন্তু তাহার অস্তিত্বে আমি অবিশ্বাস করিতে পারি না। খ্রীষ্টানেরা এইরূপ জগতের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন ; বিশ্বাস না করিলে তাঁহাদের ঈশ্বরের— খোদার—অস্তিত্বে টান পড়ে। সৃষ্ট পদার্থ, সৃষ্ট জগৎ অসত্য হইলে সৃষ্টিকর্ত্তার প্রয়োজনীয়তা কোথায় থাকে ? আমাদের ব্রাহ্মসমাজের অনেকেই এই substanceএ বিশ্বাস করেন। তাঁহাদের ব্রহ্ম খ্রীষ্টানি খোদার একটা সংস্করণমাত্র। বৈষ্ণবাদি দ্বৈতবাদীদের মধ্যেও এই বিশ্বাস প্রবল ; তাঁহাদেরও ঈশ্বর অনেক সময় ইচ্ছাময় লীলাময় সৃষ্টিকর্ত্তা মাত্র। জড় জগতের অস্তিত্বে এইরূপ বিশ্বাসকে জড়বাদ নাম দেওয়া যাইতে পারে—ইংরাজীতে materialism, জড়ের স্বতন্ত্র অস্তিত্বে যাঁহারা বিশ্বাস করেন, তাঁহারা materialist. এই হিসাবে খ্রীষ্টানাদি ধর্ম্ম জড়বাদের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। খ্রীষ্টানাদি সকলেই ঘোর জড়বাদী।

তবে খ্রীষ্টানের মধ্যেও বার্কলি জন্মিয়াছিলেন ; বার্কলি জড়জগতের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতেন না। বার্কলির পর আরও অনেকে বিশ্বাস করেন না। বার্কলি জড় জগতের অনস্তিত্বের যে প্রমাণ দিয়াছেন, তাহাতে যাঁহার ভ্রান্তি দূর হয় নাই, তাঁহার অবস্থা শোচনীয়, সন্দেহ নাই। মনুষ্যের উপর অবিদ্যার প্রভাব এমনি ভয়ঙ্কর।

যাহাই হউক, বার্কলি, হিউম ও কাণ্টের পর যাঁহারা জড়জগতের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের সহিত তর্কসমরে প্রবৃত্ত হওয়ার মত বিড়ম্বনা নাই। আমি সে কার্য্যে নিরস্ত হইলাম।

ফলে, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, যাহা আমার বাহিরে আমার সম্মুখে তাহার বিচিত্র মূর্ত্তি, তাহার বিরাট কায় প্রসারণ করিয়া বর্ত্তমান, তাহা শব্দস্পর্শগন্ধাদির সমবায় ও পরম্পরামাত্র ; এবং সেই শব্দস্পর্শগন্ধাদির অস্তিত্ব আমার বাহিরে নহে, আমার ভিতরে ; ঐ শব্দস্পর্শগন্ধাদি ও তদতিরিক্ত আরও কিছু অর্থাৎ সুখদুঃখ হিংসা ভয় প্রভৃতি একত্র করিয়া যে সমষ্টি, তাহার নাম আমি ; সেই আমিই আত্মা ; সমগ্র প্রত্যক্ষপরিদৃশ্যমান জগৎ তাহার একাঙ্গমাত্র। আমি এই জগতের সমগ্রটা ব্যাপিয়া আছি ; কেন না, যাহা কিছু আমার প্রত্যক্ষ, তাহা আমারই অঙ্গ, আমারই অংশ ; যাহা ছিল, যাহা আছে, যাহা হইবে, সকলই আমারই নিকট ছিল, আছে, ও হইবে। আমাকে ছাড়িলে আর কিছুই থাকে

না। স্বতন্ত্র নিরপেক্ষ স্বপ্রধান পদার্থের বিদ্যমানতার কোন প্রমাণ পাই নাই।

জড় জগতের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব প্রমাণ করিবার জন্ম কেহ কেহ এইরূপ একটা তর্ক তুলেন। আমার হাতের এই ফুলটা কতিপয় গন্ধ-স্পর্শ রূপাদির সমবায়, তাহা যেন স্বীকার করিলাম। এবং গন্ধস্পর্শাদিও বাহ্য পদার্থ নহে, আমার আন্তরিক পদার্থ, তাহাও মানিলাম। কিন্তু এই গন্ধস্পর্শাদির কারণস্বরূপে বাহিরে কোন একটা কিছু নিশ্চয়ই আছে, নতুবা এই গন্ধাদি জন্মিল কোথা হইতে? কেন না, বিনা কারণে কোন কার্য্য উৎপন্ন হয় না। বাহ্য জগতে ফুল নামক পদার্থ কারণ; গন্ধাদি অনুভূতি তাহার কার্য্য। ফুলটা কেমন পদার্থ, তাহা আমরা জানিতে পারি; কিন্তু অবশ্যই একটা কিছু আমার বাহিরে রহিয়াছে, নতুবা এই মনোহর সৌরভ, এই সুন্দর রূপ, আসিল কোথা হইতে? বিনা কারণে কি কোন কার্য্য ঘটে? যাঁহারা এইরূপ বিচারপন্থার আশ্রয় করেন, এখানে তাঁহাদিগকে উত্তর দিব না; তবে তাঁহাদিগকে ন্যায়শাস্ত্রের কার্য্যকারণ-তত্ত্বটা একবার ভাল করিয়া বুঝিয়া আসিয়া পরে তর্কে প্রবৃত্ত হইতে বলিব।

আপাততঃ আমি সীমাবদ্ধ সঙ্কীর্ণ বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও, বস্তুতঃ জগতের যেখানে আদি, জগতের যেখানে অন্ত, আমারও সেইখানে আদি ও আমারও সেইখানে অন্ত। জগৎ আমারই একাংশের বহির্মুখে কল্পিত প্রক্ষেপমাত্র। এই আমার নাম ব্রহ্ম; জগৎ সুতরাং এই ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ নহে; এই অর্থে জগৎ মিথ্যা, ব্রহ্ম সত্য; এবং জগৎ ব্রহ্মের কল্পনা বা সৃষ্টি।

জগৎ স্বপ্নের উৎপত্তি কেন? কেন আমি আমার জগৎ নির্ম্মাণ করিলাম; কেন সেথানে চন্দ্র সূর্য্য তারা বসাইলাম; কেন সেথানে রূপরসশব্দের বৈচিত্র্য-বিধান করিলাম, কেন সেথানে নিয়মের শৃঙ্খলার স্থাপন করিলাম; কেন আমি এই জগৎকে কল্পিত করিয়া তাহাকে পৃথগ্‌ভাবে আমা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিতে থাকিলাম, কেন আমি এই কল্পিত জগতের আক্রমণে আমার আত্মাকে অভিভূত দেখিতেছি, কেন আমাতে ও জগতে এই ভেদবুদ্ধির সৃষ্টি করিলাম, কেন ব্রহ্মে ও জগতে ভেদ উৎপন্ন করিলাম, এই সকল প্রশ্নের উত্তর কি? উত্তর আমি জানি না। এই ভেদজ্ঞানের মূল কেবল আমার না-জানা; আমার অজ্ঞান বা অবিদ্যা। অথবা আর একটু ঘুরাইয়া বলিতে পারি, যদি এই ভেদবুদ্ধি না থাকিত, জগৎ যদি আমা হইতে পৃথক্‌ভাবে দৃশ্যমান না

হইত, জগতে যদি বৈচিত্র্য ও তৎসঙ্গে শৃঙ্খলা ও নিয়ম না থাকিত, জগৎ ও আমি যদি এক হইয়া যাইতাম, তাহা হইলে জগৎই বা কোথায়, আর আমিই বা কোথায়? জগৎ তখন আমাতে লুপ্ত হইত, আমি জগতে লুপ্ত হইতাম; সুখদুঃখ, শীতাতপ, "যত কিছু ভাল মন্দ, যত কিছু দ্বিধাদ্বন্দ", সবই লোপ পাইত। থাকিত কি? কে জানে? মহাশূন্য? কে জানে? সুযুপ্ত ব্রহ্ম? নিদ্রাগত স্বপ্নহীন আত্মা? হইতে পারে, না হইতেও পারে।

এখন গোঁড়ায় পৌছান গিয়াছে। এইখানে মুক্তির ব্যাখ্যা মিলিতে পারে। মুক্তির কোনও আজগুবি অর্থকল্পনার আবশ্যকতা দেখি না। মুক্তির অর্থ দুঃখনিবৃত্তি; দুঃখের সমাপ্তি। মনুষ্য সংসারে বাস করিতে করিতে দুঃখের ভরে শ্রান্ত হয়; সেই দুঃখ হইতে পরিত্রাণের জন্য আত্মা কাতর হয়। আপনার সৃষ্ট, রচিত, কল্পিত জগতের আক্রমণে, জগৎ-স্বপ্নের বিভীষিকায়, আপনি কাতর হইয়া থাকে। আবার আত্মা এই জন্য মোক্ষ চাহে, বা দুঃখ-নিবৃত্তি চাহে। কিন্তু মুক্তির উপায় কি?—জ্ঞানলাভ। জ্ঞানের অর্থ কি? না—জগৎটা স্বপ্নমাত্র, দুঃখ দুঃখ নহে, স্বপ্নমাত্র, phenomenon বা appearance বা একটা অনুভূতিমাত্র; উহার ভিতরে কোন substance নাই। এই জ্ঞানের উৎপত্তি জগতের খানিকটা দুঃখময় হইবেই, খানিকটা সুখময় হইবে; সুখ ও দুঃখ উভয়ের সমবায়ে রচিত না হইলে জগৎ চলিবে না। দুঃখ দূর করিতে হইলে সুখের দূরও করিতে হইবে। এককে ছাড়িয়া অন্যকে রাখা চলিবে না। একের সঙ্গে অন্যের অস্তিত্ব লোপ পাইবে। কেবল দুঃখময় জগৎ অর্থশূন্য, অসম্ভব। কেবল সুখময় জগৎ অর্থশূন্য প্রলাপ। উভয় আছে বলিয়া জগৎ আছে। আঁধারের পাশে আলো থাকিতে পারে, কেবল আলোর সহিত কেবল আঁধারের কোনই তফাত নাই। বিশুদ্ধ সুখ বা বিশুদ্ধ দুঃখ উভয়ের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই, উভয়ই কবিকল্পনা। উভয় পাশাপাশি আছে বলিয়া জগৎ আছে; উভয়ের অস্তিত্ব আবশ্যক—না থাকিলে এই ব্যাবহারিক জগৎ থাকিত না।

দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ চাহিলে সুখ হইতেও মুক্তি ঘটিবে। উভয়কেই ত্যাগ করিতে হইবে। খ্রীষ্টান বা বৈষ্ণব কেবল নিরবচ্ছিন্ন নিরপেক্ষ সুখের আশা করেন; তাঁহাদের আশা অমূলক, ভিত্তিহীন। কেন না, নিরবচ্ছিন্ন সুখ অর্থহীন বাক্য, যদি পরকালে সুখের প্রত্যাশা সফল হয়, তাহা ইহকালের দুঃখের তুলনায়; যদি আমার সুখ ঘটিবে ইহা সত্য হয়, তবে অন্যের দুঃখ

থাকিবে, ইহা আবশ্যক। কিন্তু যখন ইহকালটাকেই স্বপ্ন বলিয়া উড়াইতেছি—আপেক্ষিক ব্যাবহারিক অর্থে নহে, নিরপেক্ষ পারমার্থিক অর্থে—যখন আমাকে ছাড়িয়া অপরের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেই পারিতেছি না, তখন সে সকল কথা উন্মত্তপ্রলপিতবৎ।

দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ ঘটিবে কখন; যখন দুঃখের প্রকৃত স্বরূপ জানিবে। যখন জানিবে, দুঃখ ও সুখ উভয়ই অলীক, অথচ এই অলীক স্বপ্ন দুইটার সমবায়ে জগতের মহাস্বপ্ন গঠিত হইয়াছে। এই জ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান, এই জ্ঞান পারমার্থিক জ্ঞান; এই জ্ঞান জন্মিলেই জানিতে পারিবে, জগৎ আমার কল্পনা, আমার স্বপ্ন, আমা ভিন্ন আর কিছু কোথাও নাই—আমিই "একমেবাদ্বিতীয়ম্"—"অহং ব্রহ্মাস্মি।"

এই জ্ঞান অজ্ঞানের বা অবিদ্যার বিপরীত; অবিদ্যাবশে জগৎ তোমা হইতে বিভিন্ন; জগৎ তোমাকে সুখ দিতেছে, দুঃখ দিতেছে; তুমি জন্মিয়াছ, তুমি মরিবে। তোমার কর্ম্ম থাকিবে—ব্যাবহারিক জগতে ব্যাবহারিক কর্ম্মের ধ্বংস নাই; ইহা একটা আত্মপ্রতিষ্ঠিত জাগতিক নিয়ম—ইংরাজি conservation of energy বা persistence of matter যেমন আত্মপ্রতিষ্ঠিত জাগতিক নিয়ম—এই নিয়ম না থাকিলে ব্যাবহারিক জগৎ চলিত না, অসংলগ্ন, ছন্দোহীন বিপর্য্যস্ত ঠেকিত, সেইরূপ কর্ম্মের ধ্বংস নাই, ইহাও ব্যাবহারিক—phenomenal জগতের—একটা নিয়ম। অবিদ্যা হইতে যেমন phenomenal জগতের উৎপত্তি, সেইরূপ অবিদ্যা হইতে এই phenomenal নিয়মের উৎপত্তি; কর্ম্ম থাকিবে; আমার দেহ যাইবে, আমার কর্ম্ম থাকিবে, দেহান্তের পর পরকাল, সেই পরকালে সেই কর্ম্ম দেহান্তর আশ্রয় করিয়া ফলোৎপাদন করিবে। অবিদ্যার বিনাশে জ্ঞানোৎপত্তি হইলে জগতের যথার্থ স্বরূপ প্রতীয়মান হয়; যাহা phenomenon তাহা phenomenon বলিয়া জ্ঞান জন্মে, noumenon অস্তিত্বহীন, ভিতরে substance, thing-in-itself বলিয়া কিছুই নাই সেই জ্ঞান জন্মে। তখন জগৎ আমায় লীন হয়, দেশ থাকে না, কাল থাকে না, দেশ ও কাল উভয়ই মিথ্যা জগতের কাল্পনিক উপাধি বলিয়া অনুভূত হয়। দেশ থাকে না; কাল থাকে না—কাজেই জন্মমরণ মিথ্যা কল্পনামাত্র হইয়া যায়। মরণ যদি মিথ্যা, আর কাল যদি অলীক জগতের একটা কল্পিত উপাধিমাত্র হয়, তাহা হইলে পরকাল থাকে না; জন্মান্তরগ্রহণ, দেহান্তরপ্রাপ্তি, সকলই মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। তখন কর্ম্ম থাকে না, কর্ম্মের

ফলও থাকে না; আত্মা কর্ম্মপাশ হইতে বিমুক্ত হয়; আত্মার বন্ধনচ্যুতি ঘটে; ইহার নাম মোক্ষ, মুক্তি, নির্ব্বাণ, এইরূপ যা বল তাই।

কথাটা অতি সরল; সুখ ও দুঃখ একেকে ছাড়িয়া অন্যে থাকে না; অথচ উভয়েরই কোন substance নাই; বর্ত্তমান জগৎপ্রণালী যদি বজায় রাখিতে চাও, তাহা হইলে উভয়কেই পাশাপাশি রাখিতে হইবে। একটা ছাড়িয়া অন্যকে রাখা চলিবে না। এই জ্ঞানটুকু জন্মিলেই দুঃখের অস্তিত্বের জন্য আর দুঃখ করিতে হইবে না; কেন না, দুঃখকে একবারে বর্জ্জন করিতে হইলে সুখকেও বর্জ্জন করিতে হইবে; এবং উভয় লোপ পাইলে জগৎও লোপ পাইবে। কাজেই এই জ্ঞান জন্মিলেই দুঃখনিবৃত্তি বা মুক্তি।

মৃত্যুর পর পরমাত্মায় জীবাত্মার বিলয়,—এই যে একটা প্রচলিত মত আছে,—তাহার কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি পাওয়া যায় না। মৃত্যুর পর মুক্তিলাভ অসঙ্গত কথা। জ্ঞানোদয়ে মুক্তিলাভ বুঝিতে পারি।

জ্ঞানোদয় হইলে মুক্তি ঘটে, মানিতে পারি। কিন্তু মনুষ্যের পক্ষে সেইরূপ জ্ঞানোদয় সম্ভব কি না—বিচার্য্য বিষয়। আমার মনে হয়, বোধ হয় মনুষ্যাত্মার পক্ষে এই জ্ঞানের সম্পূর্ণ বিকাশ একবারে অসম্ভব। দরিদ্রকে দয়া করিতে হয়, সকলেই জানেন; এবং অন্যকে অবলীলাক্রমে তাহা উপদেশ দিতেও পারা যায়। কিন্তু দরিদ্রকে দেখিয়া দয়ার উদ্রেক সকলের হয় না। এই দয়াবৃত্তির উদ্রেক কেবল ইচ্ছাসাপেক্ষ নহে, সাধনাসাপেক্ষ। বোধ হয়, সম্পূর্ণ সাধনাসাপেক্ষও নহে। জগৎ মিথ্যা, আমি সত্য, এ বিষয়ে উপদেশ দেওয়া সহজ; বাক্যটার যাথার্থ্য হৃদয়ঙ্গম করাও অপেক্ষাকৃত সহজ; বৈজ্ঞানিক যুক্তিবলে কথাটা আপনি আসিয়া পড়ে; ইহার হাত হইতে এড়ান চলে না। কিন্তু এই বাক্য সত্য জানিয়া আপনার অন্তর্বৃত্তিকে তদনুসারে গঠিত করা সহজ নহে। দুঃখে অভিভূত হওয়া উচিত নহে, এ এক রকমের কথা; দুঃখে অভিভূত না হওয়া আর এক রকমের কথা। প্রথম বাক্যের যিনি যাথার্থ্য উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনি মুক্তির অর্থ বুঝিয়াছেন মাত্র; যিনি এই বাক্যকে কার্য্যে পরিণত করিয়াছেন, তিনি মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

কিন্তু এই মুক্তিলাভ আত্মার পক্ষে সাধ্য কি না, সন্দেহের বিষয়। অনেকে মুক্তির অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া চিত্তবৃত্তি সমুদায়ের নিরোধের দ্বারা ও শারীরিক প্রক্রিয়াদির অভ্যাস দ্বারা আপনাকে নিস্পন্দ জড়দ্রব্যে পরিণত করেন। অচেতন জড়ের নিকট সুখ দুঃখের বিভেদ নাই; সমুদয় জগৎ অস্তিত্বহীন। ইহাকে

মুক্তিলাভ বলে না ; ইহার নাম তাহার বিপরীত ক্রিয়া। মুক্তি জড়কে আত্মায় পরিণত করে, জড়ের জড়ত্ব যায়। এইরূপ বুজরুকি দ্বারা আত্মা জড়ত্ব পায়।

মনুষ্যজীবন বাহাল রাখিতে হইলে প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে শারীরিক ক্রিয়া সকল সম্পন্ন করিতেই হইবে ; বাহ্যজগতের নিদেশানুসারে চলিতেই হইবে। বাহ্যজগৎ কর্তৃক অভিভূত থাকিতেই হইবে ; বাহ্যজগৎকে ব্যাবহারিক হিসাবে আপনা হইতে স্বতন্ত্র জানিতেই হইবে। কাজেই মনুষ্য আপনার অন্তর্জগতের স্বাস্থ্য বজায় রাখিয়া বাহ্যজগৎকে একবারে লোপ করিতে পারে না। জগৎ মিথ্যা বলিয়া আজ যদি আমি বাঘের মুখে মাথা দিই বা আগুনে প্রবেশ করি, বা আহার নিদ্রা ত্যাগ করি, তাহা হইলে আমি বাতুলের কাজ করিব ; আমার অন্তরাত্মা স্বাস্থ্যহীন হইবে। অন্তর্জগতের সহিত বহির্জগতের আমি যে সম্বন্ধ স্থাপনা করিয়াছি, বহির্জগতে যে বিবিধ নিয়মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছি, যে নিয়মের অস্তিত্বে এই বিশ্বজগতের ব্যাবহারিক অস্তিত্ব ও আমারও অস্তিত্ব, সেই সম্বন্ধের বিরুদ্ধে, সেই নিয়মের বিরুদ্ধে চলিলে, আত্মার মুক্তিলাভ হইবে না—আত্মহত্যা হইবে মাত্র।

আমার বোধ হয়, মুক্তির অর্থ যদি উল্লিখিতরূপ হয়, তবে মুক্তিলাভ মনুষ্যের পক্ষে একরূপ অসম্ভব। আত্মার বর্ত্তমান অবস্থা অবিদ্যা হইতে উৎপন্ন, কিন্তু সেই অবিদ্যার মোহ সম্পূর্ণভাবে বর্ত্তমান অবস্থায় কাটাইবার কোন উপায় নাই। জ্ঞানী মুক্তির অন্বেষণ করিতে পারেন, কিন্তু মুক্তিলাভ সম্ভবতঃ অসম্ভব ; মুক্তি যে পথে পাওয়া যায়, সেই পথে অগ্রসর হইতে পারেন ; কিন্তু গম্য স্থলে পৌঁছাইতে পারেন কি না সন্দেহের বিষয়।

আর সংসারে থাকিয়া দুঃখ হইতে অব্যাহতি লাভ করিতেই হইবে, এমনই বা কি কথা আছে ? অসাধ্যসাধনে হাত দিয়াই বা প্রয়োজন কি ? অবিদ্যা অর্থে অজ্ঞান সন্দেহ নাই ; কিন্তু অবিদ্যা বা অজ্ঞান জ্ঞানেরই মত সত্য পদার্থ। যাহা সত্য, তাহার অপলাপের কোন সম্ভাবনা নাই। আত্মার যদি অবিদ্যাক্রান্ত হইয়া থাকাই স্বভাব হয়, তাহা হইলে এই সত্যের লঙ্ঘনের প্রয়াসে কোন ফল আছে কি ? এই প্রশ্ন এক মহাসমস্যার আনয়ন করে। বর্ত্তমান প্রসঙ্গে সেই সমস্যার আন্দোলনে সাহসী হইলাম না।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

পঞ্চসহস্রের প্রত্যাবর্ত্তন।*

নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ উড়িষ্যা-বিদ্রোহের দমন করিয়া মন্দগমনে রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন। ইতঃপূর্ব্বেই অধিকাংশ সেনাদলকে অবসর-প্রদান, বা মুর্শিদাবাদে যাত্রার আদেশ দেওয়া হইয়াছে। নবাবের সহিত পাঁচ সহস্র মাত্র সৈন্য আছে। তাহারা সকলেই শ্রান্ত,—অনেকে যুদ্ধ করিতে অক্ষম। ময়ূরভঞ্জের নৃপতির উপর যথেষ্ট প্রতিহিংসা লইয়া,—তাঁহার রাজ্য উচ্ছিন্ন করিয়া, নবাব এখন মেদিনীপুরের দক্ষিণে উপনীত হইয়াছেন। ঘনান্ধকারাবসানে অরুণকিরণের মত গুরু শ্রমের পর বিশ্রাম বড় মধুর। যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাদলে সদাই শঙ্কা, সদাই শ্রম, সদাই জীবননাশের ভয়, সদাই মরণাশঙ্কা। যুদ্ধক্ষেত্রে কেবল—

"ঘোড়া দড়বড়ি, অসি ঝন্‌ঝনি;
কাটাকাটি, গোল, তীর-স্বন্‌স্বনি"

তাই সমরের অন্তে এখন বিজয়োল্লাসমত্ত নবাবসেনাগণ মন্দানিলবীজিত বিজয়-বৈজয়ন্তী উড়াইয়া হৃষ্টমনে গমনপথে মৃগয়া করিয়া সমরশ্রমের বিনোদন করিতেছিল। শিবিরে শিবিরে কেবল আনন্দস্রোত—রণসজ্জার পরিবর্ত্তে কেবল মৃগয়ার আয়োজন, অস্ত্রঝনৎকারের পরিবর্ত্তে কেবল আনন্দকোলাহল—কেবল সৈনিকদিগের উচ্চহাস্য।

সহসা সংবাদ আসিল, পঞ্চকোটের পার্ব্বত্য পথ দিয়া চল্লিশ সহস্র অশ্বারোহী সেনা সহ সুবিখ্যাত রঘুজী ভোঁসলার রণনিপুণ সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিত "চৌথ" আদায়ের ব্যপদেশে বঙ্গভূমিলুণ্ঠনের জন্য বর্দ্ধমানাভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন।

---

* দুর্দ্দমনীয় মহারাষ্ট্র-বাহিনী-বেষ্টিত আলিবর্দ্দী খাঁর এই প্রত্যাবর্ত্তন ইতিহাসে এক অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা। ইতিহাসবিমুখ বঙ্গদেশে না ঘটিয়া অন্যত্র ঘটিলে পৃথিবীর ইতিহাসে অন্যতম দুষ্কর কার্য্যাবলীর মধ্যে স্থায়িভাবে উচ্চাসনলাভের অধিকার পাইত। সেকালের ইংরাজ লেখক হলওয়েল বলিয়াছেন,—

"If we consider the retreat of these veterans......in all its circumstances it will appear as amazing an effert of human bravery as the history of any age or people have chronicled, and we think it merits as much being recorded and transmitted to posperity as that of the celebrated Athenian general and historian."—Holwell—Interesting Historical Events.

সংবাদদাতা নিবেদন করিল যে, প্রবল প্লাবনের মত মহারাষ্ট্রবাহিনী বিংশতি ক্রোশ মাত্র দূরে রহিয়াছে,—পরদিবস সন্ধ্যাসমাগমের মধ্যে নবাবশিবিরের নিকটস্থ হইতে পারে। শুনিয়া কূটবুদ্ধি নবাব বুঝিলেন যে, এই আসন্ন বিপদে তিনি ভীতির চিহ্নমাত্র দেখাইলে সেনাদলে অত্যন্ত ভীতির সঞ্চার হইবে। সপ্রতিভ নবাব চাঞ্চল্যের বা ভীতির চিহ্নমাত্র প্রদর্শন না করিয়া—উত্তর করিলেন,—"সেই 'কাফের'গণ কোথায়? পৃথিবীতে এমন কোন্ স্থান আছে, যেখানে আমি তাহাদিগকে সমুচিত শাস্তি দিতে অসমর্থ?" সংবাদদাতা ও উপস্থিত সদস্যবর্গ এই বিপদের সংবাদেও নবাবের এবম্প্রকার স্থিরনিশ্চল নির্ভীক ভাব লক্ষ্য করিয়া স্তম্ভিত হইলেন।

নবাব মুখে যাহাই বলুন, প্রকৃতপক্ষে প্রথমতঃ ভয়ে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। ক্ষণকাল চিন্তার পর তিনি সৈন্যগণকে পটবাস উত্তোলন করিয়া বর্দ্ধমানের অভিমুখে অগ্রসর হইতে আদেশ করিলেন। তিনি ইতিপূর্ব্বেই অবগত হইয়াছিলেন যে, মহারাষ্ট্রীয়গণ 'চৌথ' আদায় করিতে বঙ্গদেশে আসিবার উদ্যোগ করিতেছে। কিন্তু এরূপ সহসা অতর্কিতভাবে তাহাদের দ্বারা আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা কখনও তাঁহার মনে উদিত হয় নাই।

নবাবী সেনাদল সবেগে বর্দ্ধমানের দিকে অগ্রসর হইল। নবাব বুঝিয়াছিলেন যে, বর্দ্ধমানে যাইতে পারিলে খাদ্যাদির অভাব হইবে না, অধিকন্তু নগরের দিকে পশ্চাৎ করিয়া মার্হাট্টাগণের গতিরোধ করিবারও সম্পূর্ণ সুবিধা হইবে। কিন্তু ক্ষিপ্রগামী অশ্বারোহী বর্গীগণ (১) তাঁহার আগমনের পূর্ব্বেই নগরের একদেশ আক্রমণ ও অগ্নিসংযোগে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিয়াছিল। বাঙ্গালা সৈন্যের আগমনে তাহারা কিছু দূর সরিয়া দাঁড়াইল। কয় দিন ধরিয়া উভয়পক্ষে সেনামুখ যুদ্ধ চলিতে লাগিল। প্রতিদিন সন্ধ্যাসমাগমে উভয় পক্ষই স্ব স্ব শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করে; আবার পরদিন প্রভাতে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হয়। শত্রুপক্ষের আকার ইঙ্গিত ও নবাবের তেজস্বিতা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ভাস্কর পণ্ডিত স্থির করিলেন যে, যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হইয়া কিছু অর্থ গ্রহণ করিয়া সসম্মানে

---

(১) বর্গী শব্দের ব্যুৎপত্তি লইয়া মতভেদ আছে। কেহ সংস্কৃত 'বর্গ', কেহ পারসী 'বাগী' (বিদ্রোহী) শব্দ হইতে ইহার উৎপত্তি নির্দ্দেশ করেন; আবার কেহ কেহ "বারগীরস্ত্বশ্ববহঃ" কোষ উদ্ধৃত করিয়া অশ্বারোহী মার্হাট্টাগণের স্কন্ধে অর্পণ করিতে চাহেন। এখনও "বর্গী এলো দেশে" লোকের সুপরিচিত। মুণ্ডিতশীর্ষ 'বৈরাগী'-চিহ্নধারী বলিয়াই 'বর্গী' নাম, কি অন্য কোন কথা হইতে ইহার উৎপত্তি, ভাষাবিদ্গণ তাহার বিচার করিবেন।

প্রত্যাবর্তন করাই শ্রেয়স্কর। তিনি নবাবশিবিরে বলিয়া পাঠাইলেন যে,—মার্হাট্টাগণ বহু দূর হইতে আসিয়াছে; নবাব অতিথিসৎকারস্বরূপ দশ লক্ষ টাকা দিলেই তাহারা সন্তুষ্টচিত্তে দেশে ফিরিয়া যায়।

নবাব এ প্রস্তাবে সম্মত হওয়া অপমানজনক বিবেচনা করিয়া সেনাপতি মুস্তাফা খাঁর পরামর্শে প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলেন। আবার দুই এক দিন পূর্ব্বের মত লঘু যুদ্ধ চলিল। বাঙ্গালার সৈন্যগণ মহারাষ্ট্রীয় যুদ্ধব্যাপারে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ; শত্রুদিগের অতর্কিত আক্রমণে ও প্রত্যাবর্ত্তনে তাহারা চকিত হইতে লাগিল। নবাব স্থির করিলেন, একদিন সমগ্র বল একত্র করিয়া শত্রুদিগকে আক্রমণ করিবেন। তদনুসারে সৈন্যশ্রেণীর মধ্যে ভারবাহী ও ভৃত্যবর্গের প্রবেশ নিষিদ্ধ হইল। প্রত্যূষে নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ স্বয়ং অশ্বারোহণে সেনা চালনা করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু শিবিরের অনুচরবর্গ শত্রুভয়ে ভীত হইয়া নবাবের নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া চতুর্দ্দিকে সেনাদলের মধ্যে আশ্রয় লইতে লাগিল। সেনাদল এই অকর্ম্মণ্য জনতায় জড়ীভূত হইয়া পড়িল।

মহারাষ্ট্রীয় সেনাগণ এই অবসরের প্রতীক্ষা করিয়া ছিল। মুহূর্ত্তমধ্যে তাহারা পঙ্গপালের ন্যায় চারি দিক হইতে নবাবের সেনাদলকে আক্রমণ করিল। বাঙ্গলা সেনাগণ অতুলবিক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিল; অনেকে হত হইল; আরও অনেকে আহত হইল। কিন্তু শৃঙ্খলার সহিত সৈন্যসমাবেশের অসুবিধায় চারি দিকে বিষম বিভ্রাট উপস্থিত হইল। এই সময় যুদ্ধক্ষেত্রের একাংশে মহারাষ্ট্রীয়গণ নবাব-বেগমের হস্তীর চারি দিক বেষ্টন করিল। বেগমের শত্রুগণ কর্ত্তৃক বন্দীভূতা হওয়া অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িতেছিল, এমন সময়ে মুসাহেব খাঁ নামক নবাবের সুদক্ষ সেনানী সদলে অগ্রসর হইয়া প্রাণপাত করিয়া বেগমকে রক্ষা করিলেন। (২)

আলিবর্দ্দী খাঁ লক্ষ্য করিলেন, মুস্তাফা প্রভৃতি আফগান সেনাপতিগণ রীতিমত যুদ্ধ করিতেছেন না। শিবিরের দ্রব্যসম্ভার সকলই শত্রুহস্তগত। এ দিকে দিবা অবসানপ্রায়; আর অগ্রসর হওয়া বা পূর্ব্বশিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করা উভয়ই অসম্ভব। সুতরাং নবাব যে স্থানে ছিলেন, সেই স্থানেই শিবির-সন্নিবেশ করিতে বাধ্য হইলেন। একটি ক্ষুদ্রায়তন তাম্বু ও তিনচারিখানি

(২) তারিখ-বাঙ্গালা।

শিবিকা ব্যতীত বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যার নবাবের নিশাযাপনের অন্য কোন আশ্রয় মিলিল না! নবাব মাহাট্টাগণকে দশ লক্ষ টাকা দিবার প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন, কিন্তু ভাস্কর পণ্ডিত সুবিধা পাইয়া এক কোটী টাকা হাঁকিয়া বসিলেন। সন্ধ্যা সমাগত হইলে নবাবের সেনাদলের অনেক লোক শত্রুদলে যোগ দিতে আরম্ভ করিল। এ দিকে সংবাদ রাষ্ট হইল যে, মাহাট্টাগণ আশ্রয়-প্রার্থিমাত্রকেই আশ্রয়দান করিবে।

এই সময় নবাব আর এক উপায় স্থির করিলেন। সেই তিমিরাবগুণ্ঠিতা রজনীর সূচীভেদ্য অন্ধকারে প্রাণপ্রিয় বালক সিরাজদ্দৌলার হস্তধারণ করিয়া তিনি মুস্তাফা খাঁর শিবিরে উপনীত হইলেন। সহসা সুপ্তোত্থিত সেনাপতি ত্রস্ত-ভাবে স্বাগতসম্ভাষণ করিলে নবাব বলিলেন,—"বন্ধো! আমার পূর্ব্বকৃত দুই একটি কার্য্যের জন্য অসন্তুষ্ট হইয়া আমার বিনাশের জন্য তোমার পরোক্ষ উপায়-অবলম্বনের প্রয়োজন কি? আমি প্রিয়তম সিরাজকে লইয়া তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। যদি ইচ্ছা হয়, এক আঘাতে আমাদের উভয়কেই সংহার কর। আর যদি পূর্ব্বকৃত উপকারজন্য কৃতজ্ঞতা ও দীর্ঘকালের বন্ধুত্বজনিত স্নেহ তোমার হৃদয়ে তিলমাত্র স্থান পাইয়া থাকে, তবে সামান্য ত্রুটী মার্জ্জনা করিয়া রণক্ষেত্রে আমার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হও। তোমার সাহায্য পাইলে আমি দুরন্ত বর্গীগণকে দমন করিবার উপযুক্ত ব্যবস্থা-চিন্তার অবসর পাই। শত্রুহস্তে আত্মসমর্পণ অপেক্ষা অন্য সকল কার্য্যই আমার করণীয়।" (৩)

মুস্তাফা অন্যান্য আফগান সেনাপতিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া, প্রভুর কার্য্যে প্রাণ পর্য্যন্ত দান করিবেন, অঙ্গীকার করিলেন। তিনি বলিলেন, "প্রবাদ আছে,—চল্লিশ তরবারি (তরবারি-ধারী) একমত হইলে রাজ্য প্রদান করিতে পারে। আমরা এখনও তিন সহস্রেরও অধিক অশ্বারোহী বর্ত্তমান। আল্লার ইচ্ছায় আমরা এখনও কাফেরগণকে সমুচিত শিক্ষা দিতে সম্পূর্ণ সক্ষম।" নবাব তখন সদলে শত্রুসৈন্য ভেদ করিয়া মুর্শিদাবাদের দিকে অগ্রসর হওয়াই কর্ত্তব্য স্থির করিলেন। তাঁহার অভিপ্রায়, কিয়ৎকাল

(৩) মুতাক্ষরীণ (উড়িষ্যার যুদ্ধে নবাব কয়েক ক্ষেত্রে মুস্তাফার অনুরোধ রক্ষা করেন নাই। অনেক আফগান সৈন্যকে অবসরদান করাও হইয়াছিল।) ইউসুফ আলী এই

"আর্দ্র পক্ষ শুষ্ক করিয়া," সৈন্যাদিসংগ্রহের পর, শত্রুদিগকে আক্রমণ করিবেন।

এই দিন রাত্রিকালে মহারাষ্ট্রীয়গণ সুযোগ পাইয়া নবাব সৈন্যদিগকে সবিশেষ উত্যক্ত করিতে লাগিল। একটি লুণ্ঠিত বৃহৎ কামান নিকটস্থ বৃক্ষে সংলগ্ন করিয়া তাহারা নবাবশিবিরে অগ্নিবৃষ্টি করিতে লাগিল। সমস্ত রাত্রি শিবিরে আহতদিগের করুণ আর্ত্তনাদ শ্রুত হইতে লাগিল। বর্দ্ধমানরাজের দেওয়ান মাণিকচাঁদ ভয়ে বিহ্বল হইয়া প্রত্যূষেই সদলে প্রভুসকাশে পলায়নপর হইলেন। নিশাকালে গভীর অন্ধকারে নবাবসৈন্য চারি দিক হইতে আক্রান্ত হইল। বর্গীগণ কোন কোন স্থানে সৈন্যশ্রেণী ভেদ করিয়া সবেগে আক্রমণ করিতে লাগিল। বাঙ্গালার সৈন্যগণও অমিতবিক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিল। অবশেষে মার্হাট্টাগণ নিরুৎসাহ হইয়া পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিল। নবাব নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশ পাইলেন।

উষাকালে নবাবের আদেশে সেনাগণ শত্রুশিবির ভেদ করিয়া কাটোয়ার অভিমুখে অগ্রসর হইল। মার্হাট্টাদল পশ্চাতে থাকিয়া তাহাদিগকে উত্যক্ত করিতে লাগিল। বাঙ্গালা সৈন্যদলের অবশিষ্ট দ্রব্যাদিও এখন শত্রুহস্তগত। আহার্য্যশূন্য, বস্ত্রাদিবিরহিত ক্ষুধার্ত্ত দুই তিন সহস্র সৈন্য, আহারাভাবে দুর্ব্বলতর ক্লান্ত অশ্বে আরোহণ করিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহাদের সঙ্গে ভৃত্য, ভারবাহী প্রভৃতিতে সর্ব্বসমেত প্রায় পাঁচ সহস্র লোক পদব্রজে যাইতে লাগিল। এ দিকে মার্হাট্টাগণ পঙ্গপালের মত চারি দিক আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। তাহাদের অশ্বগুলি কষ্টসহ ও ক্ষিপ্রগামী; কাজেই তাহাদের পক্ষে অতর্কিত আক্রমণ ও সহসা প্রত্যাবর্ত্তন উভয়ই সহজসাধ্য। বর্দ্ধমান হইতে কাটোয়া সপ্তদশ ক্রোশ। সমস্ত পথ যুদ্ধ করিতে করিতে, অবরোধকারিগণের অন্তহীন আক্রমণ প্রতিহত করিতে করিতে, ক্ষুধায় দুর্ব্বল বাঙ্গালা সৈন্যদল দৃঢ়পদে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল। এত বিপদেও সৈন্যগণ কিছুমাত্র বিচলিত হইল না; নেতার অতুল উৎসাহে ও সেনাপতিগণের দুর্দ্দম বিক্রমে প্রোৎসাহিত হইয়া তাহারা সমস্ত পথ অমিততেজে শত্রুসৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহাদের বিক্রমদর্শনে মার্হাট্টাগণের মনে ক্রমশঃ ভীতির সঞ্চার হইতে লাগিল।

আহার্য্য দ্রব্যসামগ্রী সকলই শত্রুহস্তগত; পথের উভয় পার্শ্বে ও চতুর্দ্দিকে পঞ্চক্রোশব্যাপী স্থানের (৪) নিরীহ প্রজাবৃন্দ বর্গীর ভয়ে গৃহত্যাগ করিয়াছে। কোনও দিক হইতে খাদ্য প্রাপ্তির আশা নাই। এ দিকে বর্ষার বিরামবিহীন বারিধারা ও দুর্ব্বার জঠরানল দুর্দ্দম বর্গী সৈন্যদিগের সহিত যোগ দিয়া বাঙ্গালা সৈন্যদিগকে বিষম পীড়িত করিয়া তুলিতে লাগিল। সৌভাগ্যক্রমে বর্দ্ধমানের প্রশস্তপথের পার্শ্বদেশে প্রাচীন হিন্দুপ্রথার ও ধর্ম্মের ব্যবস্থানুসারে বহু প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা বর্ত্তমান। ঐ সকল পুষ্করিণীর উচ্চ পাহাড়ের উপর উন্নত বিটপিশ্রেণী চিক্কণশ্যাম পত্রবহুল সহস্র শাখা বিস্তার করিয়া শ্রান্ত পথিকবর্গকে ছায়াদানে সুশীতল করে। সমস্ত দিনের শ্রান্তির পর ক্লান্ত বাঙ্গালা সৈন্য কোনও সরোবরতীরে "বিততসহস্রশাখ-দীর্ঘ-তরুমূলে" নিশাযাপন করিত। রাত্রি সমাগত দেখিলে, কি কর্ম্মচারী, কি সেনাগণ, সকলেই মৃত্তিকাসনে উপবিষ্ট হইয়া, বৃক্ষপত্র বা শস্পাদি দ্বারা উদরপূর্ত্তি করিয়া ধরাশয্যায় কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিতেন। নিম্নে বসুন্ধরা শয্যার ও উপরে সংক্ষুব্ধ বর্ষার আকাশ আচ্ছাদনের কার্য্য নির্ব্বাহ করিত। সেনাপতিগণের ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের অবস্থাও সাধারণ সৈন্যগণের অবস্থার অপেক্ষা ভাল ছিল না। তাম্বু প্রভৃতি সমস্তই শত্রুহস্তগত। প্রচুর অর্থ সত্বেও আহার্য্যসংগ্রহের কোন উপায় নাই। ধনগর্ব্বগর্ব্বিত বিলাসী ওমরাহগণ এক্ষণে স্বর্ণরৌপ্যাদির স্বকীয় মূল্যের অকিঞ্চিৎকরত্ব বুঝিতে পারিলেন। কায়ক্লেশে প্রাণধারণ করা ব্যতীত কাহারও আর উপায়ান্তর ছিল না। বৃক্ষপত্র, বল্কল, এমন কি, পিপীলিকাদি কীটপতঙ্গ আত্মসাৎ করিয়াও অনেককে উদরপূর্ত্তি করিতে হইত। মৃতজীবের সামান্য কিছু মাংস সংগৃহীত হইলে তাহার জন্য কাড়াকাড়ি পড়িয়া যাইত।

তারিখ-ইউসুফীর রচয়িতা ইউসুফ আলিখাঁ স্বয়ং এ ক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন, এবং সৈন্যগণের অপূর্ব্ব সাহসের ও কষ্টসহিষ্ণুতার বিশেষ বিবরণ দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—"বর্দ্ধমান হইতে কাটোয়ায় পঁহুছিবার তিন দিনের মধ্যে এক সময়ে আমরা তিন পোয়া মাত্র খিচুড়ী সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলাম। নানাবিধ উপাদেয় প্রচুর খাদ্যে অভ্যস্ত আমরা সাত জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সেইটুকু ভাগ করিয়া খাইয়াছিলাম। আর একদিন সাতটিমাত্র শাকরপারা, (৫) এবং

(৪) মুতাক্ষরীণ-কার বলেন, বর্গীগণ দশ বার ক্রোশ পর্য্যন্ত দূরবর্ত্তী স্থানের গ্রামনগরাদি ভস্মীভূত করিয়া দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করিয়া লইয়া গিয়াছিল।

(৫) একপ্রকার মিঠাই; শাকর = শর্করা।

তৃতীয় দিন কেবল অর্দ্ধসের মৃত প্রাণীর মাংস সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলাম। শেষদিন রন্ধনের সময় আরও কয় জন লোক এক এক গ্রাসের প্রার্থনা করেন,—না দিয়া থাকিতে পারি নাই।”

এইরূপ বিষম ক্লেশে ও অনাহারে ক্ষিপ্তপ্রায় নিস্তেজ বাঙ্গালা সৈন্য যুদ্ধ করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিল। কামানগুলি শত্রুহস্তগত। শত্রু-সৈন্যগণ চারি দিকে বেষ্টন করিয়াছে, কিন্তু আপনাদের মধ্যে ও নবাবী সেনা-দলের মধ্যে এরূপ অন্তরাল রাখিয়াছে যে, বাঙ্গালা সেনার বন্দুকের গুলি তাহাদিগকে স্পর্শও করিতে পারিতেছে না। সময়ে সময়ে তাহারা আক্রমণও করিতেছে। বাঙ্গালা সৈন্যের তদানীন্তন অবস্থা কল্পনীয়—বর্ণনীয় নহে।

একদিন সেনাপতি মুস্তাফা খাঁ দেখিতে পাইলেন, সম্মুখে এক দল মহারাষ্ট্রীয় অস্ত্রাদি ত্যাগ করিয়া আহ্নিকের ও আহারের আয়োজনে ব্যাপৃত। তাহারা স্বপ্নেও ভাবে নাই যে, অনাহারক্লিষ্ট বাঙ্গালা সৈন্যগণ সাহস করিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিবে। সেনাপতির উৎসাহবাক্যে সৈন্যগণ নিষ্কোষিত অসিহস্তে সবেগে তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। সেই ক্ষুধিত শার্দ্দূলোপমেয় সেনাদলকে দেখিয়া অর্দ্ধপক্ক ভোজ্য ও সংগৃহীত শস্যাদি ত্যাগ করিয়া মহারাষ্ট্রীয়-গণ পলায়নপর হইল। বাঙ্গালা সৈন্যদিগের সে দল সে দিন সেই ত্যক্তভোজ্য ভোজন করিয়া কথঞ্চিৎ সবল হইল।

অতঃপর বর্গীগণ সাবধান হইল। নবাবসৈন্য কায়ক্লেশে অগ্রসর হইতে লাগিল।

তৃতীয় দিন প্রত্যূষে মহারাষ্ট্রীয়গণ সহসা চতুর্দ্দিক হইতে সবেগে আক্রমণ করিল। বাঙ্গালা সেনাগণ যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বেই—নবাব হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিতে না করিতে তাহারা বিষম তেজে যুদ্ধারম্ভ করিল। সৈন্যগণের পক্ষে পরস্পরের সহিত যোগ দিয়া একত্র নিয়মমত যুদ্ধ করা অসম্ভব হইল,—যে যেখানে ছিল, সে সেখানেই আত্মরক্ষা করিতে লাগিল। এই সময় একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনায় নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ রক্ষা পাইলেন। নবাবের হস্তীর সম্মুখে পতাকা ও সাজসজ্জার বহনের জন্য দুইটি সুসজ্জিত হস্তী থাকিত। তাহাদের প্রত্যেকের দন্তে একটি একটি বৃহৎ শৃঙ্খল আবদ্ধ থাকিত। গমনকালে ঐ শৃঙ্খলের শব্দে তাহারা সানন্দে নবাবের হস্তীর অগ্রে অগ্রে যাইত। বর্গীগণ আক্রমণ করিলে, দুইটি হস্তী চতুর্দ্দিকে অপরিচিত জনতা দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া সবেগে সেই শৃঙ্খল ঘুরাইতে লাগিল। সেই শৃঙ্খলচালনার ফলে বিষম

আঘাত পাইয়া বহু শত্রুসেনা ভূপতিত হইল। নবাবের সেনা চতুর্দ্দিকে অগ্রসর হইবার অবকাশ পাইল। নবাবের সেনাগণ সমবেত হইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিলে মার্হাট্টাগণ পৃষ্ঠপ্রদর্শনকার্য্যে কালবিলম্ব করিল না।

এইরূপে, দারুণ দুর্দ্দশায় বহুবিধ বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া নবাবের সৈন্যগণ তিন দিনে কাটোয়ায় পঁহুছিল। পর্ব্বতের শিরোদেশ হইতে দূরে বারিবিস্তার দেখিয়া "দশসহস্র" বীর গ্রীকের গৃহাভিমুখগামী জীর্ণ শীর্ণ অবশিষ্ট কয় সহস্র সৈন্য যে আনন্দে উৎফুল্লচিত্তে "ঐ সমুদ্র! ঐ সমুদ্র!" বলিয়া আনন্দাশ্রুবিপ্লুত-নেত্রে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়াছিল, সেই আনন্দে নবাবের সৈন্যগণ কাটোয়ায় প্রবেশ করিল। বর্গীগণ ইতিপূর্ব্বেই কাটোয়ায় পঁহুছিয়া নগরলুণ্ঠন করিয়াছিল। তাহারা অগ্নিসংযোগে কাটোয়ার বিখ্যাত শস্যভাণ্ডার ভস্মীভূত করিয়াছিল। অনশননিপীড়িত মৃতকল্প বাঙ্গালা সৈন্য—সেই ভৃষ্ট তণ্ডুল অমৃতোপমের বোধে আহার করিয়া তৃপ্তি পাইল। বিপদের অবসান হইল।

পোষ্টমাষ্টার।

পোষ্টমাষ্টারের প্রথম পত্র।

কমল,

ডাক বন্ধ করিয়া, হিসাব পরীক্ষা সারিয়া, লোকজনদের বিদায় দিয়া উপরে গিয়া দেখিলাম,—তুমি নাই। ঝি বলিল,—তুমি কিছু না বলিয়া, গাড়ী ডাকাইয়া, ননীকে সঙ্গে লইয়া বাপের বাড়ী গিয়াছ। ইহার অর্থ কি? তুমি নহিলে এক বেলা সংসার চলে না; তাই তুমি এক দিন কোথাও গিয়া সুস্থির হইয়া থাকিতে পার না। তুমি যখন সব ফেলিয়া,—আমাকেও না বলিয়া বাপের বাড়ী গিয়াছ, তখন নিশ্চয়ই একটা গুরুতর ব্যাপার ঘটিয়াছে। কাহারও অসুখ করিয়াছে কি?

ননী এইমাত্র ফিরিয়া আসিল। সে বলিতেছে, তাহার মামার বাড়ী সকলেই ভাল আছেন। সে যে বোকা—হয় ত কি হইয়াছে, কিছুই বুঝে নাই। তুমি কখন আসিবে, সে কথাও কিছু তাহাকে বলিয়া দাও নাই; ইহার কারণ কি?

বড় দুশ্চিন্তায় পড়িয়াছি। কি হইয়াছে লিখিও। সকলের কুশল-সংবাদ দিয়া চিন্তা দূর করিও।

একটা পিয়ন মণিঅর্ডারের কিছু টাকা লইয়া পলাইয়াছে। সেই গোলমালে মন ভাল নাই, আবার সমস্ত হিসাব তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিয়া বড় শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি। তাই স্বয়ং যাইতে পারিলাম না। খবর লিখিয়া চিন্তা দূর করিও। ইতি—

তোমার

অবিনাশ।

কমলমণির প্রথম পত্র।

শ্রীচরণকমলেষু—

এখানে কাহারও অসুখ হয় নাই। আমারই সুখের দিন গিয়াছে। যত দিন আমাকে নহিলে তোমার চলিত না, তত দিন আমাকে নহিলে সংসার চলিত না,—সংসার নহিলে আমারও চলিত না। এখন আমি না হ'লেই তুমি ভাল থাক। তোমার ভালবাসার সঙ্গে সঙ্গে সংসারে আমার সব আকর্ষণ গিয়াছে। এখন আমারও আর সংসারে আবশ্যক নাই, সংসারেরও আর আমাকে আবশ্যক নাই। বাঙ্গালীর মেয়ে,—যে বৎসরে তিন জোড়া কাপড়, আর দুই বেলা দুই মুঠা ভাত পাইলেই পরম সুখে সংসারে পাঁচটা দাসীর অধিক খাটে,—সে কি কেবল পোড়া ভাত কাপড়ের জন্য? তাহা নহে। যত দিন সে স্বামীর ভালবাসা পায়, তত দিন স্বামীর সংসার তাহার আপনার,—সে আপনার সংসারে সাধ করিয়া সব করে,—শ্রমকে শ্রম জ্ঞান করে না। স্বামীর ভালবাসা অন্যে অর্পিত হইলে সে আর স্বামীর সংসারে কেহ নহে; তখন তাহার অপেক্ষা দাসীও অধিক সুখী।

যখন আমার কপাল ভাঙ্গিয়াছে, তখন আর কেন তোমার সংসারে গলগ্রহ হইয়া থাকিব? আমার সংসার চালান কি আর মনে ধরিবে? এখন যাহাকে ভালবাসিয়াছ, তাহাকে আন,—সংসার স্বর্গ হইবে। এখন তাহার সব ভাল; আমার সবই মন্দ। যে দিন আমার দোষও গুণ ছিল, এখন সে দিন গিয়াছে; এখন আমার সবই মন্দ।

যখন তোমার ভালবাসা গিয়াছে, তখন আমার তোমার কাছে থাকা তোমার পক্ষেও জ্বালা, আমার পক্ষেও কষ্ট। তাহাতে আর কাজ কি? আমি কেন তোমার সুখের অন্তরায় হইব? তুমি যাহাকে ভালবাসিয়াছ;—তাহাকে লইয়া সুখী হও। তুমি সুখী হইলেই আমার ভাল।

আমার আর কি! যত দিন পিতামাতা স্নেহ করিয়া দুই বেলা দুই মুঠা

ভাত দিবেন, তত দিন এখানেই থাকিব। যদি কখনও তাঁহারা দুই মুঠা দিতে কুণ্ঠিত হয়েন, তখন——অদৃষ্টে যাহা থাকে, তাহাই হইবে। অদৃষ্ট ছাড়া যখন পথ নাই, তখন আর ভাবিয়া কি করিব? ইতি—

হতভাগিনী

কমল।

পুনশ্চ—ননীকে একবার পাঠাইয়া দিও। একবার যেন আসে।

পোষ্টমাষ্টারের দ্বিতীয় পত্র।

কমল,

তোমার পত্র পাইলাম। যখন স্কুলে পড়ি, তখন লুকাইয়া লুকাইয়া বঙ্কিম বাবুর বহিগুলা (দোহাই তোমার—ধর্ম্ম নহে, কেবল উপন্যাসগুলা) পড়িয়াছিলাম। মনে আছে, একখানা উপন্যাসের নায়িকা স্বামীকে এমনই পত্র লিখিত। তাহার নাম ভুলিয়া গিয়াছি; সেই যে কল্পনারাজ্যের নূতন সৃষ্টি,—বঙ্কিমবাবুর দুঃসাহসের কাজ—উপন্যাসের কালো নায়িকা! কিন্তু আমাকে এরূপ পত্র লেখা কেবল বেণা-বনে মুক্তা-ছড়ান। জানই ত,—"নয়নবিহীন জনে কি হইবে দিলে দর্পণ?" উপন্যাসের নায়কের মত সরস প্রেমালাপ আমার কখন আসে না;—চাঁদের হাসি, পাখীর গান, ও সব ভালই লাগে না। সে ত তুমি জানই। তা' ছাড়া প্রাণে যেটুকু কবিতা ছিল, তা'ও পিয়ন তাড়াইতে আর হিসাব মিলাইতেই নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। আর—তোমার আমার এখন কি আর উপন্যাসের নায়ক নায়িকা সাজিবার বয়স আছে? তবে সহসা তোমার এ কি খেয়াল? এবার যে গরম! তুমি ত একেই রুক্ষ ধাতের লোক,—মাথা খারাপ হয় নি ত?

তোমার পত্রখানা পত্র, না প্রহেলিকা? তুমি লিখিয়াছ, আমি আর কাহাকে ভালবাসিয়াছি। ভাল। আমায় যদি প্রেমে পড়িতে হয়, তবে ত পোষ্টকার্ড খাম ছাড়া আর প্রণয়পাত্রীর সন্ধান পাই না। তা' সে সতীনের উপর এত রাগ কেন? সে ত আর আমার কাছে স্থির থাকে না! তাহার যে ডানা আছে; সে 'সেকালের ছয় মাসের পথ' এক দিনে যায়। আমার সঙ্গে বন্দোবস্ত কেবল টাকায় এক পয়সা "কমিশন।"—তাহাতে আবার ভয় কি?

রঙ্গ যাহা করিবার, তাহা ত যথেষ্ট করিলে। এখন আজই ফিরিয়া আসিও। এ দিকে বাড়ীতে রঙ্গের ফোয়ারা উঠিতেছে;—বিশৃঙ্খলার সীমা নাই;—কষ্টের অন্ত নাই। সময়ে স্নান, আহার কিছুই হইতেছে না। তাহার উপর আবার

ননী মুখে ভাত তুলিতেছে না। সে নড়ে চড়ে, আর বামুনঠাক্‌রুণকে বা ঝিকে জিজ্ঞাসা করে, "মা কখন আসিবেন?" বোধ করি, লুকাইয়া লুকাইয়া কাঁদে; নহিলে চোখ ফুলিয়াছে কেন? আজ আর তাহাকে স্কুলে যাইতে দিই নাই। এখন ভাবনা,—পাছে অসুখ করিয়া বসে।

যাহা হউক, এ যাত্রায় আমারই হার। আমি ত চিরদিন হারিয়াই আছি। তুমি আজই আসিও। তুমি আসিলে শুনিব ব্যাপারখানা কি।

তোমার

অবিনাশ।

কমলমণির দ্বিতীয় পত্র।

শ্রীচরণকমলেষু—

আমি সব জানিয়াছি। আমার কাছে আর লুকোচুরী কেন? আর ঢাকিবার চেষ্টা করা বৃথা। শাক দিয়া কি মাছ ঢাকা যায়? বিদ্রূপ করিয়া কি আর আমাকে ভুলাইতে পারিবে? যতই মূর্খ হই, যতই বোকা হই, ধানের ভাত খাই না, চালেরই খাই। পোড়া চক্ষুকে আর কেমন করিয়া অবিশ্বাস করিতে পারি? অবিশ্বাস করিবার উপায় থাকিলে আমি বিশ্বাস করিতাম না। কোনও স্ত্রীই ইচ্ছা করিয়া বিশ্বাস করে না যে, তাহার স্বামী অপরকে ভালবাসে,—তাহার কপাল ভাঙ্গিয়াছে।

কষ্ট যাহা পাইবার তাহা ত পাইতেছি। তাহার উপর আর বিদ্রূপ কেন? কাটা ঘায় আর নুণের ছিটা দিও না। এততেও কি সাধ মেটে নাই?

আমি ত বলিয়াছি,—এখন আমার সবই মন্দ। এখন আমি পত্র লিখিলেও তাহা উপন্যাসের কালো নায়িকার পত্রের মত হয়। তা' ভগবান যাহাকে যেমন করেন, সে যে তেমনই থাকে; সে যে আর নিজেকে বদলাইতে পারে না; কালো যে আর ধলো হয় না! যাহার যাহা আছে, তাহার যে আর তাহা ছাড়িবার উপায় নাই! এখন আর তোমার নূতন ভালবাসার কনক-কান্তি কোথায় পাইব? কেবল দুঃখ,—পোড়া যম কালো ধলো বুঝে না; ধলোগুলাকে রাখিয়া কেবল কালোগুলাকেই লয় না; বরং যাহার জ্বালা যত অধিক, তাহাকে তত অধিক দিন রাখিয়া জ্বালা বাড়ায়। যম কালো-গুলাকে লইলে তোমারও জ্বালা জুড়াইত, আমারও জ্বালা জুড়াইত। তা' হয় না কেন?

লোকে কথায় বলে,—"যাকে দেখ্‌তে নারি, তা'র চলন বাঁকা।"

এখন আমার উপর তোমার ভালবাসা গিয়াছে, এখন আমার কিছুই আর তোমার ভাল লাগিবে না। আমি যে কালো—এ কথা এ বার বৎসরে ইতিপূর্ব্বে ত কখনও তোমার মুখে শুনি নাই! এই ত দুঃখের আরম্ভ। জানি না, বাঁচিয়া থাকিলে কপালে আরও কত দুঃখ আছে! তাই বলি,—আমার মরণই ভাল।

আমি আর পত্র লিখিয়া তোমাকে বিরক্ত করিব না। তুমি যাহাকে ভালবাস, তাহাকে লইয়া সুখী হও।

তোমার কনকের দুইখানা পত্র আমি আনিয়াছিলাম। পত্র দুইখানা না পাইয়া কতই ভাবিয়াছ, কতই কষ্ট পাইয়াছ! আমিই সে কষ্টের কারণ। আমাকে ক্ষমা করিও। আমি আর সে পত্র রাখিয়া কি করিব? দেখিলে কেবলই মর্ম্মব্যথা। সে দুই খানা এই সঙ্গে ফিরাইয়া দিলাম।

আমার কপালে সুখ নাই; বৃথা আক্ষেপ করিয়া মরি কেন? আমার অদৃষ্টে যাহা ছিল, তাহাই হইল; সে জন্য আর তোমায় দোষ দিব না। ইতি—

অভাগিনী

কমল।

পুনশ্চ—ননীকে একবার পাঠাইয়া দিও। বাছা বড় শুকাইয়া যাইতেছে। বামুনঠাকুরুণকে বলিও, যেন তাহার খাবার বিষয়ে বিশেষ যত্ন করেন। গরম দুধ নহিলে সে খাইতে পারে না; আহারের সময় যেন দুধ গরম করিয়া দেন। তা'র আহারের সময় দুই বেলা যদি তুমি নিজে দেখিতে পার, তবে বড়ই ভাল হয়। ইতি।

কনকের প্রথম পত্র।

প্রিয়তম,

তুমি বলিয়াছিলে শনিবারে আসিবে। আমি সারাদিন তোমার আশায় পথ চাহিয়া বসিয়াছিলাম। তুমি আসিলে না কেন? ছি!—তোমরা বড় নিষ্ঠুর; নহিলে মন লইয়া তাহার প্রতিদানে কেহ কি কেবল যাতনা দিতে পারে? তোমরা আমাদের ভালবাস না; তাই কাজের ছুতা করিয়া কাছ হইতে চলিয়া যাও,—দূরে থাকিতেই ভালবাস, দূরে গেলেই ভাল থাক। তোমরা বড়, আমরা ছোট। তোমরা দয়া করিয়া কখন আমাদের একটু ভালবাস, আবার রাগ হইলেই পদাঘাত কর।—

"বড়র পিরীতি বালির বাঁধ,
ক্ষণে হাতে দড়ি, ক্ষণেকে চাঁদ।"

আমরা বিড়াল পুষি। যখন ভাল লাগে, তখন কাছে আসিলে আদর করিয়া গায়ে হাত বুলাইয়া দি, যখন ভাল না লাগে, তখন লাথি মারিয়া দূর করি। তেমনই আমরা যত ক্ষণ কাছে থাকি, তত ক্ষণ হয় ত তোমরা একটু আদর দাও, তাহার পর যাইবার সময় আমাদের প্রাণে যতই ব্যথা লাগুক না কেন, একবার চাহিয়াও দেখ না।

তোমার এতই কি কাজ যে, এ সাত দিনের একদিনও আসিতে পারিলে না? তোমার আর সব কাজই হয়, কেবল যে অভাগিনী তোমার আশায় পথ চাহিয়া থাকে, তাহাকে দেখিতে আসাই হইয়া উঠে না!

তুমি না আসিলে আমার বড় মন কেমন করে। এবার আসিও, আর বিলম্ব করিও না। আমরা সকলে ভাল আছি। ইতি

তোমারই

কনক।

মাথা খাও, আমার এ পত্র যেন কেহ দেখিতে না পায়।

কনকের দ্বিতীয় পত্র।

প্রিয়তম!

তোমার পত্র ও প্রেরিত পুস্তক পাইয়া যে কিরূপ আনন্দিত হইয়াছি, তাহা প্রকাশ করিতে পারি না। "মৃণালিনী"—আমি পূর্ব্বেই পড়িয়াছি, কিন্তু তুমি যখন দিয়াছ, তখন আবার পড়িব।

তুমি আমার পত্র পাও নাই কেন? আমি ত রবিবারেই তোমাকে পত্র লিখিয়াছি! তুমি কাগজে যে ঠিকানা লিখিয়া দিয়াছিলে, আমি খামে সেই ঠিকানাই লিখিয়া দিয়াছি। তবে তুমি পত্র পাইলে না কেন? পাইয়াছ কি না লিখিও।

তুমি লিখিয়াছ, বড় কাজ, তাই এ সপ্তাহেও বোধ হয় আসিতে পারিবে না। তোমাকে দেখিবার জন্য আমার মন এত ব্যাকুল হয়, আর আমাকে দেখিতে কি তোমার একটু ইচ্ছাও হয় না? তোমাদের হৃদয় কি সত্যই পাষাণ দিয়া নির্ম্মিত? ভগবান যদি আমাদেরও তোমাদের মনের মত কঠিন মন দিতেন, তবে আর কেবল তোমাদের পথ চাহিয়া এত কষ্ট সহিতে হইত না। বিধাতা কি কেবল যাতনা সহিবার জন্যই আমাদের সৃষ্টি করিয়াছিলেন? ইহার মধ্যেই যদি একবার আমাকে দেখিতে আসিতেও অনিচ্ছা হয়, তবে কেন অত ভালবাসিয়াছিলে?

একবার আসিও। তোমার কি কাজ, আমি জানি না; জানিয়াও কাজ নাই। তুমি না আসিলে আমার বড় কষ্ট হয়। আসিও।

আশা করি, তুমি ভাল আছ। আজ ইতি।

তোমারই

কনক।

পুনশ্চ—আমার পূর্ব্বের পত্র পাইয়াছ কি না লিখিও।

পোষ্টমাষ্টারের তৃতীয় পত্র।

কল্যাণীয়া,

তোমার পত্র পাইলাম। সেই সঙ্গে তুমি যে দুইখানা পত্র পাঠাইয়াছ, তাহাও পাইলাম। কিন্তু বুঝিলাম না, সে পত্র দুইখানা কাহার। পত্র কাহার? কে কাহাকে লিখিয়াছে? তুমি কোথায় পাইয়াছ? কনক কে?

পত্র দুইখানা কাহার, আমি জানি না। কোনও কনককে আমি চিনি না। কিন্তু সে কথা বলিয়া ফল নাই; কেন না, তুমি আমার কথায় বিশ্বাস করিবে না। তুমি আমার চরিত্রে সন্দেহ করিয়াছ। কোনও পুরুষ এ কথা বলিলে আমি যাহা করিতাম, তাহা—তুমি স্ত্রীলোক—আমার স্ত্রী,—তোমাকে বলিয়া আর কি হইবে? কিন্তু তুমি আমার পত্নী হইয়া, এতদিন আমাকে দেখিয়া,—জানিয়া, এ কথা বলিয়াছ বলিয়া হৃদয়ে যেরূপ বেদনা পাইয়াছি, সেরূপ বেদনা আর কিছুতেই পাই নাই। সে কথাতেও আর কাজ নাই।

তুমি লিখিয়াছ,—ননী শুকাইয়া যাইতেছে। বামুনঠাকরুণ যেন তাহার খাবার বিষয়ে বিশেষ যত্ন করেন। তোমার এমনই মতিভ্রম ঘটিয়াছে বটে! যে ছেলে মার জন্য কাঁদিয়া শুকাইতেছে—দাস দাসী আহারের যত্ন করিলেই সে সারিবে! যাহা হউক, যখন আমাদের মায়া কাটাইয়াছ,—আমাদের ত্যাগ করিয়াছ, তখন আর সে কথা ভাব কেন? বৃথা আর উপদেশ দিয়া কি হইবে? আমি যেমন বুঝি,—যেমন করিয়া পারি, তাহাকে মানুষ করিব।

এখন আমি, রহস্য করিলেও তাহার কদর্থ বাহির হয়। তুমি যখন কালো নহ, তখন উপন্যাসের কালো নায়িকার কথাটা আপনার ঘাড়ে না লইলেই কি হইত না? এখন আমার সকল কথাই তুমি বাঁকা ভাবে বুঝিতেছ।

ব্যাপার কি, তাহা বুঝিলাম না। আমাকে জিজ্ঞাসা করাই তোমার কর্ত্তব্য ছিল; অন্ততঃ সব খুলিয়া লিখিলেও পারিতে। তুমি সে দুইয়ের

তোমার পক্ষে কষ্টকর, তাই পিত্রালয়ে গিয়াছ,—সেখানে সুখে থাকিবে। তুমি যখন তাহাই ভাবিয়াছ, তখন আমার আদর যত্নে আর কাজ নাই; তুমি পিত্রালয়ে সুখে থাক। তবে আজ এইটুকু বলিয়া রাখি,—তুমি আমার প্রতি যে অন্যায় ব্যবহার করিলে, তাহার জন্য একদিন তোমাকে লজ্জিত,—দুঃখিত হইতে হইবে, একদিন তুমি তোমার ভ্রম বুঝিবে; একদিন তুমি অনুতপ্ত হইবে।

তুমি লিখিয়াছ, তোমার অদৃষ্টে সুখ নাই। আমি রাজা বা মহারাজা নহি; তোমাকে সুদৃশ্য পুতুলের মত সযত্নে আর দশটা পুতুলের সঙ্গে আল্‌মারীতে তুলিয়া রাখিতে পারি নাই; কেবল দরিদ্রের যাহা সম্বল, সেই আন্তরিক ভালবাসাই তোমাকে দিয়াছি। মার্জ্জারের মৎস্যলাভবাসনা যেমন প্রবল, অঙ্গনার অলঙ্কারলাভলালসা তেমনই প্রবল। আমি দরিদ্র—তোমাকে অধিক অলঙ্কার দিতে পারি নাই,কেবল বৎসরে তিন জোড়া কাপড় আর দুই বেলা দুই মুঠা ভাত দিয়াছি, সত্য। কিন্তু কই, এ বার বৎসরে তোমাকে ত কখনও সে জন্য কোন কথা কহিতে শুনি নাই,—কখনও সে জন্য তোমায় বিমর্ষ দেখি নাই! তাই আমি ভাবিতাম, বুঝি তুমি সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম,—আমার সৌভগ্যের ফল। যাহা হউক,—এইটুকু মনে রাখিও, জগতে সব মেয়েই যদি রাজরাণী হইতে পণ করিয়া বসে, তবে অত রাজা মিলিবে কোথায়? জগতের কাজের জন্য যখন কতকগুলি গরীব পোষ্ট-মাষ্টারের আবশ্যক, তখন জগতে কতকগুলি গরীব পোষ্টমাষ্টারও থাকিবে—আর তাহাদের স্ত্রীও থাকিবে। আরও ভাবিয়া দেখিও,—জগতে এমন অনেক অভাগিনী আছে, যাহারা তোমাকে সৌভাগ্যশালিনী বলিয়া বিবেচনা করিতে পারে।

তোমার একখানা পত্র আসিয়াছে; পাঠাইয়া দিলাম। ইতি।

তোমার চিরশুভার্থী
শ্রীঅবিনাশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

কমলমণির তৃতীয় পত্র।

শ্রীচরণকমলেষু,

তোমার পত্র পাইয়াছি। তুমি আমার উপর রাগ করিয়াছ। করিবারই কথা। আমি যে দোষ করিয়াছি, তাহাতে তোমার কাছে আর এ পোড়ার মুখ দেখাইতে লজ্জা করিতেছে। তুমি আমার সহস্র অপরাধ ক্ষমা করিয়াছ,

এবার ক্ষমা কর,—চরণে স্থান দাও। আমি আপনার দোষে আপনি আপনার সর্ব্বনাশ করিয়াছি। এখন তুমি ক্ষমা না করিলে আর উপায় কি? তোমার পায়ে পড়ি, এ কথা আর মনে করিও না,—এ কথা লইয়া আমাকে আর লজ্জা দিও না।

আমি যে দিন না বুঝিয়া এখানে আসি, সে দিন তুমি আফিসের বাক্সটায় চাবি লাগাইয়া উপরে রাখিয়া নিম্নতলে আফিসঘরে গিয়াছিলে। আমি বাক্সটা খুলিয়া উপরেই দুইখানা খামে আঁটা পত্র দেখিতে পাই। খামের উপর ভায়োলেট কালিতে কাঁচা হাতে তোমার নামের তিন অংশের ইংরাজী আদ্যক্ষর (এ. সি. সি.) লেখা! আমার কৌতূহল হইল! সেই পাপ কৌতূহলবশে আমি চিঠি দুইখানা খুলিলাম। তাহার পরেই এই সর্ব্বনাশ করিয়াছি। সে দুইখানা তোমাকে পাঠাইয়া দিয়াছি। আমি ভাবিয়াছিলাম, সে পত্র তোমাকেই কেহ লিখিয়াছে। আবার কয় দিন হইল, আমার "মৃণালিনী"খানা খুঁজিয়া পাইতেছিলাম না।

সত্যই আমার মাথা খারাপ হইয়াছে। নহিলে আমি কেন তোমাকে সন্দেহ করিব; কেন একবার তোমাকে সে কথা জিজ্ঞাসাও করিলাম না?

তুমি যে পত্রখানা পাঠাইয়াছ, সেখানা অতুলের লেখা। সেই পত্র পড়িয়া আমি আমার ভ্রম বুঝিয়াছি। এখন লজ্জায় মরিতেছি। সে পত্রখানা পাঠাইলাম, পড়িলেই সব বুঝিবে। এখন কি করা কর্ত্তব্য—ভাবিয়া স্থির কর।

"রয়েল রিডার নম্বর থ্রি" অবধি পড়িয়া আমার মনে গর্ব্ব ছিল, আমি ইংরাজীতে উতোর হইয়াছি। আজ বুঝিয়াছি, আমি খানার জল সমুদ্র ভাবিয়াছিলাম। ও ছাই দু'পাতা ইংরাজী না জানিলে, আজ আর এ অনর্থ ঘটিত না। ননী পুরুষ মানুষ, তাহাকে যাহা খুসী পড়াইও; খুকীকে কিন্তু আমি লেখাপড়া শিখিতে দিব না। সে সংসারের কাজ শিখিবে,—সেই ভাল, সংসারও ভাল চলিবে, অল্পবিদ্যার এ গোলযোগ ঘটিবে না।

আমি যে অপরাধ করিয়াছি, তাহাতে তুমি আমার উপর রাগ করিয়াছ। আমি কি বলিয়া ক্ষমা চাহিব! কিন্তু—তুমি কি আমায় ক্ষমা করিবে না?

তুমি আজই আসিয়া আমায় লইয়া যাইও। বুদ্ধির দোষে আপনিও কষ্ট পাইলাম, তোমাকেও কষ্ট দিলাম। আর, এ কয় দিনে সংসারের যে অবস্থা হইয়াছে, তাহা ত বুঝিতেই পারিতেছি। ইতি

তোমার

পুনঃ—তুমি যদি আজ আসিয়া আমায় লইয়া যাও, তবে বুঝিব, তুমি আমায় ক্ষমা করিয়াছ। ইতি

অতুলচন্দ্রের পত্র।

শ্রীচরণকমলেষু,

দিদি, অনেকদিন তোমার কোন পত্র পাই নাই; অনেক দিন তোমাকে কোন পত্র লিখি নাই। যখন বাবার সঙ্গে ঝগড়া করিয়া বাড়ী ছাড়িয়া আসিয়াছি, তখন তোমরা কি আর আমার সঙ্গে সম্বন্ধ স্বীকার করিবে?

যাহা লইয়া বাবার সঙ্গে ঝগড়া, আমি সে পাপ চুকাইয়াছি,—দমদমায় বিবাহ করিয়াছি। বাঙ্গালীর ছেলের বিবাহে পাত্রীর অভাব হয় না, তা পাত্রের কিছু থাকুক আর নাই থাকুক। আমি এখন কাজের চেষ্টায় ফিরিতেছি; এখনও কিছু করিতে পারি নাই। তবে এ কথা নিশ্চয় জানিও যে, অন্নের জন্য কখনও বাবার দ্বারস্থ হইব না। যেমন করিয়াই হউক চলিবে। জগতে এত লোকের যদি চলে, তবে আমাদের দুজনেরও চলিবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, দোষ আমার নহে; দোষ বাবার।

আমি কখন কোথায় থাকি, কিছুই স্থির নাই। সেই জন্য কনককে (আমার স্ত্রী) তোমাদের পোষ্টআফিসের ঠিকানায় আমাকে পত্র লিখিতে বলিয়া আসিয়াছিলাম। পত্রে আমার নামের তিন অংশের ইংরাজী আদ্যক্ষর—"এ. সি. সি." ও "কেয়ার অব পোষ্টমাষ্টার" লেখা আছে। ভাবিয়াছিলাম, অবসরমত যাইয়া অবিনাশবাবুর নিকট হইতে পত্র লইয়া আসিব। কিন্তু তাহা উচিত কি না, বুঝিতে পারিতেছি না; কারণ, বাবাই যখন ত্যাগ করিয়াছেন, তখন তোমরা কি আর আমার তোমাদের বাড়ী যাওয়া পছন্দ করিবে?

তুমি দয়া করিয়া একটা কাজ করিও। অবিনাশবাবুকে বলিও, যদি আমার পত্র আসিয়া থাকে, তবে তিনি যেন তাহা আমার এই ঠিকানায় পাঠাইয়া দেন।

তুমি আমার প্রণাম জানিও। অবিনাশবাবুকে আমার নমস্কার দিও।

আশা করি, ছেলে মেয়েরা ভাল আছে। ইতি

প্রণত

শ্রীঅতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

পোষ্টমাষ্টারের শেষ পত্র।

কমল,

তোমার পত্র পাইলাম। অতুলের পত্রও দেখিলাম। এখন বুঝিলে, দোষ তোমার কি আমার?

অতুলের ও আমার উভয়েরই নামের তিন অংশের ইংরাজী আদ্যাক্ষর এক—তাহাতেই এত বিপদ। এ বিপদের আশঙ্কা জানিলে না হয় নামটা বদ্‌লাইয়া ফেলিতাম—বল ত এ বুড়া বয়সে নাম বদলাইয়া পাকা গুটি কাঁচাইয়া বসি।

আমি তখনই জানি, তুমি একটা বিষম ভ্রম করিয়াছ। তোমাদের বুদ্ধি অপরিপক্ক—তাই তোমরা এমন ভ্রম কর; আমরা সামলাইয়া না লইলেই সর্ব্বনাশ। তাই ত বলে—"স্ত্রীবুদ্ধিঃ প্রলয়ঙ্করী।" তবে, স্ত্রীলোকের বুদ্ধি পুরুষের বুদ্ধির মত হইলে একটা সুবিধা হইত; এখন কেবল আমরাই খাটিয়া আনি,—তোমরা খাও, তখন আবশ্যক হইলে তোমরাও খাটিয়া আনিতে পারিতে। কিন্তু তাহা হইলে কি আর গর্ব্বে তোমাদের মাটিতে পা পড়িত? তোমরা কি আর আমাদের দিকে চাহিতে? এখনই এত—তাহা হইলে আমাদের সংসার ছাড়িয়া বনে পলাইতে হইত।

এই যে মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া এত কষ্টের চাকরী করি, সে কেবল আপনার পেটের দায়ে নহে। একটা পেট ভিক্ষা করিয়াও চলে। তোমাদের জন্য, আর তোমাদের ছেলেমেয়েদের জন্যই আমাদের যত ভাবনা। তাই এত শ্রম। তোমরা সেইটুকুই বুঝ না। দোষ না বুঝিয়াই রাগ কর;—মিছামিছি আমাদেরও যাতনা দাও, আপনারাও যাতনা পাও। ইহাতেই তোমাদের বুদ্ধির পরিচয়। এত বুদ্ধি নহিলে আর তোমাদের বার হাত কাপড়ে কাছা নাই! তোমাদের এক দিকে বজ্র বাঁধন, আর এক দিকে ফস্কা গেরো। তাই ত শাস্ত্রে বলে, তোমরা আমাদের ছাড়াইয়া যাইবার চেষ্টা করিও না, অধীনে থাকিও। আমরা খাটিয়া আনি,—তোমরা খাও, আর আদর চাও। মান অভিমান সহ্য করিতেও আমরা। তবে ভুলিয়া যাও কেন যে, মানুষের সহিষ্ণুতার একটা সীমা আছে? অধিক কচলাইলে যে লেবু তিক্ত হইয়া উঠে! এখন ঠেকিয়া শিখিয়াছ,—আশা করি আর ভুলিবে না।

কোন্দল করাটা তোমাদের স্বভাব। তোমাদের একটা 'কুঁদুলে নাড়ী'

লোক না পাইলে বেণাবনে চুল বাধাইয়া ঝগড়া কর। প্রবাদটা কি একেবারেই মিথ্যা ?

দেখ, একটি স্ত্রী লইয়াই মাঝে মাঝে এই বিপদ। আর তুমি নিশ্চিন্তচিত্তে আমার স্কন্ধে আর একটি পত্নী চাপাইতেছিলে! কি সর্ব্বনাশ! অতুল বেচারা যদি শুনে যে, তুমি তাহার সাগর-ছেঁচা মাণিক অবহেলে আমাকে দিতেছিলে, তবে সে কি মনে করিবে ?

পরের চিঠি খোলা বড় নীচ কাজ, আর সে কাজটা মেয়েদের ও মেয়েমুখো পুরুষদের একচেটিয়া। এ কুকর্ম্ম আর কখনও করিও না। মন্দের ভাল এই যে, পত্র দুইখানা অতুলের। তাহাকে বুঝান যাইবে;—সে আর কিছু করিবে না। নহিলে এই পত্র খোলার অপরাধে আমার চাকরীটি যাইতে পারিত। তাহা হইলেই ষোল কলা পূর্ণ হইত।

সুখের বিষয় এই যে, একখানা ভীতিপ্রদ করুণরসপূর্ণ নাটক অভিনয়ে প্রহসন হইয়া গিয়াছে। ভ্রমের মেঘখানা ত হাসির বাতাসে উড়িয়া গেল, এখন দেখ, যদি সুখের উজ্জ্বল কিরণ জ্বালাইতে পার ;—যদি তোমার পিতাকে ও অতুলকে আনিয়া উভয়ের মনোমালিন্য দূর করিয়া দিতে পার।

তাহা হউক আর নাই হউক, তুমি এখানে আসিয়া ভালরূপ আহারের আয়োজন করিয়া অতুলকে আনাও। তাহার প্রেমপত্রগুলা ত দেখিলে, এখন তাহাকে ভাল করিয়া খাওয়াইয়া ঠাণ্ডা করিয়া সব বুঝাইয়া বল, যেন সে রাগ না করে।

আমি আজ তোমাকে আনিতে যাইতে পারিব না। ইন্‌সপেক্টার আজ আফিস দেখিতে আসিবে। তুমি ওখান হইতে কাহাকেও সঙ্গে লইয়া আসিও।

খুকীকে পড়াইব বলিয়া ইংরাজী বহি কিনিয়া রাখিয়াছি। ইতি

তোমার

অবিনাশ।

বিদেশী গল্প।

আত্মদান।

দীর্ঘকালব্যাপী নানা যুদ্ধবিগ্রহের অবসানে জগৎজয়ী রোমের সপ্তশৈলে বিজয়-শ্রী বিরাজ করিতেছে। রোম সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র যুদ্ধের ভেরীনিনাদ সুপ্ত—শান্তির মধুর মুরলীধ্বনি ধ্বনিত। বলবীর্য্যসম্পন্ন রোমকগণ এখন শিল্প ও বিদ্যাচর্চ্চায় মন দিয়াছে। রোম নগরী সুবৃহৎ সৌধে ও অম্বরচুম্বী দেবমন্দিরে সুশোভিত। রোমের সর্ব্বপ্রধান পাহাড় "ক্যাপিটোলাইন হিলের" (Capitoline Hill) মধ্যস্থলে প্রখ্যাতনামা রোমান ফোরম (Forum) অবস্থিত। যুদ্ধকালে ফোরম সর্ব্বদাই অশ্বের হ্রেষারবে, সেনাগণের জয়-ধ্বনিতে ও সাধারণ জনগণের কোলাহলে পূর্ণ থাকিত। এখন ফোরম প্রায়ই জনশূন্য,—নিস্তব্ধ থাকে।

একদিন অপরাহ্ণে সহসা ফোরম জনাকীর্ণ হইয়া উঠিল। নগরবাসীরা সেখানে আসিয়া একত্রিত হইল ও ভয়চকিত ব্যগ্রভাবে পরস্পরের সহিত কথা কহিতে লাগিল। ফোরমের মধ্যস্থলে মৃত্তিকা ফাটিয়া গভীর, অন্ধকার গহ্বর দেখা দিয়াছে ;—গহ্বর ক্রমেই প্রশস্ত হইতেছে—যেন কোন ক্ষুধার্ত্ত দানব বিকট বদন ব্যাদান করিয়া সৌন্দর্য্যগর্ব্বিতা রোম নগরীকে গ্রাস করিতে উদ্যত! রোমের প্রধান শাসনকর্ত্তা ও পণ্ডিতগণ উদ্বিগ্নচিত্তে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহাদের মধ্যে এক জন বৃদ্ধ পণ্ডিত গণনা করিবার জন্য ধীরে ধীরে দেবমন্দিরাভিমুখে গমন করিলেন। রোমকগণ তাঁহাকে দেবতার মত ভক্তি করে। তাঁহার উন্নত দেহ, সুগঠিত আনন, শ্বেত কেশ ও শ্বেত শ্মশ্রু দেখিলে তাঁহাকে সংসারবিরাগী মহাপুরুষ বলিয়াই বোধ হয়।

সহসা গভীর মেঘগর্জ্জন শ্রুত হইল ও পূর্ব্ব দিকে এক ঝাঁক পাখী উড়িয়া-গেল। এই দুইটি অশুভসূচক ঘটনায় রোমকগণ আরও ভীত হইল। বৃদ্ধ পুরোহিত ধীরে ধীরে মন্দিরের ছাতে উঠিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া নীরব গণনায় মগ্ন হইলেন। নিম্নে ভীত ব্যাকুল জনতা অপেক্ষা করিতে লাগিল।

গণনা শেষ হইলে পুরোহিত মন্দিরের ছাত হইতে নামিয়া সমবেত রোমক-দিগের নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাহাদিগকে স্থির হইতে ইঙ্গিত করিয়া তিনি গম্ভীরস্বরে বলিলেন,—"রোমকগণ, আজ আমাদের বড় বিপদ উপস্থিত; দেবতাগণ অপ্রসন্ন,—দেবরোষের চিহ্নস্বরূপ ঐ গভীর গহ্বর রাক্ষসের মত রোম নগরী গ্রাস করিতে উদ্যত। কিন্তু ভীত হইও না; এখনও আশা আছে। আমি গণনায় জানিয়াছি, দেবকুল বলি চাহিতেছেন। মনোমত বলি পাইলে গহ্বর মুখ বন্ধ হইবে—দ্বিধাবিভক্ত ভূমিতল পূর্ব্ববৎ হইবে। কিন্তু এ বিষম বিপদে সাধারণ বলিতে কিছু হইবে না। দেবগণ কি বলি চাহিতেছেন, জানিতে পারি নাই। তোমরা যে বলি উপযুক্ত মনে কর,—শীঘ্র স্থির করিয়া সেই বলি দান কর। দেবগণ তুষ্ট হইলে বলি গ্রহণ করিবেন। রোমকগণ, যে জননী জন্মভূমির কৃপায় আজ তোমরা শৌর্য্য বীর্য্য ও ঐশ্বর্য্যগর্ব্বে গর্ব্বিত, সেই জন্মভূমির জন্য তোমরা কি সর্ব্বস্ব দিতে প্রস্তুত নহ? রোমের সুসন্তানগণ, আজ রোমকে রক্ষা কর।"

পুরোহিত নিরস্ত হইলেন। রোমের প্রধান শাসনকর্ত্তা, পণ্ডিতগণ ও সম্ভ্রান্ত নগরবাসিগণ এই অদ্ভুত বলিদানের বলি স্থির করিবার জন্য পরামর্শ করিতে লাগিলেন।

পরামর্শ স্থির হইলে তাঁহারা জনগণকে সে কথা জানাইলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে সেই জনতা ফোরম শূন্য করিয়া চলিয়া গেল। ফোরম আবার জনহীন—শুব্ধ হইল; আর সেই বিকট স্তব্ধতার মধ্যে সেই অন্ধকার গহ্বর যেন তাহার উন্মুক্ত মুখবিবরে বলি চাহিতে লাগিল।

অল্পক্ষণমধ্যেই আবার প্রত্যাবৃত্ত জনস্রোত ফোরম পূর্ণ করিল। রোমকগণ সেই গহ্বরে তাহাদের ধনরত্নরাজি অর্পণ করিবে স্থির করিয়া সেই সকল আনিয়াছিল। গহ্বরপার্শ্বে রৌপ্য, স্বর্ণ, মুক্তা, হীরক স্তূপাকারে সজ্জিত হইল। কয় জন সম্ভ্রান্ত যুবক গম্ভীরস্বরে মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে অতুল ঐশ্বর্য্যশালী রোমের ঐশ্বর্য্যরাশি সেই গহ্বরে নিক্ষেপ করিলেন। অন্ধকার গহ্বরে উজ্জ্বল স্বর্ণ ও হীরকাদির বৃষ্টি হইতে লাগিল। সেই ধনরত্ন-রাশি অস্তগমনোন্মুখতপনকরে—অপূর্ব্ব জ্যোতিশ্ছটায় চতুর্দ্দিক উদ্ভাষিত করিয়া অন্ধকার অতলে অদৃশ্য হইল। গহ্বরতলে শব্দ নাই! গহ্বর কি অতলস্পর্শ!

হইল। বৃদ্ধ পুরোহিত আবার বলিলেন,—"রোমকগণ, ধরণীর ধাতু প্রভৃতির অপেক্ষা—মানবের শ্রম, কৌশল ও চিন্তার ফল অধিক মূল্যবান। হয় ত তাহা দেবগণের প্রীতিপ্রদ হইবে। তোমরা তাহাই আনয়ন কর।"

রোমকগণ আবার নগরে গেল ও অবিলম্বে "বলি" সংগ্রহ করিয়া আনিল। কেহ মনোহর চিত্র, কেহ আশ্চর্য্য শিল্পকৌশলের নিদর্শন প্রস্তরমূর্ত্তি, কেহ বহুদিনের চিন্তার ফল গ্রন্থ—যাহার যাহা ছিল—তাহা আনিয়া গহ্বরে নিক্ষেপ করিল। কত বৎসরের শ্রম ও চিন্তার ফল দেখিতে দেখিতে সেই গহ্বরমধ্যে অদৃশ্য হইল! প্রাচীন রোমের শিল্পকৌশলের ও বিদ্যার আর চিহ্নমাত্র রহিল না। তথাপি সেই গহ্বরমুখ বন্ধ হইল না। রোমকগণ ভীতিবিহ্বল ও হতবুদ্ধি হইল।

তখন সেই গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া আবার বৃদ্ধ পুরোহিতের গম্ভীর কণ্ঠস্বর শ্রুত হইল,—"রোমকগণ, তোমাদের রমণীরা রোমরক্ষাকল্পে কিছুই করেন নাই। রমণী-হৃদয়ের ভক্তি ও বিশ্বাসের উপহার দেবতাদিগের গ্রাহ্য হইতে পারে। রোমক রমণীগণ, জন্মভূমির রক্ষার জন্য অগ্রসর হও।" রমণীগণ অগ্রসর হইয়া আপনাদের মণিমুক্তাখচিত বহুমূল্য অলঙ্কাররাশি উন্মোচিত করিয়া প্রফুল্লচিত্তে সেই গহ্বরমধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। তথাপি গহ্বরমুখ বন্ধ হইল না।

বৃদ্ধ পুরোহিত আবার বলিতে লাগিলেন,—"রোমকগণ, দেবকুল তোমাদের প্রদত্ত কোন বস্তুই গ্রহণ করিলেন না। ধন ও অলঙ্কারলাভ সকল মানবের ভাগ্যে ঘটে না। তোমরা মানব-জীবনের বিশেষ উপকারী কোন বস্তু প্রদান কর। রোমের সঞ্চিত শস্যরাশি আনিয়া গহ্বরে অর্পণ কর। শস্যই প্রকৃত সম্পদ—তাহার নিকট মণিমুক্তা তুচ্ছ। শস্যই মানবের সুখ ও স্বাস্থ্যের সহায়। অন্ধকারমৃত্তিকাতলস্থ ধাতু বা মণির অপেক্ষা আলোকে ও বায়ুতে বর্দ্ধিত শস্যরাশি বহুমূল্য। গহ্বরে তাহাই নিক্ষেপ করিয়া দেখ।"

রোমকগণ রাশি রাশি শস্য আনিয়া গহ্বরপার্শ্বে স্তূপাকারে স্থাপন করিল ও নবোৎসাহপূর্ণহৃদয়ে সেই শস্যরাশি গহ্বরে অর্পণ করিল। মৃদু খস্‌খস্‌ শব্দে শস্যরাশি গহ্বরে অদৃশ্য হইয়া গেল। কিন্তু হায়,—গহ্বরমুখ বন্ধ হইল না! সেই সময়ে ভীত রোমকগণের মধ্য হইতে নিরাশার কাতর ধ্বনি উত্থিত হইল।

[illegible] বলিলেন,—"রোমকগণ, দেবকুল পার্থিব

সম্পদ গ্রহণ করিতেছেন না। যাহাতে লোকের ক্ষমতা, গৌরব ও সম্মানলাভ হয়, তাহাই প্রদান করিয়া দেখ। রোমক বীরগণ, যাহার দ্বারা তোমরা এই গৌরব, ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য্য পাইয়াছ, তাহা গহ্বরে নিক্ষেপ কর।"

রোমক যোদ্ধ্‌গণ যুদ্ধসাজে সজ্জিত হইয়া শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইল। রণপতাকা উড়িতে লাগিল; রণভেরীর উৎসাহোদ্দীপক রব শ্রুত হইল—সেই শব্দের তালে তালে পা ফেলিয়া সৈনিকগণ অগ্রসর হইল। তাহাদের নয়নে উৎসাহ ও স্বদেশানুরাগ বিভাষিত। তাহারা বীরদর্পে—দৃঢ়করে অস্ত্ররাশি উত্তোলিত করিল। সহস্র অসির ঝনৎকার শ্রুত হইল, রণভেরীর গভীরনাদ ধ্বনিত হইল, সহস্রকণ্ঠে জয়ধ্বনি উঠিল—"জয়—রোমের জয়!" অস্ত্রের ঝন্‌ঝনায় ও যোদ্ধ্‌গণের জয়ধ্বনিতে গগন পূর্ণ হইল। পরমুহূর্ত্তেই অস্ত্ররাশি গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হইল। রোম অস্ত্রহীন হইল।

কিন্তু হায়, সেই দুর্ভেদ্য অন্ধকারময় গভীর গহ্বর আরও চাহিতেছে! যোদ্ধৃদল হইতে বিরক্তির অর্দ্ধস্ফুট রব উঠিল। তাহারা হতাশ হইয়া সে স্থান হইতে চলিয়া গেল। বৃদ্ধ পুরোহিত সেই প্রশস্ত গহ্বরের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"রোমকগণ, তোমাদের আহুতি মানবের নিকট মূল্যবান ও প্রশংসনীয়; কিন্তু সে আহুতি অহঙ্কারের সহিত প্রদত্ত হইয়াছে। তদপেক্ষাও কোনও পবিত্র 'বলি' দান কর।"

বৃদ্ধ পুরোহিত সমবেত জনতার দিকে চাহিলেন। সকলের মুখেই দৃঢ় সঙ্কল্প, অদম্য সাহস ও প্রগাঢ় দেশানুরাগ পরিস্ফুট।

সহসা সকলের নয়নে বিস্ময় বিভাবিত হইয়া উঠিল। সকলে কৌতূহলপূর্ণনেত্রে ভেষ্টা (Vesta) মন্দিরের দিকে চাহিল। মন্দিরমধ্য হইতে বহির্গত হইয়া এক অনিন্দ্যসুন্দরী যুবতী সেই জনতার মধ্য দিয়া গহ্বরের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। তাঁহার পশ্চাতে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বহু রোমকরমণী আসিতেছেন। সকলেরই পরিধানে শুভ্র বেশ; শুভ্র ললাট শুভ্র কুসুমদামে সজ্জিত; নয়নে ভক্তি, উৎসাহ ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞার ভাব দেদীপ্যমান। সকলেরই হস্তে কুসুমমাল্য ও অঙ্গুরীয়। যিনি অগ্রগামিনী, তিনিই রূপলাবণ্যে গরীয়সী। তাঁহার আননে তেজোদীপ্তি—অশ্রুপূর্ণ নয়নে ভক্তিভাব। মার্সিয়া রোমের উচ্চকুলসম্ভূতা,—কুমারী। তিনি কুর্সিয়াস নামক এক জন সম্ভ্রান্তবংশীয় যুবকের বাগ্‌দত্তা প্রণয়িনী। আজ তিনি দেশহিতের জন্য চিরকৌমার্য্যব্রত অবলম্বন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া স্বহস্তে প্রণয়ীর প্রেমনিদর্শন ও উপহার গহ্বরে

নিক্ষেপ করিতে আসিয়াছেন। জন্মভূমির হিতকল্পে আজ যুবতী যৌবনের পবিত্র প্রেমপিপাসা, বিবাহিত জীবনের অতুলনীয় সুখ, মাতৃস্নেহের স্বর্গীয় আনন্দ, সকলই বিসর্জ্জন দিয়া, চিরকৌমার্য্যের কঠোর, প্রেমহীন,—সুখহীন জীবন যাপন করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। অসংখ্য রোমকজনতা মুগ্ধনেত্রে আত্মহারা হইয়া সেই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিতে লাগিল।

কুমারীগণ অবনতমস্তকে ধীরে ধীরে গহ্বরের কূলে উপনীত হইলেন, এবং অতি মধুর মৃদুস্বরে ব্রতমন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে প্রণয়নিদর্শনগুলি গহ্বরে নিক্ষেপ করিলেন। পশ্চিম দিকে বজ্রনাদ শ্রুত হইল, গহ্বরমুখ কিঞ্চিৎ কম্পিত হইল। সহস্রকণ্ঠে আনন্দধ্বনি উঠিল—বুঝি গহ্বর বন্ধ হইল!

বৃথা আশা। ক্ষুধিত দানবের মত গভীর গহ্বর তখনও বলি চাহিতেছে।

এইবার বৃদ্ধ পুরোহিত স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। জনতা স্থির। চারি দিকে স্তব্ধতা ভীষণ। সেই ভীষণ স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া সহসা কে বলিয়া উঠিল,—"মাতৃস্নেহের মত পবিত্র আর কিছুই নাই। মানব-হৃদয়ের সকল ভাবই সময়ের ও অবস্থার পরিবর্ত্তনে পরিবর্ত্তিত হয়—কিন্তু মাতৃস্নেহ চিরস্থায়ী—অপরিবর্ত্তনীয়। রোমক জননীগণ, জন্মভূমির রক্ষা হেতু তোমাদের শিশু-সন্তানদিগকে গহ্বরে নিক্ষেপ কর।"

সহসা এই ভীষণ কথা শুনিয়া রোমকগণ স্তম্ভিত হইয়া রহিল। কিন্তু তখনও সেই ক্ষুধিত গহ্বর বদনব্যাদান করিয়া আছে। ভীত, হতবুদ্ধি রোমকগণ ক্রমে সেই পৈশাচিক বলির কথা বলাবলি করিতে লাগিল। সেই নিষ্ঠুর প্রস্তাব শুনিয়া রোমক রমণীগণ যেন জ্ঞানশূন্য হইলেন। কি দোষে দেহের শোণিতে পুষ্ট,—প্রাণপ্রিয়,—নিষ্পাপ শিশুদিগকে সেই গভীর গহ্বরে নিক্ষেপ করিতে হইবে? কি পাপের জন্য নিষ্ঠুর কঠোর করে জীবন-মৃণালের বিকাশোন্মুখ বিসপ্রসূনচয় ছিন্ন করিতে হইবে? জননীগণ দৃঢ়করে শিশুদিগকে বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন; তাঁহাদের বিলাপে চারি দিক পূর্ণ হইল। কিন্তু ভীতি-তাড়নায় জগৎজয়ী রোমক বীরগণ উন্মত্তবৎ হইয়া—স্নেহ, মমতা, দয়া, ভালবাসা সকলই বিস্মৃত হইয়া রক্তপিপাসু পিশাচের মত শিশুদিগকে বলে মাতৃক্রোড়চ্যুত করিতে উদ্যত হইল। তেমন ভীষণ, তেমন বীভৎস, তেমন করুণ দৃশ্য পূর্ব্বে কেহ কখনও রোমে দেখে নাই। কি পাপে রোমের এই

সহসা দূরে অশ্বের পদধ্বনি শ্রুত হইল। অগৌণে সেই জনতা ভেদ করিয়া, যোদ্ধৃবেশে সজ্জিত আরোহী লইয়া, একটি বৃহৎ কৃষ্ণকায় অশ্ব বিদ্যুৎ-বেগে গহ্বরের নিকট আসিল। আরোহী বল্গা আকর্ষণ করিলেন,—অশ্ব স্থির হইয়া দাঁড়াইল। সমবেত জনতা বলিয়া উঠিল, "কুর্সিয়াস! কুর্সিয়াস!" অশ্বারোহী যুবক, সুগঠিতদেহ; তাঁহার সুন্দর মুখমণ্ডলে উৎসাহভাব সুস্পষ্ট। তিনি কোষবদ্ধ তরবারি নিষ্কোষিত করিয়া রোমকদিগকে শান্ত হইতে ইঙ্গিত করিলেন, এবং উচ্চস্বরে বলিতে লাগিলেন, "রোমকগণ, তোমরা আজ জননী রোমের জন্য ঐশ্বর্য্য, গৌরব, সংসারের পবিত্র সুখ, সবই ত্যাগ করিয়াছ। কিন্তু কই, কেহই ত আত্মদান কর নাই! নিশ্চিত বিপদ জানিয়া কেহ কি ঐ অতলস্পর্শ গহ্বরে আত্মদেহ দান করিতে প্রস্তুত নহ? জগতে আত্মবিসর্জ্জনই শ্রেষ্ঠ দান।"

কুর্সিয়াস নীরব হইলেন। ফোরমের যে অংশে ভীতিবিহ্বলা রমণীগণ দাঁড়াইয়াছিলেন, সেই অংশের দিকে চাহিয়া কুর্সিয়াস বলিলেন,—"রোমক জননীগণ, ভীতি ত্যাগ করিয়া নিজ নিজ সন্তানকে বক্ষে তুলিয়া লউন। জননীর বক্ষ হইতে কেহ সন্তানকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবে না।"

তাহার পর কুর্সিয়াস করুণনেত্রে মার্সিয়ার দিকে চাহিলেন। চারি চক্ষু মিলিল। মুহূর্ত্তের জন্য কুর্সিয়াসের নয়নে উৎসাহজ্যোতিঃ নিবিয়া গেল,—তাঁহার মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিল। তিনি মস্তক নত করিয়া মৃদু কম্পিত স্বরে বলিলেন,—"মার্সিয়া, তুমি আমার মৃত্যু সহজসাধ্য করিয়া দিয়াছ।" তিনি মস্তক উত্তোলন করিলেন,—তাঁহার নয়নে সেই উৎসাহ-জ্যোতিঃ ফিরিয়া আসিল। রোমের দিকে দুই বাহু প্রসারিত করিয়া তিনি উচ্চস্বরে বলিলেন,—"মাতঃ, তোমার মঙ্গলের জন্য তোমার এই অনুপযুক্ত সন্তান তাহার তুচ্ছ জীবন দান করিতেছে। রোমের জয় হউক।" কুর্সিয়াস অশ্বকে কশাঘাত করিলেন;—অশ্ব লম্ফ দিয়া উঠিল। মুহূর্ত্তের জন্য কুর্সিয়াসের দেবোপম মূর্ত্তি শূন্যে দেখা গেল,—তাহার পরই অশ্ব ও অশ্বারোহী সেই প্রাণহীন, বায়ুহীন আলোকহীন অন্ধ গহ্বরে অদৃশ্য হইয়া গেল। ফোরমে সমবেত জনতা গভীর আর্ত্তনাদ করিয়া করপুটে চক্ষু ঢাকিল।

পরমুহূর্ত্তে রোমকগণ চাহিয়া দেখিল,—সেই গভীর গহ্বর বিলুপ্ত হইয়াছে। দ্বিধাবিভক্ত ভূমিতল সংযুক্ত হইয়া আবার পূর্ব্ববৎ দৃঢ় হইয়াছে। কুর্সিয়াসের

সহসা সেই চতুর্দ্দিকব্যাপ্ত ভীষণ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া নারীকণ্ঠের কাতরধ্বনি শ্রুত হইল। রোমক কুমারীদল হইতে শোকপূর্ণ ক্রন্দনধ্বনি উঠিল।—লাবণ্যময়ী, প্রেমময়ী মার্সিয়া আর নাই! যখন কুমারীদল হইতে প্রথম কাতরধ্বনি উঠিয়াছিল, তখনই তাঁহার প্রেমপূর্ণ প্রাণ রূপলাবণ্যসম্পন্ন দেহ হইতে বহির্গত হইয়া গিয়াছে—কেবল কক্ষচ্যুত অম্লানজ্যোতিঃ নক্ষত্রের মত তাঁহার গতপ্রাণ দেহ পড়িয়া রহিয়াছে।

শ্রীস্নেহলতা সেন।

সহযোগী সাহিত্য।

সাহিত্য।

ছোট গল্প।

ইতিপূর্ব্বে আমরা পাঠকদিগকে সুপ্রসিদ্ধ লেখক ব্রেটহার্টের সাহিত্যিক জীবনের বিবরণ উপহার দিয়াছি। * ব্রেটহার্ট ছোট গল্পের রচনায় সিদ্ধহস্ত। তাঁহার এক একটি ছোট গল্প ভাষার লালিত্যে, রচনার মাধুর্য্যে, কল্পনার প্রাখর্য্যে ও ঘটনার বৈচিত্র্যে হৃদয়ে বহুদিনস্থায়ী প্রভাব রাখিয়া যায়। সম্প্রতি তিনি "করণ্‌হিল ম্যাগাজিন" পত্রে ছোট গল্পের বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, আমরা সেই প্রবন্ধের সারোদ্ধার করিয়া দিলাম।

অনেকে বলেন যে, ব্রেটহার্ট স্বয়ং আমেরিকান ছোট গল্পে প্রথম পথপ্রদর্শক। তিনি বলেন,—এ কথা সত্য নহে; বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধেও আমেরিকান ছোট গল্প প্রচলিত ছিল। তবে তাহার আদর্শ ইংরাজী, প্রণালীও ইংরাজী। ইংরাজ লেখক জাজ হালিবার্টন প্রথম আমেরিকান গল্প লেখেন—তাহাতে খাঁটি আমেরিকান চরিত্র অপেক্ষা খাঁটি আমেরিকান ভাষাই অধিক ফুটিয়াছিল। আমেরিকান হাস্যরসের প্রভাবেই তদ্দেশের সাহিত্য হইতে ইংরাজী আদর্শের মোহবন্ধ ভিন্ন হইয়া যায়। এ হাস্যরস নূতন দেশে নূতন সভ্যতার ফল—সম্পূর্ণ নূতন জিনিস। ব্যক্তিগত গল্প প্রভৃতিতেই ইহার প্রথম বিকাশ—গল্প মুখে মুখে চলিত। সাধারণ গল্পগুজবের বৈঠক প্রভৃতি হইতে সাধারণ সভায় ও ক্রমে ধর্ম্মমন্দিরের বক্তৃতাতেও এইরূপ গল্প বলিবার প্রথা প্রচলিত হয়। কোন বিষয় বুঝাইবার জন্য একটা গল্প বলিলে বিষয়টিও চিত্তাকর্ষক হয়, রসও জমে ভাল। ক্রমে ইহা সংবাদপত্রে স্থানপ্রাপ্ত হয়। অসংস্কৃত চলিত গল্প সংবাদপত্রে সংস্কৃত হইয়া—মণিকরগৃহপ্রত্যাগত উজ্জ্বল হীরক

ছোট গল্পের উৎপত্তি ও হাস্যরস।

খণ্ডের মত বোধ হইত। তাহার মৌলিকতা ও বিশেষত্ব বিস্ময়কর। আমেরিকান গল্প স্বল্পায়তন, জমাট এবং ভাবপ্রণোদক। এ গল্পে আতিশয্য বা ন্যূনতার লক্ষণ প্রায়ই দৃষ্ট হইত; কিন্তু মধুরতার অভাব ছিল না। ইহাতে এক এক প্রদেশের লোকের ভাষা ও ভাব দেখা যাইত;—সে সব এমনই স্বাভাবিক যে চিত্তাকর্ষক না হইয়া যাইত না। এই ছোট গল্পের কৃপায় ক্রমে চলিত কথা ভদ্র সাহিত্যে স্থান পাইতে লাগিল। দশ বা বার ছত্রের "প্যারা" হইতে ছোট গল্প অর্দ্ধ 'কলম' ব্যাপী হইয়া উঠিল। কিন্তু বড় হইয়াও ছোট গল্প পূর্ব্ববৎ সংক্ষিপ্ত ও ভাবপ্রকাশব্যাপারে সরল রহিল। আসলে কোন পরিবর্ত্তন হইল না। এ ছোট গল্পে রচনাপ্রাচুর্য্য বা কষ্টসৃষ্ট রচনাপ্রণালী লোকে সহ্য করিত না। লঘুবাণের মত এই বাহুল্যবর্জ্জিত গল্প একেবারে মর্ম্মস্থলে পঁহুছিত—পথে বাঁকিয়া চুরিয়া যাইত না। তাহার পথ সরল। এইরূপ গল্প যে অনেক সময় কিছু অতিরিক্ত উচ্ছৃঙ্খল হইত, এবং এই সকল গল্পে যে কোন প্রকার নৈতিকতা থাকিত না, তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু ইহাতে সর্ব্বপ্রধান লক্ষ্য করিবার জিনিস ইহার—মৌলিকতা। ক্রমে ছোট গল্পে ঘটনাসমাবেশ হইতে চরিত্রচিত্রণ আরম্ভ হইল; দুই চার ছত্রে সমাজের এক এক অংশের নিখুঁত চিত্র প্রদত্ত হইত; কিন্তু গল্পে একটি বাজে কথা থাকিত না। পূর্ব্বের মত এখনও আমেরিকান ছোট গল্প সংবাদপত্রের অংশ। তাহা হইতেই আমেরিকান ছোট গল্পের উৎপত্তি।

আমাদের দেশে এখন বক্তৃতামঞ্চে রসাল ছোট গল্প শুনিতে পাই; সে আশার কথা, সন্দেহ নাই। কিন্তু আবার যখন দেখি, আমাদের যে ছোট গল্প সদাসর্ব্বদা দেখিতে পাই—তাহার প্রধান দোষ অতিবিস্তৃতি—তাহাতে কেবলই ফেনা, তখন বড় আশঙ্কা হয়। সাগরসলিলে সময় সময় ফেনপুঞ্জ শোভা পায়—তাহাতে নীলজলের শোভা হয়,—তাহার উপর রবিকরে ইন্দ্রধনুর বর্ণবৈচিত্র্য বড় মধুর দেখায়; কিন্তু তাহাও সদাসর্ব্বদার জন্য নহে। আবার সাগরের পক্ষে যাহা শোভন, গোষ্পদে তাহা বড় বিসদৃশ দেখায়,—সব জিনিসেরই একটা মানান আছে।

পরিহাসরসিক জাতীয় চরিত্রের যে অংশ চিত্রিত করিতেছিলেন, ঔপন্যাসিক প্রথমে সে অংশ স্পর্শ করেন নাই। জাতীয় যুদ্ধের বা জাতীয় কোন গুরুতর ঘটনার ছায়া পর্য্যন্ত সমসাময়িক উপন্যাসে স্থান পায় নাই। এই সময় ব্রেটহার্ট "ওভারল্যাণ্ড মন্থলী" পত্রের সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেন। তাঁহার হস্তেই ছোট গল্পের প্রথম যথোপযুক্ত বিকাশ। তিনি খাঁটি আমেরিকান উপন্যাসের অভাব অনুভব করিয়া অভাবমোচনকল্পে চেষ্টিত হয়েন। তিনি বাল্যে স্কুল পালাইয়া ও যৌবনে শ্রমজীবীদিগের মধ্যে শিক্ষকের কার্য্য করিয়া—চারি দিকে যে জীবনের চিত্র দেখিয়াছিলেন, উপন্যাসে সে চিত্র দেখিতে না পাইয়া গল্পরচনায় হস্তক্ষেপ করিলেন। তাহার প্রথম ফল—The Luck of Rearing Camp. গল্পটি তাঁহার আদর্শানুরূপ না হইলেও লেখক স্বয়ং বুঝিয়াছিলেন যে, তিনি গল্পে যাহা দেখিয়াছেন, তাহাই চিত্রিত করিয়াছেন, গল্পের চরিত্রগুলি ও গল্পের গঠন খাঁটি কালিফর্ণিয়ান।

ব্রেটহার্টের প্রথম গল্প।

কিন্তু এক মহা বিপদ উপস্থিত হইল—গল্পটি প্রচলিত প্রণালীর বহির্ভূত বলিয়া মুদ্রাকর

ও প্রকাশক গল্প প্রকাশ করিতে আপত্তি করিল। গল্পের রচনাপ্রণালী, উপাখ্যানবস্তু ও নীতি সবই নূতন! গল্পমধ্যে "লকের" পরিত্যক্তা অভাগিনী জননীর আবির্ভাব ও গল্পে চিত্রিত চরিত্রগুলির ভাষা—উভয়ই যেন অত্যন্ত নূতন,—আপত্তিজনক। ব্রেটহার্ট স্বয়ং পত্রের সম্পাদক। তিনি যখন গল্পটি ছাপাইতে নিতান্ত জিদ করিলেন, তখন গল্পটি ছাপা হইল। কিন্তু প্রকাশিত হইলে দেখা গেল, মুদ্রাকর ও প্রকাশক যাহা বলিয়াছিল, পাঠকগণও সেই কথা বলিতে লাগিল। গল্প আপত্তিজনক! ঔপন্যাসিক কিংসলি এক স্থানে বলিয়াছেন,—একটা নূতন জিনিসে যতক্ষণ আমরা অভ্যস্ত হইয়া না পড়ি, ততক্ষণ সেটাকে পাপ বলিয়া বিবেচনা করি। এ ক্ষেত্রেও ব্যাপার ঠিক সেইরূপ দাঁড়াইয়াছিল। নূতন দেখিয়া লোকে শিহরিয়া উঠিয়াছিল।

কিন্তু অন্যান্য স্থানের সাহিত্যরসিকগণের নিকট Luck বড়ই আদৃত হইয়াছিল। তাহার সে আদর আজও সমভাবে বিদ্যমান। তাই কথায় বলে,—"গ্রামের ফকির ভিক্ষা পায় না।"

সমাজনীতি।

আফগান রমণী।

পূর্ব্বের দুই প্রবন্ধে আমরা আফগানিস্থানের নারীজীবনের যে অংশের বিবরণ বিবৃত করিয়াছি, তাহাকে সমাজের উচ্চস্তর বলিয়া অভিহিত করাই সঙ্গত। সর্ব্বত্রই সমাজের উচ্চস্তর সীমাবদ্ধ,—সঙ্কীর্ণ, স্বল্প। কাবুলের এই সীমাবদ্ধ উচ্চস্তরে শুদ্ধান্তশোভিনীদিগের প্রভাবও অল্প, সে প্রভাব শুদ্ধান্তের চতুঃসীমার মধ্যেই আবদ্ধ। কাজেই সাধারণ রমণী-দিগের বিবরণ ব্যতীত আফগানিস্থানের নারীজীবনের—রমণীসমাজের পরিচয় নিতান্তই অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা সমাজের সাধারণ শ্রেণীর নারীজীবনের বিবরণ বিবৃত করিব।

আফগানিস্থানের অধিবাসিগণ একজাতিভুক্ত নহে। তাহারা ভিন্ন ভিন্ন জাতির সমষ্টিমাত্র; কেবল সকলেই মহম্মদীয়-ধর্ম্মাবলম্বী। আবার ধর্ম্ম সম্বন্ধেও দুই দল আছে—এক দল অপর দলকে বিধর্ম্মী বলে। এই দুই দলের মধ্যে কুলক্রমাগত কলহকাহিনী সর্ব্বদাই শুনিতে পাওয়া যায়। এই কলহের ফলে ভিন্ন ভিন্ন দলের মধ্যে সর্ব্বদাই যুদ্ধ ঘটে। প্রতিশোধকল্পে এক দল অপর দলকে আক্রমণ করে; যাহা পায়, লুটিয়া লইয়া আইসে; সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীলোক ও শিশুদিগকেও আনে—তাহারাই ক্রীত-দাস হয়। ফলে কেবল কুচী জাতি ব্যতীত আর প্রায় সকল জাতির ক্রীতদাস আফগানিস্থানে দৃষ্ট হয়। দাসগণ প্রভু কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হয় না; বরং তাহাদের কাযে প্রভুকে অনেক অসু-বিধা ভোগ করিতে হয়; তাহারা মনোযোগ দিয়া কর্ম্ম করে না, কাজও ভাল হয় না। দাস রাখিতে যে ব্যয় পড়ে, তাহার তুলনায় বাজে খরচা পোষায় না। পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন,—তবে লোকে দাস রাখে কেন? সে প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে মহম্মদীয়-ধর্ম্মানুগত আইনের বিচারে প্রবৃত্ত হইতে হয়; এখানে তাহা করা অসম্ভব। আবার তাহা বহুপরিমাণে

ক্রীতদাস।

রাজার 'মর্জ্জির' উপর নির্ভর করে। প্রভু যতই দরিদ্র হউন না কেন, দাসীকে মুক্ত করিতে হইলে তাঁহাকে তাহার গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় স্থির করিয়া দিতে হয়। হাজারা ব্যতীত অন্য-জাতীয়া দাসীর বিক্রয়ও সহজসাধ্য নহে।

আমীরের আজ্ঞামত খাজনা না দেওয়ার অপরাধে আজ কয় বৎসর পূর্ব্বে হাজারা জাতি আমীরের সৈন্যদল কর্তৃক আক্রান্ত হয়। যুদ্ধে পরাভূত বন্দিগণ প্রকাশ্যভাবে পশুর মত বিক্রীত ও ক্রীত হইত। এখন তাহারাও ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার পাইতেছে; অল্পদিনেই তজ্জাতীয়া দাসী পাওয়া দুষ্কর হইয়া উঠিবে। হাজারা ক্রীতদাসী ব্যতীত আমীর ওমরাহের শুদ্ধান্ত চলে না। সে অশিক্ষিতা, কাজেই তাহার কার্য যে বিশেষ সুসম্পন্ন হয়, এমন নহে। সে তাহার দূর পল্লীগৃহ হইতে আনীতা; যেখানে আনীতা, সেখানে না আছে শৃঙ্খলা, না আছে কোন নিয়ম। সাধারণতঃ হাজারা দাসী—পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নহে; কিন্তু অবরোধে রন্ধন হইতে বস্ত্র ধৌত করা পর্য্যন্ত সবই তাহাকে করিতে হয়। কেবল সূক্ষ্ম সূচীকার্য্য তুর্ক বা বদক্সানী দাসীদিগের দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। কোথাও বা গৃহস্থের দরিদ্র আত্মীয়াগণ সে কার্য্য করেন। কোথাও কোথাও গৃহকর্ত্রীর প্রিয় হইলে হাজারা দাসীও এ কার্য্য করে। কিন্তু তাহারা কেহই লিখিতে বা পড়িতে শিখিতে পায় না।

হাজারা জাতি।

আফগানিস্থানের লোকের সাধারণ বিশ্বাস, হাজারাগণ কিছু নির্ব্বোধ, সহজে কিছু বুঝিতে পারে না। এ কথা কতকটা সত্য; কিন্তু শিক্ষা পাইলে তাহারা বেশ বুদ্ধির পরিচয় দেয়। তাহাদের প্রতি কুব্যবহার করিলে তাহারা যেমন প্রতিহিংসাপরায়ণ হইয়া উঠে, তেমনই আবার একটু ভাল ব্যবহার পাইলে অত্যন্ত প্রভুভক্ত হয়। তাহারা কর্ম্মনিপুণা, শ্রমশীলা, স্নেহবতী! হাজারা রমণীরা অবরোধবর্ত্তিনী নহে; কাজেই তাহাদের স্বাস্থ্যও ভাল, এবং তাহারা কষ্টসহিষ্ণু। বদক্সানীরা ইহার বিপরীত। তাহারা একটু অসুবিধা সহিতে চাহে না, একটু ব্যথায় চীৎকার করে, বা মূর্চ্ছা যায়।

হাজারা-জাতীয়া রমণীরা গৃহে একপ্রকার মোটা পশমী কাপড় বুনিয়া, তদ্দ্বারা পুরুষদিগের পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিয়া দেয়—আপনারা প্রায়ই তুলা বা ছীট কাপড় প্রভৃতি ভরা কার্পাস-বস্ত্রের পরিচ্ছদ ব্যবহার করে। সাধারণ গৃহকর্ম্ম ভিন্ন হাজারা রমণীদিগের আর একটি প্রধান কার্য্য ঘৃত প্রস্তুত করা। মেষদুগ্ধ, গোদুগ্ধ, উষ্ট্রদুগ্ধ ও ছাগদুগ্ধ হইতে ঘৃত প্রস্তুত হয়। ঘৃত বাজারে বিক্রীত হয়। আফগানিস্থানে ক্যাফার, কুচী ও হাজারা, এই তিন জাতি ভিন্ন অন্য সকল জাতির মধ্যেই অবরোধপ্রথা প্রচলিত।

আমীর একদিন প্রবন্ধলেখিকাকে বলিয়াছিলেন যে, আফগানিস্থানে সহরেই কেবল অবরোধপ্রথা প্রচলিত; সহরের বাহিরে বা পল্লীগ্রামে রমণীগণ অবরোধবাসিনী নহেন। কথাটা কতকটা ঠিক। পল্লীপথে যাইতে প্রায়ই দেখা যায়, রমণীরা ক্ষেত্রে কার্য্য করিতেছে, গোদোহন করিতেছে, বা এমনই অন্য কোন কার্য্যে রত। কিন্তু ক্যাফার কুচী ও হাজারা, এই তিন জাতি ভিন্ন অন্য সকল জাতির মধ্যে অবরোধপ্রথা সম্মানসূচক। প্রত্যেক গ্রামের সর্দ্দারের গৃহের রমণীরা শুদ্ধান্তবাসিনী; কেহ

অবরোধপ্রথা।

লেই প্রথমে স্বীয় গৃহের রমণীদিগকে অন্তঃপুরবাসিনী করে। মহি-
ৎা বই রুষ্টা হন না। তবে পল্লীপথে অবরোধবাসিনীরাও অনেক সময়
য়া গমনাগমন করেন। নিজ কাবুলে দাসীরাও অবরোধবর্তিনী—নহিলে
থাকে না।

যাযাবর জাতি। কেহ কেহ বলেন, তাহারাই আফগানিস্থানের আদিমনিবাসী;
কথা জানা যায়, তত দিন হইতেই তাহারা আফগানিস্থানে আছে। তাহারা হিম
ঋতুতে দেশের দক্ষিণাংশে সমতল ভূমিতে বাস করে, আবার
৫। গ্রীষ্মকালে পাহাড়ে চলিয়া যায়। তাহারা স্বাধীন ও গর্ব্বিত;—
প্রভুত্ব স্বীকার করে না। তাহারা বহুমূল্যধাতুহীন হইয়াও ধনী; কেন না, তাহাদের
উষ্ট্র, মেষ প্রভৃতি আছে। আবশ্যক হইলে সেই সকলের কিছু দিয়া আবশ্যক
করা অত্যন্ত সহজ।

াতির পুরুষগণও বস্ত্রবয়ন করে। রমণীরা নানা কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। পুরুষগণ
গর মতামত অগ্রাহ্য করে না; বরং কোন পুরুষকে কোন বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করিলে
, "আমি তাম্বুতে যাইয়া, মত স্থির করিয়া, উত্তর দিব।" একবার লেখিকা কাবুল
বহু দূরে ইহাদিগের একটা ছাউনির ছায়াচিত্র (photograph) লইতে গিয়াছিলেন।
আশঙ্কা ছিল—হয় ত তাহারা পারসী ভাষা বুঝিবে না, এবং তাহাদিগকে তাঁহার উদ্দেশ্য
কঠিন হইবে। যত দূর পথ ভাল, তত দূর শকটে গিয়া লেখিকা অশ্বারোহণে ছাউনিতে
হইলেন। কয় জন পুরুষ ও রমণী তাঁহাকে দেখিয়া অগ্রসর হইয়া আসিল, এবং
নিতান্ত পরিচিতের মত 'ডাক্তার সাহেব'—বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিল। অমু-
কন্যা, অমুকের পিতা, অমুকের পত্নী তাঁহার নিকট গিয়াছিল। সেই যে একজন
ক কতকগুলি কুক্কুট দিয়াছিল—সে তাহাদের আত্মীয়। তাহারা এইরূপ নানা কথা
লাগিল। তাহারা তাঁহাকে চেনে; এমন কি, তাঁহার গৃহে যে আর একজন 'ফিরিঙ্গী'
থাকেন, এবং রোগীদিগের ক্ষত ধৌত করেন ও ঔষধাদি প্রয়োগ করেন, তাঁহাকেও
তাহারা চিত্র তুলাইতে আপত্তি করা দূরে থাকুক, বরং আনন্দ প্রকাশ করিল।
এ বেলা হইলে তাহারা 'ডাক্তার সাহেব'কে দুগ্ধ ও খাদ্য দিল। তিনি দুগ্ধ পান
করিলেন; কিন্তু আর কিছু আহার করিলেন না। এখানে বলিয়া রাখা ভাল,—সে
খাদ্য বিন্দুমাত্র অপরিষ্কার নহে। কুচীরা আপনারা সাহসী ও সৎ;—তাহারা মনে করে যে,
সকলেই তাহাদের মত সাহসী ও সৎ।

ক্যাফার জাতির মধ্যেও অবরোধপ্রথা প্রচলিত নাই। ইহাদের মধ্যে সুগঠিতদেহযষ্টি
রমণী নিতান্ত বিরল নহে। রমণীদিগের অযত্ন-অবহেলিত পারিপাট্য সত্ত্বেও তাহাদের
ভঙ্গীতে যে অনায়াসলব্ধ মাধুরী আছে, পুরুষদিগের পক্ষে তাহার অনুকরণ করা অসম্ভব।
এই জাতীয় রমণীরা অসীমসাহসিনী; তাহারা কোন কার্য্য করিতেই ভয় পায় না।

শাক্যসিংহের নির্ব্বাণমন্দির।

১৮৭৬ সালে কার্‌লীল সাহেব কুশীনগরে শাক্যসিংহের নির্ব্বাণ
আবিষ্কারার্থ প্রেরিত হন, এ কথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। * তাঁহার
কর্ম্মচারী কনিংহাম্ সাহেব যেখানে কতকগুলি বৌদ্ধমূর্ত্তিমাত্র লাভ
সম্যক্ অনুসন্ধান না করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হন, তাঁহার সহকারী কার্‌লীল্
অদম্য অধ্যবসায়ে উক্ত মন্দিরের আবিষ্কার ও পুনর্নির্ম্মাণ করেন, বর্ত্তমান
তাহার উল্লেখ করিব।

কার্‌লীল্ কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত লইয়া দেখিলেন, স্থানটি দুর্ভে
আবৃত। কণ্টকবৃক্ষে ও দুর্ভেদ্য গুল্মে সে স্থান মনুষ্যমাত্রেরই দুর
কেবল সিংহশার্দ্দূলাদি শ্বাপদের লীলাভূমি হইয়া আছে। কিন্তু
সত্যান্বেষী বীরহৃদয় এ সব বাধা বিপত্তিতেও নিরুৎসাহ হইল না। তিনি
মজুর সংগ্রহ করিয়া আনাইয়া সেই স্থানটি পরিষ্কার করিবার জন্য তাহা
নিযুক্ত করিলেন। অনেক কষ্টে তাহারা অতি অল্পপরিসরমাত্র স্থান প
করিতে পারিল। আবিষ্কারক সেই পথে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া দেখিলে
সম্মুখের ভূমি প্রশস্ত অঙ্গনের মত। তিনি অনুমান করিলেন যে, ইহা ভ
সিদ্ধার্থের নির্ব্বাণমন্দিরসংলগ্ন মহাবিহারের সম্মুখস্থ চত্বর হইতে প
কুতূহলী হইয়া চতুর্দ্দিক অন্বেষণ করিয়া দেখেন যে, ঐ সমভূমির অন
জঙ্গলাবৃত, স্তূপের চূড়ার মত সূক্ষ্মাগ্রভাগ এক ভূখণ্ড পরিলক্ষিত হই
এই উচ্চ সূক্ষ্মাগ্রভাগ ইষ্টকরাশি নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলে ইহা বৃহৎ স্তূ
শীর্ষস্থ গম্বুজের ভিতরের দিক বলিয়া বোধ হইল। ইহার মূলদেশ, যেখানে
গম্বুজের বৃত্তাকার অংশ আরব্ধ হইবার কথা, তাহার কিয়দংশমাত্র পরি-
লক্ষিত হইতেছিল। বোধ হয়, ইহার পূর্ব্বে এই প্রদেশের কোন
সিবিল্ কর্ম্মচারী এ স্থান অংশতঃ খুঁড়িয়া দেখিয়াছিলেন। এই বৃহৎ স্তূপাকার
ভগ্নাবশেষের পার্শ্বে অন্যূন বার ফিট প্রস্থ পরিমিত নিম্নভূমি ছিল। তাহার
পর দেখিতে পাইলেন, ইহার ঠিক পশ্চিম পার্শ্বে বাহির হইতে দেখিতে
মাথার দিক চাপা অসমচতুর্ভুজাকার এক স্তূপ আবার উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে।

* সাহিত্য, চৈত্র, ১৩০৫, "কুশীনগরের আবিষ্কার" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

কারলীল ভাবিলেন, হয় ত সৌভাগ্যক্রমে এই স্থানেই তাঁহার বহু অন্বেষণের ধন নির্ব্বাণপ্রতিমা প্রাপ্ত হইতে পারেন। এই স্তূপের মাথা হইতে কূপের মত খনন করিয়া প্রায় ১০ ফিট নিম্নে কোদালীতে পাথর ঠেকিল। অধ্যবসায়শীল কার্‌লীলের তখন কি আনন্দ! তাঁহার এত দিনের আশা বুঝি সফল হইতে চলিল! দ্বিগুণ উৎসাহে তিনি সমগ্র প্রতিমাটির উদ্ধারার্থ, পাছে কোন অংশ নষ্ট হয়, এ জন্য অতি সাবধানে, খুঁড়িতে লাগিলেন। খুঁড়িয়া বাহির করিয়া দেখা গেল যে, প্রথমে প্রতিমার উরুদেশে কোদালী ঠেকিয়াছিল। প্রতিমাটি ভগবানের নির্ব্বাণপ্রতিমাই বটে। প্রায় ১২০০ বৎসর পূর্ব্বে হিউঅ্যান্থস্যাঙ যে নির্ব্বাণপ্রতিমার কথা বলিয়া গিয়াছেন, ইহা সেই প্রতিমা। প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের অনুমান সত্য হইল! কার্‌লীল্ এত দিনে তাঁহার অশ্রান্ত পরিশ্রমের পুরস্কার পাইলেন! সমগ্র প্রতিমাটি খুঁড়িয়া বাহির করা হইলে দেখা গেল যে, উহা দৈর্ঘ্যে প্রস্থে ৩০ × ১২ ফিট আয়তনের একটি ভগ্ন গৃহে এক ভগ্নসিংহাসনের উপর শায়িত আছে। ভগবান যেমন নির্ব্বাণসময়ে দক্ষিণ হস্ত মাথার নীচে রাখিয়া, দক্ষিণ দিক চাপিয়া পশ্চিমাস্য হইয়া শয়ান ছিলেন, এ মূর্ত্তিটিও অবিকল তদবস্থায় শায়িত। প্রতিমাটি গাঢ় রক্ত ও মৃত্তিকাবর্ণে মিশ্রিত বালুকাপ্রস্তরে নির্ম্মিত। এতদিনে প্রতিমাটির উদ্ধার হইল, কিন্তু কার্‌লীল্ দেখিলেন যে, উহা অনেক স্থানে ভগ্ন, অনেক অংশে অঙ্গহীন। বামজানু, পাদদ্বয়, বামহস্ত, কটিদেশের কিয়দংশ, শিরোভাগ ও মুখের উপরের অংশ আদৌ নাই। কার্‌লীল্ সাহেব চতুর্দ্দিকে অন্বেষণ করিয়া কতক অংশ পাইলেন, অধিকাংশ পাইলেন না, কতক অংশ আবার সিংহাসনের সহিত গ্রথিত হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং ২০ফিট্ দীর্ঘ প্রতিমা উত্তোলন করিয়া নিম্নস্থ সিংহাসন ভগ্ন করিয়া ঐ সকল অংশ বাহির করিয়া লওয়া হইল। প্রতিমার ভগ্নাংশগুলি যথাসম্ভব সংগ্রহ করিয়া কার্‌লীল্ উক্ত মন্দির ও প্রতিমার সংস্কারকার্য্যে ব্রতী হইলেন। প্রথমে তিনি প্রতিমাটির ভগ্নাংশগুলির যাহা পাওয়া গেল, সে সব বিশেষ প্রণিধানপূর্ব্বক যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিলেন। যে সকল অংশ পাওয়া গেল না, অন্যান্য প্রস্তরখণ্ড ও তদভাবে বিলাতী মাটী সংযোজিত করিয়া দিলেন। তাহার পর প্রতিমাটি এই ভাবে থাকিলে সংযোজিত অংশ উঠিয়া নষ্ট হইয়া যাইতে পারে, এই ভাবিয়া কার্‌লীল্ উহার উপর রঙ্ করিলেন। মাথার চুলগুলি কাল, পরিধেয় বসন শ্বেত ও শরীরের অপরাংশে ঈষৎরক্তাভ হরিদ্রাবর্ণ দিলেন। এই রঙ্ দিবার জন্য অনেকে সাহেবকে

বিদ্রূপ করিয়াছেন, বলিয়াছেন যে, রঙ্ ধুইয়া গেলে সময়ে প্রতিমার স্বাভাবিক জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিবে। কিন্তু বর্ণের বিলোপ ঘটিলে প্রতিমার শোভা বর্দ্ধিত না হইয়া বরং আরও বিশ্রী হইবার সম্ভাবনা; কারণ, তাহা হইলে পাঁচ পাথরের যোড় সহজেই লক্ষিত হইবে। মাননীয় শাস্ত্রী মহাশয় যথার্থই বলিয়াছেন যে, সময়ে সময়ে ইহাতে রঙ্ দেওয়া আবশ্যক।

তাহার পর সিংহাসন পুনর্নির্ম্মিত হইল। সিংহাসনের পার্শ্বদেশে বড় বড় পাথরের টালি আড় করিয়া সাজাইয়া নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার অনেকগুলি পাওয়া গেল না। ইহার চারি কোণে চারিটি স্তম্ভ ছিল। তাহার মধ্যে দুইটি ও একটির অংশ ব্যতীত অবশিষ্ট পাওয়া গেল না। সিংহাসনের পশ্চিম পার্শ্বে, তিনটি নাতিগভীর কুলুঙ্গির ভিতর তিনটি প্রস্তরমূর্ত্তি খোদিত ছিল। বামদিকের একটি মূর্ত্তি দীর্ঘকেশা রোরুদ্যমানা রমণীর মূর্ত্তি—সম্মুখের ভূমিতে হাত রাখিয়া উপুড় হইয়া রহিয়াছে। সাহেব ইহাকে যশোধরা স্থির করিয়াছেন। দক্ষিণ দিকের মূর্ত্তিটি পুরুষমূর্ত্তি। দক্ষিণ হস্তের উপর মস্তক ন্যস্ত করিয়া যেন শোকাকুল হইয়া বসিয়া আছে। সাহেব অনুমান করেন, ইহা রাহুলের মূর্ত্তি হইতে পারে। আর মধ্যবর্ত্তী মূর্ত্তিটি দর্শকের দিকে পশ্চাৎ করিয়া নির্ব্বাণমূর্ত্তির দিকে সম্মুখীন হইয়া যেন প্রণাম করিতেছে, এইভাবে উপবিষ্ট। এই মূর্ত্তির নিম্নভাগের প্রস্তরে অতি প্রাচীন অক্ষরে এই দুই ছত্র লিখিত আছে,—

১ম পংক্তি—দেয় ধর্ম্মোঽয়ং মহাবিহারে স্বামিনো হরিবলস্য

২য় পংক্তি—প্রতিমায়াশ্চেয়ং ঘটিতদিনে সংঘ (সমঃ ?) সুরেণ (?)

এই দুই ছত্রের অর্থ লইয়া পণ্ডিতসমাজে অনেক বাদানুবাদ হইয়াছে। পাঠকদিগকে সেই সব অর্থসঙ্কটের মধ্যে না লইয়া গিয়া আমরা বিখ্যাত এপিগ্রাফিষ্ট্ ফ্লীট্ সাহেবের অনুবাদ দিতেছি।

"এই (মূর্ত্তিগুলি) মহাবিহারের অধিকারী হরিবলের পুণ্যময় দান (কীর্ত্তি) ও এই প্রতিমা দিনে * * সুর (?) কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল।"

সিংহাসনটি যথাসম্ভব পুনর্নির্ম্মিত হইলে কার্লীল্ মন্দিরসংস্কারে অবহিত হইলেন। মন্দিরসংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়া কার্লীলের কষ্টের অবধি ছিল না। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, মন্দিরটি প্রায় সম্পূর্ণ ভগ্নাবস্থায় ছিল। নির্ম্মাণ দুই প্রকারে হইতে পারে। ১ম, নিজের মনোমত ও সুবিধা মত করিয়া গড়া। ২য়, বহুকষ্ট স্বীকার করিয়া, বিশেষ প্রণিধানপূর্ব্বক পুরাতনটি যেমন ছিল, যথাসম্ভব তাহার পুনঃস্থাপন করা। সাহেব যদি প্রথম পথ অব-

লম্বন করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার শ্রম খুব সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিত। স্বচ্ছন্দে তিনি কড়ি, বরগা, টালী দিয়া ইহার ছাদ নির্ম্মাণ করিতে পারিতেন। "কিন্তু সাহেব সে পথ অবলম্বন না করিয়া, যেমনটি ছিল, সেইরূপ পুনর্নির্ম্মাণ করিবার সাধ্যমত চেষ্টা করিলেন। তিনি মন্দিরের ভগ্নাংশ দেখিয়া স্থির করিলেন যে, উহা খিলানের উপর ছিল। খিলানগুলি সূক্ষ্মাগ্র ও মোচার অগ্রভাগের ন্যায়; অগ্রভাগের ইটের জমাট দেখিয়া খিলান কত বড় ছিল, এবং কিরূপ বক্রভাবে অবস্থিত ছিল, তাহা একপ্রকার জানা গেল।" তদ্দৃষ্টে জানালা ও ছাদ নির্ম্মিত হইল। প্রথমে মূর্ত্তিটির নির্ম্মাণকার্য্য সমাপ্ত না করিয়া সাহেব আর মন্দিরে হাত দিতে পারিলেন না। কারণ, প্রথমে মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তাহার পর সে বৃহৎ মূর্ত্তি তাহার মধ্যে প্রবেশ করান একপ্রকার অসম্ভব। তিনি মনে করিলেন যে, প্রথমে প্রতিমা ও পরে এই প্রতিমার রক্ষার্থ মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। প্রতিমাসংস্কার সম্পন্ন করিয়া মন্দিরটির জীর্ণোদ্ধার করিতেই সাহেবকে বিলক্ষণ কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। তাঁহার নির্ম্মাণপ্রণালী শাস্ত্রী মহাশয়ের মনোরম অনুবাদ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি ;—

"কার্লীল্ সাহেব প্রথমতঃ প্রতিমাটি বস্ত্র দ্বারা আবৃত করিলেন, এবং তাহার উপর কতকগুলি নরম মাদুর বিছাইয়া দিলেন। তৎপরে বাঁশ ও মাদুর দিয়া খাঁচার মত করিয়া উহাকে ঢাকিয়া ফেলিলেন। ইতিপূর্ব্বেই তিনি আড় দেওয়ালের উপরিভাগটি খিলানের মত করিয়া গাঁথিয়া লইয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি লম্বা দেওয়াল দুইটির ভিতর দিকে কাদার গাঁথনি ১ ফুট চওড়া ৬ ফুট উচ্চ দুইটি দেওয়াল গাঁথিয়া লইলেন। এবং তাহার উপরিভাগটি বাঁশ দিয়া ছাইয়া ফেলিলেন। এতদ্দ্বারা প্রতিমাটি সম্পূর্ণরূপে রক্ষিত হইল। পরে একটা আড় দেওয়ালের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত একটী বাঁশ ফেলিয়া দিলেন এবং যে দুইটি লম্বা কাঁচা দেওয়াল তুলিয়াছিলেন, তাহার অগ্রভাগ হইতে এই বাঁশের উপর কতকগুলি বাঁশ কাৎ করিয়া ছাইয়া ফেলিলেন এবং তাহার অগ্রদেশগুলি পূর্ব্বোক্ত বাঁশটির সহিত দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া দিলেন। এই কাৎ করা বাঁশগুলিকেও কাদা ও গোময় দিয়া কালবুদ প্রস্তুত করিয়া লইলেন। সেই কালবুদের উপর মোচার অগ্রভাগের ন্যায় খিলান প্রস্তুত হইল। খিলান সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হইয়া গেলে জানালা দিয়া এ সমস্ত মাল মশালা বাহির করিয়া লওয়া হইল। ঘর প্রস্তুত হইলে দৃষ্ট হইল যে, প্রতিমার কিছুমাত্র ক্ষতি হয় নাই।"

এইরূপে মন্দির নির্ম্মিত হইল। পার্শ্বস্থ ইট স্থাবিশের মধ্যে মন্দিরের চূড়াটি ভগ্নাবস্থায় পড়িয়াছিল। সেটিও তিনি পুনর্নির্ম্মিত করিয়া যথাস্থানে সংস্থাপিত করিলেন। মন্দিরের সম্মুখে একটা দরদালান ছিল। সাহেব অনেক যত্নে তাহারও পুনর্নির্ম্মাণ করিলেন। কিন্তু ঐ সময় দৃষ্ট হইল,সে স্থানের দ্বারটির অবশিষ্ট অংশ দগ্ধ, স্থানে স্থানে অঙ্গার, মনুষ্যাস্থি ও ভস্ম বিদ্যমান। তিনি অনুমান করিলেন যে, নিশ্চয় বৌদ্ধের এই পবিত্র তীর্থস্থান এই ধর্ম্মদ্বেষীদের কর্ত্তৃক অগ্নি ও অস্ত্রের সাহায্যে ধ্বংসপথে প্রেরিত হইয়াছিল। কোন্ জাতি কোন্ সময়ে এই দুষ্কার্য্য করিয়াছিল, অদ্যাবধি তাহা নির্ণীত হয় নাই। কিন্তু এই নিষ্ঠুর মোহান্ধ ধ্বংসকারীরা হিন্দুই হউক আর মুসলমানই হউক, মহাত্মা কার্‌লীল্ তাহাদের সকল প্রয়াস ব্যর্থ করিলেন। এত দিন পরে আবার ভগবানের নির্ব্বাণমন্দির পুনর্নির্ম্মিত হইল।

কারলীল্ এ জন্য গভর্মেণ্ট হইতে যে খরচের টাকা পাইয়াছিলেন, তাহা শেষ হইয়া যাওয়াতে, তিনি কাহাকেও কিছু না বলিয়া, নিজের বেতন হইতে ১২০০৲ শত টাকা খরচ করিয়া মন্দিরসংস্কার সম্পূর্ণ করিলেন। অথচ শাস্ত্রী মহাশয় অনুমান করেন যে, তাঁহার বেতন ৪০০৲ শত টাকার অধিক ছিল না; সুতরাং তাঁহাকে তিন মাসের বেতন ব্যয় করিতে হইয়াছিল। শুধু তাহাই নহে, তিনি সে স্থান হইতে চলিয়া আসিলে পাছে মন্দিরটি কেহ নষ্ট করে, এই আশঙ্কায় অনেক দিন ধরিয়া তিনি নিজব্যয়ে দুইটি রক্ষক নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। কয় জন ভারতবাসী স্বদেশের লুপ্ত ইতিহাসের উদ্ধারার্থ এরূপ নিঃস্বার্থ অধ্যবসায় দেখাইয়াছেন?

কিন্তু কার্‌লীল্ ইহার কি পুরস্কার পাইয়াছেন? পুরস্কার দূরের কথা, তাঁহাকে কেবল পরবর্ত্তিগণের নিষ্ঠুর পরিহাসের পাত্র হইতে হইয়াছে। শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধের উপসংহারে আক্ষেপ করিয়াছেন,—"কার্‌লীল্ সাহেব এই যে অগাধ পরিশ্রম করিলেন, প্রাণপণে যত্ন করিলেন, সাত আট মাস ধরিয়া একাকী নিবিড় জঙ্গল মধ্যে বাস করিলেন, এবং অকাতরে অর্থব্যয় করিলেন, ইহার জন্য তিনি কি পুরস্কার পাইতে পারেন? বর্ত্তমানেও কিছুই দেখি না, অনেকে তাঁহাকে পাগল বলিবে, অনেকে তাঁহাকে আহাম্মুখ বলিবে এবং অনেকেই নানাবিধ কদর্য্য বিশেষণে বিশেষিত করিবে।" হায়, পরবর্ত্তী বিরুদ্ধমতাবলম্বিগণ,—ওয়াডেল্ স্মিথ প্রভৃতি স্বমত প্রতিপন্ন করিতে গিয়া শাস্ত্রী মহাশয়ের আশঙ্কা অক্ষরে অক্ষরে সত্যে

পরিণত করিয়াছেন ! বিশুদ্ধ সত্যালোচনার স্থলেও লোকে আত্মাভিমানে এমন অন্ধ হয় । আমি বলিতে চাহি না যে, কার্‌লীলের সকল মত অভ্রান্ত, অকাট্য । হয় ত কাশিয়া কুশীনগরের বর্ত্তমান অবস্থান না হইতে পারে । হয় ত ডাক্তার ওয়াডেল্ ও তাঁহার মতানুবর্ত্তিগণের লৌরিয়াই (Lowriya) কুশীনগরের অবস্থান,—এই অনুমানই সত্য । সুতরাং কার্‌লীল্ ভ্রান্ত হইতে পারেন । কিন্তু যে পর্য্যন্ত এ বিষয়ের চূড়ান্ত মীমাংসা না হয়, সে পর্য্যন্ত কাহাকেও ভ্রান্ত বলা উচিত নয় । আর মনুষ্যশরীর ধারণ করিয়া ভ্রম প্রমাদ কত স্বাভাবিক, তাহা বিবেচনা করিয়া, যিনি সত্যান্বেষণে এরূপ অদম্য অধ্যবসায় ও উজ্জ্বল স্বার্থত্যাগ দেখাইয়াছেন, স্বমতস্থাপন করিতে গিয়া তাঁহার গুণরাশির প্রতি অন্ধ হইয়া তাঁহাকে গালি দেওয়া নিতান্ত অভদ্রতার পরিচায়ক । যত দিন কুশীনগরের নাম থাকিবে, ততদিন কার্‌লীল্‌কে কেহ বিস্মৃত হইবেন না ; বিরুদ্ধবাদীদের দ্বেষপূর্ণ বিদ্রূপে তাঁহার উজ্জ্বল যশোরাশি কিছুমাত্র ম্লান হইবে না । কেন তাঁহাকে এরূপ বিদ্রূপভাজন হইতে হইয়াছে, নির্ব্বাণ-নগরীর নবীন মতালোচনায় আমরা তাহা দেখিতে পাইব ।

শ্রীবীরেশ্বর গোস্বামী ।

শিশুপাঠ্য সাহিত্য ।*

বাঙ্গালা ভাষায় শিশুপাঠ্য সাহিত্যের দৈন্য সত্যই শোচনীয় । অকালপক্ক বাঙ্গালী তথাকথিত প্রবীণতা লইয়াই বিব্রত । যাহা নিতান্ত আবশ্যক, বাঙ্গালী তাহার সংস্থান করিয়াই নিশ্চিন্ত । যেদিন বিদ্যাসাগর, মদনমোহন, অক্ষয়-কুমার বাঙ্গালী বালকের জন্য কলম ধরেন, সেই এক দিন । বর্ণপরিচয়, শিশুশিক্ষা পড়িয়া যাঁহাদের বর্ণপরিচয় হইয়াছিল, তাঁহারা এখন খেলাধূলা সাঙ্গ করিয়া সংসারলীলায় মত্ত, আপনাদের শৈশব-জীবন এখন তাঁহাদের স্মৃতিপথের অতীত । তাঁহাদের ছেলেরা তাঁহাদেরই মত বই হাতে করিয়া বিদ্যালয়ে যায়,—টেক্‌ষ্ট-বুক-কমিটীর নির্দ্দিষ্ট রাবিশ কণ্ঠস্থ করে ;—অদৃষ্টবশে কেহ বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমায় উপনীত হইয়া ফিরিয়া আসে, কেহ বা অগ্রসর হইয়া, স্বাস্থ্য ও সহৃদয়তার বিনিময়ে এক তাড়া প্রশংসাপত্র সংগ্রহ করিয়া

* ১। ছেলেখেলা : শ্রীনবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত ।
২। খুকুমণির ছড়া : শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সরকার সঙ্কলিত ।

কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে। তাহার পর মা সরস্বতীর সঙ্গে অধিকাংশের আর প্রায় সম্পর্ক থাকে না।

কেন এমন হয়? মা সরস্বতীর সম্পর্কে মানবের হৃদয় সরস না হইয়া শুষ্ক হইয়া যায় কেন? জ্ঞানের আকর্ষণ, অন্য দেশে যাহার নিরঙ্কুশ প্রভুতা,— এ দেশে তাহার অস্তিত্বও অণুবীক্ষণ দিয়া দেখিতে হয় কেন?

মনে হয়, এ দেশের শিক্ষাবিধানের ব্যবস্থা ও পাঠ্যপুস্তকের রচনাপ্রণালীর দোষে এই বিভ্রাটের সূত্রপাত হইয়াছে। শিশুশিক্ষার স্বাভাবিক পথ এ দেশে অনুসৃত হয় না।—শিশুর চিত্তবৃত্তির বিকাশ, তাহার কোমল কল্পনার উন্মেষ, তাহার চিত্তরঞ্জন, এ দেশের শিক্ষাপদ্ধতির উদ্দেশ্য নহে। ভাষাশিক্ষার জন্য যাহা নিতান্ত আবশ্যক, তাহাই কোনও ক্রমে শিশুদের মস্তিষ্কে প্রবেশিত হ . । আর্য্যজাতির অধুনাতন শাবকগুলি বানান মুখস্থ করে, রাশি রাশি নীতিবচন গিলিয়া থাকে,—কিন্তু তাহাদের চিত্তের স্ফূর্ত্তি ও কল্পনাবিকাশের অনুকূল কোনও উপকরণ পাঠ্য গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিতে পারে না। দায়িত্ববোধ-হীন অভিভাবকবর্গও তাহাতেই সন্তুষ্ট। স্কুলের নির্দ্দিষ্ট পাঠ আয়ত্ত করিলেই ছেলের কর্ত্তব্য ফুরায়; পুঁথিগত পাঠ অভ্যাস করাইতে পারিলেই শিক্ষক ও অভিভাবকের দায়িত্বের অবসান হয়। এ দিকে অরুচিকর বিদ্যার ভারে বালকের সুকুমার মস্তিষ্ক নিষ্পিষ্ট হইয়া যায়, বিকাশোন্মুখ কোমল হৃদয়-কোরক অকালে শুকাইয়া উঠে, কল্পনা ও সরসতা হারাইয়া দুর্ভাগ্য শিশু অকালে অর্দ্ধপক্ক মানবে পরিণত হয়।

যখন গুরুমহাশয়ের পাঠশালা ছিল, তখন ছেলেরা গুরুমহাশয়ের বেতের সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুমা, দিদিমা, মার কাছে কত উপকথা, কত কাহিনী, কত ছড়া শুনিত। প্রকৃতির সহিত সহজে তাহাদের পরিচয় ঘটিত। বিদ্যা যাহাই হউক, তাহারা অকালে পাকিয়া উঠিত না। এখন সে উপকথা খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়। এখন এক দিকে বালকদের কর্ত্তব্যের বোঝা ক্রমে বাড়িতেছে, পক্ষান্তরে তাহাদের জীবনে আনন্দের লেশমাত্র থাকিতেছে না।

শৈশবে যাহাদের চিত্তবৃত্তি আনন্দরসে অভিষিক্ত, কল্পনায় প্রসারিত, সরসতায় সঞ্জীবিত, সহৃদয়তায় অনুপ্রাণিত—সর্ব্বথা পূর্ণবিকশিত না হয়, তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবনে পরিপূর্ণ, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মানব-মহত্বের আশা করা যায় না। সঙ্কুচিত হৃদয়ে জোর করিয়া জ্ঞানের ও শিক্ষার বীজ বপন করিতে পার, কিন্তু উষরে বীজবপন নিষ্ফল। নিশ্চেষ্ট, নিশ্চল, জড়বৎ হৃদয়ে ও মস্তিষ্কে

অনুশীলনের শক্তি থাকে না। যে শিক্ষার, যে জ্ঞানের অনুশীলন হয় না,—তাহা ব্যর্থ; বদ্ধ জলাশয়ের মত সঙ্কীর্ণ হৃদয়ে তাহা সত্বর দূষিত হইয়া পড়ে

বাঙ্গালায় বিদ্যাসাগর প্রভৃতি যখন শিশুপাঠ্য সাহিত্যের পত্তন করেন, তখন তাঁহাদিগকে আদ্যন্ত নূতন করিয়া গড়িতে হইয়াছিল। শিশুপাঠ্য সাহিত্যে পয়সা আছে,—তাই বোধ করি, বাঙ্গালা সাহিত্যের কেহ কেহ পুরাতন আচার্য্যগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু হায়, তাহাও সেই চর্ব্বিতচর্ব্বণ;—পরবর্ত্তী লেখকগণ কেবল বিদ্যালয়পাঠ্য পুস্তক রচিয়া দাগা বুলাইয়াছেন। কালের সঙ্গে সঙ্গে যে নূতন প্রয়োজনের উদ্ভব হইয়াছে, নূতন অভাবের সৃষ্টি হইয়াছে, সে দিকে কেহ দৃষ্টিপাত করেন নাই।

কিন্তু পৃথিবীর অন্য ভাগে শিশুপাঠ্য সাহিত্য পুঞ্জীকৃত হইতেছিল। বিদ্যালয়-পাঠ্য পুস্তক নহে, শিশুদের সুপথ্য, আনন্দপ্রদ, সরস, সচিত্র গৃহপাঠ্য পুস্তকের রাশি স্বতন্ত্র সাহিত্যে পরিণত হইতেছিল।

বহুকাল পূর্ব্বে, এ দেশে গবর্মেণ্টের উদ্যোগে অনুবাদক-সমাজের সৃষ্টি হইয়াছিল। অনুবাদক-সমাজের সদস্যগণ প্রতীচ্য শিশুসাহিত্যের অনুকরণে এ দেশে তাহার পত্তন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহারা ইংরাজী পুস্তকের অনুবাদে প্রবৃত্ত হন। তাহারই ফলে, সেকালের বাঙ্গলায়, "চকমকির বাক্স," "ছোট কৈলাস বড় কৈলাস," "কুৎসিত হংসশাবক" প্রভৃতি বালক-পাঠ্য পুস্তকাবলী ও "অহল্যা হড্ডিকার জীবনবৃত্তান্ত", "নূরজাহান" প্রভৃতি গৃহপাঠ্য পুস্তকাবলী, "গার্হস্থ্য বাঙ্গলা পুস্তকসংগ্রহ" নামে প্রচারিত হয়। ইহাই বোধ করি, এইরূপ সাহিত্যসৃষ্টির আদিম প্রয়াস। শৈশবে দাদামহাশয়ের আলমারী হইতে সংগ্রহ করিয়া নিভৃতে বসিয়া কি আনন্দে "চকমকীর বাক্স" প্রভৃতি পড়িতাম, এখনও তাহা মনে পড়ে। তার পর সেই উদ্রিক্ত কৌতূহল, সেই তীব্র গল্পপিপাসা চরিতার্থ করিবার জন্য বটতলার সরস্বতীর কত-কি গলাধঃকরণ করিয়াছিলাম! হায়, তখন দেশে শিশুপাঠ্য সাহিত্যের অঙ্কুরও ছিল না।

কিয়ৎকাল পরে মনস্বী কেশবচন্দ্র সেন বিলাত হইতে দেশে ফিরিলেন। তিনি বিলাতের সুলভ সংবাদপত্রের অনুকরণে "সুলভসমাচার" ও শিশুপাঠ্য সাহিত্যের অনুকরণে "বালকবন্ধু"র সৃষ্টি করিলেন। "বালকবন্ধু"ই শিশুপাঠ্য সচিত্র সুকুমার সাহিত্যের আদি।

তাহার পর স্বর্গীয় প্রমদাচরণ সেন "সখা"র প্রতিষ্ঠা করিয়া, কেশব বাবুর উপ্ত বীজে জলসেক করিতে লাগিলেন। প্রমদাচরণ শিশুহিতে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন,--হায়! অকালে সেই পরার্থপর কর্ম্মবীরের জীবন অবসিত হইল। "সখা"র সমাগমে সচিত্র শিশুসাহিত্যে নূতন যুগের অভ্যুদয়। তখন ফুল ফুটিয়াছিল, এখন ফল ধরিতেছে। তা, সে ফল মাকাল কি রসাল, এত শীঘ্র তাহার বিচার অনাবশ্যক।

শিশুপাঠ্য সাহিত্যের এখন শৈশব। শৈশবের লীলা সূক্ষ্ম সমালোচনার বিষয়ীভূত নহে, কিন্তু তাহারও পর্য্যবেক্ষণ আবশ্যক।

সম্প্রতি আমরা সমালোচনার জন্য দুইখানি শিশুপাঠ্য গ্রন্থ উপহার পাইয়াছি। তাহাদের পরিচয়প্রদান আবশ্যক।

১। ছেলেখেলা।

ইদানীন্তন বাঙ্গালা শিশুপাঠ্য সাহিত্যে, সুকবি শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যই সকলের অগ্রণী। শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সরকারের "হাসি ও খেলা" প্রকাশিত হইবার বহুপূর্ব্বে নবকৃষ্ণ বাবু "সখা"র সম্পাদন করিতেছিলেন। নবকৃষ্ণ বাবুর "শিশুরঞ্জন রামায়ণ" সচিত্র নহে, কিন্তু শৈশবের উৎকৃষ্ট পথ্য। সাহিত্যগুরু বঙ্কিমচন্দ্র মুক্তকণ্ঠে যাহার প্রশংসা করিয়াছেন, তাহার অন্য পরিচয়, প্রশংসা, অনাবশ্যক। সম্প্রতি নবকৃষ্ণ বাবুর রচিত শিশুদের গৃহপাঠ্য সচিত্র "ছেলে-খেলা" আমাদের আলোচ্য। "ছেলেখেলা" নবকৃষ্ণ বাবুর পূর্ব্বপ্রতিষ্ঠার অনুরূপ, আমাদের আশানুরূপ হইয়াছে। নবকৃষ্ণ বাবু সুকবি, কাব্যকলায় তিনি কুশলী,"প্রচারে"র পাঠকগণ তাহার পরিচয় পাইয়াছেন। সেই স্বাভাবিক কবিত্ব শিশুজনের চিত্তরঞ্জনে নিয়োজিত করিয়া নবকৃষ্ণ বাবু আমাদিগকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন। কবিত্বে সুসম্পন্ন হইলেই শিশুপাঠ্য কবিতায় সিদ্ধিলাভ হয় না। অনন্যসাধারণ প্রতিভার অধিকারী, কবিবর রবীন্দ্র-নাথের "নদী" তাহার প্রমাণ। "নদী" কবিতার হিসাবে রবীন্দ্রনাথের উৎকৃষ্ট কবিতার সহিত তুলিত হইবার যোগ্য নহে, অথচ তাহাতে শিশুহৃদয়ের সন্নিহিত হইবার উপযোগিতাও অল্প। কিন্তু নবকৃষ্ণ বাবু শিশুদের অন্তরঙ্গ কবি। তিনি শিশু হইয়া ভাবিতে জানেন, এবং কবি হইয়া লিখিতে পারেন; এই জন্যই তিনি শিশুপাঠ্য কবিতায় সকলের শ্রেষ্ঠ।

নবকৃষ্ণ বাবুর গদ্যও যেমন সুন্দর, তেমনই সহজ। একাধারে গদ্য-পদ্যের

এমন সমাবেশ সচরাচর বিরল। "ছেলেখেলা"য় নবকৃষ্ণ বাবুর গদ্য পদ্য উভয়ের উৎকৃষ্ট আদর্শ আছে।

"ছেলেখেলা"র আর একটি গুণ, ভাষার বিশুদ্ধি। যে সকল বহি ছেলেদের হাতে পড়ে, তাহাদের ভাষা নির্দ্দোষ হওয়া আবশ্যক। দুর্ভাগ্যক্রমে ভাষার বিশুদ্ধিবিধানে আজকাল অনেকেই উপেক্ষাপ্রদর্শন করেন। অন্য লেখক-গণের ভ্রান্ত ভাষায় কেবল সাহিত্যই বিড়ম্বিত হয়, কিন্তু শিশুপাঠ্য পুস্তকের ভাষাগত ভ্রমপ্রমাদ মারাত্মক,—অমার্জ্জনীয়। সুখের বিষয়, নবকৃষ্ণ বাবুর গ্রন্থে এ দোষ নাই, তাঁহার রচনা অসঙ্কোচে ছেলেদের হাতে দেওয়া চলে।

"ছেলেখেলা"র অন্তঃশোভার পরিচয় দিলাম; তাহার বহিঃসৌন্দর্য্যও প্রশংসনীয়। চিত্রগুলি সুনির্ব্বাচিত,—অতিসুন্দর চব্বিশখানি উৎকৃষ্ট চিত্রের সমাবেশে গ্রন্থখানি বালকগণের লোভনীয় হইয়াছে।

কি রচনায়, কি শোভায়, "ছেলেখেলা" সর্ব্বাঙ্গসুন্দর।

২। খুকুমণির ছড়া

সম্প্রতি-প্রকাশিত একখানি শিশুপাঠ্য নূতন গ্রন্থ। শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সরকারের নাম শিশুপাঠ্য সাহিত্যে ইতিপূর্ব্বেই বিখ্যাত হইয়াছে। তিনি অধ্যবসায়বলে সাহিত্যের এই নূতন বিভাগে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছেন। এবার তিনি আমাদের দেশের কতকগুলি প্রাচীন ছড়ার সংগ্রহ করিয়া, "খুকুমণির ছড়া" নামে প্রচারিত করিয়াছেন। বঙ্গসাহিত্যে সুপ্রথিত-কীর্ত্তি, শ্রীযুক্ত বাবু রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় "খুকুমণির ছড়া"র একটি নাতিদীর্ঘ ভূমিকার রচনা করিয়াছেন। রামেন্দ্র বাবুর চিন্তাশীলতা সুপ্রসিদ্ধ, বক্ষ্যমাণ ভূমিকাতে তাহার পরিচয় অসুলভ নহে। রামেন্দ্র বাবু ভূমিকায় বলিতেছেন,—

"ইংরাজীতে বালক-জনের চিত্তাকর্ষক বিবিধ সাহিত্যগ্রন্থ রাশি রাশি বর্ত্তমান আছে। বাঙ্গালাতে এইরূপ গ্রন্থের সম্পূর্ণ অভাব ছিল। বর্ত্তমান গ্রন্থের প্রকাশক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্র-নাথ সরকার মহাশয় কয়েক বৎসর হইতে এই অভাব দূর করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন; তিনিই বাঙ্গালীর মধ্যে এই ক্ষেত্রে সর্ব্বপ্রথম পথপ্রদর্শক।"

লেখকের এই নির্দ্দেশ প্রকৃত নহে। প্রারম্ভে আমরা "শিশুপাঠ্য সাহিত্যে"র সঙ্ক্ষিপ্ত ইতিহাসের রেখাপাত করিবার চেষ্টা করিয়াছি। আমা-দের মতে, যোগীন্দ্র বাবুকে "এই ক্ষেত্রে সর্ব্বপ্রথম পথপ্রদর্শক" বলা যায় না। শিশুপাঠ্য মাসিকপত্র হইতেই বাঙ্গালায় শিশুপাঠ্য সরস রচনার আরম্ভ।

এ দেশে যোগীন্দ্র বাবুর অনেক পূর্ব্বেই তাহার সূচনা হইয়াছে। যোগীন্দ্র বাবু পথপ্রদর্শক না হউন, তিনি পথ প্রশস্ত করিয়াছেন। তাঁহার প্রয়াস, পরিশ্রম প্রশংসনীয়, সে বিষয়েও সন্দেহ নাই। তাঁহার গ্রন্থপ্রকাশের পরেই এ দেশে শিশুপাঠ্য সাহিত্যের প্রতি সাধারণের চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছে। তাঁহার পরিশ্রম সফল হউক, এই আমাদের আন্তরিক কামনা।

"খুকুমণির ছড়া"র আকার-প্রকার মনোরম। বাঁধাই অতি সুন্দর, বিলাতী বলিয়া ভ্রম হয়। অতিপ্রাকৃত ছবিগুলির কল্পনা মন্দ নহে, কিন্তু গার্হস্থ্য চিত্রগুলি কালানুগ ও সময়ানুরূপ হয় নাই। যে কালের ছড়া, চিত্রে সেই কালের আভাস ব্যক্ত হইলেই স্বভাবানুরূপ হইত।

ছড়ার উপযোগিতা ও আবশ্যকতা সম্বন্ধে ভূমিকা-লেখক রামেন্দ্র বাবু আমাদের বলিবার অবকাশ রাখেন নাই। ছেলেভুলানো ছড়া সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালে, সর্ব্বসমাজে সমান সমাদর লাভ করিয়াছে, করিতেছে ও চিরকাল করিবে। দুর্ভাগ্য বঙ্গদেশে সব জিনিসই ভাঙ্গে, কিন্তু কিছুই আর পুনর্গঠিত হয় না। ছড়াও যাইতে বসিয়াছে—এখন রক্ষার চেষ্টা না করিলে দিন কতক পরে ইহারাও বাঙ্গালীর অন্তঃপ্রকৃতির সেই স্নিগ্ধ, শান্ত, অদ্ভুত চিত্র লইয়া শীঘ্রই অন্তর্দ্ধান করিবে। যোগীন্দ্র বাবু তাহাদের কতকগুলি রক্ষা করিয়া আমাদের উপকার করিয়াছেন, এ বিষয়ে মতভেদ হইবার সম্ভাবনা অল্প।

কেহ কেহ বলেন, "একানোড়ে" প্রভৃতি কাল্পনিক "জুজু"র পুনরাবির্ভাব এই অঞ্চলসম্বল কাপুরুষ জাতির শৈশবজীবনের পক্ষে বাঞ্ছনীয় নহে; এখন বাঙ্গালীর পক্ষে শ্বেতাঙ্গ জুজুই যথেষ্ট। সে স্বতন্ত্র প্রশ্ন। ছেলেভুলানো ছড়ায় অনেক অতিপ্রকৃত অমানুষ ঘটনার সমাবেশ আছে। যাঁহারা তাহাদের সংস্পর্শে শৈশবপ্রকৃতির বিকৃতিসম্ভাবনা করেন, তাঁহাদের আশঙ্কা সমূলক কি না, সহসা বলা যায় না। সে তর্কের এ স্থল নহে;—আমরা রামেন্দ্রবাবুর পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভূমিকায় এই বহুকালসন্ধুচিত তর্কবহ্নির একটা নির্ব্বাণমুক্তির আশা করিয়াছিলাম। দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি এ বিষয়ে নীরব।

আর এক কথা, সব ছড়াগুলির অর্থবোধ হয় না; কতকগুলি বালকদের পক্ষে যথার্থই দুর্ব্বোধ। সুবোধ, দুর্ব্বোধ, উভয়বিধ ছড়ারই অন্য হিসাবে বিবিধ উপযোগিতা আছে। তাহা আমরা অস্বীকার করিতেছি না। কিন্তু যে সংগ্রহখানি "খুকুমণি"র জন্য কল্পিত, তাহাতে দুর্ব্বোধ ছড়ার সমাবেশ কেন? আশা করি, যোগীন্দ্র বাবু ভবিষ্যৎ সংস্করণে ছড়াগুলির নির্ব্বাচনবিষয়ে অধিকতর অবহিত হইবেন।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

ভারতী।—শ্রাবণ। প্রথমে "বাল্মীকি-মহিমায়" পাঁচটি চলনসই সনেট। "পত্নী-হারা" একটি অদ্ভুত উদ্ভট ক্ষুদ্র গল্প। আখ্যানবস্তুর অত্যন্ত অভাব। গল্পটির উদ্দেশ্য, বক্তব্য,

বা সৌন্দর্য্য আমরা অনুধাবন করিতে পারিলাম না। "বঙ্গমাতার কর্ত্তব্য" আলোচনার যোগ্য। "গুজরাটে হিন্দু পার্ব্বণ" নামেই প্রবন্ধের বক্তব্য সূচিত হইতেছে। লেখক অনেক পার্ব্বণের পরিচয় দিয়াছেন। "সুশীল মাইক্রোব" একটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ। "উত্তর-জ্যামিতি কথা" অনেক অঙ্কশাস্ত্রের পারদর্শী ব্যক্তিই বুঝিতে পারেন নাই, আমরা ত 'ও রসে বঞ্চিত'। "পেনে প্রীতি" একটি মনোরম ভ্রমণবৃত্তান্ত। ফুলওয়ালী মহারাষ্ট্রকন্যার প্রেমকাহিনী একটি ক্ষুদ্র গল্পের মত চিত্তাকর্ষক। "সার রমেশচন্দ্র মিত্র" প্রবন্ধে উক্ত মহা-পুরুষের জীবনকাহিনীর দুই একটি কথা বর্ণিত হইয়াছে।

প্রদীপ।—শ্রাবণ। শ্রীযুক্ত কালীনাথ দত্তের রচিত "রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর" প্রবন্ধে তাঁহার জীবনচরিতবর্ণনের চেষ্টা আছে। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বড়ালের "অপরিচিত" একটি সুন্দর গাথা। এবারকার 'প্রদীপে' উল্লেখযোগ্য রচনার একান্ত অভাব। কিন্তু শ্রীমতী সরলা দেবীর "ঐতিহাসিক চিত্র ও বঙ্কিম বাবু" নামক প্রবন্ধটির উল্লেখ না করিলে 'মধুরেণ সমাপয়েৎ'—এই বাক্যের সার্থকতা হয় না। লেখিকার নিজের রচনার সহিত পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকগণের রচনা হইতে উদ্ধৃত অংশের তুলনা করিলে, 'বার হাত কাঁকুড়ের তের হাত বীচি' এই বাঙ্গলা প্রবচনটি মনে পড়ে।

পূর্ণিমা।—শ্রাবণ। "মৃত্যুর পর" এখনও চলিতেছে। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়ের "ভালবাসা"—ভাল বুঝিতে পারিলাম না।—পূর্ণিমায় আধ্যাত্মিকতা অধিক,—উহাই পূর্ণিমার বিশেষত্ব। কিন্তু তাহার অধিকাংশই এমন হেঁয়ালি যে, বুদ্ধিগম্য হয় না। "শ্রীরামকৃষ্ণকথা" সুপথ্য। "মাসিক সাহিত্য সমালোচনা"য় নিপুণ মুন্সীয়ানার পরিচয় পাওয়া যায়।

তত্ত্বমঞ্জরী।—শ্রাবণ। "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত" সুপাঠ্য। শ্রীযুক্ত জয়চন্দ্র সিদ্ধান্ত-ভূষণের "শ্রীবিষ্ণু, লক্ষ্মী ও সরস্বতী" উল্লেখযোগ্য।

মুকুল।—শ্রাবণ। "পুরুষোত্তম পারঞ্জপে" উল্লেখযোগ্য। পারঞ্জপের ছবিখানিও বেশ হইয়াছে। "সেকালের কথা" একটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ—এখনও চলিতেছে। "নরহরি দাস" গল্পটি শিশুদের আনন্দবিধান করিবে। "ফুলের ভাষা" কবিতাটি মন্দ নহে। "আখ্যানমালায়" মানবপ্রকৃতির মহত্ত্বের দৃষ্টান্ত সংগৃহীত হইয়াছে। "বৃষ্টির গল্প" ও "হি হি হি" অকিঞ্চিৎকর হউক, কিন্তু ছেলেরা হাসিবে। মোটের মাথায় এবারকার "মুকুলে"র বৈচিত্র্য প্রশংসনীয়।

প্রয়াস।—আগষ্ট। "বর্ত্তমান বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রকৃতি ও সাহিত্য পরিষৎ" প্রবন্ধটি পড়িয়া বিস্মিত হইলাম। ব্যক্তিবিশেষের আচরণের জন্য কি পরিষৎ দায়ী? সভ্য-বিশেষের আচরণ বা ঘটনাবিশেষের অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিয়া, সভাবিশেষের মুণ্ডপাত করিবার চেষ্টা প্রশংসনীয় নয়। লেখক বলিতেছেন,—"এই সকল হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, পরিষদের সভ্যগণের মধ্যে মতের একতা নাই এবং চক্ষুলজ্জার অপেক্ষা না করিয়া সত্য সমালোচনা করিবার ক্ষমতা নাই।" হাঁড়ির একটা ভাত টিপিয়া দেখিলে সব ভাতের অবস্থাই জানা যায় বটে, কিন্তু সভা সমিতির পক্ষেও কি রন্ধনশালার সেই সনাতন নিয়মটি খাটে? "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে" বটতলার ছাপাখানা-ওয়ালা হইতে হাইকোর্টের বিচারপতি পর্য্যন্ত বিবিধ-শ্রেণীর বিবিধ ব্যক্তি সভ্যরূপে বিরাজমান। তাঁহাদের সকলেরই যে "চক্ষুলজ্জার অপেক্ষা না করিয়া সত্য সমালোচনা করিবার ক্ষমতা নাই," এরূপ নির্দ্দেশ অসঙ্গত, অন্যায়। লেখক আর এক স্থলে বলিতেছেন, "আমাদের বিশ্বাস, সাহিত্য-পরিষৎ যদি কতকগুলি আদর্শ নিয়ম নির্দ্ধারণ করিয়া দেন, * * * এবং যথেচ্ছ শব্দ ব্যবহার করিলে তীব্র সমালোচন করেন, তাহা হইলে দোষগুলির সংস্কার হইবার সম্ভাবনা।" কিন্তু এ সম্বন্ধে আমাদের বিশ্বাস অন্যরূপ। মনে হয়, পরিষদের এরূপ নিয়মনির্দ্ধারণের যোগ্যতাও নাই, অধিকারও নাই,—এবং যদি কখনও পরিষৎ এইরূপ কোনও অসাধ্যসাধনে,—অনধিকার-চর্চ্চায় হস্তক্ষেপ করেন, তাহা হইলে স্বয়ং বিড়ম্বিত হইবেন, কেহ পরিষদের কড়া হুকুম তামিল করিবে না। সভাবিশেষের আয়স নিগড়ে প্রতিদিন উপচীয়মান কোনও

ভাষা-শিশুর উদ্দাম গতির রোধ করা যায় না। প্রতিভার উচ্চ আদর্শে ভাষা কতকটা প্রভাবিত হইতে পারে।—আমাদের ভাষায় তাহার নমুনাও আছে। অস্বাভাবিক নিয়মবন্ধন কুত্রাপি সফল হয় না,—স্বাভাবিক গতির রোধেও সুফল পাওয়া যায় না। বঙ্গসাহিত্যের এই ফেনা, বুদ্বুদ,জঞ্জাল, সব কিছু চিরস্থায়ী নয় ; ইহারই নিম্নে ভবিষ্যৎ ভাষার পলি থিতাইয়া যাইতেছে। তাহা ভাল কি মন্দ, তুমি আমি বর্ত্তমানে দাঁড়াইয়া তাহার বিচার করিতে পারি না,—পারিবও না। তবে ইহা দেখিতেছি, এই অনিয়মের যুগে, এই উচ্ছৃঙ্খলার রাজ্যেও প্রতিভার উজ্জ্বল জ্যোতি দেখা গিয়াছে। তাই মনে হয়,—শত অপচার সত্ত্বেও বঙ্গভাষার গতি উন্নতির দিকে। এখন পরিষদের নিয়ম-রূপ 'হাতকড়ি' বা অপরিপক্ক-ব্যাকরণ-রূপ 'পায়েবেড়ী' দিলে বঙ্গসাহিত্য বন্দীর ন্যায় নিয়মানুগ হইলেও হইতে পারে, কিন্তু তাহার স্বাধীনতা স্ফূর্ত্তি থাকিবে না। দ্বিতীয়তঃ, নিয়মের প্রভাবে প্রতিভার উদয় হয় না ;—প্রতিভা আমদানী করিবার কোনও নিয়ম বোধ করি কোনও পরিষৎ করিতে পারিবেন না।—সুতরাং আমাদের বিশ্বাস বক্ষ্যমাণ লেখকের বিশ্বাস হইতে কিছু স্বতন্ত্র ;—অর্থাৎ আমাদের মনে হয়, পরিষৎ ভাষার আদর্শ নির্দ্ধারণ করিয়া দিলে 'হিতে বিপরীত' হইবে। শ্রীযুক্ত রসময় লাহার "বর্ষা-প্রকৃতি" কবিতাটি মন্দ নহে ; আর একটু সংক্ষিপ্ত হইলে ভাল হইত ; বিস্তৃতিদোষে বাঁধুনি শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। "বিষম দম্পতী" একটি পদ্য, হাস্যরসের উদ্রেক ইহার লক্ষ্য। কিন্তু ইহাতে হাস্যরসের লেশমাত্র নাই। আর ব্যক্তিবিশেষের অক্ষমতা দেখিয়া যে হাস্যের উদ্রেক হয়, ভদ্রসমাজে তাহার সংবরণ করাই বিধি। সুতরাং আমরা হাসিতে পারিলাম না। "প্রয়াসে" এরূপ পদ্য না দেখিলে আমরা সুখী হইব। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গুপ্তের "শেষপ্রতিমা" গল্পটি উল্লেখযোগ্য। আখ্যানবস্তুর কল্পনা যদি লেখকের নিজস্ব হয়, তাহা হইলে তাঁহার ভবিষ্যৎ-আশাপ্রদ। আশা করি, লেখক ভাষার প্রতি যথেষ্ট অবহিত হইবেন। ভাষার দৈন্যে ছোট গল্পের অত্যন্ত সৌন্দর্য্যহানি হয়।

নব্যভারত।—"শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত" সুপাঠ্য।—শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্যের "কুম্ভকট্ট" একটি প্রত্নতত্ত্ববিষয়ক উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ। শ্রীযুক্ত নিত্যকৃষ্ণ বসুর "বিরহী" কবিতাটি বোধ করি কবিবর বাল্য-রচনা।—মন্দ নহে। "ধম্মপদে" লেখক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ বৌদ্ধ-গ্রন্থ ধম্মপদের পরিচয় দিয়াছেন। প্রবন্ধটি ক্ষুদ্র, কিন্তু পঠনীয়। এবারকার "নব্যভারতে" "সেবকের-প্রণিপাত" যিনি পাঠ করিবেন, তিনিই আনন্দ লাভ করিবেন। সম্পাদকের পুত্র "খোকা"—নব্যভারতে যাঁহার "খোকার বিলাতের পত্র" প্রকাশিত হইত—এই সংখ্যায় "প্রভাতকুসুম" নামে পরিচিত হইয়াছেন। টীকায় সম্পাদক লিখিয়াছেন,—"প্রলোভনপূর্ণ বিলাতে যাইয়া অনেকেরই পতন হয়, বিধাতার অজস্র করুণার পরিচয় যে, প্রভাত আরো পবিত্রতায় ভূষিত হইয়া আসিয়াছে।" এই সংবাদে সমুদায় বাঙ্গালী পাঠক অবশ্যই আশ্বস্ত হইবেন। তাহার পর,—"প্রভাত যে সকল কথা লিখিয়াছে, তাহা পাঠ করিলে চক্ষের জল আইসে।" কিন্তু সকলের চক্ষু কি সমান 'পান্‌সে' ? আর তাঁহার ব্যারিষ্টার পুত্রের এই প্রবন্ধনামক বিজ্ঞাপনটি কি সার্থক হইবে ? নব্যভারত-সম্পাদক মহাশয় শ্রীশ্রীশারদীয়া পূজার এত পূর্ব্বে পুত্রটিকে "দেশের কাজে উৎসর্গ" করিলেন কেন ? "সেবকের প্রণিপাত" জনসমাজের, সাহিত্যের, ভাষার কি কাজে লাগিবে ?—ইত্যাদি বিবিধ প্রশ্নে আমাদের সংসারমুগ্ধ স্বার্থপর চিত্ত আকুল হইয়া উঠিতেছে। আমরা অধিক আর কি বলিব—"বাপ্‌কা বেটা, সিপাহীকা ঘোড়া, কুচ্ নেহী তব্বী থোড়া"—এই প্রবাদটি অত্যন্ত সত্য ;—শ্রীমান্ প্রভাতকুসুম বাপের নাম রাখিতে পারিবেন,—"সেবকের প্রণিপাত" পড়িয়া' সে বিষয়ে আমাদের আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। নব্যভারত- সম্পাদকের কি এমন কোনও বিষয়বুদ্ধিবিশিষ্ট বন্ধু নাই—যিনি, 'পরিবার' ও 'সাধারণ' এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী সীমানা সম্পাদককে দেখাইয়া দিয়া, তাঁহাকে হাস্যরসের উৎস হইতে নিষেধ করেন ?
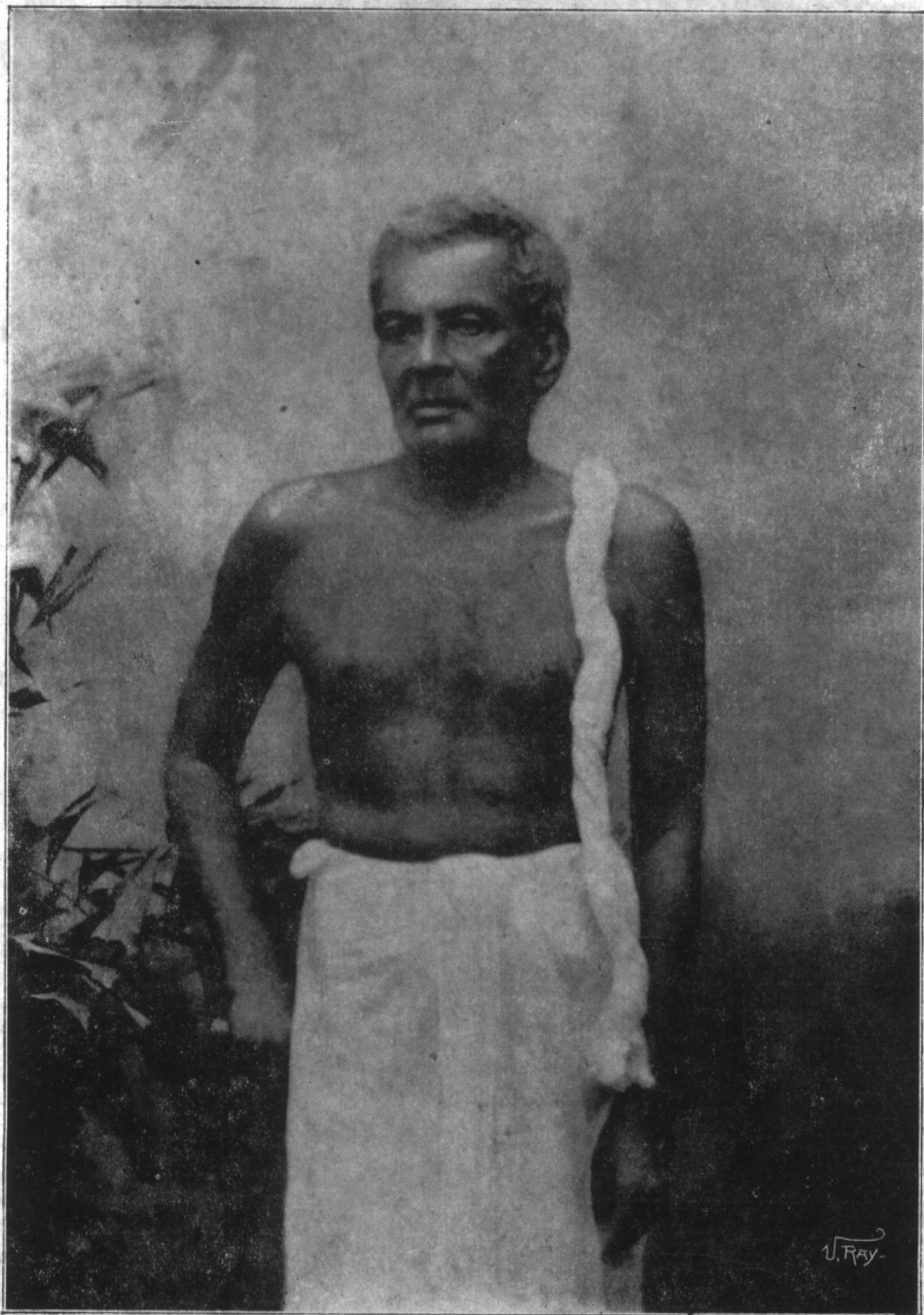
স্বগীয় আনন্দকৃষ্ণ বসু

[handwritten library annotations]

পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ও গৌড়ের প্রাচীনতা।

সুপ্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ সার উইলিয়ম হাণ্টার, প্রাচীন বাঙ্গালার রাজধানী গৌড় ও পাণ্ডুয়া এতদুভয়ের মধ্যে গৌড়কেই প্রাচীনতর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু স্থানীয় অভিজ্ঞতা, ভগ্নাবশেষের সযত্ন পরীক্ষা, এবং পুরাণাদি প্রাচীন শাস্ত্র, নবাবিষ্কৃত বৌদ্ধগ্রন্থ ও তাম্রশাসনাদির পর্য্যালোচনা করিলে, পাণ্ডুয়াকেই প্রাচীনতর বলিয়া মনে হয়।

বরিন্দ ও দিয়াড়া,—মালদহ জেলাকে এই দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। বরিন্দ উচ্চ ও প্রাচীন ভূভাগ; দিয়াড়া নবোৎপন্ন নিম্ন ভূখণ্ড। গৌড় দিয়াড়ায় পরিবেষ্টিত; পাণ্ডুয়া বরিন্দের অন্তর্গত। গৌড়ের অনেকাংশ বন্যায় প্লাবিত হয়, কিন্তু পাণ্ডুয়ার সীমান্তেও বন্যার প্রভাব অনুভূত হয় না। দিয়াড়া অঞ্চলে, এক গৌড় ব্যতীত অন্য কোথাও একখণ্ড ইষ্টক, প্রস্তর, বা সামান্য কৃত্রিম জলাশয় পরিদৃষ্ট হয় না, কিন্তু বরিন্দ অঞ্চলে নিবিড় জঙ্গলের মধ্যেও সর্ব্বত্রই বহুসংখ্যক বিশাল সরোবর ও প্রচুরপরিমাণ ইষ্টক প্রস্তর পতিত রহিয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। বরিন্দ এখন অস্বাস্থ্যকর বলিয়া অবজ্ঞাত, এবং কোচ, পলি, রাজবংশী প্রভৃতি অনার্য্যজাতির অধ্যুষিত বলিয়া ধিক্কৃত; কিন্তু এক সময়ে বরিন্দ প্রাচীন গৌরবাস্পদ বরেন্দ্ররাজ্য ও প্রাচীনতর পুণ্ড্ররাজ্যের কেন্দ্রস্থল ছিল। মালদহের ভূতপূর্ব্ব অনুসন্ধিৎসু ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত সি. এ. স্যামুয়েল্স্ বরিন্দের অবস্থা সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে, এই বরিন্দ অঞ্চলে প্রাচীনকালে নগরশ্রেণী বিরাজমান ছিল। যে কেহ বরিন্দ অঞ্চলে একবারমাত্র ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিবেন, তিনি উত্তর দক্ষিণে বিস্তারিত হিন্দুকীর্ত্তি, পুষ্করিণীসমূহ ও ভগ্নকরপদ, বিশ্লিষ্টনাসাকর্ণ, খণ্ডিতমুণ্ড প্রস্তরপ্রতিমা ও হলকৃষ্ট ক্ষেত্রমধ্যে প্রাচীন প্রাচীরের প্রোথিত ভিত্তিমূল, ইষ্টকবিনির্ম্মিত রথ্যা, বা সেতুর ভগ্নাবশেষ, অথবা ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত ইষ্টকরাশি দেখিয়া, শ্রীযুক্ত স্যামুয়েল্স্ সাহেবের উক্তির যাথার্থ্য উপলব্ধি করিবেন, এবং এই অঞ্চলেই পাণ্ডুয়ার অবস্থান দেখিয়া পাণ্ডুয়াকে প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ও বরিন্দ অঞ্চলকে প্রাচীন পুণ্ড্ররাজ্যের একাংশ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিবেন।

গোমস্তাপুর, মালদহ, গাজোল ও নবাবগঞ্জ, এই কয়েকটি থানা মালদহ জেলার অন্তর্গত ও বরিন্দ ভূভাগে অবস্থিত। এই কয়েকটি থানার অন্তর্গত বহুসংখ্যক স্থানে ভগ্ন বৌদ্ধপ্রতিমা পতিত আছে। এই সকল বৌদ্ধপ্রতিমা অনেক স্থলে হিন্দু দেবতার আসন প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং হিন্দু ব্রাহ্মণের হস্তে নিয়মিতরূপে সচন্দন পুষ্পাঞ্জলি লাভ করে। গোমস্তাপুর থানার অন্তর্গত নগরপাড়া গ্রামের নিকটবর্ত্তী জঙ্গলের মধ্যে ও পুরাতন মালদহ নগরের উত্তর-পূর্ব্বাংশে যোগীভবন নামক স্থানে ও মাধাইপুরের সুপ্রসিদ্ধ কালীমন্দিরে কয়েকটি প্রস্তরপ্রতিমা অপেক্ষাকৃত ভাল অবস্থায় আছে। এই প্রস্তর-প্রতিমাগুলিকে যে কেহ প্রথম দর্শনেই বৌদ্ধমূর্ত্তি বলিয়া চিনিতে পারিবেন। বৌদ্ধযুগের শেষ অবস্থায় বৌদ্ধধর্ম্ম পৌত্তলিকতায় পরিণত হইয়াছিল; সম্ভবতঃ, সেই সময়ে এই সকল বৌদ্ধপ্রতিমা বিনির্ম্মিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়।

পালরাজগণ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। ইঁহারা বৌদ্ধ হইলেও, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রতি সমাদরপ্রদর্শনে বিমুখ ছিলেন না। ইঁহারা যে শাসনপত্রের দ্বারা মহাভারত-পাঠক ব্রাহ্মণকে দক্ষিণাস্বরূপ ভূমিদান করিতেন, সেই শাসন-পত্রেরই উপরিভাগে "নমো বুদ্ধায়" ক্ষোদিত হইত। পালরাজগণের পরবর্ত্তী সেনরাজগণ বৌদ্ধগণের প্রতি এই উদারতাপ্রদর্শনে সক্ষম হন নাই। সেন-রাজগণের সময় ব্রাহ্মণ্য শৈবধর্ম্ম গৌড়ে প্রচলিত হয়, এবং সম্ভবতঃ শৈবগণের তাড়নায় বৌদ্ধধর্ম্ম বাঙ্গলা হইতে বিদায়গ্রহণ করে। এই হেতু বরিন্দ অঞ্চলের জঙ্গলে যে সকল বুদ্ধমূর্ত্তি পরিদৃষ্ট হয়, আমার বিশ্বাস, তাহা পালরাজ-গণের সময়ে, বা তৎপূর্ব্বে, ঐ অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পালরাজগণ খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর প্রারম্ভে গৌড়ে রাজত্ব করেন, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত; সুতরাং এই প্রমাণে প্রতিপন্ন হয়, খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন বিদ্যমান ছিল।

হোয়েন্থসাং খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারতবর্ষে আগমন করিয়া পুণ্ড্রদেশের সমৃদ্ধিশালিতা লক্ষ্য করেন। এই সময়ে তিনি পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে বিংশতিটি বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম, তিন শত বৌদ্ধ পুরোহিত ও কয়েক শত হিন্দু দেবালয় দেখিতে পান। ফ্রাঙ্কলিন, কনিংহাম, রাভেন্সা প্রভৃতি গৌড় ও পাণ্ডুয়ার প্রত্নতত্ত্বসংগ্রাহকগণ পাণ্ডুয়ার আদীনা মসজিদের বহুসংখ্যক প্রস্তরে হিন্দুদেবতার ক্ষোদিত প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে পাইয়াছেন। কিন্তু একটু বিশেষ অনুধাবনপূর্ব্বক পর্য্যবেক্ষণ করিলে, ঐ সকল দেবমূর্ত্তির কোন কোনটিতে বুদ্ধমূর্ত্তির সাদৃশ্য বিশদরূপে প্রতিভাত হইবে। আবার অপর কতকগুলি

প্রস্তরের চিত্ররেখা পরীক্ষা করিলে সুস্পষ্টই অনুমিত হইবে যে, ঐগুলি বৌদ্ধস্তূপের পাদদেশগঠনার্থ ব্যবহৃত হইয়াছিল। (১) দূরস্থ বিহারের বৌদ্ধস্তূপ ভাঙ্গিয়া আনিয়া আদীনা মসজিদ নির্ম্মিত হইয়াছিল, ইহা বোধ হয় কেহ অনুমান করিতে সাহসী হইবেন না। সুতরাং ইহা অনায়াসে বলা যাইতে পারে যে, এখন যেখানে পাঠানগণের রাজধানী পাণ্ডুয়ার ভগ্নাবশেষ অবস্থিত, সেই স্থলে বা তাহার অনতিদূরে এক সময়ে একটি প্রাচীন বৌদ্ধনগর বা জনপদ বর্ত্তমান ছিল, এবং ইহা খুবই সম্ভবপর যে, হোয়েন্থসাংএর পৌণ্ড্রবর্দ্ধনই পরে মুসলমানগণের পাণ্ডুয়া ও কোনও প্রাচীন বৌদ্ধস্তূপ সেকন্দর শাহের আদীনা মসজিদে পরিণত হইয়াছিল। বৌদ্ধ পরিব্রাজকের পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ও বর্ত্তমান পাণ্ডুয়া অভিন্ন হইলে, পাণ্ডুয়ার আরও অধিক প্রাচীনতা প্রতিপন্ন হইতেছে।

হোয়েন্থসাং পৌণ্ড্রবর্দ্ধনকে একটি স্বতন্ত্র রাজ্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, এবং পালরাজগণের তাম্রশাসনে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন একটি ভুক্তি (রাজ্যাংশ = পরগণা বা জেলা) বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহাতে বোধ হয় যে, পাল-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা, বা তৎপূর্ব্ববর্ত্তী কোনও রাজার বা রাজবংশের অধিকার-কালে, গৌড়রাজ্যের আবির্ভাব ও প্রভাবে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন রাজ্যের স্বাতন্ত্র্য ও গৌরব বিলুপ্ত হইয়া যায়। যদি আমার এই অনুমান ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া পরিগৃহীত হয়, তবে গৌড় অপেক্ষা পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের অধিকতর প্রাচীনতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য আর আয়াসস্বীকার করিতে হইবে না।

আমার জনৈক শ্রদ্ধেয় বন্ধুর সহিত গৌড়ের প্রাচীনতার বিষয়ে আলোচনা হয়। আলোচনাকালে উক্ত বন্ধু বলেন যে, পতঞ্জলি-প্রণীত পাণিনীয় মহাভাষ্যে গৌড়ের নামোল্লেখ আছে, এবং বাঙ্গালা দেশের অন্তর্গত গৌড় ও মহাভাষ্যে উল্লিখিত গৌড় অভিন্ন। পতঞ্জলি খ্রীষ্টপূর্ব্ব দুই শত বৎসরের মধ্যে

---

(১) "It is a noticeable fact that the stones of the Adina mosque, while they show on the reverse side unmistakable signs of having been part of a Hindu Temple, also, I think, show signs in some places of having been employed at the base of a Buddhist stupa. The lower line of stones on which the mosque rests are carved in the form of the wellknown Buddhist railing, which would scarcely have been executed by a Mahomedan or a Hindu."—Mr Samuells in the District Census Report for Malda no 338 G. dated the 5th March, 1892.

আবির্ভূত হন। এই হিসাবেও, গৌড় পৌণ্ড্রবর্দ্ধন অপেক্ষা প্রাচীনতর হইতেছে।

অশোক-অবদান নামক একখানি প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থ নেপালে আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই গ্রন্থখানি অশোকের রাজত্বকালের অধিক পরে সঙ্কলিত হইয়াছে, এরূপ অনুমান করিবার কোনও কারণ নাই। ইহা অশোকের বৌদ্ধগুরু উপগুপ্তের জনৈক শিষ্যের প্রণীত বলিয়া পরিচিত। এই গ্রন্থে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের উল্লেখ আছে। বৌদ্ধদ্বেষী বীতশোক, তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর বৌদ্ধধর্ম্মানুরাগী সম্রাট অশোক কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া আত্মরক্ষার্থ ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের দুর্ভেদ্য আশ্রয়দুর্গস্বরূপ পৌণ্ড্রবর্দ্ধন রাজ্যে পলায়ন করেন। অশোক ২৭০ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে রাজসিংহাসন লাভ করেন। তাঁহার রাজত্বের নবম বৎসরে বহু রক্তপাত ও জীবনধ্বংসের পর তাঁহার রাজ্যভুক্ত হয়। তাহার পরেই তাঁহার মনে বিরাগের সঞ্চার হয়, এবং তিনি অহিংসামূলক বৌদ্ধধর্ম্মের অনুরাগী হন। সম্ভবতঃ, এই সময়ের অনতিপরেই বীতশোক, পাটলীপুত্র হইতে বিতাড়িত হইয়া পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে পলায়ন করেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, অশোক-অবদানের মতে মহাভাষ্যোক্ত গৌড় অপেক্ষাও পৌণ্ড্র-বর্দ্ধনের বয়স অধিক হইতেছে। অশোক-অবদানের মতে, পৌণ্ড্রবর্দ্ধন অন্ততঃ ২৫০ পূর্ব্ব খৃষ্টীয় অব্দে একটি প্রবল প্রসিদ্ধ রাজ্য ছিল।

পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের তুলনায় গৌড় যে আধুনিক রাজ্য, তাহার আর একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই যে, রামায়ণ মহাভারতাদি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে পুণ্ড্ররাজ্যের উল্লেখ আছে, কিন্তু গৌড়ের উল্লেখ নাই। পুণ্ড্র, পুণ্ড্রবর্দ্ধন ও পৌণ্ড্রবর্দ্ধন যে একই জনপদ, তৎসম্বন্ধে প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে মতভেদ নাই। পুণ্ড্রবর্দ্ধন বা পৌণ্ড্রবর্দ্ধন পুণ্ড্ররাজ্যের রাজধানী ছিল।

এ পর্য্যন্ত যাহা আলোচনা করা গেল, তাহাতে বর্ত্তমান পাণ্ডুয়া ও প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্দ্ধন অভিন্ন বলিয়াই স্থিরীকৃত হইতেছে, এবং পৌণ্ড্রবর্দ্ধন যে গৌড় অপেক্ষা প্রাচীনতর, তাহাও প্রতিপাদিত হইল। এতদ্ভিন্ন প্রমাণান্তরেও এই মীমাংসাই সমর্থিত হয়। "পৌণ্ড্রক বাসুদেব" ইতিশীর্ষক পৌরাণিক ইতিবৃত্তমূলক প্রবন্ধে ঐ সকল প্রমাণের উল্লেখ করিয়াছি (১) বলিয়া, এ স্থলে অনাবশ্যকবোধে তৎসমুদায়ের পুনরুল্লেখ করিলাম না।

(১) ঐতিহাসিক চিত্র।

সামাজিক ব্যাধি ও তাহার প্রতীকার। *

মানবদেহে কতকগুলি ব্যাধি আছে, তাহাদের প্রত্যেকের জন্য সহস্রবিধ ঔষধের ব্যবস্থা শুনিতে পাওয়া যায়। সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপনস্তম্ভে এই শ্রেণীর প্রত্যেক রোগের জন্য সংখ্যাতীত অব্যর্থ ঔষধের নূতন আবিষ্কার আড়ম্বর-সহকারে প্রতিনিয়ত ঘোষিত হইয়া থাকে। কিন্তু দুর্ভাগ্য রোগিসম্প্রদায়-মধ্যে যাঁহার কিছু অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে, তিনিই জানেন, যেথানে অব্যর্থ ঔষধের সংখ্যা যত অধিক, রোগমুক্তির আশাও সেথানে ততই সামান্য।

এই ঘটনাকে একটা নৈসর্গিক নিয়মের একটা উদাহরণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। যে স্থলে উপদেষ্টার সংখ্যাবাহুল্য বিদ্যমান, সেথানে উপদেশ বিশেষ ফল প্রসব করে না বলিয়াই বুঝিতে হইবে। যেখানে শিক্ষাদানের জন্য বিপুলসংখ্যক শিক্ষকের সৃষ্টি আবশ্যক হয় নাই, সেখানে ফলোৎপত্তিও শিক্ষক-দত্ত উপদেশের অপেক্ষায় বসিয়া থাকে না।

পৃথিবীর বর্ত্তমান দেড় শত কোটী অধিবাসীর মধ্যে প্রায় প্রত্যেকেই জননী-গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া জননীর স্নেহে পালিত হইয়া মানুষ হইয়াছে, কিন্তু এই অত্যন্ত প্রাচীনা বসুন্ধরার পৃষ্ঠদেশে এমন কত দেড় শত কোটী মানব এ পর্য্যন্ত মর্ত্ত্যলীলা সমাপন করিয়া চলিয়া গেল; কিন্তু জননীগণকে অপত্যস্নেহের উপদেশ দিবার জন্য একখানাও নীতিপুস্তক এ পর্য্যন্ত রচিত হইল না; অথবা ধর্ম্মপ্রচারকমুখে একটাও গুরুগম্ভীর sermon প্রদত্ত হইল না। অথচ সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে প্রত্যেক জননী বিনা উপদেশে, বিনা আইনে, বিনা পুলিশে, অপত্যের প্রতি আপনার কর্ত্তব্য যথোচিতরূপে সম্পাদন করিয়া আসিতেছে। পক্ষান্তরে, যে দিন হইতে বিদ্যালয়-নামক শিশুজনভয়ঙ্কর পদার্থের আবিষ্কার হইয়াছে, সেই দিন হইতেই পণ্ডিত মহাশয়ের প্রতি ভক্তি-প্রদর্শনের ঔচিত্য সম্বন্ধে কত সালঙ্কারা বক্তৃতামালা ছাত্রবৃন্দের প্রতি প্রদত্ত হইয়া আসিতেছে; তথাপি ডিসিপ্লিনের ও ইণ্টারস্কুল রুলের এত কড়াকড়ির দিনেও, এই ছাত্রবৃন্দের মধ্যে এমন উদাহরণ বিরল নহে, যাহারা জনান্তিকে

---

* গত ৮ই আশ্বিন সাবিত্রী লাইব্রেরীর বাৎসরিক অধিবেশনে পঠিত।

মাষ্টার মহাশয়কে নিতান্ত অশাস্ত্রীয় বিশেষণে সম্বোধন করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না।

আমাদের সমাজমধ্যে উপদেষ্টার সংখ্যা ও গুরুর সংখ্যা যেরূপ সমগুণ-শ্রেঢ়ীর নিয়মানুসারে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া আসিতেছে, তাহাতে সমাজের ভবিষ্যৎ সামাজিকগণের পক্ষে চিন্তার বিষয় হইয়াছে বলিয়াই বোধ হয়। বর্ত্তমানকালে আমাদের সমাজ বিবিধ ব্যাধিতে রুগ্ন ও জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, সন্দেহ নাই ; কিন্তু চিকিৎসকের সংখ্যাধিক্য দেখিয়া এক একবার আশঙ্কা হয়, বুঝি বা বৈদ্যসঙ্কটেই রোগীর প্রাণ যায়। প্রত্যেক বৈদ্যরাজই এক একটা অব্যর্থ ঔষধের পেটেণ্ট লইয়া তারস্বরে চীৎকার করিতেছেন ও প্রশংসাপত্র-মণ্ডিত ঔষধের বোতল মাথায় রাজপথে হুঙ্কার করিয়া গৃহস্থের শান্তিভঙ্গ করিতেছেন। কিন্তু হায়! অমোঘ ঔষধের সংখ্যাও যে পরিমাণে অধিক, রোগপ্রতীকারের সম্ভাবনাও সেই পরিমাণে অল্প।

বর্ত্তমান সময়ে যদি কোন অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তি আপনাকে অকস্মাৎ লোকসমাজে জাহির করেন ও সামাজিক ব্যাধির উৎকটতা সম্বন্ধে লেক্‌চার দিতে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে তাঁহার প্রতি ভদ্রজনের সংশয়সমাকুল দৃষ্টিপাত কতকটা স্বাভাবিক হয়। সাধারণে আশঙ্কা করিতে পারেন, এই অপরিচিত মনুষ্যটির অসাময়িক বক্তৃতাবর্ষণের পর মুহূর্ত্তেই তাঁহার ঝুলি হইতে এমন একটি কৌটা বাহির হইবে, যে কৌটার অন্তর্গত বটিকাগুলি সাইবীরিয়ার তুষারক্ষেত্র হইতে আনীত ম্যামথের অস্থিচূর্ণ হইতে প্রস্তুত হওয়ায় একেবারে অব্যর্থ, এবং তাহার একটি কৌটামাত্র যিনি খরিদ করিবেন, তাঁহার রোগ-মোচন ত হইবেই, পরন্তু পথ্যলাভের পরদিনই কবিরাজ মহাশয় ঘটকালি করিয়া ক্যাম্‌স্‌কট্‌কার রাজকন্যার সহিত রোগীর বিবাহ ঘটাইয়া দিবেন।

সাবিত্রী লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ মহোদয়েরা নিতান্ত অনুকম্পা করিয়া যে অক্ষম ব্যক্তিকে এই মাননীয় জনসাধারণের সমক্ষে দণ্ডায়মান হইতে সাহসী করিয়াছেন,সেই ব্যক্তি যদি সেই শ্রদ্ধালব্ধ অনুকম্পার অপব্যবহারে প্রবৃত্ত হইয়া দুঃসাধ্য সামাজিক ব্যাধির প্রতীকার সম্বন্ধে গম্ভীরভাবে উপদেশ দিতে প্রস্তুত হয়, তাহা হইলে তাহার অহম্মুখতা হয় ত মার্জ্জনীয় বলিয়া বিবেচিত হইবে না। কিন্তু পূর্ব্ব হইতেই যদি অপরাধ স্বীকার করিয়া লইয়া এই অপকার্য্যে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে আমার পরমসহিষ্ণু শ্রোতৃমহোদয়গণ ক্ষমার জন্য কতকটা প্রস্তুত হইয়া থাকিবেন, এইরূপ ভরসা করিতে পারি। এবং শ্রোতৃ-

বৃন্দ যখন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অনুগ্রহবর্ষণে উন্মুখ, তখন তাঁহাদের সহিষ্ণুতা-পরীক্ষায় আমারও কতকটা অধিকার আছে,—ধরিয়া লইতে পারি।

আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াই দেখিতে পাই, আমাদের সমাজে সর্ব্বত্রই একটা নৈরাশ্যের আবির্ভাব হইয়াছে। আমরা বড় একটা আশা বুকে বাঁধিয়া এতকাল আশ্বস্ত ছিলাম, যেন সে আশা আমাদের চূর্ণ হইয়াছে। আমরা এত দিন ধরিয়া যাহার মুখ চাহিয়া ছিলাম, সে যেন আমাদিগকে ফেলিয়া গিয়াছে। এখন কেবল অতৃপ্ত বাসনার আর অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষার বিষাদধ্বনি কোথাও অস্ফুটভাবে, কোথাও পরিস্ফুটভাবে, সমুদ্গত হইতেছে। এই আকালিক বিষাদের, এই নৈরাশ্যের মূল কি?

অধিক দিনের কথা নহে, বোধ করি পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে, আমাদের ত এমন অবস্থা ছিল না। যে আশালতা আজ ছিন্নমূল হইয়া ভূতলে লুণ্ঠিত হইতেছে, সেই আশালতার তখন সতেজে অঙ্কুরোদ্গম হইতেছিল। পঞ্চশতবর্ষব্যাপিনী অশান্তির পর যখন আমরা পরাক্রান্ত পাশ্চাত্য জাতির রাজচ্ছত্রতলে আশ্রয়লাভ করিয়া প্রথম শান্তির মুখ দেখিতে পাইয়াছিলাম, তখনই এই আশালতার অঙ্কুরোদ্গম হইয়াছিল। যখন পাশ্চাত্য সভ্যতার তীব্র আলোক আমাদের মুদিত নেত্রকে সহসা খুলিয়া দিল, তখন আমরা যেন দীর্ঘনিদ্রার অবসানে সহসা প্রবুদ্ধ হইয়া নূতন ভাস্করের প্রভাতকিরণ দেখিতে পাইলাম, আমাদের মৃতকল্প শরীরে নবজীবনের সঞ্চার হইল। যখন দস্যু তস্করের হস্ত হইতে আমাদের ধনপ্রাণ নিরাপদ হইল, যখন প্রবঞ্চক প্রতিবেশীর হস্ত হইতে সম্ভ্রমরক্ষার জন্য রাজদ্বার অবারিতভাবে উন্মুক্ত হইল, যখন স্কুল কালেজ বিশ্ববিদ্যালয়াদির প্রতিষ্ঠা দ্বারা অভিনব সভ্যতার সহিত ও বৃহত্তর জগতের সহিত আমাদের নূতন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় সম্পর্ক স্থাপিত হইল, যখন ষ্টীম এঞ্জিন ও টেলিগ্রাফ এই নূতন সভ্যতার অজেয় বিক্রম ও অতুল ঐশ্বর্য্য ও অমিত মহিমার সহিত আমাদের পরিচয়স্থাপন করিয়া আমাদিগকেও সেই বিক্রমের ও ঐশ্বর্য্যের ও মহিমার অংশভাক্ করিবার আশা দিল, তখন আমাদের আশালতা যে অচিরে পুষ্পপল্লবে সুশোভিত হইয়া উঠিবে, তাহার সংশয়মাত্রও নিরাকৃত হইয়াছিল। কিন্তু সে অধিক দিনের কথা নহে; সিপাহীযুদ্ধের বিপ্লবান্তে যে মহীয়সী মহারাজ্ঞী ভারতের সাম্রাজ্যভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া বিংশ কোটী প্রজার হৃদয় অভয়বাণী দ্বারা আশ্বস্ত ও আনন্দিত করিলেন, সেই পূজনীয়া মহিলা আজ পর্য্যন্ত বেলাবপ্রবলয়া পরিখীকৃতসাগরা বসুন্ধরার ঐশ্বর্য্যমহিমমণ্ডিত

সিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন ; কিন্তু তাঁহার কোটী প্রজার হৃদয়ে যে আশার ও আশ্বাসের ও পুলকের সঞ্চার হইয়াছিল, তাহা যেন অঙ্কুরেই ছিন্ন হইয়াছে। পাশ্চাত্য জাতির সম্পর্কে আসিয়া আমরা যে ভাবী ঐশ্বর্য্যের স্বপ্ন দেখিতেছিলাম, সে সুখস্বপ্ন যেন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। যে মোহের ঘোরে আমরা এতদিন আচ্ছন্ন ছিলাম, সে মোহের ঘোর যেন কাটিয়া গিয়াছে। কেহ যেন আমাদের কাণে কাণে দৃঢ়স্বরে বলিয়া দিয়াছে, তোমরা দীন, কুটীরমধ্যে ছিন্ন কন্থায় শয়ন করিয়া তোমরা ঐশ্বর্য্যের স্বপ্ন দেখিতেছিলে, সে স্বপ্ন সফল হইবার নহে। পরন্তু তোমরা ভিক্ষুক ; ভিক্ষুকের জীবনে শ্রেয়োলাভের আশা বিড়ম্বনা। গত কতিপয় বর্ষ ধরিয়া যাঁহারা ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াছেন, তাঁহাদিগকে অধিক কথা খুলিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই।

ফলে আমরা যে পথ অবলম্বন করিয়া এত দিন চলিতেছিলাম, সে পথ যেন ঠিক্ পথ নহে ; এখন কোন্ নূতন পথ আমাদের অবলম্বনীয়, তাহার নির্ণয়ই আমাদের সামাজিকগণের পক্ষে প্রধান কর্ত্তব্য হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু পথ-ভ্রান্ত পথিক যেমন দিশাহারা হইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়ে, আকাশের ধ্রুবতারা তখন তাহার সংশয়াকুল চিত্তে বিশ্বাসস্থাপনে সমর্থ হয় না, আমরাও সেইরূপ দিশাহারা হইয়া গন্তব্যপথনির্ণয়ে অসমর্থ ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছি ; কোন্ অনির্দ্দেশ্য স্থান হইতে কাল মেঘ আসিয়া আমাদের সেই ক্ষীণপ্রভ ধ্রুবতারাটিকেও ঢাকিয়া ফেলিয়াছে।

যদি কেহ মনে করেন, আমি কোন কাল্পনিক বিভীষিকায় আতঙ্কিত হইয়া আপনি প্রতারিত হইতেছি ও অন্যকে অমূলক আশঙ্কায় উদ্বেজিত করিবার চেষ্টা পাইতেছি, তাঁহাদিগকে আমার মনের ভাব স্পষ্ট করিয়া বুঝাইবার জন্য দুই একটা উদাহরণের উল্লেখ আবশ্যক হইতে পারে। দুর্ভাগ্যক্রমে এইরূপ উদাহরণও নিতান্ত বিরল নহে, এবং তাহা সংগ্রহ করিবার জন্য আমাদিগকে অধিক দূর যাইতে হইবে না। আমরা যে কাজে হাত দিতে যাই, সেই কাজই শেষ পর্য্যন্ত পণ্ড হইয়া পড়ে। আমরা যে পথে কোন একটা লক্ষ্যের অভিমুখে গমন করি, সেই পথ আমাদিগকে সেই লক্ষ্যের নিকটবর্ত্তী না করিয়া সম্পূর্ণ বিপরীত মুখে লইয়া যায়। অন্যান্য দেশে যে প্রণালীতে যে কার্য্য সম্পন্ন হয়, আমাদের দেশে সে প্রণালীতে সেই কার্য্য সম্পন্ন করিতে গেলে শেষ পর্য্যন্ত নিষ্ফল হইতে হয়। আমরা পূর্ব্ব হইতে গণনা করিয়া যে ফলের জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকি, সে ফল যথাসময়ে উপস্থিত হয় না ; যাহা আমরা মনে

ভাবি না, তাহাই আসিয়া উপস্থিত হয়। আমার বক্তব্য পরিস্ফুট করিবার জন্য একটা উদাহরণের আলোচনা করিব, আমাদের দেশের শিক্ষাপ্রণালী। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানি যখন ভারতবর্ষের প্রজাগণের শিক্ষাভার গ্রহণ করেন, তখন বাগ্‌দেবী প্রাচ্য বা প্রতীচ্য কোন্ মূর্ত্তিতে আমাদের উপাসনা গ্রহণ করিবেন, এই কথা লইয়া একটা বিতণ্ডা উপস্থিত হইয়াছিল। সেই বিতণ্ডার ইতিবৃত্ত ও চরম মীমাংসা সর্ব্বজনবিদিত; তাহার বিস্তৃত পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নাই। প্রাচ্য শিক্ষা ও প্রতীচ্য শিক্ষা উভয়ের পক্ষেই বড় বড় মহারথ অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া দ্বন্দ্বক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। শেষ পর্য্যন্ত যাঁহারা প্রতীচ্য শিক্ষা-প্রণালীর পক্ষপাতী, তাঁহারাই জয় লাভ করেন। তাঁহাদের যুক্তি কতকটা এই-রূপ। ভারতবাসীর ধাতুতে ও মজ্জাতে বৈজ্ঞানিকতার অত্যন্ত অভাব; প্রাচ্য প্রণালীর শিক্ষা সেই অভাবের পূরণ করিতে কিছুতেই সমর্থ হইবে না। ভারত-বাসী চিরদিন ধরিয়া কাব্য লিখিয়া আসিতেছে ও স্বপ্ন দেখিয়া আসিতেছে; তাহাদের নিকট বাহ্যজগৎটা সমগ্রই একটা তরল পদার্থে অথবা একটা ছায়া-ময় কল্পনার সামগ্রীতে পরিণত হইয়াছে, সেই জন্য বাহ্যজগতের উপর তাহাদের কিছুমাত্র প্রসক্তি নাই। সেই জন্য তাহারা বাহ্যজগতের উপর প্রভুত্বলাভেও সমর্থ হয় নাই। বাহ্যজগৎকে তাহারা যথাসাধ্য অপমানিত করিয়াছে, তাহাতেই যেন জগৎও অপমানিত বোধ করিয়া আর তাহাদিগকে ধরা দিতে চাহে না; তাহাদের স্পর্শের মধ্যে আসিতে চাহে না। ভারতবাসী যখন বাহ্যজগৎকে আলিঙ্গন করিতে উপস্থিত হয়, তখন বাহ্যজগৎ তাহার নিকট হইতে দূরে পলায়। ভারতবাসী যখন ধরাপৃষ্ঠে পদক্ষেপ করে, বসুন্ধরা তখন তাহার পদতল হইতে সরিয়া যান। কাজেই ভারতবাসী তখন শূন্য পথে পা ফেলিয়া চলিতে থাকে। বস্তুতঃ ত্রিশ কোটী মনুষ্যের সমবায়ে গঠিত একটা সমগ্র জাতি ইউলিসিসের দৃষ্ট 'লোটস্‌ঈটার'-গণের মত নেশার ঘোরে ঝিম ধরিয়া বসিয়া আছে; বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে একটা প্রকাণ্ড ফক্কিকা ভাবিয়া নিশ্চিন্তমনে যত্নবিষ্ট সাজিয়া বসিয়া আছে, এরূপ দৃশ্য পৃথিবীর অন্যত্র বিরল। একটা সমগ্র জাতি পুরাণ-কথিত হরিশ্চন্দ্রের কটকের মত সংসারের সহিত সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া শূন্যমধ্যে নিরবলম্বভাবে অবস্থান করিতেছে, এইরূপ দৃশ্য আর কোথাও নাই। সিদ্ধান্ত হইয়া গেল, প্রাচ্য দেশের বীণাপুস্তকধারিণী শতদল-বাসিনী বাগ্দেবীকে ভারতবর্ষ হইতে নির্ব্বাসন দিয়া ঈজিচেয়ারশায়িনী ঘুটপরিহিতা পাউডারপরিলিপ্তা বিলাতী সরস্বতীকে এ দেশে আমদানি করিতে

হইবে। প্রাচীন কল্পনাপ্রধান প্রাচ্যবিদ্যাকে বিসর্জ্জন দিয়া, তাহার স্থানে বিজ্ঞানপ্রধান প্রতীচ্য বিদ্যাকে স্থাপিত করিতে হইবে। প্রাচীন কালের পৌরাণিক ভূগোলবিবরণে দধিসমুদ্র ও ক্ষীরসমুদ্র প্রভৃতির বিবরণ আছে; অথচ কলম্বস, ড্রেক ও ফ্রাবিশারের সময় হইতে ফ্রাঙ্কলিন, রস ও ন্যানসেনের সময় পর্য্যন্ত নাবিকেরা সমস্ত পৃথিবী অনুসন্ধান করিয়া সমুদ্রমধ্যে নোনা জল ব্যতীত একছটাকও স্বাদু জল সংগ্রহ করিতে পারিলেন না! এই সকল কাল্পনিক বিবরণে কেবল রসনেন্দ্রিয় দ্রাবিত হয় মাত্র, অথচ তাহার পরিতৃপ্তির কোন সম্ভাবনা থাকে না; ইত্যাদি বিবিধ যুক্তিপরম্পরা দেখাইয়া বিখ্যাত লর্ড মেকলে, তাঁহারা মোহোৎপাদিনী ভাষায় প্রতীচ্য শিক্ষানীতির সমর্থন করিলেন; এবং কবে সেই শুভদিন আসিবে, যখন প্রাচ্য বর্ব্বরগণ প্রতীচ্য শিক্ষার সহিত প্রতাচ্য সভ্যতা লাভ করিয়া প্রতীচ্য রাজনৈতিক অধিকারলাভের জন্ম লালায়িত হইবে, এই সুখস্বপ্ন দেখিয়া পুলকিত হইলেন। ভারতবর্ষে ইংরাজী বিদ্যাপ্রচলনের সূত্রপাত হইল। ভারতবর্ষের রাজধানীতে ইংরাজ অধ্যাপকের পরিচালিত ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হইল। ইংরাজ অধ্যাপকের পদপ্রান্তে বসিয়া বঙ্গীয় যুবকগণ বেকনের Essay ও মিল্‌টনের Areopagitica অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন, আরিষ্টটলের সমাজনীতি ও হব্‌সের রাজনীতি সম্বন্ধে উপদেশ গ্রহণ করিতে লাগিলেন, Paleyর Evidence ও Reidএর মনস্তত্ত্ব হইতে নূতন তত্ত্ব সংগ্রহ করিতে লগিলেন, বার্কের অনুকরণে প্রকাশ্য সভায় রাজনৈতিক বক্তৃতায় গলা সাধিতে আরম্ভ করিলেন। হিন্দু কালেজ হইতে প্রতীচ্য সভ্যতার ধ্বজা ধরিয়া যে সকল মহারথগণ বহির্গত হইলেন, তাঁহাদের আস্ফালনে ভূমিকম্পের সূচনা হইল। বাঙ্গালীর ক্ষীণবল জাতীয় জীবনে এমন উৎসাহের আবেগ আর কখনও বুঝি দেখা যায় নাই। বহুকাল পূর্ব্বে ত্রেতাযুগে সুগ্রীব-পরিচালিত সেনা স্বর্ণলঙ্কার বেলাভূমিতে পদার্পণ করিয়া যে মহোৎসাহ দেখাইয়াছিল, বোধ হয়, তাহারই সহিত এই নবীন উৎসাহের কতকটা তুলনা হইতে পারে। সে ক্ষেত্রে সীতার উদ্ধারবিষয়ে সংশয় সকলের মন হইতে গিয়াছিল কি না, জানি না; কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে হিন্দুয়ানিরূপ বিকট দশাননের কবল হইতে ভারতমাতার উদ্ধার যে অবিলম্বেই সাধিত হইবে, সে বিষয়ে কাহারও দ্বিধা রহিল না। কিছু দিন মধ্যেই ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রদেশে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইল; নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হইল; প্রতীচ্য শিক্ষা ও প্রতীচ্য সভ্যতার আলোক

নিভৃত পল্লীগ্রামমধ্যেও কুসংস্কারের অ
লেখকে ও ইংরাজী কথকে অচিরকাল
হইয়া গেল, ভারতের মুখচন্দ্রমার মালিন্য

তাহার পর অধিক দিন গত হয় নাই,
মুখে ফিরিয়াছে। চারি দিকেই এখন হতাশের আক্ষেপ।
এ দেশে ফলিল না, প্রাচীন-পন্থীরা বলিতেছেন, ইংরাজী শিখিয়া ছে
কেবল সহবৎবর্জ্জিত হইতেছে, ধর্ম্মজ্ঞানশূন্য হইতেছে, নাস্তিক হইতেছে।
রাজপুরুষেরা বলিতেছেন, ইহারা কেবলই চাকরি চাহিতেছে, ও চাকরি না
পাইলে সংবাদপত্র বাহির করিয়া দেশমধ্যে অসন্তোষের বীজ ছড়াইতেছে।
রাজজাতীয়েরা বলিতেছেন, ইহারা শ্বেতাঙ্গ দেখিলেই সেলাম করিতে চাহে না,
ইহাদের এতটা নৈতিক অধঃপতন ঘটিয়াছে। পণ্ডিতেরা বলিতেছেন, ইহারা
এতকাল ধরিয়া বিজ্ঞানের বহি মুখস্থ করিল, অথচ ইহাদের মধ্যে একটা
নিউটন জন্মিল না, একটা ফ্যারাডে জন্মিল না; ইহাদের মস্তিষ্কের উপকরণ
কেবল কাদা আর মাটি। সমাজসংস্কারকেরা বলিতেছেন, ইহারা এখনও
বাল্যকালে বিবাহ করে, অথচ বলে, আমাদিগকে রাজনৈতিক অধিকার
দাও, আমাদের টেক্স্ বাড়াইও না, আমাদিগকে বিনা দে তা মারিও
না। কাজের লোকেরা বলেন, ইহারা কেবল কবিতা লে উপন্যাস
লেখে, দেশের ধনবৃদ্ধির দিকে ইহাদের চেষ্টা নাই। যাঁহারা লোক
নহেন, তাঁহারা বলেন, ইহাদের ধনতৃষ্ণা অত্যন্ত বাড়িয়াছে, ক ইর
হইয়াই ইহারা সরস্বতীকে বিসর্জ্জন দেয় ও অর্থের জন্য ঘুরিয়া বেড়ায়।

ফলতঃ ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে বিশ্বজগৎ ভারত-উদ্ধারের জন্য যে শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মুখের প্রতি চাহিয়া ছিল, এখন এক রকম সিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছে, সেই শিক্ষিতসম্প্রদায়ের মত অকর্ম্মণ্য, জরদ্গব মনুষ্যসম্প্রদায় আর কোথাও নাই। পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রণালী যাহা এ পর্য্যন্ত এ দেশে প্রচলিত ছিল, তাহা আর কোন সুফল প্রসব করিতে পারিবে না; তাহা এক রকম নির্দ্ধারিত হইয়া গিয়াছে। বড় বড় রাজপুরুষ তাঁহাদের উচ্চ আসন হইতে শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের প্রতি ভ্রূকুটীভঙ্গী করিতেছেন। ইংরাজী সংবাদপত্রের সম্পাদকগণ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রতি ও শিক্ষাপ্রণালীর প্রতি নিয়ত হলাহল উদ্গার করিতেছেন। সার চার্লস ইলিয়ট বলিলেন, ইহারা মিল আর বার্ক পড়িয়া রাজনীতির ঝঙ্কার দিতে শিখিয়াছে মাত্র; টাইমস্ পত্র বলিলেন, ইহারা ইতিহাস

তেছে। ঈগ্‌ল্‌ পক্ষী তাঁহার চঞ্চুপুট
ক জানবাজার ষ্ট্রীটের অশ্বত্থ বৃক্ষ হইতে
ত অব্যাহতি লাভ করিলেন। পার্লে-
বনগরী বলিলেন, এখন কিছু দিনের জন্য
করিয়া ইহাদিগকে জুতাশেলাই করিতে শিখাইলে দেশের
একটা উপায় হইতে পারে।

প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষের শিক্ষিতসম্প্রদায় এখন কতকটা ধরার ভারস্বরূপ হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহাদের অস্তিত্বের আবশ্যকতা নিতান্ত প্রমাণসাপেক্ষ হইয়া পড়িয়াছে। যাঁহারা তাঁহাদের পক্ষ হইয়া দুই একটা মিষ্ট কথা বলিতে-ছেন, তাঁহারা বস্তুতই আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কনবোকে-শন উপলক্ষে আমাদের মহামান্য রাজপ্রতিনিধি ও আমাদের অকৃত্রিম হিতৈষী সার এণ্টনি ম্যাক্‌ডোনেল আমাদের এই দুর্দ্দিনে শিক্ষিতসম্প্রদায়ের পক্ষে মিষ্ট কথা কহিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতালাভের অধিকারী হইয়াছেন। কিন্তু শিক্ষা-প্রণালীর যে সংস্কার আবশ্যক, তাহা একরকম সর্ব্ববাদিসম্মত হইয়া গিয়াছে। একটা যে নূতন বন্দোবস্ত আবশ্যক, তাহা স্থিরসিদ্ধান্ত হইয়াছে। কিন্তু সেই বন্দোবস্তটা প হইবে, তাহাই এখন বিচারের ও বিতণ্ডার স্থল। 'নাসৌ মুনি-র্যস্য মতং ম্‌!' মহাজনের পন্থাই এই সঙ্কটের স্থলে একমাত্র পন্থা, কিন্তু আম ক্রমে মহাজন একজন নহেন, বহুজন, কাজেই পন্থার নির্দ্দেশও ক ব্যাধি একটা; কিন্তু চিকিৎসক অনেক; ঔষধের সংখ্যার সীমা নাই। এবং প্রত্যেক ঔষধই যেখানে অব্যর্থ, সেখানে পীড়িতের অবস্থা অত্যন্ত ভয়াবহ ও শোচনীয়। নমুনা-স্বরূপ দুই একটা ব্যবস্থার উল্লেখ করিতে পারি।

ইংরাজী-শিক্ষাপ্রবর্ত্তনের সময়ে প্রাচ্য শিক্ষার বিরুদ্ধে যে যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছিল, বর্ত্তমান ইংরাজী শিক্ষাপ্রণালীর বিরুদ্ধেও সেই যুক্তি প্রযুক্ত হইতেছে। বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর বিরুদ্ধে একটা প্রধান অভিযোগ যে, ইহা অত্যন্ত লিটা-রারি; ইহাতে বৈজ্ঞানিকতার সম্যক্ আদর নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভারত-বাসীর ধাতুতে বৈজ্ঞানিকতার অত্যন্ত অভাব। ভারতবাসী পিতৃপিতামহ-ক্রমে লিটারারি; আচার্য্য ম্যাক্সমূলর বলিয়াছেন, ভারতবাসী একবারে ফিল-সফার হইয়া ভূমিষ্ঠ হয়েন। ভারতবাসী প্রত্যেকেই এক একজন শুকদেব। শুকদেবের সংখ্যাবাহুল্য পারমার্থিক হিসাবে যতই প্রার্থনীয় হউক না, ব্যব-

হারিক হিসাবে ততটা আশাপ্রদ নহে। কেন না, আমাদের ভারতবর্ষে দশ বৎসর অন্তর এক একটা প্রবল দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়া জঠরজ্বালাকে কিছু দিনের জন্য অত্যন্ত তীব্র করিয়া ব্যবহারিক জগতের অস্তিত্বে বিশ্বাস অন্ততঃ কিছু দিনের জন্যও দৃঢ়ীভূত করিয়া দেয়। এমন কি, যে সকল সংসারবিরক্ত সন্ন্যাসিগণ মাধুকরী বৃত্তি অবলম্বন করিয়া যেন তেন সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করেন, তাঁহাদের সেই মাধুকরী বৃত্তিতেও বিঘ্ন উৎপাদন করিয়া আর একটা বৃত্তির অবলম্বনে বাধ্য করে, যাহার ফলে তাঁহাদিগকে সঙ্কীর্ণ সংসার-কারাগার হইতেও সংকীর্ণতর অন্যবিধ কারাগারে আশ্রয় লইতে হয়। যে বৈজ্ঞানিকতা ভারতবাসীর এই ফিলসফি-প্রবণতা ও কাব্যপ্রবণতা ও বৈরাগ্যপ্রবণতা কতকটা দমন করিয়া তাহাকে বৈষয়িক প্রবৃত্তি দিতে পারে, বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীতে না কি সেই বৈজ্ঞানিকতার একান্ত অভাব। বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান বন্দোবস্ত অনুসারে ছাত্রগণ বিজ্ঞানের গ্রন্থ প্রাণপণে কণ্ঠস্থ করিয়া পরীক্ষকগণের প্রযুক্ত যাবতীয় ব্রহ্মাস্ত্রকে ফাঁকি দিতে সমর্থ হয় বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহাদের মজ্জাতে ও ধাতুতে বিজ্ঞানের প্রতি আনুরক্তি জন্মায় না। আমাদের বিদ্যালয়সংযুক্ত লাবোরেটারিগুলিতে যে সকল ছাত্র অতি মনোযোগসহকারে ব্যাটারি ও থর্ম্মোমিটর লইয়া নাড়াচাড়া করে, পাঁচ বৎসর পরেই দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহাদের বৈঠকখানার আলমারিগুলি পুরাতন ল-রিপোর্টের সারিতে সুশোভিত হইয়াছে, এবং চাপকানের উপর চাদর ও মস্তকে শামলা পরিধান করিয়া তাঁহারা নবীন কার্ত্তিকেয়ের ন্যায় বিকশিত হইয়া উঠিয়াছেন।

চল্লিশ বৎসর হইল, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এ দেশে উচ্চশিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত এ দেশের লোকের বিজ্ঞানের প্রতি আনুরক্তি জন্মিল না। মাননীয় ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের জীবনব্যাপী উদ্যম এখন কেবল সাংবৎসরিক নৈরাশ্যের উচ্ছ্বাসে পরিব্যক্ত হইতেছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্প্রতি বিজ্ঞানশিক্ষার জন্য নূতন উপাধি-প্রবর্ত্তনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এখন হইতে আমাদের বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা নামের পশ্চাতে নয়নানন্দকর অভিনব উপাধিসংযোগের অবসর পাইবে। কিন্তু এই নূতন ব্যবস্থায় বিজ্ঞানের প্রতি আনুরক্তি আমাদের ছাত্রসম্প্রদায়মধ্যে কত দূর বর্দ্ধিত হইবে, তাহাতে অনেকের মনে গভীর সংশয় রহিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয় নূতন নূতন উপাধির প্রলোভন সম্মুখে ধরিতে পারেন, এবং বড় বড় কেতাবের তালিকা দ্বারা তাঁহাদের ক্যালেণ্ডারের পাতা সুশোভিত করিতে পারেন; কিন্তু শিক্ষার ভার

বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে নাই। বিজ্ঞান শিখিতে যে যন্ত্র তন্ত্র কারখানা আবশ্যক, তাহা বিশ্ববিদ্যালয় যোগাইতে পারেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের সে ক্ষমতা নাই। গবর্মেণ্ট এ সম্বন্ধে অর্থব্যয়ে পরাঙ্মুখ। লর্ড কেল্‌বিনের ন্যায় বড় বড় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতের অনুরোধ সত্ত্বেও প্রেসিডেন্সী কালেজে ফিজিকাল লাবরেটারি স্থাপনের ব্যয়ভার গ্রহণ করিতে আমাদের গবর্মেণ্ট অক্ষমতা স্বীকার করিয়াছেন; অথচ এই প্রেসিডেন্সি কালেজেই যে কিছু সামান্য উপকরণ আছে, তাহার অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও সপ্রমাণ হইয়াছে যে, বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক খেলিবার অবসর পাইলে খেলিতে না পারে, এমন নহে। এই প্রেসিডেন্সী কালেজ হইতেই দুই জন বাঙ্গালী বিজ্ঞানবিদের নাম ভারতবর্ষের চতুঃসীমা ছাড়াইয়া বহু দূর পর্য্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছে। গবর্মেণ্টের পরিচালিত মফস্বলের কালেজগুলির ও আমাদের দেশীয় লোকদিগের পরিচালিত কালেজগুলির অবস্থা অতিশয় শোচনীয়, সেখানে বিজ্ঞান শিখাইবার যেরূপ ব্যবস্থা আছে, তাহা স্মরণ করিলে চক্ষে জল আসে। এইরূপ মশলা লইয়া আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় বঙ্গদেশে বৈজ্ঞানিক বানাইবার চেষ্টা করিতেছেন। এরূপ অস্বাভাবিক শিক্ষাপ্রণালীর ফল যে স্বভাবসঙ্গত হইবে, তাহার আশা একরূপ নাই বলিলেই চলে। উনানে আগুন ধরাইবার জন্য বাতাস দিতে ও ফুঁ দিতে হয়, কিন্তু বাতাস দিবার পূর্ব্বে যথেষ্টপরিমাণ ইন্ধন যোগান আবশ্যক। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় গণ্ডদ্বয় যথাসাধ্য বিস্ফারিত করিয়া প্রাণপণে ফূৎকারপ্রয়োগের ব্যবস্থা করিতেছেন, কিন্তু উপযুক্ত ইন্ধনের যেরূপ ঐকান্তিক অভাব, তাহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের যথেষ্ট গণ্ডপীড়া হইবার সম্ভাবনা, কিন্তু দেশের মধ্যে বিজ্ঞানাগ্নি সন্দীপিত হইবার আশা সুদূরপরাহত।

বিজ্ঞানশিক্ষার সহিত নিকটসম্পর্কবিশিষ্ট আর একরকম শিক্ষা আছে, তাহাকে টেক্‌নিকাল শিক্ষা বা হাতে-কলমে শিক্ষা বলে। অনেকের মুখে আজকাল শুনিতে পাওয়া যায় যে, এই টেক্‌নিকাল শিক্ষার বন্দোবস্ত হইলেই দেশের অবস্থা ফিরিয়া যাইবে। হাতে-কলমে শিক্ষা যে জাতীয় উন্নতির জন্য নিতান্ত আবশ্যক, তাহা নিতান্ত নির্ব্বোধ ব্যতীত কেহ অস্বীকার করিবেন না। কিন্তু এই শিক্ষার জন্য যে সকল বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি বক্তৃতা করেন ও হাহুতাশ করেন, তাঁহারা এ পর্য্যন্ত টেক্‌নিকাল শিক্ষার প্রণালীটা কিরূপ হইবে, তাহার একটা পরিষ্কার উত্তর দিতে সমর্থ হন নাই। অনেকের মতে, ডাক্তার সরকারের প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানসভাকে দেশলাইয়ের বা সাবানের কারখানাতে

পরিণত করিলেই আমাদের টেক্‌নিকাল শিক্ষার এক রকম বন্দোবস্ত হইয়া যাইবে। বঙ্গদেশের অদৃষ্টে নানাবিধ বিধিবিড়ম্বনা ঘটিয়াছে; বিজ্ঞানসভার অদৃষ্টেও এইরূপ শোচনীয় পরিণতি আছে কি না জানি না; তবে আশা করি, সেই পরিণতি যেন বিলম্বিত হয়।

হাতে-কলমে শিক্ষা আমাদের দেশে কখনও ছিল না, এবং এখনও নাই, এমন নহে। মনুষ্য যে দিন তাহার আদিম বর্ব্বর অবস্থায় পাথর ভাঙ্গিয়া অস্ত্রনির্ম্মাণ অভ্যাস করিয়াছিল, সেই দিনই হাতে-কলমে শিক্ষার প্রথম বন্দোবস্ত হইয়াছিল। মনুষ্যসমাজমাত্রেই শিল্পোৎপন্ন বিবিধ সামগ্রীর আবশ্যক, এবং সেই শিল্পদ্রব্যনির্ম্মাণের কৌশল এক-শ্রেণীর মনুষ্যকে যত্নপূর্ব্বক শিক্ষা করিতে হয়। আমাদের দরিদ্র সমাজের আবশ্যকমত শিল্পদ্রব্য নির্ম্মাণের জন্য ব্যবস্থা এত কাল আমাদের সমাজের মধ্যেই বর্ত্তমান ছিল। চাষার ছেলে ছেলাবেলা হইতে চাষ শিখিত, ছুতারের ছেলে ছেলেবেলা হইতে ছুতারের কাজ শিখিত, তন্তুবায়পুত্র আপন ঘরে বসিয়া তাহার পৈতৃক যন্ত্রাদি লইয়া তাঁতবোনা শিখিত। জাতিভেদে ব্যবসায়-ভেদের ব্যবস্থা থাকায় অতি অল্পব্যয়ে দরিদ্র শিল্পীর পক্ষে শিল্পশিক্ষার বন্দোবস্ত ছিল। ঘরের ভাত খাইয়া পিতৃপিতামহ হইতে প্রাপ্ত যন্ত্রাদির সাহায্যে আপনার পিতা পিতামহের নিকট বা আত্মীয় স্বজনের নিকট শিল্প-কৌশল অভ্যাস করার যে সুন্দর বন্দোবস্ত আমাদের দেশে এত কাল প্রচলিত ছিল, এবং এখনও আছে, তাহাতে সমাজের সমস্ত প্রয়োজনীয় কার্য্যই এত কাল সম্পাদিত হইয়াছে। এবং এই শিক্ষাপ্রণালী অনুসারে যে সকল শিল্পি-সম্প্রদায় এ দেশে জন্মিয়াছে, তাহাদের কারুকার্য্য অনেক বিষয়ে এখনও বৈদেশিকগণেরও বিস্ময়োৎপাদক হইয়া আছে। এত কাল পর্য্যন্ত আমরাই শিল্পসামগ্রী বিদেশে যোগাইতাম; ইউরোপের লোকে এ দেশের শিল্পদ্রব্য লইয়া যাইবার জন্যই এ দেশের সহিত বাণিজ্যসম্বন্ধ স্থাপিত করিয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমানকালে ষ্টীম এঞ্জিনের প্রতাপে এখন পুরাতন বন্দোবস্ত সমস্তই উল্টাইয়া গিয়াছে। এখন ইউরোপের লোকেই সমস্ত পৃথিবীকে শিল্পের সামগ্রী যোগা-ইতেছে। ইউরোপের কলকারখানার সহিত আমাদের সনাতন প্রণালী এখন আর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। সেই জন্য আমাদের দেশের প্রাচীন শিক্ষাপ্রণালীরও পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে। ইউরোপে যে প্রণালীতে হাতে-কলমে শিক্ষাদান হয়, এখন এ দেশেও সেই প্রণালীতে

শিক্ষাদান আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু হাতে-কলমে শিক্ষার জন্য যে সকল সরঞ্জাম আবশ্যক, তাহা আমাদের দেশে অদ্যাপি বর্ত্তমান নাই। দেশের মধ্যে কলকারখানা নাই; দেশের লোক অনভিজ্ঞতাবশতঃ নূতন কাজে হস্তক্ষেপ করিতে অসমর্থ; মূলধনের একান্ত অভাব; যাঁহাদের ধন আছে, তাঁহারা ত বিশ্বাস ও সাহসের অভাবে সেই ধনের ব্যবসায়ে নিয়োগে কুণ্ঠিত। বৈদেশিক রাজা দেশীয়দের সাহায্য করিতে একবারে পরাঙ্মুখ। এরূপ স্থলে হাতে-কলমে শিক্ষার সুবিধামত বন্দোবস্ত হওয়া অসম্ভব। হাতে-কলমে শিক্ষা অত্যন্ত আবশ্যক, সন্দেহ নাই; এবং দেশে ত্রিশ কোটী অধিবাসীর ষাটি কোটীখানা হাতও বর্ত্তমান রহিয়াছে, কেবল কলমের অভাবে শিক্ষাটা ঘটিয়া উঠিতেছে না।

বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর যে সংস্কার ও সংশোধন আবশ্যক, তাহা রাজা ও প্রজা উভয় পক্ষ হইতেই এক রকম স্বীকৃত হইয়াছে। আমাদের মুসলমান ভ্রাতৃগণ সার সৈয়দ আমেদের স্মৃতিস্থাপনা উপলক্ষ করিয়া তাঁহার স্থাপিত আলিগড় কালেজকে স্বতন্ত্র মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। শ্রীমতী আনিবেসান্ত কাশীধামে হিন্দুর জাতীয় ভিত্তির উপর স্থাপিত হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত করিবার জন্য হিন্দুসমাজকে আহ্বান করিয়াছেন। বাঙ্গালার জমীদারগণের মধ্যে এক সম্প্রদায় ভূস্বামিগণের উচ্চশিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় হইতে স্বতন্ত্র বিদ্যালয়স্থাপনের সঙ্কল্প করিতেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে নীতির উৎকর্ষ ও স্বাস্থ্যের উৎকর্ষবিধানের কোনরূপ বন্দোবস্ত নাই দেখিয়া, কলিকাতা সহরে ছাত্রদিগের জন্য হায়ার ট্রেনিং ক্লব স্থাপিত হইয়াছে। বাঙ্গালা গবর্মেণ্টের প্ররোচনায় শিক্ষাবিভাগের মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় বাঙ্গালীর ক্ষীণপ্রাণ শিশুগণের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া তাহাদিগকে দুর্ব্বহ ভূতের বোঝা বহিবার অকারণ পরিশ্রম হইতে অব্যাহতি দিয়া নিম্নশিক্ষাপ্রণালীর আমূল সংস্কারের প্রস্তাব করিয়াছেন। পশ্চিম ভারতবর্ষে যে সমাজ হইতে আমাদের দাদাভাইকে আমরা পাইয়াছি, সেই সমাজের অপর এক স্বদেশবৎসল মহাত্মা উচ্চতর শিক্ষাবিস্তারের জন্য বদান্যতার পরাকাষ্ঠা দেখাইতে প্রস্তুত হইয়া আমাদের ধনিগণের সম্মুখে মহাদর্শ স্থাপন করিয়াছেন।

এত দিন আমরা যে প্রাচ্য শিক্ষাকে অবজ্ঞার চক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া আসিতেছিলাম, আজ কাল তাহার প্রতিও অনেকের সুদৃষ্টি পড়িবার উপক্রম

হইয়াছে। সংস্কৃত সাহিত্যে কেবলই যে ক্ষীরসমুদ্রের ও দধিসমুদ্রের নাই, সেখানে যাস্ক ও পাণিনি ও আর্য্যভট্ট ও ভাস্করাচার্য্যের মত মনস্বিগণও লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন, তাহা কেহ কেহ যেন স্মরণ করিতেছেন। ফলে চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকগণের প্রতিও একালের ইংরাজী-শিক্ষিতগণের শ্রদ্ধা ধীরে ধীরে প্রবর্ত্তিত হইতেছে। ইংরাজী-শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতশাস্ত্র-শিক্ষার আবশ্যকতা অনেকের মনে স্থান লাভ করিয়াছে। স্থানবিশেষে এই চেষ্টা নিতান্ত অদ্ভুত ফলের উৎপাদন করিয়াছে। আমাদের মত ফিলজফিকাল জাতি স্বভাবতঃই হাস্যরসের আস্বাদনে বঞ্চিত; কিন্তু বর্ত্তমান কালে ইংরাজী-বিদ্যা-গলাধঃকরণের সহকারে গীতা ও চাণক্যশ্লোকের চাটনির ব্যবস্থা হইয়া যে নিতান্ত আংগ্লোবেদিক খেচরান্নভোজনের ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহাতে নিতান্ত অরসিকেও রসপ্রবৃত্তি না হইয়া যায় না। যাঁহারা সনাতন ধর্ম্মের বা জাতীয় আচারের প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য ঈদৃশ কৌতুকের অভিনয় করিতেছেন, তাঁহাদের অভিনয় দেখিয়া রসগ্রাহী লোকের হাস্যসংবরণ কঠিন হয় বটে, কিন্তু তাঁহাদের আন্তরিক উদ্দেশ্যকে আমি শ্রদ্ধা করি। বস্তুতঃ যে শিক্ষাপ্রণালী জাতীয়তার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না হয়, তাহা নিতান্ত অস্বাভাবিক; এবং যাহা অস্বাভাবিক, তাহা হইতে স্থায়িফললাভের সম্ভাবনা অল্প। যুগান্তর হইতে যে জাতীয় স্বভাব বর্দ্ধিত, পুষ্ট ও বিকশিত হইয়া আসিয়াছে, তাহার সহিত একবারে সকল সম্পর্ক রহিত করিলে, কেবল শিক্ষাপ্রণালী কেন, কোন প্রণালীই অভিব্যক্ত হইতে পারে না। আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর প্রতিষ্ঠাতৃগণ এই সরল স্থূল কথাটা বুঝিতে পারেন নাই। শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে যে সম্বন্ধ যে আদানপ্রদান না থাকিলে সমগ্র শরীরের পুষ্টিসাধন হয় না, আমাদের শিক্ষাসমাজের শরীরমধ্যে যে সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বর্ত্তমান আছে, তাহাদের পরস্পরমধ্যে সেই সম্বন্ধ, সেই আদানপ্রদান, সেই সমবেদনা বর্ত্তমান নাই; তাই উহা বর্দ্ধিত ও পুষ্ট ও শ্রীযুক্ত হইতে পারিতেছে না। বিলাত হইতে যে শিক্ষাপ্রণালী সশরীরে আমাদের দেশে আমদানি করা হইয়াছে, তাহা আমাদের জাতীয় ভাবের সহিত মিশিতে পারে নাই; সেই অস্বাভাবিক প্রয়াসে যে অস্বাভাবিক ফল প্রসব করিবে, তাহাতে আর বিস্ময়ের কথা কি?

বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীতে নীতিশিক্ষার ও ধর্ম্মশিক্ষার আদর নাই বলিয়া সচরাচর একটা আক্ষেপ উক্তি শুনিতে পাওয়া যায়। বুদ্ধিমানেরা অনেক

। চিন্তিয়া উপদেশ দেন, নীতিপুস্তকের সংখ্যা পাঠ্যমধ্যে বাড়াইয়া দিলেই ছাত্রগণকে দুর্নীতি একবারে পরিত্যাগ করিবে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ও একবার হুজুগে পড়িয়া নিয়ম করিয়াছিলেন, প্রবেশিকা পরীক্ষার সাহিত্য-বিষয়ক পাঠ্যগ্রন্থে অন্ততঃ এত পাতা নীতিকথা থাকা চাই। কিন্তু গ্রন্থপাঠ করিয়া সন্নীতির উৎকর্ষবিধানে যাঁহারা আশা করেন, তাঁহারা নিতান্ত ভেলা বাহিয়া সাগরসন্তরণে প্রবৃত্ত হয়েন। গ্রন্থপাঠ দ্বারা ধর্ম্মনীতির উৎকর্ষ হইবার সম্ভাবনা নাই। কিণ্ডারগার্টেন প্রণালীর নাম উল্লেখ করিলে আজি-কার দিনে আমার অনেক বন্ধু হয় ত লগুড় উত্তোলন করিবেন, কিন্তু তথাপি আমি বলিতে চাহি যে, নীতিশিক্ষারও একটা কিণ্ডারগার্টেন প্রণালী আছে। কেবল বস্তুতত্ত্ব শিখাইবার জন্যই যে কিণ্ডারগার্টেন প্রণালীতে ফল পাওয়া যায়, এমন নহে; শিক্ষামাত্রেই এই প্রণালী ফলোপধায়ক; এমন কি, আমি বলিতে চাহি যে, শিক্ষামাত্রেরই বোধ হয় এই একমাত্র প্রণালী। যিনি ইংরাজী রচনা অভ্যাস করিতে চাহেন, তিনি দশ বৎসর কাল বেন সাহেবের ব্যাকরণ ও মরিস সাহেবের accidence অভ্যাস করিলেও ইংরাজী-রচনার নৈপুণ্যলাভ করিতে পারিবেন না; তাঁহাকে বাছিয়া বাছিয়া ভাল রচনা প্রচুর-পরিমাণে পড়িতে হইবে, এবং স্বয়ং প্রচুরপরিমাণে ইংরাজীরচনা অভ্যাস করিতে হইবে। হাইড্রোজেন বায়ু স্বাদহীন গন্ধহীন বর্ণহীন এইরূপ সারা বৎসর ধরিয়া মুখস্থ করিলেও ছাত্রদের হাইড্রোজেন কেবল একটা নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ পদার্থ, এইরূপই একটা জ্ঞান জন্মিবে মাত্র, প্রকৃতপক্ষে হাইড্রোজেনের স্বরূপ জানিতে হইলে বোতল বোতল গ্যাস স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়া অগ্নিপ্রয়োগে জ্বালাইতে হইবে। কিণ্ডারগার্টেন প্রণালী এই চোখে দেখিয়া হাতে লইয়া ঘাঁটিয়া নাড়িয়া ভাঙ্গিয়া পোড়াইয়া দেখারই নামান্তরমাত্র। নীতিশিক্ষারও কিণ্ডারগার্টেন আছে; শিক্ষকের কাছে কেবল নীতি সম্বন্ধে লেকচার শুনিলে চলিবে না; শিক্ষককে নীতিসম্বন্ধে ডিমনষ্ট্রেশন দিতে হইবে। তাঁহাকে আপন গৃহস্বরূপ ও সমাজস্বরূপ লাবরেটরিতে দাঁড়াইয়া সন্নীতির দৃষ্টান্ত দেখা-ইতে হইবে। ছাত্রেরা স্বচক্ষে সেই দৃষ্টান্ত দেখিবে ও তাহার ফলভোগ করিবে; শিক্ষক স্বয়ং ভাল কাজ করিয়া তজ্জাত আনন্দ উপভোগ করিবেন ও ছাত্রদের দ্বারা ভাল কাজ করাইয়া তাহাদিগকে তাহার আনন্দ উপভোগ করাইবেন। শিক্ষক স্বয়ং মিথ্যাচার ও অসদাচার হইতে দূরবর্ত্তী থাকিবেন, ও আপনার ছাত্রগণকে মিথ্যাচার ও অসদাচার হইতে দূরে রাখিবেন। পরন্তু সহানুভূতির

ও স্নেহের ও প্রীতির বন্ধনে ছাত্রদিগকে আবদ্ধ রাখিয়া বেত্রের শাসন ও জরিমানার শাসন ও percentageএর শাসন অপেক্ষা এই বন্ধন যে কত অধিক ফলদায়ক, তাহা ছাত্রদিগকে আত্মজীবনে অনুভব করিবার শক্তি দিবেন। শিক্ষা দ্বারা যদি নীতির উৎকর্ষসাধন সম্ভবপর হয়, তাহা এইরূপ শিক্ষার ফলে; কেবল পাঠ্যপুস্তকমধ্যে নৈতিক উপদেশ কণ্ঠস্থ করিবার ফলে নহে।

নীতিশিক্ষার এই কিণ্ডারগার্টেন প্রণালী মনে করিতে গেলেই আমাদের প্রাচীনকালের পুরাতন শিক্ষাপ্রণালী মনে আসে। সে এককাল ছিল; তখন গুরুশিষ্যের মধ্যে দোকানদারী সম্বন্ধ প্রচলিত ছিল না; তখন বেতনের পরিবর্ত্তে বিদ্যাবিক্রয় নিতান্ত হেয় প্রণালী বলিয়া বিবেচিত হইত। তখন গুরুশিষ্যের মধ্যে অন্যবিধ বিনিময়ের ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল; এক পক্ষে স্নেহ ও প্রীতি, অন্য পক্ষে শ্রদ্ধা ও ভক্তি। উপনয়নসংস্কারের পর ধৃতব্রত মানব যখন ব্রহ্মচারীর ইউনিফর্ম্ পরিয়া দেবতাগণের ও আত্মীয়জনের আশীর্ব্বচন মস্তকে লইয়া পিতৃভবন হইতে গুরুগৃহে উপস্থিত হইত, তখন সেই কুটীরবাসী গম্ভীরমূর্ত্তি অপরিচিত পুরুষ সেই নবীন আগন্তুককে স্নেহপূর্ণ প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টি দ্বারা অভিষিক্ত করিয়া সম্ভাষণ করিয়া লইতেন; গুরুগৃহ তখন তাহার পিতৃগৃহে পরিণত হইত; শিক্ষাদাতা তখন জন্মদাতার স্থান পরিগ্রহ করিতেন, গুরুপত্নী তখন জননীর স্থান গ্রহণ করিতেন, গুরুপুত্রগণ বয়স্যের স্থান ও ভ্রাতার স্থান গ্রহণ করিত। গুরুগৃহে বাসকালে যে সকল জ্ঞানোপদেশ প্রদত্ত হইত, তখন যে সকল শাস্ত্রের অধ্যাপনা হইত, তাহার সহিত আধুনিক শিক্ষার ও আধুনিক শাস্ত্রের তুলনায় কোন প্রয়োজন নাই; যখন সেই পুরাকালের ভারতভূমির বেদধ্বনিমুখরিত ঋষিপরিষৎ, সেই মৃগশিশুকুলের বিচরণ-ভূমি, সেই হোমধেনুসমূহের বিহারস্থলী, সেই ঋষিকন্যাসেবিত লতাবিতান, সেই নীবারকণাকীর্ণ উটজাঙ্গন, সেই শুকমুখভ্রষ্ট-ইঙ্গুদীফলচিহ্নিত শ্যামল শষ্পক্ষেত্র, সেই সমিৎকুশফলাহরণপ্রত্যাগত ঋষিশিষ্যমণ্ডলী যখন মানসনেত্রে প্রতিভাত হয়, তখন সেকালের শিক্ষাপ্রণালীর সহিত একালের বিদ্যাবিপণি-সমূহে শিক্ষাবিক্রয়প্রথার তুলনা করিয়া দীর্ঘশ্বাস আপনা হইতে বহির্গত হয়।

বর্ত্তমান অধ্যাপনাপ্রণালীকে আমি যে বিদ্যাবিক্রয় বলিয়া উল্লেখ করিতেছি, তাহার একটা কৈফিয়ত আবশ্যক। বেতন গ্রহণ করিয়া বিদ্যাদান যে একবারে অবৈধ ব্যাপার, তাহা আমি বলিতে চাহি না। অধ্যাপকেরও

জীবনধারণ আবশ্যক, এবং অধ্যাপনাই যাঁহার একমাত্র জীবিকা, তাঁহাকে সেই উপলক্ষেই জীবনোপায় সংগ্রহ করিতে হইবে। আধুনিক চতুষ্পাঠী মধ্যে ছাত্রের নিকট বেতনগ্রহণের প্রথা বর্ত্তমান নাই; কিন্তু চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকেরাও দেশের ধনিসম্প্রদায় কর্তৃক এক হিসাবে পারিশ্রমিক পাইয়া থাকেন। দেশে যখন হিন্দুরাজা শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেন, তখন তাঁহারা রাজার ব্যয়েই প্রতিপালিত হইতেন। একালে আর অধ্যাপকের জন্য ভূমিদানের তাম্রশাসন ক্ষোদিত হয় না; কিন্তু তথাপি চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকগণের সামান্য অভাব পিতৃপিতামহ হইতে প্রাপ্ত নিষ্কর ভূসম্পত্তি হইতে ও ধনিসম্প্রদায়ের অনুগ্রহ হইতে পরিপূর্ণ হইয়া থাকে। এইরূপ বন্দোবস্তে যে একবারে দোষ নাই, তাহাও আমি বলিতে চাহি না। ধনীর অনুগ্রহের উপর জীবিকার জন্য নির্ভর করিয়া থাকিতে হইলে অনেকটা আত্মমর্য্যাদার হ্রাস হয়; এবং ক্রমশঃ চাটুবৃত্তিশিক্ষা অভ্যস্ত হইয়া আসে। আমাদের ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের মধ্যেও এমন উদাহরণ বিরল নহে, তাঁহারা সামান্য অর্থের জন্য অসার অকর্ম্মণ্য জমীদারসন্তানকেও "রাজন্ তব যশোভাতি দধিবৎ" বলিয়া চাটুকীর্ত্তনে কুণ্ঠিত হয়েন না। চতুষ্পাঠীর প্রণালীকে আমরা প্রাচীন শিক্ষাপ্রণালীর শেষ অবস্থা বলিয়া মনে করিতে পারি, যখন অধ্যাপকের পালন ও উচ্চশিক্ষাপ্রদান রাজার কর্ত্তব্য ও সাধারণের কর্ত্তব্য, অর্থাৎ ষ্টেটের কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইত। একালেও সাধারণের শিক্ষার ভার ষ্টেটের লওয়া উচিত কি না, তাহা লইয়া মধ্যে মধ্যে বিতণ্ডা উপস্থিত হয়। নিম্নশিক্ষা বা প্রাথমিক শিক্ষার ভার যে ষ্টেটের লওয়া উচিত, সে বিষয়ে বোধ হয় মতদ্বৈধ নাই। আমাদের দেশে ও ইংরাজের দেশে নিম্নশিক্ষার ব্যয়ভার গ্রহণ করিতে গবর্মেণ্ট ইতস্ততঃ করেন না। উচ্চশিক্ষার ভার গ্রহণ করিতে আমাদের গবর্মেণ্ট বড় রাজী নহেন; সেই ভারটার অংশ নিজের পক্ষে লাঘব করিয়া দেশের লোকের উপর ফেলিবার জন্য গবর্মেণ্ট ব্যাকুল। বিলাতেও প্রাচীনকালের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ধনিসম্প্রদায়ের প্রদত্ত সম্পত্তি হইতে পালিত হইয়া থাকে, এ সকলের উপর রাজার তেমন কর্তৃত্ব নাই। জর্ম্মণি প্রভৃতি দেশে রাজা উচ্চশিক্ষার জন্য অকাতরে ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হন না। আমাদের দেশে গবর্মেণ্টও কুণ্ঠিত; দেশের ধনিসম্প্রদায়েরও তেমন অবস্থা নহে যে, বর্ত্তমান প্রণালীর উচ্চশিক্ষার গুরুভার তাঁহারা সম্যক্‌রূপে বহন করেন। কাজেই শিক্ষার্থিগণের উপরেই ভারটা একবারে চাপিয়া

পড়িতেছে। শিক্ষার্থিগণের প্রদত্ত বেতনেই শিক্ষাপ্রদান এ দেশে প্রায় নিয়ম হইতে চলিয়াছে। কিন্তু দরিদ্র দেশের দরিদ্র শিক্ষার্থীর ক্ষমতা যেরূপ, শিক্ষার ও অধ্যাপনার অবস্থাও তদনুযায়ী হইয়া পড়িতেছে। বিলাতী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকেরা ছাত্রদিগের সঙ্গে একত্র বাস করেন; উভয়ের মধ্যে জ্ঞানের বিনিময়ের সহিত ভাববিনিময় ও শ্রদ্ধা ভক্তির বিনিময়ও ঘটিয়া থাকে। এই বিষয়ে বিলাতী বিশ্ববিদ্যালয়গুলি অনেকাংশে আমাদের চতুষ্পাঠীর মত। এ দেশে আমরা বিলাত হইতে উচ্চশিক্ষার প্রণালী আনাইয়াছি; কিন্তু তজ্জন্য যে ব্যয়ের প্রয়োজন, তাহার ভার লইতে কেহই প্রস্তুত নহে। গবর্মেণ্ট উচ্চশিক্ষার খরচ দিতে কুণ্ঠিত; ধনিসম্প্রদায় অক্ষমতার ওজর করেন; ছাত্রসম্প্রদায়ের ক্ষমতার একান্ত অভাব। আমরা প্রাচীন শিক্ষাপ্রণালী পরিত্যাগ করিয়াছি; বৈদেশিক প্রণালীর ব্যয়ভার গ্রহণ করিতেও প্রস্তুত নহি। আমাদের অবস্থা নিতান্তই অস্বাভাবিক। এই অস্বাভাবিকতাই আমাদের ব্যাধি। ফলও ঠিক তদনুরূপ হইতেছে।

ক্রমশঃ।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

বিহঙ্গমের প্রণয়।

বিহঙ্গমজাতির মধ্যে কোন কোন শ্রেণী যৌবনের প্রারম্ভে দাম্পত্যপ্রণয়ে দীক্ষিত হইয়া আমরণ তাহা উপভোগ করে; মৃত্যু অথবা অন্য কোনও কারণে বিহঙ্গদম্পতীর পরস্পর বিচ্ছেদ না ঘটিলে, কেহ কাহাকেও ত্যাগ করে না। বৎসরের কোনও নির্দ্দিষ্ট কালে কোন কোন শ্রেণীর পক্ষীর দাম্পত্যপ্রেমানুরাগ উদ্রিক্ত হইয়া উঠে; এবং সেই সময়েই তাহাদিগের পতিপত্নীর মিলন ঘটিয়া থাকে। একবার মিলন হইয়া গেলে সেই যৌনসম্মিলন সে বৎসরের মত অটুট থাকিয়া যায়। চিরজীবনের জন্যই হউক, অথবা বাৎসরিক প্রেমঋতুর জন্যই হউক, প্রথম মিলনের অব্যবহিত পূর্ব্বে বিহগবিহগীর রূপরাশি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বিকশিত ও বর্দ্ধিত হয়। তখন বিহঙ্গমগণের কণ্ঠস্বর অধিকতর উচ্চ ও সুললিত হয়। বিহঙ্গিনীগণ নিস্পন্দ ও নিশ্চিন্তভাবে বসিয়া থাকে; প্রণয়পিপাসু বিহঙ্গমগণ তাহাদিগের সম্মুখে নানাপ্রকার অঙ্গভঙ্গী করিয়া ও আপন আপন সুস্বরধারায় সেই

স্বয়ম্বরসভা প্লাবিত করিতে থাকে ; এইরূপে কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত হইলে যে বিহঙ্গিনী যে বিহঙ্গের রূপে ও গুণে মুগ্ধ হয়, সে তাহার নিকটবর্ত্তিনী হইয়া তাহাকে বরণ করে ও মহানন্দে স্বয়ম্বরসভা পরিত্যাগ করে। এইরূপে একবার পতিনির্ব্বাচন হইয়া গেলে, তাহাদিগের দাম্পত্যবন্ধন আর কখনও বিচ্ছিন্ন হয় না। উভয়ে উভয়ের পরম অনুরক্ত থাকিয়া সংসারযাত্রার নির্ব্বাহ করে। তবে যাহাদিগের প্রণয়কাল স্বভাবতঃ বৎসরের কয়েকমাস মাত্র, প্রণয়-ঋতুর অবসানে তাহাদের মিলন স্বভাবতঃ বিচ্ছিন্ন হয়। কিন্তু সেই প্রণয়কালের মধ্যে কেহ কাহারও অবিশ্বাসী হয় না। হংস, কুক্কুট প্রভৃতি কোন কোন পক্ষী-পুরুষের একাধিক পত্নী থাকে ; অপেক্ষাকৃত শিথিল হইলেও তাহাদিগের মধ্যে দাম্পত্যপ্রেমের নিতান্ত অভাব দৃষ্ট হয় না।

যাঁহারা কখনও পারাবত পালন করিয়াছেন, তাঁহারা কপোতীর পতি-নির্ব্বাচন ও পতির প্রতি তাহার অনুরাগ লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। সন্ধ্যা-সমাগমে পালিত পারাবতকুল দলে দলে আশ্রয়ে প্রত্যাগত হয় ; এবং এক এক দম্পতী আপন আপন নির্দ্দিষ্ট কক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করে। তাহাদিগের মধ্যে কেহ অপরের কক্ষে প্রবেশ করে না। যদি কোনরূপে দম্পতীর অন্যতর পারাবত যূথভ্রষ্ট হইয়া আবাসে প্রত্যাগমন না করে,অথবা ধৃত হয়, বা মরিয়া যায়, তাহা হইলে অপরটি একাকী নিরতিশয় বিষণ্নমনে আপন কক্ষে রজনীযাপন করিয়া থাকে। তাহার আহারে সুখ থাকে না, ভ্রমণে সুখ থাকে না ; সেই বিয়োগবিধুর বিহগের প্রত্যেক পদবিক্ষেপে ও প্রত্যেক পক্ষচালনায় তাহার মানসিক বিষাদের আভাস ব্যক্ত হয়। এই জন্য কপোতপালক "জোড়া মিলাইবার" জন্য বিশেষ ব্যস্ত হইয়া থাকে। নূতনের প্রতি অনুরাগ জন্মাইবার নিমিত্ত যে প্রকার আয়াস স্বীকার করিতে হয়, তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অন্যে ভাল হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন না। ক্রমে ক্রমে দুই তিনটি বা ততোধিক পারাবত তাহার নিকট কত কৌশলে রাখিতে হয়। তাহার ও নবানীত পারাবতের মধ্যে পরস্পর অনুরাগের বীজ বপন করিতে গিয়া অনেক সময় অকৃতকার্য্য হইতে হয়। তবে, ক্রমাগত চেষ্টা করিতে করিতে, বিরহযাতনার হ্রাস হইয়া আসিলে ও একত্র বসবাসের গুণে, পরস্পরের মধ্যে প্রেমের সঞ্চার হইয়া থাকে। একবার আমাদিগের কোন বন্ধুর একটি কাপোতীর পতি হারাইয়া যায়। তিনি বহু যত্নে তাহাকে একটি নূতন পতির সহিত প্রেমে আবদ্ধ করিতে পারিয়াছিলেন। এই দাম্পত্যবন্ধনের প্রায় মাসাবধি পরে, একদা

প্রদোষে সেই যুথভ্রষ্ট কপোত আসিয়া উপস্থিত। সেই সময় তাহার পূর্ব্ব-প্রণয়িনী নবপরিণীতা কপোতী নূতন পতির সহিত প্রাঙ্গণে বিচরণ করিতেছিল। গৃহাগত কপোতের রবে কপোতীর চিত্ত আকৃষ্ট হইলে, তাহার যে কি অবস্থা ঘটিয়াছিল, তাহা অবর্ণনীয়। পার্শ্বে নূতন পতি ও সম্মুখে বহুকালের বিরহের পর পুরাতন পতিও সমাগত। কপোতী 'শ্যাম রাখিবে, কি কুল রাখিবে', এই ভাবে অবস্থিত! যাহা হউক, সেই দিন সুখ-দুঃখমিশ্রিত উল্লাসহিংসাবিজড়িত সম্মিলন হইয়া গেল। কয়েক দিবস পর্য্যন্ত কপোতীর পার্শ্বে পতিযুগলকেই দেখিয়াছিলাম। তাহার পর আর নূতন পতিটিকে দেখিতে পাইতাম না।

কপোতীর এইরূপ পত্যন্তরগ্রহণ মার্জ্জনীয় হইতে পারে, কিন্তু কোন কোন পক্ষী জাতির মধ্যে গুপ্তপ্রণয়ের দৃষ্টান্ত নিতান্ত বিরল নহে। মাণিক-জোড় পক্ষীর দাম্পত্যপ্রেম চিরপ্রসিদ্ধ; স্ত্রী-পুরুষে মুহূর্ত্তের জন্যও বিচ্ছেদ হয় না। কিন্তু ফরাসী গ্রন্থকার ফিগোয়ের একটি জোড়মাণিক দম্পতীর অভিসারের যে বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে, বিহগ-বুদ্ধির পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়; অভিসারপ্রবৃত্তিই ক্রমবিকাশের ফল, কিংবা একানুরক্তিই ক্রমবিকাশের ফল, সে বিষয়ে গভীর সন্দেহ সমুদিত হয়। ফরাসী গ্রন্থকার লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, রুসরাজ্যের একস্থানে বহুসংখ্যক জোড়-মাণিক পক্ষী বাস করিত। তাহাদের মধ্যে একটি জোড়মাণিক পক্ষিণী শারীরিক অসুস্থতার ভাণ করিয়া, সকলের সহিত প্রাত্যহিক আহারের অন্বেষণে বহির্গত হইত না। স্বামী একাকী চরিতে যাইত। এইরূপে কিছু কাল গত হইলে, একদা স্বামী অন্য দিন অপেক্ষা শীঘ্র আলয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেখিল যে, তাহার স্ত্রী অপর একটি যুবা জোড়মাণিক পক্ষীর সহিত রঙ্গরসে নিমগ্ন। স্বামীকে উপস্থিত দেখিয়া ব্যভিচারী বিহঙ্গম প্রস্থান করিল। তদবধি স্বামী স্ত্রীর যদিও একত্র বসবাস চলিতে লাগিল, কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে আর কিছুমাত্র অনুরাগ রহিল না। কিছু দিন পরে শীতসমাগমসময়ে যখন অন্য দেশে প্রস্থান করিবার সময় আসিল, তখন, নানা স্থান হইতে বহুতর জোড়মাণিক তথায় সমবেত হইল। একদিন দেখা গেল, সেই পক্ষি-সমাজ চঞ্চুর আঘাতে সেই ব্যভিচারী বিহঙ্গমের প্রাণদণ্ড করিল, এবং অন্য দেশে শীতযাপন করিতে যাইবার সময় সেই অসতী বিহঙ্গিনীকে রুসিয়ার তুষারময় প্রদেশে ফেলিয়া গেল।

স্বর্গীয় আনন্দকৃষ্ণ বসু। *

আনন্দকৃষ্ণ বাবু সাধারণের নিকটে এমনই অপরিচিত ছিলেন যে, অনেকের নিকটেই তাঁহার নাম সম্পূর্ণ অশ্রুতপূর্ব্ব। তিনি প্রকৃত ধ্যানযোগীর মত বিরলে জ্ঞানার্জ্জনে সময় অতিবাহিত করিতেন, ভাবচর্চ্চা করিয়া প্রকৃত মনুষ্যত্বের পূর্ণাদর্শের দিকে অগ্রসর হইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন। এই জনতাবহুল মহানগরে—যেখানে কারণে অকারণে সর্ব্বদা স্বার্থের সংঘর্ষে দারুণ দ্বন্দ্ব ও শূন্যগর্ভ সম্মানলাভচেষ্টায় কঠোর মনঃপীড়া উপস্থিত হয়, সেখানে থাকিয়াও তিনি কখন স্বার্থের দিকে ফিরিয়া চাহেন নাই, কখন যশের কাঙ্গালী হয়েন নাই। তাই যাহারা তাঁহার পুণ্য নিকেতনে বহুকালের জ্ঞানসম্পদসার পুস্তকে পরিবেষ্টিত ঋষিকল্প আনন্দকৃষ্ণ বাবুকে দেখিয়াছে, তাহারাই তাঁহার জ্ঞানে ও গুণে মুগ্ধ হইয়া আসিয়াছে;—অপরের নিকট তিনি সম্পূর্ণ অপচিত। তাঁহার রচিত প্রবন্ধ আপনার বলিয়া চালাইয়া তাঁহার অনেক আত্মীয় ও বন্ধু বিদেশে বাহবা পাইয়াছেন—য়ুরোপে Savant বলিয়া গণ্য হইয়াছেন, তাঁহার লিখিত বক্তৃতা সভাস্থলে ও রাজদরবারে পাঠ করিয়া অনেকে প্রশংসালাভ করিয়াছেন—কিন্তু আনন্দকৃষ্ণ বাবুকে কেহ চিনে নাই। দেশের বা সমাজের কোন হিতকর অনুষ্ঠানের জন্য আবশ্যক বুঝিলেই আনন্দকৃষ্ণ বাবু পরিশ্রম করিয়াছেন; কিন্তু আপনার নাম সযত্নে গোপন রাখিয়াছেন। তিনি যশের জন্য ব্যগ্র ছিলেন না, তাই কর্ত্তব্য বুঝিলে কর্ম্ম করিতেন। গীতা তাঁহার বড় প্রিয় গ্রন্থ ছিল; তিনি প্রকৃত জ্ঞানার্থীর মত প্রগাঢ় ভক্তিসহকারে গীতা পাঠ করিয়াছিলেন; গীতোক্তিতে বিশ্বাস করিয়াছিলেন,—

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি॥

কলিকাতায় তদীয় মাতামহ রাজা স্যার রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের ভবনে ১৮২২ খৃষ্টাব্দে আনন্দকৃষ্ণ বসুর জন্ম হয়। তাঁহার পিতা মদনমোহন বসু এক

---

* এই প্রবন্ধ প্রধানতঃ শ্রীযুক্ত বাবু বিনয়কৃষ্ণ ঘোষের A short sketch of the life of the late Babu Ananda Krishna Basu নামক পুস্তিকা অবলম্বনে লিখিত।

জন মুখ্য কুলীন ছিলেন। যদি কুলক্রমাগত বৃত্তিবিকাশে বিশ্বাস করিতে হয়, তবে এ কথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, বৃত্তি, তপ, দান—এই নয়টি সদ্গুণের জন্য যাঁহারা কৌলীন্যের কিরণ-চ্ছটায় উদ্ভাষিত হইয়া উঠিয়াছিলেন,—তাঁহাদের গুণরাজির অবশেষ এখনও তাঁহাদের বংশধরদিগের হৃদয়ে বিকাশাপেক্ষী হইয়া আছে, এবং শিক্ষায় ও সুবিধায় সহজেই পূর্ণবিকশিত হইয়া উঠে।

কিছু দিন গৃহে শিক্ষালাভের পর আনন্দকৃষ্ণ হিন্দু কলেজে প্রবেশ করেন। সেখানে তিনি ক্রমাগত সাত বৎসর ছাত্রদিগের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া প্রধান বৃত্তি ভোগ করেন। শেষ পরীক্ষায় আনন্দকৃষ্ণ আইন ভিন্ন অন্য সকল বিষয়েই সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন। তাঁহার পরীক্ষাপ্রশ্নের উত্তর দেখিয়া শিক্ষাবিভাগের তদানীন্তন কর্ত্তা মিষ্টার কেমিরন এতই প্রীত হইয়া-ছিলেন যে, তাঁহার আদেশে ঐ সকল উত্তর কলেজের পরীক্ষার বিবরণের সহিত ইংলণ্ডের তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী সার রবার্ট পীলের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। শারীরিক অসুস্থতানিবন্ধন বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ কর্তৃক টাউন হলে পুরস্কারবিতরণের দিন আনন্দকৃষ্ণ উপস্থিত হইতে পারেন নাই, তাই তিনি সুস্থ হইলে, লর্ড হার্ডিঞ্জ হিন্দুকালেজে একটি সভা আহ্বান করাইয়া, সেই সভায় আনন্দকৃষ্ণকে তাঁহার প্রাপ্য পুরস্কার প্রদান করেন। দৌহিত্রের যোগ্যতাহেতু রাজা স্যর রাধাকান্ত দেব বাহাদুর বড়লাট কর্তৃক অভিনন্দিত হইয়াছিলেন।

আনন্দকৃষ্ণ বাবুর সতীর্থদিগের মধ্যে অনেকেই উত্তরকালে নানাবিদ্যায় বিশারদ হইয়া উঠেন। তাঁহাদের মধ্যে কিশোরীচাঁদ মিত্র, প্যারীচরণ সরকার, রাজনারায়ণ বসু ও গৌরদাস বসাক, এই কয় জনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বিদ্যালয়ত্যাগের পরই আনন্দকৃষ্ণ ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ প্রাপ্ত হয়েন। জ্ঞানচর্চ্চার ব্যাঘাতাশঙ্কা করিয়া তিনি সে পদ গ্রহণ করেন নাই। তাহার পর বিদ্যাসাগর যখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষপদ ত্যাগ করেন, তখন গবর্মেণ্টের জিজ্ঞাসায় তিনি আনন্দ বাবুকেই সর্ব্বতোভাবে ঐ পদের উপযুক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। গবর্মেণ্টের ও বিদ্যাসাগরের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ সত্বেও আনন্দবাবু ঐ পদ গ্রহণ করেন নাই। তাহার পর গবর্মেণ্ট এক-বার তাঁহাকে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপকসভার সদস্যপদ প্রদান করিতে চাহেন, আর

একবার তাঁহাকে J. P. করিবার প্রস্তাব করেন। আনন্দবাবু কোন সম্মানই গ্রহণ করেন নাই। যখন আমাদের চারি দিকে যশের জন্য লোকের দারুণ তৃষ্ণা লক্ষ্য করি, যখন দেখি, শত শত লোক স্তাবকের অভাবে আপনিই আপনার জয়গান গাহিয়া অপরের কর্ণজ্বালার উৎপাদন করিতেছে, যখন ধনের জন্য মানব কর্ত্তৃক সহস্র পাপাচরণ অনুষ্ঠিত হইতে দেখি, তখন মাসিক এক শত কুড়ি টাকা মাত্র আয়ের উপর নির্ভর করিয়া এই জ্ঞানপিপাসু মহাপুরুষের অসাধারণ স্বার্থত্যাগ বিবেচনা করিয়া হৃদয় যুগপৎ বিস্ময়ে ও ভক্তিতে বিহ্বল হইয়া পড়ে।

আনন্দবাবু বিদ্যাসাগরকে ইংরাজী শিখাইয়াছিলেন। অক্ষয়কুমার দত্ত তাঁহার নিকট সাহিত্যে ও অঙ্কশাস্ত্রে পাঠ লইতেন। অক্ষয়কুমারের অক্ষয়-কীর্ত্তি "উপাসক-সম্প্রদায়ের" রচনায় তিনি আনন্দবাবুর নিকট যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছিলেন। সুধী শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঘোষ বলিয়াছেন,—"এ দেশে সাধারণতঃ যেমন হইয়া থাকে, তেমনই যাঁহারা আনন্দবাবুর কর্ত্তৃক উপকৃত হইতেন, তাঁহারা সে উপকার সাধারণে স্বীকার করিতেন না; পরন্তু তাঁহার কৃত কর্ম্মের জন্য যশ আপনারাই অকুণ্ঠিতচিত্তে ভোগ করিতেন।" বিদ্যাসাগরের চরিত্রে বাঙ্গালী-চরিত্রের অনেক দৌর্ব্বল্যের ব্যতিক্রম লক্ষিত হয়। এ বিষয়েও তাহাই হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর কখনও আনন্দবাবুর নিকট তাঁহার কৃতজ্ঞতার ঋণ স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই। বিধবাবিবাহ আইনের প্রচলনকালে আইনের ভার সার জন পিটার গ্র্যাণ্টের উপর ছিল। তিনি হিন্দুর আচার ব্যবহার ও শাস্ত্রসম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের নিকট নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। বিদ্যাসাগরের অনুরোধে আনন্দবাবু ঐ সকল বিষয়ের বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া দেন। সেই বিবরণের ভিত্তির উপর সার জন তাঁহার প্রসিদ্ধ পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতার রচনা করেন। আনন্দবাবু স্বীয় নামপ্রকাশে অসম্মত; কিন্তু কপটতা বিদ্যাসাগরের স্বভাববিরুদ্ধ। বিদ্যাসাগর সার জনকে বলিয়া আসেন যে, সে বিবরণ তাঁহার নহে—তাঁহার এক বন্ধুর। সার জনও বলেন যে, তাঁহার বক্তৃতার উপাদানের জন্য তিনি বিদ্যাসাগরের কোন বন্ধুর নিকট ঋণী; কিন্তু সেই বন্ধু স্বীয় নাম-প্রকাশে অসম্মত। আনন্দ বাবুর নিকট উপকৃত হইয়া যাঁহারা সে উপকার বিস্মৃত হয়েন নাই, তাঁহাদের মধ্যে আর এক জনের নাম উল্লেখ-যোগ্য। রায় হেমচন্দ্র কর বাহাদুরের অনুরোধে আনন্দবাবু তাঁহার জন্য

গাঁজার বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন সেই বিবরণের জন্য হেমচন্দ্র গবর্মেণ্ট কর্ত্তৃক প্রশংসিত হইয়াছিলেন। (বাবু বলিতেন,—আনন্দবাবুই রাজকার্য্যে তাঁহার সাফল্যের অন্যতম কারণ।

ইলবার্টবিল বিতর্কে রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ দেবের স্বাক্ষরিত সকল পত্রই আনন্দ বাবুর রচনা। সেই সকল পত্র পাঠ করিয়া কেবল পার্লামেন্টের সভ্য সার ডি. এম্. ম্যাকফারলেন নহেন, পরন্তু ক্ষণজন্মা মিষ্টার গ্ল্যাডষ্টোন, বড়লাট লর্ড রিপন ও ভারতবন্ধু মিষ্টার ব্রাডলও বিশেষ প্রশংসা করিয়াছিলেন। মিষ্টার ব্রাডল তাঁহার পত্রে ঐ সকল রচনার সুদীর্ঘ সমালোচনা করেন। কন্‌গ্রেস-বন্ধু মিষ্টার হিউম ও সুপণ্ডিত ডাক্তার বিভারিজ, উভয়েই আনন্দবাবুর গৃহে যাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। ডাক্তার বিভারিজ তাঁহার নন্দকুমারের মকদ্দমা-সম্বন্ধীয় প্রসিদ্ধ পুস্তকের রচনাকালে আনন্দবাবুর নিকট হইতে অনেকবার অনেক উপদেশ লইয়াছিলেন।

নদীর স্রোতে ভূমি উর্ব্বরা হয়, জীবের জীবনরক্ষা হয়, কিন্তু যাহারা উপকৃত, তাহারা অনেকেই জানে না, বিমলসলিলোদ্গারী স্রোতের মূল উৎস কোথায়। তেমনই আমরা নানা বিষয়ে আনন্দবাবুর কার্য্যের ফলভোগ করিয়াছি, কিন্তু কার্য্যকারক কে, তাহা জানিতে পারি নাই।

আনন্দবাবু কাহারও পক্ষে অনধিগম্য ছিলেন না। উচ্চ রাজকর্ম্মচারী ও প্রথিতযশ কোবিদ হইতে দীন ধর্ম্মপিপাসু ও কর্ম্মপ্রার্থী, সকলেই তাঁহার নিকটে সমান আদর পাইতেন। অর্থ দিয়া সাহায্য করা সর্ব্বদা আনন্দবাবুর পক্ষে সম্ভব হইত না; কিন্তু অন্য যে প্রকারে সম্ভব, উপকার করিতে তিনি কখনও দ্বিধা করিতেন না। শিক্ষিত ব্যক্তি কর্ম্মপ্রার্থী হইলেই তিনি বিদ্যাসাগরকে বলিয়া দিতেন। মেট্রপলিটন বিদ্যালয়ে শিক্ষকের আবশ্যক থাকিলে আনন্দ বাবুর অনুরোধ কখনও অবহেলিত হইত না। একবার অর্থের অভাবে তিনি অর্থীকে স্বীয় গাত্রবস্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন। রাজা দিগম্বর মিত্রের জীবনকথা তিনি অবগত ছিলেন। তিনি সে জীবনচরিতের রচনা করিলে দুই তিন সহস্র টাকা পাইতেন। কিন্তু লিখিতে অনুরুদ্ধ হইলেই তাঁহার মনে পড়িল, ঐ জীবনচরিতরচনার ভার পাইলে তাঁহার প্রবীণ বন্ধু শ্রীযুত ভোলানাথ চন্দ্রের উপকার হইবে। তাঁহারই অনুরোধে সেই চরিতরচনার ভার ভোলানাথ বাবুর উপর অর্পিত হয়।

বাঙ্গলা, ইংরাজী ও সংস্কৃত ব্যতীত গ্রীক, লাটিন, ফ্রেঞ্চ, হিব্রু, উর্দ্দু,

পারসীক ভাষাতেও আনন্দবাবু ব্যুৎপন্ন ছিলেন। এই সকল ভাষায় রচিত ধর্ম্মসম্বন্ধীয়, সাহিত্যসম্বন্ধীয় ও বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় নানা গ্রন্থে তাঁহার বৃহৎ পুস্তকাগার সুসজ্জিত থাকিত। নানা ভাষার জ্ঞানসম্পদসার পুস্তকরাজির এরূপ সংগ্রহ কলিকাতায় নিতান্তই বিরল। ষ্টেটসম্যান-সম্পাদক মৃত মিষ্টার নাইট প্রভৃতি কলিকাতার সাধারণ পুস্তকাগারে কোন দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ না পাইলে আনন্দবাবুর শরণাগত হইতেন। বৃদ্ধ বয়সেও কোন দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ পাইলে তিনি আদ্যন্ত নকল করিয়া লইতেন। মাতামহের "শব্দকল্পদ্রুমে"র রচনায় দৌহিত্র যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। বিদেশীয় বিদ্বজ্জনসমাজে রাজা স্যর রাধাকান্ত দেবের পত্রাদিও ইদানীং আনন্দবাবুই লিখিতেন। আনন্দবাবু বাঙ্গালার একখানি বিস্তৃত ইতিহাসের ও বাঙ্গালায় একখানি বৈজ্ঞানিক শব্দের অভিধানের খসড়া রাখিয়া গিয়াছেন। অভিধানখানির খসড়া লইয়া ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ" দেশের কল্যাণসাধন করিতে পারিবেন। আনন্দ বাবু ইংরাজীতে রচিত ভারতবর্ষের একখানি বিস্তৃত ইতিহাসের রচনা করিয়া গিয়াছেন,—কাপ্তেন রিচার্ডসন ঐ পুস্তকের একটি বিস্তৃত ভূমিকা লিখিয়াছিলেন। আশা করি, ঐ পুস্তকখানি অচিরে প্রকাশিত হইবে। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ১৩ই সেপ্টেম্বর তারিখে তাঁহার নিয়মিত প্রভাতী গীতাপাঠের পর, কোন রোগযাতনাবিহীন অবস্থায় সহসা আনন্দবাবুর প্রাণ-বিয়োগ হয়।

তাঁহার শেষ জীবন নিরবচ্ছিন্ন সুখের ছিল না। কিন্তু যে গীতা তাঁহাকে আবশ্যকের সময় কর্ম্মে নিয়োজিত করিত,—সেই গীতাই তাঁহাকে রোগে সহিষ্ণুতা, শোকে সান্ত্বনা ও নির্য্যাতনে হৃদয়ে শান্তিদান করিত। রোগে, শোকে, আত্মীয়ের নির্য্যাতনে তিনি কখনও বিচলিত হয়েন নাই। তিনি "সুখে দুঃখে নির্ব্বিকার" ছিলেন। গীতা তাঁহাকে সংসারের মোহবন্ধমুক্ত করিয়াছিল; তাই তিনি গীতার সম্বন্ধে বলিতেন,—"সর্ব্বদুঃখহরা গীতা সর্ব্ব-জ্ঞানপ্রযোজিকা, সর্ব্বশাস্ত্রসারভূতা।"

একবার আনন্দবাবু যেখানে গীতার আবৃত্তি করিতেছিলেন, তাহার পার্শ্বেই একজন জোর করিয়া একটি কক্ষের দখল লইতেছিল। তিনি এমনই তদ্গতচিত্তে গীতার আবৃত্তি করিতেছিলেন যে, সে গোলমালে তাঁহার মনোযোগ আকৃষ্ট হয় নাই।

আনন্দবাবুর অসাধারণ ক্ষমাগুণের ও সহিষ্ণুতার একটিমাত্র দৃষ্টান্ত দিয়া

পারসীক ভাষাতেও আনন্দবাবু ব্যুৎপন্ন ছিলেন। এই সকল ভাষায় রচিত ধর্ম্মসম্বন্ধীয়, সাহিত্যসম্বন্ধীয় ও বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় নানা গ্রন্থে তাঁহার বৃহৎ পুস্তকাগার সুসজ্জিত থাকিত। নানা ভাষার জ্ঞানসম্পদসার পুস্তকরাজির এরূপ সংগ্রহ কলিকাতায় নিতান্তই বিরল। ষ্টেটসম্যান-সম্পাদক মৃত মিষ্টার নাইট প্রভৃতি কলিকাতার সাধারণ পুস্তকাগারে কোন দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ না পাইলে আনন্দবাবুর শরণাগত হইতেন। বৃদ্ধ বয়সেও কোন দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ পাইলে তিনি আদ্যন্ত নকল করিয়া লইতেন। মাতামহের "শব্দকল্পদ্রুমে"র রচনায় দৌহিত্র যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। বিদেশীয় বিদ্বজ্জনসমাজে রাজা স্যর রাধাকান্ত দেবের পত্রাদিও ইদানীং আনন্দবাবুই লিখিতেন। আনন্দবাবু বাঙ্গালার একখানি বিস্তৃত ইতিহাসের ও বাঙ্গালায় একখানি বৈজ্ঞানিক শব্দের অভিধানের খসড়া রাখিয়া গিয়াছেন। অভিধানখানির খসড়া লইয়া ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ" দেশের কল্যাণসাধন করিতে পারিবেন। আনন্দ বাবু ইংরাজীতে রচিত ভারতবর্ষের একখানি বিস্তৃত ইতিহাসের রচনা করিয়া গিয়াছেন,—কাপ্তেন রিচার্ডসন ঐ পুস্তকের একটি বিস্তৃত ভূমিকা লিখিয়াছিলেন। আশা করি, ঐ পুস্তকখানি অচিরে প্রকাশিত হইবে। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে তাঁহার নিয়মিত প্রভাতী গীতাপাঠের পর, কোন রোগযাতনাবিহীন অবস্থায় সহসা আনন্দবাবুর প্রাণ-বিয়োগ হয়।

তাঁহার শেষ জীবন নিরবচ্ছিন্ন সুখের ছিল না। কিন্তু যে গীতা তাঁহাকে আবশ্যকের সময় কর্ম্মে নিয়োজিত করিত,—সেই গীতাই তাঁহাকে রোগে সহিষ্ণুতা, শোকে সান্ত্বনা ও নির্য্যাতনে হৃদয়ে শান্তিদান করিত। রোগে, শোকে, আত্মীয়ের নির্য্যাতনে তিনি কখনও বিচলিত হয়েন নাই। তিনি "সুখে দুঃখে নির্ব্বিকার" ছিলেন। গীতা তাঁহাকে সংসারের মোহবন্ধমুক্ত করিয়াছিল; তাই তিনি গীতার সম্বন্ধে বলিতেন,—"সর্ব্বদুঃখহরা গীতা সর্ব্ব-জ্ঞানপ্রয়োজিকা, সর্ব্বশাস্ত্রসারভূতা।"

একবার আনন্দবাবু যেখানে গীতার আবৃত্তি করিতেছিলেন, তাহার পার্শ্বেই একজন জোর করিয়া একটি কক্ষের দখল লইতেছিল। তিনি এমনই তদ্গতচিত্তে গীতার আবৃত্তি করিতেছিলেন যে, সে গোলমালে তাঁহার মনোযোগ আকৃষ্ট হয় নাই।

আনন্দবাবুর অসাধারণ ক্ষমাগুণের ও সহিষ্ণুতার একটিমাত্র দৃষ্টান্ত দিয়া

আমরা বর্ত্তমান প্রস্তাব শেষ করিব।—একবার কোন রাজকীয় ব্যবস্থা সম্বন্ধে আনন্দবাবু তাঁহার কোন আত্মীয়ের হইয়া একজন ইংরাজ রাজনীতিবিশারদের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। আনন্দবাবু তখন রোগে শয্যাশায়ী—স্বয়ং বসিয়া লিখিতে অসমর্থ। রোগশয্যায় শয়ন করিয়া তিনি বক্তব্য বলিয়া যাইতেন, আর তাঁহার এক পুত্র লিখিয়া লইতেন। একদিন যখন তিনি বলিতেছেন ও তাঁহার পুত্র লিখিতেছেন, তখন সেই আত্মীয় আনন্দবাবুর ভ্রাতার সহিত কলহহেতু ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার কক্ষে প্রবেশ করিয়া অকথ্যভাষায় গালি দিলেন। আনন্দবাবু স্থির হইয়া সব শুনিলেন।—আত্মীয়ের কথা শেষ হইলে বলিলেন, "আপনার মাথা খারাপ হইয়াছে। নিজের ঘরে যা'ন।" রিপুজয়ী পিতার এই অসাধারণ সহিষ্ণুতা যুবক পুত্রের ভাল লাগে নাই; রোষে অভিমানে তিনি কক্ষ ত্যাগ করিয়াছিলেন। আত্মীয় চলিয়া যাইবার পরই পুত্রের ডাক পড়িল। আনন্দবাবু তাঁহাকে কক্ষত্যাগের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে পুত্র বলিলেন, "উহার জন্য এত কষ্ট করিয়া কি হইবে?" পিতা উত্তর করিলেন, "সে বিচার তোমার নহে। আমি লিখিতে অসমর্থ, তাই তোমাকে লিখিতে বলিয়াছি; যদি আপত্তি থাকে বল, আমি অন্য কাহাকেও ডাকিব। কেহ দুর্ব্বুদ্ধিবশে আমার অপকার করিলে আমি কি তাহার জন্য আরব্ধ কর্ম্ম সম্পূর্ণ না করিয়া তাহাকে অপমানিত করিব?" পুত্র আবার লিখিতে বসিলেন। তাহার পর আত্মীয় যখন প্রবন্ধ লইতে আসিলেন, তখন আনন্দবাবু তাঁহার কুব্যবহারের উল্লেখমাত্র না করিয়া তাঁহাকে প্রবন্ধ প্রদান করিলেন।

প্রতিশোধ।

১

১৩০১ সালের ফাল্গুনের শেষে, কলিকাতায় বসন্তরোগের আবির্ভাবে অধিবাসীরা ভয়চকিত হইয়া উঠিল। উত্তরোত্তর রোগের অধিকতর প্রাদুর্ভাব দেখিয়া অনেক বিদেশী লোক সহর ছাড়িয়া পলায়ন করিল। যাহাদের কলিকাতা ত্যাগ করিবার উপায় নাই, তাহারা কেহ মা শীতলার পূজা দিল, কেহ বা টীকা লইয়া, বিবিধ প্যাটেণ্ট ঔষধ কিনিয়া, আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতে লাগিল।

ক্রমে এই দুরন্ত সংক্রামক রোগ মহামারীর ন্যায় সহর উজাড় করিতে প্রবৃত্ত হইল। অধিবাসীদের আশঙ্কা প্রবল হইয়া উঠিল। সকলেই ভয়চকিত; কাহারও মুখে আর অন্য কথা নাই, মনে স্বস্তি নাই।

এই সময়ে পটলডাঙ্গার একটি মেসে কয়েকটি ছাত্র তখনও সাহসে নির্ভর করিয়া বাস করিতেছিল। মড়কের ধুম দেখিয়া মেসের কয় জন পলাইয়াছিল, কেহ বা পলাইবার উদ্যোগ করিতেছিল। সকলের মনে ভয়—কখন কি হয়।

অপরাহ্নে যশোরের যতীন বসুর ঘরে আড্ডা করিয়া ছেলেরা গুলতান্ করিতেছিল। যতীন মাঝে মাঝে ছবি আঁকে;—খগেন তাহাকে বলিতেছিল, "তুমি মা শীতলার একখানা ছবি আঁকো।" যতীনের ব্রাহ্মসমাজে গতিবিধি ছিল বটে,—কিন্তু সেও এই দুরন্ত দেবতার সহিত বিদ্রূপ করিতে সম্মত হইল না। তখন সকলে অনাদিকে ধরিয়া বসিল, "ভট্‌চাজ্! তোমার রামায়ণ গান শোনা যাক্।" যদিও অনাদিচরণ বন্দ্য-বংশ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, কিন্তু মেসে তাহার বিবিধ উপাধি বিদ্যমান। কেহ বলিত ভট্‌চাজ্, কেহ ডাকিত শ্বশুর; এবং যতী মাঝে মাঝে তাহাকে যে মিষ্ট সম্বোধনে আপ্যায়িত করিত, তাহাতে বিশেষ কুটুম্বিতা প্রকাশ পাইত। অনাদির সব প্রস্তুত, এখন বাড়ী হইতে মনীঅর্ডার আসিলেই সে রেলে চড়ে।—এক সঙ্গে যাইবে বলিয়া, সে মেসের আর দুই জনকে ধরিয়া রাখিয়াছে।

এমন সময় মেসের ঝি আসিয়া খবর দিল, বামুনঠাকুর পলাতক।

ছাত্রের দল তখন সভাভঙ্গ করিয়া বামুন খুঁজিতে গেল। দুই এক জন বেগতিক দেখিয়া অন্য পরিচিত মেসে গিয়া অতিথি হইল। যে দুই জন অনাদির জন্য অপেক্ষা করিতেছিল, তাহারা সেই দিনই সন্ধ্যার সময় দেশে যাত্রা করিল।

কলিকাতায় তখন বস্তি উজাড় হইতেছিল; যাহারা মেসে চাকরী করে, তাহারা প্রায় মেসের কাজকর্ম্ম সারিয়া স্ব স্ব বাসায় চলিয়া যায়। এই সব বস্তিতেই তাহাদের আড্ডা। মৃত্যুভয়ে তাহারাও কলিকাতা ত্যাগ করিতেছিল।

অনেক খুঁজিয়াও বামুন পাওয়া গেল না। ছাত্রমহলে স্থির হইল, সংক্রামক রোগের সময় বাজারে খাবার খাওয়া ভাল নয়; কিন্তু বহু তর্কের পর যখন জঠরাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল, তখন অগত্যা বাজারের খাবারে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া যে যার শয্যায় শয়ন করিল।

২

তখনও রাত্রি আছে, কিন্তু প্রভাতেরও অধিক বিলম্ব নাই। উচ্চ ক্রন্দনরোলে প্রথমে যতীনের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। ক্রমে আর সকলের নিদ্রাভঙ্গ হইল। আবার যতীনের ঘরে বৈঠক আরম্ভ হইল। দুইখানা বাড়ীর পরে যে রোগীটি বসন্তে আক্রান্ত হইয়াছিল, এই রাত্রিশেষে তাহার সকল যন্ত্রণার অবসান হইল, তাহা বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হইল না। ঘর অন্ধকার, কেবল রাজপথের একটা গ্যাসের আলো বারান্দার মুক্ত বাতায়নপথে গৃহে প্রবেশ করিয়া গৃহপ্রাচীরের এক অংশে প্রতিফলিত হইতেছিল। সেই অস্পষ্ট অন্ধকারে, ছাত্রদল কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া সেই করুণ ক্রন্দন শুনিতে লাগিল। সহসা সেই শান্ত নীরবতা ভঙ্গ করিয়া উচ্চকণ্ঠে শব্দিত হইল—"বল হরি, হরিবোল্!"

তখন এক জন বলিল, "আলোটা জ্বালিয়া ফেল না—আর অন্ধকারে বসিয়া থাকা যায় না।"

খগেন বলিল, "আলো ও অন্ধকার, দুই প্রায়ই সমান ;—যেমন, জীবন ও মৃত্যু। সেখানে আলো আছে কি না কে জানে ;—অন্ধকার সহাইয়া রাখ।"

অনাদি বলিল, "যে আজ্ঞে দার্শনিক মহাশয়, এখন একটু ক্ষমা দিন। যতে! দেশ্‌লাই বার কর্।"

যতীন খানিক খুঁজিয়া দেশলাই বাহির করিল। অনাদি আলো জ্বালিতে গিয়া চিম্‌নীটা ভাঙ্গিল,—এবং সে জন্য বিন্দুমাত্র অপ্রস্তুত না হইয়া, নিজের ঘর হইতে একটা আলো জ্বালিয়া আনিল।

তখন এক জন বলিল, "কি করা যায়?"

অনাদি বলিল, "যঃ পলায়তি স জীবতি। অতএব, এসো, সকলে প্রস্থান করি।"

খগেন বলিল, "আর দুই এক দিন দেখা যাক।"

অনাদি সজোরে তক্তপোষ চাপড়াইয়া বলিল, "নিশ্চয়—যতক্ষণ মনী-অর্ডার না আসে, ততক্ষণ নিশ্চয় আছি।"

এমন সময় যতীনের ষ্টোভের প্রতি অনাদিচরণের চক্ষু পড়িল। সে ষ্টোভ্‌টি জ্বালিয়া, গৃহকোণবর্ত্তী কুঁজা হইতে কেট্‌লীতে জল ঢালিয়া ষ্টোভে চড়াইয়া দিল। তার পর চা প্রস্তুত করিয়া, যতীনকে বলিল, "তোর কন্‌ডেন্‌ষ্ট্ মিল্ক্ নেই?"

যতীন বলিল, "না।"

অনাদি তবু একবার চারি দিকে খুঁজিয়া দেখিল। তার পর তাক হইতে চিনির পাত্রটা লইয়া আসিয়া অতি সন্তর্পণে সকলকে এক এক চামচ চিনি দিয়া, অম্লানবদনে নিজের পেয়ালায় চিনির পাত্রটি উপুড় করিয়া বলিল, "দুধের অভাব চিনিতে পূরণ করা গেল। আর চিনির খাতিরেই ত আমার চা খাওয়া।"

যতীন তাহার চিরাভ্যস্ত সুমিষ্ট সম্ভাষণে অনাদিকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "বিশেষতঃ যদি নিজে কিনিতে না হয়।"

সকলে হাসিতে লাগিল।

প্রভাতে ঝি আসিয়া সদর-দরজায় ঘা দিতে লাগিল। কিন্তু কে নীচে গিয়া দরজা খুলিবে, কিছুতেই আর তাহার মীমাংসা হয় না। অবশেষে যখন ঝির মেজাজ উষ্ণ হইবার উপক্রম হইল, তখন যতীন উঠিয়া দরজা খুলিতে গেল। খগেনও তাহার অনুবর্ত্তী হইল।

ঝি চৌবাচ্চার কলটা খুলিয়া দিয়া, বসন্তের গল্প জুড়িল। তিন দিনের মধ্যে, সেই পাড়ায় ষোলটি, তাহাদের পাড়ায় বাইশটি, ইত্যাদি যতগুলি মৃত্যুর সংবাদ সে রাখিত, বিস্তারিতভাবে তাহার বর্ণনা করিল। তাহার পর বলিল,—"ঘরের ছেলে ঘরে যাও বাবা, প্রাণ থাক্‌লে ঢের লেকাপড়া হবে।"

বাসায় একটা আতঙ্কের ছায়া পড়িল।

৩

দুই দিন পরে, বেলা তিনটার সময় সকলে একটা ঘরে সমবেত হইয়া পরামর্শ করিতেছিল,—কি করা যায়? এমন সময় অনাদিচরণ কলেজের ফেরত সেই ঘরে প্রবেশ করিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "আমার মণীঅর্ডার এসেছে?"

খগেন বলিল,—"আমি ত সমস্ত দিনই বাসায় আছি,—দেখি নাই।"

অনাদি তক্তপোষের উপর বহিগুলা ফেলিয়া, স্বয়ং গৃহপ্রান্তবর্ত্তী একটা ক্যাম্পটেবিলে বসিয়া, গান ধরিল,—

"এস হে এস পিয়ন সখা!
একবার ওই রূপে দাও দেখা।
তোমার শ্রীচরণে নাগ্‌রা জুতো হে—
ও তায় আগাগোড়া কাদা-মাখা!
তোমার কাঁধে ঝোলে চামড়ার ব্যাগ্‌ হে—
তাহে ঝন্‌ ঝন্‌ বাজে কেবল টাকা।"

অনাদিচরণের সুকণ্ঠ বলিয়া সুখ্যাতি ছিল না। তাহার সঙ্গীরা "থামো! থামো!" বলিয়া গায়কের মুখ চাপিয়া ধরিল।

এমন সময় এক ঠোঙ্গা খাবার হাতে ঝি সেই ঘরে প্রবেশ করিল। বলিল,—"ওগো! নগেন বাবুর ঘরে গিয়ে দেখি, তিনি বিছানায় পড়ে [illegible] ফাট্‌ছে—আমি ত জানি নি—খাবার"—

ঝির কথা সমাপ্ত না হইতেই অনাদিচরণ এক লম্ফে তাহার সমীপবর্ত্তী হইয়া ঠোঙ্গাটি নিজে অধিকার করিল, এবং একখানা খাস্তার কচুরী মুখে ফেলিয়া দিয়া বলিল,—"ঝি! সে জন্যে তোমার ভাবনা নেই, এখানে খাবার লোক আছে, খাবার নষ্ট হবে না।"

আর সকলে নগেনের জ্বর হইয়াছে শুনিয়া বড় শঙ্কিত হইল, এবং তাড়াতাড়ি তাহার ঘরে চলিল। অনাদি বলিল, "চল—আমিও যাই,—গান্‌টা নিজে বাঁধিয়াছি, তোমাদের শুনাইয়া দি।"

খগেন বলিল, "গান থাক্—তুমি একবার ডাক্তার দাসকে খবর দাও,—যে সময়, এখুনি ডাক্তার আনা ভালো।"

অনাদি খাবারের ঠোঙ্গাটি নিঃশেষ করিয়া, এক গ্লাস জল খাইয়া,—কাঁধে একখানি চাদর ফেলিয়া, ডাক্তার আনিতে গেল।

৪

নগেনের বয়স বেশী নয়—এখনও যৌবনসীমায় পদার্পণ করে নাই। সম্পন্ন গৃহস্থের সন্তান। কলিকাতায় মেসে থাকে, পড়াশুনা করে।

দুই তিন দিন হইতে তাহার শরীরে যেন স্বাচ্ছন্দ্য ছিল না। তাহার সর্ব্বাঙ্গে বেদনা,—কিন্তু বেশী নয়; মাথা ভার; ক্ষুধার অভাব। এই রকমে দু' তিন দিন কাটিয়াছিল। আজ স্কুলে তাহার জ্বর আসিয়াছিল। জ্বর-গায়ে স্কুল হইতে হাঁটিয়া আসিয়া সে শয্যার আশ্রয় লইয়াছে। সে জ্বরে এমন অবসন্ন হইয়াছিল যে, মেসের কাহাকেও ডাকিতেও পারে নাই।

ডাক্তার আসিয়া দেখিয়া গেলেন। গম্ভীরভাবে বলিলেন, "আজ কিছু বলা যায় না। আমি কাল আবার আসিব।"

মেসের আতঙ্কিত ছাত্রমহলে আশঙ্কা সংশয় ঘনাইয়া আসিল। সকলেরই মনে হইতেছিল,—বুঝি বা বসন্ত দেখা দেয়। কিন্তু কেহ মনের সন্দেহ মুখে প্রকাশ করিতে পারিতেছিল না।

মেসের ঝি কাজকর্ম্ম সারিয়া রাত্রে বাসায় চলিয়া যায়। কিন্তু আজ সে

বাসায় গেল না, নগেনের ঘরের বারান্দায় শুইয়া রহিল। বাসার ছেলেদের মধ্যে নগেন সবচেয়ে ছেলেমানুষ। বোধ করি ঝির তাহার প্রতি একটু কেমন মায়া ছিল।

৫

পরদিন প্রাতে জানা গেল, নগেনের বসন্ত হইয়াছে। মধুচক্রে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিলে তাহার যেমন অবস্থা হয়, এই দুঃসংবাদে মেসের ছাত্রদলে সেইরূপ চাঞ্চল্য উপস্থিত হইল।

বেলা আটটার সময় যতীনের মাতুল দেবেন্দ্রপ্রসাদ বেড়াইতে আসিয়া শুনিলেন, মেসে এক জনের বসন্ত হইয়াছে। তিনি যতীনকে আর সেখানে রাখিতে সম্মত হইলেন না। অগত্যা সে চাঁপাতলায় তাহার মামার বাড়ী চলিয়া গেল। আর আর সকলেও বাড়ী যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিল।

নগেনের এক আত্মীয় হারিসন রোডের একটা মেসে থাকিতেন। তাঁহাকে নগেনের সেবা শুশ্রূষার উপায়বিধান করিবার জন্য, একখানি চিঠি লিখিয়া দিয়া, মেসের ছাত্রগণ, কেহ ইচ্ছায়, কেহ অনিচ্ছায়, কেহ প্রাণের ভয়ে, কেহ অভিভাবকের কড়া হুকুমে, যে যার বাড়ী চলিয়া গেল।

রোগক্লিষ্ট, যন্ত্রণাবিধুর, মরণভয়ভীত নগেন্দ্রনাথ বন্ধুগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া, দুরন্ত বসন্ত রোগের কবলে আত্মসমর্পণ করিয়া, মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

রোগের যন্ত্রণা অপেক্ষা এই অসহায় অবস্থা তাহার পক্ষে অধিকতর অবসাদের কারণ হইল। তখন স্নেহকিরণসমুজ্জ্বল পল্লীগৃহের কথা তাহার স্মরণপথে প্রতিফলিত হইতেছিল,—মধ্যে মধ্যে অশ্রুজলে তাহার বসন্ত-ব্রণকণ্টকিত পাণ্ডু গণ্ডদেশ ভাসিয়া যাইতেছিল।

নগেনের এই অসহায় অবস্থায়, ঝি তাহাকে পরিত্যাগ করিল না। ঝির প্রাণের মায়া ছিল কি না, বলিতে পারি না; কিন্তু নগেনের মায়া সে ছাড়িতে পারিল না। নগেনকে একাকী ফেলিয়া সে বাসায় যাইতে পারিল না। সমস্ত দিন অনাহারে নগেনের শুশ্রূষায় নিযুক্ত রহিল।

অপরাহ্নের অস্তমান রবিকর নগেনের শয্যায় আসিয়া পড়িল; তাহার নিষ্প্রভ মলিন মুখ ও নিমীলিত নেত্রযুগ রৌদ্রকরে একটু কুঞ্চিত হইল। ঝি উঠিয়া জানালা বন্ধ করিয়া দিল। জানালা বন্ধের শব্দে নগেন এক বার চক্ষু চাহিল। ঝিকে বলিল, "তুমি এখনও বসিয়া আছ?"

ঝি বলিল, "সমস্ত দিনটা তুমি অঘোরে ছিলে, আমি কেমন করিয়া তোমায় একলা ফেলিয়া যাই। একটু একলা থাকো বাবা, আমি এই চিঠি-খানা দিয়ে আসি।"

নগেন কাতরনয়নে, সন্দিগ্ধচিত্তে, ঝির মুখের দিকে চাহিল, তাহার পর তাহার অঞ্চল ধরিয়া বলিল, "সবাই ফেলে চলে গেছে, ঝি, তুমি ফেলে যেও না!" অশ্রুজলে তাহার উপাধান সিক্ত হইতে লাগিল।

ঝি বলিল, "তোমায় ফেলে আমি কোথাও যাব না বাবা; একবার ছেড়ে দাও, নতুন রাস্তার সেই বাসায় তোমার কে আপনার লোক আছেন,—তাঁহাকে এই চিঠিখানি দিয়া আসি।"

রোগের যন্ত্রণায়, শারীরিক দৌর্ব্বল্যে, মনের উদ্বেগে ও আশঙ্কায়, নগেনের প্রতিবাদ করিবারও সাধ্য ছিল না। তাহার মুষ্টি শিথিল হইয়া আসিল, অনিচ্ছা সত্বেও অঞ্চল মুক্ত হইল। নগেন আবার চক্ষু মুদিয়া পাশ ফিরিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না।

ঝি অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া বলিল, "ঠাকুর! রক্ষা কর!" তার পর চিঠিখানি সংগ্রহ করিয়া সে হারিসন রোডের দিকে প্রস্থান করিল।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে ডাক্তার দাস নগেনকে দেখিতে আসিলেন। উপরে উঠিয়া তিনি মেসের কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। প্রত্যেক কক্ষে অনুসন্ধান করি-লেন, কিন্তু জনমানবের সাক্ষাৎ পাইলেন না; তখন তাঁহার মনে হইল, বাড়ীতে বসন্তরোগের আবির্ভাব দেখিয়া ছেলেরা মেস ছাড়িয়া পলাইয়াছে। কিন্তু বসন্তপীড়িত নগেন্দ্রনাথ কোথায় গেল? তাহাকে হয় ত কোনও আত্মীয়ের আলয়ে বা হাঁসপাতালে পাঠাইয়া থাকিবে।

ডাক্তার দাস ফিরিতেছিলেন, আবার কি মনে হইল—তিনি আবার উপরে উঠিয়া নগেনের ঘরের দিকে চলিলেন।

সেই অন্ধকার কক্ষে, হৃদয়ে তদপেক্ষা অন্ধকার আশঙ্কা সংশয় নিরাশার ভার লইয়া নগেন্দ্রনাথ শয্যার সহিত মিশিয়া পড়িয়া আছে। ডাক্তার বাবু তাহার অবস্থা কল্পনা করিয়া শিহরিয়া উঠিলেন।

নগেন চমকিয়া উঠিল; জিজ্ঞাসিল, "কেও? ঝি?"

ডাক্তার বাবু বলিলেন, "না, আমি ডাক্তার।"

নগেন ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, "তবে ঝিও চলে গেছে—ডাক্তার ম'শায়, আমার কি হবে?"

ডাক্তার বাবুও অন্যমনে তাহাই ভাবিতেছিলেন।

৬

এমন সময়ে সোপানে কাহার পদশব্দ শ্রুত হইল। ডাক্তার দাস বলিলেন, "কে ও?"

ঝি নিরুত্তরে নিঃশব্দে সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। তাহার হাতে সেই চিঠি।

ঝি প্রদীপ জ্বালিয়া, ঘরের কোণ হইতে একটা মাটীর দেল্‌কো আনিয়া তাহার উপর প্রদীপটি বসাইয়া, রোগীর শয্যাপার্শ্বে রক্ষা করিল।

নগেন জিজ্ঞাসা করিল, "চরণ বাবু এলেন না?"

ঝি বলিল, "তিনি সে বাসায় নেই। তাঁদের বাসার সকলে চলে গেছে; তিনি কোথায় আছেন, কেউ বল্‌তে পার্‌লে না। আমি পাশের বাসায় সন্ধান নিয়ে আর দুটো তিনটে বাসা খুঁজে আস্‌ছি—কিন্তু তিনি কোথাও নেই।"

ডাক্তার দাস জিজ্ঞাসা করিলেন, "চরণ বাবু কে?

নগেন। আমার দূর সম্পর্কের ভগিনীপতি।

ডাক্তার দাস জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার বাড়ীতে খবর দেওয়া উচিত। তোমার বাড়ী কোথায়?"

নগেন বলিল, "হরিরামপুর।"

গ্রামের নাম শুনিয়া ঝি যেন একটু চমকিয়া উঠিল; সে উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিল।

ডাক্তার বাবু আবার জিজ্ঞাসিলেন, "কোন্ জেলা? পোষ্ট-আফিসের নাম কি? সেখানে টেলিগ্রাফ যায় না?

নগেন বলিল, "পাবনা। আমাদের গ্রামেই ডাকঘর। টেলিগ্রাফ যায়।"

ঝি আপন মনে বলিতেছিল,—"হরিরামপুর—পাবনা!"

ডাক্তার বাবু ঝির দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "হরিরামপুরে তোমার বাড়ী বুঝি?"

ঝি ডাক্তার বাবুর কথার উত্তর দিল না; বুঝি সে দিকে তাহার কানও ছিল না। সে বিছানার পাশে বসিয়া নগেনের মাথার চুলগুলি সযত্নে কুরিয়া দিতে লাগিল।

ডাক্তার বাবু বলিলেন, "আমি তোমার বাড়ীতে টেলিগ্রাফ করিয়া দিতেছি। তোমার বাবার নাম?"

ঝি বলিল, "সমস্ত দিনটা তুমি অঘোরে ছিলে, আমি কেমন করিয়া তোমায় একলা ফেলিয়া যাই। একটু একলা থাকো বাবা, আমি এই চিঠি-খানা দিয়ে আসি।"

নগেন কাতরনয়নে, সন্দিগ্ধচিত্তে, ঝির মুখের দিকে চাহিল, তাহার পর তাহার অঞ্চল ধরিয়া বলিল, "সবাই ফেলে চলে গেছে, ঝি, তুমি ফেলে যেও না!" অশ্রুজলে তাহার উপাধান সিক্ত হইতে লাগিল।

ঝি বলিল, "তোমায় ফেলে আমি কোথাও যাব না বাবা; একবার ছেড়ে দাও, নতুন রাস্তার সেই বাসায় তোমার কে আপনার লোক আছেন,—তাঁহাকে এই চিঠিখানি দিয়া আসি।"

রোগের যন্ত্রণায়, শারীরিক দৌর্ব্বল্যে, মনের উদ্বেগে ও আশঙ্কায়, নগেনের প্রতিবাদ করিবারও সাধ্য ছিল না। তাহার মুষ্টি শিথিল হইয়া আসিল, অনিচ্ছা সত্ত্বেও অঞ্চল মুক্ত হইল। নগেন আবার চক্ষু মুদিয়া পাশ ফিরিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না।

ঝি অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া বলিল, "ঠাকুর! রক্ষা কর!" তার পর চিঠিখানি সংগ্রহ করিয়া সে হারিসন রোডের দিকে প্রস্থান করিল।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে ডাক্তার দাস নগেনকে দেখিতে আসিলেন। উপরে উঠিয়া তিনি মেসের কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। প্রত্যেক কক্ষে অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু জনমানবের সাক্ষাৎ পাইলেন না; তখন তাঁহার মনে হইল, বাড়ীতে বসন্তরোগের আবির্ভাব দেখিয়া ছেলেরা মেস ছাড়িয়া পলাইয়াছে। কিন্তু বসন্তপীড়িত নগেন্দ্রনাথ কোথায় গেল? তাহাকে হয় ত কোনও আত্মীয়ের আলয়ে বা হাঁসপাতালে পাঠাইয়া থাকিবে।

ডাক্তার দাস ফিরিতেছিলেন, আবার কি মনে হইল—তিনি আবার উপরে উঠিয়া নগেনের ঘরের দিকে চলিলেন।

সেই অন্ধকার কক্ষে, হৃদয়ে তদপেক্ষা অন্ধকার আশঙ্কা সংশয় নিরাশার ভার লইয়া নগেন্দ্রনাথ শয্যার সহিত মিশিয়া পড়িয়া আছে। ডাক্তার বাবু তাহার অবস্থা কল্পনা করিয়া শিহরিয়া উঠিলেন।

নগেন চমকিয়া উঠিল; জিজ্ঞাসিল, "কেও? ঝি?"

ডাক্তার বাবু বলিলেন, "না, আমি ডাক্তার।"

নগেন ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, "তবে ঝিও চলে গেছে—ডাক্তার ম'শায়, আমার কি হবে?"

নগেন বলিল, "কৃষ্ণকমল ভাদুড়ী।"

কৃষ্ণকমল ভাদুড়ীর নাম শুনিয়া ঝি আবার যেন চকিত হইয়া উঠিল। তাহার পর ডাক্তার বাবুকে বলিল, "ডাক্তার বাবু, টাকার জন্য ভাব্‌বেন না, আমার বাবাকে আপনি ভাল করে দিন। এই তাগা আর দানা বিক্রী কল্লে আন্দাজ দু' শ' টাকা হবে,—তাতে কুলোবে না?"

ডাক্তার দাস বলিলেন, "টাকার জন্য ভাবিতেছি না। দুরন্ত রোগ, তুমি স্ত্রীলোক, একা কি করিবে?"

ঝি বলিল, "তাহার জন্য আপনি ভাবিবেন না;—আমি এখান থেকে নড়িব না। ভদ্রলোকের ছেলে কি বিদেশে এই বিপদে একলা থাক্‌বে?"

ডাক্তার বাবু বলিলেন, "হাঁসপাতালে পাঠাইলে সব দিকে সুবিধা হইত।"

হাঁসপাতালের নামে নগেন শিহরিয়া উঠিল। ঝি দৃঢ়স্বরে বলিল, "তাহা হইবে না; আমি কিছুতেই বাছাকে হাঁসপাতালে পাঠাইতে দিব না। আপনি না দেখেন, আমি অন্য ডাক্তার ডাকিয়া আনিব।"

অনেক বাগ্‌বিতণ্ডার পর স্থির হইল, নগেন মেসেই থাকিবে। ডাক্তার বাবুর বাড়ী হইতে তাহার পথ্য আসিবে, আর ঝি তাহার পরিচর্য্যা করিবে।

৭

ডাক্তার বাবু নগেনের পিতাকে টেলিগ্রাফ করিয়া দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে চিঠিও লিখিলেন।

দিনের পর দিন গেল। সপ্তাহ অতীত হইল। ক্রমে পক্ষ পূর্ণ হইল। কিন্তু নগেনের পিতা আসিলেন না। একখানা চিঠিও পাওয়া গেল না। ডাক্তার বাবু বিস্মিত হইলেন, কিন্তু ঝি বিশেষ বিস্ময় প্রকাশ করিল না। সে ক্রমাগত সেই পোড়ার মুখো বুড়োকে গালি দিতে লাগিল।

ঝির নিদ্রা দূরে থাক্‌, তন্দ্রাও ছিল না। রাত্রিদিন রোগীর শিয়রে বসিয়া নগেনের সুশ্রূষা করিতে লাগিল। অনবরত ব্যজন করিয়াও তাহার হস্ত অবসন্ন হইত না; বসিয়া বসিয়া তাহার ক্লান্তি জন্মিত না। বসন্তের পূয রক্ত স্বয়ং অতিসন্তর্পণে পরিষ্কার করিত, তাহাতে তাহার ঘৃণা ছিল না। বোধ করি, মাও পেটের ছেলের জন্য এতটা করিতে পারিতেন না।

ডাক্তার বাবু নিরক্ষর দাসীর এই অপূর্ব্ব পরার্থপরতা দেখিয়া প্রথমে বিস্মিত হইয়াছিলেন, শেষে মুগ্ধ হইলেন। তিনি মনে মনে চিন্তা করিতেন, এ মানবী না দেবী?

এইরূপে প্রায় তিন সপ্তাহ অতিবাহিত হইল। যমের সহিত যুদ্ধ করিয়া ডাক্তার বাবু নগেনকে কাড়িয়া লইলেন। ঝি যখন শুনিল যে, নগেন নিরাপদ হইয়াছে, তখন আর তাহার আনন্দের সীমা রহিল না। সে ডাক্তার বাবুর পদতলে পড়িয়া চক্ষের জলে তাঁহার পাদুকা ধৌত করিয়া দিল।

৮

নগেন ডাক্তারবাবুকে বলিয়াছিল,তাহাদের গ্রামেই পোষ্ট-আফিস আছে। তিনি তদনুসারে সেই ঠিকানায় নগেনের পিতাকে সংবাদ দিয়াছিলেন। টেলিগ্রাফ আফিস বহু দূরে,—সেখান হইতে পিয়ন আসিয়া টেলিগ্রাফ বিলি করিয়া যায়। যখন টেলিগ্রাফ আসে, নগেনের পিতা তখন গ্রামান্তরে ছিলেন। পিয়ন আসিয়া টেলিগ্রাফখানি কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্যের চাকরের হাতে দিয়া গেল। চাকর সেখানি চালের বাতায় গুঁজিয়া রাখিয়া পুনরায় গরুর সেবায় প্রবৃত্ত হইল। তাহার পর আর তাহার খেয়াল হইল না।

চিঠিখানি যথাসময়ে ভট্টাচার্য্যের বাড়ীতে পঁহুছিল বটে, কিন্তু সেখানিও গৃহিণীর হাতে পড়িয়া টেলিগ্রাফের দশা প্রাপ্ত হইল। প্রভেদের মধ্যে, টেলিগ্রাফখানি চণ্ডীমণ্ডপের, আর চিঠিখানি রান্নাঘরের চালের বাতায় বিরাজ করিতে লাগিল।

আট দশ দিন পরে কৃষ্ণকমল ভাদুড়ী বাড়ী ফিরিলেন। তাহার দুই দিন পরে ভট্টাচার্য্যের জামাতার একখানি পত্র আসিল। কর্ত্তা সেই পত্রহস্তে গৃহিণীকে কন্যার সংবাদ দিতে অন্দরে প্রবেশ করিলেন। কর্ত্তার করতলস্থ পত্র দেখিয়া গৃহিণীর মনে পড়িল, আর একখানা চিঠি চালের বাতায় গোঁজা আছে। তখন সেই ধূমধূসরিত পত্রখানি বাহির করিয়া তিনি কর্ত্তার হাতে দিলেন। কর্ত্তা চিঠিখানি খুলিয়া পড়িতে পড়িতে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন।

৯

যে দিন কৃষ্ণকমল ভাদুড়ী কলিকাতায় পঁহুছিলেন, তাহার পূর্ব্ব দিন ঝি প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হইয়াছিল। ডাক্তার বাবু বুঝিলেন, বসন্তরোগীর সেবা করিয়া ঝি বসন্তের বিষে আক্রান্ত হইয়াছে। পর দিন ডাক্তার বাবুর সংশয় সত্যে পরিণত হইল।

নগেন তখনও শয্যাগত। বৃদ্ধ পিতা প্রাণপণে তাহার সুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। সে তবু বারবার প্রশ্ন করিতে লাগিল—"ঝি কোথায় ?"

বৃদ্ধের পক্ষে ঝির সেবা সুশ্রূষা সম্ভব নহে। তিনি নিজের রুগ্ন পুত্র লইয়াই বিব্রত। বিশেষতঃ, দেশে নগেনের মা দুশ্চিন্তায় মৃতপ্রায় হইয়া আছেন। নগেন আর একটু সারিয়া উঠিলে কর্ত্তা তাহাকে লইয়া দেশে ফিরিবেন। নগেন জানিত, ঝির জ্বর হইয়াছে। সে মধ্যে মধ্যে ঝিকে দেখিবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইত। বৃদ্ধ তাহাকে বিবিধ স্তোকবাক্যে নিরস্ত করিতেন।

ঝিকে লইয়া বৃদ্ধ বিষম সমস্যায় পড়িলেন। ঝির প্রাণপণ যত্নেই পুত্র প্রাণ পাইয়াছে, তাহা তাঁহার অবিদিত ছিল না। এ অবস্থায় তাহাকে হাঁস-পাতালে পাঠাইতে তিনি স্বভাবতঃ একটু কুণ্ঠিত হইলেন। কিন্তু নিজেও বসন্তের মত সংক্রামক রোগের সংস্পর্শে যাইতে পারেন না। আর, তাঁহার পক্ষে কলিকাতায় থাকাও সম্ভবপর নহে। দুই বেলা হাত পোড়াইয়া রাঁধিয়া খাইতে হয়, রুগ্ন পুত্রের পথ্য যোগাইতেই প্রাণান্ত, কি করিয়াই বা কলি কাতায় থাকেন। সুবিধা ও সুপ্রবৃত্তি, উভয়ের সংগ্রামে, শেষে সুবিধারই জয় হইল। বৃদ্ধ ঝিকে হাঁসপাতালে পাঠাইয়া দিলেন। মনে মনে স্থির করিলেন, যদি বাঁচে, তাহাকে আর দাসীবৃত্তি করিতে দিবেন না।

১০

ডাক্তার বাবু বলিলেন, "এখন আপনি নগেনকে দেশে লইয়া যাইতে পারেন।"

নগেন শুনিয়া বলিল, "ঝি কই?"

তখন নগেনকে সব কথা খুলিয়া বলিতে হইল।

শুনিয়া নগেন অনেকক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া রহিল; তাহার পর কিয়ৎক্ষণ বৃদ্ধ পিতার মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। সে কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু বলিতে পারিল না;—কেবল তাহার শীর্ণ, জীর্ণ, বসন্তদীর্ণ গণ্ডদ্বয় বহিয়া জলধারা বহিতে লাগিল।

নগেন বলিল, "ঝিকে না দেখিয়া আমি কখনও বাড়ী যাইব না।"

পুত্রের বাক্যহীন তিরস্কারে বৃদ্ধ অত্যন্ত মর্ম্মাহত, সঙ্কুচিত, লজ্জিত হইয়াছিলেন। আপনার নিকট আপনাকে অপরাধী মনে করিতেছিলেন। বার্দ্ধক্য আপনার গণ্ডা বেশী মাত্রায় বুঝিয়া লয় বটে, কিন্তু সরল নিঃস্বার্থ ভাবের নিকট সেও সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে।

দুর্ব্বল রুগ্ন পুত্রকে সংক্রামক রোগের বীজে পূর্ণ হাঁসপাতালে লইয়া যাইতে

বৃদ্ধের আদৌ ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু নগেন কিছুতেই নিরস্ত হইল না। অগত্যা বৃদ্ধ তাহাকে লইয়া হাঁসপাতালের দিকে যাত্রা করিলেন।

১১

অনেক কষ্টে কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতি লইয়া বৃদ্ধ ও নগেন বসন্তরোগীর ওয়ার্ডে প্রবেশ করিলেন।

ঝির আর বাঁচিবার আশা ছিল না। তাহার দেহ অবসন্ন, জীবনীশক্তিশূন্য হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু তখনও তাহার জ্ঞান একবারে বিলুপ্ত হয় নাই।

নগেন তাহার শয্যাপার্শে দাঁড়াইয়া রুগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "ঝি! কেমন আছ?"

ঝি চোখ তুলিয়া চাহিল; তাহার মরণছায়ামলিন মুখে অপূর্ব্ব আনন্দ-ভাতি প্রতিভাসিত হইয়া উঠিল। সে ধীরে ধীরে বলিল, "তুমি এখানে কেন, তুমি যাও, —একবার তোমাকে যমের মুখ হইতে টানিয়া আনিয়াছি—"

নগেন কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "তুমি আমার প্রাণ দিয়াছ, আমার রোগ আপনি লইয়াছ;—আমার জন্যই—"

ঝি নগেনের কথা সমাপ্ত হইতে দিল না। তাহার কোটরগত চক্ষে অপূর্ব্ব জ্যোতি, রোগশীর্ণ মুখে স্বর্গীয় দীপ্তি;—সে নগেনকে বলিল, "তুমি চিরজীবী হও বাবা;—আমার মরিবার বয়স হইয়াছে,—মরিতে দুঃখ নাই। অসময়ে ভগবান যে আমাকে তোমার সেবা করিতে দিয়াছেন, সেই আমার ভাগ্য।—তোমার বাবাকে বলো—"

নগেন বলিল, "বাবাও তোমাকে দেখিতে আসিয়াছেন। বাবা!"

বৃদ্ধ কৃষ্ণকমল ভাদুড়ী কুণ্ঠিতভাবে সন্নিহিত হইলেন। তাঁহার মনে তখন অনুশোচনার উদয় হইতেছিল। হয় ত অযত্নে এই দয়াবতী নারীর প্রাণ গেল;—হয় ত গৃহে রাখিয়া চিকিৎসা করাইলে তিনি পুত্রের প্রাণদাত্রীর প্রাণ-রক্ষা করিতে পারিতেন। অপরাধীর মত জড়িতকণ্ঠে বলিলেন, "আমি এ জীবনে তোমার ধার শুধিতে পারিব না।—তোমার কোন্ দেশে বাড়ী, সেখানে তোমার কে আছে বল,—কাহাকে দেখিতে চাও—বল, আমি তোমার কোনও ইচ্ছা অপূর্ণ রাখিব না।"

ঝি একবার চাহিয়া দেখিল, তাহার পর অতিকষ্টে ক্ষতপূর্ণ করদ্বয়ে অঞ্জলি রচনা করিয়া বৃদ্ধকে প্রণাম করিল; তাহার পর ধীরে ধীরে বলিল, "ঠাকুর, আমাকে চিনিতে পারেন কি?"

বৃদ্ধ তীক্ষ্নদৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিলেন, কিন্তু সেই ব্রণ-ক্ষত মুখ তাঁহার পরিচিত বলিয়া বোধ হইল না। মনে কৌতূহল না উদ্বেগ, কোন্‌টার প্রবাহ অধিক, তাহাও তিনি বুঝিতে পারিলেন না। বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "না।"

ঝি বলিল, "আমার নাম বামা। আজ কুড়ি বৎসর হইল, আপনি আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছিলেন। বিধবার সর্ব্বনাশ করিয়াও আপনার তৃপ্তি হয় নাই, তাই আমার বুক-চেরা ধন আপনি নষ্ট করিয়াছিলেন, সে কথা মনে পড়ে কি?"

বৃদ্ধ নীরবে ভূতলে দৃষ্টি সন্নদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। যেন ভূতলে তিনি অতীত-কাহিনী চিত্রিত দেখিতেছিলেন।

ঝি একটু চেষ্টা করিয়া আবার বলিল "আপনার মান বাঁচাইবার জন্য দুঃখিনীর ছেলে নষ্ট করিয়া আপনি আমাকে দেশছাড়া করিয়াছিলেন। আজ আমি আপনার ছেলে আপনার কোলে দিয়া চলিলাম! আমাকে দুটি পায়ের ধূলো দিন।"

স্তম্ভিত বজ্রাহত পুত্র ও চিত্রার্পিতবৎ নিশ্চল নির্ব্বাক নিঃস্পন্দ পিতার সম্মুখে বামার পার্থিব যাতনার অবসান হইল।

নূতন যুদ্ধাস্ত্র।

আজকাল আমেরিকা প্রভৃতি বিজ্ঞানপ্রধান দেশে, সুদক্ষ যন্ত্রশিল্পিগণের কৌশলে, যেরূপ সুখসচ্ছন্দতা ও বিলাসভোগের উপযোগী বিবিধ যন্ত্রাদি উদ্ভাবিত হইতেছে, সেইরূপ আবার সেই যন্ত্রবিদ্‌গণের শিল্পচাতুর্য্যে নর-শোণিতপাত ও লোকক্ষয়ের সহস্র উপায়ও আবিষ্কৃত হইতেছে। আধুনিক নৌযুদ্ধের প্রধান অবলম্বন টর্‌পিডো তরীর কথা, বোধ করি, কাহারও অবিদিত নাই। শত্রুপোতনিমজ্জনে টর্‌পিডোর উপযোগিতা ও ইহার অদ্ভুত শক্তি বাস্তবিকই বিস্ময়কর। উদ্ভাবনকাল হইতে এ পর্য্যন্ত কত সহস্র মানব যে ইহা দ্বারা সমুদ্রগর্ভে সমাহিত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা অসম্ভব। কয়েক বৎসর হইল, হার্ভি নামক জনৈক বিজ্ঞানবিদ্‌, যুদ্ধজাহাজের বহির্ভাগ একপ্রকার ধাতব আবরণ (Harveyibed plates) দ্বারা মণ্ডিত করিবার প্রথা

প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। এই ধাতব আবরণ এত দৃঢ় যে, প্রভূত শক্তিশালী গোলা এই আবরণ ভেদ করিয়া জাহাজের অনিষ্টসাধন করিতে পারে না। আধুনিক যুদ্ধপোতমাত্রই হার্ভির আবরণে মণ্ডিত থাকে, এই জন্য গত কয়েক-বৎসর হইতে টর্‌পিডো ও মাক্সিম কামানের অতিবেগশালী গোলার অনিষ্ট-কারিতা কতকটা প্রশমিত হইয়াছে। সম্প্রতি কয়েকখানি মার্কিন বৈজ্ঞানিক পত্রে একপ্রকার অতীবশক্তিশালী যুদ্ধগোলকের উদ্ভাবন-সমাচার প্রচারিত হইয়াছে। এই ভয়ঙ্কর গোলা হার্ভি-প্রবর্ত্তিত স্থূল ও কঠিন আবরণ ভেদ করিয়া অনায়াসে জাহাজের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে। অনেকেই বলিতে-ছেন, এই উদ্ভাবন দ্বারা আধুনিক নৌযুদ্ধপদ্ধতির প্রবল ব্যতিক্রম ও তুমুল বিপ্লব ঘটিবার বিশেষ সম্ভাবনা।

এই নবাবিষ্কৃত সামরিকযন্ত্রের আকার ও কার্য্য কতকটা সাধারণ অস্ত্রপূর্ণ গোলকের (Shell) ন্যায় ; কেবল ইহার গঠনকৌশলে নূতনত্ব দৃষ্ট হয় ; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, নির্ম্মাণব্যাপারে জটিলতা বা সূক্ষ্ম শিল্পনৈপুণ্যের অণু-মাত্র পরিচয় নাই। ইহাতে সাধারণ গোলা একপ্রকার কোমল ধাতুর স্থূল আবরণে আচ্ছাদিত থাকে ; এই আবরণ দ্বারা দুইটি কার্য্য সাধিত হয়। প্রথমতঃ, কোন বাধা প্রাপ্ত হইলে সাধারণ গোলকের ন্যায় এই গোলা হঠাৎ বিদীর্ণ হইতে পারে না ;—বরং বাধা ভিন্ন করিয়া যতক্ষণ লক্ষ্যস্থলে উপস্থিত না হয়, ততক্ষণ উক্ত ধাতুময় আবরণ দ্বারা গোলা সকল অক্ষতাবস্থায় রক্ষিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, এই শ্রেণীর সূক্ষ্মাগ্র গোলক (Projectiles) কোনও কঠিন বাধা প্রাপ্ত হইলেই, উক্ত ধাতব আচ্ছাদনের কিয়দংশ সংঘাতজাত তাপে দ্রবী-ভূত হইয়া যায়, এবং এই ধাতু দ্বারা গোলকের প্রবেশপথনির্ম্মাণকার্য্য অনেকটা সহজ হইয়া পড়ে। যে প্রথায় এই গোলকগুলি অনায়াসেই দৃঢ় ও স্থূল বাধার অতিক্রম করিতে পারে, তাহার অনুরূপ অনেক সহজ উদাহরণ আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই। সূচ্যগ্র দ্বারা কোন ধাতুফলকে ছিদ্র করা বড়ই কঠিন ব্যাপার, এবং অনেক সময়েই তাহা অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু একটি সূচি, একখণ্ড কর্কে প্রবিষ্ট করাইয়া, পরে সূচ্যগ্র কর্কের অপর পার্শ্বে ঈষৎ বহির্গত হইলে, তাহার সাহায্যে যদি ধাতুফলকে ছিদ্র করিবার উদ্যোগ করা যায়, তাহা হইলে চেষ্টা প্রায়ই ব্যর্থ হয় না। সূচ্যগ্রযুক্ত কর্কের সমতল অংশটি ধাতুফলকে সংলগ্ন রাখিয়া, সূচির অপরপ্রান্তে যথেষ্ট আঘাত করিলে, অতিস্থূল ধাতুফলকেও সূচিমুখ প্রবিষ্ট হইতে দেখা যায়। এই সামরিক

গোলক, কর্ক-আচ্ছাদিত সূচির ন্যায়, কোমল ধাতুর আবরণে মণ্ডিত থাকে বলিয়া, ইহার সূক্ষ্ম অগ্রভাগ, অনায়াসেই কঠিন বাধা ছিন্ন করিতে পারে।

অতি অল্পকালে মধ্যে, এই গোলা লইয়া অনেক পরীক্ষাদি হইয়া গিয়াছে। ইহাদের অদ্ভুত বেগ ও কঠিন বাধাতিক্রমণের আশ্চর্য্য ক্ষমতার বিবরণ বাস্তবিকই বিস্ময়কর। সম্প্রতি এক পরীক্ষায় এই গোলা ২২ ইঞ্চি স্থূল কঠিন প্রাচীর ভেদ করিয়া বহির্গত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, প্রাচীরটি ইষ্ট-কাদি সাধারণ উপাদান দ্বারা নির্ম্মিত নহে;—দশ ইঞ্চি স্থূল হার্ভির ধাতুফলক, প্রায় আট ইঞ্চি সারবিশিষ্ট কাষ্ঠ ও অবশিষ্ট চারি ইঞ্চি কঠিন লৌহফলকে এই প্রাচীর রচিত হইয়াছিল। অধিকতর আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, উক্ত কঠিন বাধা ভেদ করাতে, গোলার বিশেষ বলাপচয় দৃষ্ট হয় নাই। দৃঢ় ধাতব প্রাচীর ভেদ করিয়াও গোলকটি বহুদূরবর্ত্তী এক মৃত্তিকাস্তূপে সবলে প্রবিষ্ট হইয়াছিল।

আজকাল বৈজ্ঞানিকপত্রে অনেক আজগুবী আবিষ্কারবার্ত্তা প্রচারিত হইয়া থাকে; পরীক্ষাকালে সেগুলি প্রায়ই অতিরঞ্জিত বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। এই জন্য, এখন অদ্ভুত যন্ত্রের উদ্ভাবন-সমাচার সত্য বলিয়া স্বীকার করিবার পূর্ব্বে বিশেষ সতর্ক হইবার আবশ্যকতা দেখা যাইতেছে। ইতিমধ্যে এই গোলক লইয়া নানা স্থানে বহু পরীক্ষাদি হইয়া গিয়াছে; ইহা দেখিয়া অনেকেই বলিতেছেন, এই নূতন গোলকের শক্তি ও কার্য্যের প্রচারিত বিবরণে অণুমাত্র অতিরঞ্জন নাই, এবং আধুনিক নৌযুদ্ধাদি ব্যাপারে এই গোলকের যে অসাধারণ উপযোগিতা আছে, সে বিষয়ে সন্দিহান হইবারও কোনও কারণ নাই।

অওরঙ্গজেবের ধর্ম্মভাব।

১৬৩৬ খৃষ্টাব্দে আহম্মদনগরের নিজামশাহী সুলতানগণের শাসিত প্রদেশের অধিকাংশ মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। নবাধিকৃত প্রদেশের শাসন-শৃঙ্খলা-বিধানের জন্য সম্রাট্ শাহজাহান স্বীয় তৃতীয় পুত্র কুমার মহম্মদ অওরঙ্গজেব বাহাদুরকে সুভেদার নিযুক্ত করিয়া দাক্ষিণাত্যে প্রেরণ করেন। এই সময়ে অওরঙ্গজেবের বয়স সপ্তদশ বৎসর মাত্র ছিল।

সুভেদারের পদপ্রাপ্তির কয়েক বৎসর পরে অওরঙ্গজেবের মনে গভীর বৈরাগ্যের উদয় হয়। ১৬৪৩ সালের জুন মাসে, চতুর্ব্বিংশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে, তিনি রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া ফকীরবেশে সহ্যাদ্রির কোনও নির্জ্জন প্রদেশে ঈশ্বরের ধ্যানধারণায় ও সাধুসহবাসে কালাতিপাত করিতে প্রবৃত্ত হন।

অওরঙ্গজেব বাল্যকালে অতি সামান্য শিক্ষা পাইয়াছিলেন। রাজকুমারোচিত উচ্চশিক্ষা বা নানা শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তিলাভের সুযোগ তাঁহার ভাগ্যে ঘটে নাই। তাঁহার সমস্ত শিক্ষা কোরাণ-অধ্যয়ন ও আরব্য ভাষার অভ্যাসে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। বাল্যকালে উপযুক্ত শিক্ষা ও জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হন নাই বলিয়া সময়ে সময়ে তাঁহার এরূপ অনুতাপ হইত যে, সাম্রাজ্যলাভের পর তিনি একদা তাঁহার শিক্ষককে এ জন্য কঠোর তিরস্কার পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন। যাহা হউক, শৈশবের ধর্ম্মশিক্ষাগুণে অল্পবয়সেই তিনি মুসলমান-ধর্ম্মানুমোদিত কঠোর সংযম অভ্যাস করিয়াছিলেন। কোরাণ-বর্ণিত উপদেশের আদর্শে ব্রতোপবাসাদির অনুষ্ঠান দ্বারা ধর্ম্মজীবনযাপনের আকাঙ্ক্ষা তরুণ বয়সেই তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়াছিল। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত বৈরাগ্য তাঁহার চরিত্রে অস্বাভাবিক বলিয়া আমাদের মনে হয় না। ইতিহাসে ইহাই কুমার অওরঙ্গজেবের প্রথম কার্য্য।

পুত্রের এইরূপ বুদ্ধিবিপর্য্যয় দেখিয়া রুষ্ট হইয়া দিল্লীশ্বর শাহজাহান তাঁহাকে পদচ্যুত এবং তাঁহার বৃত্তি ও যাবতীয় ধনসম্পত্তি হরণ করেন। এক বৎসর কাল অরণ্যবাসের পর রাজকুমার কষ্টসাধ্য সন্ন্যাসধর্ম্মে বীতরাগ হইয়া পুনরায় সাংসারিক ব্যাপারে মনোনিবেশ করিলেন। ইহার পর তিনি বিবিধ কার্য্যে দক্ষতা প্রদর্শন ও কান্দাহারাদির যুদ্ধে (১৬৪৭—১৬৫২ খৃঃ) অসীম শৌর্য্য সাহসের পরিচয় প্রদান করিয়া পিতার অনুগ্রহভাজন ও পুনর্ব্বার দাক্ষিণাত্যের শাসনভার প্রাপ্ত হইলেন। মালিক আম্বেরের প্রতিষ্ঠিত "খড়কী" (Khirki) নগরে তিনি স্বীয় রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহারই নামানুসারে ঐ নগর অওরঙ্গাবাদ নামে প্রথিত হয়।

অওরঙ্গজেব অতিশয় সাহসী, কার্য্যদক্ষ ও প্রতিভাসম্পন্ন পুরুষ ছিলেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহার প্রতিভা মহামতি আকবরের প্রদর্শিত পথ পরিত্যাগ করিয়া মোগল সাম্রাজ্যের ধ্বংস-সাধিনী হইয়াছিল। তাঁহার চরিত্রে অন্যান্য রাজকীয় গুণেরও অভাব ছিল না। ঐকান্তিক স্বধর্ম্মপ্রীতি, দুর্দ্দমনীয় উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও নিরবচ্ছিন্ন কুটিলতা তাঁহার চরিত্রের দোষ গুণরূপে

পরিগণিত। এই সকল গুণ তাঁহাকে যেমন উন্নতির সর্ব্বোচ্চ শিখরে উন্নীত করিয়াছিল, সেইরূপ আবার উহারা তাঁহার বিনাশের ও সমগ্র সাম্রাজ্যের অধঃপতনের এক প্রধান কারণস্বরূপ হইয়াছিল।

তাঁহার বাল্যজীবন ধর্ম্মালোচনায় ও কোরাণানুশাসিত বৈরাগ্যের অনুকরণ-চিন্তায় অতিবাহিত হওয়ায়, তাঁহার অন্তর্নিহিত উচ্চাভিলাষের বীজ বহুদিন অঙ্কুরিত হইবার অবসর প্রাপ্ত হয় নাই। দাক্ষিণাত্যে প্রথম সুভেদারী কালে তিনি নামে শাসনকর্ত্তা ছিলেন। কার্য্যতঃ শাহজাহানের বিজ্ঞ কর্ম্ম-চারিগণই সমস্ত রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। এই কারণে, তথনও অওরঙ্গ-জেবের দৃষ্টি পার্থিব বিষয়ে আকৃষ্ট না হইয়া আদর্শ বীরত্বপ্রাপ্তির মোহেই মুগ্ধ ছিল। পরিশেষে ১৬৪৩ খ্রীষ্টাব্দের অরণ্যবাসের ফলে যোগিত্বপ্রাপ্তির দুঃসাধ্যতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া রাজকুমার সে বাসনা পরিত্যাগ করিলেন, এবং পিতার তুষ্টিসাধনের জন্য সংসারধর্ম্মে মনোযোগী হইলেন। এই ঘটনার পর প্রায় দ্বাদশবর্ষকাল গুজরাট ও কান্দাহার প্রদেশে স্বাধীনভাবে শাসন-দণ্ড পরিচালনা ও কিছু কাল দিল্লীতে অবস্থানের পর তিনি একত্রিশ বৎসর বয়ঃ-ক্রম কালে দাক্ষিণাত্যের প্রকৃত সুভেদাররূপে অওরঙ্গবাদে প্রেরিত হইলেন।

পিতার তিরস্কারে, স্বাধীন শাসনক্ষমতালাভে, যুদ্ধবিগ্রহে ও দিল্লীর ঐশ্বর্য্যদর্শনে তাঁহার বৈরাগ্য প্রশমিত হয়, এবং ক্ষমতাপ্রিয়তা ও বিজয়বাসনা ক্রমশঃ তাঁহার হৃদয়ে জাগরূক হইয়া উঠে। বিজাপুর ও গোলকোণ্ডার সুলতানগণ মোগল সম্রাটের প্রাধান্য স্বীকার করিতেন বলিয়া তাঁহাদিগের উপরও অওরঙ্গজেবের কথঞ্চিৎ প্রভুত্ব ছিল। সুতরাং দাক্ষিণাত্যের ন্যায় অর্দ্ধ-ভারতব্যাপী বিশাল প্রদেশের প্রভুত্বও যে তাঁহার উচ্চাকাঙ্ক্ষা উদ্দীপনের বিশেষ সহায়ক হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়। কান্দাহারের কঠোর যুদ্ধব্যাপারে তাঁহার হৃদয়ে উচ্চাভিলাষ ও জয়ৈষার যে স্ফুলিঙ্গসঞ্চার হইয়াছিল, তাহা দাক্ষিণাত্যে গোলকোণ্ডার বহুমূল্য হীরকখনিসমূহ ও বিজাপুরের অধীন অমিতধনধান্যপূর্ণ বিশাল প্রদেশদর্শনে প্রদীপ্ত অগ্নিশিখায় পরিণত হইল।

অওরঙ্গজেব স্বয়ং সুন্নী-সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমান ছিলেন বলিয়া দাক্ষিণাত্যের শিয়া-সম্প্রদায়স্থ সুলতানগণের ক্ষমতাহরণে তাঁহার সমধিক আগ্রহ জন্মিয়া-ছিল। স্বকীয় শৌর্য্যসাহস ও বুদ্ধিমত্তার প্রতি অতিরিক্ত বিশ্বাস থাকায় তাঁহার মনে এইরূপ এক ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছিল যে, পৃথিবীর কোনও মহৎ-কার্য্যসাধনের জন্যই তাঁহার জন্ম হইয়াছে। এই সকল কারণে ও বাল্যকালে

জ্ঞানমূলক শিক্ষার অভাবে তাঁহার দুরাকাঙ্ক্ষা অধিকতর দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিয়াছিল।

অওরঙ্গজেবের দুরাকাঙ্ক্ষা-স্রোতে ক্রমে তাঁহার বাল্যজীবনের ধর্ম্মভাব ও বৈরাগ্য ভাসিয়া গিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাতে তাঁহার শাস্ত্রোপদিষ্ট ক্রিয়া-কলাপের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধার কিছুমাত্র হ্রাস হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। ধর্ম্মের বাহ্য অঙ্গস্বরূপ কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠানে—কোরাণোল্লিখিত কৃচ্ছ্রসাধ্য ব্রতনিয়মাদির আচরণে তাঁহার আজীবন আন্তরিক অনুরাগ পরিলক্ষিত হয়। দুঃখের বিষয়, ধর্ম্মের রাজসিক অঙ্গগুলি তাঁহার হৃদয়কে যেরূপ অধিকার করিয়াছিল, উহার সাত্বিক ভাবগুলি তাঁহার উপর সেরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। সত্যনিষ্ঠা, দয়া, সারল্য, প্রীতি, সমদর্শিতা প্রভৃতি সাত্বিক বৃত্তিনিচয়ের অনুশীলনে তাঁহাকে প্রায় কখনও সম্যক্ যত্নপরায়ণ দেখা যায় নাই। বরং কুটিলতা তাঁহার সহজাত বৃত্তির স্বরূপ ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। নিষ্কাম স্বধর্ম্ম প্রীতির ন্যায় উহা তাঁহার অধিকাংশ কার্য্য নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল। কথিত আছে, তরুণবয়সে ধর্ম্মচর্চ্চায় জীবনযাপনকালেও তিনি, (বোধ হয় স্বাভাবিক প্রবৃত্তিবশেই) কুটিল ব্যবহারের লোভ সংবরণ করিতে পারেন নাই। (১) দুরাকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তির জন্য ক্রমশঃ তাঁহাকে কুটিল-নীতির একান্ত পক্ষপাতী হইতে হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার কঠোর সংযমগুণে ও শৈশবের ধর্ম্মানুরাগফলে বহুদিন পর্য্যন্ত সাধারণে তাঁহার নবোদ্দীপিত উচ্চাকাঙ্ক্ষার ও কুটিলতার সম্যক পরিচয় প্রাপ্ত হয় নাই। এই কারণে তাঁহার সিংহাসনলাভের পথ অপেক্ষাকৃত সুগম হইয়াছিল।

---

(১) কথিত আছে, অওরঙ্গজেব সহ্যাদ্রির নির্জ্জন প্রদেশে বাসকালে একদা বহুসংখ্যক ফকীরকে ভোজনার্থ নিমন্ত্রণ করেন। ভোজনান্তে তিনি ফকীরদিগকে জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগ পূর্ব্বক নববসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। ফকীরদিগের ভিক্ষাসঞ্চিত অর্থ জীর্ণবস্ত্রমধ্যে লুক্কায়িত ছিল বলিয়া তাহারা এ প্রস্তাবে সম্মত হইতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। রাজকুমার তাহাদের ভণ্ডামির প্রতিফলদানের জন্য বলপূর্ব্বক তাহাদিগকে বস্ত্রত্যাগ করাইয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিয়া দিলেন। বস্ত্রগুলি ভস্মাবশিষ্ট হইলে তাহার মধ্যে গলিত সুবর্ণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভণ্ডামি-প্রকাশের ভয়ে ফকিরেরা সেই সুবর্ণপ্রার্থী হইতে পারেন নাই। তাহারা শেষ পর্য্যন্ত সেস্থানে উপস্থিত থাকিতে পারিয়াছিল কি না, সে বিষয়েও সন্দেহ। সুতরাং রাজকুমার ঐ অর্থের গ্রহণ করিলেন। ফকীরদিগকে দণ্ডিত করিবার এ নবাবিষ্কৃত পথ নিশ্চয়ই সরলতার অনুমোদিত নহে।

অওরঙ্গজেবের কুটিলতা সর্ব্বজনবিদিত। তাঁহার ক্রূরতাও নিতান্ত অল্প ছিল না। কিন্তু ডাক্তার হণ্টার প্রমুখ ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ তাঁহার এ দোষ স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, অওরঙ্গজেব অতিশয় দয়ালু ও ন্যায়-পরায়ণ ছিলেন! রাজ্যলাভের জন্য তিনি যে ভ্রাতৃহত্যা করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার পক্ষে অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছিল। মোগলদিগের সেকালের রীতি অনুসারে রাজ্যের একাধিক উত্তরাধিকারী বা অংশভাগী থাকিলে, তাঁহাদিগকে নিহত করিয়া সিংহাসন নিষ্কণ্টক করিবার চেষ্টা সকল নরপতিকেই করিতে হইত। সুতরাং অওরঙ্গজেব সন্ন্যাসী হইয়া গিরিগুহায় বাস করিলেও তাঁহার নিষ্কৃতি ঘটিত কি না সন্দেহ। তাঁহাকে তাঁহার সিংহাসনাধিরূঢ় ভ্রাতার হস্তে হয় ত নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিতে হইত। তদ্ভিন্ন দারা ও সুজা স্বধর্ম্মে নিষ্ঠাহীন ছিলেন বলিয়াও স্বধর্ম্মনিষ্ঠ অওরঙ্গজেব তাঁহাদিগের সাম্রাজ্য-প্রাপ্তি-বিষয়ে বাধা দেওয়া আবশ্যক মনে করিয়াছিলেন। এই সকল যুক্তি দেখাইয়া ডাঃ হণ্টার বলেন, আত্মরক্ষার্থ ও ধর্ম্মরক্ষার্থ ভ্রাতৃহত্যা করিতে বাধ্য হইয়া অওরঙ্গজেব অন্যায় করেন নাই। তিনি প্রকৃতপক্ষে ক্রূর ছিলেন না।

হণ্টার প্রভৃতি ঐতিহাসিক উকীলগণের এ সকল যুক্তি আমাদিগের মতে সারগর্ভ বলিয়া বোধ হয় না। আত্মরক্ষার্থ ভ্রাতৃহত্যা করা অওরঙ্গজেবের পক্ষে আবশ্যক হইয়াছিল, এ কথা স্বীকার করিলেও তাঁহার ক্রূরতায় সন্দিহান হইবার কোনও কারণ আমরা দেখিতে পাই না। তাঁহার সুদীর্ঘ রাজ্যকালের মধ্যে তিনি একটিও ক্রূরতার কার্য্য করেন নাই, এ কথা কীন, এল্‌ফিনষ্টোন, বা হণ্টার সহস্রবার বলিলেও, আমরা তাহা বিশ্বাস করিতে পারিব না। তুলাপুরে শিবাজীর পুত্র শাম্ভাজীকে তিনি যেরূপ নিষ্ঠুরভাবে নিহত করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার দয়ার লেশমাত্র দেখিতে পাওয়া যায় না। জিজিয়া-করের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হওয়ায় হিন্দুগণ আবেদন লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে, তিনি তাঁহার করুণাপ্রার্থী প্রজাদিগের উপর হাতী চালাইবার আদেশ করিয়া শত শত নিরপরাধ ব্যক্তির প্রাণসংহার করিয়াছিলেন। ইহা কিরূপ দয়ালুতার নিদর্শন, তাহা হণ্টার প্রমুখ ঐতিহাসিকগণই বলিতে পারেন। যশোবন্ত সিংহের পুত্র পৃথুসিংহকে বিষাক্ত পরিচ্ছদ ও বিজাপুরের নবীন সুলতান সেকন্দরের ভক্ষণার্থ বিষগর্ভ তরমুজ প্রদান করিয়া তাঁহাদিগের বিনাশসাধনও তাঁহার সামান্য ক্রূরতার পরিচায়ক নহে।

তার পর ভ্রাতৃহত্যার কথা। দারা ও সুজা স্বধর্ম্মভ্রষ্ট ছিলেন বলিয়া

অওরঙ্গজেব তাঁহাদিগকে মোগল সাম্রাজ্যশাসনের অনুপযুক্ত বিবেচনা করিয়াছিলেন, এ কথা সত্য হইতে পারে। কিন্তু মুরাদের সম্বন্ধে সেরূপ কোনও কথা বলা যায় না। স্বধর্ম্মে তাঁহার শ্রদ্ধা অল্প ছিল, এ কথা বোধ হয় কেহই বলিতে পারিবেন না। বরং তাঁহাকে ধর্ম্মে শ্রদ্ধালু ও সরলপ্রকৃতি বলিয়াই বর্ণিত দেখিতে পাই। সুতরাং অওরঙ্গজেব যদি তাঁহাকে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া স্বয়ং সন্ন্যাস অবলম্বন করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় তাঁহার কোনও অনিষ্ট হইত না। মুরাদের সারল্যে ও সহৃদয়তায় বিশ্বাস স্থাপন অযৌক্তিক বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকিলে, তিনি বৃদ্ধ পিতা শাহজাহানের ন্যায় মুরাদকেও আজীবন বন্দী করিয়া রাখিতে পারিতেন। কিন্তু তাহা না করিয়া তিনি যেরূপ কৌশলে তাঁহাকে মিথ্যা হত্যাপরাধে অভিযুক্ত ও পরিশেষে ন্যায়পরায়ণতার ভাণ করিয়া তাঁহার প্রাণনাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার ক্রূরতা ও নীচতা সম্বন্ধে লেশমাত্র সংশয় থাকে না। তাঁহার সাম্রাজ্যলাভব্যাপারে আমরা হণ্টর প্রভৃতির কথিত ন্যায়পরতা, দয়ালুতা ও সাত্ত্বিকভাবের কোনও পরিচয় দেখিতে পাই না।

অওরঙ্গজেবের উচ্চাকাঙ্ক্ষাই তাঁহাকে সমধিক তমোভাবাপন্ন করিয়াছিল। এই কারণে তাঁহার স্বধর্ম্মনিষ্ঠা সম্বন্ধে অনেকের সন্দেহ জন্মে। মোসলমান শাস্ত্রানুমোদিত ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠানে তিনি আজীবন যে আস্থা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাও অনেকের মতে তাঁহার কপটতা হইতে উদ্ভূত। এ কথা কত দূর সঙ্গত, তাহার বিচার করা উচিত।

বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক ধর্ম্মনীতির সহিত রাজনীতির বিরোধ চিরপ্রসিদ্ধ। আদি কবি মহর্ষি বাল্মীকি বানররাজ বালীর বধে আর্য্যকুলতিলক ভগবান রামচন্দ্রের পক্ষে যে সকল রাজনীতিক যুক্তির প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা কেহই বিশুদ্ধ সত্ত্বনীতির অনুমোদিত বলিয়া মনে করিতে পারেন না। আর এই সভ্যতাভিমানী উনবিংশ শতাব্দীর খৃষ্টনীতি-সমুদ্ভাসিত ইউরোপে রাজপুরুষগণ যে নীতির অনুসরণ করিয়া থাকেন, তাহাও মৌর্য্যবংশের স্থাপনাকালে কৌটিল্য-উপাধিপ্রাপ্ত মহারাষ্ট্র-চূড়ামণি চাণক্যের, বা গত শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত নানাফড়ণবীসের অবলম্বিত নীতি অপেক্ষা বিন্দুমাত্র উন্নত, বা সমধিক সত্ত্বভাবাপন্ন নহে। সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালেই রাজনীতির পথ কুটিল ও তমোগুণাশ্রিত দুর্দ্দমনীয় দুরাকাঙ্ক্ষা রাজনীতির পথপ্রদর্শক হইলে, উহা অধিকতর তমঃকলুষিত হইয়া উঠে। অওরঙ্গজেবের চরিত্রে ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়।

কুটিল রাজনীতি বিশুদ্ধ সাত্ত্বিকনীতির বিরুদ্ধ হইলেও, এতদুভয়ের একত্রাবস্থান অসম্ভব নহে। রাজনীতিক্ষেত্রে যাঁহারা কোনও প্রকার ক্রূরতা ও কুটিলতা অবলম্বন করিতে কুণ্ঠিত হন না, তাঁহাদিগকেই অনেক সময় অন্যক্ষেত্রে সরল ও সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। পৌরাণিক কালের মহারাজ দুর্য্যোধন হইতে বর্ত্তমান কালের বঙ্কিমবাবুর বর্ণিত নিষ্ঠাবান সন্ধ্যাহ্নিকাদি শাস্ত্রানুমোদিত ক্রিয়াকর্ম্মে নিরত, পরপীড়নকারী জমিদার পর্য্যন্ত বিবিধ চরিত্রে এইরূপ পরস্পর বিরোধী ভাবের সমাবেশ দেখা যায়। জাতীয় চরিত্রের ইতিহাসেও এইরূপ বৈচিত্র্য দুর্লভ নহে। উদাহরণস্বরূপ মারাঠাচরিত্রের আলোচনাপ্রসঙ্গে সিডনী ওয়েন মহোদয়ের India on the Eve of the British Conquest গ্রন্থে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা এ স্থলে উদ্ধৃত হইল,—

Treachery, too, has always been esteemed among the Marathas legitimate and speaking generally laudable in public affairs, though in private life I have seen them conspicuously faithful and straightforward. How far assassination is considered venial, depended on circumstances. The murder of Afzal khan was highly approved.

অওরঙ্গজেবের চরিত্র অনেকটা এইরূপ ছিল। রাজনীতিক্ষেত্রে তমোভাবাপন্ন হইলেও, ব্যক্তিগত জীবনে তিনি সাত্ত্বিক ছিলেন। অন্তর্নিহিত ধর্ম্মবিশ্বাস ভিন্ন, অওরঙ্গজেবের অপর সকল বৃত্তিই সমগ্রভারতব্যাপী জটিল রাজনীতিক ব্যাপারের সহিত নানা প্রত্যক্ষ ও অদৃশ্য সূত্রে জড়িত ছিল। এই কারণে, তাঁহার ব্যক্তিগত ভাবের সীমা অতীব সংকীর্ণ। সেই সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে—ধর্ম্মনিষ্ঠায় তাঁহার আন্তরিকতার অভাব কখনও পরিদৃষ্ট হয় নাই। স্বধর্ম্মবিষয়ে এই আন্তরিক নিষ্ঠার কারণও ইতঃপূর্ব্বেই আমরা নির্দ্দেশ করিয়াছি।

সহযোগী সাহিত্য।

সাহিত্য।

জাপানী সাহিত্য।

আসিয়াখণ্ডে এখন জাপানই সর্ব্বাপেক্ষা উন্নতিশীল। শিল্প বাণিজ্য বিজ্ঞান ও যুদ্ধবিদ্যায় কোন প্রাচ্য জাতিই জাপানীর সমকক্ষ নহে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যে জাপান

'অসভ্য' বলিয়া সকলের উপেক্ষার বিষয় ছিল, আজ তাহা সভ্যতাকিরণমণ্ডিত হইয়া অনেক প্রতীচ্য দেশ হইতেও উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিয়াছে। পৃথিবীর ইতিহাসে বোধ হয় কোন জাতিই জাপানীদের ন্যায় দ্রুতগতিতে উন্নতিশিখরে আরোহণ করিতে পারে নাই। জাপানের অসম্ভাবিত অভ্যুদয় দেখিয়া সমস্ত সভ্য জগৎ আজি বিস্মিত। বুদ্ধদেবের জন্মভূমি ভারতবর্ষে জাপানীরা তীর্থ করিতে আসিত, এখন ভারতীয় যুবকগণ বিজ্ঞানশিক্ষার নিমিত্ত জাপানে গমন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

কিন্তু জাপানের জাতীয় উন্নতির ইতিহাসের আলোচনা সম্প্রতি আমাদের উদ্দেশ্য নহে। অদ্য আমরা কেবল ডাক্তার জর্জ ব্র্যাণ্ডস্ (Dr. George Brandes) মহোদয়ের একটি প্রবন্ধ অবলম্বন করিয়া জাপানী সাহিত্যের কিঞ্চিৎ বিবরণ 'সাহিত্যে'র পাঠকদিগের জন্য সঙ্কলন করিয়া দিতেছি।

৪০০ খৃষ্টাব্দ হইতে চীন জাপানের উপর সভ্যতার স্থায়িপ্রভাব বিস্তার করিয়া আসিয়াছে। প্রতীচ্য সভ্যতা গ্রীস ও রোমের নিকট যেরূপ ভাবে ঋণী, জাপানী সভ্যতাও চীনের নিকট সেইরূপ ঋণী। য়ুরোপের সহিত পালেষ্টাইনের যে সম্বন্ধ, জাপানের সহিত ভারতবর্ষের সেই সম্বন্ধ। খৃষ্টধর্ম্ম যেমন য়ুরোপের উপধর্ম্মগুলিকে বিতাড়িত করিয়া সেই বিস্তীর্ণ মহাদেশে স্বীয় রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, বৌদ্ধ ধর্ম্মও সেইরূপ ভারতবর্ষ হইতে জাপানে প্রবেশ করিয়া প্রাচীন 'শিন্‌তো' ধর্ম্মের স্থান অধিকার করিয়াছে।

বিদেশের প্রভাব।

জাপানী ভাষার আদিগ্রন্থের নাম 'কোজিকি'; ইহা আমাদের 'পুরাণ' গ্রন্থের স্থানীয়। ইহাতে এক দিকে যেমন শিন্‌তো ধর্ম্মের মূলীভূত অনেক অলৌকিক আখ্যায়িকা সন্নিবিষ্ট আছে, অপর দিকে তেমনি ৬২৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দেশের ইতিহাসও লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ৬৭০ খৃষ্টাব্দে দেশের সর্ব্বত্রই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; ইহার অনতিকালপরেই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ইহাতে ছাত্রগণকে ইতিহাস, গণিত, ব্যবস্থাশাস্ত্র ও চীনসাহিত্য শিক্ষা দান করা হইত। অতএব দেখা যাইতেছে যে, সাধারণ শিক্ষা সম্বন্ধে জাপান য়ুরোপের অনেকটা অগ্রবর্ত্তী ছিল। তদানীন্তনকালের জাপানীগণ চিত্রবিদ্যা ভাস্কর্য্য প্রভৃতিতে বিলক্ষণ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিল। সেই বহুদূরবর্ত্তী সময়ে তাহারা বুদ্ধদেবের জন্য সুরম্য মন্দিরাবলী নির্ম্মিত করিয়াছিল, এবং 'নারা' নামক স্থানে বুদ্ধদেবের বিরাট ধাতব মূর্ত্তির গঠন করিয়াছিল।

উন্নতি।

সপ্তম শতাব্দীতে জাপানী সাহিত্যে কাব্যরচনার সূত্রপাত হয়। জাপানী কাব্য য়ুরোপীয় কাব্য হইতে অনেক বিষয়ে ভিন্ন প্রকৃতির;—ইহার প্রসরও অল্প। জাপানী সাহিত্যে 'ইলিয়াড্', 'ডিভাইন কমেডি' ইত্যাদির ন্যায় মহাকাব্য নাই। এবং জাপানী ভাষায় দার্শনিক, রাজনৈতিক অথবা ব্যঙ্গরসাত্মক কাব্যেরও সম্পূর্ণ অভাব। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে নাট্যকাব্যের সৃষ্টি হইয়াছিল, কিন্তু তাহা বিশেষ উন্নতিলাভ করে নাই, এবং প্রশংসাযোগ্য কোন নাট্যগ্রন্থ অদ্যাবধি রচিত হয় নাই। জাপানী কাব্য সাহিত্য কেবল গীতিকবিতায় পরিপূর্ণ, এবং এই খণ্ডকবিতাগুলি অত্যন্ত স্বল্পপরিসর ও সংহত;—

কাব্য।

রে একটামাত্র ভাবপ্রকাশ, অথবা স্বভাবের একটিমাত্র দৃশ্যের বর্ণনা, ইহার উদ্দেশ্য। জাপানী কবিতার বিষয় এইগুলি,—প্রেম ও মদিরার প্রশংসা, আকাঙ্ক্ষা অথবা বেদনা-প্রকাশ, নদীর কলতান, বিহঙ্গের কাকলি, গিরিচূড়াবেষ্টিত তুষাররাশি, চন্দ্রালোক, কুসুম, বৃষ্টি ও বাতাস। সূর্য্যাস্ত ও নক্ষত্রালোক জাপানী কবিতার বিষয়ীভূত নহে।

জাপানী কবিতা বিষয়বৈচিত্র্যে যেরূপ দীন, ছন্দ সম্বন্ধে ততোধিক দরিদ্র। জাপানী ভাষাটি এমনি যে, কেবল পাঁচটিমাত্র শব্দের মিল খুঁজিয়া পাওয়া যায়। সুতরাং জাপানীরা মিত্রাক্ষর কবিতা পছন্দ করে না। অথচ, সংস্কৃতের ন্যায় তাহাদের ভাষায় অক্ষরের গুরু লঘু মাত্রাও নিরূপিত নাই। গদ্য ও পদ্য রচনা চিনিবার উপায় এই যে, পদ্যে চরণ-গুলি পর্য্যায়ক্রমে ৫ ও ৭ মাত্রাত্মক [প্রতি (syllable) শব্দাংশই এক মাত্রা]। 'টঙ্কা' নামক ক্ষুদ্র কবিতাই জাপানে অত্যধিক প্রচলিত ; একটি 'টঙ্কা'য় পাঁচটি মাত্র চরণ ; প্রথম চরণে পাঁচ, দ্বিতীয় চরণে সাত, তৃতীয় চরণে পাঁচ, চতুর্থ চরণে সাত, ও পঞ্চম চরণে সাত,—মোট একত্রিশটি মাত্রা [শব্দাংশ]। সপ্তম শতাব্দী হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত জাপানী কবিতা এই সংকীর্ণ পরিসরের মধ্যে আবদ্ধ রহিয়াছে। এখনও প্রতি নববর্ষে সম্রাট্ তাঁহার সভাসদ্-গণকে 'টঙ্কা'য় পরিণত করিবার জন্য কতকগুলি বিষয় নির্ব্বাচিত করিয়া দেন। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা আবশ্যক যে, জাপানী কবিগণ সকলেই উচ্চপদস্থ, সম্ভ্রান্তবংশীয়। দারিদ্র্যপীড়িত কবি জাপানে নাই। আজকাল অনেকে বলিয়া থাকেন যে, কবিতারচনার ভার এখন নারীজাতির উপর অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা উচিত ; তাঁহারা শুনিয়া সুখী হইবেন যে, জাপানী কবিগণের মধ্যে অন্ততঃ ; অর্দ্ধেক মহিলা-কবি। জাপানে কবিতারচনা সখের কার্য্য ; ইহা অভিজাত-গণের শিক্ষণীয়। কিন্তু কোন লেখকই নিজের গ্রন্থ প্রকাশ করিতে পারেন না। সম্রাট্ একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে লিখিত সমুদয় উৎকৃষ্ট কবিতা সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন। এইরূপ একখানি সংগ্রহপুস্তকে নবম শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে রচিত চারি সহস্র কবিতা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। জাপানীদের মানসিক প্রকৃতি খুব rational, এ জন্য কবিতাতেও তাহারা রূপক পছন্দ করে না। তাহারা কখনও কোন অশরীরী পদার্থের গুণের, অথবা মনোভাবের শরীরিণী কল্পনা করিয়া লয় না। তাহাদের স্বভাবের এই বিশেষত্ববশতঃই বোধ হয় তাহারা প্রতিকৃতিচিত্রণ ও স্মৃতিস্তম্ভের গাত্রে কারুকার্য্য-অঙ্কন, এই দুই বিষয়ে পটুতা লাভ করিতে পারে নাই। জাপানীরা ব্যক্তিগত বিষয়ে আকৃষ্ট হয় না। কিন্তু তাহারা বাগ্মিতার বিশেষ অনুরাগী।

'মিকাডো-সম্রাটে'র ক্ষমতা খর্ব্ব হইলে যখন 'সগুণ' অর্থাৎ 'পার্থিব সম্রাট্' শাসনদণ্ড পরিগ্রহণ করিলেন, তখন জাপানীদিগের চিন্তারাজ্যে স্ত্রীজাতির প্রভাবেরও হ্রাস হইল। রাজ-ভক্তিই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া ঘোষিত হইল, এবং রাজার প্রতি একান্ত আনুরক্তি ও অন্ধভাবে রাজাজ্ঞার পালনই মহত্তম কর্ত্তব্য বলিয়া গণ্য হইল। নাকামিৎসু নামক এক ব্যক্তি জাপানী ইতিহাস ও উপন্যাসের সর্ব্বজনপ্রিয় নায়ক ;—সম্রাটপুত্র প্রাণদণ্ডার্হ কোন অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইলে, ইনি তাঁহাকে দণ্ড হইতে মুক্তি দিবার জন্য স্বহস্তে নিজের নিরপরাধ সন্তানের শিরশ্ছেদ করিয়া রাজভক্তির চরম

সেকাল।

দেখাইয়াছিলেন।—এই বিবরণটি পাঠ করিয়া আমাদিগের রাজস্থান ইতিহাসের ধাত্রী পা: কথা মনে পড়ে।—এই যুগে জাপানীগণ প্রতিহিংসাগ্রহণও অতি পবিত্র কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিত; য়ুরোপীয় উপন্যাসে প্রেম যেমন মুখ্য বিষয়, তৎকালীন জাপানী কাব্য উপন্যাসেও প্রতিহিংসা তেমনই প্রধান বিষয় ছিল। চীনের সংস্রবে আসিয়া জাপান যখন ক্রমে ক্রমে চীনদেশীয় ভাবে অনুপ্রাণিত হইল, তখন নারীজাতির প্রভাব লোপ পাইতে লাগিল, ধর্ম্মের অবনতি ঘটিল। বিধবার পুনর্ব্বার পতিগ্রহণে অসম্মতিই সতীত্বের পরাকাষ্ঠা বলিয়া গণ্য হইল। গণিকাবৃত্তি নিন্দনীয় ছিল না; প্রত্যুত, কোন বালিকা দরিদ্র পিতামাতার ভরণপোষণ অথবা সাহায্যকল্পে বারবিলাসিনীবৃত্তি অবলম্বন করিলে সে প্রশংসার পাত্রী হইত। প্রত্যেক উপন্যাসেই নায়িকার গৌরবান্বিত আসনে গণিকা প্রতিষ্ঠিত হইল।

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে জাপানের প্রসিদ্ধ রাষ্ট্রবিপ্লব সংঘটিত হয়; 'সগুণ সম্রাট্' বিতাড়িত হইলেন, এবং মিকাডো পুনর্ব্বার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন। এই সময় হইতেই জাপানের সর্ব্বাঙ্গীন

একাল।

সংস্কার আরম্ভ হইল; ইংরাজী ভাষা ও য়ুরোপীয় সভ্যতা জাপানে প্রবর্ত্তিত হইল; রেলবর্ত্ম নির্ম্মিত হইল; টেলিগ্রাফ্ স্থাপিত হইল; সৈন্যদল, রণতরী—সমস্তই য়ুরোপীয় আদর্শে গঠিত হইল। বিচারপদ্ধতি, শিক্ষাপ্রণালী, য়ুরোপীয় আদর্শে সংস্কৃত হইল। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে জাপানে প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়, ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের শেষে সংবাদ ও সাময়িকপত্রের সংখ্যা ৮১৪ ছিল। অতঃপর সাহিত্যের পুষ্টির জন্য য়ুরোপীয় গ্রন্থের অনুবাদ আরম্ভ হইল, Smile's Self-Help, Mill's Liberty ও Kant ও Spencerএর দার্শনিক গ্রন্থাবলী অচিরকালমধ্যে একে একে অনূদিত হইল। উপন্যাসের মধ্যে Ernest Maltravers সর্ব্বপ্রথম ভাষান্তরিত হয়—এই গ্রন্থখানি যথেষ্ট সমাদর লাভ করিয়াছিল। 'টেলিমেকস' ও 'রবিনসন ক্রুসো'ও নীতিগ্রন্থ স্বরূপ অনুবাদিত হইয়াছে। গল্পের বহির মধ্যে Three Musketeers, Don Quixote এবং Rider Haggard ও Jules Vernea প্রণালী জাপানে অত্যন্ত আদর প্রাপ্ত হইয়াছে।

উন্নতিশীল-সম্প্রদায়ভুক্ত নব্য জাপানী গ্রন্থকারগণ, জাপানী ও য়ুরোপীয়, উভয় সাহিত্যভাণ্ডার হইতেই ভাব গ্রহণ করেন। সুডো নানসুই তাঁহার একখানি গ্রন্থে জাপানী ও য়ুরোপীয় গ্রন্থকারগণের নাম এইরূপ একত্র করিয়া লিখিয়াছেন,—"লিটন, বেকিন, স্কট, টেনেহিকো, হুগো, সুনশুই, ডিকেন্স ও ইক্কু।" ইনি রাজনৈতিক উপন্যাসের অতিশয় ভক্ত। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে নানসুই যে উপন্যাসখানি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার নাম 'নব্যানারী' (modem women,) টোকিও নগরে আধুনিক আদর্শানুযায়ী শ্রমশিল্পের উন্নতি হইলে তাহার যেরূপ অবস্থা হইবে, ইহাতে তাহাই চিত্রিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের নায়িকা এক জন সুন্দরী দুগ্ধবিক্রয়কারিণী; কেহ মনে করিবেন না যে, দুগ্ধব্যবসায় কোনও উপন্যাসের নায়িকার পদোচিত নহে। ইহাতে বরং তাঁহার গৌরবই সূচিত হইয়াছে; কারণ, এ যাবৎ গোদুগ্ধ জাপানে খাদ্যরূপে গৃহীত হয় নাই। মানবদেহের পুষ্টির পক্ষে গোদুগ্ধ যে অতিশয় উপকারী, সুশিক্ষিতা উন্নতচরিত্রা মহিলা ব্যতীত অন্য কে দেশপ্রচলিত কুসংস্কার তুচ্ছ করিয়া তাহার প্রচার করিতে সাহসী হইবেন?

সমাজনীতি।

আফগানিস্তানের বিবাহ প্রণালী।

মহিলা-চিকিৎসক কুমারী হ্যামিল্টন্ আফগানিস্থানের বিবাহপ্রথা সম্বন্ধে স্বীয় অভিজ্ঞতালব্ধ যে বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন, পাঠকগণের অবগতির নিমিত্ত এবার আমরা তাহার সারসংগ্রহ করিয়া দিলাম।

মুসলমান-ধর্ম্মাবলম্বী হইলেও আফগানগণ বিবিধ উপজাতিতে (tribes) বিভক্ত; প্রত্যেক উপজাতির মধ্যেই স্বতন্ত্র প্রকার বিবাহপ্রণালী প্রচলিত। কিন্তু বিবাহের আবশ্যক মূল অনুষ্ঠান মহম্মদীয় শাস্ত্র কর্ত্তৃক ব্যবস্থিত, সুতরাং সেটুকু সর্ব্বত্রই একরূপ। সেই অনুষ্ঠানটুকু এই,—কন্যা স্বয়ং অথবা প্রতিনিধি দ্বারা দুই জন সাক্ষীর সমক্ষে এক জন পুরুষকে পতি বলিয়া গ্রহণ করিতে সম্মতি-জ্ঞাপন করিবে; এবং ঐ পুরুষও ঐরূপে উক্ত বালিকাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিতে সম্মতি জানাইবে।—বিবাহের মূল ব্যাপারটুকু এইরূপ সরল হইলেও, আনুষঙ্গিক আচার ব্যবহার এত অধিক যে, তিন দিন ও তিন রাত্রি ধরিয়া সেগুলি সম্পন্ন করিতে হয়।

মূল অনুষ্ঠান।

একটি উপজাতির মধ্যে বর্ত্তমানকালেও প্রাচীনকালের আসুরবিবাহ অর্থাৎ বলপূর্ব্বক বিবাহযোগ্যা কন্যা গ্রহণের প্রথা প্রচলিত থাকার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়। আবার কোন কোন উপজাতির মধ্যে আসুর বিবাহের চিহ্নমাত্র এখন বর্ত্তমান আছে;—কন্যা বহু বর্ষ যাবৎ বিবাহার্থী যুবকের প্রণয়াবদ্ধ থাকিলেও বিবাহের সময় ছয় বার পর্য্যন্ত তাহাকে পতিত্বে বরণ করিতে মৌখিক আপত্তি প্রকাশ করিবে। একটি উপজাতির মধ্যে নিয়ম আছে যে, বিবাহানুষ্ঠানের সময়ে বালিকা তিন বার কাঁদিয়া আকুল হইয়া পড়িবে, এবং তাহার মাতা ও অন্যান্য আত্মীয়গণ তাহার সহিত সমবেদনা প্রকাশ করিয়া তাহাকে সস্নেহে সান্ত্বনা করিবেন।

আসুর বিবাহ।

মহম্মদীয় ব্যবস্থানুসারে বিবাহ ধর্ম্মানুষ্ঠান নহে, একটা সামাজিক অনুষ্ঠানমাত্র। প্রায় সমস্ত উপজাতির মধ্যেই বিবাহের কথাবার্ত্তা একবার স্থির হইয়া গেলে, তাহা অগ্রাহ্য করিবার উপায় নাই। অনেক সময় বিবাহের প্রস্তাব স্থিরীকৃত হইয়াও যৌতুক প্রভৃতি সম্বন্ধে তর্ক মীমাংসিত না হওয়া পর্য্যন্ত কয়েক বৎসরের জন্য পরিণয়কার্য্য স্থগিত থাকে; কিন্তু এ জন্য বর ও কন্যাপক্ষীয় কেহই প্রস্তাবিত সম্বন্ধ পরিত্যক্ত হইবে, স্বপ্নেও এরূপ মনে করেন না।

কোন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে, বিবাহের আচার অনুষ্ঠান শেষ হইবার পূর্ব্বে বর কন্যার দর্শনলাভ করিতে পারে না। আবার কোন কোন সম্প্রদায়ে বিবাহপ্রস্তাব স্থিরীকৃত হইয়া সাধারণ্যে প্রচারিত হইবার পর বর কন্যার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারে। কিন্তু বরকে কন্যার পিতা ও অপর পুরুষ আত্মীয়গণের অজ্ঞাতে তাহার নিকট আসিতে হইবে। মনে কর, দৈবক্রমে কন্যার ভ্রাতা এক দিন তাহার ভাবী ভগ্নীপতিকে অন্তঃপুর হইতে বহির্গমন করিতে দেখিল; এখন, যদিও

নানা প্রথা।

সে বিলক্ষণ জানে যে, ঐ যুবক অনেক দিন,—এমন কি, একাধিক বৎসর যাবৎ তাহার ভগ্নীর পাণিপ্রার্থী হইয়া তাহার অন্তঃপুরে যাতায়াত করিতেছে, তথাপি আত্ম-সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সে তৎক্ষণাৎ সেই হতভাগ্য প্রণয়ীকে হত্যা করিতে বাধ্য। বলা বাহুলা, পরিবারস্থ বর্ষীয়সী মহিলাগণ যাহাতে এরূপ শোচনীয় দুর্ঘটনা ঘটিতে না পারে, তৎপক্ষে যথোচিত অবহিত থাকেন। তাঁহাদের সাবধানতা সত্বেও যদি প্রণয়ী যুবক দৈবাৎ তাহার ভাবী পত্নীর কোন আত্মীয়ের দৃষ্টিপথে পতিত হয়, তবে ঐ আত্মীয় ব্যক্তি প্রায় সর্ব্বস্থলেই তাহাকে দেখিতে পান নাই, এইরূপ ভাণ করিয়া থাকেন। কিন্তু যদি তিনি উপেক্ষা না করিয়া ঐ যুবকের প্রাণনাশ করেন, তবে নিহত ব্যক্তির আত্মীয় স্বজন হত্যাকারীর বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ উপস্থিত করিতে পারে না। দুর্ভাগ্যক্রমে যদি বিবাহার্থী যুবকের প্রতি কন্যার কোন আত্মীয়—যত দূরসম্পর্কিতই হউক না কেন—কোন কারণে আন্তরিক রুষ্ট থাকে, তবে সে বৈরনির্যাতনের এই সহজ উপায় অবলম্বন করিতে ইতস্ততঃ করে না। এই রূপে কন্যার জ্ঞাতিগণের গুপ্ত ষড়যন্ত্রে অন্তঃপুরনিষ্ক্রান্ত অনেক প্রণয়ী যুবকের শোচনীয় পরিণামের কাহিনী শুনিতে পাওয়া যায়।

যৌতুক।

ভারতবর্ষের ন্যায়, আফগানিস্থানেও কন্যাকর্ত্তাকে প্রকৃতপক্ষে মূল্য দ্বারা বর ক্রয় করিয়া আনিতে হয়; এবং ধনসম্পত্তি ও পদমর্য্যাদা অনুসারে বরের মূল্যের তারতম্য হয়। আমাদের বঙ্গদেশে যেমন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ বরের মূল্য যোগাইতে গিয়া অনেক কন্যাদায়গ্রস্ত ভদ্রলোক আকণ্ঠ ঋণে মগ্ন হইয়া পড়েন, কাবুলেও সেইরূপ অনেকে এক জন পদস্থ রাজকর্ম্মচারীর হস্তে কন্যা সমর্পণ করিতে গিয়া সর্ব্বস্বান্ত হন। ঐরূপ এক জন রাজকর্ম্মচারীর পত্নীবিয়োগ ঘটিলে চারি দিক হইতে এত লোক আসিয়া তাঁহাকে শূন্য আসন পূর্ণ করিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে যে, নূতন একটি দারপরিগ্রহ না করা পর্যান্ত তিনি নিরুপদ্রবে কালযাপন করিতে পারেন না।

বহুবিবাহ।

কিন্তু সর্দ্দার নসেরুল্লার বিবাহে একটু অসাধারণত্ব ও ঔপন্যাসিক রস আছে। যখন তিনি বালকমাত্র ছিলেন, তখন মহিলাগণ অবগুণ্ঠিত না হইয়াও তাঁহার সম্মুখে আসিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেন না। সেই সময়ে একদা তিনি তাঁহার বর্ত্তমান পত্নীকে দর্শন করিয়া মুগ্ধ হন, এবং প্রণয়িনীর বয়স তাঁহার অপেক্ষা কয়েক বৎসর অধিক হইলেও পরে তাঁহাকেই বিবাহ করেন। তদবধি নানারূপ উপরোধ অনুরোধ সত্বেও তিনি দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করিতে সম্মত হন নাই। মহাপুরুষ মহম্মদ একটি পুরুষের এক সময়ে অনধিক চারিটি ভার্য্যা গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন; সুতরাং পুরুষের বহুবিবাহ মুসলমান ধর্ম্মের অনুমোদিত। কিন্তু নসেরুল্লা বলেন, মহম্মদ যে সমাজে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেই সমাজের লোকদিগের উচ্ছৃঙ্খল, অসংযত, ও কলুষিত চরিত্র দেখিয়াই তাঁহাকে অগত্যা ঐরূপ ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল; তিনি যদি স্পষ্টরূপে একাধিক পত্নীগ্রহণ ধর্ম্মবিরুদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করিতেন, তবে কেহ তাঁহার সেই আদেশ প্রতিপালন করিত কি না সন্দেহ। সেই জন্য মহম্মদ তদানীন্তন সমাজের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া, একটি পুরুষের পত্নীর সংখ্যা যাহাতে এক সময়ে চারিটির অধিক না হয়, তাহার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু একাধিক পত্নীর

প্রতি সকল স্ত্রীকেই সমান ভাবে ভালবাসিতে এবং তুল্যভাবে বসন ভূষণ আহারাদি দান করিয়া ভরণপোষণ করিতে বাধ্য। সর্দ্দার নসেরুল্লা অনেকবার লেখিকার নিকট প্রকাশ করিয়াছেন যে, একজন পুরুষের পক্ষে এক সময়ে একাধিক রমণীকে আন্তরিক ভালবাসা প্রদান করা সম্ভব নহে; এমন কি, দুইটিমাত্র স্ত্রীকেও ঠিক সমভাবে দর্শন করা অসম্ভব। সুতরাং মহম্মদ চারিটি ভার্য্যা গ্রহণের অনুমতি দান করিয়াও প্রকৃতপক্ষে শিক্ষিত পুরুষদিগকে এক স্ত্রী বর্ত্তমান থাকিতে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

কিন্তু আফগানিস্থানের সকলেই কিছু ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধিব্যবস্থা মানিয়া চলিতে যত্ন করে না; এই সকল লোকের পক্ষে বিবাহ করা সংসারে এক জন অতিরিক্ত পরিচারিকা নিযুক্ত করা অপেক্ষা গুরুতর ঘটনা নহে। চারিটির অধিক পত্নী গ্রহণ করিতে মহম্মদ স্পষ্টাক্ষরে নিষেধ করিয়াছেন, কিন্তু ইহাদের অনেকে কেবলমাত্র চারিটি স্ত্রী লইয়া সংসারধর্ম্ম পালন করিতে সক্ষম হয় না। পতি যদি অবস্থাপন্ন লোক হন, তবে পত্নী কর্ম্মিষ্ঠা না হইলেও ক্ষতি নাই, কিন্তু পত্নীর ব্যয় বিবাহলব্ধ যৌতুক দ্বারা নির্ব্বাহ হওয়া আবশ্যক।

আফগানিস্থানে পুরুষের পক্ষে বিবাহ যদিও একটা সামান্য ঘটনামাত্র, কিন্তু রমণীর পক্ষে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর বিষয়। যে পুরুষের হস্তে সে সমর্পিত হয়, তাহার উপরই তাহার নারীজীবনের সমস্ত সুখ দুঃখ নির্ভর করে। ঐ পুরুষটি যতদিন জীবিত থাকে, ততদিন তাহার আর কিছুমাত্র স্বাধীনতালাভের আশা নাই। কোন হতভাগিনী হয় ত জন্মেও স্বামীর দর্শনসৌভাগ্য লাভ করিতে পারে না; সে উপেক্ষিত ও অনাদৃত হইয়া পড়িয়া থাকে, এবং তাহার অশিক্ষিতা ও নীচকুলোদ্ভবা সপত্নীগণকে অন্যায্য সম্মান প্রাপ্ত হইতে দেখে। কিন্তু তথাপি তাহাকে চিরজীবন পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গের ন্যায় স্বামীর শুদ্ধান্তে রুদ্ধ হইয়া থাকিতে হইবে। তাহার জীবনে কোন কর্ত্তব্য নাই, কোন বৈচিত্র্য নাই। অন্তঃপুরের এক পার্শ্ব হইতে অন্য পার্শ্ব, অথবা ছাদের উপর হইতে প্রাঙ্গণে গমনাগমন ভিন্ন, সময় অতিবাহিত করিবার তাহার কোন উপলক্ষ নাই। এমন অবস্থায় অন্তঃপুর যে পাপপঙ্কিল হইয়া উঠিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? নারীদিগকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা মহম্মদ প্রচার করেন নাই। স্বয়ং আমীর অনেকবার, লেখিকার সমক্ষে, স্ত্রীদিগকে পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়া রাখিবার এই নিষ্ঠুর প্রথা যে ব্যক্তি মুসলমান জাতির মধ্যে প্রবর্ত্তিত করিয়াছে, তাহাকে উদ্দেশ করিয়া অভিশাপ দিয়াছেন, এবং নারীদিগের স্বাধীনতা প্রদান করা যে অত্যন্ত বাঞ্ছনীয়, এরূপ অভিপ্রায়ও ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু লেখিকার মতে প্রাচ্যদেশে স্ত্রীজাতির অবরোধপ্রথা দূর হইবার পূর্ব্বে পুরুষদিগের বহুবিবাহপ্রথা সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হওয়া আবশ্যক। আক্ষেপের বিষয় এই যে, ভারতবর্ষেও আজ পর্য্যন্ত অনেক বহুবিবাহের পক্ষপাতী ব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। শিক্ষাসম্পর্কশূন্য স্ত্রীগণ যদি স্বাধীনতাপ্রাপ্ত হইয়া দেখে যে, তাহারা যে সকল নিয়মের বাধ্য, তাহাদের স্বামীরা সে সকল নিয়ম মানিয়া চলিতে বাধ্য নহে, তখন সেই সকল স্বামীদেবতার প্রতি তাহাদের ভক্তি অবিচলিত থাকিবার সম্ভাবনা কোথায়? 'হারেমে' অবরুদ্ধ থাকিয়া সারা জীবন আলস্যে যাপন করা নারীত্বের অবমাননা, সন্দেহ নাই; কিন্তু বহুবিবাহ-পরায়ণ জাতির উপেক্ষিতা স্ত্রীগণ স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়া অন্তঃপুর-কারার বাহিরে সান্ত্বনা অন্বেষণ করিতে গেলে যে বিষময় ফল উৎপন্ন হইত, তাহা মনে করিতেও শরীর শিহরিয়া উঠে।

পতি-পত্নী।

উপসংহারে লেখিকা প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দেশের বিবাহ সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার মতে, প্রাচ্যদেশে বিবাহের পূর্ব্বে একটিমাত্র বিষয় বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখা হয়—তাহা অর্থ। কেবল আফগানিস্থানে নহে, সভ্যতালোকদীপ্ত কলিকাতা নগরেও লেখিকা দেখিয়াছেন যে ধনীর ঘরের অত্যন্ত রুগ্না ও কুৎসিত বালিকা সৎপাত্রে পরিণীতা হয়, কিন্তু দরিদ্র হইয়া সুস্থ ও সুশ্রী বালিকারও বর জোটে না। য়ুরোপেও যে ধনসম্পদ দেখিয়া বিবাহের জন্য কন্যা নির্ব্বাচিত হয় না, এমন নহে; কিন্তু য়ুরোপীয়গণ মুখে তাহা স্বীকার করেন না; প্রাচ্যদেশীয়গণ অকপটে ইহা স্বীকার করেন, এবং ইহাতে লজ্জাবোধ করিবার কোন কারণ দেখিতে পান না। কিন্তু পরিণয় সম্বন্ধে প্রাচ্যদেশীয়দিগের অপেক্ষা য়ুরোপীয়দিগের একটি মহৎ সুবিধা আছে,—প্রতীচ্যদেশে ইচ্ছা থাকিলে, এবং লোকচরিত্র অধ্যয়ন করিবার উপযুক্ত প্রখর বুদ্ধি থাকিলে, পুরুষ এমন স্ত্রী নির্ব্বাচন করিতে পারেন, যিনি সহচরী ও সহকর্ম্মিণী হইতে পারেন। কিন্তু প্রাচ্যদেশীয়ের পক্ষে ইহা একরূপ অসম্ভব, এ দেশে অনূঢ় যুবককে বিবাহযোগ্যা কুমারীদিগের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিতে দেওয়া হয় না; তাহার জন্য যে বালিকা মনোনীত করা যায়, সে তাহাকেই বিবাহ করিতে বাধ্য। এরূপ স্থলে, সে যে কেবল ধনসম্পত্তির প্রলোভনেই বিবাহ করিবে, ইহাই স্বাভাবিক।

অভাগিনী।

১

আমি এসেছি জননী! মন্দিরে তব
শেষ আশ্রয় খুঁজি,
আমি শ্রান্ত জননী! মরণ আহত
হৃদয়ের সাথে যুঝি।
মাতা পাপের গভীর কালিমা-জড়িত
আমার হৃদয়তল;
আমি এনেছি বহিয়া পাপ জীবনের
অনুতাপ তুষানল।
আমি পাপ-জীবনের রুদ্ধ কাহিনী
বহিতে পারি না আর;
তাই তোমার চরণে নিবেদিব সব,
হ্রাসিব হৃদয়ভার।
মাতা, পাপী তাপী সব সন্তান তব
তব স্নেহ করে পান;
তবে পাপী কি পা'বে না ক্ষমা তব কাছে,
অঙ্কে পাবে না স্থান?
তুমি জগত-জননী, তব স্নেহস্রোত
জগতে বহিয়া যায়;
তাই, এসেছি জননি ব্যথিত-হৃদয়ে
আশ্রয় খুঁজি পায়।

২

মাতা, অভাগীর এই পাপদেহ ছিল
রূপের তুলিতে লিপ্ত;
মোর হৃদয়েতে ছিল দেব-অভিশাপ
রূপের গর্ব্বশিখা।
মোর শৈশব-কুঁড়ি ফুটিল যখন
কৈশোর রবিকরে,
আমি জনকের গেহ ছাড়িয়া তখন
পশিনু পতির ঘরে।

মাতা, তই রচেছিনু আমি
নূতন জীবনে পশি,
হায়! তাসে কুসুমের মত
ঢলি পড়িল খসি।

আমি আদর হইয়া পাইনু ভূষণ,
প্রণয় চাহিয়া ধন,
মাতা, বসনে ভূষণে তৃপ্ত কি হয়
প্রণয়-পিপাসী মন?

তাঁর হৃদয়ে কেবল অর্থ-চিন্তা,
স্বার্থ সর্ব্বগ্রাসী;
মাতা, স্বার্থের বায়ু প্রণয়ের পরে
বরষে গরলরাশি!

আমি দুর্ব্বল নারী, চাহিতাম আমি
সোহাগ, আদর, প্রেম;
আমি কি করিব ল'য়ে প্রেমের বিহনে
রজত, হীরক, হেম?

মোর হৃদয়-স্বপ্ন নাশিত হৃদয়ে
ক্রুদ্ধ চাহনি তাঁর;
মোর চুম্বন-সাধ নাশিত অধরে
ক্রূর বিরক্তি তাঁর।

আমি মরমবেদনে কাঁদিতাম, মাতা,
করপুটে মুখ ঢাকি;
মোর দুর্ব্বল দুখে উপহাসভরে
চাহিত তাঁহার আঁখি।

সেই উপহাস-ভরা দৃষ্টি তাঁহার
শাণিত ছুরিকা সম;
সেই বেদনাক্লিষ্ট বিপদ-ব্যথিত
হৃদয়ে পশিত মম।

সেই উপহাস আর, মূক অবহেলা—
বড়ই যাতনা তা'য়;
মাতা, ঘৃণার বেদনা তাড়না যাতনা
তা'র চেয়ে সহা যায়।

৩

ধীরে উঠে নবপট, নূতন অঙ্ক
খুলিল জীবনে মম,
মোর দগ্ধ হৃদয়ে শিশু সুকুমার
দেবতা আশীষ সম।

তাঁরে সূতিকাগৃহের দুয়ারে ধাত্রী
জানাইলে এ বারতা;—
শুধু "মেয়ে! ছেলে নহে?" জনকের মুখে
শুনিনু কঠোর কথা।

আমি দেহের শোণিতে পুষেছি তাহারে
প্রাণ দিয়া ভালবাসি,
আমি ভেবেছিনু মনে তা'র মুখ চাহি
ভুলিব যাতনারাশি।

যবে তা'র প্রতি এই অবহেলাবাণী
বাহিরিল তাঁর মুখে,
সেই অবহেলা-বাণী শতশেল সম
বাজিল আমার বুকে।

সে যে দগ্ধ জীবনে সুখের উৎস—
শুনি এ কঠোর কথা;
মোর নবস্নেহ-ভরা জননী-হৃদয়ে
বাজিল বিষম ব্যথা।

মাতা, বিদ্যুৎ সম, তীব্র যাতনা
জ্বলিল হৃদয়তলে;
মোর রক্তবিহীন শীর্ণ গণ্ড
ভাসিল অশ্রুজলে,

৪

ক্রমে ফিরিল গণ্ডে রক্ত-চিহ্ন,
শরীরে নবীন বল;
শুধু জুড়াল না, মাতা, বেদনা-দগ্ধ
তপ্ত হৃদয়তল।

তাঁর অবহেলা বায়ে গিয়েছিল নিবি
আমার প্রণয় আশা।
ধীরে ঘৃণা আসি, মাতা, বসেছিল সেথা
ছিল যেথা ভালবাসা।

৫

আর শুনিও না তুমি, কহিতে পারি না,
মগ্ন হৃদয় মোর,

মাতা, অন্ধ করিল নয়ন আমার
ঝাঁকি কোন মোহঘোর।
আমি এক দিন শেষে ভুলিনু ধর্ম্ম,—
ভুলিনু জননীস্নেহ,
হায়! রাজপথে একা আসিয়া দাঁড়ানু
ত্যজিয়া আপন গেহ।
সেই অন্ধতামসী নিশার আঁধারে
বিদ্যুৎ ক্ষণ জ্বলে,
মাতা, ঘনগর্জ্জন- বিহ্বলা আমি
পথে ভুলি পাপছলে।
আমি গমনের কালে শিশুটিরে মোর
তুলিয়া লইনু বুকে,
আমি স্নেহচুম্বন দিলাম তাহার
সুপ্তিশান্ত মুখে।
তা'র অঙ্গ-পরশ তপ্ত বলিয়া
ঠেকিল আমার করে,
তাহা 'কিছু নহে' বলি, মাতা, আমি তারে
রাখিনু শয়ন 'পরে।
ধীরে কম্পিতকরে দ্বার-অর্গল
মুক্ত করিয়া শেষে
আমি আসিনু বাহিরে কোন্ পাপ-পথে
অভিসারিকার বেশে।
আমি শঙ্কিত-হৃদে কম্পিত-পদে
চলিনু সে পথ 'পর
যেথা অদূরে দাঁড়ায়ে আছিল আমার
পাপ পথে সহচর;
তা'র প্রসারিত দুই বাহু মাঝে পড়ি,
মাথা রাখি তা'র বুকে,
আমি প্রাণের বেদনে আকুল যাতনে
কাঁদিলাম দুখে সুখে।

৬

মাতা, কলুষে কাটিল দীর্ঘদিবস,
কাটিল দীর্ঘ নিশি;
ক্রমে সপ্তাহকাল [illegible] আমার
পাপের প্রবাহে
আমি সারা দিনমান [illegible] কাণে
শিশুর রোদ[illegible],
আমি চমকিয়া ফিরি চাহিতাম তা'রে
আমার নিক[illegible]ট গণি'।
আমি নিশীথে স্বপ্নে ধরিতে তাহারে
প্রসারিয়া দুই কর,
শেষে জানিয়া একাকী, কাঁদিতাম শুধু
শূন্য শয়ন 'পর।
মোর জননী-হৃদয় রুদ্ধ দুয়ারে
কাঁদিত হৃদয়মাঝে,
সেই ক্রন্দন তা'র এখনো নিয়ত
আমার হৃদয়ে বাজে।
মাতা, টুটি গেল মোহ, বুঝিনু হৃদয়ে
পাপপ্রলোভনসুখ
এই সংসারে শুধু মরীচিকা সম
কেবল বাড়ায় দুখ।
মাতা, টুটিল কুয়াসা, দেখিনু কলুষ,
দেখিনু মুরতি তার,—
সে ত নহে মনোরম নয়নরঞ্জন,—
ভীতিপ্রদ, কদাকার।
শেষে একদিন আর রহিতে নারিনু
কুস্বপন দেখি জাগি,
মোর জননী-হৃদয় আকুল আবেগে
ব্যাকুলিত শিশু লাগি।
সেই নিশীথের ঘন আঁধার বক্ষে
কম্পিত পদে একা,
সেই শতস্মৃতি-ঘেরা চিরপরিচিত
গৃহদ্বারে দিনু দেখা;
মোর উন্মাদ সম মুরতি হেরিয়া
বিরলপথিক পথে
মোরে প্রেতলোকবাসী ভাবিয়া পথিক
সরি গেল পথ হ'তে।

আমি দেখিনু কক্ষে জ্বলি আলোক,
মুক্ত গৃহের দ্বার ;
আমি শুনিনু শ্রবণে গৃহ হ'তে আসে
রোদননিনাদ কার।
ধীরে তস্কর সম শঙ্কিত হৃদে
কম্পিত-কলেবরে
আমি করিনু প্রবেশ আপনার সেই
চিরপরিচিত ঘরে।
আমি দেখিনু,—বসিয়া ননদিনী মোর—
নয়নে অশ্রুধার ;
তাঁর কোলে শুয়ে আছে মরণ-আহত
মোর শিশু সুকুমার।
মাতা, পরের শিশুরে বন্ধ্যা রমণী
এত স্নেহ করে যদি,
তবে কি পাষাণে গড়া —নিষ্ঠুরা আমি—
আমার কঠোর হৃদি।
বড় বাসনা জাগিল চিত্তে আমার
শবদেহ চাপি বুকে
শেষ স্নেহচুম্বন আঁকি দিতে সেই
মরণসুপ্ত মুখে।
সেথা আমারে হেরিয়া ননদিনী মোর
তুলিয়া নয়ন দুটি,—
তাহে রোষানল যেন ছুটি বাহিরায়
অশ্রুবাঁধন টুটি।—
মোরে কহিলা ননদী, "কেন আসিয়াছ
হেথা কুলকলঙ্কিনী ?
তব কলুষ-পরশ আনিও না আর,
দূর হও পিশাচিনি !
যথা গহন কাননে ভ্রমে অবিরত
নিষ্ঠুর পশু যত,
তা'রা সন্তানে পালে, সন্তানঘাতী
নহে তা'রা তোর মত !

তুমি জ্বর-ঘোরে তা'রে গিয়াছ ফেলিয়া
ভুলেছ ধর্ম্ম স্নেহ ;
তুমি নহ ত মানবী, ক্রূর রাক্ষসী
ধরেছ মানবদেহ !"—
তার অশ্রু-উচ্ছ্বাসে রুদ্ধ কণ্ঠে
সরিল না আর কথা,
শুধু কাতর মুখানি নয়নে ভাসিল
দারুণ মর্ম্মব্যথা।
আমি প্রহারক্লিষ্ট সারমেয়ী সম
বাহিরিনু সেথা হ'তে,
হৃদে দারুণ বেদনা বহিয়া আবার
দাঁড়ানু পাষাণ-পথে।
সেথা বসিয়া একেলা কাঁদিতে চাহিনু
করপুটে মুখ ঢাকি ;
কিন্তু এক ফোঁটা জল ঝরিল না, মাতা,
সিক্ত হ'ল না আঁখি।
মোর মর্ম্মবেদনা, চাহে বাহিরিতে
ভাঙ্গিয়া হৃদয়দ্বার,
তবু নয়নের কোণে শান্তিসলিল
আসিল না একবার।
ক্রমে উঠিল ফুটিয়া পূর্ব্ব গগনে
অরুণ-কিরণ-রেখা,
ক্রমে জাগিল জনতা, পথিক আবার
রাজপথে দিল দেখা।
আমি জাগিনু আপনি আপনার মাঝে
মর্ম্মজ্বালায় দহি,
আমি চলিনু, জননি, লক্ষ্যবিহীন
জীবনের ভার বহি।

৮

আমি সে অবধি, মাতা, ফিরি পথে পথে
প্রাণে বহি ব্যথাভার।
মোর হৃদয়ে কেবল অনুতাপরাশি,
নয়নে নয়নধার।

মোরে কেহ করে দয়া, কেহ করে ঘৃণা,
কেহ করে উপহাস,
মাতা, কেহ 'আহা' বলে, কেহ দেয় গালি,
কেহ হাসে ক্রূর হাস।
আমি শুনি কা'র ক্রন্দনধ্বনি,—
ফেটে যায় যেন বুক;
আমি সদাই নয়নে হেরি শিশুটির
মরণ-সুপ্ত মুখ।
হায়! অসহ বেদনে কাটি যাবে, মাতা,
কত দিন মোর আর?

আর ব পারি না কলুষ-ক্লিষ্ট
দুর্ব্বহ হৃদি-ভার।
আমি য়াছি তাই মন্দিরে তব
শেষ আশ্রয় খুঁজি,
আমি ান্ত, জননী, মরণ-আহত
হৃদয়ের সাথে যুঝি।
আমি মরণসুপ্তি চাহি এবে শুধু—
এ জ্বালার অবসান,
আমি মরণ মাগিয়া লয়েছি শরণ
চরণে; দাও, মা, স্থান।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

পূর্ণিমা। ভাদ্র। "মৃত্যুর পরে" এবারকার পূর্ণিমার প্রায় অর্দ্ধাংশ পূর্ণ করিয়াছে। 'চুটকি" পাঁচ ফুলের সাজি,—লেখকের মুন্সীয়ানা প্রশংসনীয়।

স্বাস্থ্য। ভাদ্র। "স্বাস্থ্যপ্রসঙ্গে" 'গুপ্তব্যাধিপ্রকাশে' লেখক কালা জ্বরের নব-নির্দ্দিষ্ট কারণের উল্লেখ করিয়াছেন। "জেলের কয়েদী ও রক্তামাশয়" প্রবন্ধে লেখক বলিয়াছেন, রক্তামাশয়পীড়িত কয়েদীদের দেশীয় ঔষধ ব্যবস্থা করিয়া দেখিলে হয়। আশা করি, আমাদের সংবাদপত্র-সম্পাদকগণ এ বিষয়ে গবর্মেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করিবেন। "হিন্দুর আবগাহনপদ্ধতি" প্রবন্ধে বৈদ্যকশাস্ত্রবিহিত অবগাহনপদ্ধতির উৎকর্ষ ও উপযোগিতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। "দার্জ্জিলিং" প্রবন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য কথা পাওয়া যায়। "সিঙ্কোনা" আর একটি উৎকৃষ্ট সন্দর্ভ। "পল্লীচিকিৎসা" সাধারণ গৃহস্থের উপকারী। "বহুমূত্ররোগের পথ্য" বহুমূত্ররোগীর বিশেষ উপকারে আসিবে। উত্তরোত্তর স্বাস্থ্যের উন্নতি দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি।

মুকুল। ভাদ্র। "সার রমেশচন্দ্র মিত্র" প্রবন্ধটি সুরচিত ও শিক্ষাপ্রদ। লেখক সংক্ষেপে এই মহাপুরুষের জীবনকথা বেশ গুছাইয়া বলিয়াছেন। রমেশবাবুর চিত্রখানিও মন্দ হয় নাই। "বানরের দুষ্টামি" একটি সুলিখিত সুমিষ্ট গল্প। ছেলেরা পড়িয়া আনন্দলাভ করিবে। "অদ্ভুত প্রাণী" প্রাণিতত্ত্ববিষয়ক একটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ। বিজ্ঞানের কথা লেখক অবলীলাক্রমে এমন সহজে ও এত মনোহরভাবে বলিয়া গিয়াছেন যে, দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। বিষয়টি যেমন চিত্তাকর্ষক, লেখকের ভাষা তেমনই সহজ। প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া মুকুলের পাঠকগণ আনন্দের সহিত শিক্ষালাভ করিবে। বিনা প্রয়াসে, আনন্দ প্রীতির সহকারে যিনি শিক্ষা দিতে পারেন, তিনি ধন্যবাদভাজন। "হেঁয়ালী গল্প" একটি উপকথা। "ইতর প্রাণীর ভালবাসা" একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ। গল্পগুলি বেশ। "ঘুমের ওষুধ" সচিত্র রহস্য কবিতা,—খোকা ভুলাইবার জন্য।

আলো। প্রথম বর্ষ; প্রথম সংখ্যা; ভাদ্র। আলো একখানি নূতন মাসিকপত্র ও ও সমালোচন; ইডেন্ হিন্দু হোষ্টেল্ হইতে প্রকাশিত। আমরা সাদরে ও আশাপূর্ণহৃদয়ে, এই নূতন মাসিকের আবাহন করিতেছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণের উদ্যোগে 'আলো'র প্রচার; বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতন ও নূতন ছাত্রগণের রচনায় আলো পরিপূর্ণ। এমন দিন গিয়াছে, যখন বাঙ্গালী ছাত্র ইংরাজী লিখিয়া, বিদেশীয় ভাষার বার্থ সেবায় প্রতিভার অপব্যয় করিয়া তৃপ্ত হইতেন, মাতৃভাষার প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি ছিল না। সৌভাগ্যক্রমে এখন স্রোত ফিরিয়াছে; 'মাতৃভাষারূপ খনি পূর্ণ মণিজালে,' এখন দেশের ও দশের চোখে পড়িতেছে। "আলো" সেই নবানুরাগের, সেই মাতৃভাষাভক্তির অন্যতর প্রমাণ। যাঁহারা আলোর প্রবর্ত্তক, তাঁহাদের এই সাধনা সফল হউক, এই আমাদের আন্তরিক কামনা। শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সেনের "পারঞ্জপেয়" প্রবন্ধটি মন্দ হয় নাই। "একদিন সাহিত্যে, শিল্পে, বিজ্ঞানে, ব্যায়ামে, নীতি ও ধর্ম্মে—সর্ব্বাঙ্গপুষ্ট মনুষ্যত্বের জ্বলন্ত গৌরবে ভারতভূমি আবার জগতের চক্ষে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে"—পারঞ্জপেয়র সাফল্যগৌরবে গৌরবান্বিত নবীন লেখকের তরুণ হৃদয়ের এই উগ্র আশা দেখিয়া অনেক শৈশবস্বপ্ন মনে পড়ে। শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষের "আলোক-শোষণ" একটি সুলিখিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ। আশা করি, লেখক উত্তরোত্তর অধিকতর কৃতকার্য্য হইবেন। শ্রীযুক্ত রমণীমোহন ঘোষের "যোগভঙ্গ" কুমারসম্ভবের অমরচিত্র উমার অনুকরণে লিখিত একটি মধুর কবিতা। "বঙ্কিমপ্রসঙ্গে" বিশেষত্ব বা নূতন তথ্য কিছু দেখিলাম না। উমাচরণ বাবু বঙ্কিম বাবুর লেখক ছিলেন, এ কথা সত্য কি?

প্রদীপ। ভাদ্র। "তপোবন-চিত্রের" মাধুর্য্য অনুভব করিতে পারিলাম না। বোধ হয়, ছন্দের দীনতায় কবিতাটি আরও মলিন হইয়া পড়িয়াছে। "বৈদেশিকের মারাঠা-চরিত্র" নামক অনূদিত প্রবন্ধটির উপযোগিতা কি, তাহা লেখকই বলিতে পারেন। মূল লেখকের রচনায় লেখক যে 'সরলতা' ও 'চরিত্রাভিজ্ঞতার পরিচয়' পাইয়াছেন, আমরা তাহার পরিচয় না পাই, আংলো-ইণ্ডিয়ান্ লেখকের ভারতীয় চরিত্রের প্রতি স্বাভাবিক উপেক্ষা ও ঘৃণার একটা নমুনা পাইয়াছি। আংলো-ইণ্ডিয়ানের রচনার তথাকথিত রসটুকুর জন্য, এই অমূল্য উপেক্ষাটুকু আমদানী করিবার আবশ্যক কি? স্বদেশে কি বিলাতী 'বুট'-রজের কিছু অভাব আছে? শ্রীমতী কৃষ্ণভাবিনী দাসের "দেশী ও বিলাতী জিনিস" প্রবন্ধটি স্বদেশভক্তির পরিচায়ক ও সকলের আলোচ্য। "জাপান," "মালদহ" প্রভৃতি অবশিষ্ট প্রবন্ধগুলির কোনও বিশেষত্ব নাই। শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর "আমাদের গৃহে অন্তঃপুরশিক্ষা ও তাহার সংস্কার" প্রবন্ধটি ভবিষ্যৎ সামাজিক-ইতিহাস-লেখকের উপকারে আসিবে। আমাদের দুঃখ এই যে, অন্তঃপুর-শিক্ষা ও তাহার সংস্কারের জন্য যে গৌরব ও প্রশংসা ঠাকুর-পরিবারের প্রাপ্য, ঠাকুরবংশীয়া শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী আমাদিগকে তাহা বলিবার অবকাশ দিলেন না, আপনিই সকল কথা বলিয়া রাখিয়াছেন। সুতরাং রবীন্দ্র বাবুর "রাজা ও রাণীর" নায়কের ভাষায় আমা-দিগকেও বলিতে হইতেছে—"তাহারও দিলে না অবকাশ!" লেখিকা উপসংহারে বলিয়া-ছেন, "যদি স্বামী মেজদাদার সহায়তা না করিতেন, তাহা হইলে এত শীঘ্র স্ত্রীজাতির এত-দূর উন্নতি হইত কি না সন্দেহ।" কিন্তু এত শীঘ্র "যে এত উন্নতি" হইয়াছে, তাহাকে

স্ত্রীজাতির প্রকৃত উন্নতি বলিয়া স্বীকার করা যায় কি না সন্দেহ। এই ঠাকুর-পরিবারে প্রসূত, পরিপালিত, সুশিক্ষিত, আদিব্রাহ্মসমাজের অন্যতর আচার্য্য শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "পুণ্য" নামক মাসিকে আধুনিক স্ত্রীশিক্ষার অপচার দেখিয়া ক্রমান্বয়ে কয় মাস ধরিয়া যে আক্ষেপ করিতেছেন, এবং বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর পরিবর্ত্তন ও সংশোধনের জন্য প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া, স্ত্রীজাতির "এত দূর উন্নতি" সম্বন্ধে একটু সংশয় জন্মে। যে স্ত্রীশিক্ষার ফলে আমরা শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর গ্রন্থাবলী পাইয়াছি, সে শিক্ষার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। কিন্তু যে শিক্ষায় রমণীহৃদয়ের শালীনতা, কোমলতা, কুলীনতার অপচয় হয়, বম্বে শাড়ী, রুজ, পাউডার, পমেড, পিয়ানো প্রভৃতিই যে শিক্ষার অগ্রদূত, এক কথায়, যে শিক্ষা নারীকে বিলাস-সর্ব্বস্ব-প্রগল্‌ভ পুরুষে পরিণত করে, সে শিক্ষা প্রার্থনীয় কি না, সে বিষয়ে বিশেষ বিচার-বিতর্ক আবশ্যক। যাহা হউক, সে বিচারের এ স্থল নহে। শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের স্বাক্ষর দেখিয়া "প্রতিভা" নামক কবিতাটি আগ্রহসহকারে পাঠ করিয়া, অবশেষে নিরাশ হইয়াছি। আমরা "প্রতিভার" অর্থ বুঝিলাম না।

এবার "গুর্জ্জর কাহিনী লেখকের নিবেদন" এই শিরোনাম দিয়া, শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় "সাহিত্যের" মাসিক-সাহিত্য-সমালোচককে গালি দিয়াছেন। দীনেন্দ্র বাবু প্রথমেই অনুমান করিয়াছেন,—সাহিত্যের কোনও 'প্রচ্ছন্ননামা সমালোচক' তাঁহার গুর্জ্জরকাহিনীর সমালোচনা করিয়াছেন। তাহার পরই দীনেন্দ্র বাবু বলিতেছেন,—"নিজের ছাগল লেজের দিকে কাটিবার অধিকার সকলেরই আছে, সুতরাং সকলেই স্ব স্ব বক্তব্য নিজের কাগজে লিপিয়া আপনার লেখনী কণ্ডূয়ন চরিতার্থ করিতে পারে," ইত্যাদি। তাঁহার লেখার এই অংশ পড়িয়া মনে হয়,—"সাহিত্য" সম্পাদকই তাঁহার এই উক্তির লক্ষ্য। তবে দীনেন্দ্রবাবু প্রথমে তাঁহার সমালোচককে প্রচ্ছন্ননামা মনে করিলেন কেন? এই ভাবে দীনেন্দ্রবাবুর কি অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে, বলিতে পারি না। তাঁহার গালির উত্তরে তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়াই নিরস্ত হইতে পারিতাম; কিন্তু যে প্রসঙ্গে দীনেন্দ্রবাবু এই 'অযাচিত উপদেশদানে'র ও সৌজন্যপ্রকাশের অবকাশ পাইয়াছেন, সেই মূল প্রসঙ্গ সম্বন্ধে কিছু না বলিলে চলিতেছে না। আমাদের প্রথম অপরাধ, আমরা বলিয়াছিলাম, "লেখক পাঁচ ছয় মাস বরোদায় থাকিয়া তত্রত্য প্রত্যেক জাতির সম্বন্ধে যেরূপ অভিজ্ঞতার সঞ্চয় করিয়া আসিয়াছেন, সহসা তাহার উপর নির্ভর করিতে আমাদের ভরসা হয় না।"—লেখকের এত সযত্নসঙ্কলিত গালি খাইয়াও তাঁহার উপর নির্ভর করিতে আমাদের প্রবৃত্তি হইতেছে না। দ্বিতীয়তঃ, আমরা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম,—"এই অভিজ্ঞতা লেখকের পর্য্যবেক্ষণের ফল, না কোন শ্বেতাঙ্গের পূর্ব্বলব্ধ অভিজ্ঞতার বঙ্গীয় পুনরাবৃত্তি?"—"ভারতী" পত্রিকায় গুজরাট সম্বন্ধে গত আষাঢ় মাসে যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা দীনেন্দ্রবাবুর লিখিত; আশা করি, ইহা তিনি অস্বীকার করিবেন না।—ভাদ্রমাসে দীনেন্দ্রবাবু কৈফিয়তে বলিতেছেন,—

১। "গুজরাটে বাস করিয়া গুর্জ্জরদিগের সংস্রবে আসিয়া লেখক যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন সমালোচক মহাশয় তাহা 'কোনও শ্বেতাঙ্গের পূর্ব্বলব্ধ অভিজ্ঞতার বঙ্গীয় পুনরাবৃত্তি' বলিয়া সন্দেহ করিয়াছেন" ইত্যাদি।

আষাঢ় মাসের প্রদীপের গুর্জ্জরকাহিনী সম্বন্ধে লেখক এই কথা এখন বলিতেছেন।

২। কিন্তু ঐ আষাঢ় মাসেরই ভারতীতে গুর্জ্জর-চরিত্রের অঙ্কন-প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন,—"অল্প অভিজ্ঞতা লইয়া বিভিন্নদেশস্থ অপরিজ্ঞাত সমাজভুক্ত ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধে কোনও কথা বলা উচিত নহে; কিন্তু বরোদার ইতিবৃত্তলেখক, বর্ত্তমান মহারাজের ভূতপূর্ব্ব শিক্ষক মিঃ ইলিয়ট ইহাদের (গুজরাটীদের) সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—Their women dress scantily and have a poor name for chastity".—পৃঃ ২১৮, ভারতী।

৩। আষাঢ়ের প্রদীপের ২২৪ পৃষ্ঠায় বলিতেছেন,—"রমণীর পতিব্রতা ধর্ম্ম ইহাদের নিকট কিছু মাত্র গৌরবজনক নহে।" এই উক্তিটি কি পূর্ব্বোক্ত ইংরাজী উক্তির 'বঙ্গীয় পুনরাবৃত্তি' নহে?

আষাঢ় মাসের অনভিজ্ঞতাস্বীকার, এবং এখনকার অভিজ্ঞতার আস্ফালন, পাঠক, এতদুভয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন।

৪। আষাঢ়ের ভারতীতে "বরোদার জাতিতত্ত্বে" "কেড়োয়া কানবী" "ধেদ" এই যে দুইটি জাতিবাচক নামের উল্লেখ আছে, সে দুটির প্রকৃত উচ্চারণ "কড়ুওয়া কুণবী" ও "ধেড়" হইবে। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের "বোম্বাই-চিত্রে" প্রকৃত নাম দুটি পাওয়া যায়। সত্যেন্দ্র বাবু গুজরাটে পাঁচ ছয় মাসের অনেক অধিক কাল যাপন করিয়াছেন; তাঁহার গ্রন্থে যে নাম পাওয়া যাইতেছে, তাহাই প্রকৃত মনে করিলে অপরাধী হইব কি? সেই সঙ্গে ইহা বলিলেও বোধ করি প্রত্যবায় ঘটিবে না, দীনেন্দ্র বাবু ইংরাজী গ্রন্থ হইতে নামগুলি নকল করিয়া লইবার সময় স্থানীয় লোকদিগের সাহায্য লইলে এরূপ হাস্যজনক প্রমাদে পতিত হইতেন না।

এই সকল আভ্যন্তরীণ প্রমাণ দেখিয়া, এবং দীনেন্দ্র বাবুকে পূর্ব্বে না বলিয়া ইংরাজী পুস্তক হইতে কঙ্কাল সংগ্রহ করিয়া তাহাতে নিজের মাংসশোণিত লাগাইয়া 'নূতন' সৃষ্টি করিতে দেখিয়াছি বলিয়া, আমরা এই প্রশ্ন করিয়াছিলাম। সে জন্য কি আমরা এতই অপরাধী? আমাদের তৃতীয় অপরাধ,—আমরা বলিয়াছিলাম,—"গুজরাটী সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধির জন্য গুজরাটবাসীর যথেষ্ট চেষ্টা বিদ্যমান।"—দীনেন্দ্রবাবুর এই 'নিবেদন' পড়িয়াও আমাদের পূর্ব্বমত পরিত্যাগ করিবার কোনও কারণ দেখিতেছি না। অনুসন্ধানে যাহা অবগত হইয়াছি, তাহাতে আমাদের পূর্ব্ববিশ্বাস আরও দৃঢ়তর হইয়াছে। এ সম্বন্ধে আমাদের বন্ধুবর শ্রীযুত সখারাম গণেশ দেউস্কর মহাশয় আমাদের জিজ্ঞাসার উত্তরে যে পত্র লিখিয়াছেন, সেই পত্রখানি উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি,—"কিছু দিন পূর্ব্বে 'জ্ঞানপ্রকাশ' নামক প্রসিদ্ধ মারাঠী সংবাদপত্রে পড়িতেছিলাম,—'বোম্বাই বিভাগের সাহিত্য সম্বন্ধে অল্প দিন পূর্ব্বে যে সরকারী রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে, তৎপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, গত বৎসর উক্ত প্রদেশে সর্ব্বসমেত ৬২০ খানি নূতন গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ৯১ খানি মরাঠী ভাষায় ও ২৩৯ খানি গুজরাটী ভাষায় লিখিত। ঐ রিপোর্টে ইহাও প্রকাশ যে, গুজরাটী ভার্ণাকুলার সোসাইটীরহস্তে সাহিত্যোন্নতির জন্য বহুসংখ্যক মেমোরিয়াল ফণ্ডের অর্থ উৎসর্গীকৃত গচ্ছিত আছে। এবং গুজরাটী গ্রন্থকারগণ

ধনবান পার্শীদের নিকট হইতে অন্ন সাহায্য লাভ করেন না। মারাঠী গ্রন্থগুলির অবস্থা প্লেগের জন্য এবার এরূপ শোচনীয় হইলেও, সাধারণতঃ গুজরাটের সাহিত্যোন্নতিবিধায়ক সভা যেরূপ অর্থশালী, মারাঠী সাহিত্যসভা সেরূপ নহে। গত বৎসর গুজরাটী গ্রন্থগুলির মধ্যে ১৫ খানি গ্র্যাজুয়েটদিগের লিখিত। কিন্তু মারাঠী ভাষায় উক্ত বর্ষে ১০ জনের অধিক গ্র্যাজুয়েট লেখনী স্পর্শ করেন নাই। ইহা হইতেই গুজরাটীদিগের সাহিত্যোদ্যম প্রকাশিত হইতেছে।" ইহার পূর্ব্বেও অন্যান্য বৎসরের রিপোর্টের সমালোচনাকালে "কেসরী"র ন্যায় পত্রেও গুজরাটী-দিগের সাহিত্যোৎসাহের প্রশংসা ও তত্তুলনায় মারাঠী লেখকগণের ঔদাস্যের উল্লেখ করিয়া কয়েকবার আক্ষেপ প্রকাশ করা হইয়াছে, দেখিয়াছি। গুজরাটী সাহিত্যের যে গ্রন্থখানিকে শ্রীযুক্ত বাবু দীনেন্দ্রকুমার রায় গত আষাঢ়ের প্রদীপে 'কেরন ঘেল' নামে উল্লেখ করিয়াছেন, ঐ গ্রন্থের প্রকৃত নাম 'করণ বাঘেলা'। এই গ্রন্থখানি ও আর ২।১ খানি গুজরাটী উপন্যাস মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। 'বিবিধজ্ঞানবিস্তার' নামক মাসিকপত্রে যখন করণ বাঘেলা খণ্ডশঃ প্রকাশিত হইতেছিল, তখন আমি উহা স্থানে স্থানে পাঠ করিয়াছিলাম। মোটের উপর বইখানি ভাল হইয়াছে বলিয়াই আমার মনে হইয়াছিল।"

পাঁচ মাসের প্রবাসী দীনেন্দ্র বাবুর কথায় নির্ভর করিব, না গুজরাটীদের প্রতিবাসী, "কেসরী" ও "জ্ঞানপ্রকাশে"র মত প্রসিদ্ধ পত্রের সাক্ষ্য প্রত্যয় করিব? আর এক কথা,—যে হেতু শ্রীযুক্ত নারায়ণ হেমচন্দ্র 'পেচকের' অনুবাদে 'ভেক' লিখিয়াছেন, অতএব তিনি আত্ম-ত্যাগী নহেন, এ কিরূপ সিদ্ধান্ত? তাঁহার কৃত সমুদায় কর্ম্ম ভ্রান্ত, পণ্ড, নিষ্ফল হইতে পারে, কিন্তু তাহা বলিয়া তাঁহার মাতৃভাষানুরাগ, আত্মত্যাগ প্রভৃতিও তুচ্ছ করিতে হইবে, এমন কোনও বিধির বিধান আছে কি? যে পবিত্রভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি মাতৃভাষার সেবায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন,—তৎকৃত অনুবাদে সহস্র ভুল থাকিলেও, সেই পবিত্রভাবের মূল্য কমিবে না।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় এই "নিবেদনে" 'ভদ্রতা,' 'আত্মসংযম' ও 'রুচির' যে নমুনা দিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ মৌলিক। ইতঃপূর্ব্বে ভদ্রসমাজে পূর্ব্বোক্ত গুণাবলীর এরূপ মনোরম নমুনা আমরা দেখি নাই। এ জন্য লেখককে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি।

ভারতী। ভাদ্র। "চৌরপঞ্চাশিকা" একটি কবিতা,—কেবল শব্দসমষ্টি। "দেবী" গল্পটি মন্দ নহে। "গুজরাটে ভূত ছাড়ানো" প্রবন্ধে অনেক ভূতের ব্যাপার বর্ণিত হইয়াছে। "কিষ্কিন্ধ্যা" প্রবন্ধের লেখকের মতে, "যাঁহারা মহীশূর অঞ্চলে কিষ্কিন্ধ্যার অবস্থান নির্দ্দেশ করেন, পূর্ব্বোদ্ধৃত বাল্মীকির বচনগুলি তাঁহাদিগের মতের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। মহর্ষির বর্ণিত কিষ্কিন্ধ্যা মধ্যভারতের কোনও স্থানে অবস্থিত থাকাই সম্ভব বলিয়া মনে হয়।" "গেগেনশাইন" নাম শুনিয়া ভীত না হইলে, পাঠক প্রবন্ধমধ্যে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব পাইবেন। এবারকার "ভারতীতে" বিশেষজ্ঞ পাঠকদের জন্য কল্পিত "দ্বাদশ স্বীকার্য্য-বর্জ্জিত জ্যামিতি" ব্যতীত আর কিছু উল্লেখযোগ্য দেখিলাম না।

গৌড়স্তম্ভ।

Thacker, Spink & Co.'s Press, Calcutta.

Ak2 596
182.61
SL 1900

সামাজিক ব্যাধি ও তাহার প্রতীকার।

২

আমাদের মত দরিদ্রের পক্ষে ঐশ্বর্য্যশালীর অনুকরণচেষ্টা বস্তুতঃই অস্বাভাবিক। হয় ত এই দারিদ্র্যই আমাদের সকল ব্যাধির মূল। সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন, আমরা দরিদ্র। রাজপুরুষেরাও বলেন, আমাদের দেশের চারি আনা লোক প্রতিদিন অর্দ্ধাশনে যাপন করে। অথবা তাঁহাদের স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। এই সেদিনমাত্র ভারতের কোটি প্রজার অন্নসংস্থানের জন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মহারাজ্ঞীর প্রতিনিধি ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে লইয়া দেহি দেহি শব্দে পৃথিবীর লোকের দ্বারস্থ হইয়াছিলেন। বিগত দুর্ভিক্ষের সমালোচনায় নিযুক্ত কমিশনের রিপোর্ট স্বাক্ষরিত না হইতেই পশ্চিম ভারতে আবার রণবাদ্য বাজিয়া উঠিয়াছে; আবার বৃটিশ সিংহের চতুরঙ্গিনী সেনা দুর্ভিক্ষ দৈত্যের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য সাজ সাজ শব্দে আহূত হইয়াছে। ইহার উপর আর কথা নাই। আমাদের দারিদ্র্য ব্যাধির উপশম করিতে পারিলে হয় ত অন্যান্য উপসর্গ আপনা হইতে দূর হইতে পারিবে। সুতরাং এই দারিদ্র্যের কথাটা আমাদের বিশেষরূপে আলোচ্য।

আলোচ্য বটে; কিন্তু আলোচনা করিতে গেলেই আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। কেন না, দারিদ্র্যের কথা আনিতে গেলেই 'পলিটিকাল ইকনমি' নামক একটা বিকট শাস্ত্রের আশ্রয় লইতে হয়, এবং আমাকে কাতরভাবে স্বীকার করিতে হইতেছে যে, আপনাদের অনুগৃহীত এই দীন প্রবন্ধপাঠক উক্ত শাস্ত্রের প্রতি কস্মিন্‌কালে অনুরাগস্থাপনে সমর্থ হয়েন নাই। সুতরাং আমার আশা নাই যে, আমি ইহার সম্যক্ আলোচনায় সমর্থ হইব! দারিদ্র্যের কথা আনিতে গেলেই আমাদের আয় ব্যয়ের কথা, টাকা আনা গণ্ডার ভীষণ ষ্টাটিষ্টিক্‌স্ আসিয়া পড়ে; এবং পাটীগণিত শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তির অভাবে আমার ঐ লোমহর্ষণ অনুষ্ঠানে হাত দিতে স্বতঃই শঙ্কা হয়। পাঠশালায় পড়িবার সময় সঙ্কলন, ব্যবকলন, সন্তুয়সমুত্থান প্রভৃতি শব্দপরম্পরা কেবল রাত্রিযোগে দুঃস্বপ্নের সৃষ্টি করিত। আমার এরূপ ক্ষমতা নাই যে, হিসাব করিয়া আমাদের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে একটা যথাযথ উত্তর দিব। তবে পরের মুখে

দুই চারি কথা যাহা শুনিতে পাওয়া যায়, তাহারই সারসঙ্কলন পূর্ব্বক আপনাদিগের নিকট উপস্থিত করিতে চেষ্টা করিব।

আমরা দরিদ্র, সে বিষয়ে কাহারও কোন সংশয় নাই, কিন্তু সেই দারিদ্র্য বাড়িতেছে কি না, এই প্রশ্নের দুই রকম উত্তর শুনিতে পাওয়া যায়। এক উত্তর সরকারি, অন্য উত্তর বেসরকারি। অন্য দেশের কথা জানি না, কিন্তু আমাদের দেশে সাধারণতঃ প্রাকৃতিক ঘটনার তথ্যনির্ণয়েও সরকারি ও বেসরকারি দুই রকম সিদ্ধান্ত সচরাচর প্রচলিত আছে। দেশে দুর্ভিক্ষ হইয়াছে কি না? বেসরকারি উত্তর,—দুর্ভিক্ষে অর্দ্ধেক লোক মরিয়া গেল; সরকারি উত্তর,—দুর্ভিক্ষ কোথায়? সহরে প্লেগ আসিয়াছে কি না? সরকার যখন বলেন, প্লেগে বিস্তর লোক মরিতেছে, সাধারণের তখন স্থিরসিদ্ধান্ত, এ সমস্তই কবিকল্পনা। দারিদ্র্য সম্বন্ধে সরকারি উত্তর দেশ দরিদ্র, কিন্তু ইংরাজ শাসনের কল্যাণে উত্তরোত্তর ধনবৃদ্ধি হইয়া দারিদ্র্য দূরীভূত হইতেছে; বেসরকারি উত্তর, ইংরাজের শাসনে আমরা অত্যন্ত সুখে আছি সন্দেহ নাই, কিন্তু কিছু দিন পরে দেশে আর কাণা কড়িটিও থাকিবে না। এ রহস্য মন্দ নহে; কিন্তু রহস্যের সমালোচনায় কৌতুক ও শিক্ষা আছে। উভয় পক্ষে বহু দিন হইতে বিতণ্ডা চলিয়া আসিতেছে; উভয় পক্ষের তূণীর হইতে ক্ষুরধার যুক্তির বাণসমূহ সর্ব্বদা প্রক্ষিপ্ত হইতেছে; কিন্তু সমরে জয়পরাজয়ের অদ্যাবধি মীমাংসা হইল না।

বেসরকারি পক্ষ বলেন, তোমরা হোম চার্জ বলিয়া যে টাকাটা বৎসর বৎসর আপন দেশে লইয়া যাইতেছ, তাহা আমাদের নিছক লোকসান; ইংরাজ সৈনিক, ইংরাজ রাজপুরুষ যে টাকা এ দেশ হইতে লইয়া যায়, তাহার এক কড়াও আর এ দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করে না। দেশীয়ের হাতে শাসনকার্য্য ও শান্তিরক্ষার ভার দিলে দেশের টাকাটা দেশে থাকিত।

সরকারি পক্ষ বলেন, ঠিক্। কিন্তু এতকাল ত তোমরা দেশ শাসন করিয়া আসিতেছিলে, কিন্তু শান্তিরক্ষা করিতে সমর্থ হও নাই। বাহিরের শত্রু আসিয়া মাঝে মাঝে তোমাদের সর্ব্বস্ব লুঠিয়া লইত। অভ্যন্তরে দস্যু-তস্কর বর্গী পিণ্ডারীর অনুগ্রহে কাহারও ধন প্রাণ নিরাপৎ ছিল না, আমরা তোমাদিগকে শান্তি দিয়াছি। বহিঃশত্রুর ভয় নাই; ভিতরে নির্ব্বিবাদ শান্তি; সকলে এখন মনের সুখে পরিশ্রমের ফলভোগ করিবার অবসর পাইয়াছে। সহস্র গুণ দিবার জন্য সূর্য্যদেব রসগ্রহণ করেন; আমরাও পরিশ্রমের বেতনস্বরূপ এক গুণ গ্রহণ করি; তোমরা আমাদের আশ্রয়ে থাকিয়া

সহস্র গুণ লাভ করিয়া থাক। তোমরা শান্তির অবসর পাইয়া পরিশ্রমের দ্বারা ধনের উৎপাদন করিতে পারিতেছ, ধনের সৃষ্টি করিতে অবসর পাইয়াছ। তোমরা সহস্র গুণ ধন উৎপাদন করিবে; আমাদিগকে একগুণ বেতনস্বরূপ দিবে না কেন? আমরা কি পেটে না খাইয়া তোমাদের প্রহরীর কাজ করিব ও তোমাদের ঘরাও বিবাদের মধ্যস্থতা করিব?

আমরা নিরুত্তর হইয়া বলি, রাজপুরুষেরা, রাজকর্ম্মচারীরা তেমন অধিক লয়েন না বটে, কিন্তু এই ইংরাজ ব্যবসায়ীরা দেশের অনেক টাকা লইয়া যায়।

ও পক্ষ হাসিয়া বলেন, অরে মূর্খ, নীলকর ও চাকরের শুভাগমনের পূর্ব্বে এ দেশের মাটিতে নীলের ও চায়ের চাষ হইতে পারে, তাহা কয় জন লোকে জানিত? ইংরাজ ব্যবসায়ীর আগমনের পূর্ব্বে এ দেশের লোক রাণীগঞ্জের মাটি খুঁড়িয়া কয় মণ কয়লা তুলিত? আসামের জনশূন্য অরণ্যে হস্তী ভিন্ন তোমাদের মত হস্তিমূর্খ কতগুলি প্রতিপালিত হইত? ইংরাজ ব্যবসায়ী ও ইংরাজ কুঠিয়াল আসিয়া এ দেশের ছাই মুঠোকে কড়ি মুঠোয়, এ দেশের ধূলিমুষ্টিকে স্বর্ণমুষ্টিতে পরিণত করিয়াছে; লৌহকে স্পর্শমণিসংযোগে কাঞ্চনে পরিণত করিয়াছে। যখন ইংরাজের জাহাজ এ দেশে আসে নাই, তখন চীনাম্যানের জন্য কত কোটি টাকার আফিম এ দেশের জমি হইতে উৎপন্ন হইত? ভারতবর্ষে যে শস্যসম্পত্তির, যে রত্নসম্পত্তির কখনও অস্তিত্ব ছিল না, ইংরাজ আসিয়া সেই সম্পত্তির আবিষ্কার করিয়াছে। তাহার আবিষ্কৃত স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তির কতক ভাগ, সিংহের প্রাপ্য ভাগ, সে গ্রহণ করিবে, ইহাতে অন্যায় কি? কিন্তু তোমাদিগকেও ত সে একবারে ফাঁকি দেয় না। কত লক্ষ লক্ষ কৃষক, কত লক্ষ লক্ষ কুলিমজুর ইংরাজ কুঠিয়ালের আশ্রয়ে প্রতিপালিত হইতেছে, তাহার সংবাদ রাখ কি?

ইহার উত্তর নাই। আমরা তখন অন্য পথে ঘুরিয়া উত্তর দিই,—কিন্তু তোমাদের দেশের শিল্পীর দৌরাত্ম্যে আমাদের দেশীয় শিল্প লোপ পাইতে চলিল, শিল্পিকুল নিরন্ন হইয়া পড়িল, তাহার কি?

প্রতিপক্ষ বলেন, তোমাদের এ আবদার অসহ্য। এই অবাধ বাণিজ্যের ও স্বাধীন ব্যবসায়ের দিনে এ সকল আবদার শোভা পায় না। বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য—উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ। তোমাদের শিল্পিগণ প্রতিযোগিতায় হঠে কেন? তাহারা আমাদের মত কল কারখানা খুলিয়া আমাদের

তাহারা সেই মান্ধাতার আমলের সনাতন মার্গ ত্যাগ করিবে না, আমরা তাহার কি করিব? তোমরা অগ্রসর হইবে না বলিয়া আমরা ত আর পশ্চাতে ফিরিতে পারি না। আমরা স্বাধীন ব্যবসায় চাহি; কাহাকেও বাধা দিতে চাহি না; যাহার যেমন ক্ষমতা, সে তেমনি পন্থা দেখিয়া লউক।

অকস্মাৎ একটা উত্তর দিবার অবকাশ পাইয়া আমরা অমনি বলিয়া উঠি—ঐ ত, ঐ অবাধ বাণিজ্যই আমাদের সর্ব্বনাশের মূল। আমাদের নিরন্ন দেশের খাদ্যসামগ্রী, আমাদের ধান গোম, তোমরা অবাধ বাণিজ্যের নামে লইয়া যাইতেছ; পূর্ব্বে পাল-তোলা জাহাজের আমলে যাহা দশ বৎসরে লইয়া যাইতে, এখন রেল তার ষ্টীমারের আমলে তাহা দশ দিনে লইয়া যাইতেছ, ও তাহার বিনিময়ে কতকগুলা কাচ আর লোহা আর মাটি দিয়া আমাদিগকে প্রতারিত করিতেছ। এখন তোমাদের অবাধ বাণিজ্যের কল্যাণে টাকায় আট মণ চালের কথা আমাদের উপন্যাস হইতে চলিয়াছে; বাক্সে রৌপ্যমুদ্রা ও হাল আইন মতে স্বর্ণমুদ্রা সঞ্চিত থাকিলেও আমাদের অন্নাভাবে প্রাণবিয়োগ ঘটিবে।

প্রতিপক্ষ মহাশয় তখন দশনপ্রভায় শ্মশ্রুগহন মুখমণ্ডলের ধ্বান্তরাশি বিদূরিত করিয়া বলিতে থাকেন,—ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, টাকায় আট মণ চাল যেন তোমাদের পক্ষে উপন্যাসই থাকে। টাকায় আট মণ চাল কি ভীষণ কথা। এই কৃষিপ্রধান দেশের অধিকাংশ লোক কৃষিবৃত্তি দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে। এমন এক কাল ছিল, যখন সে তাহার সংবৎসরের পরিশ্রমের ফল শস্য, যাহা দস্যুর হস্ত হইতে ও দস্যু হইতেও ভয়ানক জমীদার ও তাঁহার পারিপার্শ্বিকগণের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া আপনার ও আপনার পরিজনবর্গের দেহরক্ষার জন্য সঞ্চিত করিতে সমর্থ হইত, তাহার বিনিময়ে সে কি পাইত? না, আট মণের বিনিময়ে একখণ্ড রজতমুদ্রা। এইরূপ বিনিময়-ব্যাপারের পর তাহার অন্যান্য দৈহিক প্রয়োজননির্ব্বাহ একরূপ অসাধ্যসাধন; হয় ত তাহার শীতনিবারণ ও লজ্জানিবারণও ঘটিত না। হয় ত ক্রেতার অভাবে তাহার ক্ষেতের ফসল মূষিকের উদরে যাইত, বা ক্ষেতে পচিত; তাহার রাজকরের সংস্থানও ঘটিয়া উঠিত না। আমাদের অনুগ্রহে ও স্বাধীন বাণিজ্যের অনুগ্রহে সে আর তাহার পরিশ্রমলব্ধ জীবনোপায় শস্যসম্পত্তি মূষিকের ও তস্করের ও নায়েব গোমস্তার উদরপূরণের জন্য গোলা বাঁধিয়া রাখে না; এখন নিজে উদর পূরিয়া খাইয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহার বিনিময়ে নানাবিধ

.য়াজনীয় সামগ্রী, হয় ত, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিলাসোপকরণ পর্য্যন্ত, সামান্য মূলে, আমাদের নিকট গ্রহণ করে, ও জীবনে আরাম ও স্বাস্থ্য উপভোগ করিবার অবসর পায়। একালে চাষার ছেলে ছাতা মাথায় দেয়, জামা গায়ে দেয়, জুতা পরে; চাষার গৃহিণী সোনায় রূপায় আপনার শ্যাম তনু অলঙ্কৃত করে; কৃষক গৃহস্থ এখন পোষ্টআফিস হইতে কুইনাইন খরিদ করে, এবং হয় ত শৌণ্ডিকালয়েও এক আধবার লব্ধপ্রবেশ হইয়া দিনান্তের পরিশ্রমজাত অবসাদ দূর করিবার অবকাশ পায়। সে কালের ধনী লোকে আইনি-আকবরির ব্যবস্থা মত বাদশাহী পোলাও চারি আনা খরচে প্রস্তুত করিত; কিন্তু তাই বলিয়া মনে করিও না যে, সেকালের কৃষকেরও ভাগ্যে শাকান্ন ভিন্ন অন্য সামগ্রী জুটিত। সেকালে সাত কোটি টাকা ব্যয়ে তাজমহল নির্ম্মিত হইয়াছিল; কিন্তু তাই বলিয়া মনে করিও না, সেকালের মজুর-রমণীরা মুক্তা পোড়াইয়া পান সাজিত। দেশের মধ্যে পলান্নভোজী কয় জন? আর শাকান্ন-ভোজীই বা কয় জন? পলান্নভোজনের খরচটা এখন হয় ত বাড়িয়াছে, কিন্তু শাকান্নভোজীর আরাম কমিয়াছে মনে করিবার কোন কারণ নাই।

তোমাদের দেশে যে এই ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ ঘটিতেছে, তাহার জন্য অবাধ বাণিজ্যকে দায়ী করিও না। প্রত্যুত দুর্ভিক্ষের জন্য ভারতবর্ষের ল্যাটিচুড্ বা অক্ষাংশ যতটা দায়ী, আমরা ততটা দায়ী নহি। দুর্ভিক্ষ সে কালেও ছিল; হয় ত আরও বেশী বেশী ছিল। কিন্তু প্রজার দুঃখের কাহিনী তখনকার ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করিবার অযোগ্য বিবেচিত হওয়ায় সকলে তাহা ভুলিয়া গিয়াছে। সে যাই হউক, আমরা কিছু জোর করিয়া প্রজার মুখের গ্রাস কাড়িয়া লই না। সে আপনার উদরপূরণের পর যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাই চোরের জন্য ও আগুনের জন্য না রাখিয়া আমাদিগকে ইচ্ছাসুখে বিক্রয় করে। স্বাধীন বাণিজ্য স্বাধীন ইচ্ছা হইতে উৎপন্ন। কৃষকেরা ইচ্ছাপূর্ব্বক আমাদিগকে তাহাদের ভুক্তাবশেষ প্রদান করিয়া তাহার বিনিময়ে বিলাসসামগ্রী গ্রহণ করে। তাহাদের স্বেচ্ছাক্রীত ঐ সকল বিলাসদ্রব্যই কি প্রমাণ করিতেছে না যে, তাহাদের অবস্থা দিন দিন ফিরিতেছে? তবে তাহারা যে যথোচিত উন্নতিলাভ করিতে পারিতেছে না, সে নানা কারণে। তাহারা তোমাদেরই স্বজাতীয়, সুতরাং গণ্ডমূর্খ, অদূরদর্শী, যন্ত্রবিদ্য, কুসংস্কারাপন্ন। তাহারা জাতি মানে, পেটে না খাইয়া মরিবে, অথচ বৃত্ত্যান্তর গ্রহণ করিবে না; ব্রাহ্মণের চতুরতায় ভুলিয়া তাহাকে যথাসর্ব্বস্ব অর্পণ করিবে; বিধবা পিসী-মাসী-সম্প্র-

গায়কে অকারণে খাইতে দিবে, অথচ তাহাদের বিবাহ দিয়া একটা গতি করিয়া দিবে না ; স্বয়ং ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বেই বিবাহ করিবে, এবং তৎপূর্ব্বেই সন্তানোৎপাদন করিয়া ঐহিক পিণ্ডের যোগাড় না থাকিতেও পারত্রিক পিণ্ডলাভের জন্য লালায়িত হইবে। এই জাতি যদি দরিদ্র না হয়, তবে হইবে কে ?

এই সকল যুক্তিবর্ষণের পর আমাদিগকে কাজেই নিরুত্তর হইতে হয়। বিশেষতঃ যখন যুক্তির অন্তরালে পীনাল কোডের একটা নূতন ধারা আকস্মিক আপতনের জন্য উন্মুখ হইয়া থাকে। আমাদের পক্ষে নিরুত্তর হওয়াই শ্রেয়স্কর। কিন্তু মনের মধ্যে একটা খট্‌কা থাকিয়া যায় ; সবই ঠিক্, কিন্তু তবু যেন কোথায় কি একটা গোল থাকিয়া গেল। বর্ত্তমান কালে আমাদের আয় বাড়িয়াছে সত্য কথা ; আয়ের বিবিধ নূতন পন্থা আবিষ্কৃত হইয়াছে সত্য কথা, কিন্তু আয়ের সঙ্গে কি ব্যয়ও বাড়ে নাই ? এবং ব্যয়ের অঙ্ক যাহা বাড়িয়াছে, তাহা কি ঠিক্ আমাদের ইচ্ছাক্রমেই বাড়িয়াছে ; এই ব্যয়বৃদ্ধিবিষয়ে কি আমাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে ? এক একটা ছেলে মানুষ করিতেই এখন খরচ পড়ে কত ? সেকালে ছেলেগুলা ভূমিষ্ঠ হইয়া 'উঙা উঙা' শব্দ করিত ; এ কালের ছেলেগুলা ভূমিস্পর্শ করিবামাত্র 'ডাক্তার আন, ডাক্তার আন' বলিয়া কাঁদিতে থাকে। ডাক্তার বাবু আসিয়া অনেককে ভবযন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি দিয়া ভবিষ্যতের খরচ কমাইয়া দেন, সুতরাং তাঁহার ভিজিটের টাকাটা নিতান্ত লোকসান মনে করা অন্যায়। কিন্তু দৈবাৎ যদি একটা ছেলে ডাক্তারকে ফাঁকি দিয়া পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করিল, অমনি তাহার স্কুলের খরচ যোগাইতে হইবে। ছাত্রবৃত্তি পাঠশালায় জ্যামিতি ও পরিমিতি ও ভূবিদ্যা ও পদার্থবিদ্যা ও ব্যাকরণ ও অর্থব্যবহার ও নীতিকথা ও তত্ত্বকথা প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক ও অবৈজ্ঞানিক শাস্ত্রগ্রন্থ সকলের ভীষণ ভার দুর্ব্বল শিশুর কণ্ঠরোধ করিয়া শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যাঘাত জন্মাইয়া জঠরাগ্নি নির্ব্বাপিত করিয়া গৃহস্থের ভাবী ব্যয়ের সংক্ষেপসাধনের আশা দেয় বটে ; কিন্তু আপাততঃ ঐ সকল শাস্ত্রগ্রন্থের মূল্য যোগাইতে গৃহস্থের প্রাণ অস্থির হয়। ছাত্রবৃত্তি পাশ করিয়া চাষার ছেলে আর লাঙ্গল ধরিতে চাহে না, কিন্তু আদালতের পেয়াদাত্ব গ্রহণ করিয়া নানা কৌশলে অর্থোপার্জ্জনে ব্যুৎপত্তি লাভ করে, ইহা নিতান্ত মন্দ নহে। কিন্তু ভদ্র গৃহস্থের ছেলেকে ইংরাজী পড়াইতে হয়। এন্‌ট্রান্স পাশ করিলে দূরদেশে কালেজে পাঠাইতে হয়। সেখানে কালেজের বেতন ও পুস্তকাদির হিসাবে যে খরচ পড়ে, থিয়েটারের পয়সা যোগাইতে তাহার তিন গুণ পড়িয়া যায়।

এত প্রয়াসের ফলে যাঁহারা উপাধিভূষিত হইয়া বাহির হয়েন, তাঁহাদের চাপ-স্নাশের ও সামলার মূল্যও সহজে আদায় হয় না। বিবাহ উপলক্ষে কিঞ্চিৎ অর্থাগমের আশা থাকিলেও অন্ধ বিধাতা সকলকে কেবল পুত্ররত্নে সৌভাগ্য-শালী করেন নাই।

এইরূপ সর্ব্বত্র। কি ধনী, কি দরিদ্র, সকলেরই ব্যয়ের অঙ্ক অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে। বিলাতী সভ্যতা যেখানে যে পরিমাণে প্রবেশ করিয়াছে, সেখানে সেই পরিমাণেই ব্যয়বাহুল্য হইয়াছে। আমাদের আয় বাড়িয়া থাকিলেও সঙ্গে সঙ্গে যদি ব্যয়ও সেই অনুপাতে বাড়িয়া থাকে, তাহা হইলে আমাদের অব-স্থার তেমন সুবিধা হইল কোথায়? অন্ততঃ আয় ব্যয়ের হিসাব করিতে গিয়া কোন্‌টা কত বাড়িয়াছে, তাহা না জানিলে আমাদের অবস্থা কিরূপ, তাহার নির্ণয় হইবে কিরূপে? সরকারি ও বেসরকারি উভয় পক্ষ কেবল আয়ের অঙ্ক বা কেবল ব্যয়ের অঙ্ক লইয়া আলোচনা করেন, উভয় দিক খতাইয়া দেখিলে এতদিন একটা মীমাংসা বোধ করি স্থির হইয়া যাইত। অথচ মীমাংসা এতকাল হইল না। ওয়েডারবর্ণ ও দাদাভাই নৌরজী ভারতবর্ষ দেউলিয়া হইল বলিয়া ক্রমাগত ষ্টেট্‌সেক্রেটারির কর্ণজ্বালার উৎপাদন করিতেছেন, ষ্টেট্‌-সেক্রেটারি ক্রমাগত জবাব পাঠাইতেছেন আমরা তোমাদিগকে ক্রমেই উত্তর দিক্‌পানের দরজার নিকট লইয়া যাইতেছি। আমাদের পক্ষে এরূপ স্থলে তুষ্ণীম্ভাবই বিধি।

যাঁহারা আমাদের ব্যয়বৃদ্ধি ও বিলাসিতাবৃদ্ধি দেখিয়া আমাদের অবস্থার স্বচ্ছলতা অনুমান করেন, তাঁহাদের সেই অনুমানের যাথার্থ্যে একটু সন্দেহ উপস্থিত হয়। অবশ্য অবস্থা ভাল না হইলে বিলাসের দিকে, খরচের দিকে, অনাবশ্যক অপব্যয়ের দিকে মানুষের মন যায় না, ইহাই সাধারণ নিয়ম; এবং যে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বিলাসের উপকরণ আহরণ করে, তাহার অবস্থার স্বচ্ছলতা স্বভাবতঃই অনুমেয়। ইহা স্বভাবেরই নিয়ম; মানুষ কিছু পেটে না খাইয়া বাবুয়ানার ভড়ং করে না। কিন্তু এই স্বাভাবিক নিয়মের কি কোথাও ব্যভিচার নাই? বুদ্ধিদোষে, সঙ্গদোষে, কর্ম্মবিপাকে, প্রকৃতির তাড়নায় মনুষ্য কি কখনও এই স্বাভাবিক নিয়ম হইতে ভ্রষ্ট হয় না? কুবেরপুত্রও আপনার অস্বাভাবিক প্রকৃতির তাড়নায় পৈতৃক ঐশ্বর্য্য নষ্ট করিয়া ভিক্ষাবৃত্তির অবলম্বনে বাধ্য হয়। ব্যক্তি-পক্ষে যাহা ঘটিতে পারে, ব্যক্তিসমষ্টি বা সমাজ-পক্ষে তাহা ঘটা কি একেবারে অসম্ভব? সমাজচক্র কি বর্ত্তমানকালে ঠিক্

স্বাভাবিক নিয়মেই চালিত হইতেছে? আমাদের সমাজে স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন ইচ্ছা, স্বাধীন বাণিজ্য প্রভৃতি শ্রবণনিনাদী শব্দসমূহ কি ঠিক্ অভিধান-প্রচলিত অর্থেই ব্যবহৃত হয়? ইহা ভাবিবার বিষয় ও আলোচনার বিষয়।

আমরা বর্ত্তমানকালে যে সর্ব্বাঙ্গীন শান্তি ও আরাম উপভোগ করিতেছি, সেই অবস্থা কি মনুষ্যসমাজের পক্ষে স্বাভাবিক অবস্থা হইতে পারে? আমাদের প্রভু জাতি মহামহিম, মহৈশ্বর্য্যশালী, মহাজ্ঞান, মহানুভাব, মহাশয়। কিন্তু আমরা তাঁহাদের তুলনায় সর্ব্বাংশেই ক্ষুদ্র। এবং বৃহত্ত্বের সান্নিধ্য ক্ষুদ্রের স্বাভাবিক ক্ষুদ্রত্বকে কি আরও ক্ষুদ্র করিয়া দেয় না? আমরা পাশ্চাত্য শিক্ষা লাভ করিয়া স্বাধীন চিন্তার অবকাশ পাইয়াছি বলিয়া ঘটা করিয়া বক্তৃতা করি; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমাদের সেই চিন্তা কি আমাদেরই চিন্তা? আমরা প্রাদেশিক শাসনকার্য্যে প্রভুশক্তি হইতে কতকটা ক্ষমতা লাভ করিয়াছি বলিয়া অহঙ্কার করিয়া থাকি; কিন্তু গত দুই সপ্তাহ কালের কাউন্সিল গৃহের যাঁহারা সংবাদ রাখেন, তাঁহারা কি বলিতে পারেন যে, সেই শাসন কি প্রকৃতই আমাদেরই আয়ত্ত?

আমরা বিলাতের লোকের সহিত স্বাধীনভাবে বাণিজ্য চালাইয়া থাকি; কিন্তু সেই বাণিজ্য কি সর্ব্বতোভাবেই স্বাধীন?

আমি রাজনীতির সম্পর্ক একবারে বর্জ্জন করিয়া নিতান্ত একাডেমিক অর্থে জিজ্ঞাসা করিতেছি, প্রবলের সাহায্যে যে দুর্ব্বল মুগ্ধ, তাহার স্বাতন্ত্র্য কোথায়? সূর্য্যালোকের সন্নিধানে খদ্যোতের স্বাভাবিক দীপ্তি কত দূর পর্য্যন্ত প্রকাশ পায়? মাতৃক্রোড়শায়ী স্তন্যপায়ী শিশুর কতকটা স্বাতন্ত্র্য আছে বটে, কিন্তু সে স্বাতন্ত্র্যের দৌড় কতটুকু? আমাদের দয়াময়ী ঘটোধ্নী গবর্মেণ্ট-জননী আমাদিগকে যে স্তন্যপীযূষদানে অহরহ তৃপ্ত রাখিয়াছেন, এবং ঘুমপাড়ানিয়া গান অবিরত কর্ণকুহরে ঢালিয়া দিয়া আরামের পালঙ্কে আমাদের ঘুম পাড়াইতেছেন, আমাদের এই পীযূষপানের ও সুখনিদ্রার ও স্বপ্নদর্শনের স্বাতন্ত্র্যের দৌড় কতটুকু?

আমাদের অবস্থা কতকটা হট্‌হাউসের যত্নপালিত চারার মত। আমরা যথা-সময়ে জল পাই, আলো পাই, শীতাতপ উপভোগ করি, আমাদের কীটের ভয় নাই, শিশিরের ভয় নাই, বড় বড় মহীরুহ যখন প্রভঞ্জনের সহিত মল্লযুদ্ধে পরাজিত হইয়া ভূমিশায়ী হয়, আমরা তখন গ্লাসকেসের ভিতর হইতে তাহাদের

স্থা দেখিয়া হাসিয়া থাকি; কিন্তু হায়! দৈববিধানে আমাদের প্রভুর যদি আমাদের প্রতি অনুগ্রহ শিথিল হয়, যদি আমাদের মালী মহাশয় একদিন আমাদিগকে জল যোগাইতে ও সার যোগাইতে ভুলিয়া যান, তবে সংসারের নিষ্ঠুর জীবন-দ্বন্দ্বে আমাদের ঔদ্ভিদিক জীবনের পরমায়ু কতটুকু হইয়া দাঁড়ায়?

আমাদের এই হট্‌হাউস-পালিত জীবনে স্বাভাবিকতা থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা আভিধানিক অর্থে নহে। অন্য সমাজে যে কারণে যে কার্য্যের উৎপত্তি হয়, আমাদের সমাজে সে কারণে সে কার্য্যের উৎপত্তি হয় না। পৃথিবীর ইতিহাস হইতে যে সকল সমাজতত্ত্বের সূত্র সঙ্কলন করিয়াছ, ভারতবর্ষের ইতিহাসে তাহার প্রয়োগ করিতে যাইও না।

আমি বলিতে চাহি যে, এই অস্বাভাবিকতাই আমাদের সমাজ-শরীরের সকল ব্যাধির নিদান; এখন ইহাই একমাত্র ব্যাধি; অন্য সকলই তাহার বিশেষ বিশেষ লক্ষণ বা উপসর্গমাত্র। অন্যান্য দেশে সমাজজীবন স্বাভাবিক নিয়মে প্রকৃতির সহিত দ্বন্দ্ব করিয়া বর্দ্ধিত হইয়াছে ও বিকাশলাভ করিয়াছে; আমাদের দেশে সমাজ পরপ্রদত্ত অনুগ্রহের উপর ভর করিয়া জীবনরক্ষা করিতেছে। পরে না বলাইলে আমরা বলিতে চাই না, কাজেই আমাদের বলিবার শক্তি কতটুকু আছে, সে বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। আমাদের গায়ে কতটুকু বল আছে, তাহা আমরা জানি না। আপনার সম্বন্ধে এই শোচনীয় অনভিজ্ঞতা হইতে আমাদের অক্ষমতার উৎপত্তি। যে কাজ আমরা সম্পাদন করিতে পারিব, তাহাতে আমরা হাত দিতে সাহস করি না; তাহা এই অনভিজ্ঞতার ফলে। যে কাজ আমাদের অসাধ্য, আমরা তাহাতে হাত দিয়া নিষ্ফল হইয়া থাকি ও উপহাস্য হই, তাহাও এই অনভিজ্ঞতা হইতে উৎপন্ন। আমাদের দেশের শিক্ষাপ্রণালী উচিতমত ফল উৎপাদন করিল না, ঠিক এই কারণে। আমাদের দেশে কোম্পানী খুলিয়া কারবার করিতে গেলে উদ্যম ব্যর্থ হয়, সেও এই কারণে। আমাদের ধর্ম্মসংস্কারের চেষ্টা, সমাজসংস্কারের চেষ্টা, সভা সমিতি মন্ত্রণা সমস্তই বাক্যমাত্রে পর্য্যবসিত হয়, তাহারও মূল কারণ এইখানে মিলিবে। আমরা আপন কর্ম্মের সম্পূর্ণ প্রভু নহি, আমাদের হৃদিস্থিত কোন হৃষীকেশ আমাদিগকে যে পথে চালাইতেছেন, আমরা সেই পথে চলিতেছি। আমাদের সংসারযাত্রা প্রকৃতপক্ষেই রঙ্গমঞ্চে অভিনয়; অথবা বুদ্ধিজীবী জীবের সম্পাদিত অভিনয় নহে; পরহস্তধৃত সূত্রবিলম্বিত পুত্তলিকার অভিনয়-

মাত্র। আমরা কোন উদ্দেশ্যসাধনের জন্য ইচ্ছাপূর্ব্বক কোন কাজ করি আমরা লোককে দেখাইতে চাই আমরা কাজ করি। আমরা গবেষণার ও পাণ্ডিত্যের অভিনয় করি, সাহেবদের কাছে প্রশংসালাভের জন্য; আমরা দেশ-হিতৈষিতার অভিনয় করি, বড় হইবার জন্য; আমরা বদান্যতার অভিনয় করি, উপাধিলাভের জন্য; আমরা সমাজসংস্কারের অভিনয় করি, আপনাকে জাহির করিবার জন্য; আমরা বিলাসিতার ও সাহেবিয়ানার অভিনয় করি, সভ্যতা ফলাইবার জন্য। জগৎ সংসার আমাদিগের অভিনয় দেখিয়া হাসে ও করতালি দেয়; আমরা মনে ভাবি, আমরা কেমন বীর। আমরা রঙ্গমঞ্চের বিল্বমঙ্গলের মত চীৎকার করিয়া প্রেমের আবেগের অভিনয় করি, এবং লোকের করতালি-ধ্বনি শুনিয়া মনে করি, প্রেমের বুঝি চীৎকারই স্বভাব। আমরা উদরান্নের সংস্থান না করিয়াও বিলাতী পণ্যদ্রব্যে ঘর সাজাই, বিলাতের বণিকেরা ভাবে, কেমন শীকার মিলিয়াছে। আমাদের বিলাসিতার বৃদ্ধি দেখিয়া আমাদের ধনবৃদ্ধি ঘটিয়াছে মনে করিও না; আমাদের শরীরে অভিনেতার চাকচিক্যময় পরিচ্ছদ দেখিয়া সেই পরিচ্ছদে আমাদের স্বামিত্ব কল্পনা করিও না।

বিলাতী পণ্যদ্রব্যের পরিবর্ত্তে আমাদের স্বদেশোৎপন্ন দ্রব্যে আমরা কাজ চালাইব, মাঝে মাঝে এইরূপ একটা তরঙ্গ উঠে। কিন্তু সর্ব্বত্র যেরূপ, এখানেও আমাদের চেষ্টা সেইরূপ বাক্যমাত্রে পর্য্যবসিত হয়; বিলাতের মত কলের সাহায্যে অল্পমূল্যে শিল্পদ্রব্য ও বিলাসের দ্রব্য প্রস্তুত করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই, অথচ বিলাসের দ্রব্য ব্যবহারে যথেষ্ট সখ আছে। আমাদের বর্ত্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকারী অস্বাভাবিক অবস্থায় এই সকল দ্রব্য নহিলেও একরকম চলে না; এরূপ অবস্থায় বাক্য ভিন্ন কার্য্যের সম্ভাবনাই বা কোথায়? যতদিন স্বদেশে বিলাসোপকরণ প্রস্তুত করিবার ক্ষমতা না জন্মিতেছে, ততদিন এই বিলাসিতাকে একটু সংযত করিতে পারিলেই ভাল হয়। কিন্তু এইরূপ সংযমের উপদেশ দেওয়া যতটা সহজসাধ্য, উপদেশমতে কাজ করা ততটা সহজ নহে। মনুষ্যের অন্তরের মধ্যে আরামের দিকে, স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে, বিলাসের দিকে একটা স্বাভাবিক টান আছে। বিশেষতঃ, মনুষ্যসমাজে যাহাকে সভ্যতা বলে, তাহার সহিত বিলাসপ্রিয়তার যেন একটা কিছু ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। সকল দেশেরই ইতিহাস একই রকম সাক্ষ্য দেয়। আমাদের এই ভারতবর্ষেই বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাবল্যের সময় যখন সংসারে আনুরক্তির প্রতি ও বিষয়স্পৃহার প্রতি ঘোরতর সংগ্রাম চলিয়াছিল, ভগবান্ বুদ্ধদেবের

গণ যখন সমস্ত জগৎ সংসারকে শূন্যপদার্থে পরিণত করিয়াছিলেন, এবং সেই শূন্যের প্রতি অনুরাগকে অজ্ঞানের ও মূঢ়তার পরাকাষ্ঠা বলিয়া প্রচার করিতেছিলেন, ঠিক্ সেই সময়ই তদানীন্তন সমাজে বিলাসের স্রোতেও যেন জোয়ারের বাণ ডাকিয়াছিল। তদানীন্তন প্রাচীন কাব্য ও প্রাচীন স্থাপত্য যাহা এ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান আছে, তাহাই তাহার প্রধান সাক্ষী। মনুষ্যের এই স্বাভাবিক বিলাসপ্রিয়তার ও আরামপ্রিয়তার সহিত সংগ্রাম, বোধ করি, নিরর্থক শ্রম। কিন্তু আমাদের বর্ত্তমানকালের বিলাসপ্রিয়তার যে অংশ পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণচেষ্টা হইতে উৎপন্ন, তাহা নিতান্ত অস্বাভাবিক; স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হইতে উৎপন্ন বিলাসপ্রিয়তার দমনের জন্য স্বভাবনির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা আছে। স্বাভাবিক প্রবৃত্তিমাত্রেরই একটা সীমা আছে; যখন শারীরিক অবসাদ উপস্থিত হয়, তখন আকাঙ্ক্ষারও তৃপ্তি হয়; কিন্তু যে প্রবৃত্তির মূল অস্বাভাবিক, তাহা শরীরের অবসাদ ও ইন্দ্রিয়ের গ্লানি সত্ত্বেও বিবিধ অস্বাভাবিক ইন্ধন সংগ্রহ করিয়া আগুনের মত ক্রমে ক্রমে জ্বলিয়া যায়। একটা অন্ধ অনুকরণপ্রবৃত্তি বা ফ্যাশান হইতে যাহার উদ্ভব, তাহার তৃপ্তি সহজে ঘটে না। আমাদের বিলাসিতা ও সাহেবিয়ানা অস্বাভাবিক; কেন না, ইহা আমাদের মত দরিদ্রের আর্থিক অবস্থার অনুরূপ নহে; এই সাহেবিয়ানা আমাদের পক্ষে শোভন হয় না; পরের নিকট ধার করিয়া যে জিনিস লওয়া যায়, তাহার উপর স্বত্ব স্বামিত্ব ও অধিকার অত্যন্ত শিথিল থাকে। পরের পোষাক শরীরে কোন মতেই মানায় না, প্রত্যুত অনেক সময় সংএর মত দেখায়। আবার আমাদের এই যে অন্ধ ফ্যাশানের অনুবৃত্তি, এই পরানুকরণচেষ্টা, ইহাকেও ঠিক স্বাধীন ইচ্ছা হইতে উৎপন্ন বলিতে পারি না; কেন না, এখন আমাদের অবস্থা এইরূপ দাঁড়াইয়াছে যে, ইচ্ছা না থাকিলেও ও সামর্থ্য না থাকিলেও লোক দেখাইবার জন্য ও পরকে দেখাইবার জন্য পরের খাতিরে আমাদিগকে সাহেব সাজিতে হয় ও সভ্যতা ফলাইতে হয়।

স্বভাবতঃ যে দরিদ্র, তাহার পক্ষে ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বর অস্বাভাবিক। স্বভাবতঃ যে ছোট, তাহার পক্ষে ছোট হইয়া থাকাই স্বাভাবিক। ক্ষুদ্র যদি অস্বাভাবিক বলপ্রয়োগ করিয়া বড় হইবার চেষ্টা করে, তাহার সেই অস্বাভাবিক প্রয়াসের পরিণাম কল্যাণপ্রদ হয় না। আমরা হুঙ্কার ও কলরবের সহিত বড় বড় কাজ করিবার জন্য প্রস্তুত হই, আর কাজ সফল হইল না

দেখিয়া নৈরাশ্যের আক্ষেপ করিতে থাকি। আমরা বামন হইয়া চাঁদ আশায় হাত বাড়াই, ও চাঁদ ধরা পড়িল না দেখিয়া শেষে চাঁদের নিন্দা করি। মানবশিশু হামাগুড়ি অভ্যাস করিয়া পরে চলিতে শিখে, আমরা বড়মানুষকে চলিতে দেখিয়া একবারে পদক্ষেপের জন্য দণ্ডায়মান হই; হামাগুড়ির অভ্যাস দরকার বোধ করি না। আমাদের যে সকল পৈতৃক স্বকীয় সম্পত্তি আছে, যাহা আমাদের পূর্ব্বপিতামহেরা পরম যত্নে সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা এখন পুরাতন, জীর্ণ ও মলিন, সেই জন্য সেই সকল সামগ্রীতে আমাদের মন বসে না; তাহাদের মালিন্য দূর করিতে, মরীচা সাফ করিতে আমাদের প্রবৃত্তি হয় না; আমরা চাক্‌চিক্যযুক্ত পরের দ্রব্য দেখিবামাত্র মুগ্ধনেত্রে তাহার প্রতি চাহিতে থাকি, এবং একটু অবসর পাইলেই তাহা আত্মসাৎ ও সিন্দুক-বদ্ধ করিবার চেষ্টা করি। কিন্তু আমরা মনে ভাবি না যে, পরের দ্রব্যের প্রতি এরূপ অনুরাগ নীতিশাস্ত্রসম্মত নহে, ও ইহার ফলে সেই দ্রব্যে আমাদের স্বামিত্ব কথনও স্বীকৃত হয় না, পরন্তু ধরা পড়িলেই কর্ণমর্দ্দনলাভ ঘটে। কিন্তু চিরকাল মর্দ্দন লাভ করিয়া আমাদের কর্ণ দুইটাও যারপরনাই সহিষ্ণু হইয়া পড়িয়াছে।

আমাদের মূল ব্যাধির একটা উৎকট উপসর্গ সম্প্রতি প্রকাশ পাইয়াছে। আমরা শক্তির অভাবে, অনুরাগের অভাবে, শ্রদ্ধার অভাবে, বুদ্ধির অভাবে, অভিজ্ঞতার অভাবে সকল কাজেই হাত দিয়া বিফলপ্রযত্ন হই, ও অবশেষে পরস্পরকে গালি দিতে আরম্ভ করি। এই জাতিকে গালি দেওয়া একালের লোকের একটা দারুণ ব্যাধি হইয়া পড়িয়াছে। আমরা প্রত্যেকেই ভাবি, আমি বড় বীর, কেবল আমার সঙ্গীদিগের কাপুরুষতাতেই লড়াইটা ফতে হইল না। একটা সুবিধা বা অবসর পাইবামাত্র আমরা প্লাটফর্ম্মে দাঁড়াইয়া বা খবরের কাগজে লিখিয়া আমাদের স্বজাতিকে গালি দিতে থাকি। যিনি ধর্ম্মসংস্কারক, তিনি উচ্চ কণ্ঠে বলিতেছেন, আমি বড় ধার্ম্মিক, আর তোমরা সকলে পাপপঙ্কে ডুবিয়া রহিয়াছ, ইহাতে ভারত-উদ্ধার হইবে কিসে? যিনি সমাজসংস্কারক, তিনি তারস্বরে চীৎকার করিতেছেন, আমি বড় সাহসী; আমি এইমাত্র আমার বৃদ্ধ পিতামহের পৈতা ছিঁড়িয়া দিয়া আসিয়াছি, এবং বৃদ্ধা পিতামহীর পাকা চুলে কলপ মাথাইয়া আসিতেছি, কেবল তোমাদেরই সৎসাহসের অভাবে ও কাপুরুষতায় আমরা সভ্যজগতে মুখ দেখাইতে পারিতেছি না। যাঁহার রাজদ্বারে কেরাণীগিরির দরখাস্ত গৃহীত হয় নাই, তিনি সংবাদ-

ত্র ঘোষণা করিতেছেন, দেশের শিক্ষিত-সম্প্রদায় যত দিন কেবল চাকরীর জন্য ব্যস্ত থাকিবেন, তত দিন ভারতের কোন আশা নাই। যিনি বড় সাহেবের কানমলা খাইয়া অক্লেশে হজম করিয়াছেন, তিনি হুঙ্কার ছাড়িতেছেন, যত দিন তোমরা স্বদেশের জন্য ও স্বজাতির জন্য ধন প্রাণ সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিতে না পারিবে, তত দিন তোমাদের মনুষ্যজন্ম অজাগলস্তনের ন্যায় নিরর্থক থাকিবে। যিনি আবার সমাজমধ্যে সুনীতির অভাবদর্শনে ব্যথিতপ্রাণ, তিনি সকলের উপর গলা তুলিয়া বলিতেছেন, তোমরা চরিত্র উন্নত কর, চরিত্রবল ব্যতিরেকে তোমাদের সকল চেষ্টাই পণ্ড হইবে।

এই দৃশ্য নিতান্ত মন্দ নয়। পরকে গালি দিলে নানা বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা। এখনি পীনাল কোডের নূতন ধারা আসিয়া সবেগে আপতিত হইতে পারে। বিলাতী বুট সকল সময়ে পীনাল কোডের দীর্ঘসূত্রিতা পছন্দ না করিয়া অন্যরূপ সরাসরি বিচারের ব্যবস্থা করে। এরূপ ক্ষেত্রে স্বজাতিকে গালি দেওয়াই সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপৎ। বিশেষতঃ পরের নিকট বাহবা পাইবারও ইহাতে অনেকটা সম্ভাবনা আছে। গালাগালি পর্ব্বের অভিনয়ের মত, দর্শক হাসাইবার উপায় আর নাই; এবং আমরা সংসারের রঙ্গমঞ্চে দাঁড়াইয়া পরস্পরের প্রতি মুখ খিঁচাইয়া পরস্পরকে গালি দিয়া যে বিকট অভিনয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছি, ইহাতে বিশ্বজগতের দর্শকবৃন্দের মধ্যে উৎকট হাস্যরসের অবতারণার সহিত যথেষ্ট করতালিলাভ হইবে, তাহাতে আর সংশয় কি?

শাস্ত্রে বলে, গৃহছিদ্র প্রকাশ করিতে নাই; কিন্তু আমরা আমাদের পুরাতন ঘরের চালে ও প্রাচীরে যেখানে যতগুলা ছিদ্র আছে, তাহার প্রত্যেককে লক্ষ্য করিয়া এক একটা দূরবীণ লাগাইয়া যত অনাত্মীয় অপরিচিত লোককে আমোদ দেখাইতেছি ও মনে করিতেছি, আমরা কেমন সত্যনিষ্ঠ, আমরা কেমন উদার। আমি পরকে দেখাইতে চাই, আমি কত ভাল, আমি কত উদার, আমি কত সভ্য; আর আমার সমস্ত আত্মীয় অনুচর প্রতিবেশী আমা হইতে কত নীচ, কত হেয়, কত অসভ্য। এইরূপ উদারতার নামান্তর আত্মদ্রোহ ও সমাজদ্রোহ, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।

এই গালাগালি পর্ব্বের অভিনয়টা আমাদের সমাজে এখন সমারোহের সহিত চলিয়াছে।

আমাদের ধনিসন্তানেরা বড়সাহেবদের চরণের জন্য তৈলনিষ্পীড়নার্থ সবেগে ঘানি চালাইতেছেন, আমরা গম্ভীরভাবে তাঁহাদিগকে গালি দিয়া থাকি।

আমাদের সংস্কারকেরা সভ্যতা ফলাইবার জন্ত সমাজের যেখানে যাহা ক্ষত আছে, তাহা পরের নিকট উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেখাইতেছেন, আমরা তাঁহাদিগকেও গালি দিয়া থাকি। আমাদের ধর্ম্মধ্বজীরা আপন আপন ধ্বজার নীচে দাঁড়াইয়া প্রতিবেশীকে পরকালের জন্ত প্রস্তুত হইতে বলিতেছেন ও সঙ্গে সঙ্গে আপনার ইহকালের বন্দোবস্ত পাকা করিয়া লইতেছেন, আমরা তাঁহাদিগকেও গালি দিয়া থাকি। আমাদের অধ্যাপক গোখলে মহাশয় বিধি-বিড়ম্বনায় বিড়ম্বিত হইয়া রাজার নিকট বিনীতভাবে ক্ষমাভিক্ষা করিলেন, আমরা তাঁহাকেও কাপুরুষতার জন্ত ধিক্কার দিলাম, আমরা প্রত্যেকেই এক একটা বালগঙ্গাধর তিলক। অথচ আমাদের প্রত্যেক শ্রেণীর প্রত্যেক সম্প্রদায়ের প্রত্যেক কার্য্যই অস্বাভাবিক মূলে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া নিষ্ফল হইয়া থাকে, ও যাঁহারা গালি দেন, তাঁহাদেরও নৈতিক সাহস ও চরিত্রবল ও পুরুষকার যে সমধিক উন্নত, তাহার কোন প্রমাণ এ পর্য্যন্ত উপস্থিত হয় নাই। ইহা অপেক্ষা অস্বাভাবিক হাস্তকর দৃশ্ত আর কি আছে?

আমার অনুগ্রাহক শ্রোতৃবর্গ হয় ত এতক্ষণ মনে মনে হাসিতেছেন, ও বলিতেছেন, বর্ত্তমান প্রবন্ধপাঠকও উপদেশের ছলে বেশ এক চোট গালি দিয়া লইলেন! প্রবন্ধপাঠকও দুনিয়ার বাহির হইতে চাহেন না, এবং বর্ত্তমান কালের বাঙ্গালীজাতির একমাত্র কার্য্য বাদ দিলে প্রবন্ধের জন্ত বিষয় পাওয়াই দুর্ঘট হইয়া উঠে। যদি অদ্যকার এই প্রহসনের অভিনয়ের পর মুহূর্ত্তেই আমাদের জাতীয় জীবনের এই অঙ্কে যবনিকাপতন হয়, তাহা হইলে আমি আপনাকে নিতান্ত সৌভাগ্যশালী জ্ঞান করিব। আমরা দুর্ব্বল, সুতরাং বিশ্বজগতের সকলেরই আমাদিগকে গালি দিবার সম্পূর্ণ অধিকার রহিয়াছে, এবং তাঁহারা সেই অধিকারের সদ্ব্যবহারেও ক্রটী করেন বলিয়া বোধ হয় না। মেকলের মত মকর তিমিঙ্গিল হইতে ডেলীমেলের ষ্টীভেন্সের মত ফরফরায়মান শফরী পর্য্যন্ত সকলেই সেই অধিকারের সম্যক্‌ ব্যবহার করিয়া আসিয়াছেন। যখন বসুধাব্যাপী কুটুম্বসমাজ সকলেই আমাদিগকে গালি দিতেছেন, তখন দিন কতক আপনাকে আপনি গালি না দিলেও শ্রবণেন্দ্রিয়ের অতৃপ্ত থাকিবার সম্ভাবনা নাই। অনেকে বলিয়া থাকেন, নিজের দোষ নিজে না দেখিলে চরিত্রশোধনের উপায় থাকে না; কথাটা সত্য কথা; কিন্তু কেবলই দোষের আলোচনায় কেবল আত্মগ্লানির অবতারণা করে। প্রতিনিয়ত আপনার ক্ষুদ্রত্বের আলোচনা করিলে ক্ষুদ্রত্বই ক্রমে জীর্ণতর হইতে থাকে; কেবলই

পনার দৌর্ব্বল্যের বিষয় ভাবিলে স্নায়ুযন্ত্র আরও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। সংসারে বাহুবলে যাহা সম্পন্ন হয় না, তাহা মনের বলে অনেক সময় সম্পন্ন হইয়া যায়। মানসিক বল দুর্ব্বল বাহুতে অনেক সময়ে দৈত্যের শক্তি আনিয়া দেয়। ইংরাজীতে যাহাকে বলে confidence, আপনার শক্তিতে অতিবিশ্বাস, তাহা সাংসারিক উন্নতির পক্ষে অনেক সময় অনুকূল হয়। এই বৃহৎ জগতের মধ্যে ক্ষুদ্রের ও দুর্ব্বলের ও দরিদ্রের স্থান যে একবারে নাই, এমন নহে। আমাদের দৌর্ব্বল্য ও ক্ষুদ্রত্ব লইয়া যদি আমরা প্রবলের দ্বারে ভিক্ষাবৃত্তি করিতে যাই, তাহা হইলে আমাদের অবমাননা অবশ্যম্ভাবী। আমাদের দারিদ্র্য লইয়া যদি ঐশ্বর্য্যশালীর পশ্চাতে দাঁড়াইয়া চাটুকারবৃত্তি অবলম্বন করিতে যাই, তাহা হইলে আমাদের মনুষ্যত্বের অবমাননা অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু যদি ঐশ্বর্য্য হইতে ও বৃহত্ত্ব হইতে যথাসম্ভব দূরে থাকিয়া আমাদের ভগ্নকুটীরমধ্যে আমাদের পুরাতন জীর্ণ গৃহসজ্জাগুলির মধ্যে যাহা আমাদের নিজস্ব,অথবা যাঁহাদের শোণিত আমাদের ধমনীমধ্যে বহিতেছে—উঁহাদের নিকট হইতে প্রাপ্ত, পরের নিকট ভিক্ষালব্ধ বা ঋণলব্ধ নহে, তাহারই মধ্যে আমরা স্থির হইয়া থাকি, তাহা হইলে আমাদের মনুষ্যত্বের গৌরব কি কিছু বাড়িবে না? ভগ্ন কুটীর কি অট্টালিকার প্রতি অবজ্ঞার দৃষ্টিনিক্ষেপে সাহসী হইবে না? আমাদের সমাজশরীরে কি ধনসঞ্চয় ঘটিবে না? প্রকৃতি ও কাল কি চিরদিনই আমাদের প্রতিকূল থাকিবে?

অদ্যকার এই ধরাপৃষ্ঠে যে সকল জাতি জ্ঞানের ও গৌরবের ও মাহাত্ম্যের ধ্বজা ধরিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে আমাদের স্থান নাই। জ্ঞানের সহিত জ্ঞানের, শক্তির সহিত শক্তির, ঐশ্বর্য্যের সহিত ঐশ্বর্য্যের, জাতির সহিত জাতির ভীষণ প্রতিদ্বন্দ্বিতার কোলাহলে দিঙ্মণ্ডল আপূরিত হইতেছে, আমাদের ক্ষীণ কণ্ঠ সেই কোলাহলের তীব্রতাবর্দ্ধনে অধিকারী নহে। কিন্তু আমরা যদি সেই উচ্চ কোলাহল, উৎকট উদ্যম ও অমানুষিক চেষ্টা দেখিয়া আত্মবিস্মৃত হইয়া কেবল মুগ্ধের ন্যায় চাহিয়া থাকি, এবং আত্মগ্লানি ও আত্মাবমাননার অভ্যাস দ্বারা আপনাদিগকে জড়পদার্থে পরিণত করি, তাহা হইলে আমাদের ভবিষ্যৎ বড় ভয়াবহ। পরন্তু যদি আমরা আমাদের প্রাচীন পুরাতন সভ্যতার ও মাহাত্ম্যের ভগ্নাবশেষের অন্তরালে দণ্ডায়মান থাকিয়া সার্ব্বভৌমিকত্বের অসার উপহাস্য আস্ফালন ত্যাগ করিয়া আমাদের সীমাবদ্ধ সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে বিজনে লোকনয়নের অসাক্ষাতে আমাদের কালা-

স্বরূপ ও দেশানুরূপ ও অবস্থানুরূপ সাধনা অভ্যাস করিয়া ধনসঞ্চয়ে প্রবৃ
হই, তাহা হইলে ভবিষ্যতের ইতিহাস অন্যরূপ আকার ধরিতেও পারে।

আমার এই সুদীর্ঘ প্রস্তাবের উপসংহারের পূর্ব্বে আমার এতক্ষণের স্বজাতিনিন্দা-রূপ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ যদি একবার স্বজাতির গৌরব-কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে শ্রোতৃবর্গ আমাকে উপহাস করিবেন না। আমাদের কলকারখানা নাই, আমরা জয়েণ্টষ্টক কোম্পানি চালাইতে পারি না, আমাদের দেশলাইয়ের কারখানা চলিল না, আমাদের প্রবিন্শিয়াল রেল-ওয়ের শকটশ্রেণী অতি মন্থরগতিতে চলিতেছে, এই মনে করিয়া হা হুতাশ করিয়া বিশেষ কোন লাভ নাই। আমাদের বর্ত্তমান অস্বাভাবিক অবস্থায় আমাদের উদ্যমের নিষ্ফলতাই স্বাভাবিক। স্বতন্ত্র জাতি যাহা দশ বৎসরে শিখিয়াছে, আমাদের মত পরতন্ত্র জাতিকে তাহা শত বৎসরে শিখিতে হইবে, পুনঃপুনঃ ঠেকিয়া শিখিতে হইবে; এবং এই অবস্থাতেও আমরা যে অকর্ম্মণ্য হেয় জীব নহি, তাহাও নানা স্থানে সপ্রমাণ হইয়াছে। বর্ত্তমান কালকে যাঁহারা জাতীয় জীবনের নবাভ্যুদয়ের কাল বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, আমি কখনই তাঁহাদের মতের অনুমোদন করিতে পারি নাই; শত শত বৎসরের অন্ধকারের পর যাঁহারা নূতন জ্যোতির আবির্ভাব দেখেন, তাঁহাদের নেত্রদ্বয়ের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আমার সন্দেহ আছে। আমি বর্ত্তমান কাল ও বর্ত্তমান কালের অব্য-বহিত পূর্ব্বের মুসলমানি কালকে জাতীয় জীবনের অপরাহ্নমাত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিব। তবে এই অপরাহ্নের পরে সন্ধ্যা আসিবে কি না, তাহা বলিতে আমি সমর্থ নহি। আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণের মানসিক প্রতিভাবলে আমা-দের সমাজতন্ত্র এরূপে গঠিত ও পরিচালিত হইয়াছে যে, বৌদ্ধ চার্ব্বাক নানকপন্থী কবীরপন্থী চৈতন্যপন্থী প্রভৃতি অন্তঃশত্রু ও শকপহ্লব হূনযবনাদি বহিঃশত্রুর পুনঃ পুনঃ আক্রমণেও উহা অদ্যাপি ভাঙ্গিয়া যায় নাই; পরন্তু যখন যে নূতন জাতির সহিত উহাকে দ্বন্দ্ব করিতে হইয়াছে, সেই দ্বন্দ্বের ফলেই আপনি নূতন শক্তির সঞ্চয় করিয়া নূতন বলে আপনাকে জীবিত রাখিয়াছে। সেই জন্য এই বর্ত্তমান অবস্থাতেও আমাদিগের গৌরব করিবার আছে। বর্ত্তমান কালে আমাদের মধ্যে সেক্‌সপীয়ার জন্মেন নাই, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র জন্মিয়াছেন; অর্দ্ধ শত বৎসর পাশ্চাত্যবিজ্ঞানশিক্ষার প্রভাবে মাইকেল ফ্যারাডে জন্মেন নাই, কিন্তু আমরা জগদীশচন্দ্রকে পাইয়াছি। বিজ্ঞানপ্রধান ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্তিমকালে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকসমাজের অগ্রণিগণ জড় পদার্থের ও আকা-

স্বরূপনির্ণয়ার্থ যে মহতী চেষ্টায় নিযুক্ত আছেন, আমাদের এই পতিত সমাজের অন্তর্ভুক্ত আমাদেরই পরিচিত কোন পরমাত্মীয় ব্যক্তি উদাসীন স্বদেশীয়গণের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে বৈদেশিকগণের সন্দেহাকুল নয়নের সম্মুখে দাঁড়াইয়া সহস্র বিঘ্ন সত্বেও পদার্থবিজ্ঞানের সেই মহাতথ্যের অনুসন্ধানে সাহায্য করিতে সমর্থ হইয়াছেন, ইহা আমাদের জাতীয় জীবনের ইতিবৃত্তে শ্লাঘার ঘটনা বলিয়া বিবেচনা করি।

বর্ত্তমান কালেও যদি গৌরবের কথা না পাওয়া যায়, আমরা আমাদিগের অতীত ইতিহাসে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিব। অতীতের নাম উল্লেখ করিবামাত্র এক সম্প্রদায়ের লোক আমার প্রতি ভীতিবিহ্বল নেত্র স্থাপিত করিবেন। তাঁহারা ভাবিবেন,—হয় ত আমি আমার স্বদেশীয়গণকে ভবিষ্যতের মুখে অগ্রবর্ত্তী হইতে নিষেধ করিয়া অতীতের মুখে পশ্চাদ্বর্ত্তী হইতে আহ্বান করিব। তাঁহাদের আগে চলা বন্ধ করিতে বলিয়া পাছু হঠিতে উপদেশ দিব। কিন্তু প্রথমেই বলিয়া রাখি, তাঁহাদের এরূপ আশঙ্কার কোন কারণ নাই। সমাজ-ঘড়ীর কাঁটাকে ফিরাইয়া দিবার আমার আদৌ প্রবৃত্তি নাই। কলিযুগের এই ভয়াবহ প্রকোপের সময় আবার যে অশ্বমেধ ও সোমযাগের প্রথা প্রবর্ত্তিত হইবে, এরূপ আমার ভরসা নাই। আবার যে মন্বত্রিবিষ্ণুহারীতের অনুশাসনমতে আমাদের সমাজযন্ত্র সর্ব্বদা চালিত হইবে, এরূপ আমার আশা নাই। বালকেরা স্কুলে এড্‌মিশনের সময় যে আবার মুণ্ডিতশিরা হইয়া অজিন কাষায় ধরিয়া স্কুলগৃহে প্রবেশ করিবে, তাহার আমি ভরসা করি না। নূতন গ্রাজুয়েট যে তাহার গাউন হুড্‌ পরিত্যাগ করিয়া গোলদিঘীতে স্নানের পর সমাবর্ত্তন করিবে, তাহারও আমি আশা করি না। কিন্তু যে প্রাচীন সমাজ মানবসভ্যতার প্রত্যূষকাল হইতে সংসারের জীবনদ্বন্দ্বে সহস্র আঘাত সহস্র নিষ্ঠুর আক্রমণ সহ্য করিয়াও আজ পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতে সমর্থ হইয়াছে, সেই প্রাচীন সমাজকে আমি নমস্কার করি। যে পুরাতন ধর্ম্মমার্গ এই পুরাতন সমাজকে বিঘ্ন বিপত্তি হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহাকে আমি অকপটভাবে ভক্তি করি। যে পুরাতনী বাণী পুরাণ কবি বিশ্ববিধাতার চতুর্ম্মুখ হইতে সমীরিত হইয়া প্রজাপতিপরম্পরায় ও ঋষিপরম্পরায় ও শাস্ত্রকারপরম্পরায় ও অধ্যাপকপরম্পরায় বিবিধ ছন্দে, বিবিধ ঝঙ্কারে, ধ্বনিত হইয়া আজ পর্য্যন্ত বিশ্বজগতে প্রতিধ্বনির উৎপাদন করিতেছে, সেই চতুষ্টয়ী বাণীর সম্মুখে আমি ভক্তিসহকারে প্রণত হই।

যদি আমাদের সামাজিক ব্যাধির কোন ফলপ্রদ চিকিৎসা আবিষ্কৃত তাহা এই আত্মসমাজের প্রতি অকপট শ্রদ্ধা ও অবিচলিত ভক্তি। যদি অকৃত্রিম স্বদেশহিতৈষা ও স্বজাতিপ্রিয়তা আমাদের মধ্যে কখনও উৎপন্ন হয়, তাহা হইলেই আমাদের অবস্থার অস্বাভাবিকতা দূর হইবে, আমাদের সামাজিক ব্যাধির প্রতীকার হইবে। যদি আমরা কখনও রঙ্গমঞ্চের অস্বাভাবিক প্রহসনের অভিনয় ত্যাগ করিয়া প্রকৃত মনুষ্যোচিত কর্ম্মক্ষেত্রে বিচরণ করিতে চাই, আমাদের এই প্রাচীন সমাজের প্রতি অকপট শ্রদ্ধা হইতেই সেই ক্ষমতা উৎপন্ন হইবে। যাঁহারা এই পুরাতন সমাজের সহিত সকল সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়া বিদেশ হইতে আনীত বা চৌর্য্যলব্ধ উপকরণ দ্বারা নূতন সমাজ গড়িতে চাহেন, তাঁহারা মূলচ্ছেদনের পর শাখা হইতে ফলপ্রাপ্তির কামনা করেন। যাঁহারা এই পুরাতন সমাজকে অদ্য হীনবল ও অধঃপতিত ও শাসনবিষয়ে অসমর্থ দেখিয়া ইহার প্রতি নির্ম্মম বিদ্রূপবাণীর প্রয়োগ করেন, তাঁহাদের কাপুরুষত্ব অবজ্ঞেয়।

কিন্তু বলিতে দুঃখ হয়, আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালী আমাদের সমাজের প্রতি এই অকৃত্রিম শ্রদ্ধার উৎপাদনে সমর্থ হয় নাই। আমরা বিজাতীয় সমাজের সম্বন্ধে যে সংবাদ রাখি, আমাদের আত্মসমাজের সম্বন্ধে সে সংবাদ রাখা আবশ্যক বোধ করি না। বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর ফলে কবি জন্মিয়াছেন, ঔপন্যাসিক জন্মিয়াছেন, বাগ্মী জন্মিয়াছেন, রাজনীতিকুশল ব্যক্তি জন্মিয়াছেন, গণিতবিৎ ও বৈজ্ঞানিক পর্য্যন্ত জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু ভারতবর্ষের পুরাকালের ও বর্ত্তমানকালের সমাজতত্ত্বের শ্রদ্ধার সহিত আলোচনা করেন, শিক্ষিতসম্প্রদায়মধ্যে এরূপ উদাহরণ নিতান্তই বিরল। ভারতবর্ষের বিবিধধর্ম্মী, বিবিধকর্ম্মী ত্রিশ কোটি মনুষ্যের ভাষাতত্ত্ব, আচারতত্ত্ব, ধর্ম্মতত্ত্ব প্রভৃতির আলোচনা অদ্যাপি বৈদেশিকের হস্তে রহিয়াছে। আমাদের মধ্যে যাঁহারা অত্যন্ত গম্ভীরভাবে বৈদেশিক সমাজের ইতিবৃত্ত ও সমাজতত্ত্বের আলোচনা করেন, তাঁহারা স্বদেশের ইতিবৃত্ত ও সমাজতত্ত্বের আলোচনায় সম্পূর্ণ উদাসীন। ভারতবর্ষের পুরাবৃত্তের ও সমাজতত্ত্বের কথায় তাঁহারা হয় ত সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য দেখান, অথবা অবজ্ঞার ও অশ্রদ্ধার হাসি হাসিয়া থাকেন। আমাদের প্রাচীন বা বর্ত্তমান সমাজের প্রতি যাঁহাদের ভক্তি নাই বা অনুরাগ নাই, তাঁহাদের কথা ছাড়িয়া দিলাম। যাঁহারা হিন্দুয়ানির নবোত্থিত ধ্বজার নিম্নে দণ্ডায়মান থাকিয়া আপনাদিগকে প্রাচীন সমাজতত্ত্বের ও সনাতন ধর্ম্মের একান্ত পক্ষপাতী

য়া পরিচয় দিয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যেও এই ঔদাসীন্য ও এই অবজ্ঞা দেখিয়া ব্যথিত হইতে হয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা ভারতবর্ষের পুরাবৃত্তের আলোচনা করিয়া যে সকল তত্ত্বের আবিষ্কার করিতেছেন, তাহার যাথার্থ্যে তাঁহাদের শ্রদ্ধা না থাকিতে পারে, কিন্তু তাঁহারাও ত প্রকৃততত্ত্বনিরূপণের জন্য শ্রম স্বীকার করেন না, এবং পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা যে সকল ভ্রমসঙ্কুল মিথ্যাবাদের প্রচার করিতেছেন বলিয়া তাঁহাদের বিশ্বাস আছে, সেই সকল মতের অযৌক্তিকতাপ্রতিপাদনের জন্য যে পরিশ্রম, যে গবেষণা, যে অধ্যবসায় আবশ্যক, তাহাও স্বীকার করেন না। এই ঔদাসীন্যে, এই অনুরাগের অভাবে, তাঁহাদের সমাজভক্তির অকৃত্রিমতায় সন্দেহ থাকিয়া যায়। আমার বোধ হয়, বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীই তাঁহাদের এই ঔদাসীন্যের জন্য ও অবজ্ঞার জন্য দায়ী। যে প্রণালী জাতীয় ভাবের ভিত্তির উপর স্থাপিত নহে, তাহাতে প্রকৃত স্বজাতি-অনুরাগ ও স্বদেশ-অনুরাগ আনিতে পারে না, কেবল স্বজাতির প্রতিও একটা কৃত্রিম অন্তঃসারশূন্য মৌখিক আসক্তির ছদ্মভাব উৎপাদন করে মাত্র।

আমাদের শিক্ষিতসমাজের মধ্যে আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, তাঁহারা বলেন, ভারতবর্ষের পুরাতত্ত্বে শিখিবার কথা আছেই বা কি যে, সে দিকে সময় নষ্ট করিব? গোটাকতক শিলালিপি ও খানকতক তাম্রশাসন ও কয়েকখানা প্রক্ষিপ্তোক্তিপূর্ণ কীটদষ্ট গ্রন্থমাত্র যে পুরাতত্ত্বের অবলম্বন, তাহার সমালোচনায় ফল কি? গ্রীসের ইতিহাস আছে, রোমের ইতিহাস আছে, রোম সাম্রাজ্যের বিশাল কলেবর ছিন্নভিন্ন হইয়া যে সকল খণ্ডরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকেরই ধারাবাহিক প্রামাণিক ইতিহাস আছে। সেই সকল ইতিহাস হইতে মনুষ্যজাতির বিবিধ অবস্থাবিপর্য্যয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য রঙ্গমঞ্চে যে মহানাটকের অভিনয় ম্যারাথনের দিন হইতে ওমডুরমানের দিন পর্য্যন্ত অভিনীত হইতেছে, তাহার প্রত্যেক দৃশ্য, প্রত্যেক অঙ্ক, প্রত্যেক অভিনেতার নাট্যপ্রণালী উজ্জ্বলালোকে দৃষ্টিপথবর্ত্তী হয়। ভারত-সমাজের সেরূপ ইতিহাস কোথায়?

কথাটা সম্পূর্ণ সত্য, কিন্তু যুক্তিটা সম্পূর্ণ অসার। ভারতের ইতিহাস নাই বলিয়া কি সেই ইতিহাসের উদ্ধারে আমরা প্রযত্ন করিব না? শিলালিপি ও তাম্রশাসন ও কীটদষ্ট গ্রন্থ যে কয়েকখানা আছে, তাহা সকলই কি

সমাজের বিকৃত ইতিহাসের সৃষ্টি করিবে? যে দেশের প্রাচীন ইতিহাস দে-গণের ভক্তি আকর্ষণে সমর্থ হয় না, সে দেশের সামাজিকগণের মধ্যে প্রকৃত স্বজাতিবাৎসল্য জন্মিতে পারে না। সভ্যতাগর্ব্বিত ইংরাজরাও আপনাদের ঊনবিংশ শতাব্দীর উন্নতির ও ঐশ্বর্য্যের ও পরাক্রমের অঙ্কুর সার্দ্ধ সহস্র বৎসর পূর্ব্বের জর্ম্মন জলদস্যু ও বনদস্যুদের সমাজমধ্যে বিকশিত দেখিয়া কতই গর্ব্ব ও আনন্দ অনুভব করেন, আর আমাদের এই পুরাতন সভ্যতার স্রোত মানবেতিহাসের অজ্ঞাত কোন্ পুরাকাল হইতে সিন্ধুতটবাসী হিন্দুসমাজ হইতে, কাস্পীয়তটবাসী আর্য্যসমাজ হইতে, বা কোন্ অজ্ঞাত-মহাসিন্ধু-তট-বাসী কোন্ অজ্ঞাত সমাজ হইতে আজ পর্য্যন্ত একই ধারায় কখনও খরস্রোতে কখনও মন্দপ্রবাহে প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে, তাহার আলোচনা কি অনুরাগ ও প্রীতির উৎপাদনে অসমর্থ?

ভাবের উদ্দীপনা মনুষ্যকে সকল সময়ে ঠিক্ পথে লইয়া যায় না, কিন্তু মনুষ্যজীবন ভাব কর্ত্তৃকই মূলতঃ নিয়ন্ত্রিত হয়। ইংরাজীতে যাহাকে feeling ও emotion বলে, সেই অর্থে ভাবশব্দ প্রয়োগ করিতেছি। জ্ঞান অবকাশ-মত ভাবকে সংযত করে, সংহত করে, গঠন প্রদান করে, সংশোধিত করে, প্রকৃতপক্ষে মনুষ্যজীবন ভাব কর্ত্তৃকই পরিচালিত হয় ও নিয়ন্ত্রিত হয়। জ্ঞান চেষ্টার প্রসূতি নহে, ভাবই চেষ্টার প্রসূতি; চেষ্টা হইতে কর্ম্ম উৎপন্ন হয়, যে কর্ম্মসমষ্টি লইয়া মনুষ্যের জীবন। শুধু মনুষ্যের ব্যক্তিগত জীবন কেন, সমাজের জীবনও মুখ্যতঃ ভাব কর্ত্তৃকই নিয়মিত হইয়া থাকে। সমাজের ইতিহাস মুখ্যতঃ ভাবের ইতিহাস, অথবা ভাব কর্ত্তৃক প্রণোদিত ও পরিচালিত কর্ম্মের ইতিহাস। সমাজের জ্ঞানিসম্প্রদায় কখনও বা উদ্দামগতি ভাবের বেগবত্তা কমাইয়া দেন, কখনও ভাবের স্রোতে ভাঁটা পড়িলে তাহার বেগবত্তা বাড়াইয়া দেন, ভাবের স্রোতকে অবসরমত ও ক্ষমতামত নূতন খাতে পরিচালিত করিবার চেষ্টা করেন; কিন্তু ভাব যখন প্রবাহিত হইতে থাকে, তখনই ভাবের স্রোতে মনুষ্যসমাজ চলে; কখনও বা মন্দবেগে চলে; কখনও বা খরস্রোতে বাঁধ ভাঙ্গিয়া কূল ছাপাইয়া ধুইয়া ভাসাইয়া চলিতে থাকে। উদাহরণ, ইউরোপে খ্রীষ্টানিপ্রচার, chivalryর অভ্যুদয়, renaissance ও reformation ও ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লব। ভাবের প্রবাহ সময়ে সময়ে এইরূপ খরস্রোতে চলিতে থাকে, তখন সমাজের নূতনজীবনলাভ হয়, সমাজ তখন নূতন মূর্ত্তি গ্রহণ করে, যাহাকে এতদিন মৃতকল্প বলিয়া বোধ হইত, সে এখন জীবনের

স্রোতে তরঙ্গ উঠাইয়া কলকলনাদে ছুটিতে থাকে। সমাজের মধ্যে যাঁহারা জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ, সমাজের মধ্যে যাঁহারা উচ্চ পদবীতে সমাসীন, সমাজের যাঁহারা নেতা, তাঁহারা এই ভাবের স্রোতের সৃষ্টি করিয়া দেন, আবার সমগ্র সমাজ, যাহা এতদিন জড়ভাব, নিশ্চেষ্ট ভাব অবলম্বন করিয়াছিল, সমগ্র সমাজ যখন সেই দুর্দ্দম প্রবাহে নীয়মান হয়, জ্ঞানিগণ ও নেতৃগণও তখন সেই স্রোতের মুখে ভাসিয়া চলেন।

আমাদের জাতীয় জীবনের যে স্রোত এখন অল্পবেগে চলিয়াছে, সেই স্রোতে বেগ-উৎপাদনের জন্য এইরূপ ভাবের উদ্দীপনা প্রয়োজন। আমার বিশ্বাস, স্বজাতিপ্রেম ও স্বদেশবাৎসল্য সেই উদ্দীপনা-প্রদানে সমর্থ। এবং এই স্বজাতিপ্রেম ও স্বদেশবাৎসল্য জন্মাইবার জন্য সমাজের সহিত ঘনিষ্ঠতর পরিচয়স্থাপন আবশ্যক। সমাজের কোথায় কি আছে, সমাজশরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ খুঁজিয়া দেখিতে হইবে, কোথায় কয়খানা হাড় আছে, কোথায় কয়টা শিরা আছে, কোন খাতে রক্ত চলে, কোন্ স্নায়ু দিয়া চেষ্টাশক্তি পরিচালিত হয়। অনুরক্তভাবে সন্ধান করিয়া দেখিতে হইবে। কোথায় কোন্ ক্ষত আছে, কোথায় কোন্ ব্রণ আছে, তাহারও অনুসন্ধান চাই, কিন্তু বৃত্তিগ্রাহী মমত্বহীন সার্জনের অনুসন্ধানে চলিবে না, অন্তরঙ্গ আত্মীয়ের মত সকরুণ সপ্রেম অনুসন্ধান আবশ্যক। তাহার পর সেই সমাজ-শরীরের ভ্রূণাবস্থা হইতে শৈশব, শৈশব হইতে যৌবন, যৌবন হইতে প্রৌঢ়দশা, সমস্তেরই আনুপূর্ব্বিক ধারাবাহিকভাবে তন্ন তন্ন করিয়া তত্ত্ব লইতে হইবে। সমাজের প্রাচীন ইতিহাস যথাসাধ্য তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিতে হইবে। তবেই সেই সমাজের প্রতি শ্রদ্ধা জন্মিবে, শ্রদ্ধা ভক্তিতে, ভক্তি প্রেমে ও প্রেম শেষ পর্য্যন্ত মহাভাবে পরিণত হইবে। সমাজের যাঁহারা নেতা, যাঁহারা শিক্ষিত, যাঁহারা জ্ঞানী, যাঁহারা চিন্তাপটু, তাঁহারা সেই মহাভাবের উদ্বোধন করিবেন, ও সেই মহাভাবকে শিরায় শিরায় সঞ্চালিত ও স্নায়ুতে স্নায়ুতে প্রবাহিত করিয়া দিবেন। সেই মহাভাবের স্ফূর্ত্তিলাভে সমাজ-শরীর কণ্টকিত হইবে, ধমনীতে রক্তপ্রবাহ বেগে ছুটিবে, হৃৎপিণ্ড মুহুর্মুহুঃ স্পন্দিত হইতে থাকিবে। নবজীবনসঞ্চারের হর্ষোদ্গত অশ্রুপ্রবাহে বন্যা আসিবে; সেই বন্যাস্রোতে বিঘ্ন বিপত্তি কোন্ অকূলে ভাসিয়া যাইবে। ইহাই আমাদের সামাজিক ব্যাধির চিকিৎসা, ইহাই আমাদের সকল রোগের একমাত্র প্রতীকার।

উষা।

পদ্যগল্প।

সপ্ত বর্ষ, বন্ধুবর, সপ্ত যুগ পরে
এই শেষ পত্র মোর! লিখি' অকপটে
কলঙ্ক-কণ্টকে গাঁথা কলুষ কাহিনী
পাঠাইনু তব পাশে। গুণগ্রাহী তুমি,
পাপ-অন্ধকার মাঝে পুণ্যরশ্মিরেখা
যদি পাও, কৃপা করি' করিও গ্রহণ।
তার পরে ধর্ম্মাধর্ম্ম করি' বিশ্লেষণ
বংশপরম্পরাক্রমে শিখাতে মানবে
কালের কুটিল স্রোতে দিও ভাসাইয়া।
জানো তুমি, পঞ্চ মাস গর্ভবাসে যবে
বন্ধু তব, পিতৃদেব নিজ কর্ম্মফলে
ত্যজিলা নশ্বর লীলা। নিদারুণ ব্যাধি
রাজযক্ষ্মা, অদৃষ্টের অভিশাপ সম,
করাল কবলে তাঁরে গ্রাসিল অকালে।
পঞ্চম সূতিকাদিনে মরিলা জননী
স্বামিশোকে ম্রিয়মাণা ;—ধরণীর কোলে
পিতৃমাতৃহীন শিশু রহিল পড়িয়া।
ধন্য সেই পুণ্যময়ী পিসীমা আমার!
কত যত্নে মাতৃসমা মমতা সলিলে
পুষিলেন দেহতরু ; কিশোর শৈশবে
কি কষ্ট সহিয়া হায়! করিলা পালন!
ধন্য সহিষ্ণুতা তাঁর! কিন্তু অভাগিনী
স্নেহঅন্ধ, পুষেছিল ঘৃতাহুতি দিয়া
কালানল। এতদিনে সে অনলরাশি
পুড়ায়ে সংসার শেষে পুড়িছে আপনি।
হে দেবতা! যেই শুভ্র দেবহৃদি সহ
পশি এই ভবে মোরা, কার অভিশাপে
হয় তাহা কলুষিত? কোথা হ'তে আসে
জ্বলন্ত যাতনা-ভরা যৌবনের ব্যাধি
অকাল কালের গ্রাসে নিক্ষেপিতে বলে?
শুনেছি কস্তুরী যবে জন্মে মৃগকোলে
অন্ধ গন্ধভরে তার ভ্রমে সে বিকল
বন হ'তে বনে ; সেইরূপ মদভরে
উদ্‌ভ্রান্ত যৌবন-হ্রদে উত্তুঙ্গ দোলায়
প্রমোদ-তরঙ্গ-রঙ্গে ভাসাইনু তরী।
আসিলে বরষাকাল বন্যার সলিলে
প্লাবিয়া যাইত দেশ। ক্ষুব্ধ জলরাশি
ভাসায়ে নগর গ্রাম তরঙ্গে উথলি'
মাঠে মাঠে মহাসিন্ধু করিত সৃজন।
তরী বেয়ে তদুপরি ভ্রমিতাম মোরা
পূর্ণিমা-নিশীথে। হায়! আজও জাগে প্রাণে
প্রসন্নগম্ভীরা সেই মূর্ত্তি প্রকৃতির।
চারি ধারে জলস্রোত অবিরামগতি
বহিছে নীরবে ; চন্দ্রকরে বীচিমালা
চূর্ণ চন্দ্রকান্তমণি নীরবে জ্বলিছে।
মাঝে মাঝে স্থির নীরে নিদ্রা-নিমগন
দীর্ঘ তরুরাজি। দূর পল্লীবাস হ'তে
স্নিগ্ধ গন্ধে গন্ধবহ আনিছে বহিয়া
কোন্ গৃহ-নিকুঞ্জের রহস্যবারতা।
শির'পরি চিররম্য শোভিছে আকাশ
জ্যোৎস্নালোকে হ্রস্বদীপ্তি তারারাজি সহ ;
নিম্নে নৌকা-বক্ষ হ'তে উঠিছে সঙ্গীত,—
মৃদু কভু, প্রণয়ের মৃদু ভাষা সম ;
কভু বা কল্লোলপ্রায় উচ্ছ্বসি' আবেগে
প্লাবিয়া সে অন্তহীন শান্ত সমতল
সুপ্ত দিগঙ্গনাগণে দিতেছে জাগায়ে।

হাঁ! সে কি বন্ধহীন আনন্দ মহান!—
যত দূর দৃষ্টি চলে অসীম উদার
সে সুষমা; সেই মুক্ত স্খলিত-বসনা
বসুধার রূপরাশি; সেই পূর্ণালোকে
তারাপূর্ণ নিশীথের নিবিড় নীলিমা।
বাহিরের সে বিস্তৃতি অন্তরে আসিয়া
প্রবেশিত কভু। দেখিতাম মনোরাজ্য
অনন্ত অসীম দেশ, গাম্ভীর্য্যে বিশাল,
সহস্র সন্দেহে পূর্ণ, শত বাসনার
প্রশস্ত বিলাসভূমি, শত মরণের
একমাত্র গুপ্ত নিকেতন। দেখিতাম
ছায়াসম আজিকার এই ভবিষ্যৎ,
দিগন্তবিস্তৃত দেহ, চুম্বিত-গগন,
মৃত্যু-বিভীষিকারূপী মেঘমালা গলে।
হৃদয়-দর্পণে হায়! অমনি পড়িত
কালো ছায়া; অনির্দ্দেশ্য অন্ধকার মাঝে
ডুবে যেত যৌবনের যতেক কামনা;
আপনার চিন্তারাশিভারে হইতাম
আপনি আকুল। অবসাদে অবশেষে
উপাধানে ন্যস্তমুখ বিনিদ্র শয়নে
অশ্রুরূপে গুরুভার দিতাম ঢালিয়া।
এইরূপে, বন্ধুবর, প্রথম যৌবনে
আনন্দ-উল্লাসে কভু, কভু বা বিষাদে
কাটাইনু কতকাল। মত্ত মোহমদে
কোন দিন কোন পথে ছুটিত কামনা
বর্ণিয়া কে করে শেষ? দেখিয়াছ তুমি
পর্ব্বতের গুহা হ'তে বহিতে তটিনী,—
কেমন শোভন শুভ্র, কলঙ্ক-কলুষে
অনাবিল, একমাত্র ক্ষুদ্র পথ ধরি
চলিয়াছে আত্মভাবে আপনি উদাসী!
অতঃপর যায়—যত যায়, অলক্ষিতে
জগতের ক্লেশরাশি যতেক জঞ্জাল
শনির সঞ্চার সম মিশে তার প্রাণে।
দিনে দিনে বিবর্দ্ধিত জীবনের ভার
বহিতে না পারে নদী; তাই পাগলিনী
সন্তাপে সহস্রধারা পড়ে আছাড়িয়া
সমুদ্রের পদতলে, অবশেষে, হায়,
উন্মাদিনী আপনারে পায় না খুঁজিয়া!—
তেমতি আপনাহারা চিন্তা-প্রপীড়িত
সংসার মরুভূ-মাঝে লাগিনু ভ্রমিতে।
জীবন যাতনাময়, চিত্তে অবসাদ,
যে দিকে ফিরাই আঁখি জীর্ণারণ্য সম
সব চরাচর। শতবার ভাবিলাম,
"কেন অকারণে, হায়, কোন্ সুখ-আশে
বহি এ যন্ত্রণারাশি, স্বহস্তে সহজে
জ্বালা যদি পারি নিবাইতে?" সযতনে,
মিত্রবর, নিবারিনু, মৃত্যুর কামনা।
কর্ম্মময় কলিকাতা, লোক-সমাগমে
বিশাল সমুদ্র সম অমেয় অপার।
ভাবিনু মিশিব গিয়া সেই সিন্ধুমাঝে
জনস্রোতে। আঁখিপথে জাগে চারিধার
উচ্চ উচ্চ অট্টালিকা, শত রাজপথ
সুবিস্তৃত, সমুজ্জ্বল বিদ্যুৎ-আলোকে।
হেথা শোভমান সেতু, হোথা অগণিত
পোতমালা, নভঃস্পর্শী গুণতরুরাজি
অন্তহীন অরণ্যানী যথা। অবিশ্রাম
জীবনের মহারণ; বাণিজ্য-রাক্ষস
বিস্তারিয়া শতবাহু শত অভাগার
বুভুক্ষার অন্নমুষ্টি নিতেছে কাড়িয়া।
নিভৃতে কোথাও ভায় ক্ষীণ পুণ্যলেখা;
কোথা বা প্রকাশ্যে পাপ ঘৃণ্য অভিনয়ে
বিষম বীভৎস কাণ্ড করিছে প্রচার।
ভাবিলাম প্রবেশিব গিয়া সেই মহা-
রঙ্গালয়ে। শত দৃশ্যে রুদ্ধ আঁখিযুগ
আপন শূন্যতা আর পাবে না দেখিতে,—
শত স্বার্থ-কোলাহলে বদ্ধ বধিরিত
পরাণের এ রোদন পশিবে না কানে।
কাটাইনু কিছুকাল ...

উদাসীন। নিম্নে কর্ম্ম-তরঙ্গের ঘোরে
উঠিছে পড়িছে বিশ্ব, উর্দ্ধে আমি যেন
সৃষ্টিশৈলসমাসীন তা'রই ফলাফল
দেখিতেছি গণি'! নিম্নে নরপশুপাল
বদ্ধ মায়ামোহে; হাসিছে কাঁদিছে কেহ,
কেহ আচম্বিতে মৃত্যু-অন্ধকার-মাঝে
হ'তেছে বিলীন! আমি কোন্ শূন্যালয়ে
নিশ্চিন্তমানসে যেন রচিতেছি বসি
অভাগা সে পশুদের অদৃষ্টকাহিনী।
দেখিতে দেখিতে ক্রমে চিন্তা নবতর
উদিল মানসে, "চিরদিন এ জীবন
যাপিব বিফলে, হায়! কর্ম্মের ভবনে
কর্ম্মশূন্য আলস্যের করিব সাধনা?
নাহি কি কর্ত্তব্য মোর? দেখিতেছি হেথা
ফুটে ফুল, গাহে পাখী, বহে জলধারা,
শত দিকে ধায় শত লোক, পুরে দেশ
কর্ম্মকোলাহলে। দেখিতেছি শির'পরি
উজ্জ্বল জ্যোতিষ্করাশি ভ্রমিছে নিয়ত
সমস্বরে কর্ম্মগীত গাহি—কর্ম্ম-সূত্রে
বদ্ধ ত্রিজগৎ। হে বিধাতঃ! কর্ম্মহীন
অলস নিষ্ক্রিয় আর চাহি না বাঁচিতে;
একবার ওই ক্ষুব্ধ-সমুদ্র-মাঝার
ওই কলস্রোতে মোরে দাও ভাসাইয়া।"
ঘুরিলাম বহু দিন। প্রত্যহ প্রভাতে
জাগিতাম ভাঙ্গি' দুঃস্বপন, চিন্তানলে
দহিবারে শুধু। কভু গৃহ তেয়াগিয়া
লোকারণ্যে পথে পথে ফিরি সারাদিন
সন্ধ্যামুখে বসিতাম রাজোদ্যানে আসি।
দেখিতাম সারি দিয়া করি গলাগলি
ধাইছে যুবকদল, বসিছে কোথাও
কাছাকাছি, মুগ্ধ মত্ত মিলনের সুখে।
উঠিছে সঙ্গীত কোথা, কোথা বা লহরে
উথলিছে নবোল্লাস কলহাস্যে ভরা।
কখন বা দেখিতাম প্রৌঢ় পান্থ দুটি

দিবসের পরিশ্রমে শ্রান্ত তপ্ত তনু
চলে যায় ধীর পদে; কহে কত কথা,
পুত্র কন্যা পরিজন দারিদ্র্য দীনতা
জীবনের অত্যাচার মৃত্যুর তাড়না,
বাসুকী সহস্রফণা সংসারের বেশে।
অসম্বদ্ধ অর্থহীন লাগিত সকলি
শূন্য এ নয়নে মোর। হায়! মূর্খ মুগ্ধ
প্রতারিত! এই কি রে জীবনের সুখ?
ভিত্তিহীন সুখ-দুঃখ-ডোরে মায়াজাল
করিয়া নির্ম্মাণ, আপনারে কল্পনায়
নিত্য আবেষ্টন! ধিক্ প্রতারণা হেন!
চাহি না এ মিথ্যাসুখ। সত্য দুঃখরাশি
তাও ভাল কল্পনার মিথ্যা সুখ হ'তে।
চাহি আমি সত্য দুখে ভাসিতে নিয়ত
তৃণ সম নিঃসহায়,—বিশ্বের তুফানে
পূর্ণভাবে তনু মন ফেলিতে ডুবায়ে।
এইবার, বন্ধুবর, শুন মন দিয়া।
এবে সেই সন্ধিস্থল,—জন্ম-মরণের
সূক্ষ্ম সীমারেখা, সেই প্রলয়ের পথে
অতর্কিত গুপ্ত পদক্ষেপ! তার পরে
ধীরে ধীরে চিরদিন রহিয়া বসিয়া
স্মৃতির মুর্ম্মুরদাহ, কণ্টক-শয়নে
বৃশ্চিকদংশন সম অনুশোক-শিখা।
দেখ ভাবি, প্রিয়বর, পড়িবে স্মরণে
বিষাদ-কাহিনী কার শুনেছিনু আমি
তোমারই সকাশে। পরদুখে সদা দুখী
তুমি; কি করুণ-ভাব-ভরে বাক্যরাশি
করিয়া রচন বরষিলে শ্রুতিপথে।
বুঝিতে নারিলে, হায়, অলক্ষিতে তাহে
ভিজিল এ মরুভূমি; লোকলজ্জা সহ
কঠোর কারুণ্য-রণ আরম্ভিল প্রাণে।
ভাবিলাম, "লক্ষ্যহীন, কর্ম্মের প্রয়াসী
আমি; যদি এতদিনে বিধাতা সদয়
দিলেন দেখায়ে পথ, এই পথ ধরি

চলি, দেখি সুখ ইথে যদি মিলে।
পেয়েছি যে পিতৃধনরাশি, তাই দিয়া
বঙ্গভূমে পুণ্যগৃহ করিব নির্ম্মাণ।
পাপমুক্তিপ্রয়াসিনী অনাথিনী আছে
যে যথায়, পুণ্যাশ্রমে পাবে সে আশ্রয়।
কারে বা করিব ভয়? কিসের সরম?
আঁধারে স্খলিতপদ পতিতা যে নারী
সে কি কন্যা নহে বিধাতার? এই বাহু,
কি লাগি ইহারে দেহে বেড়াব বহিয়া
নহে নিয়োজিত যদি দেবতার কাজে?
দেবতা হৃদয়দর্শী; সরম সঙ্কোচ
সাজে না এ বিশ্বরাজ্যে জীবন-সংগ্রামে।"
করিনু কঠোর পণ; আপনার হাতে
আপনারি মৃত্যুবাণ করিনু রচনা।
হায় রে রাক্ষসী তুই! ছিলি কি বসিয়া
দুরন্ত বাঘিনী সম এই মৃগ-আশে?
সহায় হইতে তোর বিশাল জগতে
ছিল না কি কেহ আর? যে পাপিষ্ঠে ল'য়ে
ভুলেছিলি জাতিকুল, সে যবে ত্যজিল
তখনিও পাপ প্রাণ কেন না ত্যজিলি?
কিন্তু বৃথা দুষি তোরে; আপনি ঝাঁপিয়া
পড়েছিনু দীপ্তশিখামুখে। বৃথা তোরে
দুষি, হায়! নিরাশ্রয় তুই অভাগিনী!
হে মদনমদোন্মাদী যৌবন-বিলাসী
চিত্তহারী তুমি রূপ! সেই সন্ধ্যালোকে
কি মূর্ত্তি ধরিয়া তুমি বধিলে এ জনে?
কিশোর শৈশবে যবে স্নিগ্ধ হাসিমুখে
দাঁড়াতে আসিয়া, সম্মুখে পশ্চাতে উর্দ্ধে
সহস্র বিচিত্রবেশে শোভিতে সুন্দর,
ভুলাতে তরুণ মন, হৃদয়ের পটে
আঁকিতে আশার ছবি সোনার কিরণে,
তখন কোথায়, হায়, রাখিতে লুকায়ে
হেন তীব্র কালকূট? কামের সায়রে
গরল এ ঊর্ম্মিলীলা লালসা-বিহ্বল?
জীবন-বিপিনে মোর কোথা অকস্মাৎ
জ্বালিলে সে দাবানল, পোড়াইলে যাহে
হৃদয়-পাদপে বদ্ধ, সুখপুষ্পাবৃত
আশার ব্রততী? অবশেষে নির্ব্বাপিত
ভস্মরাশি-মাঝে প্রলয়ের শিখা সম
শুধু তৃষ্ণানলশিখা রাখিলে পুষিয়া?
কে দিবে তৃষ্ণার বারি? বিশ্ব-মরু-মাঝে
লুপ্তবুদ্ধি নরপশু আমি! আয় তুই,
আয় কাছে, কুহকিনী ফণিনী আমার!
পাকে পাকে আলিঙ্গিয়া রক্তাধরপুটে
পিয়া রে অমিয়-হলাহল! যাত্রী আমি
সুখতীর্থ-আশে, তাহে তুই সাথী মোর!
ঢাল্ সুরা পুনর্ব্বার, আনন্দ-তুফানে
টলমল দেহতরী দিলাম ভাসায়ে।
বিবেক-বেদনা-ভরা সংশয়-তমসে
কে চাহে কণ্টকাকীর্ণ কর্ম্ম-কারাগার?
কুসুমে সুষমাময় সহজে সরল
এই সেই মোক্ষ-পথ; মত্ত সুধাপানে
সখি, মোরা এই পথে যাত্রা করি চল্।
ক্ষম মোরে, মিত্রবর, বিজ্ঞবর তুমি।
শুনিয়াছ কবিমুখে, স্বচক্ষে দেখেছ—
পিচ্ছিল পুণ্যের পথ; হটিলে চরণ
মুহূর্ত্তে তলায় লোক অতল গভীরে।
ইন্দ্রিয়লালসারসে লিপ্ত যেই জন
কোথা তার মনুষ্যত্ব মহত্ত্বকামনা?—
মুক্তিভ্রমে মৃত্যুপথ করে সে আশ্রয়!
কিন্তু হায়! কামসুখ সহে কতকাল
নরদেহে? একদিন উদিল চেতনা;
অভাগা জাগিল কাঁদি, দেখিল চাহিয়া,
অলক্ষিতে অপহৃত উচ্চ-আশারূপী
মস্তকের মণি তার, কুবের-ভাণ্ডার
লুণ্ঠিত আগার সম রয়েছে পড়িয়া।
হে মাতঃ জগৎ-ধাত্রী! পাপ-দৈত্য সহ
পাঠাইয়া রণে হেন অন্ধ শিশু সবে

কেমনে নিশ্চিন্ত তুই থাকিস্ বসিয়া?
মাতৃহস্ত অলস কি কভু, যবে শিশু
স্খলিতচরণে কাঁদে পড়ি ভূমিতলে?
জননী! যেদিন তোরে অসহায় আমি
ডেকেছিনু বারংবার, অমনি আসিয়া
ঝাড়িয়া কলঙ্ক-ধূলা যেতে যদি ল'য়ে
গৃহপানে! বৃথা খেদ;—অদৃষ্ট-লিখন
রৌরব-অনলে পুড়ি মরিবে অভাগা।
ধিক্ মূর্খ! নিজ হাতে গড়িয়া নিগড়
পরিলি নিজের পায়? তুচ্ছ তৃণলোভে
পড়ে গিয়া মৃগ যবে আনায়-মাঝারে
সে কি শুধু অদৃষ্টের লীলা? যবে পুন
ছলে বলে ছিঁড়ি পাশ পায় সে উদ্ধার,
অদৃষ্ট আসিয়া তারে করে কি মোচন?
যে আছে জীবনহীন নিষ্ক্রিয় অলস
অন্ধ প্রাক্তনের স্রোতে লঘুতৃণসম
যাক্ সে ভাসিয়া! শুভক্ষণে আজি প্রাণে
চেতনা জেগেছে তোর; দেখ্ একবার
এই স্রোতগতি যদি পারিস্ ফিরাতে।
নব আশে, বন্ধুবর, আনি নববধূ
স্থাপিনু প্রতিমা সম গৃহে। বাঁধিলাম
তনু মন। ভাবিলাম হৃদয়-আকাশে
ঊষারূপে ঊষা মোর হইল উদয়।
ক্রমশঃ কাটিবে মেঘ, টুটি অন্ধকার
অমানিশা, স্নিগ্ধবর্ণে জীবন-গহনে
বিভাসিবে স্বর্ণালোক, নব গন্ধ ভরে
নব প্রেমপারিজাত উঠিবে বিকশি'।
সে সৌরভে সে আলোকে উদিবে হাসিয়া
অস্তমিত শত সাধ; মুক্ত বিকশিত
নিরখিব চারি ধার; নিত্য নব বেশে
সংসারের শুভমূর্ত্তি শোভিবে সম্মুখে।
এস তবে ঊষাময়ী! অমা-অন্ধকারে
আলোকের মহাকেন্দ্র তুমি; আপনার
লাবণ্যমণ্ডল মাঝে দাঁড়াও আসিয়া।

হৃদয়ের কূলে মোর দেবতা-দানবে
বেধেছে বিষম রণ। মোহিনীর বেশে
এস তুমি, দৈত্যদলে ছলে পরাজয়ি
কর শান্তি প্রতিষ্ঠিত অশান্ত এ গৃহে।
যাক্ দূরে কোলাহল। এস বাঁধি দোঁহে
নিভৃত নিজন প্রেমনীড়, করি নিত্য
কঠোর সাধনা, শিখি সদা আত্মজয়;
তার পরে শশী সহ শর্ব্বরীর বেশে
বাহিরিয়া দুই জন, সৌরভে শিশিরে
সুস্বপনে সুনিদ্রায় আনন্দে আলোকে
সুমধুর শান্তিধর্ম্ম করি সুপ্রচার।
ধিক্ অধীনতা! ইন্দ্রিয়ের চিরদাস
শৃঙ্খলিত বন্দী পশু মোরা! রুদ্ধ-আঁখি
চিরদিন, নতশিরে মৃত্তিকা ঘাঁটিয়া
করি শুধু বিচরণ। কোথা শির'পরি
শোভিছে অমৃতফলরাশি, মোহে অন্ধ
পাই না সন্ধান। বর্ষবর্ষান্তরে কভু
রুদ্ধ কক্ষে রন্ধ্রাগত রবিরশ্মি সম
তারই প্রতিবিম্ব যেন পড়ে আসি প্রাণে।
সহসা শিহরে কায়, কানন-মাঝার
চকিতা হরিণী সম চাহি চারিধার,
হৃদয়-সাগরে মত্ত তরঙ্গের বেশে
উদ্দাম বাসনারাশি উঠে ব্যাকুলিয়া।—
কোথা তুমি মুক্তিফল? কোথা ভুবনের
চির-অভীপ্সিত সুধা? যৌবন-স্বপনে
আজি স্বর্ণকান্তি তব পেয়েছি দেখিতে।
কোথা তুমি প্রেমভক্তি-প্রতিষ্ঠা-রূপিণী
কল্যাণী কল্যাণময়ী বিশ্বের বাসনা
বিশ্বারাধ্যা! আমি আর পারি না বহিতে
কষ্ট এ কলুষ গুরুভার; চাহি আজি
ছুটিবারে ঊর্দ্ধশ্বাসে ঊর্দ্ধলোক পানে।
কে মোরে দেখায় পথ? কেমনে বা হায়,
এ ঘোর শৃঙ্খলমালা করি বিমোচন?
হায়! ব্যর্থ বুঝি সব! কই, কোথা প্রিয়ে!

নের পারিজাত, স্বর্গের সুষমা ?
কোথা নব বসন্তের মুক্ত সে মিলন ?
জীবন-প্রান্তরে সেই যেতেছে বহিয়া
আবিল বরষা-স্রোত, তেমতি এ মন
ধাইছে সে কুহকিনী পানে, সেই তৃষ্ণা
তুষানল অবিশ্রাম জ্বলিছে মরমে।
যুঝিতেছি নিশিদিন ; নিশিদিন তবু
হেরি শুধু সাপিনীরে,—প্রসারিত ফণা,
অপাঙ্গে কুটিল দৃষ্টি, অধরের কোণে
সুধাসিক্ত হলাহল-হাসি। মুহুর্মুহুঃ
নিশ্বাস-কুয়াসা-জালে ফেলিছে ঘিরিয়া
চারিধার, পলাইতে পথ নাহি পাই।
অবশেষে অসহায় আপনি ধাইয়া
পশি' গিয়া স্বেচ্ছাবন্দী মায়া-পাশ মাঝে।
হায়, উষাময়ী হায়! স্নেহে অভিমানে
ভেবেছিস মায়ামৃগে করিবি স্ববশ ?—
বালি দিয়া জলোচ্ছ্বাসে চাহিস্ বাঁধিতে ?
ভ্রান্ত তুই অভাগিনী ; এ নহে রে শুধু
বাহুপাশ মৃদুভাষ, নিশীথ-শয়নে
নিশ্চিন্ত প্রণয়-রণ! পারিস্ যদ্যপি
ঘুচা' ও সোহাগশোভা সৌম্যশান্ত বেশ।
লইয়া খর্পর খণ্ডা ধেয়ে আয় ধরি'
চামুণ্ডা-মূরতি! লজ্জা ত্যজি বিবসনা
দুলা' নরমুণ্ডমালা গলে, ভীম আস্যে
লোল জিহ্বা, ছিন্নকরকাঞ্চী কটিতটে!
তার পর অট্টহাসে তাণ্ডবে নাচিয়া
আকাঙ্ক্ষার রক্তবীজে বধিস্ সংগ্রামে!
নিতান্ত বিমূঢ় তুই মুক্তির ভিখারী!
শবরের ফাঁদে সিংহ ডাকে কি মূষিকে
কাটিতে বন্ধন তার? নিজ বীর্য্যবলে,
বিফল কৌশল যদি, করে সে উদ্ধার
নিজ স্বাধীনতা ধন ; বনে বনান্তরে
বিপুল গৌরবে পুন বেড়ায় ভ্রমিয়া।
হৃদয়ের অন্তঃপুরে করিয়া প্রবেশ
কুসুম-শয়নে কোথা দেখ্ ঘুমাইছে
দৃঢ় দৃপ্ত পরাক্রম। উচ্চ ভেরীরবে
ডেকে বল,—"সুষুপ্তির এ নহে সময় ;
অনন্ত মুহূর্ত্ত এই। এবে না জাগিলে
আসিবে অনন্ত নিদ্রা মৃত্যুমোহরূপে।"
হায় মূর্খ! তোরে আমি বুঝাব কেমনে,
জীবনের মূলে তোর পশেছে আসিয়া
কালকীট ; কোন্ সন্ধ্যাবেলা মুহ্যমান
নয়ন পল্লব দু'টি আসিবে মুদিয়া!
ধীরে ধীরে অতর্কিতে পদতলে তোর
সরিছে ধরণী ;—কোন্‌দিন অকস্মাৎ
কেন্দ্রচ্যুত ধূমকেতু সম, প্রজ্বলিত
অন্তর-অনলে, বিদরিয়া বিচূর্ণিয়া
নষ্ট ভ্রষ্ট হ'বি শেষে গভীর গহ্বরে!
থাক্ চিন্তা, থাক্ দ্বিধা, সন্দেহ-সংশয়।
ভাবিলে ভাবনা আসে, সংশয়ের শিলা
করে রুদ্ধ অবিচল কর্ম্মের প্রবাহ।
মানব-দেবতা মোরা ত্রিভুবনজয়ী
বিশ্বাধিপ! বাসনার অগ্নিকুণ্ড মাঝে
অনন্তের অধিকারে দিব কি আহুতি?
কোথা শত্রু? কোথা রিপু? ইন্দ্রিয়-আহবে
উদ্যত-কৃপাণ-করে দাঁড়াইনু আজি।
আলস্য-শয়ন ছাড়ি' সুপ্ত পশুরাজ
উঠেছে জাগিয়া ; আপনার পরিত্রাণ
সাধিবে সে আপনার বলে। নাহি মোর
আত্মপর পাপপুণ্য বিচার-বিবেক।
আগ্রহ-উন্মত্ত আমি, কামের নিগড়
ঊর্ণনাভ-তন্তু সম ফেলিব ছিঁড়িয়া।
ক্ষিপ্ত জয়োল্লাস শুধু ভুঞ্জিবারে আজি
ধরিনু প্রলয়মূর্ত্তি। ইঙ্গিতে সৃজিব
কালানল, রুদ্রনেত্র হ'তে রোষদীপ্ত
বৈশ্বানর সম! কিংবা ছিন্নমস্তারূপে
স্বহস্তে ছেদিয়া শির, তপ্ত পিপাসায়
আপনি করিব তৃপ্ত আপন শোণিতে!

বিরক্ত কি তুমি, বন্ধুবর? শুনিবারে
চাহনাকি আর? ক্ষম সখা, এ নহে সে
মৃদুতান, বসন্তের বিলাস-ভবনে
ললিত লালসাগীত!—মর্ম্মের মাঝার
এ যে মৃত্যুদৈত্য সহ রণ! দীর্ণ বক্ষে
বজ্রাঘাত! রুদ্ধকণ্ঠে রুদ্ধ আর্ত্তনাদ!—
দেখিয়াছ কাম ক্রোধ স্মৃতির বিভ্রম,
দেখ এবে বুদ্ধিনাশ, মৃত্যু তার পরে!

ছিঁড়িল বীণার তার অতি-আকর্ষণে।
মুক্তিযুদ্ধে মনোযন্ত্রে বাঁধিতে কসিয়া
বিফল হইল সব; দীপ্ত জ্ঞান-রবি
আবরিল কালরাহু উন্মত্ততা-রূপে।
দারুণ সে ক্ষিপ্ত দশা। মনে নাহি কিছু
কেমনে কোথায় হায় গিয়েছে কাটিয়া
রাত্রি দিন—কি করেছি কি বলেছি কারে।
সপ্তবর্ষব্যাপী সেই দীর্ঘ বিভাবরী
একমাত্র ঘুমে যেন করেছি যাপন।
মাঝে মাঝে কভু যেন ভেসে আসে প্রাণে
অর্থহীন উপকথা, অস্ফুট কাহিনী,
নিদ্রাভঙ্গে নিশীথের চূর্ণস্মৃতিসম।
মনে হয় পৃথ্বীতলে যেন লৌহময়
অন্ধকার পুরী, তার মাঝে তপ্তশয্যা,
তদুপরি বন্দিবৎ বদ্ধকরপদে
রয়েছি পড়িয়া। যাতনার অন্তর্দাহী
জ্বলিতেছে তুষানল, মর্ম্মগ্রন্থি সব
মাংসাশী শকুনি সম ফেলিছে ছিঁড়িয়া!
চারি দিক হ'তে সদা পশিছে শ্রবণে
অঙ্গহীন ব্যঙ্গহাসি, সঙ্গোপনে কথা;
কে হাসে কে ভাষে, কিছু পাই না ভাবিয়া!
হা নিষ্ঠুর! পিশাচেরা বসিয়া সভায়
অভাগার মৃত্যু তরে কি তর্ক করিছে
এতকাল? একেবারে তীক্ষ্ণ অসিধারে
ক্ষিপ্রকরে কেন শির করে না ছেদন?

আর এক মূর্ত্তি, সখা, জাগিছে স্মরণে;—
আজও আঁখি-আগে আমি পেতেছি দেখা
বিষণ্ণ প্রতিমাখানি; সেই ম্রিয়মাণ
মুখছবি, আলুথালু রুক্ষ কেশপাশ।
ধীরে ধীরে দেববালা শয্যাপদতলে
দাঁড়াইছে আসি; ধীরে ধীরে স্পন্দহীন
স্বচ্ছনীল নেত্রযুগ রাখিছে মেলিয়া
শুষ্ক শীর্ণ মোর মুখপানে; ধীরে ধীরে
অবশেষে উপজিয়া অশ্রুবাষ্পরাশি
পাণ্ডুর কপোলে তার পড়িছে আসিয়া।
শয্যাপ্রান্তে অশ্রুময় সেই মূর্ত্তিখানি
দেখিতে দেখিতে ক্রমে উন্মাদেরও আঁখি
ভাসিছে সলিলে; অমনি সে দেববালা
বিবশা পড়িছে বসি, নমিত বয়ান
ভিজাইছে গৃহতল দর দর ধারে।

এই ভাবে গেল কত দিন। অতঃপর
সবই মসীময় যেন! না না, নহে সখা!
আরও এক কথা এবে পড়িছে স্মরণে।
একদা নিশীথকালে সহসা জাগিয়া
দেখিলাম মুক্ত দ্বার; পার্শ্বে দীপাধারে
ক্ষীণ শিখা, কভু মৃদু, কভু আভাময়ী;
শিয়রে বসিয়া সেই দেবের বালিকা
সেইরূপ স্পন্দহীন অশ্রুপূর্ণ-আঁখি।
সহসা কি ভাবি মনে চঞ্চলচরণে
কক্ষ ত্যজি মত্ত যুবা হইল বাহির,—
সহসা সে ক্ষীণ দীপ নিবিল অমনি।
বালিকা আইল ছুটি; কিন্তু উন্মাদেরে
কেমনে সে রাখিবে রুধিয়া? ক্ষিপ্রগতি
বাহিরিয়া রাজপথে একাকী যুবক
স্বপ্ন-অভিভূত প্রায় লাগিল ভ্রমিতে।

অকস্মাৎ মত্ত যুবা দেখিল চাহিয়া
পশেছে সে নাগলোকে। সম্মুখে তাহার
নিদ্রাবশে আকুঞ্চিত বিস্ফারিত-ফণা
তীব্রবিষ বিষধরী রয়েছে শয়ান!
চারিধারে মৃতপ্রায় হলাহল পানে

.াম্ব কালিয়কুল ; দিয়াছে তুলিয়া
দীর্ঘ পদদ্বয় কেহ কারও শির'পরি,
কেহ বা বেঁধেছে কারে দৃঢ় আলিঙ্গনে !
বীভৎস-দর্শন সেই,—ভগ্নপাত্ররাশি
বিগলিত বস্ত্ররাশি সহ ইতস্ততঃ
লুটে গৃহতলে ; দীর্ণ ছিন্ন উপাধান
মূর্চ্ছিত মস্তক সহ যায় গড়াগড়ি !
মুক্ত পাত্রমুখে কোথা সুরার প্রবাহ ;
কোথা বা বমনস্তূপ আনিছে টানিয়া
জুগুপ্সিত উগ্রগন্ধে জীর্ণ অন্নরাশি !
　ধমকি দাঁড়াল যুবা ; পুন ক্ষণতরে
সেই পাপদৃশ্য পরে রাখিল নয়ন ;
মুহূর্ত্তেকে কোথা হ'তে আনি খর অসি
উর্দ্ধনেত্রে কি ভাবিল আপন মানসে,—
তার পরে কি করিল কেহ নাহি জানে !
　মনে পড়ে, সপ্তবর্ষ পরে যেই দিন
প্রথম লভিনু জ্ঞান । সম্মুখে চাহিয়া
দেখিনু বিশাল সিন্ধু,—নীল জলরাশি
শোভিতেছে সীমাহীন নীল নভস্তলে !
উষার কিরণস্রোতে নিশার কালিমা
হয়েছে বিলীন ; দূরে দিগন্তের কোলে
রবিদেব দিব্য মূর্ত্তি দাঁড়ায়েছে আসি
দুটি উর্ম্মিশিরে দুটি রক্তিম চরণ ।
পশ্চাতে পর্ব্বতমালা শিখরে শিখরে
ছাইয়া গগনপট মেঘমালা সম
কোন দেশ দেশান্তরে গিয়েছে চলিয়া ।
দুই পার্শ্বে শত শত লতাগুল্মে ঘেরা
পুষ্পিত পাদপ, শ্যামছবি প্রভাময়
প্রভাত-আলোকে । শত জাগরণ-গীত
শ্রুতিপথে যুগপৎ পশিছে আসিয়া,
কভু উচ্চ, কভু মৃদু বীণাধ্বনি সম ।
তরুণ তমালশিরে শির'পরি মোর
বসি বনপ্রিয় এক ; বুঝি সে বিরহী
স্বর্ণ-রঞ্জিত সেই সিন্ধুপানে চাহি
কুহরি প্রিয়ারে তার করিছে স্মরণ ।
সহসা সে বিহঙ্গের আকুল কূজনে
কার প্রেমস্মৃতি প্রাণে উঠিল ঝলকি !
সহসা হৃদয়-নভে পূর্ণ শশী সম
দেখিলাম কা'র মুখশশী ! সেই শান্ত
বিস্ফারিত আঁখিযুগ, সন্ধ্যার ললাটে
স্থিরস্নিগ্ধকান্তি দুটি দীপ্ত তারাসম ।
দেখিতে দেখিতে ক্রমে সে আঁখি-আলোকে
উদ্ভাসিত চিত্র সম যতেক কাহিনী
সম্মুখে জীবন্তবৎ উঠিল জাগিয়া ।
　প্রথম চেতনা সহ বিদ্যুৎ-বেদনা
বিঁধিল মরমে ; সমুজ্জ্বল সিন্ধুনীরে
মরণের মায়াময় মূরতি মোহন
নিমন্ত্রিল বারংবার সান্ত্বনার ছলে ।
কিন্তু সত্য, মিত্রবর, একদিন যাহা
শুনেছিনু তব মুখে,—"জীবন-বিধাতা
জীবন-সঙ্কটে কভু আপনি আসিয়া
দেন্ দেখা।" যা দেখিনু জন্মজন্মান্তরে
নারিব ভুলিতে আর । প্রাণের আগারে
আজও শুনিতেছি আমি সেই সুধাময়
স্বপনের বাণী,—"যাও, বৎস, পুনর্ব্বার
ফিরি সুখাশ্রম মাঝে । শূন্য গৃহকোণে
শূন্যমনে পথ চাহি একা বিরহিণী
আছে যে বসিয়া, তারই প্রেমতরুশাখে
রচিও নবীন নীড় ; লভেছ যে জ্ঞান
অর্দ্ধজন্ম বিনিময়ে কলঙ্কে রোদনে
সেই বর্ম্মে বাঁধি বুক পুন বীরসাজে
জয় জয় রবে যুদ্ধে হও আগুয়ান ।"
　শুন এবে সখা মোর, কি ঘটিল শেষে ।
পাঠশ্রান্ত তুমি, অতি সংক্ষেপিয়া তাই
জানাইব যাহা আছে শেষ । আজি আর
কামনা নাহিক কিছু মোর ; শুধু ভিক্ষা,
অধ্যয়ন-অবসানে উর্দ্ধপানে চাহি,
সর্ব্বাধম বন্ধু লাগি তব, একবার

করিও প্রার্থনা। চির ধর্ম্মাচারী তুমি,
শুনিবেন ধর্ম্মাধিপ তুমি নিবেদিলে।
বৈশাখের খর রৌদ্রে দারুণ নিদাঘে
ঝাঁ ঝাঁ করে চারি দিক ; একেলা পথিক
চলিয়াছে অবিশ্রাম গৃহাশ্রম পানে।
দহিছে অনলে শির, ঘর্ম্মের উচ্ছ্বাসে
সর্ব্ব অঙ্গ ভাসমান, চরণযুগল
আহত বিক্ষত শ্রান্ত শোণিত-বরষে!
পথিক না মানে কিছু ; শুধু মাঝে মাঝে
শুধাইছে পথ, আর চলিছে অমনি।
কোথা অশথের তলে নিভৃতে বসিয়া
পান্থ দুই চারি ; কোথা দীর্ঘবটমূলে
শুয়ে আছে পশুপাল ; কোথা বা রাখাল
পাতার কুটীরমাঝে লয়েছে আশ্রয়।
আপনার মনোমাঝে আপনি বিলীন
যুবক চলিয়া যায়। বিস্মিতনয়নে
পশু পক্ষী নর সবে নিরখে চাহিয়া!
চলিয়াছি রাত্রিদিন ; উতরিনু শেষে
পূর্ব্বপরিচিত সেই প্রান্তরের পথে।
নাহি সে বন্যার স্রোত, শুভ্র চন্দ্রালোকে
সেই শুভ্র সলিলের সৌন্দর্য্য-হিল্লোল।
দেখিনু বালুকারাশি ধাঁধিয়া নয়ন
উজ্জ্বল অনল সম জ্বলে চারিভিতে।
কোথা তরুতৃণলতা? যোজন ব্যাপিয়া
বিরাজিছে মহামরুভূমি, মরণের
লীলাস্থলী সম! মুহুর্মুহু হুঙ্কারিয়া
উড়ায়ে বালুকাকণা বহিছে প্রবল
বক্রগতি পবনের বহ্নিময় শ্বাস,—
সর্ব্বাঙ্গ পুড়িয়া যেন যেতেছে পরশে।
সে অনলস্রোত মাঝে পিপাসা-আকুল
শুষ্ককণ্ঠ ক্ষীণবল তবু প্রাণপণে
চলিনু ভাসিয়া। পরিশ্রান্ত দেহমন
অবসন্ন হ'য়ে এল ক্রমে ; অগ্রপথে
চরণ চলে না আর ; নয়ন-পল্লব
বারংবার আসিছে মুদিয়া ; প্রতিক্ষণে
মৃত্যুরে প্রতীক্ষা করি চলিলাম তবু।
সহসা সম্মুখে মোর দেবমায়া সম
অপূর্ব্ব উদ্যান এক পাইনু দেখিতে।
বিস্ময়ে পুরিল প্রাণ ; নব আশাভরে
উপজিল নববল, উন্মুক্ত তোরণে
ধীরে ধীরে প্রবেশিনু গিয়া। দেখিলাম
বিচিত্র নিলয় ; চারিধারে সুরোপিত
শ্রেণীবদ্ধ মহীরুহরাজি ; দীর্ঘশাখা
আবৃত পল্লব পুষ্পে ছায়া-সুশীতল ;
বিবিধ বিহঙ্গ তাহে গাহিছে বসিয়া।
মাঝখানে ঘনশ্যাম বিশাল সরসী,—
বিমল সলিলে তার তরঙ্গে দুলিয়া
ভাসিছে মরালকুল, কেহ বা বিলাসে
পক্ষপুটে বাঁকাইয়া দীর্ঘ গ্রীবাখানি
ঘুমাইছে সুকোমল কমলশয়নে।
সরোবরতীরে শ্বেতসোপান-উপরি
হেরিলাম শিবালয় ; ছাড়ি তরুশির
উচ্চ ত্রিশূলের চূড়া উঠেছে আকাশে।
মন্দিরের দুই পাশে মর্ম্মরে খচিত
বিশ্রামের গৃহ সারি-সারি ; শান্তিসুখে
অসংখ্য সন্ন্যাসী তাহে রয়েছে শয়ান।
শান্তির সে নিকেতন ; পুণ্যের লহরী
স্নিগ্ধ পুষ্পগন্ধ সম চৌদিকে উথলে।
লভিয়া সে পুণ্যঘ্রাণ দগ্ধ এ হৃদয়
অপরূপ তৃপ্তিরসে আইল ভরিয়া।
অকস্মাৎ উদ্যানের অন্তদেশ হ'তে
শুনিলাম জয়ধ্বনি। চকিতে ফিরিয়া
দেখিলাম সুনির্ম্মিত উচ্চ মঞ্চোপরি
অপূর্ব্ব মুরতি! পরিহিত রক্তবাস,
পৃষ্ঠোপরি প্রলম্বিত রুক্ষ কেশরাশি
গৈরিকে রঞ্জিত যেন,—নবীনা ভৈরবী,—
দীপ্ত চন্দনের ফোঁটা প্রশান্ত ললাটে।
দেহলতা শীর্ণ, সুকুমার,—শরতের

ওষীর শশী ; নম্র আঁখি ; সুবয়ান
কি-যেন বিষাদে মাখা, তবু তনুতটে
স্বর্গের সুষমারাশি পড়িছে উছলি।
বেদীমূলে দলে দলে পথিক প্রবাসী
চৌদিকে ঘেরিয়া ; উৰ্দ্ধবাহু উৰ্দ্ধদৃষ্টি,
"অন্ন দে মা ! অন্নদে মা !" মুখে শুধু রব।
অন্নপূর্ণা অবিশ্রাম বামকরে ধরি
সুরসাল ফলমূলে পূর্ণ পাত্রখানি
অকাতরে করিছেন দান। বহে ভৃত্য
সুবাস-বাসিত জল, আতিথ্যের ব্রতে
অক্লান্ত উৎসাহে ভরা শ্রান্তিহারা সবে।
থেকে থেকে উচ্চকণ্ঠে উঠিছে উল্লাস,—
"জয় জয় উষারাণী ! উষারাণী জয় !"
মুহূর্ত্তে বুঝিনু সব ; ফিরি ধীরে ধীরে
বেদীর অদূরে এক বকুলের তলে
দাঁড়াইনু আসি। একদৃষ্টে বহুক্ষণ
নির্ব্বাক বিস্ময়ভরে রহিনু চাহিয়া।
আঁখির আলোকে সেই স্বচ্ছ নীর সম
দেখিলাম চিত্তখানি পুণ্যালোক-ভরা ;
দেখিলাম শান্ত সব, বিলীন বাসনা,—
সে মন্দির মাঝে আজি ভক্তি বসি শুধু
বিশ্বের দেবেরে পূজে বিল্বদল দিয়া।
আপন কর্ত্তব্যপথ শুভপুণ্যক্ষণে
লইলাম চিনি। করিলাম দৃঢ়পণ।
ভাবিলাম, "ধন্য তুমি দেবী ! পতিযোগ্য
নহি আমি তব। পারি যদি শোধিবারে
অগাধ প্রেমের ঋণ, তবে ধন্য আমি।
এমন শোভন দৃশ্য কি আছে জগতে ?
অন্ধ মোহবন্ধ আজি আঁখি হ'তে মোর
গিয়েছে টুটিয়া ; নিষ্কাম এ ব্রত তব
চাই কলুষিতে চাহিনাক আর।
আজ আমি চাহি দেখাইতে, যার লাগি
সর্ব্বসুখ বিসর্জ্জিয়া সাজিয়াছ হেন
যৌবনে যোগিনী, নরাধম নারকী সে
নহে। সর্ব্ব প্রাণমনে বুঝিয়াছি আজ
পুণ্যের মহিমা ; আত্মজয়ে করি পণ
আপনার হৃদিপিণ্ড ছিঁড়িব আপনি।
পুণ্যব্রত তব দেবী ! ভাঙ্গিব না আর ;
লইনু উদ্দেশে এবে অন্তিম বিদায় ;
শুধু ভিক্ষা, পাতকীরে নিজ পুণ্যবলে
করিয়া উদ্ধার, চিরপুণ্য লোকে গিয়া
প্রেমমালাখানি পুন পরাইও গলে।"
নীরবে মুছিয়া আঁখি, মর্ম্মের মাঝার
মোহন মুরতিখানি ভাবিতে ভাবিতে
নবীন পথের পান্থ ফিরিনু অমনি।

শ্রীনিত্যকৃষ্ণ বসু।

সংবাদপত্রে।

কলিকাতা হাইকোর্টের পূর্ব্বপার্শ্বে রাস্তার পরপারে একটা বৃহৎ অট্টালিকা। পারাবতাশ্রয়ে যেমন বহু পারাবতের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নির্দ্দিষ্ট কক্ষ থাকে, এই অট্টালিকায় তেমনই গোটা পনের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র এটর্নির আফিস ও ব্যারিষ্টারের "চেম্বার" আছে। এই অট্টালিকার দ্বিতলস্থ একটা কক্ষে একখানা রক্তভোজী

জীববিশেষে পূর্ণ চেয়ারে বসিয়া নলিনীনাথ ভাবিতেছে। ঘরের মে নারিকেলের ছোবড়ায় বোনা "ম্যাটিং"এ মোড়া। সেই ম্যাটিংএর উপর একখানা মাছুরে বসিয়া একটা উড়িয়া বালক পাখা টানিতেছে, কাশিতেছে, আর আবশ্যক মত ম্যাটিংএর উপরেই নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিতেছে। তাহার পার্শ্বেই আফিসের চাপকানপরা মুসলমান দপ্তরী ঘুমাইতেছে। ঘরের চারি দিকে প্রাচীরের কোণে কোণে লম্বা লম্বা ব ...লফগুলা লালফিতা বাঁধা মকদ্দমার কাগজপত্রে পূর্ণ। চাপকানপরা ...নাথের সম্মুখে একখানা টেবিল; সেখানার বনাত নানা স্থানে ছিন্ন; তাহার উপর একখানা "ব্লটিং-প্যাড্" আছে—সেখানার অবস্থা শোচনীয়। নলিনীনাথের বামে মুক্ত দ্বারপথে দালানের অপর পার্শ্বে এক জন ব্যারিষ্টারের বসিবার ঘরে মক্কেলের গতায়াত লক্ষিত হইতেছে। নলিনীনাথ যে ঘরে বসিয়া আছে, সেই ঘরে তাহার দক্ষিণে একটা লম্বা টেবিলে ছয় সাত জন কেরাণী বসিয়া আছে; কেহ নিবিষ্টচিত্তে দলিল লিখিতেছে, কেহ কি লিখিতে লিখিতে কথা কহিতেছে, কেহ লিখিতেছে, আর লেখা তুলিতেছে, কেহ টেবিলে পা তুলিয়া ঘুমাইতেছে, কেহ বা উপস্থিত মক্কেলের নিকট গঙ্গার ইলিশ হইতে কাশ্মীরের শাল পর্য্যন্ত নানা দ্রব্য সম্বন্ধে মুরুব্বির মন্তব্য প্রচার করিতেছে। নলিনীনাথের সম্মুখে ঘরের দুইটা দ্বারের মধ্যে সংযোজিত কাচের পর্দ্দা দুইটার নিম্ন দিয়া অপর কক্ষে এটর্নি দুই জনের বসিবার টেবিল ও চেয়ার দেখা যাইতেছে। চেয়ার দুইখানাই শূন্য;—দুই জন এটর্নিই কার্য্যোপলক্ষে বাহিরে গিয়াছেন। একটা কাচের পর্দ্দার উপর দিয়া হাইকোর্টগৃহের গাত্রপ্রাচীরের কয় ফুট স্থান দেখা যাইতেছে; সেই স্থানটুকুর মধ্যেই একটা জায়গায় পাকা-গাঁথনির মধ্যে আপনার দৃঢ় মূল বিস্তার করিয়া একটা অশ্বথ-শিশু বায়ুহিল্লোলে নাচিতে নাচিতে বুঝি একদিন সমগ্র গৃহটাকে আত্মসাৎ করিবার আশা করিতেছে। ঘরে ক্রমাগত লোক আসিতেছে, যাইতেছে; কেহ কোন এটর্নির খোঁজ লইতেছে, কেহ কোন কেরাণীর সহিত কথা কহিতেছে, কেহ বা, কি কাজে জানি না, কেবল উঁকি দিয়া যাইতেছে।

নলিনীনাথ সদ্য বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এই এটর্ণির আফিসে কাজ শিখিতে আসিয়াছে। আজ একখানা দলিল নকল শেষ করিয়া বসিয়া সে পাঁচ বৎসর শিক্ষানবিশীর অবসানে স্বীয় সৌভাগ্যসম্পদের সুখস্বপ্ন রচনা করিতেছে। সে আপনার সৌভাগ্যকল্পনায় আপনি প্রফুল্ল হইতেছে—

গোসম্ভাবনাকে হৃদয়ে স্থানও দিতেছে না। সে বসিয়া ভাবিতেছে, এমন সময় সহসা তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কে অতি স্পষ্ট ও মধুর স্বরে ডাকিলেন,—"বাবু!"

নলিনীনাথ চমকিয়া চাহিয়া দেখিল, পার্শ্বে দাঁড়াইয়া—এক অনিন্দ্যসুন্দরী ইংরাজরমণী; তাঁহার ওষ্ঠাধরে রক্তাভা যেন ফাটিয়া বাহির হইতেছে, তাঁহার গাঢ়নীল নয়নে নিঃসঙ্কোচ দৃষ্টি।

আফিসে সচরাচর যে সকল মক্কেল আসে, তাহাদের মধ্যে ধুতিচাদর-পরা বাঙ্গালী ও মলিন-রঙ্গিন-পাগড়ী-মাথায় মাড়োয়ারীই অধিক; কচিৎ কখনও দুই এক জন তাম্রবর্ণ, মোটা সোটা, বলিষ্ঠগঠন ইংরাজ বা ফিরিঙ্গীও আসে; কিন্তু নলিনীনাথ আসিয়া অবধি এক দিনও আফিসে এরূপ মক্কেল আসিতে দেখে নাই। কেরাণীদিগের বিস্ময়বিস্ফারিত লোচনের কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টি দেখিয়া সে বুঝিল, আফিসে এরূপ মক্কেলের আগমন সুলভ নহে। সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া রমণীকে আসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিল। তিনি ধন্যবাদ দিয়া আসন গ্রহণ করিলেন; তখন সে বসিল।

রমণী নলিনীনাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি এটর্ণি?"

নলিনীনাথ বলিল, "না। আমি শিক্ষানবিশ। আপনার কি আবশ্যক?"

"আপনাকে বলিলেই হইবে কি?"

"কাজ যদি সহজ হয়, তবে আমিই তাহার বন্দোবস্ত করিতে পারি। নহিলে এটর্ণিদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া কর্ত্তব্য স্থির করিতে হইবে। এটর্ণি দুই জনেই কার্য্যোপলক্ষে বাহিরে গিয়াছেন; কখন ফিরিবেন, স্থির নাই। যদি অধিকক্ষণ অপেক্ষা করা আপনার পক্ষে অসুবিধাজনক হয়, তবে আমাকে সব বলিয়া গেলেই হইবে; আমি তাঁহাদিগকে সকল কথা বলিব।"

"আমার কাজ বুঝিতে হইলে আমার জীবনের একাংশের একটু নাতিবিস্তৃত বিবরণ শুনিতে হইবে; নহিলে আপনি বুঝিতে পারিবেন না। আশা করি, বিরক্ত হইবেন না।"

"বিরক্ত কি? আপনি বলুন।"

নলিনীনাথ একখানা ফুলস্কেপ কাগজ সম্মুখে টানিয়া লইল; দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলে সূক্ষ্মাগ্র পেন্‌সিলটা ধরিল, এবং টেবিলের উপর উন্নতভাবে স্থাপিত বামহস্তের করতলে মস্তকের ভারটা আংশিকরূপে স্থাপিত করিয়া মক্কেলের দিকে চাহিয়া তাঁহার কথা শুনিবার জন্য প্রস্তুত হইল—তিনি যাহা বলিবেন

তাহার সারাংশ লিখিয়া লইবে। নলিনীনাথ নূতন ব্যবসায়ের ভড়ংগুঃ অভ্যাস করিতেছিল।

রমণী সুস্পষ্ট সুমিষ্ট স্বরে বলিতে লাগিলেন ;—

আমি যখন ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষে আসি, সে আজ দশ বৎসরের কথা। আমার স্বামী গভর্মেণ্টের চাকরী লইয়া আমাকে বিবাহ করিয়া সঙ্গে লইয়া ভারতবর্ষে আসেন। তাঁহার আত্মীয় স্বজনগণ তাঁহাকে অত অল্প বয়সে বিবাহবন্ধনবদ্ধ হইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। তাই বাধাপ্রাপ্ত প্রবল প্রবাহের মত তিনি সকল বাধা তুচ্ছ করিয়া আপনার ইচ্ছামত কার্য্য করিয়াছিলেন,—কাহারও কথা শুনেন নাই। তাঁহার প্রকৃতিতে যথেষ্ট সদ্‌গুণ ছিল; কিন্তু দোষ বা গুণ তাঁহার প্রকৃতিতে যাহা ছিল, সবই আতিশয্যদোষদুষ্ট। তাঁহার হৃদয়ে দয়া, উদারতা, ভালবাসা প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে একগুঁয়েমীরও আতিশয্য ছিল। কেহ কোন কায করিতে নিষেধ করিলে, তিনি সর্ব্বাগ্রে সেই কাযটাই করিতেন।

ভারতবর্ষে আসিয়া আলফ্রেড প্রথমে উত্তর পশ্চিম-প্রদেশে একটি মহকুমার কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। ভারতবর্ষ আমার নিকট অভিনব স্থান,—বিস্ময়ের দেশ। এখানে অম্লানোজ্জ্বল রবিকর হইতে পথে ঘাটে পথিকের বেশের বর্ণ বৈচিত্র্য পর্য্যন্ত সবই নূতন,—সবই সুন্দর। মেঘকুহেলিকাশূন্য নীল আকাশ, রৌদ্রতপ্ত রাজপথ, পথে বৃহদকায় হস্তী ও দুই চাকা গোযান,—এ যেন আরব্য উপন্যাসের দেশে বিচরণ করিতেছি! তদ্ভিন্ন স্বামীর প্রেম—সেও আমার নিকট যেমন নূতন, তেমনই মধুর। সেও আলফ্রেডের স্বাভাবিক আতিশয্যবর্জ্জিত নহে। শত শোভার আগার নূতন দেশে—স্বামীর প্রেমরাজ্যে আমার দিনগুলা আনন্দে কাটিতে লাগিল। নূতন কার্য্যে, নূতন জীবনে, নূতন সংসারে, আলফ্রেডের ও আমার সময় জলস্রোতের মত বহিয়া যাইতে লাগিল।

এখানে আসিয়া একটা ব্যাপার দেখিয়া বিস্মিত হইলাম,—সেটা মানুষে মানুষে প্রভেদ; শ্বেতকায়ে ও কৃষ্ণকায়ে প্রভেদ। শ্বেতকায়ের প্রতি ভারতবাসীর সভয় সম্মান, আর তাহার প্রতি শ্বেতকায়ের দারুণ ঘৃণা, দুইই বিস্ময়কর। আর এক বিস্ময়ের বিষয়, এদেশের বহুভৃত্যের অত্যাচার। দেশে আমাদের ভৃত্যসংখ্যা নিতান্তই অল্প; এখানে বহুভৃত্য আমাদের হইয়া সকল কার্য্য করিতে গিয়া আমাদিগকে বিব্রত করিয়া তুলে।

আলফ্রেড বড় সামাজিক লোক ছিলেন। তাঁহার ব্যবহারে সকলেই পরম প্রীত হইতেন। সেই মফঃস্বল সহরের প্রায় সকল ইংরাজ কর্ম্মচারীই সর্ব্বদা আমাদের গৃহে আসিতেন। মফঃস্বলে এক এক স্থানে যে কয় জন ইংরাজ থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে মেশামিশি খুবই অধিক হয়। প্রবাস বন্ধুত্বের বন্ধন বড় দৃঢ় করে; বিদেশ পরকে আপন করে। আমরা যেখানে ছিলাম, সেখানে একটা সেনানিবাস ছিল। সেখান হইতে সৈনিক কর্ম্মচারীরা প্রায়ই আমাদের গৃহে সমাগত হইতেন। সৈনিক কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে এক জন নিত্যই আমাদের গৃহে আসিত। তাহাকে যুবক না বলিয়া, বাল্য ও যৌবন এতদুভয়ের মধ্যসীমায় অবস্থিত বলিলেই অধিক সঙ্গত হয়। তাহার মুখে কেবল গোঁফের রেখা দিয়াছে; নবোদ্গত গুম্ফরাজি তাহার আন্তরিক ইচ্ছা সত্বেও কিছুতেই রাতারাতি "কর্ণেলের" গোঁফের মত হইয়া উঠিতেছে না। আমরা সবাই হ্যারীকে ছেলেমানুষ বলিতাম। তাহার উপরিস্থ কর্ম্মচারিগণ তাহাকে নিতান্তই বাল [illegible] তেন। অল্পবয়স্ক বলিয়া সে বেচারী আমাদের হাস্য-পরিহাসে [illegible] িতে পারিত না, এক পার্শ্বে বসিয়া থাকিত। তবু সে নিত্য সন্ধ্যাকালে আ[illegible]রে বাড়ী আসিত। আমরা সকলেই হ্যারীকে ভাল বাসিতাম।

নিতান্ত প্রবল বিঘ্ন ব্যতীত সন্ধ্যায় হ্যারীর আমাদের গৃহে আসার কামাই হইত না। সামান্য বাধা[illegible], এমন কি, সামান্য ঝড়বৃষ্টিতেও তাহার আসা বন্ধ হইত না। এক একদিন বিদ্যুচ্চকিত ঘনান্ধকার রজনীতে বৃষ্টি মাথায় আসিয়া সে আলফ্রেডের কাছে কত স্নেহতিরস্কার ভোগ করিত! ক্রমে এমনই হইয়া উঠিয়াছিল যে, যখন পুষ্পসৌরভসমাকুল মন্দানিলবীজিত নিশামুখে মেঘকুজ্ঝটিকাহীন স্বচ্ছান্ধকারব্যাপ্ত আকাশে একে একে নক্ষত্রফুল ফুটিয়া উঠিত, মাথায় পাগড়ীপরা ভৃত্য কক্ষে কক্ষে আলোক জ্বালিয়া দিত, এবং দূরে সহরের হিন্দু অধিবাসিগণের অধ্যুষিত অংশ হইতে আরতির নহবৎধ্বনি কোমল হইয়া আসিয়া যেন শান্তসন্ধ্যার এক স্নিগ্ধ মাধুরীভরা করুণতার সঞ্চার করিয়া দিত,—তখন হ্যারী না আসিলেই মনে হইত,—কেন সে আসিল না? আমি কলিকাতায় চলিয়া আসিবার পরও অনেকদিন অবধি সন্ধ্যাসমাগমে আমার হ্যারীকে মনে পড়িত। সেটা বোধ করি ভাবসাহচর্য্য-মাত্র। আলফ্রেড বিদ্রূপ করিয়া হ্যারীকে বলিতেন, "হ্যারী, তুমি আমাদের ঘড়ী! তুমি আসিলেই বুঝি, রাত্রি আসিতেছে।"

কতকগুলা জিনিস আছে, যেগুলা পুরুষ সহসা বুঝিতে পারে না, রমণী সহজেই পারে। প্রেম সেইগুলার মধ্যে একটা। কাহারও কাতর নয়নের সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে প্রেমের প্রকাশ লক্ষ্য করা, কাহারও মুখের ভাবে প্রেমের প্রভাব অনুভব করা, কাহারও কথাবার্ত্তা, গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া তাহাতে প্রেমের ছায়াপাত অনুমান করা—পুরুষের কার্য্য নহে। প্রেমিক যে দিন সসঙ্কোচে বাধ-বাধ কথায়, লজ্জাকম্পিত স্বরে প্রেমিকার নিকট আপনার হৃদয়ের প্রেমের কথা ব্যক্ত করে, প্রেমিকা তাহার বহুদিন পূর্ব্বেই তাহার হৃদয়ে প্রেমের প্রথম কোকিলকূজন শুনিতে পাইয়াছে, এবং প্রেমিকের হৃদয়ে লজ্জায় ও আবেগে অহরহঃ দ্বন্দ্ব দেখিয়া মনে মনে অনেকবার হাসিয়াছে। রমণী যে পুরুষকে আত্মসমর্পণ করে, সে কেবল একটা উৎকট আবেগে দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হইয়া মুহূর্ত্তের অন্ধতায় নহে; তাহার কার্য্য চিন্তিতপূর্ব্ব—বহুদিন পূর্ব্বে স্থিরীকৃত। পুরুষ প্রবল ঝঞ্ঝা, সে আপনার বেগে এক দিকে যায়, কোন্ গাছ ভাঙ্গিবে, কোন্ গৃহ ভূমিসাৎ হইবে, কোন্ [illegible] কূল ছাপাইবে, সে সব কথা সে ভাবে না। রমণী মৃদু মন্দানিল, সে [illegible] দুলায়, যে ফুলটি ফুটায়—সবই ভাবিয়া। তাই যে প্রেম—যে [illegible] নিন্দনীয়, সে প্রেমে, সে সম্বন্ধে পুরুষের তত দোষ নাই; রমণীর দোষের সন্দেহমাত্র নাই।

আমি বুঝিলাম, হারী আমাকে ভালবাসে। সাধারণতঃ ভালবাসা বলিলে আমরা যাহা বুঝি, এ সে ভালবাসা নহে; ইহাতে দারুণ লালসা নাই, প্রগাঢ় ভক্তি আছে;—উচ্ছৃঙ্খল আকাঙ্ক্ষা নাই, শুদ্ধ শ্রদ্ধা আছে। আমি বুঝিলাম, হারী কখনও আমার কাছে তাহার ভালবাসার কথা মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিবে না, সে দূরে থাকিয়াই আমার উপাসনা করিবে। আপনি দেবদেবীপূজক—মূর্ত্তি-পূজক হিন্দু, আপনি সে ভালবাসার কথা বুঝিতে পারিবেন। আপনি দেবীর উপাসনা করেন, তাঁহার কৃপাকটাক্ষ পাইলে আর সব ত্যাগ করিতে পারেন, অথচ কবিকল্পনার সৌন্দর্য্যসার সে মূর্ত্তির দিকে লালসা-কলুষিত দৃষ্টিতে চাহিতে পারেন না—দূরে থাকিয়া ভক্তিভরা নয়নে সেই দিকে চাহিয়া থাকেন; আপনি সে ভালবাসা বুঝিতে পারিবেন।

হারী যতক্ষণ আমাদের কাছে থাকিত, তাহার তৃষিত নয়নের সাগ্রহ দৃষ্টি আমার প্রত্যেক গতিবিধির অনুসরণ করিত। কোন দিন আমাদের গৃহে আসিয়া বসিবার ঘরে আমাকে দেখিতে না পাইলে, তাহার দৃষ্টি চারি দিকে

হার অন্বেষণ করিত, তাহা আমি জানিতাম। আমার রুমাল বা পাখা পড়িয়া গেলে তাহা কুড়াইতে, আমার কোন জিনিসের আবশ্যক হইলে তাহা আনিতে হ্যারীর ব্যাকুল ইচ্ছার সীমা থাকিত না; কিন্তু লজ্জায় সে কোন কার্যই করিতে পারিত না; কেবল তাহার মুখ রক্তাভ হইয়া উঠিত। আমি সে সবই লক্ষ্য করিতাম।

আমরা যেখানে থাকিতাম, সেখান হইতে অনতিদূরে একটা ছোট পাহাড়ের উপর একটা প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ ছিল। আলফ্রেড একদিন সেখানে যাইবার জন্য একটা দল স্থির করিলেন। স্থির হইল, আমরা প্রত্যূষে অশ্বে যাইয়া ভগ্নাবশেষ দেখিয়া প্রভাতেই ফিরিয়া আসিব। গমনকালে গমনপথে যেখানে আমাদের সকলের মিলিত হইবার কথা ছিল, হ্যারী সেখানে ছিল না। সেনানিবাস হইতে আর যাঁহারা আসিয়াছিলেন, তাঁহারা বলিলেন, সে প্রত্যূষে তাঁহাদের পূর্ব্বেই বাহির হইয়াছে, কোথায় গিয়াছে, কেহ বলিতে পারে না।

আমরা অল্প দূর অগ্রসর হইয়াই দেখিলাম, ক্ষেত্রের সঙ্কীর্ণ আলির উপর দিয়া যাইতে হইবে, সে পথে অশ্ব চলে না। অগত্যা আমাদিগকে অশ্ব ছাড়িয়া সাবধানে হাঁটিয়া যাইতে হইল। পূর্ব্ব গগনে মেঘের উপর যেন অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল; লোহিত আভায় সমগ্র পূর্ব্বগগনপ্রান্ত রঞ্জিত হইয়া গেল। চারি দিকে বিনিদ্র বিহঙ্গকুল মধুর বিরাবে প্রভাতের আবাহন করিল। সূর্য্যোদয় হইল। ক্রমে সূর্য্যকর প্রখর হইয়া উঠিল। আমরা যখন গন্তব্য স্থানে উপনীত হইলাম, তখন মাথার উপর দীপ্ত রবিকর; আমরা সকলেই শ্রান্ত। সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখি, হ্যারী একটা বড় গাছতলায় একখানা গালিচা বিছাইয়া আমাদের বিশ্রামের আয়োজন করিয়া রাখিয়াছে, এবং সেই শ্রান্তির পর আমাদের শ্রমাবসানের জন্য খাদ্য ও পানীয় রাখিয়াছে। দেখিয়া সবাই অবাক! কর্ণেল হ্যারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কখন আসিলে?" হ্যারী বলিল, "আমি জানিতাম, আপনারা আসিতে শ্রান্ত হইবেন, তাই আপনাদের শ্রমবিনোদনের আয়োজন করিয়া রাখিয়াছি! আপনাদের বিস্ময়োৎপাদনের জন্য আগে এ কথা বলি নাই।" আমি বুঝিলাম,—এ অনুষ্ঠান কাহার জন্য।

আমি নিশ্চয় জানিতাম, হ্যারী কখনও আমাকে বা আর কাহাকেও তাহার ভালবাসার কথা জানাইবে না; সে কেবল দূরে থাকিয়া আমার উপাসনা করিবে। যদি এক জন দূরে থাকিয়া নিত্য তোমার উপাসনা করে, তাহার জীবনপ্রবাহ তোমার দিকে প্রবাহিত হয়, অথচ তোমাকে স্পর্শ

করিতে সাহস না করে,—সে কেবল তোমার উপাসনা করিয়াই তৃপ্তি৻ করে, তবে কে স্বেচ্ছায় সেই উপাসনার প্রত্যাখ্যান করে? কে সেই ভক্তিভরা ভালবাসার অর্চ্চনায় হৃদয়ে তৃপ্তির অনুভব না করে? আমার দুর্ব্বলতা বলিতে হয় বলুন, আমি সেই উপাসনার প্রত্যাখ্যান করিবার কোন কারণ দেখিলাম না; আমি তাহাতে তৃপ্তি-অনুভব করিতাম। আমি তাহার শ্রদ্ধার বেদীর উপর দেবীপ্রতিমার মত তাহার ভালবাসার অর্চ্চনা লইতে কোন দোষ নাই, মনকে এমনই বুঝাইতাম।

এই সময় একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনায় আমি চারি দিক অন্ধকার দেখিলাম। মফঃস্বলপরিদর্শনে যাইয়া দুরন্ত কলেরায় আলফ্রেডের মৃত্যু হইল। আমার সকল সুখস্বপ্ন ছুটিল, আমি অসহায়া,সংসারে অনভিজ্ঞা,—অথচ আমার নিজের সব আমাকেই করিতে হইবে! আশ্রয়তরুচ্যুতা ব্রততীর মত আমি নিরুপায় হইয়া পড়িলাম। আমি অকূল পাথারে ভাসিলাম। সেই আমার প্রথম শোক, সেই আমার প্রথম দারুণ দুশ্চিন্তা ও যাতনা। এত দিন প্রেমের স্বপ্নে, প্রাচুর্য্যে, চিন্তাহীন—সুখময় জীবন কাটাইয়াছি; এখন কি করি?

আলফ্রেডের জীবন বীমা করা ছিল। দ্রব্যাদি সব বিক্রয় করিয়া আমি সেই টাকাটা বাহির করিতে কলিকাতায় আসিলাম। টাকা পাইলাম। কিন্তু সে কয় সহস্র টাকায় কয় দিন চলিবে? দেশে ফিরিয়া আত্মীয়স্বজনগণের গলগ্রহ হইয়া থাকিবার ইচ্ছা আমার আদৌ ছিল না। আমি কি কার্য্য করিব?

পূর্ব্বে আমি সখ করিয়া মধ্যে মধ্যে কোন কোন সংবাদপত্রে প্রবন্ধাদি লিখিতাম। ভাবিলাম, যদি সম্ভব হয়, সংবাদপত্রে লিখিয়াই জীবিকার অর্জ্জন করিব। স্বাধীন ব্যবসা; যেমন শ্রম করিতে পারিব, তেমনই পারিশ্রমিক পাইব। পূর্ব্বে সংবাদপত্রে যে সব প্রবন্ধাদি লিখিয়াছিলাম, সেইগুলা লইয়া একদিন উদ্বেগাকুলহৃদয়ে একখানা সংবাদপত্রের সম্পাদকের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। সম্পাদক আমার অবস্থা শুনিলেন, আমার লিখিত প্রবন্ধগুলায় চোখ বুলাইলেন; শেষে বলিলেন, "আপনি লিখিতে পারেন। আপনি যদি স্বীকৃত হয়েন, তবে আমি যেরূপ বলিব, কাগজে সেইরূপ লিখিতে পারেন।" আমি স্বীকার করিলাম। পারিশ্রমিকের বন্দোবস্ত স্থির হইয়া গেল। আমি সেই সংবাদপত্রে নিয়মমত লিখিতে লাগিলাম। সে আজ প্রায় আট বৎসরের কথা।

এ কয় বৎসর আমি সংবাদপত্রে নানা বিষয়ে প্রবন্ধাদি লিখিতাম। ক্রমে ক্রমে কাগজখানার সহিত আমার সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ হইয়া আসিতেছিল। গত ক্রীষ্ট-মাসের সময় আমাদের প্রচলিত প্রথামত সংবাদপত্রে গোটাকয়েক গল্প দিবার কথা। কিন্তু গল্পের বড় অভাব। সম্পাদক ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। নিত্য নানারূপ প্রবন্ধ লিখিয়া আমার আত্মশক্তিতে কিছু অতিরিক্ত বিশ্বাস জন্মিয়াছিল; আমি বলিলাম, "আচ্ছা আমি আজ বাড়ী গিয়া একটা ছোট গল্প লিখিব। কাল পাইবেন।" সম্পাদক নিশ্চিন্ত হইলেন।

প্রথম যখন এ দেশে আসি, তখন রৌদ্রতপ্ত দীর্ঘ মধ্যাহ্নে বাঙ্গলোয় একাকিনী আরাম-কেদারায় শুইয়া নূতন দেশের নানা জিনিস লইয়া গল্পের আখ্যান-বস্তু মাথায় আসিত। আমি কখনও গল্প লিখিবার চেষ্টা করি নাই; করিলেই বুঝিতাম যে, গল্প লেখাটা যত সহজ ভাবিতাম, বাস্তবিক ব্যাপারটা তত সহজ নহে। চেষ্টা করি নাই বলিয়াই আমার বিশ্বাস ছিল,—চেষ্টা করিলেই ভাল গল্প লিখিতে পারিব। এখন দেখিলাম, সম্পাদকের আবশ্যকমত প্যারা ও প্রবন্ধ লিখিয়া কল্পনা-সিন্ধু বিশুষ্ক—তাহা মন্থন করিয়া সুধা বা গরল কিছুই উঠে না। আমি মহা বিপদে পড়িলাম। কাল আমি গল্প দিব এই ভরসায় সম্পাদক সব বন্দোবস্ত করিয়াছেন। এখন কি করি?

রাত্রি বারটা পর্য্যন্ত কলম হাতে করিয়া বসিয়া ভাবিলাম। সবই বিফল। শেষে সহসা মনে হইল, হ্যারীকে নায়ক করিয়া তাহার প্রেমকাহিনীর ভিত্তির উপর একটা গল্প রচনা করি না কেন? শেষে তাহাই করিলাম। আলফ্রেডের ও আমার সেই মফঃস্বল সহরে গমন হইতে আলফ্রেডের মৃত্যু ও আমার সেই সহরত্যাগ পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনার প্রায় যথাযথ বর্ণনা করিলাম; কেবল মধ্যে মধ্যে কোথাও বা একটু রং বদ্‌লাইতে হইল, কোথাও বা একটু রং চড়াইতে হইল। তাহার পর কল্পনায় আশ্রয় লইতে হইল; দেখিলাম, কল্পনা সদয়। আমি গল্পের শেষাংশে লিখিলাম, উপাসিতার গমনের সঙ্গে সঙ্গে হ্যারীর অধঃপতনের সূত্রপাত হইল, উপাসিতার বিরক্তির ভয় একদিন তাহাকে যে পথে গমন হইতে বিরত রাখিয়াছিল, এখন সে সেই পথে গমন করিল। সে ভাবিল, কাহারও প্রতি তাহার কোন কর্ত্তব্য নাই, সে সাধারণ সৈনিকদিগের পৈশাচিক উত্তেজনায়, আমোদ প্রমোদে যোগ দিতে আরম্ভ করিল;—ক্রমে একেবারে উৎসন্ন গেল।

যখন গল্প শেষ করিয়া শয়ন করিলাম, তখন প্রায় প্রভাত। ঘুম

ভাঙ্গিতে বেলা হইল। আফিসে যাইয়া সম্পাদককে গল্পটা দিলাম; তি সেটা পড়িয়া ছাপিতে দিলেন। দশ বৎসর পূর্ব্বে সুদূর মফঃস্বল সহরে যে নাটকের অভিনয় হইয়াছিল—যে অভিনয়ের কথা আমি ছাড়া কেবল প্রধান অভিনেতা ব্যতীত আর কেহ জানিতও না,সে অভিনয়ের ভিত্তির উপর স্থাপিত গল্পটা পড়িয়া কেহ যে কিছু বুঝিতে পারিবে, আমি তাহা কল্পনাও করিতে পারি নাই। স্বামী যে এই পত্র পড়িতে পারে, এ সম্ভাবনা আমার কল্পনারও অতীত ছিল। কাজেই রমণীসুলভ দূরদর্শিতার অভাবে আমি গল্পে সব নামগুলিরও পরিবর্ত্তন করি নাই।

গল্পটা ছাপা হইবার পর যখন সেটা পড়িলাম, তখন একবার মনে হইল,—কাজটা কি ভাল হইয়াছে? যদি কেহ বুঝিতে পারে? কিন্তু যখন সম্পাদক হইতে কার্য্যাধ্যক্ষ পর্য্যন্ত আফিসের সকলেই গল্পটার প্রশংসা করিতে লাগিলেন, যখন সম্পাদক আমাকে বলিলেন, "আপনার গল্প লিখিবার ক্ষমতা আছে, অবহেলায় নষ্ট করিবেন না। লিখুন। আপনি নিশ্চয়ই অ্যাংলোইণ্ডিয়ান লেখকদিগের মধ্যে স্থায়ী আসন পাইবেন।"—তখন আমার আশঙ্কা গর্ব্বে নিমগ্ন হইয়া গেল। রাতারাতি একটা বড় গল্প-লেখক হইবার আশায় আমি নানা ধরণের নানা গল্প-রচনার চেষ্টা করিতে লাগিলাম।

গল্পটা প্রকাশিত হইবার পঁচিশ দিন পরে সে দিনের প্রবন্ধ ও প্যারা লইয়া আফিসে প্রবেশ করিলাম। তখন অদূরে গির্জ্জার ঘড়ীতে এগারটা বাজিল। সম্পাদকের বসিবার ঘরে প্রবেশ করিব, এমন সময় কক্ষমধ্যে দুই জনের কথোপকথন শুনিতে পাইলাম। সম্পাদকের কণ্ঠ পরিচিত; অপরের কণ্ঠ অপরিচিত।

অপরিচিতকণ্ঠ একটু উত্তেজিতভাবে বলিলেন, "এ গল্প কাহার লেখা?"

সম্পাদক স্থিরস্বরে বলিলেন, "তাহাতে আপনার কাজ কি? তিনি যিনিই হউন, আমি আপনাকে তাঁহার নাম দিতে বাধ্য নই; দিবও না।"

"একজনের জীবনকাহিনী বিবৃত করিবার আপনি কে? একজন অতি গোপনে যে কথা দীর্ঘকাল ধরিয়া অন্যের অজ্ঞাতে মর্ম্মতলে লুক্কায়িত রাখিয়াছে, কোন্ অধিকারে আপনি সে কথা সাধারণের উদ্রিক্ত কুতূহলদৃষ্টির সমক্ষে আনিতে পারেন?"

"সে অধিকার-বিচারের স্থান এ নহে। আপনি কি উন্মাদ? যদি ভদ্রলোক হন, বিনা বাক্যব্যয়ে এ কক্ষ ত্যাগ করুন।"

"আমিই ভ্রান্ত। আমি অন্ধ উত্তেজনায় আপনাকে চাবকাইতে আসিয়াছিলাম। এখন নিজের ভ্রম বুঝিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।"

আগন্তুকের কণ্ঠস্বর যেন আবেগে রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। তিনি বলিলেন, "যাহাই হউক, অনুগ্রহ করিয়া গল্প-লেখককে বলিবেন, তিনি মানব-চরিত্র বুঝেন না। সকল মানব পশু নহে; সকল প্রেম অধঃপতনের পথ নহে। তিনি যে প্রেমের বর্ণনা করিয়াছেন, সেই প্রেমই প্রেমিককে সকল অপবিত্রতা হইতে রক্ষা করে।"

আমি স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলাম। আগন্তুক বাহিরে আসিয়াই আমার সম্মুখে পড়িলেন। আমি চিনিলাম—হ্যারী! আট বৎসরে তাহার চেহারায় অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে; কিন্তু আমার চিনিতে কষ্ট হইল না। সম্মুখে আমাকে দেখিয়া প্রথমে হ্যারীর গণ্ডদ্বয় আকর্ণ রক্তিমাভ হইয়া উঠিল; তাহার পর মুহূর্ত্তমধ্যে সে বর্ণ কপোতকর্ব্বুরে পরিণত হইল।

আমি কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া কৃত্রিম প্রফুল্লতাসহকারে বলিলাম, "হ্যারী, কেমন আছ?" আমি করমর্দ্দনের জন্য হাত বাড়াইলাম, হ্যারী আমার প্রসারিত কর গ্রহণ করিল না। সে মাতালের মত অস্থির ভাবে একপদ পিছাইয়া গেল, তাহার পর বলিল, "তবে আপনিই গল্প লিখিয়াছেন?"

আমি আবার বলিলাম, "হ্যারী, কবে আসিয়াছ?"

হ্যারী সে কথার উত্তর দিল না; বলিল, "আপনি কাযে যাইতেছেন, আমি বিলম্ব করাইব না।" তাহার পর একবার আমার দিকে চাহিয়া মস্তক অবনত করিয়া সে দ্রুতপদে সেথান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। তাহার সে দৃষ্টিতে কি যাতনা, কি তিরস্কার! সেই দৃষ্টির স্মৃতি এখনও যেন শাণিত ছুরিকার মত আমার হৃদয়ে বিদ্ধ হইতেছে।

আমি তাহার সহিত দেখা করিতে চাহি। তাহার নিকট ক্ষমা না চাহিয়া আমি স্থির হইতে পারিব না।

এখন কি করা কর্ত্তব্য?

রমণীর শেষ প্রশ্ন শুনিয়া নলিনীনাথ যেন চমকিয়া উঠিল। তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া এতক্ষণ সে তদ্‌গতচিত্তে তাঁহার কথা শুনিতেছিল। কাগজে পেন্সিলের একটা আঁচড়ও কাটা হয় নাই!

রমণী আবার বলিলেন, "হ্যারী এখন কোথায় আছে, আমি জানিতে চাহি।

আমি বরাবরই তাহাকে কেবল 'হ্যারী' বলিতাম, তাহার বংশগত ন ভুলিয়া গিয়াছি। সেদিন তাহার বেশ দেখিয়া বুঝিয়াছি, সে এখন সেনা-বিভাগে উচ্চপদস্থ। আপনারা আমাকে তাহার সন্ধান জানিয়া দিন। তাহার জন্য সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া বা আর যাহা করা আবশ্যক বিবেচনা করেন, করুন। খরচ যাহা হয়, আমি দিব। এখন এই টাকা লউন, আর যাহা খরচ হয়, লিখিলেই দিব।"

রমণী ব্যাগ হইতে একখানা একশত টাকার নোট বাহির করিয়া দিতে উদ্যত হইলেন। নলিনীনাথ বলিল, "এখন টাকা দিবার প্রয়োজন নাই। আমি এটর্নিদিগকে সব কথা বলিয়া আপনাকে তাঁহাদের অভিমত জানাইব। অনুগ্রহ করিয়া আপনার ঠিকানা দিবেন কি?"

রমণী আপনার কার্ড দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। নলিনীনাথকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া, তাহার সহিত করমর্দন করিয়া রমণী বলিলেন,—"আমি আগামী কল্য এই সময়ে আসিব। আপনি এটর্নিদিগকে সব বলিয়া, তাঁহাদের মত লইতে ভুলিবেন না।" তাহার পর তিনি কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

রমণী চলিয়া যাইতে না যাইতেই দুই তিন জন কেরাণী তাড়াতাড়ি আসিয়া নলিনীনাথকে জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয়, ব্যাপারটা কি? মেম কি বলিল?" নলিনীনাথ যেন একটু বিরক্তিসহকারে উত্তর দিল, "সে কথায় তোমাদের কাজ কি?" কেরাণী কয় জন আপনাদিগকে অপমানিত বোধ করিল। তাহারা যে যাহার চেয়ারে বসিল।

নলিনীনাথ বসিয়া ভাবিতে লাগিল; আর অপমানিত কেরাণীরা মধ্যে মধ্যে তাহার প্রতি বিরক্তদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল।

প্রায় এক ঘণ্টা পরে এটর্নি দুই জনের মধ্যে এক জন ফিরিলেন। তিনি আফিস হইতে যাইবার সময় বা আফিসে আসিবার সময় কখনও ধীরপদে চলিতেন না। তিনি নলিনীনাথের বসিবার ঘরের মধ্য দিয়া দ্রুতবেগে আপনার বসিবার ঘরে প্রবেশ করিলেন। তিনি চোগাটা খুলিয়া চেয়ারে বসিতে না বসিতে নলিনীনাথ তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিল। টেবিলের কাছে একখানা চেয়ার টানিয়া বসিয়া নলিনীনাথ এটর্নিকে সব কথা বলিল। সব শুনিয়া এটর্নি একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "এরূপ মক্কেল এটর্নির আফিসে দুর্ল্লভ, এবং আপনার মত যুবকের পক্ষে প্রলোভনের বিষয়। এ ব্যাপারটা প্রেমঘটিত। এটর্নির আফিসে নানাপ্রকার দান ও বিনিময়ের কায হয় বটে, কিন্তু

দান ও প্রেমবিনিময়, এ ব্যাপার, বোধ হয়, কখনও হয় নাই। যাহা হউক—তিনি যাহা করিতে বলেন, আমরা করিতে প্রস্তুত আছি। আপনি টাকাটা রাখিলেন না কেন? কাল তিনি যখন আসিবেন, তখন আমি যদি আফিসে না থাকি—রসিদ দিয়া টাকাটা লইবেন।"

শুনিয়া নলিনীনাথ আপনার বসিবার ঘরে আসিতেছিল। সে দ্বার অবধি আসিতে এটর্নি আবার বলিলেন, "কাল যখন মহিলাটি আফিসে আসিবেন, তখন যদি আমি আফিসে না থাকি, তবে রসিদ দিয়া টাকাটা রাখিতে ভুলিবেন।"

পীরু-সা মিনার বা ত্রিশূলমন্দির।

প্রাচীন গৌড়নগরের মধ্যে গৌরাঙ্গদেবের সময় হইতে একটি মেলা বসিয়া থাকে। ঐ মেলা রামকেলী গ্রামে হইত বলিয়া তাহা রামকেলী মেলা নামেই বিখ্যাত। জ্যৈষ্ঠমাসের সংক্রান্তিতে এই মেলা আরম্ভ হয়, এবং এই মেলার সময়েই প্রাচীন গৌড়ের ভগ্নাবশেষপরিদর্শনের বিশেষ সুবিধা। এই রাম-কেলীর মেলার নিকটেই কয়েকটি ভগ্নাবশেষ বিশেষ দ্রষ্টব্য; তন্মধ্যে পীরু-সা মিনার অন্যতম। হিন্দুগণ সাধারণতঃ এই মিনারকে ত্রিশূলমন্দির নামে অভিহিত করে। এ বৎসর বাঙ্গলার ছোট লাট বাহাদুর গৌড়-পরিদর্শনে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রমণের সচিত্র-বিবরণ-লেখক এই মিনারকে গৌড়স্তম্ভ বা Tower of Gaur আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। (১)

এই মিনার গৌড়ের গড়ের বহির্ভাগে রামকেলী মেলা, বা সুবৃহৎ "বারো-দুয়ারি মসজিদ" হইতে প্রায় অর্দ্ধক্রোশ দূরে অবস্থিত। ইহা প্রস্তর ও ইষ্টক দ্বারা নির্ম্মিত। ইহার উচ্চতা ৫০ হস্তেরও অধিক, এবং বেড় প্রায় বিংশতি হস্ত। মিনারে উঠিবার জন্য ইহার মধ্যভাগে শঙ্খগর্ভাকারে সোপানশ্রেণী আছে। মিনারের নিম্নভাগ অপকৃষ্ট মার্ব্বেল পাথরে ও প্রবেশদ্বার সুন্দর নীল প্রস্তরে নির্ম্মিত ও সম্মুখভাগ প্রস্তরে খোদিত গোলাপ পুষ্প দ্বারা পরি-শোভিত। লতাপুষ্পাদিখচিত ইষ্টক এই স্তম্ভের গাত্রে পরিশোভিত। এই স্তম্ভের

(১) 'এম্প্রেস' পত্রের অগষ্ট সংখ্যায় উল্লিখিত ভ্রমণ-বিবরণ ও চিত্র প্রকাশিত হইয়াছিল।

বহির্ভাগ পূর্ব্বে শ্বেত ও নীল মার্ব্বেল পাথর দ্বারা সুন্দররূপে নির্ম্মিত হইয়া. কিন্তু এই সকল মার্ব্বেল কালাপাহাড়গণের দ্বারা স্থানান্তরিত হইয়াছে।

আবিসিনীয় মালিক ইন্দিল স্বীয় প্রভুকে হত্যা করিয়া সুলতান ফিরোজ-সাহ নাম গ্রহণ পূর্ব্বক ১৪৮৮ খ্রীষ্টাব্দে (৮৯৩ হিজরাব্দ) গৌড়ের রাজসিংহাসন অধিকার করেন। মুসলমান ও ইংরাজ ইতিহাসলেখকগণ ইহাকেই মিনার-নির্ম্মাতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু মালদহের জনশ্রুতির রসনা স্বনামখ্যাত হোসেন সাহকেই মিনার-নির্ম্মাতা বলিয়া থাকে। এ সম্বন্ধে যে জনশ্রুতিটি প্রচলিত আছে, তাহা এ স্থলে প্রদত্ত হইল ;—

"পীরু সাহ নামক জনৈক রাজমিস্ত্রি ইষ্টকগৃহনির্ম্মাণে হো সাহের সময় অতিশয় সুখ্যাতিলাভ করে। হোসেন সাহ ইহাকে এ রম-ণীয় মিনার-নির্ম্মাণের আদেশ করেন, এবং পীরু নীল ও শ্বেত মার্ব্বেল র ও কারুখচিত ইষ্টকের দ্বারা উক্ত মিনার নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করে। উপ ছাদ-নির্ম্মাণ অবশিষ্ট আছে, এমন সময়ে হোসেন সাহ মিনার দেখিতে আই , ও মিনারের রমণীয়তায় মুগ্ধ হইয়া পীরুর নির্ম্মাণকৌশলের প্রশংসা রন। ইহাতে হতভাগ্য পীরু অদৃষ্টবশে বলিয়া ফেলে যে, সে ইহা অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট-তর মিনার নির্ম্মাণ করিতে পারে। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া হোসেন সাহ বলেন, "আমার ভাণ্ডারে কোন্ মশলার অভাব যে, তুই আপনার কৌশল সম্পূর্ণ দেখাইতে পারিলি না? তোর কার্য্যের উপযুক্ত পুরস্কার দিতেছি।" এই বলিয়া হোসেন সা পীরু সাকে মিনারের উপর হইতে ফেলিয়া দিয়া প্রাণদণ্ড-বিধানের আদেশ দেন। পীরু দণ্ডভোগের প্রাক্কালে আপন নামে মিনারকে অভিহিত করিবার প্রার্থনা করায় হোসেন সাহের আদেশে মিনার পীরু-সা মিনার নামে অভিহিত হইয়া থাকে। জনশ্রুতি এই যে, মাধাইপুরের রাজমিস্ত্রি আসিয়া মিনারের অবশিষ্ট ভাগ নির্ম্মাণ করে। এই মিনার-নির্ম্মাণ উপলক্ষেই বৈষ্ণবমণ্ডলে বিখ্যাত রূপ ও সনাতন গোস্বামিদ্বয়ের বুদ্ধিমত্তার প্রতি হোসেন সাহের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। মাধাইপুর মহানন্দা নদীর পূর্ব্বতীরের অনতিদূরে ইংরেজবাজারের অপর পারে অবস্থিত। এই মাধাইপুর রূপ সনাতনের বাসস্থান, ইষ্টক ও সুনিপুণ রাজমিস্ত্রিগণের জন্য বিখ্যাত ছিল।

পারসীতে নীল বর্ণকে ফিরোজা বলে। কেহ কেহ বলেন, এই মিনার নীল মার্ব্বেলে রচিত বলিয়া ইহার ফিরোজা মিনার নাম হয়। "ফিরোজা" অবশেষে "পীরুসা"য় পরিণত হইয়াছে।

ইহাকে হিন্দুগণ "ত্রিশূলমন্দির" কেন বলেন, তাহার কোন হেতু দেখা যায় না। তবে ইহা যে হিন্দু দেবালয় বা প্রাসাদ ভাঙ্গিয়া নির্ম্মিত, তাহার সন্দেহ নাই। কারণ এই স্তম্ভগাত্রে বহুসংখ্যক হিন্দুখোদিত চিত্র দৃষ্ট হইয়াছে। রাভেন্সা লিখিয়াছেন,—"Some remarkable Hindu carvings, apparently representing a boar hunt, were discovered on the door sills and limble." রাভেন্সা মালদহের মাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তিনি মিনার সম্বন্ধে লিখিতেছেন যে, ইহার দ্বারের চৌকাটে বরাহ-শীকারের চিত্র খোদিত দৃষ্ট হইয়াছিল। বরাহ-শীকার সম্ভবতঃ ভগবানের বরাহ অবতারের চিত্র ছিল। ইহা হইতে অনুমিত হয় যে, ত্রিশূলমন্দিরাখ্য কোন হিন্দু মন্দির পীরু-সা মিনারে পরিণত হইয়াছে।

পীরু সার কীর্ত্তি এখনও বিলুপ্ত হয় নাই। মিনারের ছাদ পীরু সার নির্ম্মিত ছিল না, তাহা গঠিত হইয়াছে। সর্ব্বধ্বংসী কাল মিনারের পীরু-সা-নির্ম্মিত অংশ এখনও বিনষ্ট করিতে সক্ষম হয় নাই।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বঙ্গীয় ব্যবসায়ের পূর্ব্বে মান্দ্রাজ নগরীস্থ অধ্যক্ষের অধীনেই পরিচালিত হইত। ১৬৮১ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গীয় ব্যবসায়ের তত্ত্বাবধান জন্য সর্ব্বপ্রথমে মিঃ হেজেস (Mr. Hedges) নামক এক জন ইংরাজ অধ্যক্ষ বা গবর্ণর নিযুক্ত হন। ইনি গৌড়-পরিদর্শনের জন্য ১৬৮৩ খ্রীষ্টাব্দে মালদহে আগমন করিয়া পীরু-সা মিনার দেখিয়া যান। ইহার পর হইতে বর্ত্তমান ছোট লাট পর্য্যন্ত বহুসংখ্যক উচ্চপদস্থ মান্যগণ্য পদস্থ ইংরাজ ও গবর্ণর জেনারেলগণের মধ্যে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক, এই মিনারের সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া গিয়াছেন। আমাদের মহারাণীর মধ্যমপুত্র স্বর্গীয় ডিউক অব এডিনবরা বাহাদুরও এই মিনার দেখিয়াছিলেন। মেজর ফ্রাঙ্কলিন, বুকানন হামিল্‌টন্, কানিংহাম, রাভেন্সা প্রভৃতি মিনারের কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

শ্রীরাধেশচন্দ্র শেঠ।

রাজা রামমোহন রায়।

"সাহিত্যে" অনেক দিন পূর্ব্বে রাজা রামমোহন রায়ের সম্বন্ধে কতিপয় "অজ্ঞাত-বৃত্তান্ত" আমরা মুদ্রিত করিয়াছিলাম।* শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, স্বপ্রণীত "রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিতের" তৃতীয় সংস্করণে "সাহিত্য" পত্রের ও সেই সঙ্গে তৎপ্রবন্ধ-লেখকেরও নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন।† সাহিত্যসেবীদের নিকট ইহা একটি সুসংবাদ, তাহার আর সন্দেহ কি ? সাধারণকে, বিশেষতঃ উক্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ভাবী চতুর্থ সংস্করণের উপকরণ-স্বরূপ এই উপহার-অর্পণে এখন আমরা আবার অগ্রসর হইতেছি।

১। রামমোহন রায়ের স্মৃতিচিহ্ন ও স্মরণার্থ সভা।

অনেকেরই সংস্কার, রামমোহন রায়ের স্মৃতি-চিহ্ন-রক্ষার্থ এ দেশে কোনরূপ উদ্যোগই হয় নাই। বক্ষ্যমাণ প্রকরণে প্রাগুক্ত সংস্কার, বিপরীত প্রতিপন্ন হইবে। এতৎ-কথা-সংক্রান্ত বিষয়-সমুদয়, একে একে পশ্চাৎ নিবদ্ধ হইল।

১৮৪২ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসের "বেঙ্গল্ স্পেক্‌টেটর্" পত্রে রাজা রামমোহন রায়ের বিষয়ে বিস্তর বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। যথা,—

১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৭ শে সেপ্টেম্বরে বিলাতের বৃষ্টল নগরে রাজা পরলোকে প্রয়াণ করেন। তাহার পর, বহু মাস অতিক্রান্ত হইলে—প্রায় এক বৎসর অতীত হইয়া গেলে—ভারতে তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা-প্রদর্শনোদ্দেশে স্মরণার্থ-সভার সূচনা হইয়াছিল।

ক।—১৮৩৪ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে কলিকাতাস্থিত "টাউন্-হলে" এক মহতী সমিতির অধিবেশন হয়। লোকান্তরিত রাজা রামমোহন রায়ের কীর্ত্তি চিরস্থায়িনী করাই, ঐ সভাস্থ সমবেত সদস্য-মণ্ডলীর অভিপ্রেত। বৈদেশিক রাজপুরুষকুলই উহার অনুষ্ঠাতা।

---

* সাহিত্য ; ১২৯৮ সাল, ফাল্গুন।

† নগেন্দ্রনাথ বাবুর প্রণীত রামমোহন রায়ের জীবনচরিত, ৩য় সংস্করণ ৫৬৩—৫৬৫ পৃঃ।

খ।—মাননীয় সার্ জন্ পিটার গ্রাণ্ট সাহেব-মহোদয়, সভাপতিরূপে বৃত হয়েন। গ্রাণ্ট মহোদয়, তদানীন্তন "সুপ্রিম কোর্টের" বিচারপতিত্বে আসীন ছিলেন।

গ।—তদুপলক্ষে ৫ (পাঁচ) জন, বক্তৃতা করিবার ভার গ্রহণ করেন,—

১। জে. প্যাটল্।

২। বাবু রসিককৃষ্ণ মল্লিক। ✓

৩। এইচ্. এম্. পার্কার।

৪। টি. এম্. টর্টন্।

৫। জে. সদার্লণ্ড।

প্রথমোক্ত ব্যক্তি আমাদের অপরিচিত। দ্বিতীয় ব্যক্তির পরিচয়, প্রকারান্তরে প্রদত্ত হইতেছে। তিনি সেই সময়ের এক জন বিদ্বান্ ব্যক্তি। তৎপুত্র স্বর্গীয় মাতাব মল্লিক। তৃতীয়, পার্কার। ঐ নামে দুই জন ছিলেন। এক জন বারিষ্টার-এট্-ল,এবং অপর পার্কার, একটি পাদরি। ইনি যে কোন্ পার্কার, প্রথমে ঠিক্ নির্ণয় করা ঘটে নাই। বিশেষ বিচারে ও বিবেচনায়, অন্বেষণে ও অনুসন্ধানে—সিদ্ধান্ত হইয়াছে, ইনি বারিষ্টার পার্কারই বটেন। এই আনুমানিক যুক্তিতে সায় দিবার পূর্ব্বে আমরা পাঠকগণকে এইমাত্র বুঝিতে অনুরোধ করিব যে, তদানীন্তন সুপ্রিম কোর্টের বিচারক ও ব্যবহারাজীব লইয়াই যখন এই সভার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা, তখনই আমাদের অনুমান অমূলক কি সমূলক, তৎ-পক্ষে আর কোন দ্বিধা থাকিতেছে না। চতুর্থ ব্যক্তি, এক জন প্রধান কাউন্সিল অর্থাৎ সাহেব-উকীল। পঞ্চমের পরিচয় আমাদের জ্ঞাত নয়।

ঘ।—যে যে সভ্য লইয়া কমিটী অর্থাৎ কার্য্যনির্ব্বাহক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়, তাঁহাদের নাম-মালার তালিকা পশ্চাৎ প্রদর্শিত হইল।

১। সার্ জন্ পি. গ্রাণ্ট।

২। টি. ই. এম্. টর্টন।

৩। এল্. ক্লার্ক (ইনি এক জন কাউন্সিল্)।

৪। জে. সদার্লণ্ড।

৫। জি. জে. গর্ডন।

কিন্তু কি পরিতাপ, এই সুমহান্ উদ্যম ফল-প্রসূ হওয়া দূরে থাকুক, কিছুই কার্য্যে পরিণত হয় নাই। সুতরাং বলিতে হয়, "বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া"।

২। রামমোহনের কার্য্যের গুরুত্ব।

(রাজা রামমোহন রায় ও দিল্লীরাজ দ্বিতীয় অকবর।)

রাজা কি বিনা পারিশ্রমিকে দিল্লীশ্বরের নিমিত্ত বিলাত গমন করেন ? কি ঘটনায় কি বিষয় ব্যক্ত হয়, বলা যায় না। এখানে যে কথার অবতারণা করিতেছি, একটা বিবাদ তাহার আদি।

দিল্লীর পদচ্যুত সম্রাট্ দ্বিতীয় অকবরের অমাত্য রাজা মোহনলাল ও জাকুত আলি খাঁ নামক এক খোজার মধ্যে বিরোধ ছিল। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে তাঁহাদের কৌতুকাবহ কলহ, ঐ মহীপতির সম্মুখেই চলিল। পরস্পরের মধ্যে অশ্লীল বাণী, কুৎসা, কটু ভাষা, গ্লানি, নিন্দা, পরীবাদ রাশীকৃত হইয়া উঠিল। কাষ্ঠপুত্তলী-প্রায় সম্রাট্, সমুদয় শ্রবণ করিতে লাগিলেন। তিনি তৎকালে নাম-মাত্র মহীপাল। "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" এই খ্যাতি, তাঁহার বহু পূর্ব্বেই বিনষ্ট হইয়াছিল।

রাজা মোহনলাল কহিতে লাগিলেন,—'তুই একটা সামান্য চোপদার বৈ আর কি ? তুই মনোযোগ করিয়া নিজের কার্য্য নিষ্পাদিত কর্।—অপর খবরে তোর কি দরকার ?'

খোজাও নাছোড়বন্দা। সে, নিরুত্তর থাকিবার পাত্র নয়। সে বলিল, 'তোমাকে আমিও তুচ্ছ তৃণ জ্ঞান করি। আমার উপরেই তো বাদশাহের বহুল বিশ্বাস। প্রথমে আমার উপর রাজাদেশ অর্পিত হয়। তৎপরে আমি তোমার প্রতি, প্রত্যেক বিষয়ের ভার সমর্পণ করিয়া থাকি। তুমি কে ? তুমি আধুনিক লোক। তুমি নবাব নওয়াযিস্ খাঁর এক জন ভৃত্য ছিলে। সেই পূর্ব্ব প্রভুর পদচ্যুতি ঘটাইয়া কৃতঘ্নতাপূর্ব্বক তৎপদে সমাসীন রহিয়াছ। তোমা কর্ত্তৃক বাদশাহ কিসে উপকৃত ? তুমি ৭০,০০০ (সত্তর হাজার) মুদ্রা-ব্যয়ে রামমোহন রায়কে সম্রাটের উকীল বা প্রতিনিধি-স্বরূপ বিলাতে প্রেরণ করিয়াছ। তাহাতে কি সুফলোদয় হইয়াছে ? না—হইবে ?'

ফলতঃ, উক্ত বাদানুবাদে আমরা অবগত হইলাম, সম্রাট্‌কে ৭০,০০০ (সত্তর হাজার) টাকা (১) দিয়া রামমোহন রায়কে বিলাতে প্রেরণ করিতে হয়।

---

(1) "For some time past the greatest enmity and jealousy has subsisted between the Emperor's minister Raja Sohun Lall and one of the eunuchs Jakoot Alee Kanh which lately broke forth into reproaches in the

ব্যয়, প্রবাস-ব্যয় ইত্যাদিতে তৎকালে বিলাতে তাঁহার বিস্তর ব্যয়িত হইত। তথায় তিনি "লর্ড" শ্রেণীর সমকক্ষ-ভাবেই থাকিতেন। এদেশের বাদশাহী "ওমরা" ও হিন্দুর "সম্ভ্রান্ত লোক" যে শ্রেণীর, লর্ডেরা সেই শ্রেণীস্থ।

৩। বিলাতের পরিচ্ছদ।

কোন্ প্রকারের পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া তিনি ইংলণ্ডীয় দরবারে উপস্থিত হইতেন? ইহাও একটি জানিবার বিষয়।

ইংলণ্ড দেশের নরপতির দরবারে তাঁহার উপস্থিতিও অতি কৌতূহলোদ্দীপক ব্যাপার। বিলাতের দরবারে তদানীন্তন বাদশাহের সঙ্গে সাক্ষাতের সময়ে রামমোহন রায় ব্রাহ্মণের বেশে গমন করিতেন। উষ্ণীষ ও কাবা পরিধান করিয়া তিনি রাজসভায় নিত্যই উপনীত হইতেন। ঐ কাবা, নীলবর্ণ মকমল অথচ সুবর্ণমণ্ডিত। (২) ইহা হিন্দুস্থানী, অর্থাৎ খোট্টা মহাধনী ব্রাহ্মণের পোষাক; বাঙ্গালী হিন্দুর নয়।

Royal presence. These disputes are not of the slightest importance, for the King of Delhi is a shadow, and we should not have mentioned the subject but for the fact elicited in the dispute that *Raja Rammohan Roy* received of the King of Delhi, 70,000 Rs as his envoy to England. The following is the conversation between those two worthies, which led to the disclosure of the fact. Raja Sohun Lall contemptuously told the Eunuch that he looked on him as no better than a common *chobdar* and desired him to confine himself to his own province. At this the Eunuch took fire and replied that he considered the Minister as his inferior and subordinate, in as much as His Majesty's commands were communicated first to him, the Eunuch, and then through him, to the Minister. "Who", he added "are you"? A mere upstart of yesterday, who rose from being a servant of Nawab Nawaist Khan by getting his master displaced and stepping into his shoes, and What he asked are the services you have rendered to his Majesty? You have spent 70,000 Rupees in sending *Rammohan Roy* to England and have effected nothing."—*Samachar Darpan*, 5th June, 1833. P. 268.

(২) "In the notice in the court circular of Rammohan Roy's introduction to the King, it is stated that he wore the costume of a *Brahman*, the *turban* and *Kabah*. The latter was composed of purple velvet embroidered with gold."—*Samachar Darpan*, 22nd Feb, 1832, P. 82.

৪। বিলাতে সতীদাহের আন্দোলন।

সহমরণের আন্দোলন, তাঁহার আন্তরিক কি না? সর্ব্বদেশেই আন্দোলন, দ্বিবিধ—মৌখিক ও মানসিক, বা প্রাণগত। সতীদাহ-রাহিত্যের প্রয়াসে রামমোহনের শেষোক্ত প্রকার যত্নই অত্যন্ত স্পষ্টীকৃত। তাঁহার ইংলণ্ড-গমনের অন্যতম কারণই সতীদাহের আপীলে ঐকান্তিক বাধা-প্রদান।

"কৌন্সিল আফিসে" ১৮৩২।২রা জুলাই শনিবার প্রাতে এক সভাধিবেশন হয়। ইংলণ্ড ও ভারতের মহারাজ চতুর্থ উইলিয়মের গোঁড়া হিন্দু-প্রজাবৃন্দের "সহমরণ"-সংক্রান্ত আপীল-শ্রবণার্থ এই সভার প্রয়োজন হইয়াছিল। যাঁহারা সভাস্থ হওয়ায়, সভার শোভা, শত সহস্র গুণ বিবর্দ্ধমান হইয়াছিল, * বলিতে পারা যায়, তাঁহাদের নামের তালিকা দিতেছি।

১। কাউন্সিলের লর্ড সভাপতি।
২। " " চেন্সেলার।
৩। মাষ্টার অব্ রোলস্।
৪। বোর্ড অব্ কণ্ট্রোলের সভাপতি।
৫। এড্মিরাল্টির প্রথম লর্ড।
৬। সৈন্যদলের বেতনদাতা।
৭। মার্কুইস্ ওয়েলেস্লি।
৮। সার্ এল. সেড্ওয়েল্।
৯। " এইচ. এষ্টেট্।
১০। মাননীয় উইলিয়ম্ বথরষ্ট (কাউন্সিলের কেরাণী)

১১। রাজা রামমোহন রায়। *

ড্রিঙ্ক ওয়াটার সাহেব, আপীলের পক্ষীয় বাগ্বিতণ্ডা চালাইয়াছিলেন। (৩)

---

* "Ram Mohun Roy and several distinguished individuals connected with India, were present during the argument."—*Samachar Darpan*, 10th Nov., 1832, p 534.

† পূর্ব্ববৎ লর্ড-গণের সমীপে সমাসীন হইলেন।

(৩) (2nd July. 1832)

(1) "The Lord President of the (Privy) Council,
(2) " " Chancellor,
(3) "Master of the Rolls,
(4) "The President of the Board of Control,

১৮৩২ খৃষ্টাব্দের ৭ই জুলাই তারিখে "সহমরণ"-আন্দোলন-নিবন্ধন "প্রিভি কৌন্সিলের" এক বৈঠক হয়। তাহাতেই তাবৎ বাদানুবাদ, নির্ব্বিবাদ হয়। কিন্তু তাহাতে কোন মতামত প্রকাশিত হয় নাই। "প্রিভি কৌন্সিলের" সকল অধিবেশনেই রামমোহন রায়, উপস্থিত হইয়া, লার্ড চান্সলর সাহেবের নিকটে সমাদর পূর্ব্বক উপবেশনার্থ আসন প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। (৪)

৫। তাঁহার অসাধারণ জ্ঞানের একটি নিদর্শন।

ভারতীয়-রাজস্ব-সংগ্রহ-সংক্রান্ত নিয়ম-বিষয়ে পার্লেমেণ্ট-পক্ষ হইতে রাজা রামমোহন রায়কে যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হয়, তৎ-কর্ত্তৃক প্রদত্ত উত্তর, অতি সুন্দর—সে সব পশ্চাৎ প্রকাশ্য। (৫)

"চন্দ্রিকা" ও রামমোহন।

"সমাচার-চন্দ্রিকা" পত্রিকার সম্পাদক ও "ধর্ম্মসভার" অধ্যক্ষ ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, রাজা রামমোহনের বড়ই দ্বেষ্টা ছিলেন। তাহার বিবরণ, নিরপেক্ষ পক্ষ হইতেই প্রদর্শিত হইতেছে।

---

(5) "The first Lord of the Admiralty,

(6) The Pay-master of the Forces.

(7) The Marquis of Wellesley

(8) Sir L. Shadwell.

(9) Sir H. Easte.

(10) The Hon'ble William Buthurst

(11) "The *Raja Rammohan Roy* sat near their Lordships as on the former occasion.

Mr. Drinkwater resumed his address in support of the appeal."—*Samachar Darpan.* 10th Nov, 1832 P. 535.

(৪) "At all the meetings of the Privy Council for the consideration of this subject (Sutee petition) Rammohan Roy was present, and was honoured with a seat beside the Lord Chancellor."—*Samachar Darpan*, 3rd Nov, 1832, p 518.

(৫) "We are happy to perceive the interest with which *Raja Raman Roy's* replies to the Parliamentary queries on the Revenue system ndia has been received by the native community."—*Samachar Dar-* , 7th. July, 1832, p 315.

"সমাচার-দর্পণে" "চন্দ্রিকার" উত্তর-স্বরূপ এক নাতিদীর্ঘ সন্দর্ভ মুদ্রিত হইয়াছিল,—"শ্রীযুত রাজা রামমোহন রায়ের বিষয়ে "চন্দ্রিকাতে" যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, এতদ্বিষয়ে এক পত্র, এই সপ্তাহে প্রকাশ করা গেল। "চন্দ্রিকা"-সম্পাদক মহাশয়ের তদ্বিষয়ক প্রস্তাবের একটা গণনাতে এক ভ্রম হয় এবং তাহা আমারদিগের পত্রপ্রেরক মহাশয় কর্ত্তৃক দর্শিতও হইয়াছে। রাজা রামমোহন রায়, বিলাতে যে সকল উত্তর করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার তাদৃশ যশস্বিতা বোধ হইতেছে না। এক দিগে "হরকরাতে" জমীদারের পক্ষ বলিয়া তাঁহার প্রতি দোষারোপ করিতেছেন। অন্য দিগে "চন্দ্রিকা"-সম্পাদক মহাশয়, জমীদারের বিপক্ষ বলিয়া যা ইচ্ছা, তাহাই বলিতেছেন। আমরা এতদ্বিষয়ে মৌনাবলম্বন করিলাম। রাজা রামমোহন রায়ের বিলাতে গমন করাতে এবং তথায় যে সকল উদ্যোগ করিয়াছেন, তাহাতে এতদ্দেশের যে, বিলক্ষণ মঙ্গল হইবে, তাহাতে কিছু সন্দেহ নাই। যদ্যপি এতদ্বিষয়ে আমারদিগের কিছু সন্দেহ থাকিত, তবে ভারতবর্ষে উক্ত উভয় পক্ষের অন্যতরকেও যে, তিনি তুষ্ট করিতে পারিলেন না, এতদ্দৃষ্টেই সে সন্দেহ দূর হইত। যেহেতুক, সত্যতা উভয়ের মাঝামাঝিই আছে।"

——সমাচার দর্পণ, ১৮৩২। ২১ শে জুলাই, ৩৩৮ পৃষ্ঠা। (৬)

৬। রামমোহন রায়ের বিলাতীয় সংবাদ।

রাজা রামমোহন রায়ের প্রতি পার্লেমেন্টের জিজ্ঞাসার যে সকল অতি মনোহর উত্তর রাজা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা "দর্পণে" প্রকশার্থ সম্পাদক

(৬) "We have given insertion to a letter containing some remarks on the observations made in the Chandrika on the subject of Raja Rammohan Roy. The Editor of that paper has fallen into a most palpable error in his calculations which our correspondent very ably exposes. Ram Mohan Roy obtains little credit for his evidence. The Harkaru rates him for being too favorable to the Zemindars, the Chandrika on the other hand is perpetually decrying him for having injured the Zemindars in his evidence. We offer no opinion on the subject. Great good will, we have no doubt flow to the country from Rammohan Roy's visit to England and from the exertion he is making. If we had any doubts on this subject they would be dispelled by his having succeeded in pleasing both parties in India. The truth lies between them."—*Samc Darpan*, 21st *July*. 1832. P 339.

শেয়কে অনেক অনেক নূতন সংবাদ ফেলিয়া রাখিতে হইত। সমস্ত উত্তর মুদ্রিত করিতে দুই সপ্তাহ লাগিবে, এইরূপ স্থির হয়। অতঃ সমাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত সম্পাদকদিগের মানস হইয়াছিল যে, আগামি "দর্পণে" সমুদায় অন্য নূতন সংবাদ প্রকাশ করা যাইবে। এ। সমাচার দর্পণ, ১৮৩২। ২৮ শে জুলাই, ৩৫২ পৃষ্ঠা দেখুন। (৭)

৭। বিলাতী বিবী বিবাহের অপবাদ।

তৎ-সময়ের বঙ্গদেশস্থ বাঙ্গালা ও ইংরাজি সংবাদ-পত্র-সম্পাদকগণ লিখিয়াছিলেন,—রামমোহন রায়, বিলাতীয় রমণীয় রমণীকে (বিবীকে) পত্নীত্বে গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। কলিকাতায় তাঁহার এক প্রণয়িনী সত্ত্বেও, এই অমূলক অপবাদের উৎপত্তি! তদ্ভিন্ন প্রকাশ্যভাবে তিনি স্বজাতীয় অনুষ্ঠান-সংরক্ষণে সদাই সমুৎসুক। এতদুভয় কারণ বর্ত্তমানে ঐ জনরব, একান্ত অসম্ভব। জাতি-ভ্রংশ-ভীতি-বিচলিত-মতির পক্ষে তাদৃশ ব্যাপার অতিমাত্র কঠোর প্রতীতি হয় না কি? যদি তিনি ভার্য্যা বিদ্যমানে বর্ত্তমান কালে পুনঃ-পরিণয়-প্রয়াসী হইতেন, তবে তাঁহার শত্রুদল অধিকতর প্রবল হইত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। (৮)

রাজা রামমোহন রায়ের শ্বেতাঙ্গী-পত্নী-গ্রহণের যে অতি কৌতুকাবহ

---

(৭) "We have been obliged to exclude many items of recent intelligence to afford room for *Raja Rammohan Roy's* very interesting replies to the Parliamentary queries, which we believe will yet extend to two numbers. We propose, therefore until the replies are concluded, to devote our papers of Wednesday exclusively to news."——*Samachar Darpan. 28th July, 1832*, P 852.

(৮) "We observe that many have given currency to a foolish report that *Rammohan Roy* was about to marry an English Lady. Seeing he has a wife in Calcutta, and has always been careful to avoid the loss of caste by any manifest violation of the Hindu Shastras, we consider the report as utterly incredible. Were he to attempt, in his circumstances to seek any Lady as his wife, we should certainly consider him worthy of all the contempt and abuse, which have ever been vented aginst him by his worst enemies."—S. Darpan, 3rd Nov, 1832, P 518.

উঠিয়াছিল, তাহা কিন্তু একান্ত অমূলক। তিনি নিজেই তা৲
দ করেন। (৯)

্বার মূলে "ধর্ম্মসভার" দল ছিলেন। বিপক্ষেরা বিবিধ উপায়ে তাঁহাকে
্থ ও জাতিচ্যুত করিবার যথেষ্ট চেষ্টা করিতেন, ইহা তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

৯। তাঁহার প্রতি এ দেশীয়দের কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ।

"জ্ঞানান্বেষণ" তৎকালে একখানি উৎকৃষ্ট সংবাদপত্র ছিল। বাবু রাম-গোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী প্রভৃতি উহার সংস্থাপক। তাহাতে লিখিতে হয়,—

গত শনিবার (১৮৩২ খৃঃ ১০ই নবেম্বর অর্থাৎ ১২৩৯ সাল, ২৬শে কার্ত্তিক) ব্রাহ্মসমাজে এক সভাধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ ঠাকুর, সভাপতির অধিকার-গ্রহণে অনুরুদ্ধ হইয়া ঐ উচ্চাসনে আসীন হয়েন। কতিপয় প্রস্তাব সমর্থিত হয়। যথা,—

১ম।—চতুর্থ উইলিয়ম এবং প্রিভি কৌন্সিলকে ধন্যবাদ করা।

২য়।—কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসকে ধন্যবাদ।

৩য়।—লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ককে ধন্যবাদ।

"চতুর্থ প্রশ্ন এই যে, শ্রীযুক্ত রাজা রামমোহন রায় মহাশয়ের দ্বারা ঐ ধন্যবাদ-পত্র, বিলাতে পূর্ব্বোক্ত উভয় বিচার-স্থানে অর্পিত হওনের বিষয়ে আপনারা কি অনুমতি করেন? তাহাতেও সভ্যগণেরা, আনন্দিতরূপে সম্মত হইলেন। বিশেষতঃ, সভ্যগণেরা, এই অভিপ্রায় প্রকাশ করেন যে, স্ত্রীহত্যা-নিবারণার্থে শ্রীযুত রাজা রামমোহন রায়ের যে পর্য্যন্ত পরিশ্রম ও নির্দ্দয়-স্ত্রী-বধিদের কটূক্তির ভাগী তিনি হইয়াছেন, বাঙ্গালির মধ্যে অন্য কাহারও এরূপ হয় নাই। অতএব এতদ্বিষয়ে তাঁহাকে এক ধন্যবাদ দেওয়া অত্যাবশ্যক।"—জ্ঞানান্বেষণ। (১০)

---

(৯) "We observe from the English papers, that Rammohan Roy has taken the trouble of contradicting the report, that he was about to marry an English lady."—*Samachar Darpan*, 10*th* Nov, 1832, P 538

(১০) ১৮৩২। ১৭ই নবেম্বরের "সমাচারদর্পণে" উহা উদ্ধৃত হইয়াছিল।

"শ্রীযুক্ত বাবু হরিহর দত্ত কহিলেন,—

*　　　*　　　*

"ধন্যবাদ-পত্র, শ্রীযুক্ত রাজা রামমোহন রায়ের নিকট প্রেরণ এবং তাঁহার নিকট এই এই প্রার্থনা করা যায় যে, তিনি স্বয়ং, এই আবেদন-পত্র-সকল প্রদান করেন এবং কমিটীর অধ্যক্ষদিগকে ক্ষমতা দেওয়া যায় যে, ইংলণ্ডে অন্য আত্মীয়দিগকে লিখেন যে, যদি ঐ রাজা, আবেদন-পত্র, উপস্থিত হইবার সময়ে তথায় উপস্থিত না থাকেন, তবে অন্য কাহারও দ্বারা আবেদনপত্র অর্পণ করেন।" * * *

"পরে শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রশেখর দেব, প্রস্তাব করিলেন—'উক্ত রাজা, এ বিষয়ে অনেক পরিশ্রম করিয়াছেন। অতএব তাঁহাকেও ধন্যবাদ দেওয়া আমাদের কর্ত্তব্য হয়'।"

"ইহাতে শ্রীযুত বাবু শ্যামলাল ঠাকুর, সম্মত হইলেন। উক্ত প্রস্তাবকে সকলেই, আহ্লাদ-পূর্ব্বক স্বীকার করিলেন।"

* * * "শ্রীযুত কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, (১১) অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত বক্তৃতা করিলেন এবং এদেশের কুরীতি নীতি বহিষ্কৃত করণে উক্ত রাজা, অনেক চেষ্টা পাইয়াছিলেন, এ বিষয়েরও প্রসঙ্গ করিয়াছিলেন।"

* * * "শ্রীযুক্ত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র, স্ত্রী-দাহ-নিবারণের বিষয়ে শ্রীযুক্ত রামমোহন রায়ের প্রশংসায় ও ব্রাহ্ম-সমাজ-সৃজনের আদি কারণের জন্য অনেক বক্তৃতা করিলেন।"—সংবাদকৌমুদী, ১৮৩২ খৃঃ।(১২)

এবার এই পর্য্যন্ত। আবার যদি কখন কিছু পাওয়া যায়, "সাহিত্য"-পাঠকদিগকে উপহার দিব।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।

---

(১১) ইনিই উত্তরকালে রেভারেণ্ড কে. এম্. বানর্জি নামে খ্যাত হয়েন।

(১২) সমাচারদর্পণ, ১৮৩২। ২৪ শে নবেম্বর, ৫৫৯ পৃষ্ঠা।

সহযোগী সাহিত্য।

জীবনচরিত।

কাউণ্ট টলষ্টি।

বর্ত্তমান সময়ে য়ুরোপের ভিন্ন ভিন্ন দেশে যে সকল খ্যাতনামা ঔপন্যাসিক, আপনাদের প্রতিভা-সেবার ফলে সভ্য জগতের পাঠকদিগের মনোযোগ আকৃষ্ট অবকাশকাল রঞ্জিত, সহানুভূতি সঞ্জীবিত, কল্পনা মুকুলিত ও শ্রান্তি বিদূরিত করিয়াছেন ও করিতেছেন, রুসিয়ার কাউণ্ট-টলষ্টি তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহার অমরলেখনীপ্রসূত বহু গ্রন্থ বিবিধ ভাষায় অনূদিত হইয়া নানাদেশীয় পাঠককে আনন্দ ও শিক্ষা দান করিয়াছে। সম্প্রতি আমেরিকা হইতে How Count L. N. Tolsti lives and works, নামক যে পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা হইতে কাউণ্টের সম্বন্ধে নানা কথা জানিতে পারা যায়।

সাহিত্য-প্রেমিক।

পাঠকগণের অবগতির জন্য আমরা সেই পুস্তকের নানা অংশের সারসংগ্রহ হইতে এই প্রবন্ধ সঙ্কলিত করিলাম। সাহিত্য সম্বন্ধে কাউণ্টের যেরূপ আগ্রহ, তাহাতে তাঁহাকে সাহিত্য-সেবক না বলিয়া সাহিত্য-প্রেমিক বলিলেই অধিকতর সঙ্গত হয়। একটা ভাল গল্প শুনিলে তাঁহার আনন্দের আর সীমা থাকে না। একবার তিনি লেখককে একটা আদালত-ঘটিত গল্প বলেন; ঘটনাটা প্রকৃত;—ঘটনার স্থান মস্কো। গল্পটা শেষ করিয়া তিনি বলিলেন,—"এ যেন মোপাসার ধরণের একটা গল্প। নবীন লেখক এ গল্প লিখিতে পাইলে নিশ্চয়ই বিশেষ প্রীত হন।" তাহার পর তিনি ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "হয় ত আমিই গল্পটা লিখিব।" যেন তাঁহার ভয় হইয়াছে, পাছে আর কেহ গল্পটা লিখিয়া বসে। ইহার কিছু দিন পরে তিনি আর একজনকে সেই গল্পটা বলিয়াছিলেন; তখন, বোধ হয়, তাঁহারও অজ্ঞাতসারে, তাঁহার কল্পনা সেই ঘটনাটাকে উপন্যাসোচিত শাখা পল্লবে সুশোভিত করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু একটা ঘটনা পাইলেই যে তাঁহার প্রতিভাবহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, এমন নহে। প্রথমতঃ জিনিসটার নূতনত্ব থাকা চাই; তাহার পর, সেটার গুরুত্ব ও উপন্যাসের হিসাবে প্রকৃত মূল্য থাকাও নিতান্ত আবশ্যক। ইহার পর যদি ঘটনার বিষয় ও পাত্র সম্বন্ধে কাউণ্টের অভিজ্ঞতা থাকে, তবেই তিনি সেই ঘটনার ভিত্তির উপর রচনা আরম্ভ করিতে পারেন। ইহার পর যদি ঘটনাটা তাঁহাকে পাইয়া বসে, তবেই তিনি প্রকৃত শিল্পসুলভ অখণ্ড মনোযোগের সহিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ঘটনার পাত্রদিগের সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতা থাকা চাহি। তিনি

বিষয়নির্ব্বাচন।

শুনিয়া লিখিতে বড় নারাজ, দেখিয়া লেখার বড় পক্ষপাতী। এ বিষয়ে য়ুরোপের অন্য দুই দেশে দুই জন প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিকের সহিত কাউণ্টের বিশেষ সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। ইংলণ্ডের অমর লেখক চার্লস্ ডিকেন্স কুহুমের পার্শ্বে

.টি ভুলিতেন না; তিনি সকল খুঁটিনাটি লক্ষ্য করিতেন ও বর্ণনা করিতেন। .াহার সাহিত্যিক জীবনের মূলমন্ত্র ছিল—যাহা করিবার উপযুক্ত, তাহাই সুচারুরূপে করিবার উপযুক্ত—(whatever is worth doing is worth doing well.) তাঁহার উপন্যাসে বর্ণিত চিত্রে আলোক ও ছায়ার সম্পাতে কোথাও অস্বাভাবিকতা নাই; যেন জীবন্ত চিত্র নিতান্তই সম্ভব। তাঁহার উদ্যানে প্রস্ফুট কুসুমের সঙ্গে ঝরা ফুলও আছে—ফুলের পার্শ্বে কাঁটাটিও আছে, অলির সঙ্গে দুষ্ট কীটও আছে, আবার অলির গুঞ্জনও যেমন আছে, তাহার দংশনজ্বালাও তেমনই আছে। তিনি আপনি সব না জানিয়া না বুঝিয়া লিখিতেন না। তাঁহার পুস্তক পাঠ করিতে করিতে মনে হয়, যেন আমরা তাঁহার বর্ণিত চরিত্রগণে পরিবৃত হইয়া তাঁহারই বর্ণিত রাজ্যে বিচরণ করিতেছি। বর্ণনা সম্বন্ধে ফ্রান্সের খ্যাতনামা লেখক,—বাস্তবাদর্শের বুঝি কিছু বাড়াবাড়ি রকমের পক্ষপাতী ও অনুসারী—জোলাও এইরূপ। তিনিও শুনিয়া লিখিতে নারাজ। তিনিও আপনার উপন্যাসে বর্ণিত সব নিজে ভাল করিয়া না দেখিয়া কলম ধরেন না। "La Curee" রচনার সময় তিনি বর্ণিত যান সকল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দর্শন করিয়াছিলেন, এবং কয় জন প্রসিদ্ধ যান-নির্ম্মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আবশ্যক জ্ঞাতব্য বিষয় জানিয়া আসিয়াছিলেন। "Renee"র উদ্ভিদগৃহ-বর্ণনার সময় তিনি Jardin des Plantes উদ্ভিদগৃহ দর্শন করিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহার প্রসিদ্ধ পুস্তক La Debacleএর রচনাকালে তাঁহাকে যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। আর একখানি গ্রন্থের রচনার জন্য তিনি পর্ব্বতপ্রমাণ ধর্ম্মপুস্তক হইতে ঘটনা-সংগ্রহ করিয়াছিলেন; এবং তখন ধর্ম্মমন্দিরে গমন করিয়া ধর্ম্মযাজকের উপদেশও শুনিয়া .সিতেন। সাহিত্যে এইরূপ সত্যপ্রিয়তা, সাহিত্যের প্রতি আন্তরিক ভালবাসার ও .হিত্যের উপযোগিতা সম্বন্ধে স্থিরবিশ্বাসের ফল। ইহা সর্ব্বাঙ্গীন সত্যপ্রিয়তার আংশিক বিকাশমাত্র। স্বাধীন, নিঃসঙ্কোচ, সত্যপ্রিয় জাতির পক্ষেই এরূপ সত্যপ্রিয়তা সম্ভব। আমাদের দেশে সর্ব্ববিষয়ে এইরূপ সত্যপ্রিয়তা দেখাইয়া গিয়াছেন—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

কাউণ্টের রচনা-প্রণালী প্রাচীন চিত্রকরদিগের অঙ্কনপ্রণালীরই মত। সঙ্কলিত পুস্তকের রচনা-প্রণালী স্থির ও উপাদানসংগ্রহ শেষ করিয়া, খুঁটিনাটির প্রতি কিছুমাত্র মনোযোগ না দিয়া, কাউণ্ট দ্রুত পুস্তকখানার একটা খসড়া প্রস্তুত করেন। তাহার পর, হয় তাঁহার পত্নী, (কাউণ্টেস সোফিয়া অ্যানড্রিভনা) নয় ত তাঁহার কোন কন্যা, নয় ত তাঁহার রচনাপ্রিয় কোন বন্ধু, তাঁহার পুস্তকের সেই খসড়াখানি নকল করিয়া দেন।

রচনা-প্রণালী।

কাউণ্ট সাধারণতঃ সস্তাদামের কাগজে লিখিয়া থাকেন;—হাতের লেখা জড়ান; অক্ষরগুলা বড় বড়। সময় সময় দিন কুড়ি পৃষ্ঠাও লিখিয়া থাকেন, কিন্তু ছাপায় তাহা বড় অধিক হয় না। তিনি সকালে নয়টা হইতে আরম্ভ করিয়া তিনটা পর্য্যন্ত রচনাকার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন। তাঁহার পত্নী সেই সময়ের মধ্যে কাহাকেও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে দেন না। বোধ হয়, স্বয়ং রাজ্ঞী আসিলেও কাউণ্টেস্ তাঁহাকে স্বামীর কাযের সময় স্বামীকে বিরক্ত করিতে দেন না।

পুস্তকের প্রথম খসড়া নকল হইয়া আসিলে, কাউণ্ট তাহাতে কাটকুট আরম্ভ ক
কথা কাটা হয়; ভাবের পরিবর্ত্তন করা হয়; নূতন জিনিস বসান হয়।—ক্রমে নূতন লেখা,
কাটায়, পত্রপ্রান্তে লেখায়, পার্শ্বের পৃষ্ঠায় লেখায়, খাতাখানা অদ্ভুত মূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়।
তখন সেখানা পরিষ্কার করিয়া নকল করা হয়।—এবারও পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন চলে,
এবং শেষে আর একবার নকল করা হয়। তাহার পর আর একবার সংশোধন ও পরিবর্দ্ধন
চলে। কাউণ্ট সময় সময় এক একটি অধ্যায় দশবারও লিখিয়া থাকেন। কিন্তু তিনি
বাহ্যিক অংশের প্রতি আদৌ দৃষ্টিপাত করেন না; এমন কি, তিনি অতিমাত্র-সুচারুরূপে
সম্পাদিত শিল্পের উপর বিরক্ত। তিনি বলেন, তাহাতে অনেক সময় চিন্তার উৎস শুষ্ক
হইয়া যায়, ভাব বিকলাঙ্গ হইয়া পড়ে।

রচনা যত অগ্রসর হয়, কাউণ্ট ততই আপনার স্মৃতিপটে বিরাজিত ঘটনাদির ও সংগৃহীত
উপাদানের সদ্ব্যবহার করেন। প্রত্যেক নায়কের চরিত্র যাহাতে সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত
হয়, তাহাই তাঁহার প্রধান চিন্তনীয় বিষয়।

প্রথম চেষ্টায়—উজ্জ্বল ভাবসাহচর্য্যে তিনি অতি অল্প বর্ণনাই করিতে পারেন। ক্রমে
পুনর্লিখন ও পুনর্গঠনকালে নানা অস্পষ্ট বিষয় সুস্পষ্ট হইয়া উঠে, নানা সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল বিষয়
অস্পষ্ট ও ম্লান করিয়া দেওয়া হয়। রচনা কতকটা অগ্রসর হইলে কাউণ্ট তাঁহার বন্ধু
বান্ধবদিগকে পুস্তক পড়িয়া শুনান; উদ্দেশ্য—তাঁহাদিগের সমালোচনায় রচনার দোষ-
গুণ বুঝিতে পারিবেন। এ উদ্দেশ্য সকল সময় সফল হয় না, তাহা বলাই বাহুল্য। The
Power of Darknessএর রচনা সম্পূর্ণ হইলে তিনি কয় জন কৃষককে তাহা পড়িয়া
শুনাইয়াছিলেন। কিন্তু যেখানে করুণরসের এমনই প্রাবল্য যে লেখক স্বয়ং কাঁদিয়া ফেলি-
ছিলেন, সেখানেও তাঁহার শ্রোতাদের মধ্যে কেহ কেহ হাস্যসংবরণ করিতে পারে নাই!

টলষ্টর পুস্তকের সর্ব্বাপেক্ষা কঠোর সমালোচক তাঁহার পত্নী। তিনি তাঁহার
স্বভাবসিদ্ধ নিঃসঙ্কোচভাবে আপনার মতামত ব্যক্ত করেন। কাউণ্ট কখনও তাঁহার মতের
যাথার্থ্য স্বীকার করেন, কখনও বা আপনার মতের সমর্থন করেন। এক

পত্নীর সমালোচনা।

দিন লেখক কাউণ্টেসের সহিত চা পান করিতেছিলেন। কাউণ্টেস
তখনই War and Peaceএর নূতন সংস্করণের "প্রুফ" দেখিয়া আসিয়াছেন। পুস্তকখানা
তাঁহার ভাল লাগে কি না, এক জন অতিথি এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে কাউণ্টেস বলিলেন,
"কোন কোন স্থান ভাল লাগে, আবার কোন কোন স্থান পূর্ব্বেও ভাল লাগে নাই, এখনও
ভাল লাগে না।" দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি যেখানে Pierre গ্রেপ্তার হইয়া হাসিল, সেই স্থানের
উল্লেখ করিলেন;—তাঁহার মতে, সেরূপ স্থলে হাস্য করা অস্বাভাবিক।—সেই সময় কাউণ্ট
স্বয়ং টেবিলে উপস্থিত হইলেন, এবং কথোপকথনের বিষয় জানিতে পারিয়া পত্নীকে বলিলেন,
"তুমি এমন দৃঢ়ভাবে ব্যাপারটা অস্বাভাবিক বলিতেছ কেন? আমি আজই এক জনের
বিবরণ পড়িতেছিলাম; সে গ্রেপ্তার হইয়া উচ্চহাস্য করিয়া বলিল,—'তোমরা আমার
মতের জন্য আমায় জেলে পুরিতেছ; কিন্তু আমার মত কি এখানে বন্ধ আছে?' Pierre হয় ত
ঠিক সেই ভাবে হাসিয়াছিল।"

কাউণ্টেস বলিলেন, "না। অমন সময়ে হাস্ত নিতান্তই অস্বাভাবিক। তুমি কেমন করিয়া এ ব্যাপারটার সমর্থন করিতেছ, বুঝি না।"

"যে ব্যাপারটা তুমি বুঝ না, সেটা কেমন করিয়া অসম্ভব বলিতেছ, তাহাই আমি বুঝি না।"

"আমার মত এইরূপ।"

এইখানে তর্ক শেষ হইল। অল্পক্ষণের মধ্যেই টলষ্টির মুখ পূর্ব্বভাব ধারণ করিল।

পতির কার্য্যে পত্নীর এরূপ আকর্ষণ ও মনোযোগ—বিরল না হইলেও সুলভ নহে। এই স্থলে দুই জন ফরাসী ঔপন্যাসিকের পত্নীর উল্লেখ করিলে নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ডোডের পত্নী নিজে সাহিত্যরসিকা ছিলেন। তিনি স্বামীর প্রতিভায় আপনার প্রতিভা নিমগ্ন করিয়াছিলেন; আপনার স্বাতন্ত্র্য ভুলিয়া স্বামীর কার্য্যে সাহায্য করিতেন। আর জোলার পত্নী তাঁহার স্বামীর কোন গ্রন্থ পাঠও করেন না। আমাদের দেশে কোন প্রসিদ্ধ লোকের জীবনে তাঁহার পত্নীর প্রভাব জানিবার উপায় নাই—সে সম্বন্ধে আমাদের নিতান্তই —'জেনানা সিষ্টেম'। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন,—"স্ত্রীই আমার জীবনের কল্যাণস্বরূপা।" আবার,—"একজনের প্রভাব আমার জীবনে বড় বেশী রকমের—আমার পরিবারের।"

পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন।

টলষ্টি কোন নূতন পুস্তকের রচনা করিতেছেন, এই সংবাদ প্রচারিত হইতে না হইতেই নানা লোক আপনাদের অবস্থা জানাইয়া পুস্তকখানি প্রার্থনা করে। শেষে প্রায়ই কাহাকেও না কাহাকেও গ্রন্থখানি দান করা হয়। জগতে ঘটনার বিরাম নাই। পুস্তকের মুদ্রণ আরব্ধ হইলেও এমন হয় যে, কোন ঘটনার বিবরণ জানিয়া তিনি পুস্তকে বহুলপরিমাণে পরিবর্ত্তনের প্রবর্ত্তন করেন। যত বার প্রুফ আসে, ততবারই পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন চলে। যদি কাগজে স্থানাভাব না হইত, এবং ছাপাখানার তাড়া না থাকিত, তবে বোধ হয় তাঁহার পুস্তকে পরিবর্ত্তন কখনও শেষ হইত না। লেখক বলেন, যদি কাউণ্ট ৯৯ বার প্রুফ পান, তবে ততবারই পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করেন। কোন ঘটনা লিপিবদ্ধ করিবার পর তিনি বাস্তবজীবনে তাহার অনুরূপ ঘটনার সন্ধান করেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, প্রথমে পুস্তকে Anna Karenina জীবননাশ করা গ্রন্থকারের অভিপ্রেত ছিল না। কিন্তু বাস্তব জীবনে বর্ণিত ঘটনার অনুরূপ একটা ঘটনা ঘটে; তাহাতে নায়িকা স্বেচ্ছায় রেলগাড়ীর নীচে পড়িয়া আপনার জীবন শেষ করে। সেই ঘটনার কথা জানিয়া টলষ্টি আপনার উপন্যাসে পরিবর্ত্তন করেন।

প্রভাতে সাহিত্যসেবার পর টলষ্টি সাধারণতঃ একটু বেড়াইতে বাহির হইয়া থাকেন।

অভ্যাস।

মস্কোতে অবস্থানকালে তিনি আকাশের অবস্থা বুঝিয়া ঘোড়ায় বা দ্বিচক্ররথে ভ্রমণে বাহির হন, বা হাঁটিয়াই বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন। মুক্তস্থানে শারীরিক শ্রম নহিলে তিনি থাকিতে পারেন না। তবে তাঁহার বয়সে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে বা দ্বিচক্ররথ হইতে পতন অসম্ভব নহে; তাই তিনি বাহির হইলে কাউণ্টেসের চিন্তার কারণ ঘটে। কিন্তু তাঁহাকে নিবারণ করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। যাহা হউক, পত্নীর প্রেমপ্রসূত ভীতিসত্বেও এখনও কোনদিন কাউণ্টের তেমন কোন

বিপদ ঘটে নাই। বসন্তের সঙ্গে সঙ্গে টলষ্টয়-পরিবার যখন মস্কৌ হইতে মফস্বলে করেন, তখন তাঁহার সুবিধা হয়। সেখানে তাঁহার অধিক অবসর হয়; তদ্ভিন্ন তিনি সহর অপেক্ষা মফস্বল অধিক ভালবাসেন।

১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে যে গৃহে টলষ্টয়ের জন্ম হয়, এখন সে গৃহ অন্যের অধিকারে। ককেসাসে অবস্থানকালে তিনি তাস খেলায় হারিয়া অনেক টাকার জন্য দায়ী হইয়া পড়েন। সেই দেনার দায়ে তাঁহাকে আপনার গৃহ বিক্রয় করিতে হইয়াছিল। এখন সে গৃহ অধিবাসিবিহীন, রুদ্ধদ্বার;—তাহার রুদ্ধ দ্বারপথে আলোক প্রবেশ করে না। আর সত্তর বৎসর পূর্ব্বে তাহারই একটি কক্ষে যে শিশু জগতের আলোক দেখিয়াছিল, আজ তাহার প্রতিভালোকে সভ্যজগতের সাহিত্যগগন সমুজ্জ্বল; সে আলোক অজ্ঞানতার অন্ধকারদূরীকরণে প্রবৃত্ত।

নানা কথা।

গৃহস্থালীর সব ভার কাউণ্টেসের উপর। তিনি তাঁহার স্বাভাবিক-শ্রমশীলতা-সহকারে সব জিনিসের ব্যবহার করেন। তিনি বিশৃঙ্খলা সহিতে পারেন না। তিনি যদি কোন কার্য্যোপলক্ষে দুই দিনের জন্য কোথাও গমন করেন, তবেই সর্ব্বনাশ—গৃহস্থালীর সব গোলমাল হইয়া যায়।

গৃহস্থালীর কার্য্যে কেহই কাউণ্টেসকে সাহায্য করিবার নাই। তাঁহার পুত্রগণ স্বতন্ত্র বাস করেন। তাঁহারা যে যাহার কার্য্যে ব্যস্ত। কন্যাদেরও আপন আপন কাজ আছে। বড় মেয়েটি ত পিতার কার্য্যেই ব্যস্ত। তিনি পিতার পুস্তক নকল করেন ও তাঁহার হইয়া পত্র লেখেন। সভ্যজগতের নানা দেশ হইতে নানা ভাষায় কাউণ্ট নিত্য এত পত্র পাইয়া থাকেন যে, তাঁহার চারিখানি হাত থাকিলেও তাঁহার পক্ষে সেগুলার উত্তর দেওয়া সম্ভব হইত না।

কাউণ্ট স্বয়ং এবং তাঁহার প্রথমা ও দ্বিতীয়া কন্যাদ্বয়—নিরামিষভোজী। কাউণ্টের বিশ্বাস, নিরামিষ আহার শরীরের পক্ষে ও মনের পক্ষে বিশেষ উপকারী। এই বৃদ্ধবয়সেও তিনি স্বয়ং কৃষকের কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারেন, ঘোড়ায় চড়িতে ও দ্বিচক্ররথে দীর্ঘপথ ভ্রমণ করিতে পারেন। তদ্ভিন্ন তিনি লন্‌টেনিস্ খেলিতেও পটু। এরূপ শারীরিক বল যদি নিরবচ্ছিন্ন নিরামিষভোজনের ফল হয়, তবে আমিষভোজন যে কিসে নিরামিষভোজন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সে বিষয়ে বিষম সন্দেহ উপস্থিত হয়। কাউণ্টেস কিন্তু নিরামিষভোজনের বিদ্বেষিণী। অনেক বিষয়ে কাউণ্টের কতকগুলি নূতন মত আছে; তিনি সেই সকল মত কার্য্যে পরীক্ষা করিয়া দেখেন। তিনি আপনার মতে বিশ্বাস করেন, তাই সহস্র অসুবিধা ভোগ করিয়াও আপনার মতানুযায়ী কার্য্য করিয়া থাকেন।

টলষ্টয়ের অদ্ভুত মত সকল কখনও সাধারণ্যে গৃহীত হইবে কি না সন্দেহ। তাঁহার মতানুযায়ী কার্য্যাবলী হয় ত নিতান্তই নিষ্ফল হইবে। তাহাতে দুঃখ নাই। তাঁহার রচনা-রাশি বহুদিন সভ্যজগতে তাঁহার স্মৃতি জীবিত রাখিবে, এবং পাঠকদিগকে আনন্দ ও জ্ঞান দান করিবে।

কবিতা-কুঞ্জ।

গান।

(মালকোষ)

জগত যা' নিয়ে যায় একবার
ফিরায়ে দেয় না আর তায়,
নিয়ে যায় সব ভেঙে চুরে, শুধু
স্মৃতিটুকু তার রেখে যায়!
একবারই আসে বসন্তে তেমতি
স্নিগ্ধ মধুর মৃদু বায়,
একবারই হাসে তেমতি ধরণী
মধুর শরত জ্যোছনায়!
নিয়ে যায় চলে নবীন শৈশবে
নবীন উন্মুখ প্রতিভায়,
নিয়ে যায় চলে' নবীন যৌবনে
নবীন উদ্দাম বাসনায়,
বিবাহের নিশি তেমতি করিয়া
একবারই শুধু বাঁশি গায়,
একবারই লাগে তেমতি মধুর
বধূর মিলন মদিরায়,
যায় সে সুখের স্মৃতি ও সুখ, সে
যদিও জড়িত যাতনায়,
মুছে যায় তাও যতই ধরণী
আঁধার হইয়া আসে হায়!
নিতি যদি ধরা তার ফুলভরা—
রাশি রাশি হাসি হেসে চায়,
যে ফুলটি হায়! ঝরে গেছে, আর
ফোটে না সে ফুল পুনরায়।

বিকাশ।

ওহে সুন্দর! মম অন্তরে আজি
একি উচ্ছ্বাস নব।
একি আকুল পুলক- হিল্লোল, প্রিয়,
নব সঙ্গীত [illegible]রব।
আজি মধুময় ধরা শো[illegible]ভা সৌরভে ভরা
নিভৃত মম কুঞ্জকুটী[illegible]রে আজি
কি নব মহোৎ[illegible]সব!

আজি বিকশিত যেন নব গৌরবে
হৃদয়-কমল মম,
তাই উচ্ছ্বসি' আজি উঠিছে প্রাণের
লাবণ্য নিরুপম;
নবীন বাসনা কত ফুটে' উঠে' অবিরত
চেয়ে আছে তোমা'পানে প্রেমালোক তরে
সূর্য্যমুখীর সম।

কত দিন তুমি হায় জেগেছ রজনী
কত না বিষাদভরে,
পারনি বুঝিতে মোরে সংশয়-ভরা
ব্যগ্র প্রশ্ন করে';
কত ন[illegible] ভালবাসা আবেগপূর্ণ ভাষা
[illegible]কাতর দীন বালিকার কাছে
বিফলে গিয়াছে মরে'।

অ[illegible] ফেলে দিব তুচ্ছ জীর্ণ চীর
হীন লাজ-আবরণ;
তুমি এস, হৃদয়েশ! হৃদি-মন্দিরে
হৃদি-মন্থন-ধন!
গোপন মরম মম দেখ অন্তরতম
দেখ কোন্ দেবপদে সঁপিয়াছি আমি
তরুণ জীবন মন।

দেখ মৌন মূঢ় সে বালিকাচিত্তে
আজি কি মত্ত আশা!
মিটাতে চাহে সে প্রেমসুধাধারে তব
চির প্রণয়-পিপাসা!
চাহে সে পরাণ খুলে' কহিতে শ্রবণমূলে
যুগে যুগে কহিয়াছে যত প্রণয়িণী
যত প্রণয়ের ভাষা।

ওহে সুন্দর, দেখ অন্তরে মম
একি ব্যাকুলতা নব।
ক্ষুদ্র হৃদয় চাহে পুরাইতে তব
আশা আকাঙ্ক্ষা সব!
রেখেছি বক্ষ ভরে' সান্ত্বনা তব তরে
ওহে অতৃপ্ত, আছে এ হৃদয়ে আজি
সর্ব্ব তৃপ্তি তব।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

ভারতী। আশ্বিন। "তুমি বুঝি মনে ভাবো!" একটি গান, হাস্যরসের উদ্রেক ইহার লক্ষ্য।—গানটি পড়িয়া আমরা হাসিয়াছি বটে, কিন্তু তাহা অন্য কারণে। "তুমি যদি আমায় না ভালবাস ত বয়ে গেল"—ইহার মধ্যে হয় ত হাস্যরসের বীজাণু প্রচ্ছন্ন আছে,—কিন্তু হায়! তাহা দেখিবার মত অণুবীক্ষণ আমাদের সন্ধানে নাই। "ভিখারী সাহেব" গল্পটির আখ্যানবস্তু অত্যন্ত অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। "শিশুতত্ত্ব" প্রবন্ধের লেখক উপসংহারে বলিয়াছেন,—"শিশুদিগকে আমরা যেরূপ উপেক্ষা ও তাচ্ছল্যের (তাচ্ছীল্যের?) সহিত দেখি তাহারা তাহার যোগ্য নহে। শৈশবলীলার মধ্যেও যে একটি মহৎ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে তাহাই প্রদর্শন করা এই প্রবন্ধের প্রধান উদ্দেশ্য।" লেখকের ভাষা দুর্ব্বোধ, এবং ইংরাজী-ভাবাপন্ন।—"তিনি পূর্ব্বানুষ্ঠিত কার্য্যাবলীর ভিতর দিয়া একবার অতি দ্রুত ভাবে যাইতেও ইচ্ছুক হ'ন"—লেখকের এইরূপ বাঙ্গালা দেখিয়া, "গোয়ালিনী-মার্কা গাঢ় দুগ্ধকে ব্যবহারে আনো!"— [illegible]কার বিলাতী বিজ্ঞাপনের বিকৃত বাঙ্গালা মনে পড়ে। বিষয়গৌরবে "শিশুতত্ত্ব" প্রশংস[illegible] কিন্তু তাহার ভাষার দারিদ্র্য শোচনীয়। ভাষার প্রতি অবহিত হইলে লেখক আমাদে[illegible] কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন। "একাদশীর সোয়ারী" প্রবন্ধে লেখক বরদা রাজ্যের একটি উ[illegible] কাহিনীর ছবি আঁকিয়াছেন। তাঁহার বর্ণচিত্রখানি হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। "তাড়িৎ পদার্থ কি?" একটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ,—আলোচনার যোগ্য। "অভিশাপ" পয়ারে গ্রথিত একটি সুদীর্ঘ রচনা। "অভিশাপে"র ললাটে "ব্যঙ্গকাব্য" এই রাজটীকা অঙ্কিত হইল কেন, বলিতে পারি না। বলিয়া না দিলে আমরা এই রচনাটিকে আর যাহাই মনে করি, কখনও ব্যঙ্গকাব্য ভাবিতে সাহস করিতাম না।

প্রদীপ। আশ্বিন ও কার্ত্তিক। প্রথমে "ভ্রষ্ট লগ্ন" নামক একটি সুরচিত ক্ষুদ্র কবিতা। কবি অতি সুকৌশলে কতিপয় ছত্রের মধ্যে কোন্ অজ্ঞাত উপকথা-নন্দনের অধীশ্বরী স্বপ্নময়ী লীলাময়ী তরুণীর তরুণ হৃদয়ের মধুর করুণ প্রেমকাহিনী চিত্রিত করিয়াছেন। কবিতার সঙ্কীর্ণ আয়তনে যতখানি পরিব্যক্ত, তদপেক্ষা অনেক অধিক অব্যক্ত কাহিনী কল্পনায় প্রতিবিম্বিত হয়। কবির কলাকৌশলে পাঠকের কল্পনা জাগিয়া উঠে, তখন সুপ্তোত্থিত কল্পনা কখনও আবেগে অধীর হইয়া সেই প্রেমময়ী লাজময়ী মায়াময়ী মানসী স্বপ্নরাণীর আকাঙ্ক্ষা-চঞ্চল হৃদয়ের তালে তালে নাচিতে থাকে, পরক্ষণে নায়িকার সরমে সঙ্কোচে মুগ্ধ হইয়া আপনাতে আপনি নিমগ্ন—মৌন হইয়া যায়। যখন 'অরুণ ধূসর পথে রাজরথে তরুণ পথিক দেখা দিয়া' কাতরস্বরে ডাকিয়া যায়—'সে কোথায়, সে কোথায়!',—তখন 'সরমে মরিয়া' মানসী মূক হইয়া থাকে—বলিতে পারে না,—'নবীন পথিক, সে যে আমি, সে যে আমি!' তার পর, যখন ফিরিয়া ফিরিয়া বার বার ডাকিয়া বাঞ্ছিত চলিয়া যায়, তখন চিরবিরহকাতরা 'শূন্য রাজপথ পানে' চাহিয়া 'জানালার তলে

...য়' বসিয়া, 'ত্রিযামা যামিনী' জাগিয়া একাকিনী গাহিতে থাকে,—'হতাশ পথিক, সে যে আমি!' ইহাই মানব-হৃদয়ের যুগযুগান্তব্যাপী বিরহকাব্য,—জগতের নিষ্ঠুর সত্য। এই নিষ্ঠুর চিরসত্যের প্রতি তৃষিত মানবের কি প্রবল আকর্ষণ! কবি কাব্যকলার কুহকে যেন সেই চিরসত্যের নিদারুণ নিষ্ঠুরতা ঢাকিয়া দিয়াছেন;—যেখানে করুণার অশ্রুমন্দাকিনী জগতের মরুক্ষেত্র সিক্ত সরস স্নিগ্ধ করিয়া তুলিতেছে, কবি সেই পুণ্য বিরহতীর্থে সেই চির-পুরাতন চিরনবীন চিরন্তন তৃষিতার মন্দির গড়িয়াছেন। শ্রীযুত হেমচন্দ্র সরকারের রচিত "আচার্য্য ম্যাক্সমূলর" নামক প্রবন্ধটি অপেক্ষা ম্যাক্সমূলরের চিত্রখানি অধিক চিত্তহারী। "স্বর্গীয় বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর" প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেন লোকান্তরিত বলেন্দ্রনাথের সাহিত্য-শক্তির পরিমাণ ও তাঁহার রচনার সমালোচনা করিয়াছেন। লেখক আরম্ভে যথার্থই বলিয়াছেন,—"বলেন্দ্রনাথের মৃত্যুসংবাদে বঙ্গসাহিত্যানুরাগী মাত্রেই শোকসন্তপ্ত হইয়াছেন।" সমালোচক বলেন্দ্রনাথের রচনার যে সমালোচনা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার ভাবুকতা ও সূক্ষ্ম-পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি ও সাহিত্যিক অভিজ্ঞতার প্রভূত পরিচয় পাওয়া যায়। "বলেন্দ্রনাথের অসমাপ্ত রচনা"—স্বর্গীয় লেখকের শেষ স্মৃতিচিহ্ন;—হায়! এত শীঘ্র বলেন্দ্রনাথ নামশেষ হইবেন, তাহা কে জানিত? "সাহিত্যে ভাগ" শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র রক্ষিতের রচনা। লেখক এত শীঘ্র নিজের 'জীবন-চরিত'-রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন কেন? "চিকিৎসক! আপনার রোগ আরোগ্য কর," এই অমূল্য উপদেশ কি তাঁহার অবিদিত? "নীরা" গল্পটি রাবিশ। এবারকার প্রদীপে আর কোনও সুপাঠ্য বা উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ নাই।

(উদ্বোধন। আশ্বিন। "বিলাতযাত্রীর পত্র" স্বামী বিবেকানন্দের লিখিত। স্বামীজীর পত্রসমূহ চিত্তাকর্ষক এবং তাঁহার বহুদিনসঞ্চিত বিবিধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্যে পরিপূর্ণ। কিন্তু পত্রের ভাষার আমরা প্রশংসা করিতে পারিলাম না। এই সকল পত্রে অসংযত চলিত ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে। তাহার কি উদ্দেশ্য, বুঝা যায় না। বিশুদ্ধ ভাষাও সরল, প্রাঞ্জল ও সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য হইতে পারে। "তিব্বত-ভ্রমণ" আর একটি সুখপাঠ্য ভ্রমণ-বৃত্তান্ত।)

বামাবোধিনী। ভাদ্র, আশ্বিন। "একটী শুভ প্রস্তাব" প্রবন্ধে সর্ব্বসাধারণের অবধান প্রার্থনীয়। এই প্রবন্ধে প্রকাশ,—কলিকাতার অনাথবন্ধু সমিতি দুঃখিনী শ্রমজীবিনীদের জন্ম "শ্রমজীবিনী সাহায্য-ফণ্ড" নামে একটী নূতন সদনুষ্ঠানের সঙ্কল্প করিয়াছেন। "কার্য্যক্ষম অনাথা দরিদ্রা রমণীদিগকে ফণ্ড হইতে মালমশলা কিনিয়া দেওয়া হইবে। তাঁহারা পরিশ্রম করিয়া যে সকল জিনিষ প্রস্তুত করিবেন, ফণ্ডের খরচ বাদে তাহার বিক্রয়লব্ধ অর্থ তাহাদিগকে দেওয়া হইবে। * * * আপাততঃ ৪০০৲ টাকায় এই ফণ্ডের কার্য্য আরম্ভ করা প্রয়োজন।" লেখকের ন্যায় আমরাও আশা করি,—"দরিদ্রহিতৈষী মহোদয়গণের সাহায্যে এ অর্থ সহজে সংগৃহীত হইবে।" "আধুনিক স্ত্রীশিক্ষার ইতিবৃত্ত" প্রবন্ধটি উপাদেয় কিন্তু সম্পূর্ণ হয় নাই। এরূপ প্রবন্ধ এক সংখ্যায় সমাপ্ত হইলে ভাল হয়।

ব্রহ্মতত্ত্ব। "ব্রহ্মবিদ্যা এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শন-বিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্র।" ৩র্থ, ভাগ, প্রথম সংখ্যা। মাসের নাম নাই কেন? বহু দিন পরে "ব্রহ্মতত্ত্বের দর্শন লাভ

করিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। "রাজা রামমোহন রায় প্রণীত বেদান্তসার" ও "শ্রীশ্রীকৃষ্ণকথামৃত" উল্লেখযোগ্য সুপ্রবন্ধ।

উৎসাহ। তৃতীয় বর্ষ, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ। বহুকাল পরে "উৎসাহে"র পুনরাবির্ভাব দেখিয়া সুখী হইলাম। প্রথমে শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের "আহিরিণী" নামক একটি ক্ষুদ্র গাথা। গদ্যকাব্যে শ্রীশবাবুর যে বিশেষত্বে আমরা মুগ্ধ, তাঁহার বর্ত্তমান কবতিায় সেরূপ কোনও বিশেষত্ব নাই। "দেশভ্রমণ" পড়িয়া "তালপুকুরে"র কথা মনে পড়িল; তালগাছ নাই, কিন্তু পুকুরের নামটি আছে। "দেশভ্রমণে"র শেষে সেই সুবিখ্যাত ভ্রমণকাহিনী-লেখক শ্রীযুক্ত জলধর-সেনের স্বাক্ষর আছে,—কিন্তু রচনায় সে বৈচিত্র্য নাই। শ্রীমতী কৃষ্ণভাবিনী দাসের "স্বদেশে ইংরেজ" পড়িয়া ইংরেজ-চরিত্রের এক অংশের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র মজুমদার "প্রেমবৈচিত্র্য" নামক একখানি উপন্যাস আরম্ভ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায়ের "প্রলয়ের ধূমকেতু" একটি চলনসই বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ। শ্রীযুক্ত হরিসাধন মুখোপাধ্যায়ের "চৌঘাটে" সাপ, ভীমরুল প্রভৃতি অনেক জিনিস আছে,—কেবল উপভোগযোগ্য কিছু নাই। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় "খুকুমণির ছড়ার" সমালোচনা করিয়াছেন। আমরা আশা করিয়াছিলাম, তাঁহার কৃত সমালোচনায় ছড়ার 'ঐতিহাসিকতা' সম্বন্ধে কিছু নূতন শুনিব, কিন্তু অক্ষয় বাবু সে পথে যান নাই। শ্রীযুক্ত রাধেশচন্দ্র শেঠ তাঁহার বহুদিন পূর্ব্বে আরব্ধ "রাজা রামানন্দ রায়" নামক প্রবন্ধে পুনর্ব্বার হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। "কবিতা-কুঞ্জে" শ্রীযুক্ত নিত্যকৃষ্ণ বসুর "দুটি তারা" নামক ক্ষুদ্র কবিতা উল্লেখযোগ্য।

আলো। আশ্বিন। শ্রীযুক্ত মাহাম্মদ মহতহসন বিল্লাচৌধুরীর "চট্টলে পর্ত্তুগীজ দস্যু" একটি সুপাঠ্য ঐতিহাসিক প্রবন্ধ। মুসলমান লেখকের বঙ্গভাষায় অনুরাগ অত্যন্ত আশাপ্রদ ও প্রশংসার্হ। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের "মেঘদূত" ও শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষের "শক্তি-বিজ্ঞান" উল্লেখযোগ্য।

তত্ত্বমঞ্জরী। ভাদ্র, আশ্বিন। "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত" পাঠ করিয়া পাঠক শিক্ষা-লাভ করিবেন। শ্রীযুক্ত জয়চন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণের "শ্রীবিষ্ণু, লক্ষ্মী ও সরস্বতী" নামক উৎকৃষ্ট সন্দর্ভটি অনুশীলনের যোগ্য। শ্রীম-মিত্রের "যুগধর্ম্ম" আর একটি সুচিন্তিত রচনা। শ্রীযুক্ত জয়-চন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণের "শ্রীকৃষ্ণরহস্য নাটকের" উদ্দেশ্য কি? ইহার নাটক উপাধি সঙ্গত নয়। রচনাটি সম্পূর্ণ ব্যর্থ বলিয়া বোধ হইল।

পূর্ণিমা। আশ্বিন। "টানাটানি" এই সংখ্যার পূর্ণিমার উজ্জ্বল মুকুট। ভাবুকের ভাবোচ্ছ্বাসে, চিন্তাশীলের সুচিন্তায়, নিপুণ শিল্পীর মুন্সিয়ানায়, "টানাটানি" হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহের সুপ্রবন্ধ "যজ্ঞ"—তৃতীয় প্রস্তাব প্রকাশিত হইয়াছে। "কান্যকুব্জে রাজসূয় এবং স্বয়ম্বর" প্রবন্ধটির নামে আগ্রহের উদ্রেক হয়। কিন্তু মোটে দুই পৃষ্ঠার প্রবন্ধের সূচনামাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। এরূপ হোমিওপ্যাথি মাত্রায় প্রকাশ করিবার প্রয়োজন কি? "পূর্ণিমায়" ক্রমশঃপ্রকাশ্য প্রবন্ধের বড় বাহুল্য;—ক্রমশঃপ্রকাশের খাতিরে অনেক সময় রসভঙ্গ হয়।

একলক্ষী।

আদীনা।

Thacker, Spink & Co.' Press, Calcutta.

বাঙ্গালা দেশে বৈষ্ণবধর্ম্ম ।

Acc 397 / 11   B2.62   12-1900
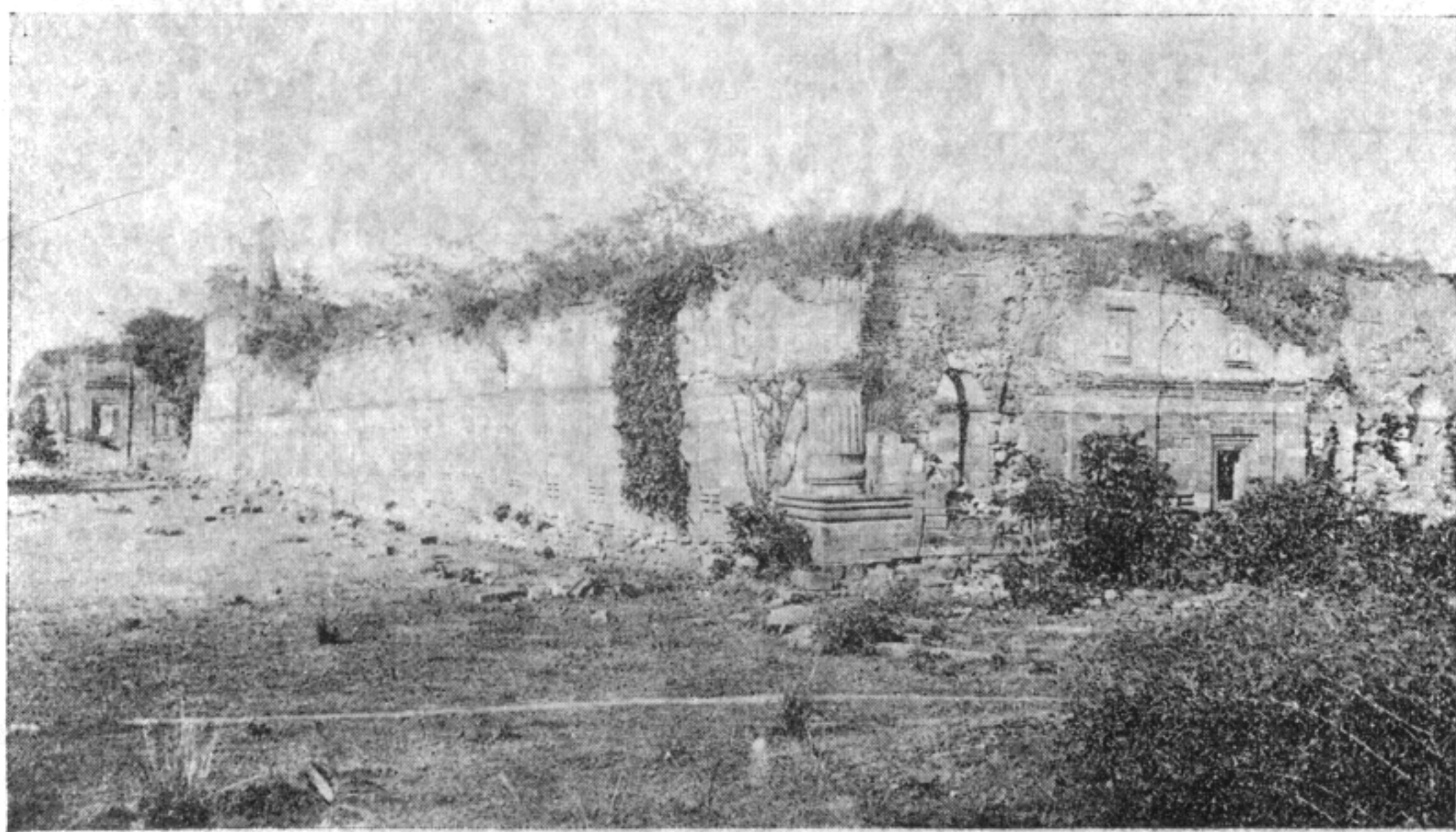
বেদের বহু সংখ্যক দেবতার মধ্যে বিষ্ণুই পরমদেবতা বলিয়া গণ্য । পরমেশ্বরকে সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বনিয়ন্তা ও সর্ব্বান্তর্য্যামী বলিয়া যখন কল্পনা করা যায়, তখন বেদবিজ্ঞানে তাঁহার "বিষ্ণু" এই মহীয়সী সংজ্ঞা নিরূপিত হইয়া থাকে । অগ্নিপূজা যেমন বৈদিক উপাসনাপ্রণালীর প্রথম সোপান, বিষ্ণুপূজাও তেমনি শেষ সোপান । যজ্ঞকালে প্রথম সবনে অগ্নি যেমন প্রধান দেবতা, তৃতীয় সবনে বিষ্ণু তেমনি প্রধান দেবতা । ঐতরেয় ব্রাহ্মণের ভাষায় অগ্নি দেবতাদের মধ্যে "অবম", আর বিষ্ণু "পরম" । বেদপন্থী-গণের মধ্যে নিকৃষ্টাধিকারিগণ বাহুল্যে যেমন অগ্নিপূজা করিতেন, উৎকৃষ্টা-ধিকারিগণ তেমনি বিষ্ণুর মহিমা হৃদয়ঙ্গম করিতে যত্নশীল হইতেন । পরে যখন সিদ্ধার্থ গৌতমের প্রচারিত নাস্তিক শীলধর্ম্ম—যাহাকে সচরাচর বৌদ্ধধর্ম্ম বলা যায়—সেই শীলধর্ম্ম যখন ভারতবর্ষে বহুলভাবে প্রচারিত হইল, তখন অনেক নিকৃষ্টাধিকারিগণ বুদ্ধের সহিত [illegible] পরাবর্ত্তনীয়কশ্যপের ন্যায় অগ্নিপূজা পরিত্যাগ করিতে লাগিল বটে, কিন্তু উৎকৃষ্টাধিকারিগণের হৃদয়ে বিষ্ণুর আধিপত্য অক্ষুণ্ণই থাকিল ।

ঈশ্বরের এই পার্থিব রাজ্যে একটি আশ্চর্য্য রহস্য এই যে, প্রায় কোন পদার্থই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়া প্রাদুর্ভূত হয় না । এ স্থানটা নিরবচ্ছিন্ন পরীক্ষার স্থান । কোনও এক মহা শিল্পী যেন কোনও একটি অচিন্তনীয় মহৎ উদ্দেশ্যসাধনের জন্য সর্ব্বদাই গড়িতেছেন, ভাঙ্গিতেছেন,—ভাঙ্গিতেছেন, গড়িতেছেন । কোনও একটাতেও যেন তাঁহার মনস্তুষ্টি হইতেছে না । তাই এখানে জন্মমৃত্যুর নিয়ম দেখি । কোনও জিনিসই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়া জন্মিতেছে না, কাযেই মৃত্যু অপরিহার্য্য থাকিতেছে । বিশ্বস্রষ্টার প্রবৃত্তি গুণের সামগ্র্যবিধিতে কেন এতই পরাঙ্মুখী, তাহা তিনিই জানেন ।

সংসারের যখন ইহাই নিয়ম, তখন যাহাকে বেদপন্থা বলা যায়, এবং যাহাকে বৌদ্ধপন্থা বলা যায়, এই দুইই যে অসম্পূর্ণ হইয়া লোকসমাজে আবির্ভূত হইবে, তাহাতে বিচিত্র কি ? বেদপন্থার বাহ্যাড়ম্বরে মনুষ্যজাতির অগ্রগামিনী বুদ্ধি যখন অসম্পূর্ণতার অনুভব করিতে লাগিল, তখন বৌদ্ধ-পন্থার শীলধর্ম্ম দেখা দিল,—কিন্তু এই শীলধর্ম্মের ভিত্তি হইতে ঈশ্বর

নিরাকৃত হওয়ায়, ইহা এক নির্ভীক কপটাচারে বা প্রকাশ্য উচ্ছৃঙ্খলে পরিণত হইল। একদা বেদপন্থার বাহ্যাড়ম্বর যেমন লোকের চক্ষে মন্দ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল, আবার পরে বৌদ্ধপন্থার যথেচ্ছাচারও তেমনি মন্দ বলিয়া পরিগণিত হইতে লাগিল। সুবুদ্ধি বেদপন্থীগণ ক্রমে ক্রমে যেমন বৌদ্ধপন্থার উৎকৃষ্ট শীলধর্ম্ম আত্মসাৎ করিতে লাগিলেন, সুবুদ্ধি বৌদ্ধপন্থীগণও তেমনি বেদপন্থার উৎকৃষ্ট ব্রহ্মবিজ্ঞান আত্মসাৎ করিতে লাগিলেন। দুই দিক হইতেই সম্মিলনের পন্থা আবার নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। বৌদ্ধেরা ক্রমে ক্রমে এক "আদিবুদ্ধ" বা আদিম সৃষ্টিকর্ত্তা মানিয়া লইলেন। আদি বুদ্ধ হইতে ধ্যানী বুদ্ধ, ধ্যানী বুদ্ধ হইতে বোধিসত্ত্ব ইত্যাদির আবির্ভাব কল্পনা করিয়া, বেদপন্থার পরমাত্মা হইতে প্রজাপতি-গণের সৃষ্টি উপাখ্যানের রূপান্তরসাধন করিলেন। আবার অন্য দিকে বৌদ্ধপন্থার বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ, এই ত্রিমূর্ত্তিকে বেদপন্থীগণ সৃষ্টিকর্ত্তা, পালনকর্ত্তা, প্রলয়কর্ত্তা নামক ত্রিমূর্ত্তিতে রূপান্তরিত করিয়া লইলেন। এইরূপে বেদ-পন্থার বিষ্ণু ও বৌদ্ধপন্থার আদিবুদ্ধ ক্রমে ক্রমে মিলনের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। "অর্ব্বাচীন" বৌদ্ধপন্থায় হীন ও মূর্খ লোকের কপটাচার বা যথেচ্ছাচার যখন অবশেষে বেদপন্থার বাহ্যাড়ম্বরের ন্যায় মন্দ বলিয়া সর্ব্বসাধারণের প্রতীতি জন্মিল,—তখন এক্ষণকার প্রচলিত "পুরাণ-পন্থা" দেখা দিল। নূতন পথটা ভাল না লাগায় লোকের মন আবার পুরাতনের দিকে গেল। তখন "পুরাণ" নামক গ্রন্থপুঞ্জ লিখিত হইল। পুরাণে বেদের পরমাত্মা ও বৌদ্ধদের আদিবুদ্ধ মিলিত হইয়া গেলেন; এবং পুরাতন "বিষ্ণু" নামেই তাঁহার নামকরণ হইল। কিন্তু সে বিষ্ণু ও এ বিষ্ণুতে আকাশপাতাল ভেদ।

পৌরাণিক বিষ্ণু একজন হস্তপদনাসাকর্ণবিশিষ্ট মনুষ্যমাত্র। তাঁর বাপ আছে, তাঁর মা আছে। তাঁর পত্নী আছে, একটি নয়, অনেকগুলি। তিনি কখনও লাড়ু খান, কখনও বা লড়াই করেন, কখনও গরু চরান, কখনও বা রাসকেলি করেন। তাঁহার মূর্ত্তি আছে, মন্দির আছে। তিনি এক সময়ে মৎস্য ছিলেন, আর এক সময় কূর্ম্ম ছিলেন, আর এক সময়ে বরাহ ছিলেন, ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, যিনি বেদের পরম দেবতা বিষ্ণু, তাঁহার এ সকল সরঞ্জাম আদৌ নাই।

পৌরাণিক বিষ্ণুর এই সকল আখ্যায়িকা যে বৌদ্ধপন্থা হইতে

য়াছে, তাহা এক্ষণে অনেকেই বুঝিতে পারিয়াছেন। বুদ্ধদেব একদিনে বা একজন্মে বুদ্ধ হইতে পারেন নাই। তিনি মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ ইত্যাদি অশেষ যোনি ভ্রমণ করিয়া অবশেষে সিদ্ধার্থ গৌতম অবতারে নির্ব্বাণ পাইয়াছিলেন। তাই বৌদ্ধেরা যখন বুদ্ধের পূজা আরম্ভ করে, তখন তাঁহার জাতক উপাখ্যান অবলম্বনপূর্ব্বক তাঁহার মৎস্যবিগ্রহ, কচ্ছপবিগ্রহ, বরাহ-বিগ্রহ প্রভৃতির পূজার সূত্রপাত হয়। বৈদিক ঋষিরা প্রতিমা কাহাকে বলে, জানিতেন না। পৌরাণিক পদ্ধতির প্রতিমার্চ্চনা বেদ হইতে উদ্ভূত হয় নাই, ইহা বিমিশ্র নরপূজামূলক বৌদ্ধাচার। বুদ্ধ নিজে এক জন আমাদের ন্যায় মনুষ্য ছিলেন, তাঁহার পিতামাতা ও বিবাহিতা পত্নী ছিল। কেবল তাহাই নয়। তাঁহার পিতা শুনিয়াছিলেন যে, বুদ্ধ সন্ন্যাসী হইয়া বাহির হইয়া যাইবেন। পুত্রকে সংসারবন্ধনে রাখিবার জন্য তিনি তদীয় প্রাসাদ বহু-সংখ্যক সুন্দরী রমণীতে পরিপূর্ণ করেন, এবং বুদ্ধ কিছুকাল তাহাদের সহিত বিলাসসুখে কালহরণ করেন। ইহাই পৌরাণিক বিষ্ণুর রাসলীলার মূল। বুদ্ধের মাতা মায়া দেবী এক্ষণে আমাদের গণেশজননী দুর্গাতে পরিণত হইয়া-ছেন। বুদ্ধের জন্মগ্রহণকালে তিনি স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন যে, এক দিব্য হস্তী দন্ত দ্বারা তাঁহার উদর বিদীর্ণ করিয়া তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। তাই বৌদ্ধেরা বাম বুদ্ধকে হস্তিমুখ দিয়া পূজা করিত, এবং সেই হস্তিমুখ দেবতা অদ্য আমাদের সিদ্ধিদাতা গণেশ হইয়াছেন। যিনি বুদ্ধের পত্নী, তাঁহার নাম কোনও কোনও গ্রন্থে যশোধরা, আবার কোনও কোনও গ্রন্থে গোপিকা। বুদ্ধপত্নী বৌদ্ধসমাজে দুই মূর্ত্তিতে উপাসিতা হইতেন। বুদ্ধের সন্ন্যাসের পূর্ব্বে বুদ্ধ ও বুদ্ধপত্নীর যুগলমূর্ত্তি, তাহা এক দেবতা। আবার বুদ্ধের সন্ন্যাসের পর বুদ্ধপত্নীও সন্ন্যাসিনী হইয়া যে সিদ্ধিলাভ করেন, তাহা আর এক দেবতা। এই যুগলমূর্ত্তি স্থানবিশেষে হরগৌরী, স্থানবিশেষে লক্ষ্মীনারায়ণ হইয়া পৌরাণিক বৈষ্ণবধর্ম্মের অঙ্গ হইয়াছে। আর গোপিকার ইতিহাস বড়ই বিচিত্র। গোপিকা বলিলে গোয়ালার মেয়ে বুঝায়। গোপিকার সহিত বুদ্ধের বিহারের গল্প হইতে কৃষ্ণের গোকুলে গোপীগণের সহিত বিহার সৃষ্ট হইয়াছে। আবার তাহারই মধ্যে কোনও রসিক কবি ভাবিয়া দেখিলেন, কৃষ্ণ ত যাদব ক্ষত্রিয় ছিলেন; পুরাণ-পন্থায় ত গোয়ালার মেয়ে যাদবক্ষত্রিয়ের পত্নী হইতে পারেন? * * * যে সকল ভিক্ষু ভিক্ষুণীগণ দুর্নীতিপরায়ণ হইয়া কাল কাটাইত, তাহারা যখন পুরাণপন্থী

হইতে লাগিল, তখন সেই সমাজের এক কবিই, বোধ হয়, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের সৃষ্টি করিয়া শ্রীমতী রাধার অবতারণা করিয়াছিলেন।

ইহাই আধুনিক বৈষ্ণব ধর্ম্মের ইতিহাস বলিয়া স্পষ্ট প্রতীতি হয়। শকাব্দের অষ্টম শতাব্দীতে শঙ্করাচার্য্য প্রাদুর্ভূত হইয়া ভারতবর্ষের সকল স্থানেই নাস্তিক বৌদ্ধগণকে আপন অলৌকিক তর্কশক্তি দ্বারা পরাভূত করিলেন। তাঁহার সময় হইতে দলে দলে বৌদ্ধেরা পুরাণ-পন্থী হইতে আরম্ভ করিল। শঙ্করাচার্য্যের সময়েও বিবিধ বৈষ্ণবসম্প্রদায় বর্ত্তমান ছিল; কিন্তু ইদানীং তাহার কোনও সম্প্রদায়ই অবিকল দৃষ্ট হয় না। এক্ষণে চারি সম্প্রদায় প্রবল,—রামানুজ, বিষ্ণুস্বামী, মধ্বাচার্য্য ও নিম্বাদিত্য। তন্মধ্যে বাঙ্গালা-দেশীয় বৈষ্ণবগণ প্রায়ই মধ্বাচার্য্য-সম্প্রদায়ী। শকাব্দের দ্বাদশ শতাব্দীতে দক্ষিণা-পথে তুলগ দেশে মধ্বাচার্য্যের আবির্ভাব হয়। এই সময়ে বাঙ্গালা দেশে জয়দেব গোস্বামী বর্ত্তমান ছিলেন। কুতূহলী পাঠক, মধ্বাচার্য্যের ধর্ম্মমতের বিবরণ স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্তের উপাসক-সম্প্রদায় নামক গ্রন্থে দেখিতে পাই-বেন। মধ্বাচার্য্য-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবেরা শঙ্করের অদ্বৈতবাদ মতের বিরোধী। ইহারা দ্বৈতবাদী, এবং জগৎকারণকে বিষ্ণু বা নারায়ণ বলিয়া পূজা করে। ইহাদের মতে, নারায়ণ বৈকুণ্ঠধামে লক্ষ্মী, ভূমি ও নীলাদেবী এই তিন পত্নীর সহিত স্বর্গীয় বেশভূষায় বিভূষিত হইয়া অনির্ব্বচনীয় ঐশ্বর্য্যসুখ সম্ভোগ করেন। সেই রসিক ও প্রেমিক বিষ্ণুর প্রতি যাঁহার প্রীতি জন্মে, তাঁহার আর জন্মান্তর হয় না। তিনি বৈকুণ্ঠবাসী হইয়া সারূপ্য, সালোক্য, সান্নিধ্য ও সাযুজ্য নামক (একপ্রকার নয়, চারি প্রকার!) মুক্তিলাভ করিয়া অনির্ব্বচনীয় সুখসম্ভোগ করিতে থাকেন।

বৈকুণ্ঠধামে যিনি নারায়ণের পত্নী, বাঙ্গালী বৈষ্ণবগণের আদিকবি জয়দেব গোস্বামী ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণের বর্ণনা-অনুসারে তাঁহাকে কৃষ্ণের প্রণয়িনীর আকারে স্বদেশবাসিগণের সমক্ষে সাজাইয়া আনিলেন। জয়দেব গোস্বামীর জীবন যেরূপ, তাহাতে তিনি যে ঐরূপ আদর্শকেই ঐশ্বরিক আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে বিস্মিত হইবার কারণ নাই। বীরভূমে অজয়নদের তীরে কেন্দুলীগ্রামে এক সামান্য ব্রাহ্মণের গৃহে তাঁহার জন্ম হয়। ঈশ্বর তাঁহাকে ললিতপদাবলীরচনার অদ্ভুত প্রতিভা প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহার সদ্ব্যবহার করিতে পারেন নাই। তরুণ বয়সেই সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া তিনি ইতস্ততঃ ভ্রমণশীল হইয়া শ্রীক্ষেত্রে উপনীত

এবং গুরুতা-ব্যবসায়ী বৈষ্ণব। গৃহী বৈষ্ণবে
ই ইহারা অতিশয় অজ্ঞ ও কুসংস্কারাপন্ন। যে
। লোক অথবা বর্ণসঙ্করভাবাপন্ন লোক বৈদিক দ্বিজাতি-
প্ত হয় নাই, তাহারা দলে দলে বৌদ্ধ হয়। আবার
র ধীরে ধরে আধুনিক বৈষ্ণব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ব্রাহ্ম-
যাজাক্রিয়া করিতেন না, এবং জলস্পর্শ করিতেন না।
কিন্তু বৌদ্ধশ্রমণেরা তাহাদিগকে গ্রহণ করায় তাহারা বুদ্ধোপাসক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। শ্রমণেরা আবার যখন বৈষ্ণব হইল, তখন ইহারাই বৈষ্ণব-শিষ্য বৈষ্ণব বলিয়া পরিগণিত হইতে লাগিল। শ্রমণদের বৈষ্ণব হওয়ার পক্ষে এক বিশেষ আকর্ষণ এই যে, বৌদ্ধরীতি-অনুসারে ভিক্ষুগণ প্রকাশ্যে ভিক্ষুণীদের সহিত স্ত্রীপুরুষের ন্যায় একত্র বাস করিতে পারে না; কিন্তু বৈষ্ণব-রীতি-অনুসারে ভিক্ষুভিক্ষুণীগণের তাদৃশ একত্র বাস কেবল দূষণীয় নয়, বরং প্রার্থনীয়।—এইরূপ একত্রবাসকে "সহজ ভজন" নাম প্রদান করিয়া তাহারা ধর্ম্মের অঙ্গ করিয়া লইয়াছিল।—এই প্রবল প্রলোভন উপস্থিত হইলে বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণ নির্ম্মূল হইয়া গেল, এবং বষ্টম-বষ্টমীতে পরিণত হইল।—সাধারণ বুদ্ধোপাসকদের উপদেষ্টৃগণ এইরূপে বষ্টম-বষ্টমী হইয়া গেলে, তাহারাও বষ্টম নাম প্রাপ্ত হইল।—এক্ষণে জয়দেব ও পদ্মাবতীর ন্যায়, কিংবা চণ্ডীদাস ও রামী রজকীর ন্যায় জাতিচ্যুত লোক প্রকাশ্যভাবে বষ্টম-বষ্টমীর দল বাড়াইতে লাগিল। * * *

বোধ হয়, স্বাধীন দেশীয় রাজা থাকিলে সমাজের এই দুর্দ্দশা বাড়িতে পাইত না। কিন্তু জয়দেব গোস্বামী ও বখতিয়ার খিলিজী আমাদের এই হতভাগ্য দেশে একই সময়ে দেখা দেন। মুসলমান রাজত্বে ঘোর সামাজিক অরাজকতা ঘটিয়াছিল। এবং সেই অরাজকতার মধ্যে বৈষ্ণবধর্ম্মের পুষ্টিসাধন হইতেছিল।

মধ্বাচার্য্য-সম্প্রদায়ে গুরুদের আধিপত্যের সীমা নাই।—গুরুগণ মন্ত্রদাতা, এবং বৈষ্ণবমাত্রকেই মন্ত্রগ্রহণ করিতে হয়। মন্ত্রগ্রহণকালে শিষ্যকে গুরুর নিকট একবারে আত্মবিক্রয় করিতে হয়। মধ্বাচার্য্যদের মধ্যে "সন্ন্যাসী ও ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য লোকের দীক্ষাগুরু হইবার অধিকার নাই। দীক্ষা-গুরুরা নিতান্ত অন্ত্যজ ব্যতিরেকে আর সকল জাতিকেই উপদেশ দিয়া থাকেন। প্রত্যেক গুরুরই কতকগুলি পৈতৃক শিষ্য থাকে, এবং তাঁহার গুরুত্বপদ বিক্রয় করিবার ও বন্ধক দিবার অধিকার আছে।" (১)

১। উপাসকসম্প্রদায়; ১ম ভাগ। পৃঃ ১১৯।

.রন। তথায় জগন্নাথ বুদ্ধ তৎকালে জগন্নাথ
জীবদ্দশায় পৈতৃক প্রাসাদে তরুণীগণ যেমন
জগন্নাথের মন্দিরে তদনুরূপ বহুসংখ্যক দেবদাসী থাকা
ছিল। এই দেবদাসীরা নামে কুমারী-ব্রত অবলম্বন করিতেন,।
জগন্নাথসেবকদেরই ভোগ্যা বলিয়া পরিণত হইতেন। পদ্মা
কলকণ্ঠী গায়িকা জগন্নাথমন্দিরে এইরূপ এক দেবদাসী ছিলেন
সহিত তাঁহার মিলন হইলে, তিনি মন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ।-ক্ষুণী-
বৃত্তি অবলম্বন করেন, উভয়ে গান করিয়া ও ভিক্ষা করিয়া দেশবিদেশে বেড়াইতে
লাগিলেন। লক্ষ্মণসেনের রাজসভায় উপস্থিত হইলে, রাজা পদ্মাবতীর সঙ্গীতে
ও জয়দেবের কবিত্বে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাদিগকে আশ্রয় দান করেন। মালদহ
জেলার পাঁড়ুয়ানগরের বাইশহাজারি মসজীদে সংরক্ষিত একখানি মিশ্র সংস্কৃত
ভাষায় রচিত "সেকশুভোদয়া" নামক গ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে যে, লক্ষ্ম-
ণের সভায় বিদ্যুৎপ্রভা নাম্নী জনৈক সঙ্গীতকুশল নটবধূ ছিল, পদ্মাবতীর গানে
সেও পরাভূত হয়। এমন কি, লক্ষ্মণের সভায় পদ্মাবতী এক দ্বিগ্বিজয়ী গায়ক-
কেও পরাভূত করিয়া যশস্বিনী হইয়াছিলেন। পদ্মাবতীর প্রতি জয়দেবের
যে অনুরাগ জন্মিয়াছিল, তাহাই তাঁহার গীতগোবিন্দে রাধাকৃষ্ণের লীলায়
পরিণত হইয়াছে।

বাঙ্গালাদেশে বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মধ্যে এইরূপে জয়দেবের প্রসাদে
রাধাকৃষ্ণের প্রেমকাহিনী চিত্তাকর্ষক ধর্ম্মসঙ্গীতে পরিণত হইল। যাহা হউক,
জয়দেবের কবিত্ব সংস্কৃতের আচ্ছাদনে আবৃত থাকায় অজ্ঞলোকের অনধিগম্য
ছিল; কিন্তু চণ্ডীদাস ঠাকুরের অনুগ্রহে অবশেষে তাহাও সংসাধিত হইল।
এই কবিও বীরভূম অঞ্চলের এক দরিদ্র ব্রাহ্মণসন্তান। তিনি এক বিধবা
রজকবধূর প্রেমে মগ্ন হইয়া বৈষ্ণব হয়েন, এবং জয়দেব যেরূপ সংস্কৃতে রচনা
করেন, তিনিও তেমনি চলিত বাঙ্গলায় তাদৃশ গান রচনা করিয়া উচ্ছৃঙ্খল
নরনারীগণের "সহজ" নামক কলুষিত রাগমার্গের আকর্ষণশক্তি বাড়াইয়া
গেলেন। ১৪০৭ শাকে গৌরাঙ্গের জন্ম, আর ১৩৯৯ শাকে চণ্ডীদাসের মৃত্যু
হয় বলিয়া কথিত হয়।—সুতরাং চণ্ডীদাসের কাব্যেই আমরা গৌরাঙ্গের
অব্যবহিতপূর্ব্বকাল-বর্ত্তী বৈষ্ণবসমাজের চিত্র অঙ্কিত দেখিতে পাই।—দুঃখের
সহিত বলিতে হয়, চিত্র অতিশয় জঘন্য।

বৈষ্ণবগণ বাঙ্গ শে এই সময়ে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন।—

াঙ্গলা দেশের বৈষ্ণবেরা বিবেচনা করেন যে, সর্ব্বপ্রকার সাধন অপেক্ষা দাশ্রয়ই সমধিক শ্রেয়ঃসাধক। "অন্যান্য অনেক উপাসকের ন্যায় ইহাদেরও গুরু ও মন্ত্রের অভেদজ্ঞান এবং গুরুকে আত্ম-সমর্পণ ও সর্ব্বস্বদান কর্ত্তব্য বলিয়া বিশ্বাস আছে। বরং তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষাও শক্তিমান ও পূজা করিয়া মানিতে হয়।

'যো মন্ত্রঃ স গুরুঃ সাক্ষাৎ যো গুরুঃ স হরিঃ স্বয়ং॥'—উপাসনাচন্দ্রামৃত।

মন্ত্রই সাক্ষাৎ গুরুস্বরূপ ও যিনি গুরু, তিনি স্বয়ং হরি।

'প্রথমন্তু গুরুঃ পূজ্যস্ততশ্চৈব মমার্চ্চনম্।'—ভজনামৃত।

অগ্রে গুরুপূজা করিয়া আমার অর্চ্চনা করিবে।

'গুরুরেব সদারাধ্যঃ শ্রেষ্ঠো মন্ত্রাদভেদতঃ।
গুরৌ তুষ্টে হরিস্তুষ্টো নান্যথা কল্পকোটিভিঃ॥—ভজনামৃত।

সর্ব্বদা গুরুর আরাধনা করিবে। তিনি শ্রেষ্ঠ যেহেতু গুরু ও মন্ত্রের বিশেষ নাই। গুরু তুষ্ট হইলেই হরি তুষ্ট হন। নতুবা কোটিকল্প আরাধনা করিলেও হরি তুষ্ট হন না।

'হরৌ রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন।' —ভজনামৃত।

হরি রুষ্ট হইলে গুরু ত্রাণকর্ত্তা আছেন, কিন্তু গুরু রুষ্ট হইলে আর কেহ নাই। গোস্বামীরা এইরূপ কুলক্রমাগত গুরুত্বপদের অধিকারী হইয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে এইপ্রকার দুর্দ্ধর্ষ গুরুত্বপদ ও একাধিপত্য প্রাপ্ত হইয়া শিষ্যদের প্রতি যথেচ্ছ অত্যাচার করেন ও নানা উপলক্ষ করিয়া তাহাদের নিকট হইতে অর্থ নিষ্পীড়ন করিতে থাকেন। রাজার রাজস্ব আদায় অপেক্ষা তাঁহাদের বৃত্তি আদায়ের শাসন কঠিন। তাঁহাদের শিষ্য-শাসনার্থ স্থানে স্থানে ফৌজদার ও ছড়ীদার নিয়োজিত থাকে। উহারা প্রভুদের আজ্ঞাপালনার্থ শিষ্যদিগকে বন্ধন ও প্রহার পর্য্যন্ত করিয়া থাকে।" (১)

এই শেষোক্ত বিবরণ যদিও গৌরাঙ্গ-সম্প্রদায়ের বর্ত্তমান গুরুগণের কার্য্য-পদ্ধতির সম্পর্কে লিখিত হইয়াছে, তথাপি গৌরাঙ্গের পূর্ব্বেও এইরূপ ব্যবহার প্রচলিত ছিল, জানা যায়।

অদ্বৈত লাড়িয়াল নামক এক বৈষ্ণব গুরু জগন্নাথ মিশ্রের প্রতিবেশী ছিলেন।—জগন্নাথের ন্যায় অদ্বৈতের পূর্ব্বপুরুষেরাও শ্রীহট্টদেশীয়। তবে জগন্নাথ বৈদিকশ্রেণীর ব্রাহ্মণ, অদ্বৈত বারেন্দ্র শ্রেণীর। অদ্বৈতের পিতার নাম কুবেরাচার্য্য; পিতামহের নাম ছকড়ি; প্রপিতামহের নাম বিদ্যাধর; বৃদ্ধ

১। উপাসকসম্প্রদায়; ১ম ভাগ। পৃঃ ১১৯।

প্রপিতামহের নাম নরসিংহ।—"ভরদ্বাজগোত্রীয় লাড়ুলিগ্রামী ন লাড়িয়ান্ তাম্বূল বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। অদ্বৈত য় গোস্বামিগণ কহেন, শ্রীহট্টের অধীন লাউড় গ্রামে নরসিংহের বাস ছিল। । হইতে এ দেশে আসিয়া বাস করেন। তাম্বূলবিক্রয় দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ । শ্রীহট্টে বাসনিবন্ধন নরসিংহ সমাজ কর্ত্তৃক আদৃত ছিলেন না। ব্রাহ্মণবালা গ্রামনিবাসী শুকদেব আচার্য্যের পিতৃশ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণেরা নরসিংহকে পংক্তি হইতে উঠাইয়া দিয়া ভোজন করিয়াছিলেন। নরসিংহ সমাজ কর্ত্তৃক এইরূপ অবমানিত হইয়া তাৎকালিক শ্রেষ্ঠ কুলীন মধু মৈত্রের সহিত করণ করিয়া কন্যাদান করার মানস করিলেন। পরিবর্ত্ত মর্য্যাদার নিয়ম অনুসারে শ্রোত্রিয়ের সহিত কুলীনের করণ হইতে পারে না, নরসিংহ ইহা অবগত থাকিয়াও আপন অভিলাষসিদ্ধির আশায় আপন কন্যা ও একটি গাভী এবং শালগ্রামশিলা নৌকাতে উঠাইয়া মাজু গ্রামে মধুর ঘাটে উপস্থিত হইয়া মধু মৈত্রকে আপন অভিলাষ জানাইলেন। মধু মৈত্র এবং তাঁহার পুত্রেরা নরসিংহের প্রার্থনাতে অসম্মতি প্রকাশ করিলে, নরসিংহ নৌকা সহিত গভীর জলে যাইয়া নৌকা ডুবাইয়া দিবার উদ্যোগ করেন। অভিপ্রায় এই যে, মধুর ঘাটে স্ত্রীহত্যা, গোহত্যা, ব্রহ্মহত্যা এবং শালগ্রাম বিসর্জ্জন হউক। মধু বিপাকে পতিত হইয়া পাপভয়ে পুত্রগণের নিষেধ সত্ত্বেও নরসিংহের সহিত করণ করিয়া তাহার কন্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই ব্যাপারে কুলজ্ঞেরা নরসিংহকে নৃসিংহ অবতার বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেন। প্রকৃতপক্ষে ইহাতে মধুর কুলক্রটি হইল।" (১)

এই বিবরণ-অনুসারে দেখা যায়, নরসিংহ এক জন জাতিভ্রষ্ট পান-বিক্রেতা ব্রাহ্মণ ছিলেন; তাঁহাকে লইয়া ব্রাহ্মণেরা এক পংক্তিতে আহার করিতেন না। অসম্ভব নয়, জাতি হারাইয়া এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ-পরিবার বৈষ্ণব-দলে মিলিত হয়েন, এবং গুরুর ব্যবসায় আরম্ভ করেন।

বৃন্দাবন দাসের বর্ণনায় অবগত হওয়া যায়, নবদ্বীপের বৈষ্ণব-সমাজ এই সময়ে একপ্রকার পতিত সমাজ বলিয়াই পরিগণিত ছিল।

গৌরাঙ্গের পূর্ব্বে আভিজাত্যসম্পন্ন লোক এ সমাজে বড় একটা দেখা যাইত না।—নবদ্বীপের অধ্যাপকগণ কেহই এ সমাজের পক্ষপাতী ছিলেন না, এবং তজ্জন্য তাঁহারা বৃন্দাবন দাসের তিরস্কারভাজন হইয়াছেন।

৺উমেশচন্দ্র বটব্যাল।

১। গৌড়ে ব্রাহ্মণ। পৃ ১৭১—১৭২।

ভুল।

র এ ভুল, বন্ধু, আমারি এ ভুল ;—
বরষার কুটজকুসুমহার,
শরতে সোনার ক্ষেতে শেফালির দুল ;
হেমন্তে কুন্দের হাস, বসন্তে বেলার বাস,
নিদাঘে অপরাজিতা এলায়িত-চুল ;—
আমারি এ ভুল, বন্ধু, আমারি এ ভুল !

২

আমারি এ ভুল, বন্ধু, বলি শতবার ;—
সর্ব্বস্ব ফেলিয়া পাছে সে যবে আসিত কাছে,
গললগ্নীকৃতবাসে করি নমস্কার,
দুই করে কৃতাঞ্জলি 'প্রেমভিক্ষা দেহ' বলি'
দাঁড়াইত মূর্ত্তি যেন দীন দীনতার,
ভাবিতাম মনে মনে, আমি ধনী যেই ধনে
সে যে পূর্ণ সফলতা কম-কামনার,
শত সুষমার খনি সে যে কোহিনুর মণি
সোহাগে ধরিবে শিরে রাণী অলকার ;
এ কি বিড়ম্বনা হায় ! ভিখারিণী তারে চায় !
এমনি নিলাজ বটে আশা দুরাশার !

৩

আমারি এ ভুল, বন্ধু, বুঝেছি এখন ;—
কে জানিত সেই দিন দীন হ'তে আমি দীন,
বুকে পোরা সর্ব্বনাশী হোম-হুতাশন ;
চির নিশি দিনমান শিখা যায় লেলিহান
রস রক্ত মাংস মেদ করে বিদাহন ;
কে জানিত অবশেষে ক্ষুধার্ত্ত কাঙাল বেশে
সর্ব্বশূন্য অকিঞ্চন অনাথ মতন,
দীর্ণ শত বজ্রাঘাতে এ হৃদয় ল'য়ে হাতে
ধরার দুয়ারে হ'বে করিতে ক্রন্দন ;—
আমারি এ ভুল, বন্ধু, বুঝেছি এখন।

৪

আমারি এ ভুল, বন্ধু, লইনু মানিয়া ;—
—কেমনে জানিব, হায়, পরিহরি অলকায়
মায়া করি' মানবীর মুরতি ধরিয়া,
দীনা ভিখারিণী বেশে ধরার কুটীরে এসে
অলকার লক্ষ্মী মোরে যাবে যে ছলিয়া ;

কেমনে জানিব তবে সেই যাচনার রবে
চিরসুখ-বরদান ছিল লুকাইয়া;
স্বর্গের সম্পদে তাই উপেক্ষা করেছি ভাই,
ভেঙেছি মঙ্গল-ঘট চরণে ঠেলিয়া;—
আমারি এ ভুল, বন্ধু, লইনু মানিয়া।

৫

আমারি এ ভুল, বন্ধু, বলি আরবার;—
সব গর্ব্ব-অভিমান চূর্ণ আজি শতখান,
শূন্য ঘরে রিক্ত আত্মা করে হাহাকার;
বিশাল বিশ্বের পাট ধূ ধূ ধূ মরুভূ-মাঠ
হু হু হু অবাধ বায়ু বহে অনিবার;
বাসগৃহে করি থানা পিশাচে দিতেছে হানা,
অদৃষ্টের অট্টহাসে কাঁপে চারিধার;
ঢাকিয়া শবদ সব সদা 'দেহি-দেহি' রব,
উচ্চকণ্ঠে আর্ত্তনাদ চির বুভুক্ষার;—
আমারি এ ভুল, বন্ধু, বলি আরবার।

৬

আমারি এ ভুল, বন্ধু, বুঝিনু এখন;—
ছিঁড়িয়া কনকপট ভাঙ্গিয়া মঙ্গলঘট
করিতেছি কাষ্ঠলোষ্ট্রে দেবতা-পূজন;
দারুণ অবজ্ঞাভরে দূর করি কমলারে
কামরূপা কুহকীর চরণ-বন্দন;
সে ছিল শঙ্কিতগতি হরিণী বেপথুমতী,
এ যে প্রলয়ের বামী বড়বা ভীষণ;
সে ছিল জগত-ধাত্রী স্বর্ণসীতা সুখদাত্রী,
এ যে শুষ্ক শূর্পণখা সর্ব্ব অলক্ষণ;
আমারি এ ভুল, বন্ধু, বুঝিনু এখন।

৭

আমারি এ ভুল, বন্ধু, আমারি এ ভুল;—
কেন না শুনিনু কানে সে বচন বীণাগানে?
সেই প্রেমমন্দাকিনী কল-কুলুকুল?
কেন না দেখিনু, হায়, সে আনন-সুষমায়?
ধরাতলে কোথা আছে তার সমতুল?
জীবন-মন্থন-সার মোহিনী সে অমরার,
সকল সুখের উৎস, প্রণয়ের মূল।
তাই ভাবি প্রাণ দিলে প্রাণের সর্ব্বস্ব দিলে
আর কি মেলে না সেই ত্রিদিবের ফুল?—
আমারি এ ভুল, বন্ধু, আমারি এ ভুল।

শ্রীনিত্যকৃষ্ণ বসু।

নরহত্যা ও দস্যুতা।

নরহত্যা ও দস্যুতা, বিচারক ও সমাজের লোক উভয়ের চক্ষেই দুই অতি ভীষণ অপরাধ। মানুষের শরীর সম্বন্ধে যত প্রকার অপরাধের কল্পনা করা যাইতে পারে, হত্যাই তাহার চরম। আবার সমাজশক্তির বিরুদ্ধে যত কিছু অপরাধ সংঘটিত হয়, তন্মধ্যে দস্যুতাই সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ানক। ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনে নরহত্যার শ্রেণী অনেক। দস্যুতার শ্রেণী-বিভাগ অধিক নাই। নরহন্তা অবস্থাবিশেষে কেবল অর্থদণ্ড দিয়া নিষ্কৃতি পাইতে পারে; কিন্তু অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে ইহাতে কারাবাস, নির্ব্বাসন এবং প্রাণদণ্ড পর্য্যন্তও ব্যবস্থা আছে। এ দিকে দস্যুতার জন্য কারাবাস ভিন্ন কেবল আর্থিক দণ্ড হইতেই পারে না। কিন্তু চিরনির্ব্বাসন এই অপরাধের সর্ব্বোচ্চ শাস্তি। তবে যে স্থলে দস্যুদিগের মধ্যে একজনও নরহত্যা করে, সেখানে তাহার সহচরেরা পর্য্যন্ত সকলেই প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইতে পারে। আইনের এই বিধি যে সুযুক্তি ও সদ্বিবেচনার উপর সুপ্রতিষ্ঠিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ, ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি (১৮৬০ সালের ৪৫) আইন যাঁহাদের মস্তিষ্কপ্রসূত, তাঁহাদের ন্যায় প্রতিভাশালী লোক, বোধ হয়, এক সময়ে ইংলণ্ডের ন্যায় দেশেও অধিক জন্মগ্রহণ করেন না। লর্ড মেকলে ও সার বার্ণেস পিকক, এই আইনপ্রণয়নে রত ছিলেন, এবং এক জন বলিয়াছিলেন ও অন্যে লিখিয়াছিলেন বলিয়া, বেদব্যাস বক্তা ও গণেশ লেখক বলিয়া এই আইনের খ্যাতি আছে। বস্তুতঃ, পৃথিবীর নানাদেশীয় দণ্ডবিধি, বিশেষতঃ ভারতবর্ষের নানা স্থানের নানাজাতির নানাপ্রকার পূর্ব্বপ্রচলিত ব্যবস্থা সমুদায়ের পর্য্যালোচনা করিয়া, তাঁহারা এই আইন প্রণয়ন করেন। প্রায় অর্দ্ধ-শতাব্দী পর্য্যন্ত ইহা সমগ্র ভারতে সমভাবে প্রযুক্ত হইয়া আসিতেছে, অথচ এই দীর্ঘকালের মধ্যে ইহাতে অধিক পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন হয় নাই। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা অতিশয় সঙ্কোচের সহিত দুই একটি কথা বলিব। বলা বাহুল্য যে, আমরা কেবল নিজের মনের ভাবই ব্যক্ত করিব।

অবস্থাবিশেষে নরহত্যা যে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর অপরাধ, তাহাতে

সন্দেহ নাই। কিন্তু অনেক সময়েই সামান্য নরহত্যা অপেক্ষা দস্যু যেন আমাদের নিকট ভীষণতর অপরাধ বলিয়া মনে হয়। মনের ভাব ঠিক বুঝাইতে পারিব কি না, বলিতে পারি না; কিন্তু যত দূর সাধ্য, বুঝাইতে চেষ্টা করিব। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, নরহত্যা অনেক শ্রেণীর, দস্যুতার শ্রেণীবিভাগ অতি অল্প। আইন-কর্ত্তারাই অনেক স্থলে নরহত্যার জন্য দস্যুতার অপেক্ষা লঘুতর দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাঁহারা দস্যুতা যে অতিভীষণ অপরাধ বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন, তাহার এক প্রমাণ এই যে, দণ্ডবিধি আইনে অন্য কোন অপরাধের জন্যেই সর্ব্বনিম্ন দণ্ডের ব্যবস্থা নাই। কিন্তু দস্যুতা সম্বন্ধে দণ্ডবিধির ৩৯৭ ও ৩৯৮ ধারায় লিখিত আছে যে, এই ধারায় বর্ণিত অপরাধে সাত বৎসর কারাদণ্ডের নিম্নে শাস্তি হইতেই পারিবে না। ইহাতেও আমাদের মনে হয় যে, দস্যুতার দণ্ড যেন আরও একটু কঠোর হইতে পারে; আর অবস্থাবিশেষে নরহত্যার দণ্ড একটু লঘু করিলেও যেন ক্ষতি নাই।

সমস্ত রাজদণ্ডের উদ্দেশ্যই স্থূলতঃ অপরাধীর চরিত্রসংশোধন ও সমাজের লোকের নিমিত্ত শাস্তিবিধান। প্রত্যেক দণ্ডেই ইহার এক এক, কোন কোন স্থলে একের অধিক উদ্দেশ্য সাধিত হইয়া থাকে। অপরাধের গুরুত্ব নির্দ্ধারণ করিতে হইলে, অপরাধীর পূর্ব্বজীবন কিরূপ, এবং তাহা হইতে সমাজের ভাবী আশঙ্কা কত দূর, অনেক সময়ে এই সমস্ত বিবেচনা করিতে হয়। দণ্ডবিধির ৭৫ ধারায় বিধান আছে যে, যে কোন ব্যক্তি একবার চুরি প্রভৃতি তিন বৎসর কারাদণ্ডের যোগ্য অপরাধের শাস্তি ভোগ করিয়া পুনরায় সেইরূপ কোন অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হয়, তাহার প্রতি চিরনির্ব্বাসন পর্য্যন্ত দণ্ড প্রযুক্ত হইতে পারে। এইরূপ দণ্ডের উদ্দেশ্য কেবল সমাজের ভাবী আশঙ্কার নিবারণ। এক বার দণ্ডভোগ করিয়াও যাহার চরিত্র সংশোধিত হয় নাই, সমাজের মঙ্গলার্থ তাহাকে সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। সময়ে সময়ে পূর্ব্বে শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তির সামান্য অপরাধে কঠোর দণ্ড দেখিয়া কেহ কেহ তাহা অতিরিক্ত মনে করিতে পারেন; কিন্তু ধীরচিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখিলে, অনেক সময়েই বুঝিতে পারা যায় যে, এইরূপ স্থলে গুরুদণ্ডের উদ্দেশ্য আছে। অপরাধীর পূর্ব্বজীবন দূষিত বলিয়াই সে এইরূপ দণ্ডের যোগ্য।

এক্ষণে দেখা যাউক, দস্যু ও নরহত্যা সম্বন্ধে এই কথা কেমন ভাবে খাটে।

।মরা দেখিতে পাই, অনেক নরহন্তারই পূর্ব্বজীবন কলুষিত নহে, হয়ত পবিত্র। কিন্তু দস্যুর পূর্ব্বজীবন প্রায়ই বিপরীত। অনেক নরহন্তার স্বপক্ষেই দু' চারি কথা বলা যাইতে পারে; কিন্তু দস্যুর স্বপক্ষে প্রায়ই বলিবার কিছুই থাকে না। অনেক স্থলে নরহত্যার পূর্ব্ব উদ্যোগ থাকে, কিন্তু দস্যুতায় পূর্ব্ব উদ্যোগ ও ষড়যন্ত্র থাকিবেই থাকিবে। নরহন্তা অনেক সময়ে অপরাধ করিয়া আপনার লাভ কিছুই করে না। পরের জীবন নষ্ট করে মাত্র। দস্যু সকল সময়েই অন্যায় লাভের আশায় পরের অনিষ্ট-সাধন করে। নরহন্তা অনেক স্থানেই ক্রোধ ও উত্তেজনার বশবর্ত্তী হইয়া হিতাহিতজ্ঞানশূন্য অবস্থায় হত্যা করিয়া থাকে। দস্যুদিগের উত্তেজনা প্রায় কোন স্থলেই থাকে না। অনেক সময়েই তাহারা নিরপ-রাধ লোকের প্রতি কৃত্রিম ক্রোধ দেখাইয়া থাকে। নরহত্যার অনেক স্থলেই একটা পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ থাকে। দস্যুতায় দুর্লোভ ব্যতীত প্রায়ই অন্য কারণের অভাব। বলা বাহুল্য, যে স্থলে নরহন্তা দুর্লোভের বশবর্ত্তী হইয়া নিরপরাধ লোকের প্রাণসংহার করে, আমরা সেরূপ নরহত্যার কথা বলিতেছি না। এই শ্রেণীর ঘাতকের সহিত সমাজের কোন লোকেরই সহানুভূতি থাকিতে পারে না, এবং আইনের সর্ব্বপ্রধান শাস্তি প্রাণদণ্ড ইহাদের প্রতিই প্রযোজ্য; কিন্তু এইরূপ লোক দস্যুর শ্রেণীরই অন্তর্গত। ইহারা সহচর পাইলেই দস্যুতাও করিতে পারে। পাঁচ জন কিংবা ততোধিক লোক একত্র হইয়া বলপূর্ব্বক পরস্ব অপহরণ করিলেই ত তাহাদিগকে দস্যু বলা যায়। যে ব্যক্তি এমন ভাবে নরহত্যা করিতে পারে, সে যে সুযোগ পাইলে দস্যুদলের অগ্রণী হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? কিন্তু সমাজের অনেক নরহত্যাই অকারণপ্রণোদিত নহে। এবং আমরা এইরূপ কারণপ্রণোদিত বা উত্তে-জনাপ্রণোদিত হত্যার সঙ্গেই দস্যুতার তুলনা করিতেছি। এইরূপ শ্রেণীর নরহত্যাই অনেক সময়ে আইনের সহানুভূতি না পাইলেও, সমাজের লোকের, বিচারকের, এবং এমন কি, রাজার সহানুভূতিও পাইয়া থাকে। অনেকেই জানেন যে, অনেক সময়ে জুরিগণ একবাক্যে আসামীকে নরহত্যার অপরাধী নির্দ্ধারণ করিয়াও বিচারককে দয়াপ্রকাশের জন্য অনুরোধ করিয়া থাকেন। কোন কোন স্থলে বিচারক স্বয়ংই আসামীকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াও রাজসকাশে তাহার নিমিত্ত দয়া ভিক্ষা করেন। দু' এক স্থলে রাজা স্বতঃপ্রণোদিত হইয়াই কোন কোন নরহন্তাকে মুক্তি দেন।

ইহাতে বুঝিব কি ? নিশ্চয়ই এই সব আসামীরা দয়ার যোগ্য সমাজের শিক্ষা ও শান্তির জন্যেও ইহাদের প্রাণদণ্ডের প্রয়োজনীয়তা নাই। বস্তুতঃ, সমাজ অনেক স্থলে ইহাদের কোন দণ্ড চাহে না, তাহাই নহে ; প্রত্যুত ইহাদের জন্য রাজা করুণা ভিক্ষা করিয়া থাকে। সমাজ বলে, "এরূপ নরহন্তা হইতে আমাদের ভাবী আশঙ্কা কিছুই নাই। আমরা সকলেই ইহার জন্য দুঃখিত, এবং ইহার মুক্তির জন্য প্রার্থী।" দস্যু সম্বন্ধে এমন কথা প্রযোজ্য কি ? একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। কোন বিবাহিত দরিদ্র হিন্দু যুবক, যুবতী ভার্য্যাকে শ্বশুরালয়ে রাখিয়া আপনি দূরদেশে বিষয়কার্য্যে নিযুক্ত। সহসা সে সংবাদ পাইল যে, কোন পাপাশয় লোক কর্তৃক সেখানে তাহার স্ত্রীর ধর্ম্মহানি হইয়াছে। যুবক শ্বশুরালয়ে যাইয়া সেই কলুষিতা স্ত্রীকে আনিবার উদ্যোগ করিল। কিন্তু সেই পাপাত্মার ষড়যন্ত্রে তাহার সকল চেষ্টাই বিফল হইল। নানারূপ যত্ন করিয়াও যখন যুবক পত্নীকে উদ্ধার করিতে পারিল না, তখন সে ভগ্নমনে একরূপ উন্মত্ত অবস্থায় পাপীর পাপেচ্ছার একবারে মূলোচ্ছেদ করিবে বলিয়া নির্ম্মমভাবে আপনার স্ত্রীকে হত্যা করিল। আইনের বিচারে সে চিরনির্ব্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত হইল। বিচারক হয় ত দয়া করিয়া তাহার প্রতি প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা করিলেন না ; কিন্তু দেশ ইহাতেও কাঁদিয়া উঠিল। অনেক পাঠকই হয় ত বুঝিয়াছেন যে, আমরা সেই দীর্ঘকাল পূর্ব্বের নবীন এলোকেশী বা মোহান্ত এলোকেশীর মোকদ্দমার প্রতি লক্ষ্য করিয়াছি। নবীন নারীহন্তা, আর মোহন্ত মাধবগিরি সেই পাপাত্মা দুরাচার বড়লোক। সমাজের সম্পূর্ণ সহানুভূতি সেই নারীহন্তার দিকে। সহস্র সহস্র লোক সমস্বরে রাজার করুণা ভিক্ষা করিয়া কহিতে লাগিলেন, "হে রাজন্ ! এই নারীহন্তাকে মুক্তি দিতে আজ্ঞা হউক। আমরা প্রত্যেকে ইহার প্রতিভূ হইয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত যে, মুক্তি পাইলে এ আর কখনও কোন অপরাধের কার্য্য করিবে না। দেশ ইহার জন্য কাঁদিতেছে।" সকলেই জানেন যে, রাজা প্রজার এই কাতর প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছিলেন। নবীনকে অধিক দিন নির্ব্বাসন দণ্ড ভোগ করিতে হয় নাই। নবীন কলিকাতায় আসিলে তাহার বিশেষরূপ অভ্যর্থনা হইয়াছিল। সমাজের শীর্ষস্থানীয় লোকেরাও এই নারীহন্তাকে ঘৃণার চক্ষে, ক্রোধের চক্ষে না দেখিয়া, স্নেহের চক্ষে, দয়ার চক্ষে, দেখিয়াছিলেন।

.হার অপরাধ সকলেই ভুলিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার প্রতি যে অত্যাচার হইয়াছে, ইহাই সকলের মনে ছিল। সমাজের এই সহানুভূতি অসঙ্গত কি? নবীন হয় ত পূর্ব্বে কখনও কাহাকেও সামান্য চপেটাঘাতও করে নাই। তার পরেও হয় ত তৎকর্তৃক কোন অপরাধ সংঘটিত হয় নাই। এইরূপ বিষম এবং মর্ম্মভেদী অবস্থায় না পড়িলে হয় ত সে নারীর গাত্রে হাত তুলিত না। এরূপ স্থলে তাহাকে লঘুদণ্ড দিলে সমাজ সন্তুষ্ট বই অসন্তুষ্ট হয় না। ইহার প্রমাণ পাঠক পূর্ব্বেই পাইয়াছেন।

তাই বলিতেছিলাম যে, এমন নরহত্যায় দণ্ড লঘু হইলেও যেন চলে। তাহাতে সমাজের কোন হানি হয় না, এবং ভাবী অনিষ্টের আশঙ্কাও অতি অল্পই থাকে। এই শ্রেণীর নরহন্তা শেষে অনুতপ্ত জীবন যাপন করে; সমাজে অশান্তির উৎপাদন করে না। ঠিক কোন শ্রেণীর অপরাধে দণ্ড লঘু করা যাইতে পারে, আমরা তাহা নির্দ্দেশ করিতে চাহি না, উহা রাজার বিচার্য্য। আমাদের মনে হয়, যেন যেখানেই স্ত্রীলোকের দুশ্চরিত্রে মর্ম্মাহত হইয়া স্বামী কিংবা অন্য আত্মীয় নরহত্যা করেন, ভারতবর্ষে তাহার অধিকাংশ স্থলেই আসামীর আকস্মিক উত্তেজনার ফল পাওয়া কর্ত্তব্য। যে স্থলে আসামী সমাজের লোক, বিচারক, রাজ্যশাসকের সহানুভূতি পায়, সেখানে তাহার আইনের নিকটও সহানুভূতি পাওয়া উচিত।

কিন্তু দস্যুর প্রতি কাহারও সহানুভূতি হয় কি? দস্যু কোন অবস্থাতেও যেন সহানুভূতির পাত্র নহে। গৃহস্থ শান্তিময়ী নিদ্রার ক্রোড়ে শয়ন, জগৎ সুষুপ্ত, চারি দিক নিস্তব্ধ, এমন সময়ে রজনীর অন্ধকারময়ী নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া গ্রামবাসীর শান্তি ভঙ্গ করিয়া রাক্ষসবেশে উপস্থিত হইয়া তাহারা গৃহস্থকে শতনির্য্যাতনে নিপীড়িত করিয়া তাহার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিতে প্রস্তুত। দস্যুরা অনেক সময়ে শিশু ও স্ত্রীলোকের প্রতি যে অমানুষিক অত্যাচার করিয়া থাকে, সমাজ তাহা শুনিয়া কেবল শিহরিয়া উঠে, এবং এক-বাক্যে বলে, রাজা ইহাদিগকে ফাঁশী দিলে উপযুক্ত দণ্ড হয়। এমন দুর্ব্বৃত্ত-দিগকে নির্ব্বাসিত করাই যেন সামান্য দণ্ড বলিয়া মনে হয়। বস্তুতঃ আমাদের মনে হয়, দস্যুমাত্রেরই যেন নির্ব্বাসিত হওয়াই ঠিক; কারাবাস দণ্ড ইহাদের পক্ষে লঘু। সামান্য বাধা প্রাপ্ত হইলেই ইহারা নরহত্যা করিতে প্রস্তুত। মানুষের সম্পত্তি ও জীবন যেন ইহাদের ক্রীড়ার সামগ্রী। দণ্ডপ্রাপ্ত কোন দস্যুদলপতির মুখে শুনিয়াছি, "দলে নূতন লোক মিশাইতে হইলে

আমরা তাহার এইরূপ কোন পরীক্ষা করিয়া থাকি। সম্মুখে একটি গোবৎস চরিতেছে। দলে প্রবেশার্থীকে কহিলাম, 'একটি বাঁশ লইয়া এই বৎসটিকে এক আঘাতে মারিয়া ফেল্।' যদি সে বিনা আপত্তিতে বিনা সঙ্কোচে তাহাই পারিল, তবে বুঝিলাম, ইহা দ্বারা কাজ চলিতে পারিবে।" হৃদয় কিরূপ উপাদানে গঠিত হইলে মানুষ বিনা কারণে এমন নৃশংস কার্য্য করিতে পারে, তাহা পাঠককে বুঝাইয়া দিবার প্রয়োজন আছে কি? এরূপ লোককে সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলে সমাজ তাহাতে সন্তুষ্ট বই ক্ষুব্ধ হয় না। প্রত্যুত ইহাদিগকে কেবল পাঁচ সাত বৎসরের নিমিত্ত কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিলে যেন সমুচিত শাস্তি হয় না। আর ইহারা কারাগারে থাকিলে অনেক সময়েই কারাবাসী অন্য অপরাধীর চিত্ত ও চরিত্র কলুষিত করিয়া দিয়া থাকে। দস্যুর জীবন বড়ই পাপপঙ্কিল। আমরা এমনও দেখিয়াছি যে, এক দস্যু সুদীর্ঘ ষোল বৎসর কাল কারাদণ্ড ভোগ করিয়া আসিয়া পুনরায় দস্যুতা করিয়াছে। অন্যের সম্পত্তি বলপূর্ব্বক অপহরণ করিয়া ভোগ করিতে পারিলে সে লোভ বড়ই দুর্দ্দমনীয় হইয়া পড়ে। তাই আমাদের মনে হয়, এরূপ লোককে সমাজ হইতে চিরদিনের নিমিত্ত বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়াই উচিত। ইহাতে যেন দেশের ইষ্ট বই অনিষ্ট সাধিত হইবে না। আমাদের মতে দস্যুর চরিত্র-সংশোধন করাই একরূপ অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। যে ব্যক্তি একবার দস্যুতা করিয়াছে, সুযোগ পাইলেই সে আবার তাহা করিতে প্রস্তুত। কিন্তু অধিকাংশ নরহন্তা সম্বন্ধেই এ কথা খাটে না। বস্তুতঃ আমাদের বিশ্বাস, ভারতবর্ষে (professional murderer) ব্যবসায়ী নরহন্তার সংখ্যা অতি অল্প; পক্ষান্তরে, ব্যবসায়ী দস্যুর সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যেখানে অপরাধী দুর্লোভের বশবর্ত্তী হইয়া বা পূর্ব্বে ষড়যন্ত্র করিয়া নরহত্যা করে, সে হত্যা বড়ই ভীষণ অপরাধ; কিন্তু তাহা প্রায়ই দস্যু অথবা দস্যুভাবাপন্ন ব্যক্তি কর্ত্তৃক সাধিত হইয়া থাকে। ইহাদিগকে ব্যবসায়ী নরহন্তা বলা যাইতে পারে, এবং ইহাদের সহিত কাহারও সহানুভূতি থাকিতে পারে না। আইনের সর্ব্বোচ্চ দণ্ড যে ইহাদের প্রতি প্রযোজ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। দুঃখের বিষয় এই যে, দস্যু অথবা তস্করভাবাপন্ন বলিয়া এই শ্রেণীর নরহন্তা অনেক সময় ধৃতই হয় না, বা ধৃত হইলেও প্রমাণাভাবে মুক্তি পাইয়া থাকে। এ দিকে কিন্তু যে সকল নরহন্তা সমাজের সহানুভূতি পাইয়া থাকে, তাহারা অধিকাংশ স্থলে অপরাধ স্বীকার করে। ইহাও যেন তাহাদের অপরাধের লঘুত্বের পরিচায়ক।

আমরা এতক্ষণ ইহাই প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছি যে, ভারতবর্ষে অনেক স্থলেই স্ত্রীলোকঘটিত নরহত্যায় হত্যাকারীর অপরাধ আইনের চক্ষে লঘু না হইলেও, সমাজের চক্ষে লঘু বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে। আর এই সমস্ত হত্যাকারী হইতে সমাজের ভাবী আশঙ্কা অতি অল্পই থাকে। দস্যুর অপরাধ আমাদের মতে ইহাদের অপরাধ অপেক্ষা ভাষণতর বলিয়া বোধ হয়। দস্যু কোন অবস্থাতেই কৃপার পাত্র নহে। দস্যুমাত্রকেই যেন চিরজীবন অথবা কিছু কালের নিমিত্ত নির্ব্বাসিত বা দেশ হইতে বহিষ্কৃত করা কর্ত্তব্য। আইনের কিরূপ পরিবর্ত্তন হওয়া আবশ্যক, রাজাই তাহার বিচারক। বর্ত্তমান প্রবন্ধ কেবল এক জন রাজভক্ত প্রজার মনের ভাবের অভিব্যক্তিমাত্র। আমাদের এইরূপ মনে হয় যে, যেখানে ভার্য্যা কিংবা ভগ্নী প্রভৃতির ব্যভিচারে ক্ষুব্ধ হইয়া স্বামী কিংবা ভ্রাতা প্রায় উন্মত্ত অবস্থায় নরহত্যা করে, সেখানে অপরাধীর শাস্তি সম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনা হওয়া কর্ত্তব্য, এবং এই সম্বন্ধে বর্ত্তমান আইন পরিবর্ত্তিত হওয়া আবশ্যক। আর দস্যুতা সম্বন্ধে যেমন দণ্ডবিধি আইনের ৩৯৭ ও ৩৯৮ ধারায় আছে যে, এই এই ধারায় বর্ণিত অপরাধে সাত বৎসর কারাবাসের ন্যূন দণ্ডই হইতে পারিবে না, সেখানে যেন সাত বৎসর কারাবাস না হইয়া সাত বৎসর নির্ব্বাসন হইতে পারে। দেশে দিন দিন দস্যুতার সংখ্যা যেরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে দণ্ডের মাত্রা বর্দ্ধিত হইলে শুভ ফল ফলিবারই সম্ভাবনা। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এ সমস্তই রাজার বিচার্য্য। আমরা আমাদের মনের ভাব সাধারণ-সমীপে প্রকাশ করিলাম মাত্র। যদি আমাদের যুক্তিতে কিছুমাত্র সারবত্তা থাকে, তাহা হইলে এ বিষয়ে হয় ত রাজার দৃষ্টিও আকৃষ্ট হইতে পারে।

একলক্ষী ও আদীনা। *

একলক্ষী মসজিদ।

পাণ্ডুয়ার ভগ্নাবশেষের মধ্যে একলক্ষী মসজিদ দর্শনীয় ও উল্লেখযোগ্য। ইহা ইষ্টক ও কৃষ্ণপ্রস্তরে নির্ম্মিত বৃহৎ চতুষ্কোণ মসজিদ। ইহা উত্তর-দক্ষিণে ৫০ হস্ত, এবং পূর্ব্বপশ্চিমে ৪৬ হস্ত। প্রাচীরের উচ্চতা ১৭ হস্ত, এবং তদুপরিস্থ গুম্বজের উচ্চতা ২৭ হস্ত। চতুস্পার্শ্ববর্ত্তী প্রাচীরে এক একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বার আছে। দক্ষিণদিকস্থ দ্বারের উপরিভাগে একটি হিন্দু দেবমূর্ত্তি প্রস্তরে খোদিত আছে। ইহা হইতে বোধ হয় যে, ঐ প্রস্তর কোন হিন্দুদেবালয় ভাঙ্গিয়া আনীত হইয়াছে। এই মসজিদের ভিতর তিনটি সমাধি আছে। রিয়াজুস সালাতিন নামক পারসী ইতিহাসের প্রণেতা মালদহ-নিবাসী স্বর্গীয় গোলাম হোসেন বলেন যে, রাজা গণেশের মুসলমানধর্ম্মাবলম্বী পুত্র জালালউদ্দীন, তাঁহার বেগম ও পুত্র এই একলক্ষী মসজিদে সমাহিত আছেন।

একলক্ষী সমজিদ মালদহ-দিনাজপুর রোডের পশ্চিম পার্শ্বে অবস্থিত। জেনেরাল কনিংহাম এই একলক্ষী মসজিদকে "বঙ্গীয় পাঠান সমাধির পরম রমণীয় আদর্শ" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

৮

আদীনা।

পাণ্ডুয়ার ভগ্নাবশেষের মধ্যে আদীনা সর্ব্বপ্রধান, সুবৃহৎ এবং শিল্প-নৈপুণ্যের ও বাঙ্গালার পাঠান ভাস্কর্য্যবিদ্যার প্রধান পরিচায়ক দর্শনীয় বস্তু। আদীনার বিশালতা এবং তাহার প্রস্তর ইষ্টকাদি নির্ম্মাণোপাদান-সমূহ দেখিলে প্রাচীন বৌদ্ধ পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরের অস্তিত্ব স্মৃতিপথে জাগরূক হয়। আদীনার ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত বা প্রাচীরগাত্রে ও সোপাননিম্নে গ্রথিত হিন্দু

* এই চিত্রদ্বয় Empress পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। চিত্রের জন্য আমরা Empress পরিচালকদিগের নিকট কৃতজ্ঞ।—সাহিত্য-সম্পাদক।

মূর্ত্তি দেখিয়া মনে হয়, কাশ্মীররাজ জয়াপীড়ের গুপ্তভাবে গৌড়-পরিদর্শনপ্রসঙ্গে গৌড়পতি রাজা জয়ন্তের রাজধানীস্থিত, সতত নৃত্যগীতাদিতে আমোদিত, দিগ্বিজয়ী কাশ্মীরপতির দর্শনযোগ্য কার্ত্তিকেয়-নিকেতনের সহিত আদীনার কোনরূপ সংস্রব ছিল। জয়ন্তের কার্ত্তিকেয়-নিকেতন আদীনা মসজিদে পরিণত না হউক, ইহা যে হিন্দু রাজধানীর এক বা ততোধিক হিন্দু দেবালয়ের উপকরণে গঠিত, তৎপক্ষে কোন সন্দেহ হইতে পারে না।

আদীনা মসজিদ একটি চতুষ্কোণ সুউচ্চ প্রাচীরে বেষ্টিত ও প্রস্তর স্তম্ভাবলী দ্বারা ধৃত গুম্বজাকৃতি বহুছাদবিশিষ্ট বিশাল চতুষ্কোণ প্রাসাদ। ইহার মধ্যভাগ বিস্তৃত প্রাঙ্গণ। এই প্রাঙ্গণের পশ্চিম পার্শ্বের কিয়দংশ ব্যতীত অবশিষ্ট সমুদায় প্রাসাদ ভূমিসাৎ ও তদুপকরণাদি দূরদূরান্তরে নীত হইয়াছে। সমগ্র প্রাসাদ বর্ত্তমান না থাকিলেও, যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহা হইতেই আদীনার বিশালতা, গাম্ভীর্য্য ও রমণীয়তার অনুমান করা যাইতে পারে। ইহা দৈর্ঘ্যে উত্তর-দক্ষিণে ৫০০ ফীট, এবং প্রস্থে পূর্ব্বপশ্চিমে ৩০০ ফীট, উচ্চতা ৬০ ফীট। এই প্রাসাদে এককালে অন্যূন চল্লিশ সহস্র লোকের সমাবেশ হইতে পারিত। এই প্রাসাদের বহিঃপ্রাচীর ইষ্টক ও কষ্টিপাথর দ্বারা গ্রথিত; ইষ্টকাংশ নানা কারুকার্য্যে খচিত। প্রাসাদের অন্তর্ভাগে বহুসংখ্যক প্রস্তরস্তম্ভের উপর গুম্বজের ছাদ পরিরক্ষিত।

এই বিশাল প্রাসাদের পশ্চিমাংশে প্রবেশদ্বারের উত্তর দিকে "বাদাশহকা তক্ত", বা "বাদশাহের আসন" নামে পরিচিত অংশ এখন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান; তাহা দেখিয়া আদীনা মসজিদের বিশালতা ও নির্ম্মাণপ্রণালী এখনও পর্য্যন্ত দর্শকের হৃদয়ঙ্গম হয়। "বাদশাহকা তক্ত" ৮ ফীট উচ্চ অতিস্থূল প্রস্তর-স্তম্ভের উপর নির্ম্মিত। এই স্তম্ভগুলি তিন শ্রেণীতে স্থাপিত। স্তম্ভোপরি প্রস্তরের কড়ি দিয়া তদুপরি প্রস্তরেরই 'পাটাতন' দিয়া ছাদ প্রস্তুত হইয়াছে। এই ছাদের উপর সুদৃশ্য কারুকার্য্যবিশিষ্ট অনতিস্থূল স্তম্ভ বসাইয়া তদুপরি গুম্বজ নির্ম্মিত হইয়াছে। এই বাদশাহকা তক্তের পশ্চিমস্থ প্রাচীরের গাত্রে গহ্বর কাটিয়া তন্মধ্যে বসিবার উপযুক্ত চারিটি স্থান নির্ম্মিত হইয়াছিল; এবং তাহার পার্শ্বদ্বয় ও ঊর্দ্ধ দিকে কষ্টিপাথরে আরবী অক্ষরে অতি সুন্দর ও বিশদভাবে কলমা খোদিত হইয়াছে। এই বাদশাহকা তক্তের পশ্চিম দিকে একটি প্রকোষ্ঠে আদীনার নির্ম্মাতা চিরনিদ্রায় নিদ্রিত রহিয়াছেন, কিন্তু এই প্রকোষ্ঠটির ছাদ ভূমিসাৎ হইয়া আদীনা-নির্ম্মাতার সমাধি আচ্ছাদিত করিয়াছে।

বাদশাহকা তক্তের দক্ষিণে সুদৃশ্য কারুকার্য্যখচিত কৃষ্ণ কষ্টিপাথরে নির্ম্মিত "মিম্বার," বা ইমামের বক্তৃতামঞ্চ স্থাপিত। এই মিম্বারও ভূমি হইতে বহু ঊর্দ্ধে স্থাপিত ও তন্নিম্নে একটি সুন্দর প্রকোষ্ঠ বিদ্যমান। প্রকোষ্ঠ, মঞ্চ ও মঞ্চে উঠিবার সোপানশ্রেণী লতাপুষ্পাদিখচিত কৃষ্ণপ্রস্তরে গঠিত।

ইলিয়াসসাহী পাঠান-বংশীয় সুলতান সেকন্দর সাহ ১৩৭৪ খৃষ্টাব্দে এই আদীনা মসজিদের নির্ম্মাণ আরম্ভ করেন, এবং তাঁহার মৃত্যুর পর আদীনার নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হয়। মালদহ অঞ্চলের জনশ্রুতি এই যে, সেকন্দর শাহ অতি দীর্ঘাকৃতি ছিলেন, এবং তিনি স্বহস্তের সার্দ্ধ-ত্রি-হস্ত-পরিমিত না হইয়া চতুর্হস্ত-পরিমিত ছিলেন। সেকন্দর শাহের হস্তের পরিমাণে দৈর্ঘ্য-পরিমাপক নূতন গজ প্রচলিত হয়, এবং তাহা অধুনাপ্রচলিত গজ অপেক্ষা অনেক বড়। সুতরাং সেকন্দর শাহ নিজে যেমন দৈর্ঘ্যপ্রিয় ও বৃহৎকায় ছিলেন, নিজেও তেমনি সুবিশাল কীর্ত্তিমন্দিরের প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন।

খুরসেদজাহাননামার প্রণেতা, ধর্ম্মভীরু, স্বর্গীয় সৈয়দ এলাহী বক্স আদীনা-পর্য্যবেক্ষণসময়ে তথায় বহুসংখ্যক হিন্দু দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ও প্রাচীরগাত্রে ও সোপানপাদে প্রোথিত দেখিয়াছিলেন। এখনও বিশেষ মনোযোগের সহিত আদীনা পরিদর্শন করিলে, মিম্বারের পাদদেশে ও অন্যত্র প্রস্তরখোদিত হিন্দু দেবমূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হয়। এই কারণে ইহা সহজেই প্রতীত হয় যে, আদীনা প্রথমতঃ হিন্দুদেবালয় ছিল; পরে মুসলমানের মসজিদরূপে পরিণত হইয়াছে।

হিন্দু দর্শনশাস্ত্র।

একজন প্রসিদ্ধ দার্শনিক সত্যই বলিয়াছেন যে, সৃষ্টির মধ্যে মানব, এবং মানবপ্রকৃতির মধ্যে মনই সর্ব্বাপেক্ষা শ্লাঘ্যতম। চিন্তাশক্তির বিকাশ-অনুসারেই জাতীয় অভ্যুদয়ের তারতম্য বিচারিত হইয়া থাকে। আহার বিহার ও শারীরিক বল সম্বন্ধে মানবজাতি সাধারণ জন্তুদিগের অন্তর্বর্ত্তী, কিন্তু সাহিত্য, বিজ্ঞান ও দর্শন মানবের সম্পূর্ণ নিজস্ব। অতীতিহাস সময় হইতে সত্যানুসন্ধিৎসা অনভিভবনীয় ভাবে মনুষ্যের অপরিমার্জ্জিত

নাবৃত্তিকে উচ্চ হইতে উচ্চতর স্তরে পরিচালিত করিয়া আসিতেছে। অবস্থার বিপর্যায়ে কোন শিক্ষিত জাতির অধঃপতন হইলে বর্দ্ধিষ্ণু ও বিজয়ী জাতি বিজিতের নিকট সত্য শিক্ষা করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। যদি প্রত্যেক জাতির অভ্যুত্থানসময়ে সত্যানুসন্ধানের পুনরারম্ভ করিতে হইত, তাহা হইলে পৃথিবীর উন্নতি নিশ্চয়ই আকাশকুসুমে পরিণত হইত। কিন্তু বাহ্যিক অবস্থার অবনতিতে নিত্য সত্যের কখনও অবমাননা হয় না। সুতরাং মানসিক ও প্রাকৃতিক জগৎ কোনও বর্দ্ধমান অনির্দ্দেশ্য উদ্দেশ্যের লীলাক্ষেত্র বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

ব্যক্তিগত জীবন যেমন উন্নতি ও অবনতির, কৃতকার্য্যতা ও অকৃতকার্য্যতার সংগ্রামক্ষেত্র, ইতিহাসও সেইরূপ জাতিপরম্পরার জয় ও পরাজয়, অভ্যুদয় ও অধঃপতনের সংগ্রামক্ষেত্র। কেবল ব্যক্তিগত জীবনে যাহা অল্প সময়ে সংঘটিত হয়, ইতিহাসে তাহা দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া ঘটিয়া থাকে। কিন্তু এই পরিবর্ত্তনশীল ঘটনাস্রোতের মধ্যে,—এই ক্ষণস্থায়িত্বের মধ্যে, চিরস্থায়িত্বের অবকাশ আছে। জড় জগতে মানবের আধিপত্য ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু মনোরাজ্যের আধিপত্য মানবাস্তিত্বের সমকালস্থায়ী। গ্রীসের অসাধারণ গৌরব ক্ষুদ্র মেসিডনের নিকট মস্তক অবনত করিয়াছিল, কিন্তু গ্রীক সাহিত্য ও দর্শন এই দুই সহস্র বৎসর সমগ্র সভ্য জগতে অপরিমেয় প্রভাব বিস্তার করিয়া আসিতেছে। বর্ত্তমান পাশ্চাত্য সাহিত্যে গ্রীক কবির আদর্শ, হেগেলের দর্শনে প্লেটো আরিষ্টটলের আভাস, গ্রীক প্রভাবের চিরস্থায়িত্বের পরিচায়ক। তরবারি ব্যর্থ হইল, কিন্তু মানসিক প্রভাব অক্ষয়, অনন্ত রহিয়া গেল! সেই জন্য মনে হয় যে, এই দুঃখাবর্ত্তপতিত হিন্দুজাতির শেষ আশালোকরেখা হয় ত ভবিষ্যতে জাতীয় মুক্তির স্নিগ্ধ প্রভাতে পরিণত হইবে। স্বল্পায়াসজীবী প্রাচীন হিন্দুদিগের পক্ষে জ্ঞানার্জ্জনই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইত। নিভৃতচিন্তা তাহার প্রধান সাধন, এবং মোক্ষই একমাত্র বাঞ্ছনীয় পরিণাম ছিল। আমাদিগের উত্তরাধিকার বর্ত্তিবার মত যদি কিছু তাঁহারা রাখিয়া গিয়া থাকেন, তবে সে নিস্তব্ধ নির্জ্জনারণ্যে বহুকালের চিন্তার্জ্জিত ফল দর্শনশাস্ত্র। আর যদি বংশপরম্পরাক্রমিক দায়াধিকার সত্য হয়, তবে ইহা কেবলমাত্র কল্পনা নহে যে, অন্যান্য বিষয় অপেক্ষা দর্শনের অনুশীলন আমাদের অধিকতর স্বভাবানুযায়ী হইবে। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে আমরা যেরূপ মানসিক

গঠনে উপনীত হইতেছি, তাহাতে পাশ্চাত্য কর্ম্মযোগ ও প্রতীচ্য জ্ঞানযোগ এতদুভয়ের মাঝামাঝি অর্থাৎ বাক্‌প্রগল্‌ভতামাত্রই আমাদের জীবনের লক্ষ্য হইতেছে। অধ্যাপক ম্যাক্‌স্‌মূলার তাঁহার নবপ্রকাশিত "ভারতীয় ষড়্‌দর্শন" নামক গ্রন্থে বর্ত্তমান সময়ে আমাদের এই বিষয়ে উদাসীনতার জন্য আক্ষেপ করিয়াছেন। তিনি হিন্দুদর্শন সাধারণের অধিগত করিবার জন্য আজীবন যেরূপ চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাতে তিনি শিক্ষিত জনসাধারণের আন্তরিক ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। কিন্তু তিনি হিন্দু জাতির বিশেষ ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার পাত্র। দর্শন আমাদের নিজস্ব হইলেও আমরা উহার যত্ন করিতে শিক্ষা করি নাই। অতি পুরাতন কীটদষ্ট তালপত্রলিখিত পুঁথির দুর্বোধ্য লিপির অভ্যন্তরে যে 'রাবিশ' ভিন্ন অন্য কিছু থাকিতে পারে, ইহা আমাদের ধারণা হওয়াই সুকঠিন। আজকাল যে ভারতীয় চিন্তাশীলতার ভাঁটায় সামান্য জোয়ারের টান দেখা যাইতেছে, ইহাও ডিউসেন্, গার্ব, কাউএল ও মূলার প্রভৃতি বিদেশীয় মনস্বিগণের কৃপায়। অস্মদ্দেশীয় প্রাচীন দার্শনিক পরভৃতগণ অবশেষে সত্য সত্যই বিদেশীয়দিগের আশ্রয়ে প্রতিপালিত হইলেন। হিন্দুদর্শন স্বদেশে অনাদৃত হইয়াও বিদেশে যে এই প্রভূত সম্মানের স্থান অধিকার করিয়াছে, ইহাতে বিস্মিত হইতে হয়। অধ্যাপক ম্যাক্‌স্‌মূলার ষড়্‌দর্শনের অবতরণিকায় বলিয়াছেন যে, এখন প্লেটো ও আরিষ্টটল, স্পিনোজা ও লক, কাণ্ট ও হেগেলের মূলদর্শন পাঠ না করিলে যেমন দর্শনশিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়, তেমনি এক দিন হয় ত বেদান্ত ও সাংখ্যদর্শনে অনভিজ্ঞ ব্যক্তি গৌরবান্বিত দার্শনিক নামের যোগ্য হইবেন না। বেদান্তদর্শন ভারতীয় চিন্তাশীলতার চরম বিকাশ। পরিদৃশ্যমান জগতের অনিত্যতা ও অসারতার অন্তরালে যে একমাত্র অনন্ত সত্তা বিদ্যমান আছে, তাহার প্রতিপাদনই বেদান্তের উদ্দেশ্য। সৎ,—একমাত্র, নিত্যস্বরূপ, অসীম ও অনন্ত; তাহার জ্ঞানই পরমার্থজ্ঞান। দৃশ্যমান জগৎ অলীক, মরুভূমিতে মৃগতৃষ্ণিকার ন্যায় ভ্রমমাত্র। এই ভ্রম বা অবিদ্যার অন্ধতমিস্র, বিদ্যা বা জ্ঞানালোকের দ্বারা বিনষ্ট হয়। যাহা পূর্ব্বেও কখন ছিল না, পরেও থাকিবে না, তাহা সত্য হইতে পারে না, পরন্তু ভ্রমমাত্র, যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম। জ্ঞানই এই ভ্রমের বিনাশক। অবিদ্যা বিনাশশীল, ব্রহ্মই অবিনশ্বর, এবং নিত্য 'দ্বিতীয়' কিছুই থাকিতে পারে না; কারণ তাহা হইলে সেই একমাত্র অসীম সত্তা সসীম হইবে। অতএব ব্রহ্ম 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'। অনিত্য সংসার বা ব্যাবহারিক জগৎ (phenomenal world)

দেখিয়া সত্য পদার্থ ব্রহ্মের প্রকৃত ধারণা হওয়া অসম্ভব, অসংখ্যবীচিভঙ্গপ্রতিবিম্বিত চন্দ্রমা যেমন নীলনভস্তলশোভমান চন্দ্রমা হইতে বিভিন্ন, জগৎ ও জগৎ-প্রতিবিম্বিত ব্রহ্মও সেইরূপ পরমার্থ ব্রহ্ম হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ও বিকৃত। বেদান্তের এই অদ্বৈতবাদের সহিত পার্মেনাইডিজ্‌ ও প্লেটো, স্পিনোজা ও হেগেলের অদ্বৈতবাদের অতি নিকট সম্বন্ধ আছে বলিয়া মনে হয়। পার্মেনাই-ডিজ্‌ ও প্লেটো পরিবর্ত্তনশীল জগতের বাস্তবত্ব-জ্ঞান ভ্রমাত্মক বলিয়াছেন। স্পিনোজার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রকৃতি, অসীমসমুদ্রোপরি বীচিমালার ন্যায়, একমাত্র অনন্ত পদার্থের প্রকারভেদমাত্র (modes)। হেগেলের প্রাকৃতিক জগৎ তাঁহার নির্গুণসত্বার (absolute) অভিব্যক্ত রূপান্তর। অতএব দেখা যাইতেছে যে, ইঁহারা সকলেই একমাত্র সত্য হইতে জগৎকাণ্ডের নির্দ্দেশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

সাংখ্যকার জগত্তত্ব সত্য মানিয়া লইয়া ইহার কারণের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সাংখ্য দ্বৈতবাদী, সমস্ত জগৎ প্রকৃতি ও পুরুষের মিলনে সমুৎপন্ন। কিন্তু তাহা হইলেও প্রকৃতি ও পুরুষের বিশ্লেষণ অর্থাৎ স্বতন্ত্রাবস্থিতি অত্যন্ত দুর্বোধ্য। মনুষ্যের আত্মা পুরুষের সচৈতন্যাবস্থা। সুতরাং সাংখ্যমতে পুরুষ অনেকগুলি, তবে সাংখ্যদার্শনিকগণ যে পুরুষের স্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাস করিতেন, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়; কারণ তাঁহাদের মতে প্রকৃতির কর্ম্মফলে পুরুষ প্রকৃতি হইতে মুক্তিলাভ করেন। কিন্তু পুরুষ মুক্ত হইয়া কিরূপ অবস্থায় থাকেন, তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন। পুরুষ আপনার মুক্তির জন্য প্রকৃতির নিকট ঋণী; কারণ, পুরুষ নিষ্ক্রিয়। এই জন্য সাংখ্যকে জড়বাদী ও নাস্তিক বলা হয়। কিন্তু সাংখ্য প্রকৃতপক্ষে অজ্ঞেয়বাদী। কারণ, জ্ঞানের ত্রিবিধ উপায়ের (প্রত্যক্ষ, অনুমান, আপ্তবচন) দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণিত করা যাইতে পারে না, ইহাই সাংখ্যের অভিপ্রেত। কিন্তু সাংখ্য তাহা বলিয়া ঈশ্বরের অনস্তিত্ব প্রমাণ করা যাইতে পারে, এরূপ কথনও বলেন নাই। সাংখ্যের পঞ্চবিংশতি তন্মাত্রের ক্রমবিকাশের (অচৈতন্য হইতে চৈতন্যাবস্থা) সহিত হেগলের Diaelcticএর সাদৃশ্য আছে বলিয়া মনে হয়।

বেদান্ত ও সাংখ্যের মতে, জ্ঞানের উপায় তিন প্রকার, কিন্তু বেদান্ত 'আপ্ত-বচন' অবলম্বন করা সম্বন্ধে আমাদের স্বাধীনতা আছে, ইহা স্বীকার করিয়াছেন। তবে বেদান্ত নিজে বেদের কতকগুলি সূত্র বিনাপত্তিতে গ্রহণ করিয়াছেন;

পূর্ব্বে এই মতগুলির অখণ্ডনীয়তা স্বীকার করিয়া, শঙ্করাচার্য্য চার্বাকে, নাস্তিকতা ও সাংখ্যের অজ্ঞেয়বাদের উপরে উঠিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু এই জন্য কেহ কেহ বলেন যে, সংস্কৃত দর্শন আদৌ যুক্তির মূলে গঠিত নহে। দার্শনিকগণ আপন আপন মত ইচ্ছামত বিনিবিষ্ট করিয়াছেন মাত্র, যুক্তি প্রদর্শন করেন নাই। কিন্তু ম্যাক্‌স্‌মূলার বলেন যে, প্রতীচ্যদর্শনের এই প্রণালীই বরং ঠিক। কারণ, প্রত্যেক দর্শনে কতকগুলি সত্য স্বতঃসিদ্ধভাবে মানিয়া লইতেই হইবে। এই বিষয়ে পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ প্রতীচ্য পন্থা অবলম্বন করিলে অনেক বৃথা বিরোধ ও পরিশ্রম বাঁচিয়া যাইত।

এই স্থলে একটি বিষয় মনে রাখা কর্ত্তব্য। বেদান্ত ও সাংখ্যের পূর্ব্বে যে দর্শনশাস্ত্র প্রচলিত ছিল, অস্তিত্বসংগ্রামে তাহা বিলুপ্ত হইয়া থাকিবে। সে সকল দর্শনের যুক্তির দ্বারা প্রতিপাদিত সত্যগুলিকে ইঁহারা স্বীকার্য্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। বিজ্ঞানভিক্ষু এইরূপ বলেন যে, আমাদের ষড়দর্শন কোন একটি সাধারণ দর্শন হইতে সমুদ্ভূত হইয়া থাকিবে। ম্যাক্‌স্‌মূলারও এইরূপ অনুমান করিয়াছেন। তিনি বলেন, সুদূর অতীতের সেই সাধারণ দর্শন সমস্ত দার্শনিক ভাষা ও ভাবের মানসসরোবর ছিল, যাহা হইতে দার্শনিকগণ ইচ্ছামত রত্ন তুলিয়া ব্যবহার করিতেন। ইহাও অসম্ভব নহে যে, হস্তলিপির যুগে লিপিবাহুল্যভয়ে অতি সাধারণ যুক্তিগুলি পরিত্যক্ত হইয়া থাকিবে।

ম্যাক্‌স্‌মূলার ভারতীয় দর্শনের সত্যনিষ্ঠা, স্বাধীনতা ও উদারতার অত্যন্ত প্রশংসা করিয়াছেন। আর্য্য ঋষিগণকে জঠরের ভীষণ তাড়নে মূলমন্ত্র ভুলিয়া যাইতে হয় নাই; অদৃষ্টের অগ্নিপরীক্ষা সহ্য করিতে হয় নাই, এবং উপজীবিকার জন্য জনসাধারণ নামক অদ্ভুত প্রাণীর ভ্রূকুটী অথবা প্রসাদের প্রতি লক্ষ্য করিতে হয় নাই। চার্বাক নাস্তিক ছিলেন, তিনি তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হন নাই; বরং, বেদপ্রভৃতি শাস্ত্র অন্ধবিশ্বাসমুগ্ধ সাধারণকে প্রলোভিত করিবার জন্য লোভী ব্রাহ্মণদিগের বাগুরাবিস্তার ইত্যাদি বলিয়া গালি বর্ষণ করিয়াছেন। সাংখ্যকার ঈশ্বরের অপ্রামাণ্যতা প্রমাণিত করিতে সঙ্কুচিত হন নাই। ইঁহারা একেশ্বরবাদী বা নিরীশ্বরবাদী, দ্বৈত বা অদ্বৈতবাদী, জড় বা চৈতন্যবাদী, যাহাই হউন, তৎসম্বন্ধে আমাদিগকে সন্দেহে রাখিয়া যান নাই। আর এক কথা এই যে, ইউরোপীয় দর্শন প্রায়ই

।গুিত্যপ্রসূত। প্রাচীন হিন্দুদিগের পক্ষে দর্শনশাস্ত্র অতীব গুরুতর বিষয় ছিল। জীবনের সমস্যানির্ণয় ইহার মুখ্যতম উদ্দেশ্য, এবং এই বিষেয় কৃতকার্য্যতা অনুসারেই ইহার প্রকৃত মূল্য নিরূপিত হইত। সেই জন্য বেদান্ত-দর্শন প্রভৃতি ধর্ম্মের সহিত এরূপ বিজড়িত যে, ধর্ম্মগত ও দর্শনগত অংশের বিশ্লেষণ অত্যন্ত দুষ্কর।

হিন্দুদর্শনের একটি জটিল বিষয়,—ভিন্ন ভিন্ন দর্শনের কালনির্দ্দেশ। ভারতীয় দর্শনের বিস্তৃতি ও চিন্তাশক্তির বিকাশের নিরূপণ করিতে হইলে দর্শন-গুলির পারম্পর্য্যনির্দ্দেশ করা নিতান্ত আবশ্যক। বিলাতে সেক্‌স্‌পিয়র সমাজ প্রভৃতি যেরূপ সভা সমিতি আছে, আমাদের দেশে তত্ত্বানুসন্ধিৎসু যোগ্য ব্যক্তিগণের সেইরূপ সমবেত চেষ্টা কি অসম্ভব? মহাভারত-প্রণেতা ব্যাস ও বেদকর্ত্তা একই ব্যক্তি কি না, ইহাও একটি ঐতিহাসিক আলোচনার বিষয়। কেহ কেহ বলেন যে, মহাভারতের ব্যাসদেব ও বেদপ্রণেতা কখনই এক ব্যক্তি হইতে পারেন না। অতীতের বিস্মৃতিময় তমোগর্ভ আমাদের ক্ষীণ দৃষ্টি শক্তি উপেক্ষা করিয়া অগণিত প্রহেলিকার সৃষ্টি করিতেছে!

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র।

পাগল।

১

রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের ফরেক্কাবাদে ওকালতি করিতেন। বড় উকিল, পসার বেশ জমিয়া গিয়াছিল। মক্কেলের নিকট হইতে যে অর্থ পাইতেন, তাহার অধিকাংশই খরচ হইয়া যাইত; অথচ পরিবারের মধ্যে স্ত্রী আর কন্যা। পুত্রসন্তান হয় নাই,—হইবার আশাও ছিল না। হুগলী জেলার হরিহরপুরে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা থাকিতেন, বিষয় যাহা ছিল, তাহাতেই সংসার বেশ চলিয়া যাইত। তবুও রাজেন্দ্রবাবু মধ্যে মধ্যে দাদাকে টাকা পাঠাইতেন।

দাদা হরিহর মুখোপাধ্যায় বারবার অনুরোধ করেন, মেয়ে বড় হই- বিবাহের ব্যবস্থা করিতে হয়। রাজেন্দ্র বাবু কথাটা তেমন গায়ে মাখেন না ; ইন্দুর বিবাহ হইয়া গেলে সে পরের ঘরে চলিয়া যাইবে ; গৃহ যে অন্ধকার হইবে। এই ভাবনাতেই রাজেন্দ্র বাবুর কষ্ট হইত। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, একটি পিতৃমাতৃহীন ভাল ছেলে পাইলে তাহার সহিত ইন্দুর বিবাহ দিয়া ঘরজামাই রাখিবেন। সে রকম ছেলে মেলে কৈ ? এ দিকে দাদার তাড়ায় অস্থির। তবুও ইন্দুর বয়স এখনও এগার পার হয় নাই।

শেষে অনেক চেষ্টায় মৈনপুরীর সেরেস্তাদার রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের একমাত্র পুত্র পরেশের সঙ্গে ইন্দুর বিবাহ স্থির হইল। ঘরজামাই মিলিল না বটে, কিন্তু মৈনপুরী ফরেক্কাবাদ হইতে বেশী দূর নয় ; যখন তখনই মেয়েকে দেখিতে পাওয়া যাইবে। এই আশায় বিবাহ স্থির হইল। বৈশাখ মাসের ১৭ই তারিখে ইন্দুর বিবাহ হইয়া গেল। রাজেন্দ্র বাবু কাছারীর কাজ কর্ম্ম ফেলিয়াই মেয়ের সঙ্গে মৈনপুরী গেলেন, এবং সপ্তা- হের মধ্যেই ইন্দুকে লইয়া বাসায় ফিরিলেন ; নিরানন্দ গৃহ আবার আনন্দ- পূর্ণ হইল।

আশ্বিনমাসে নূতন জামাই সঙ্গে লইয়া বাড়ী আসিবার বন্দোবস্ত হইতেছে, জিনিসপত্র বাঁধা হইতেছে ; যাত্রার দিন পর্য্যন্ত স্থির হইয়াছে। জামাই পরেশ যাত্রার একদিন পূর্ব্বে আসিয়া শ্বশুরের সঙ্গে মিলিবে। এমন সময় একদিন সন্ধ্যার সময়ে তার আসিল, পরেশের বড় অসুখ ; ইন্দুকে লইয়া অবিলম্বে যাইবার জন্য অনুরোধ। রাজেন্দ্র বাবু স্ত্রী ও কন্যাকে লইয়া তাড়াতাড়ি রওনা হইলেন। রামলাল বাবুর বাড়ীতে পঁহুছিয়া আর পরেশকে দেখিতে পাইলেন না ; পরেশ কোন এক অজানা দেশে চলিয়া গিয়াছে। পিতা মাতা বালিকা স্ত্রী সকলকে ফেলিয়া সে আর এক রাজ্যে গিয়াছে। উন্মত্ত রাজেন্দ্র সমস্ত গৃহ অনুসন্ধান করিয়াও সে মুখখানি আর একটিবার দেখিতে পাইলেন না। স্ত্রী কন্যা লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে রাজেন্দ্র ফরেক্কাবাদে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার বড় সাধের কন্যা—বড় আদরের ধন চিরদিনের জন্য তাঁহার গৃহে বাস করিতে আসিল। নিরানন্দ গৃহ ত আর আনন্দপূর্ণ হইল না ; কে এক জন পরের ছেলে সব আনন্দ লইয়া আনন্দধামে চলিয়া

২

বিধবা ইন্দুর দুঃখময় জীবনের উপর দিয়া পাঁচটি বৎসর চলিয়া গিয়াছে। রাজেন্দ্র বাবু বিধবা কন্যাটিকে বুকে লইয়া সেই ফরেক্কাবাদে পাঁচ বৎসর কাটাইলেন। বাড়ী হইতে দাদার কত অনুরোধ আসিল, কতবার দাদা নিজে আসিলেন, কিন্তু রাজেন্দ্র বাবু নিজের উপর চিরনির্ব্বাসনদণ্ড বিধান করিয়াছিলেন। কি লইয়া দেশে ফিরিবেন? যে কয় দিন বাঁচিয়া থাকিবেন, এই বিদেশেই চিরদুঃখিনী কন্যাকে লইয়া কাটাইয়া দিবেন।

ইন্দুর বয়স ষোল বৎসর। যৌবনের সৌন্দর্য্য সর্ব্বাঙ্গে ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। পিতা মাতা কন্যার এই অতুলনীয় সৌন্দর্য্য দেখেন, আর নির্জ্জনে চক্ষের জল মোছেন। এক এক বার ভাবেন, পরেশ চলিয়া গেল, এ জ্বলন্ত দীপশিখা রাখিয়া গেল কেন? ইন্দু নিজের উচ্ছলিত রূপরাশি ঢাকিবার জন্য বিধিমত চেষ্টা করে। সে সমস্ত অলঙ্কার খুলিয়া ফেলিয়াছে, মোটা সাদা গন্ধা পরে, শরীরকে নিগৃহীত করিবার জন্য অনেক দিন অনাহারেই কাটাইয়া দেয়। মাথার চুলগুলি কাটিয়া ফেলিবার জন্য একবার প্রস্তাব করিয়াছিল; কিন্তু সেই কথা শুনিয়া পিতামাতা দুই দিন অনাহারে ছিলেন;—সে কৃষ্ণকেশগুচ্ছ আর কাটা হইল না। পিতা মাতাকে প্রফুল্ল রাখিবার জন্য কত কষ্টে তাঁহাদের সম্মুখে আপনাকে সর্ব্বদাই প্রফুল্লিত রাখে; হৃদয়ের অসীম দুঃখ কত করিয়া চাপা দেয়। কিন্তু যখনই কেহ কাছে থাকে না, তখন তাহার মুখে কালী ভাঙ্গিয়া দেয়; বসিয়া বসিয়া কত কি আকাশ পাতাল ভাবে। বিধবা যুবতীর সে ভাবনা ভাষায় ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করা বৃথা; সে ভাবনার আগা নাই, গোড়া নাই; তার পদ্ধতি নাই, শৃঙ্খলা নাই। ভাবিতে ভাবিতে হয় ত ক্লান্ত হইয়া পড়ে, তখন দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বোঝাটা বুঝি একটু হালকা করিয়া লয়। অথবা দুঃখিনী বিধবা সকল ভাবনা, সকল দুঃখ, সেই অখিলনির্ভরের উপর ফেলিয়া দিয়া তখনকার গৃহকার্য্যে মনোনিবেশ করিতে যায়। আবার যখন ভাবনার ভার চাপিয়া পড়ে, কত আশা, কত অতৃপ্ত বাসনা, কত অনাস্বাদিত সুখ, কত আকাশকুসুম, চারি দিক হইতে ঘিরিয়া ধরে, তখন আবার দৌড়াইয়া গৃহের ছাদে কি অন্য কোন নির্জ্জন স্থানে গিয়া, কখনও নয়নজলের সাহায্যে, কখনও দীর্ঘনিশ্বাস দিয়া সেগুলিকে বিদায় করিয়া দেয়। বিধবার দুর্ব্বহ

ইন্দুর মা ভাবেন, এ অতুল রূপরাশি লইয়া কোথায় লুকাইব সর্ব্বদা চোখে চোখে রাখিয়াও তাঁহার ভয় দূর হয় না। রাজেন্দ্র বাবু বলেন, মেয়ে আমার সতী লক্ষ্মী, তাহার মনে কোন অপবিত্র ভাব প্রবেশ করিতে পারিবে না। এই ভাবে এত দিন গিয়াছে।

কঠোর নির্ম্মম অদৃষ্টলিপিতে আরও অনেক কথা আছে। এমন করিয়া দিন গেলেও ত হইত। এক দিন কাছারী হইতে ফিরিয়া আসিয়া রাজেন্দ্র বাবুর শরীর সামান্য একটু অসুস্থ হইল; সেই অসুখ রাত্রে বাড়িল; হাত পা অবশ হইতে লাগিল; ডাক্তার আসিল; চিকিৎসাও হইল; কিন্তু সব ফুরাইল। রাত্রিপ্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে রাজেন্দ্র বাবুর প্রাণবায়ু জামাতার উদ্দেশে চলিয়া গেল।

৩

আর কি লইয়া ফরেক্কাবাদে বাস করিবেন? ইন্দুর মা বিধবা কন্যার হাত ধরিয়া হরিহরনগরে ফিরিয়া আসিলেন। আজ নয় বৎসর পরে মা ও মেয়ে থানের ধুতি পরিয়া কাঙ্গালিনীর ন্যায় গ্রামে আসিলেন। বাড়ীতে কান্না পড়িয়া গেল। পাড়ার সকলে দেখিতে আসিল; মেয়ের অপূর্ব্ব রূপ দেখিয়া সকলে অবাক্ হইয়া গেল; সকলেই একবাক্যে বলিল, মেয়ে ত নয়, যেন মা দুর্গা!

পাড়াগাঁয়ের গৃহস্থঘরের মেয়েরা অন্তঃপুরে আবদ্ধা থাকে না; পাড়ায় সকলের বাড়ীতেই তাহাদের গতিবিধি করিতে হয়। স্নানের জন্য পুকুর-ঘাটেও যাইতে হয়। প্রথম প্রথম কয়েক দিন বাহিরে যাইতে ইন্দুর কেমন বাধ-বাধ ঠেকিত, তাহার পর ক্রমে সে সব তাহার অভ্যাস হইয়া গেল। মেয়ের স্বভাব চরিত্র, বিনয়নম্র ব্যবহার, মাতৃভক্তি দেখিয়া সকলে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল।

একদিন ইন্দু বাড়ীর আরও কয়েকটি স্ত্রীলোকের সহিত পুকুরঘাটে স্নান করিতে গিয়াছে। এ পুকুরে পাড়ার স্ত্রীলোকেরা স্নান করে বলিয়া পুরুষেরা বড় একটা এ দিকে আসেন না। সেদিন কিন্তু দৈবক্রমে দক্ষিণপাড়ার বছিরদ্দি মণ্ডলের পুত্র আমীর মণ্ডল পুকুরের ধারের খেজুর গাছ কাটিতে-ছিল। স্নানের ঘাটে কথাবার্ত্তার শব্দ পাইয়া আমীর সেই দিকে চাহিয়া দেখিল;—দেখিল, স্বর্গের এক দেবী ঘাটের জলে আগ্রীবনিমজ্জিতা হইয়া স্নান

হার নয়নপথের পথিক হয় নাই। আমীর আর চক্ষু ফিরাইতে পারিল না। উনিশ বৎসরের যুবক,— মাথায় লম্বা চুল, গৌরবর্ণ, মণ্ডল-পুত্র, অনিমেষ-নয়নে সেই অনিন্দ্যসুন্দর রূপ দেখিতে লাগিল। সে যেন সেই রূপের সাগরে ডুবিয়া গেল। ভদ্র গৃহস্থের মেয়ে,—ব্রাহ্মণকন্যা, সে সব ভুলিয়া গেল। তাহার সেই খেজুর গাছ কাটিবার শাণিত অস্ত্র তাহার হাতেই থাকিয়া গেল। কে যেন তাহাকে মন্ত্রবলে যাদু করিয়া ফেলিল! সহসা তাহার অবশ হস্ত হইতে অস্ত্রখানি জলের মধ্যে পড়িয়া গেল। সেই শব্দে তাহারও চৈতন্য হইল; স্নানার্থিনী রমণীগণের দৃষ্টিও সেই দিকে আকৃষ্ট হইল। তাঁহারা দেখিলেন, একটি মুসলমান যুবক তাড়াতাড়ি খেজুরগাছ হইতে নামিতেছে।

মণ্ডল-পুত্র আমীর গাছ হইতে নামিয়া আর জলের মধ্যে অস্ত্রের সন্ধান করিল না। পুকুরের ধারের কালকাসিন্দার বেড়া ডিঙ্গাইয়া মাঠে যাইয়া পড়িল, এবং সেই চষা মাঠের মাটীর উপর দুই জানুর মধ্যে মাথা দিয়া বসিয়া পড়িল। বিশ্বসংসার তখন তাহার মাথার মধ্যে ঘুরিতেছে! সুরাপান করিয়াই লোকে উন্মত্ত হয়; কিন্তু দক্ষিণপাড়ার বছিরদ্দি মণ্ডলের ঊনবিংশ বৎসরের উপযুক্ত পুত্র আমীর মণ্ডল আজ বিধবা ব্রাহ্মণকন্যার রূপসুধাপানে সত্য-সত্যই উন্মত্তের ন্যায় হইয়া পড়িল। ধীরে ধীরে মাথা তুলিয়া জানুর উপরে দুই হাতের ভর দিয়া আমীর একবার উঠিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু কি ভাবিয়া যেন আবার বসিয়া পড়িল। কতক্ষণ পরে আমীর ভূমি-আসন ত্যাগ করিয়া মাথা নীচু করিয়া চোরের মত পা টিপিয়া পুকুরের ধারে কালকাসিন্দার বেড়ার নিকট গেল; দুই হাতে বেড়া একটু ফাঁক করিয়া দেখে, ঘাট অন্ধকার;—ঘাটে কেহ নাই।

৪

কন্দর্প ঠাকুর গরিব মণ্ডল-পুত্র আমীরের স্কন্ধে যে কেন ভর করিলেন, তাহা তিনিই বলিতে পারেন। তবে আমাদের মতে তাঁহার পক্ষে এ কাজটা নানা কারণে ভাল হয় নাই। জগতের কেহ এই দীপ্তশিখারূপিণী মূর্ত্তিমতী পবিত্রতার দিকে কুদৃষ্টি করিতে সাহস করিল না; আর এই নিরক্ষর মণ্ডল-পুত্র তাহাকে দেখিয়া পাগল হইল? লেখাপড়া জানিলে সে না হয় কবিতা লিখিত; লম্বা চুলগুলির কেয়ারী করিত; আকাশের চাঁদের দিকে চাহিয়া থাকিত; কত হা হুতাশ, কত দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিত। ...

নির্জ্জন নির্ঝরিণীতীরে, বিহঙ্গকাকলীমুখরিত শ্যাম কুঞ্জবনে তমালতলে কুটী নির্ম্মাণ করিয়া, প্রেমের সন্ন্যাসী সাজিয়া, প্রেমময়ীর রূপধ্যানে কিছু দিন কাটাইত। তাহা পর দেশে ফিরিয়া দীর্ঘ কেশ মুণ্ডন করিয়া গৈরিকবসন পরিত্যাগপূর্ব্বক একটি বালিকার পাণিগ্রহণ করিয়া শেষে পুত্র কন্যা লইয়া সুখে ঘরগৃহস্থালী করিত। ব্যাপারটি বেশ শোভন হইত, গল্পটিও বেশ জমাট বাঁধিত। কিন্তু বিধিলিপি! প্রভু কন্দর্পদেবের অতখানা ভাবিবার অবকাশ ছিল না। অশুভক্ষণে আমীর মণ্ডল তাঁহার শরের লক্ষ্য হইল। বেচারা না জানে কাঁদিতে, না জানে কবিতা লিখিতে, না জানে জ্যোৎস্না-রজনীর শোভা উপভোগ করিতে।

আমীর সেই দিন হইতে কাজ কর্ম্ম ছাড়িয়া দিল। প্রথম তিন চারি দিন সে বাড়ীর বাহির হইল না; দিনরাত্রি সুধু হাঁটুর মধ্যে মাথা দিয়া বসিয়া থাকে; আর এক এক বার মাথা তুলিয়া কাতরনয়নে চারি দিকে চায়,—কাহাকে যেন খোঁজে। বৃদ্ধ পিতা ভাবিয়া অস্থির, মাতা কাঁদিয়া আকুল। মণ্ডলের একমাত্র লায়েক পুত্র,—সংসারের অবলম্বন। সে ভাল করিয়া খায় না, কাহারও সঙ্গে কথা কহে না, কোন কাজে যায় না; সুধু হাঁটুর মধ্যে মাথা দিয়া দাবায় বসিয়া থাকে; আর কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলে সজলনয়নে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকে।

দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যার পরে আমীরের বাড়ীর দাবায় কমিটী বসিল। পাড়ার মাতব্বর সরদার, সেখ, খাঁ প্রভৃতি সকলে আসিয়া বসিলেন। প্রতিবেশী হবিবুল্লা সরদারের অশীতিবর্ষীয়া বৃদ্ধা জননীও সেই দাবায় উপস্থিত। সকলেই একবাক্যে বলিল, ছেলের উপর পরীর দৃষ্টি হইয়াছে; সে বিষয়ের প্রমাণপ্রয়োগও যথেষ্ট হইল; নানা জনে পরীর দৃষ্টি সম্বন্ধে নানা গল্প বলিল। হবিবুল্লার মা সে দিনের জন্য নানাপ্রকার তুক্ তাকের ব্যবস্থা করিল, এবং আগামী কল্য প্রত্যুষেই কসিমপুর হইতে বিখ্যাত রোজা গুণীন হানিফ সেখকে আনিবার ব্যবস্থা স্থির হইল। আমীর সেই সভাস্থলে বসিয়া; কত জনে কত কি বলিতেছে, কিন্তু সে কোন কথারই জবাব দিতেছে না। বুঝি ব্রাহ্মণকন্যা ইন্দুর রূপরাশি তাহার সমস্ত শরীর অসাড় করিয়া দিয়াছিল।

ন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। "শক্ত পরীতে নাগাল লইয়াছে, আপনি ইচ্ছা করিয়া না গেলে কেহ তাড়াইতে পারিবে না" এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়া রোজা ঘরে ফিরিয়া গেল।

৫

আমীরের স্কন্ধে যে শক্ত ভূত চাপিয়াছিল, সে সহজে নামিল না। সেই ভূতের গল্পই ত বলিতে বসিয়াছি। আমীরের পিতা মাতা নিরাশ হইল; এমন কর্ম্মক্ষম ছেলেটির এমন দশা দেখিয়া তাহারা মাথায় হাত দিয়া বসিল; তাহাদের মনে হইল, কে যেন তাহাদের অন্নের গ্রাস মুখ হইতে কাড়িয়া লইয়া গেল;—কে যেন তাহাদের অন্ধের নড়ি ভাঙ্গিয়া দিয়া গেল। চিকিৎসা আর কি করিবে? এত বড় ওঝা যখন হারি মানিয়া গেল, তখন আর চিকিৎসা নাই। এখন, ভরসা আল্লা। সেই আল্লার উপর নির্ভর করিয়াই আমীরের বাপ মা চুপ করিয়া রহিল।

সকলে মনে করিয়াছিল, আমীরের উন্মাদের লক্ষণ প্রকাশ পাইবে; কিন্তু সে সব কিছুই হইল না। আমীর তিন চারি দিন বাড়ীতেই বসিয়া রহিল; দিনরাত্রি বুঝি তাহার হৃদয়ের মধ্যে দেবাসুরের যুদ্ধ চলিতেছিল। শেষে অশুরেরই জয় হইল। আমীর আর গৃহে তিষ্ঠিতে পারিল না; কিন্তু কেমন করিয়া সে ব্রাহ্মণবাড়ীতে যাইবে? সেখানে গেলে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, "কেন আসিয়াছ? কি চাও?" তাহা হইলে সে কি জবাব দিবে? লোকে যদি তাহাকে সন্দেহ করে, তাহা হইলে কি হইবে? অনেক ভাবিয়া শেষে আমীর স্থির করিল, সে পুকুরের পাড়ে কোন স্থানে বসিয়া থাকিবে; ব্রাহ্মণকন্যা নিশ্চয়ই স্নান করিতে, জল লইতে, দুই চারিবার ঘাটে আসিবে। তাহা হইলেই সাধ মিটিবে। সে ত আর কিছুই চাহে না, স্নধু সেই দেবীপ্রতিমা দেখিতে চায়, স্নধু এক এক বার প্রাণ ভরিয়া সেই রূপসুধা পান করিতে চায়। মূর্খ মণ্ডলের ছেলে মনে ভাবিয়াছিল, সেই সুন্দরীর রূপ একবার করিয়া দেখিলেই বুঝি তাহার হৃদয় শীতল হইবে। রূপদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে যে তাহার মনে আরও কত ভাবের উদয় হইবে, তাহা সে তখন ভাবিতে পারে নাই; তাহার তৃষিত চিত্ত একবার সেই রূপ দেখিলেই পরিতৃপ্ত হইবে, তাহাই সে মনে করিয়াছিল।

ধারের খেজুরতলায় যাইয়া বসিয়া রহিল। পুকুরের ঘাটের দিকে সরল ভাবে চাহিতে তাহার সাহসে কুলাইতেছিল না; সে ভয়ে ভয়ে ঘাটের দিকে পিছন করিয়া বসিয়াছিল, কিন্তু থাকিয়া থাকিয়া তাহার যেন মনে হইতে লাগিল, কে তাহাকে উঁচু করিয়া ধরিয়া তাহার মুখখানা সজোরে পুকুরের দিকে ফিরাইয়া দিতেছে। হায় হায়! মণ্ডলের ছেলে সত্য সত্যই পাগল হইবে।

ঘাটের দিকে একটু শব্দ হইলেই আমীর চোরের মত চাহিয়া দেখে। বেলা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। কত স্ত্রীলোক স্নান করিতে আসিল; কত হাস্যপরিহাসে পুকুরের ঘাট পরিপূর্ণ হইল; কত জন স্নান করিয়া চলিয়া গেল। বেলা হইল, কিন্তু বিধবা ব্রাহ্মণকন্যা ত স্নান করিতে আসিল না। তবে কি সে আজ স্নান করিবে না? কেন? হয় ত তাহার অসুখ হইয়াছে, তাই সে আজ স্নানে আসিল না। অসুখের কথা মনে হইতেই আমীর কেমন হইয়া গেল। তখন সে ব্রাহ্মণবাড়ীতে যাইয়া কোন প্রকারে সংবাদ লইবে, কৃতসঙ্কল্প হইল।

পুকুরের ধারের সেই কালকাসিন্দার বেড়ার ভিতর দিয়া বাহির হইয়া মাঠ পার হইয়া আমীর রাস্তায় উঠিল। সেইটি পুকুরের রাস্তা। একটু অগ্রসর হইয়াই একটা মোড় আছে। আমীর সেই মোড় ফিরিয়াই দেখে, সম্মুখে পথের মাঝখান দিয়া ব্রাহ্মণকন্যা একাকিনী একটি কলসী কক্ষে স্নান করিতে আসিতেছে। তাহাকে দেখিয়াই আমীর থমকিয়া দাঁড়াইল;—তাহার পর এক দৌড়ে পলায়ন।

৬

আমীর সত্য সত্যই পাগল হইয়াছে। তাহার মুখে কথা নাই। সারাদিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাহিরবাড়ীর উঠানের পাশের লম্বা ঘরের বারান্দায় পড়িয়া থাকে। সারাদিন সে সেখান হইতে নড়ে না, কোথাও যায় না; রাত্রে উঠিয়া খানিকক্ষণ রাস্তায় রাস্তায় দৌড়িয়া যখন ক্লান্তিবোধ হয়, তখন আবার আসিয়া সেই বারান্দায় পড়িয়া থাকে। তাহার বাপ মা কত দিন তাহাকে জোর করিয়া বাড়ী লইয়া গিয়াছে, হাত পা বাঁধিয়া রাখিয়াছে; কিন্তু যদি কোন প্রকারে সে একবার ছাড়া পাইয়াছে, অমনি এক দৌড়ে ব্রাহ্মণবাড়ীর বারান্দায় আসিয়া হাজির। কাহারও সহিত সে কথা কহে না, কোন অত্যাচার করে না, শুধু সেই বাড়ীর ভিতরকার দ্বারের দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকে।

বিধবা ইন্দুর হৃদয় এই পাগলের দুঃখে গলিয়া গেল। আহা! এমন জোয়ান ছেলে, পাগল হইয়া গেল! এই কথা সর্ব্বদাই তাহার মনে হইত। প্রতিদিন দ্বিপ্রহরে সে পাগলকে ভাত দিয়া যাইত। একখানি কলাপাতায় করিয়া ভাত ব্যঞ্জন দিত, আর একটা মাটীর ভাঁড় দিয়াছিল, তাহাতেই জল দিত। ইন্দু প্রথম প্রথম ভাত দিয়াই চলিয়া যাইত, কিন্তু বিকালে কি অন্য সময়ে আসিয়া দেখিত, যেমন ভাত তেমনি পড়িয়া আছে। তখন দয়াময়ী ইন্দু সেখানে দাঁড়াইয়া যেই বলিত, "আমীর, ভাত খাও", আর অমনি পাগল গোগ্রাসে ভাতগুলি খাইয়া ফেলিত। ইন্দু বলিত, "আমীর, পাতখানি ফেলিয়া মুখ ধুইয়া এস", আমীর অবিলম্বে আদেশ পালন করিত।

ইন্দুর এখন এক কাজ বাড়িল; প্রতিদিন পাগলকে খাওয়ান। জেঠামহাশয় এক এক দিন দাঁড়াইয়া এই দৃশ্য দেখিতেন, আর বলিতেন, "মা আমার অন্নপূর্ণা,—আমার মায়ের গুণে পাগলও বশ হয়।" হায় ব্রাহ্মণ, কি বুঝিবে তুমি!

আর কি আত্মসংবরণ, কি ইন্দ্রিয়জয়ের শক্তি ঐ নিরক্ষর চাষার ছেলে আমীরের। তাঁহার সাধনার ধন, তাহার জীবনের অবলম্বন, তাহার তৃষ্ণার জল, তাহার কল্পনার সর্ব্বস্ব প্রতিদিন তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায়, তাহার ক্ষুধার অন্ন পিপাসার জল দিয়া যায়; কিন্তু যে ক্ষুধায় তাহার প্রাণ জ্বলিতেছে, যে মহাতৃষ্ণায় তাহার ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে, আমীর তাহা হৃদয়ের অন্তস্তলে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। একদিনও সে ভাল করিয়া তাহার দেবতার মুখের দিকে চাহিতে পারিল না।

৭

এই ভাবে পাগলের দীর্ঘ তিন বৎসর কাটিয়া গেল। পাগল ব্রাহ্মণদের সেই বারান্দায় দিন কাটাইতে লাগিল।

একদিন দ্বিপ্রহরে তাহার খাবার আসিল না। পাগল ভাবিয়া পায় না, কি হইয়াছে। অনেকক্ষণ পরে ইন্দুর মা আসিয়া পাগলের খাবার দিয়া গেলেন। পাগল ভাবিল, এমন ত কোন দিন হয় না, ব্রাহ্মণকন্যা ভিন্ন আর কেহ ত এই তিন বৎসর তাহাকে খাইতে দেয় নাই। আজ কি তাহার কাজ কর্ম্ম আছে? আমীর সে দিন আর ভাত খাইল না; যেমন ভাত তেমনই পড়িয়া রহিল।

বিকালে পাগল শুনিল, ইন্দুর বড় জ্বর হইয়াছে। জ্বরের অবস্থা তাহা

নয়। ব্রাহ্মণের বিধবা, ঔষধ খাইতে নাই। সেদিন চলিয়া গেল; পরা. জ্বর আরও বাড়িয়া উঠিল।—প্রেমচাঁদ কবিরাজকে ডাকিয়া আনাইল। বৃদ্ধ কবিরাজ মহাশয়ের নাড়ীজ্ঞান অসাধারণ; তিনি ইন্দুর নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, সান্নিপাতক্ষেত্রে জ্বর, বাঁচিবার আশা নাই, বিকারের লক্ষণ দেখা গিয়াছে। রাত্রে বাঁচে কি না সন্দেহ। বাড়ীতে কান্না-কাটি পড়িয়া গেল।

কবিরাজ মহাশয়ের কথাই সত্য হইল। রাত্রি সাড়ে তিনটার সময় বিধবা ইন্দু সকল দুঃখ যন্ত্রণার হাত এড়াইয়া চলিয়া গেল। বাড়ীতে কান্নার রোল উঠিল।

পাগল আমীর আর সেখানে বসিয়া থাকিতে পারিল না। উন্মত্তের ন্যায় ছুটিয়া ব্রাহ্মণ-বাড়ীর অন্দরে প্রবেশ করিল। সেখানে যাইয়া দেখে, তাহার জীবনের অবলম্বন, তাহার পাগলের নিধি, উঠানে পড়িয়া রহিয়াছে! পাগল আর স্থির থাকিতে পারিল না। আজ দীর্ঘ তিন বৎসর হৃদয়ের সহিত মহা সংগ্রাম করিয়া সে জয়ী হইয়াছিল, আজ আর সে পারিল না; আজ তাহার পরাজয়ের দিন। উন্মত্তের ন্যায় ছুটিয়া গিয়া পাগল ইন্দুর মুখের উপরের বস্ত্রাবরণ দূরে ফেলিয়া দিল।—আর চীৎকার করিয়া বলিল, "আজ—"। চারিদিক হইতে সকলে ছুটিয়া আসিল, পাগলকে সরাইতে গেল। পাগল আপনি সরিয়া দাঁড়াইল, একবার নিমেষমাত্র মৃতার মুখের দিকে চাহিল। তাহার পর ছুটিয়া বাড়ীর বাহির হইয়া সে ঘনান্ধকারে কোথায় মিশিয়া গেল।

আর কেহ তাহার সন্ধান পায় নাই।

শারীরিক কার্য্যপ্রণালী।

শারীরিক কার্য্যপ্রণালী মোটামুটি এইরূপ ভাবে চলিয়া থাকে।—আমরা যে সকল দ্রব্য আহার করি, পরিপাক-ক্রিয়া দ্বারা তাহা হইতে সারাংশ পৃথকৃকৃত হইয়া রক্তে নীত হয়।

পরিপাক-কার্য্য পরিপাকযন্ত্রে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। এই পরিপাকযন্ত্র একটি বৃহৎ নলমাত্র,—অতি জটিলভাবে সংস্থিত। ইহার প্রবেশপ্রান্তে মুখ ও অপর প্রান্তে মলদ্বার। পরিপাকক্রিয়া দুইটি কার্য্য দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে। অন্নবহানালীর গাত্রের ভিন্ন ভিন্ন স্থল হইতে বিভিন্নরূপ পাচক-রস প্রস্তুত হইয়া খাদ্যের সহিত মিশ্রিত হয়, এবং নাড়ীর গতিবিশেষে সেই রসমিশ্রিত খাদ্যরাশি আলোড়িত হইয়া মুখের দিক হইতে আরম্ভ করিয়া মলদ্বারের দিকে চলিয়া যায়।

আমাদের ভিন্ন-ভিন্ন-জাতীয় খাদ্য আবশ্যক। যথা, মাংসজাতীয় খাদ্য,—যেমন মাংস, ডাল। বসাজাতীয়,—যথা ঘৃত, তৈল। মিষ্টজাতীয়,—যথা চিনি, গুড়। শ্বেতসারজাতীয়,—যথা চাল, ময়দা, ফল মূল ইত্যাদি। এতদ্ব্যতীত লবণ ও জলও অবশ্য প্রয়োজনীয়। একটি উদাহরণ দিয়া বলিলে পরিপাকযন্ত্রের বর্ণনাও হইবে, এবং পরিপাককার্য্যও বেশ বুঝা যাইবে। ভাব, আমি রুটি মাখন চিনি ও মাংস আহার করিয়া এক বোতল সোডা-ওয়াটার পান করিলাম। খাদ্যগুলি পাকস্থলী হইতে ক্ষুদ্র অন্ত্র দিয়া, এবং তৎপরে বৃহৎ অন্ত্র দিয়া অবশেষে মলদ্বারপথে বহির্গত হইয়া যায়। মুখ দিয়া খাদ্য প্রবেশ করিল, এবং চিবাইবার সময় লালার সংযোগে অন্নজাতীয় খাদ্য রুটিটুকু হজম হইয়া গেল। তৎপরে পাকস্থলীতে তথা হইতে প্রস্তুত রসের সংমিশ্রণে মাংসজাতীয় খাদ্য মাংসটুকু হজম হইল। এবং তাহার পর ক্ষুদ্র অন্ত্রের মধ্য দিয়া যাইবার সময় সেখানকার যকৃৎপ্রস্তুত পিত্তের সংযোগে এবং ক্লোম-প্রস্তুত ক্লোমরসের সংযোগে তৈলজাতীয় খাদ্য মাখনটুকু হজম হইল। শুধু তাই নহে, বাকি যে রুটি ও মাংস পূর্ব্বে হজম

হইয়া খাদ্য হইতে সাররস ক্ষুদ্র অন্ত্র ও বৃহৎ অন্ত্র দিয়া যাইব. সময় শোষিত হইয়া রক্তে নীত হইল। অবশিষ্ট যাহা জীর্ণ ও শোষিত হইল না, তাহা মলদ্বারপথে মলরূপে পরিত্যক্ত হইল।

এইরূপে রক্তে খাদ্য হইতে সাররস সংগৃহীত হইলে, সেই রক্ত প্রত্যেক সূক্ষ্মতম স্থানে সঞ্চালিত হয়। আমাদের যেমন খাদ্যের প্রয়োজন, শরীরের প্রত্যেক সূক্ষ্মতম অংশগুলিরও সেইরূপ খাদ্যের প্রয়োজন আছে। তাহারাও আমাদের মত জীববিশেষ। অসংখ্য জীবাণু (protoplasm) একত্র হইয়া এই দেহ গঠিত। যেমন অনেক লোক লইয়া একটি রাজত্ব গঠিত হয়, এবং সেই সব লোকের মধ্যে কতকগুলি যুদ্ধবিগ্রহকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া, কতক বা ব্যবসায় বাণিজ্য ইত্যাদি কার্য্যে নিযুক্ত থাকি া, রাজ্যটি চালাইয়া থাকে, সেইরূপ, এই শরীররূপ মহারাজত্বও অসংখ্য জীবাণু দ্বারা গঠিত, এবং ইহার কতকগুলি জীবাণু এক একটি নির্দ্দিষ্ট কার্য্য করে। অর্থাৎ, যেগুলি লইয়া হৃদয় হইয়াছে, সেগুলি কেবল রক্তপরিচালনকার্য্যে ; যেগুলি লইয়া পরিপাকযন্ত্র হইয়াছে, সেগুলি কেবল পরিপাককার্য্যে ; ইত্যাদি-রূপ এক একটি কার্য্যে ব্যস্ত । হস্ত গ্রহণ করে, পা চালায়, চক্ষু দেখে, কান শোনে, ইত্যাদি প্রত্যেক অঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য আছে। অসভ্য সমাজের প্রত্যেক জনে এবং নিম্নশ্রেণীর জীবের প্রত্যেক অঙ্গে এরূপ কার্য্যের বিভিন্নতা নাই। তাহাদের ভিতর যে যুদ্ধ করে, সেই ব্যবসা করে। যে অঙ্গ হজম করে, সেই আবার রক্ত চালায়। কিন্তু সুসভ্য দেশে ও উচ্চশ্রেণীর জীবে, এই বিভিন্নতা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান। খাদ্য হইতে সাররস সংগ্রহ করা পরিপাকযন্ত্রের কার্য্য ; সেই সাররস রক্তের সহিত শরীরের সূক্ষ্মতম অংশে লইয়া যাওয়া হৃদয়যন্ত্রের কার্য্য ; এবং তাহাদের আবর্জনা শরীর হইতে বাহির করিয়া দেওয়া ফুসফুস, ত্বক্ ও মূত্র-যন্ত্রের কার্য্য।

উপরি-উক্ত সাররস রক্তের সহিত এই সকল ক্ষুদ্র অংশে নীত হইলে, ঐ সকল অংশ তাহা হইতে নিজ নিজ আবশ্যকমত সারাংশ আত্মসাৎ করে, এবং যাহার যাহা পরিত্যজ্য আছে, সে সকলও রক্তে ঢালিয়া দেয়। রক্ত যেন সপ্রবাহ নদীর জল ;—যাহার জলপান করিবার ইচ্ছা হইল, সে জলপান করিল, এবং ছাই মাটি আবর্জ্জনা যাহার যাহা পরিত্যজ্য আছে, তাহা সে নদীর জলে ঢালিয়া দিল ; নদী সেগুলিকে লইয়া গন্তব্যপথে চলিয়া

জল, এই তিনটি প্রধান। এই সকল পরিত্যজ্য পদার্থ শরীর হইতে বাহির করিয়া দিয়া শরীরের রক্তশোধন আবশ্যক। ফুসফুস দিয়া প্রশ্বাসের সহিত দ্ব্যম্লাঙ্গার নির্গত হইয়া যায়। মূত্রযন্ত্র দিয়া মূত্ররূপে জলের সহিত অনেকটা ইউরিয়া নির্গত হয়, এবং ত্বক্ দিয়া ঘর্ম্মরূপে প্রভূত জলীয়াংশ বহির্গত হইয়া যায়। এগুলির কোন্‌টি কোথায় আছে, জানা আবশ্যক। বক্ষঃস্থলের দুই ধার জুড়িয়া ফুসফুস অবস্থিত। নিশ্বাস প্রশ্বাসের বায়ু এইখানে যাতায়াত করে, এবং এইখানে প্রভূতপরিমাণে রক্ত থাকায়, বায়ু হইতে রক্তে অম্লজান গৃহীত হয়, এবং রক্ত হইতে বায়ুতে দ্ব্যম্লাঙ্গার নির্গত হইয়া যায়। দুইধারকার দুইটি ফুসফুসের মধ্যে হৃদয় অবস্থিত। উদরে পাকযন্ত্র অবস্থিত,—পাকস্থলী, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অন্ত্র ও মলদ্বার। এই স্থানের দক্ষিণে যকৃৎ ও বামে প্লীহা, এবং পশ্চাতে ক্লোম অবস্থিত। পার্শ্বদেশে দুই ধারে দুই মূত্রযন্ত্র বর্ত্তমান। এইখানে রক্ত হইতে মূত্র প্রস্তুত হইয়া দুইটি নল দিয়া মূত্রাশয়ে আসিয়া জমে, এবং সেখান হইতে নির্গত হইয়া যায়। ত্বক্ শরীরের সর্ব্বত্রই বিদ্যমান, তাহা দিয়া ঘর্ম্ম নির্গত হয়।

রক্ত-চলাচলের যে কত প্রয়োজন, তাহা এখন বুঝা গেল। রক্ত চলাচল করিয়াই শরীরের সর্ব্বত্র খাদ্য যোগায়, এবং তাহাদের পরিত্যজ্য দ্রব্যগুলি সেখান হইতে সরাইয়া আনিয়া ফুসফুস, মূত্রযন্ত্র ও ত্বকের পথে তাহাদিগকে শরীর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়। এতদ্ব্যতীত পরে দেখা যাইবে, রক্ত দ্বারা অম্লজান বাষ্প গৃহীত হইয়া শরীরের সর্ব্বত্র সঞ্চারিত হয়। রক্ত-চলাচলেই শরীর উষ্ণ থাকে।

এই রক্ত কিরূপ পদার্থ? বর্ণহীন একরূপ তরল পদার্থে রাশি রাশি লাল কীটাণু ভাসিতেছে বলিয়া রক্ত লালবর্ণ দেখায়। ঐ লাল লাল কীটাণুগুলি অতি ক্ষুদ্র, গোল ও চেপ্‌টা,—যেন ছোট ছোট লাল পয়সার মত। ইহাদের অপেক্ষা বড় বড় একপ্রকার সাদা কীটাণুও রক্তে দেখা যায়; তাহারা কিন্তু সংখ্যায় অল্প। এই বর্ণহীন তরল পদার্থের সহিত মিশ্রিত হইয়াই খাদ্য হইতে সংগৃহীত সাররস শরীরের বিভিন্ন অংশে যায়, এবং ইহারই সহিত মিশ্রিত হইয়া দ্ব্যম্লাঙ্গার, ইউরিয়া ও জল এই সকল স্থান হইতে ধুইয়া আসে। এই লাল কীটাণুগুলিই নিশ্বাস দ্বারা বায়ু হইতে গৃহীত অম্লজান বাষ্প লইয়া শরীরস্থিত জীবাণু সমুদয়কে যোগায়। আর এই যে সাদা কীটাণুর কথা

রক্তে অনিষ্টকর দ্রব্য দেখিতে পাইলেই ইহারা তাহা খাইয়া ফেলিয়া আপনাদে দেহমধ্যে তাহা আবদ্ধ রাখে। ম্যালেরিয়া, যক্ষ্মা, প্লেগ প্রভৃতি বৈশেষিক রোগ, কীটাণুবিশেষ রক্তে প্রবেশ করিলে, সংঘটিত হয়। কিন্তু এই সকল সাদা কীটাণু, রক্তে এরূপ অনিষ্টকর কীটাণু দেখিতে পাইলেই উদরসাৎ করে। অণুবীক্ষণ দ্বারা এই সকল কীটাণু তাহাদের দেহমধ্যে দেখা যায়। তাহাদের আর একটি কার্য্য, যখনই শরীরের কোনও স্থানে আঘাত লাগে, তখনই তাহারা আহত স্থানের চারি দিক ঘিরিয়া ফেলে, এবং এইরূপে কোনও অনিষ্টকর কীটাণুকে শরীরের ভিতর প্রবেশ করিতে দেয় না। তাহারা এইরূপে চারি দিক ঘিরিয়া ফেলে বলিয়াই আহত স্থান লাল হয়, ফুলিয়া উঠে ও কষ্টকর হয়। যখন এত করিয়া ঘিরিয়া ফেলিয়াও তাহারা শরীরের আহত অংশ রক্ষা করিতে পারে না, তখন নিজেরাও বিনষ্ট হইয়া পূয় হইয়া যায়। সুতরাং পূয় মোটামুটি দেখিতে গেলে আর কিছুই নয়, কেবল ঐ সকল সাদা কীটাণুর রাশি রাশি বিকৃত মৃতদেহমাত্র। তাহারা শরীররক্ষাকার্য্যে এইরূপ সদা সচেষ্ট থাকে বলিয়াই আজকাল যক্ষ্মা প্রভৃতি অনেক রোগের চিকিৎসায়, কিরূপে ঐ সকল রোগনিবারক কীটাণুর* বৃদ্ধি করিতে পারা যায় ও তাহারা রোগ-কীট খাইয়া ফেলিয়া রো৹ নিবারণ করে, পণ্ডিতসমাজে তাহা প্রধান আলোচ্য বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। হৃৎপিণ্ডই রক্ত-চলাচলের প্রধান যন্ত্র। বক্ষঃস্থলের বাম স্তনের নিম্নে হৃদয়ের অধিষ্ঠান। ইহা একটি ফাঁপা ব্যাগের মত, এবং এই ফাঁপা ব্যাগে একটি যেন রবারের নলের দুই প্রান্ত আসিয়া লাগিয়াছে। সুতরাং ব্যাগটির ভিতর জল দিলে নলের ভিতরও জল যাইয়া নলটিকে পরিপূর্ণ করিতে পারে। এই রবারের নলটি আপনা হইতে একবার সঙ্কুচিত ও একবার বিস্ফারিত হইতেছে। যখন ইহা সঙ্কুচিত হয়, তখন হৃৎপিণ্ড হইতে ঐ নলটির মধ্য দিয়া রক্ত প্রবাহিত হয়। এবং যখন বিস্ফারিত হয়, তখন নল বহিয়া রক্ত পুনর্ব্বার ব্যাগটিতে ফিরিয়া আসে। নলটির যে প্রান্ত দিয়া রক্ত হৃদয় হইতে নলটির ভিতর যায়, তাহার বিপরীত অন্ত দিয়া নলটি হইতে হৃদয়ে ফিরিয়া আসে। ইহার কারণ, নলটির প্রত্যেক অন্তে এক একটি কপাট আছে। যে অন্ত দিয়া রক্ত বাহির হইয়া নলের ভিতর যায়, সে অন্তের কপাট কেবল বাহিরের অর্থাৎ নলের দিকেই খুলিতে পারে, সুতরাং কেবল সেই ধারেই রক্তপ্রবাহ সম্ভব। আর যে অন্ত দিয়া রক্ত নল হইতে পুনরায় হৃদয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করে, সে অন্তস্থিত কপাটটি

কেবল হৃদয়ের দিকেই খুলিতে পারে, সুতরাং নল হইতে রক্ত আসিতে পারে; কিন্তু হৃৎপিণ্ড হইতে নলের দিকে সে অস্ত দিয়া আর যাইতে পারে না। হৃৎপিণ্ডের ক্রমান্বয়ে সঙ্কোচ ও বিস্ফারণে যখন নলটির ভিতর রক্ত চলাচল করে, তখন এই নলটি হইতে সমুদ্ভূত সহস্র সহস্র সূক্ষ্মতম নলের চারি ধারে স্থিত শরীরের অংশ সমুদয় সেই সঞ্চালিত রক্ত হইতে রস লইয়া পূর্ব্বোক্তরূপে তাহাতে আবর্জ্জনা ঢালিয়া দেয়। পরে দেখা যাইবে, হৃদয় চারিটি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত।—দুইটি (Auricle) অরিকল ও দুইটি (Ventricle) ভেণ্ট্রিকল। শিরা হইতে রক্ত অরিকলে আসে; তৎপরে অরিকল হইতে ভেণ্ট্রিকলে যায় ও সেখান হইতে ধমনী দিয়া কৈশিক নালী হইয়া পুনরায় শিরাপথে অরিকলে ফিরিয়া আসে। শরীরের অংশ সকল সুধু রস চায় না। অম্লজান নামক একপ্রকার বায়ব পদার্থ তাহাদের পক্ষে রস অপেক্ষাও অধিক প্রয়োজনীয়। না খাইয়াও তাহারা অনেক দিন বাঁচিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু অম্লজান বিনা তাহারা দশ মিনিটের ঊর্দ্ধ বাঁচিতে পারে না। যেমন পরিপাকযন্ত্রে জীর্ণ খাদ্য হইতে সাররস গৃহীত হয়, সেইরূপ ফুসফুস দিয়া নিশ্বাসের সহিত এই অম্লজান গৃহীত হইয়া থাকে। প্রশ্বাসের দ্বারা ফুসফুস দিয়া রক্ত হইতে দ্ব্যম্লাঙ্গার বহির্গত হয়, আর নিশ্বাস দ্বারা ফুসফুস দিয়া রক্তে অম্লজান গৃহীত হইয়া থাকে। এই অম্লজানও রক্তপ্রবাহের সহিত শরীরের সর্ব্ব স্থানে উপনীত হয়। তখন শরীরের সকল অংশ রক্ত হইতে এই অম্লজান আত্মসাৎ করে।

এইরূপে শরীরের সকল অংশের পুষ্টিক্রিয়া সাধিত হয়। পরিপাক দ্বারা খাদ্য হইতে রসসংগ্রহ ও নিশ্বাসের দ্বারা বায়ু হইতে অম্লজান সংগ্রহ করিয়া রক্ত শরীরের প্রতি সূক্ষ্মতম অংশ সকলে লক্ষ লক্ষ নল দিয়া প্রবাহিত হয়, এবং তাহারা এই রক্ত হইতে রস ও অম্লজান লইয়া, দ্ব্যম্লাঙ্গার, ইউরিয়া ও জল আবর্জ্জনারূপে ঢালিয়া দেয়। রক্ত আবার এই আর্জ্জনাগুলিকে ফুসফুস, মূত্রযন্ত্র ও ত্বকে লইয়া গিয়া ফুসফুস-পথে প্রশ্বাস দ্বারা দ্ব্যম্লাঙ্গার, মূত্রযন্ত্র পথে [illegible] রূপে ইউরিয়া ও ত্বক্ দিয়া ঘর্ম্মরূপে জল, শরীর হইতে নিষ্কাশি[illegible] দেয়।

[illegible] রিপাকযন্ত্র সাররস যোগায়। হৃদয়যন্ত্র সেই রসকে [illegible] লইয়া যায়। ফুসফুস, ত্বক্ ও মূত্রযন্ত্র আবর্জ্জনা [illegible] রাখে। সকল যন্ত্রই স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রধান।

কিন্তু প্রধান হউক, সম্পূর্ণ স্বাধীন নহে। অর্থাৎ, সকল যন্ত্রগুলিকে মিলিয়া মিশিয়া পরস্পরের আবশ্যক অনাবশ্যক বুঝিয়া কার্য্য করিতে হয়, এবং এই কারণে তাহাদিগের একজনের কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকা চাই। পরিপাকযন্ত্র যেন কৃষিবিভাগ; হৃদয়যন্ত্র যেন বাণিজ্যবিভাগ; ফুসফুস, মূত্রযন্ত্র ও ত্বক যেন মিউনিসিপালিটীর ময়লা ফেলিবার বন্দোবস্তবিভাগ; এই সকলগুলি স্থানীয় গবর্মেণ্টের তত্ত্বাবধানে আছে। সেইরূপ, শরীরের সকল যন্ত্রই মস্তক ও মেরুদণ্ডস্থিত স্নায়বীয় বিধানের কর্ত্তৃত্বাধীন থাকে। পূর্ব্বোক্ত যন্ত্রগুলি শরীররক্ষার জন্য আবশ্যক; কিন্তু সুধু শরীররক্ষা হইলেও ত চলে না। "অদ্য বর্ষশতান্তে বা" সকল প্রাণীকেই মরিতে হইবে; তখন এক পুরুষের পর অন্য পুরুষ আসিয়া জীবপ্রবাহ অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে। সৃষ্টির যাহাই উদ্দেশ্য হউক না কেন, জীবপ্রবাহরক্ষা, মোটামুটি দেখিতে গেলে, তাহার একটি প্রধান উদ্দেশ্য; সুতরাং জীবরক্ষার উপযোগী যন্ত্রগুলি ব্যতীতও জাতিরক্ষার উপযোগী যন্ত্রের প্রয়োজন। ইহাই জননেন্দ্রিয়। জীবতত্ত্ব শাস্ত্রের এইটি প্রধানতম আলোচ্য বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

সকল শ্রেণীর জীবেরই এক একটি সমাজ আছে। সমাজ থাকিলেই পরস্পরের ভাবব্যক্তি আবশ্যক। ভাষার দ্বারা এই ভাবব্যক্তি হইয়া থাকে। তবে সে ভাষা সর্ব্বদা কথনীয় ভাষা হইবে, এমন নহে। পিপীলিকা, মৌমাছি প্রভৃতি কীট পতঙ্গের ভাষা দৃষ্ট সাঙ্কেতিক;—তাহারা "শুঁয়া" নাড়িয়া ভাব ব্যক্ত করে। আমরা কথা কহিয়া ভাব ব্যক্ত করি। এই জন্য সমাজ-বদ্ধ মনুষ্যের ন্যায় জীবের বাক্‌যন্ত্র এত প্রয়োজনীয়।

পূর্ব্বোক্ত কয়প্রকার যন্ত্র ব্যতীত আরও অনেক প্রকার যন্ত্র আছে। তাহার মধ্যে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক প্রভৃতি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় সর্ব্বপ্রধান। কিন্তু ইহাদের সম্বন্ধে কিছু বলিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধ বাড়াইবার আবশ্যক নাই।

অতএব দৃষ্ট হইতেছে যে, শরীরের প্রত্যেক অংশেরই নির্দ্দিষ্ট কার্য্য আছে। এক অংশ একরূপ কার্য্য করে, আর একটি আর একরূপ কার্য্য করে। এবং কোনটির কার্য্যে কোনওরূপ সমগ্র শরীরের কার্য্যপ্রণালীর ব্যাঘাত ঘটে;—তাহাকেই

...গী সাহিত্য।

সমাজনীতি।

নব্যবঙ্গ।

আমাদের বর্ত্তমান সমাজ প্রাচ্যজাতীয় চরিত্রে প্রতীচ্য শিক্ষা ও সভ্যতার ফলোদ্ভূত। এখনও অনেক বিষয়ে আমরা দুই নৌকায় পা দিয়া আছি; কোন্‌টা ছাড়িব, কোন্‌টা রাখিব, স্থির করিতে পারিতেছি না। এ অবস্থায় আমাদের নানা ত্রুটি, নানা ভ্রম অবশ্যম্ভাবী। এই সকল ত্রুটির ও ভ্রমের জন্য আমাদিগকে স্বদেশে বিদেশে, ঘরে বাহিরে নানাপ্রকারে লাঞ্ছিত হইতে হয়। সে লাঞ্ছনা যেখানে সদিচ্ছাপ্রণোদিত, আমাদের প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষীর স্নেহতিরস্কার, সেখানে আমরা কৃতজ্ঞ, সন্দেহ নাই। কিন্তু অনেক স্থলে সে লাঞ্ছনা হিতকামীর স্নেহতিরস্কার নহে,—আত্মম্ভরিতার গর্ব্বোদ্ধত আন্তরিকতাহীন তিরস্কারমাত্র,—চপলচিত্তের রচনাচাতুরীপ্রদর্শনেচ্ছার পরিতৃপ্তিমাত্র। দ্বিতীয় শ্রেণীর সমালোচকগণ ইচ্ছা করিয়া ভুলিয়া যান যে, প্লাবনপ্রবাহ স্বচ্ছ ও নির্ম্মল নহে, পরন্তু সমল ও মলিনতাপূর্ণ; এবং তাহার সেই সমলতা ও মলিনতাতেই ভবিষ্যতে ভূমির কাঠিন্য ও উর্ব্বরতার বীজ থাকে;—তাই প্লাবনের প্রবাহ প্রশমিত হইলে ভূমি কঠিন ও উর্ব্বর হয়। আমাদের সমাজে এখন পরিবর্ত্তনের প্লাবন প্রবহমান; এখন আমাদের সহস্র ত্রুটি, সহস্র ভ্রম কেবল অবশ্যম্ভাবী নহে, পরন্তু আবশ্যক।—প্লাবনের সমল প্রবাহের বেগ ও বারিরাশি উভয়ই বহুকালস্থায়ী। যখন উচ্ছ্বসিত বারিরাশি ক্রমে বহিয়া যাইবে, তাহার বেগ প্রশমি[ত] হইবে, তখনই আমাদের জাতীয় চরিত্রের গঠন হইবে; তখন তাহার কাঠিন্য ও উর্ব্বর[তা] আপনা হইতেই আসিবে। এ সম্বন্ধে জড়জগতে ও জাতীয় জীবনে সাদৃশ্য বিস্ময়কর।

বলিয়াছি, আমাদিগকে আজকাল ঘরে বাহিরে নানা লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হয়... নব্যবঙ্গের কাব্য-সাহিত্যে সরস মধুর হাস্যরসের উৎসমুখ মুক্ত করিয়া দিয়া অ... সাহিত্যকে সিক্ত করিয়া দিয়াছেন, ঊষরে উর্ব্বরতাসঞ্চার সম্ভব করিয়া তুলিয়া... আমাদের সেই প্রিয় কবি শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় "Reformed Hindoos" ... লিখিয়াছেন;—

"আমরা Curious commodities, human obdities, denominated Babus.

ঘরের কথা ছাড়িয়া এখন বাহিরের কথা বলিব। সম্প্রতি একখানি নবপ্র... মাসিকপত্রে একজন প্রচ্ছন্ননামা লেখক নব্যবাঙ্গালীদিগের সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখি... পড়িয়া বোধ হয়, যেন লেখক গাত্রজ্বালায় ঝাল ঝাড়িয়াছেন। আমরা সেই ...

নব্যবাঙ্গালী। প্রবন্ধের সারসঙ্কলন করিলাম। জলাভূমিতে আগাছার মত ... চারি দিকে যে নব্য ভারতবাসি-সম্প্রদায় দেখা দিতেছে, তাহা... রাডিয়ার্ড কিপ্‌লিং লিখিয়াছেন,—তাহাদের থাকিবার ... কেবল প্রদর্শিত পুরাতন পথে পরিভ্রমণনৈপুণ্য, ফনোগ্রাফ যন্ত্রের মত যাহা ...

...বার শক্তি ও বহু ভা...

...দিবে... ব্যাপার চলিতেছে, যাঁহারা তাহা...

জীবনের সকল বিভাগে যে বিরামবিহীন কলরব শ্রুত...

স্বীকার করিবেন যে, কিপলিংএর এই কথা নব্যবাঙ্গালী...

নব্য বাঙ্গালী কি? সে যে শিক্ষার ফল, সে শিক্ষা নী... চরিত্রে প্রাচ্যস্থলভ মাধুরী নাই; ভারতবাসিগণের জীবনে ও চরিত্রে যাহা... সহিত কোন সম্বন্ধ নাই। যৌবন হইতে সে কেবল য়ুরোপীয় চিন্তার ত্যক্ত অংশ অথ... মাল লইয়া ব্যাপৃত থাকে, এবং শিখে কেবল প্রতীচ্যের দোষগান। তাহার স্বাবলম্বন, স্বাধীনতা ও ধর্ম্ম,—কিছুই নাই। তাহার সামাজিক অবস্থা অবনত। রাজনৈতিক হিসাবে সে বর্ণসঙ্কর, অর্থাৎ জোড়-কলম।

দুই অংশ।

নব্যবাঙ্গালীকে মোটামুটি দুই অংশে বিভক্ত করা যাইতে পারে;—"বিলাত"-ফেরত ও "দেশে"-থাকা। Reformed নব্যবাঙ্গালী শিক্ষায় ও সংস্রবে খাঁটি বাঙ্গালী, অর্থাৎ প্রাচীন-পন্থী বাঙ্গালী হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন জীব। সে জাতীয়তাহীন নকল জিনিস। নব্যবাঙ্গালীসমাজ স্রোতোহীন, দূষিত, কীটাণুপূর্ণ জলাশয়ের সহিত উপমেয়। দূষিত পদার্থ স্বাভাবিক লঘুত্ব প্রযুক্ত সলিলের উপরে ভাসমান থাকে; এখানেও তেমনই বিলাতফেরতগণ উপরে ভাসমান। এই বিলাতফেরত বাঙ্গালীদিগের সম্বন্ধে পরিহাস করিয়া বলা যাইতে পারে,—"বাবুর" আত্মা আছে কি না, জিজ্ঞাসা করায় উত্তর পাওয়া গেল,—"না। কিন্তু আমি তিন বৎসর বিলাতে বাস করিয়া ...াসিয়াছি।" গত কুড়ি বৎসরের মধ্যে এই বিলাতফেরতদিগের সংখ্যা এতই বাড়িয়াছে ...য়, এখন তাঁহারা একটি স্বতন্ত্র, বিস্ময়কর সম্প্রদায়ের গঠন করিয়াছেন। তাঁহাদের স্বাতন্ত্র্যের ...রণ যে, তাঁহারা মনে করেন, তাঁহারা "দেশে-থাকা" দলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আর তাঁহারা ...স্ময়োৎপাদক; কারণ, তাঁহারা যাদুঘরে থাকিবার উপযুক্ত অদ্ভুত জিনিস।

এই বিলাতফেরতদিগের মুখ দিয়াই বিলাতফেরত কবি শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ...লাইয়াছেন,—"আমরা স্বদেশআচার করিয়াছি সব জবাই।" আবার,—

"আমরা ছেড়েছি চটির আদর,
আমরা ছেড়েছি ধুতি ও চাদর,
আমরা হ্যাট, বুট আর প্যাণ্ট, কোট প'রে,
সেজেছি বিলাতি বাঁদর।"

...তফেরত সম্প্রদায়।

...ফেরত বাঙ্গালীকে দুই ভাবে দেখা যাইতে পারে;—ব্যক্তি হিসাবে, আর সমাজ ...তিসম্পর্কে। সামাজিক হিসাবে ইনি কোন দলেরই নহেন। তিনি কোন বিশেষ ...ক নিয়ম, ব্যবহার, বেশ, বা ভাষা মানিয়া চলেন না; এ সব বিষয়েই তিনি খেয়ালে বা ক্ষণস্থায়ী কায়দায় চালিত। তিনি সর্ব্ববিষয়ে ইংরাজের অনুকরণে ব্যাপৃত; কিন্তু ইংরাজের স্থরুচি তাঁহার নাই। তাঁহার ভাষা, ইতর ইংরাজের ভাষা ও প্রাচ্যস্থলভ অত্যুক্তি, এতদুভয়ের সংমিশ্রণোদ্ভূত, সে এক বিস্ময়াবহ খিচুড়ী। বিলাতফেরতগণ সাধারণতঃ ...লোকের সন্তান, কাজেই তাঁহাদের বংশমর্য্যাদা নাই, বংশমর্য্যাদার জন্য সম্মানও ...ই বিলাতফেরত "সাহেব" সাজিয়া বসেন, কিন্তু ইংরাজের সাহস, সমবেত-...ক্তি প্রভৃতি তাঁহার নাই। তাঁহার ইংরাজী-শিক্ষার ফল হয় কেবল ...পানস্পৃহা ও কুৎসাপ্রিয়তা।

...ফেরত সম্প্রদায়ের সান্ধ্যসমিতি বা যে কোন নিমন্ত্রণসভা বড় অদ্ভুত ব্যাপার।

সকল সভায় স্ত্রীপুরুষে বৈষম্য বড় সুস্পষ্ট। পুরুষগণ রমণী
হওয়া আবশ্যক বিবেচনা করেন না;
বসিয়া আপনাদের মধ্যে কথোপকথনে
কথাবার্ত্তা একঘেয়ে ও কেবল "আলুপটল
মানসরাজ্য অতি সঙ্কীর্ণ। সামাজিক সদ্‌গুণ

সমাজে ও ধর্ম্মবিশ্বাসে।

না। সাহিত্য, সঙ্গীত ও অন্যবিধ ললিতকলাপ্রীতি, সরস মধুর
বার্ত্তা, এবং উদ্দেশ্য ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার সাদৃশ্য, এই সকলই সমাজের
র বিলাতফেরত সমাজে এই সকলেরই শোচনীয় অভাব।
ধর্ম্মবিষয়ে বিলাতফেরত বাঙ্গালী ধ্বংসবাদী। জিজ্ঞাসা করি
আমি ব্রাহ্ম"। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহার ধর্ম্মই নাই। ব্রাহ্মধর্ম্ম
জাতির বা জাতির অংশের ধর্ম্ম বলিয়া গৃহীত হইবে কি না,
এ কথা নিশ্চিত যে, এখন কোন পুরুষোচিত ধর্ম্মই ভারতের আ
ক।

পদগর্ব্বই নব্যবাঙ্গালীর একমাত্র লক্ষ্য। তাঁহার উদ্দেশ্য,—দেশে
শিখা জ্বলিয়া উঠে উঠুক, আমি কিন্তু দেশের সারাংশ সংগ্রহ
রিদ্র্যে মরে মরুক, আমার অর্থলাভ হইলেই হইল; যে প্রকারেই হ
গৌরবলাভ হইলেই হইল।

এখানে একটি প্রশ্ন স্বতঃই মনে উদিত হয়। বিদেশভ্রমণে কি নব্য
জ্যের সঙ্কীর্ণতা কিছুমাত্র দূর হয় নাই?—সভ্যতার কেন্দ্রস্থলেও কি
উপর নিতান্তই নিষ্ফল হইয়াছে? ইহার উত্তরে হোম্‌সের
—"ভ্রমণবৃত্তান্তে ভ্রমণের যে ধারণা জন্মে, ভ্রমণ সম্বন্ধে সে
ভ্রমণকারীর স্বভাবের পরিবর্ত্তন হয় না।"

একাল আবার নব্য বাঙ্গালীরা ইংরাজ-রমণীকে বিবাহ করিতে
কল বিবাহের অধিকাংশই অসুখময় হয়। যে ইংরাজ-রমণী
প্রেমের জন্য স্বদেশ, স্বজাতি, আত্মীয়-স্বজন সকলই ত্যাগ করিতে
র বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্রী; কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই মহিলারা অ
পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। যে সকল পুরুষ মিথ্যায় ভুলাইয়া
তিরস্কার করিবার উপযুক্ত ভাষা আছে কি?

জাতির মধ্যে বিবাহ আমাদের নিকট আপত্তিজনক; বর্ণসঙ্ক
নারাজ; যে বিবাহে দম্পতীর মধ্যে জাতিগত, ধর্ম্মগত,
নের শিক্ষা ও সামাজিক বিশ্বাস ভিন্ন, সেখানে সুখের আশা
দৈহিকসম্বন্ধমাত্র নহে। কিন্তু যত দিন ধরায় বসন্ত আছে, য
র সাক্ষাৎ হইবে, ততদিন প্রেমের মৃত্যু নাই। কাজেই আই
সেই মৃত্যুঞ্জয়ী প্রেমের গতিরোধ করা অসম্ভব। সুতরাং এ
দোষ যে কেবল নব্য বাঙ্গালীর, এমন কথ
এমন একাধিক দৃষ্টান্তের বিষয় অবগত আছি
ক প্রলোভিত করিয়াছে, এবং পিতা মাতার অ
রিয়া আইনের আশ্রয় লইবার ভয় দেখাইয়া বা
অসুখময় করিয়াছে। যৌবনের উচ্ছৃঙ্খল বাস
য়াছে।

জাতীয় হৃদয়তন্ত্রীতে আঘাত করিবার মত একজন কবি নাই, একজন ঐতিহা
একজন কর্ম্মী নাই, একজন উদ্ভাবনীশক্তিশালী ব্যক্তি বা একজন যন্ত্রনির্ম্মাতা না
কেবল কতকগুলা "শিক্ষিত" বাক্সর্ব্বস্ব লোক—একদল কথার বুজরুক। হতভ
আত্মোন্নতিসাধনে তৎপর হও; তাহা হইলে দেশের উন্নতি আপনা হইতেই হ
হইলে হয় ত একদিন আপনা হইতে ভারতবর্ষে প্রকৃত জীবন সঞ্জীবিত হইয়া উ

এ কথার প্রতিবাদ অনাবশ্যক। কবিগুরু টেনিসনের কথায় বলিতে পারি,—

"Thro' the ages one increasing purpose runs,
And the thoughts of men are widen'd with the process of the su

আমরা উন্নতির পথেই অগ্রসর হইতেছি। যে শিক্ষার ফলে আমাদের উন্নতি
অগ্রসর হয় নাই, সে শিক্ষাপ্রণালীর উদ্ভাবক বিদেশীয়—বিদেশীয়ই শিক্ষার দা
শিক্ষা যদি আশানুরূপ না হইয়া থাকে, তবে শিক্ষাপ্রণালী-পরিবর্ত্তনের সময় আ
এতদিনের পরীক্ষায় ফলাফল নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত।

দেশে শিক্ষাবিস্তারের জন্য প্রথম আবশ্যক—দেশীয় ভাষায় শিক্ষাদান। যে জা
মনোভাব সাধারণ্যে প্রকাশ করিবার জন্য বিদেশীয় ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করিতে
যাহাদের চিন্তাকে বন্ধনবদ্ধ করিতে হয়,—সে জাতির মধ্যে মৌলিকতার বা উদ্ভাব
বিকাশ সহজ নহে। কিন্তু এই প্রতিবন্ধক সত্বেও দেখা গিয়াছে যে, দেশীয়দিগে
মৌলিকতার ও উদ্ভাবনীশক্তির অভাব নাই।

কোনও জাতির উন্নতিই এক দিনে হয় না। এখন যাহাতে আমাদে
নিয়ন্ত্রিত হইয়া আশানুরূপ ফল প্রসব করে, তদ্বিষয়ে অবহিত হওয়াই আমা
কোনরূপে বিচলিত হইয়া আমরা যেন—

"নাহি যাই ইতস্ততঃ
মেঘ যথা বাতাহত।"

সাহিত্য।

ইয়ুরোপে সংস্কৃতচর্চ্চা।

সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক ম্যাক্সমূলর সম্প্রতি ভারতীয় ষড়দর্শন সম্বন্ধে একখানি প্রকাণ্ড
প্রকাশ করিয়াছেন। অধ্যাপকের বয়স এখন প্রায় ছিয়াত্তর বৎসর। এ বয়সে এত
একখানি গ্রন্থের রচনা করিয়া তিনি আমাদের সকলের বিস্ময়োৎপাদন করিয়াে
ম্যাক্সমূলর প্রভৃতি ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্য ও দর্শন সম্বন্ধে
করিয়াছেন ও করিতেছেন, আমরা আমাদের প্রাচীন সাহিত্য ও দর্শন সম্বন্ধে ত
শতাংশের একাংশও করি নাই। ইহা স্মরণ করিলে লজ্জার ও ক্ষোভের সীমা থাকে
প্রাচীন জাতীয় রত্নগুলির উদ্ধার ও প্রচারের ভার পরহস্তে সমর্পণ করিয়া আমরা নির্
হইয়া আছি, এবং কেবল সময়ে ও অসময়ে আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের কীর্ত্তি সকলের উ
ও আস্ফালন করিয়া গর্ব্বানুভব করি, ইহা যখন মনে হয়, তখন আমাদের বর্ত্তমা
ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিরাশ হইতে হয়।

আমরা ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের দ্বারা ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা
দিগকে উপহার দিব।

সুপ্রিম-কোর্টের জজ সার উইলিয়ম জোন্স সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনার
ন। এসিয়াটিক সোসাইটী তাঁহারই প্রযত্নে স্থাপিত হয়, এবং তিনি ইহার
সভাপতি ছিলেন। তিনি বিশেষ যত্নসহকারে সংস্কৃত সাহিত্যের
ইলিয়ম আলোচনা করেন; কিন্তু সেকালে বিদেশীর পক্ষে সংস্কৃত শিক্ষা
ন্স। এখনকার মত সহজ ছিল না; সুতরাং দর্শনশাস্ত্র আলোচনা
করিবার মত সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিবার সুবিধা তাঁহার ভাগ্যে
তিনি ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হন। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সেই
ভাষায় সুপণ্ডিত হেনরী টমাস কোলব্রুক এ দেশে আগমন করিয়াছিলেন।
খৃষ্টাব্দে এসিয়াটিক সোসাইটীর এক অধিবেশনে "হিন্দুদিগের ধর্ম্মানুগত
একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। সেই সময় কোলব্রুক সাহেবের বয়স সবে
ত্রিশ বৎসর। কোলব্রুকের পিতা সার জর্জ্জ কোলব্রুক অনারেবল
ব্রুক। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সভাপতি ছিলেন। কোলব্রুক সতের
বৎসর বয়সে এ দেশে পদার্পণ করেন। ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে তিনি
কলেক্টরের পদে আসীন ছিলেন; সেই সময় ওয়ারেন হেষ্টিংস কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত
উইলিয়াম জোন্স কর্ত্তৃক আরব্ধ হিন্দুদিগের দেওয়ানী আইন সঙ্কলন করিবার
উপর সমর্পিত হয়। ১৮১৫ অব্দে তিনি এ দেশ হইতে চলিয়া যান ও ১৮৩৬
পতিত হন। তিনি জীবদ্দশায় সংস্কৃত দর্শন সম্বন্ধে যাহা রচনা করিয়া
াই তখনকার ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের প্রাচ্য-দর্শনালোচনার যথেষ্ট সহায়তা
উরোপীয় পণ্ডিতগণ ইউরোপের বিভিন্ন দেশ হইতে লণ্ডনে আসিয়া তাঁহার
করিয়া যথেষ্ট সাহায্য পাইতেন। এক শতাব্দী পূর্ব্বে কোলব্রুক যাহা
সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত কাওয়েল, জন মুইর ও হুইটনি এ কালে তাহা
রন নাই। এ কালেও সংস্কৃতভাষানুরাগী ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের কোলব্রুকের
না করিলে চলে না। কোলব্রুকের প্রবন্ধাবলী ইংরাজ পণ্ডিতদিগের নিকট
াদর লাভ করে নাই সত্য, কিন্তু সেই সকল প্রবন্ধ ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের
বিশেষ সমাদর লাভ করে। স্লেনে-বংশীয়গণ ভারতীয় ভাষা, সাহিত্য ও দর্শন
কখানি সুচিন্তিত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ১৮২৮ অব্দে ফরাসী দার্শনিক ভিক্টর
র্শনশাস্ত্রের ইতিহাস সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করেন, এবং তাঁহার
শ্রবণ করিবার জন্য সহস্র সহস্র বিদ্যার্থী পারিসে আসিয়া উপস্থিত হন।
সাহেব কর্ত্তৃক সংগৃহীত ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রবিষয়ক সন্দর্ভগুলির প্রতি ভিক্টর
মুচিত আদর প্রদর্শন করেন। স্কচ দার্শনিক সার উইলিয়াম হামিলটনের মতে
জিন এই সকল বক্তৃতা করিয়া পারিসে ও ফ্রান্সে দর্শনশাস্ত্রের প্রতি যে
সৃষ্টি করিয়াছিলেন, মনীষী এবেলার্ডের পর সেরূপ আর দেখা যায় নাই।
বক্তৃতাশক্তি অসাধারণ ছিল, এবং তিনি বক্তৃতাগুলি সুন্দর ভাষায় গ্রথিত
। তিনি যে সময় ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের বিষয়ে বক্তৃতা করেন, সেই সময়
লণ্ডন এসিয়াটিক সোসাইটীর সভাপতি-পদে আসীন ছিলেন। লোকব্রুক ১৮২৪
৮২৭ অব্দের মধ্যে লণ্ডন এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রে ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে যাহা
করেন, কুজিন সেইগুলি অবলম্বন করিয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তিনি নিজেই
কার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতাগুলি অতীব সুন্দর ভাষায় গ্রথিত

র তাঁহার বক্তৃতাস্তবকের ৫ম ও ৬ষ্ঠ বক্তৃতায় তিনি ভারতীয় দর্শনশা
করিয়া পণ্ডিতমণ্ডলীর মন হরণ করেন। সার উইলিয়ম হামিলটন বলিয়া
নের বক্তৃতাগুলি মুদ্রিত হইয়া অতিদূরবর্তী প্রদেশেও প্রচারিত হইত। সে
তে অনূদিত হইয়া এডিনবরা ও নিউইয়র্ক হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল।
লব্রুকের পরে স্কচ পণ্ডিত জেমস ব্যালানটাইন এবং জন মুইরের নাম বি

ব্যালানটাইন ও মুইর।

উল্লেখযোগ্য। দুই জনেই অনেক কাল পর্য্যন্ত কাশীতে এক বাস করিয়াছিলেন; দুই জনেই কাশীর সংস্কৃত কলেজের সহি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ইঁহাদিগের পরে গ্রিফিথের ন্যায় সংস্কৃত ভাষা সুপণ্ডিত ব্যক্তিগণ তাঁহাদিগের প্রদর্শিত পথে সেই প্রদেশে সংস্কৃতের আলোচনা করিয়াছেন। ১৮৫৩—৫৫ অব্দে ডাক্তার ব্যালানটাইন
সংগৃহীত ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রবিষয়ক প্রবন্ধগুলি এলাহাবাদে মুদ্রিত হয়। ডাক্তার
টাইন অকালে কালগ্রাসে পতিত হন। জন মুইর হিন্দুজাতির উৎপত্তি, ইতিহাস
ন্ধে একখানি প্রকাণ্ড পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত পুস্তক প্রণয়ণ করেন। এই পুস্তকে তিনি
ন জ্ঞাতব্য বিষয় সন্নিবিষ্ট করেন, এবং ইহাতে তাঁহার পাণ্ডিত্য ও চিন্তা
রিচয় পাওয়া যায়। কোলব্রুক পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন; এবং তিনি ব্যতীত
জন মুইয়ের সমকক্ষ নহেন।
ক ম্যাক্সমূলরের নবপ্রকাশিত ভারতীয়দর্শনসম্বন্ধীয় গ্রন্থখানিতে অনেক নূতন
তব্য সংগৃহীত হইয়াছে, কিন্তু ইহাতে তাঁহার স্বাভাবিক রচনাচাতুর্য্য দৃষ্ট হয়
বিভাগ ও সংগৃহীত বস্তুগুলির সমালোচনার পূর্ণ একত্রীকরণ করিবার সুবিধাও
য়া উঠে নাই। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে হইতে এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত তিনি ভারতীয়
যে সকল বিষয় সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাই এক স্থলে নিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি
নিজেই প্রকাশ করিয়াছেন যে, এই পুস্তকে ভারতীয় দর্শনের সার সংগৃহীত হইয়াছে মাত্র, এবং ইহাতে সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, এ কথা বলা যায় না। অধ্যাপক ম্যাক্সমূলর
চ্য ধর্ম্মগ্রন্থ সম্পাদন করিয়াছেন। তাঁহার স্বদেশীয় অধ্যাপক ডুসেন
সেণ্ট্রাল কলেজের অধ্যক্ষ ডাক্তার থিবো ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে যাহা
নি পাঠ করিয়াছেন; এতদ্ভিন্ন তিনি নিজে উপনিষদ ইংরাজী
। বেদান্ত, অধ্যাপক ম্যাক্সমূলরের অতি প্রিয় বস্তু। সুপ্রসিদ্ধ
র বলিয়া গিয়াছেন যে, সংস্কৃত ভাষায় উপনিষদ পাঠ করিয়া
প্রভূত ফল পাওয়া যায়, পৃথিবীর আর কোন পুস্তকপাঠে সেরূপ
ক্সমূলার সপেনহারের এই মতের সম্পূর্ণ অনুমোদন করেন, এই
র আর্য্য-ঋষিদিগের ও উপনিষদকারগণের প্রতি তাঁহার ভক্তি অসীম।
, অধ্যাপক ম্যাক্সমূলর কখনও ভারতবর্ষে আগমন করেন নাই।
ও খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী—খৃষ্ট ধর্ম্ম তাঁহার বিশ্বাসানুসারে জগতের শ্রেষ্ঠ
রতীয় দর্শন ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে সংস্কৃত সাহিত্য আলোচনা করিয়া যে
তাহাতে তাঁহার মতের উদারতা বুঝা যায় ও বিদেশীয় চিন্তা ও
নুভূতি প্রকাশ পায়। আমরা নিজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি, আমরা
সম্বন্ধে কত ভ্রান্ত মত পোষণ করি। নিজের জিনিসের প্রতি
দেখা যায়। এতদ্ভিন্ন ইয়ুরোপীয় [illegible] কালে গর
শ র

শীর্ষস্থানীয় পণ্ডিত বিজিতজাতির প্রাচীন দর্শন ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে উদার ম
ন দেখিয়া আমাদের হৃদয় ভক্তিরসে আপ্লুত হয়। আমরা কত দিনে
কসমূলর ও মহাত্মা কোলব্রুক প্রভৃতি বিদেশী পণ্ডিতদিগের ন্যায় যত্ন ও পরিশ্রম
াদের নিজের প্রাচীন সাহিত্য, দর্শন, ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে সম্যক আলোচনা
ব?

আকবর।

আকবর—এ নামে ঐতিহাসিকের মানসক্ষেত্রে কল্পনার কত কুসু
উঠে, বিস্মৃতির কুজ্ঝটিকায় সমাবৃত অতীতের ভিতরে প্রথম
বিচ্ছুরণের ন্যায় কত আশার দীপ্তি জাগিয়া উঠে;- কত ভা
আলোচনা, কত বিচারযুক্তি বিদ্যুদ্বিকাশের ন্যায় চিত্তকে মুহূর্ত্তে
সমালোকিত--সমুদ্বেলিত করিয়া আবার যেন কোথায় মিলাই
আকবর মোগল-তাতার হইলেও ভারতের সম্রাট, ভারতের
আকবর ইসলামধর্ম্মাবলম্বী হইলেও, মোসলায়েম বলিয়া পরিচিত
আকবর ভারতের হিন্দুর নিজস্ব। কেন না, আকবরের
মুসলমানসম্রাট ভারতের হইয়া, ভারতবাসীর হইয়া শাসনদণ্ড
করিয়াছিলেন; কেন না, পাঠানগণ গজনীর দিকে অঙ্গু
ইরাণ-তুরাণের দিকে বাহু প্রসারিত করিয়া স্বদেশ ও স্বজা
আকবর সকল ভুলিয়া, দিল্লীর উপর সস্নেহ দৃষ্টি স্থির রা
জয় করিয়াছিলেন; - সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তকে এক শৃঙ্খলে আ
তক্তের তলে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন। তাই হিন্দু সেই
শৃঙ্খল ভাবিয়া পূজা করিত; তাই হিন্দু রাজ্যেশ্বরকে
জানিলেও স্বদেশবাসী শাসনকর্ত্তা দেখিয়া দেবতার আস
রা বা জগদীশ্বরো বা” বলিয়া স্তুতিবন্দনা করিত। আক
লেন; বিদেশী, বিজেতা, ভিন্নধর্ম্মী হইলেও, আকবর
বুক হইয়াছিলেন। বিজিতের দেশকে নিজের দেশ বলিয়
লেন। বিজিতের যাহা কিছু মূল্যবান, যাহা কিছু সুন্দর,
ম্ম করিয়া রাখিয়াছিলেন।

...নজের আদরে বিজিতকে আত্মহারা করিয়া, আকবর দিগ্বিজয়ী সম্রাট হই-লেও, বিজিতের দলে মিশিয়া মিলিয়া গিয়াছিলেন। পরাজিত, আশ্রিত, হীন হেয় ভাবিয়া তিনি হিন্দুগণকে দূরে রাখিতেন না; বিজিত হিন্দুর সবই মন্দ, বিজেতা মুসলমানের সবই ভাল, এমন কথা তিনি বলিতেন না, কাহাকেও বলিতে দিতেন না। বিজেতা বিজিতের এমন ওতঃপ্রোত ভাবে সম্মিলন, এমন সলিলশর্করাসংযোগবৎ সম্মিলন জগতের ইতিহাসে আর কখনও লিখিত হয় নাই। বিজেতার জাতিগত ও দেশগত স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণ রক্ষা করিয়া, বিজিতের জাতিগত ও দেশগত স্বাতন্ত্র্যকে চূর্ণ করিয়া,—সংবদ্ধ সংযত জাতিকে রেণু রেণুতে বিশ্লেষণ করিয়া শাসনদণ্ড পরিচালন করাই সকল দিগ্বিজয়ীর চেষ্টা। একটা দুইটা বা দশটা সম্মুখ-সংগ্রামে কোন স্বাধীন জাতিকে পরাজিত করিলে কেহ বিজেতার বৈজয়ন্তী লাভ করিতে পারে না। বিজিত জাতির সর্ব্বস্ব নষ্ট করিতে হইবে;—আহার ব্যবহার, রীতি পদ্ধতি, বসন ভূষণ, সাহিত্য শিল্প, আশা ভরসা সর্ব্বস্বই বিজেতার মহাশক্তির প্রভাবে ধূলিসাৎ হইবে। বিজিতের সংসারের সকল বিষয়ের আদর্শ হইবেন বিজেতা, তবেই সম্পূর্ণ বিজয়। যে ক্ষীণ অল্পপ্রাণ জাতি বিজেতার এই বিশ্লেষণ-বিদারণ-ব্যবস্থা সহ্য করিতে পারিবে না, সে জাতিকে অচিরে মরিতে হইবে, বন্য অসভ্য বর্ব্বরের দলে মিশিয়া পশু-জীবন অতিবাহিত করিতে হইবে। দিগ্বিজয়ের ইহাই চিরাচরিত পদ্ধতি, অনাদিকাল হইতে এই পদ্ধতি অনুযায়ী সর্ব্বদেশে বিজয়কার্য্য হইতেছে। মধ্যে আকবর এই পদ্ধতি উল্টাইয়াছিলেন; তাই তিনি চিরস্মরণীয়, তাই তিনি ইতিহাসপূজ্য। কেন তিনি এই চিরকালের ব্যবস্থা পরিবর্ত্তিত করিলেন, কোন সাহসে তিনি সর্ব্বস্ব পণ করিয়া বিজিতের সঙ্গে মিশিয়াছিলেন, তাহা একটু বুঝিয়া দেখা উচিত।

প্রবাদ আছে, ফকীর সাহ সাহেবকে আকবর একদিন বলিয়াছিলেন যে, "দেখুন, দেশ বলিতে, জাতি বলিতে আমার কিছুই নাই; আমি মরুক্ষেত্রে জন্মিয়াছি; আমার আত্মীয়-স্বজন আমার জন্মাবধি আমার সহিত অসদ্ব্যবহার করিয়াছে; জুড়াইবার শান্তি পাইবার একটা কোন স্থান আমার নাই। শৈশবের সেই প্রথম স্মৃতির বিকাশ হইতে আজ পর্য্যন্ত, আমার ত মনে হয় না,—আমি একদিনও স্থির হইতে পাইয়াছি। ভাঁটার মত আমি কেবল গড়াইয়া গড়াইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছি।

আমি চাই শান্তি, আমি চাই আমার বলিবার কিছু। হিন্দুস্থানকে আমার করিতে পারি, হিন্দুকে যদি আমার করিতে পারি, তবে ত আমার সকল আকাঙ্ক্ষা মিটিতে পারে। যাহারা সমরকন্দ বা বোখারায় জন্মিয়াছে, তাহাদের শৈশবের সুখের স্মৃতি ঐ সকল স্থানের সহিত কেমন এক কি ভাবে বিজড়িত আছে। মানুষ জন্মিলেই যাহা পায়, আমি তাহা পাই নাই। খোদা মাতৃস্তন্যের সহিত মানুষকে আত্মীয় স্বজন দিয়া থাকেন, খোদা আমার মাতৃস্তন্যের সহিত আমাকে বিপদ বিচ্ছেদ বিশ্বাসঘাতকতা দিয়াছিলেন। আমি দিল্লীর তক্তে বসিয়া সুশাসনে হিন্দুকে তুষ্ট করিতে পারিলে, আমার জাতির শত্রু, পিতামহের শত্রু, পিতার শত্রু রাজপুতগণকে আমার শক্তির, আমার প্রভাবের অনুকূল করিতে পারিলে, আমার যাহা নাই সে সবই ত আমি পাইব। বলিতে পারেন, আমি যাহা করিতেছি বা করিব বলিয়া মানস করিয়াছি, তাহা ইস্‌লাম-ধর্ম্মবিরুদ্ধ। কিন্তু একটা কথা ত আপনি ভাবিতেছেন না যে, এই হিন্দু জাতিকে নির্ম্মূল করা অসম্ভব, ইহাদিগকে একেবারে ইস্‌লাম-ধর্ম্মাবলম্বী করাও অসম্ভব। যদি চিরকাল আমরা এই দেশে সলতনৎ করিতে পারি, তবে মনে হয়, বহুদিনে হিন্দুস্থানে একটা বড় মুসলমান-সম্প্রদায় গঠিত হইবে; তখন যেমন ইচ্ছা, তেমনি করিয়া এ জাতিকে আমরা গঠিত করিতে পারিব। হিন্দু যেমন দুর্দ্ধর্ষ—দুর্দ্দমনীয়, তেমনি কৃতজ্ঞ ও মিষ্ট কথায় সহজে মুগ্ধ হয়। উপকারক-উপকৃতের সম্বন্ধে সংবদ্ধ করিয়া, মিষ্ট কথায় মুগ্ধ করিয়া, হিন্দুকে প্রথমে মোগলের অনুকূল ও সহায়ক করি, হিন্দুর সাহায্যে, হিন্দুর দেশে মোগলের পাদশাহী তক্তের বনীয়াদ পোক্ত করি, পরে আপনার উপদেশমত পীর পয়গম্বরের ঋণ পরিশোধ করিব; ইস্‌লামধর্ম্মপ্রচারের ব্যবস্থা করিব। আপনি দোয়া করুন, খোদা মালেক যাহা মঙ্গল তাহাই হইবে। উলেমাগণকে বৃথা গণ্ডগোল বাধাইতে বারণ করিবেন।

সাহ ফকীর আকবরের বড়ই শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন; যখন মুসলমান উলেমাগণ আকবরের ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া দেশময় একটা ধর্ম্মের গোল বাধাইবার চেষ্টায় ছিলেন, তখন বাদশাহ ফকীর সাহেবের সহিত অনেক মনের কথা কহিতেন। আকবরনামা গ্রন্থে মাঝে মাঝে এই ভাবের কথা লিখিত আছে। এই কথাগুলির আলোচনা করিলেই আমরা আকবরের মর্ম্মের ভাবনা বুঝিতে পারি। একটা সার্ব্বভৌম পদ্ধতিকে উল্টাইয়া,সার্ব্বজনীন ব্যবস্থার বিপরীতাচরণ

এমন লোভ, এত মর্য্যাদা সামান্য পদানত পরাজিত জাতি সামলাইতে পারে না; হিন্দু যে একটুও পারিয়াছিল, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়।

যাহাদিগকে ইসলামধর্ম্মে দীক্ষিত করা অসম্ভব বলিয়া আকবর বুঝিয়াছিলেন, তাহাদের সহিত কুটুম্বিতা করিয়া, ঘনিষ্ঠতা করিয়া, তিনি তাহাদের আচার-পদ্ধতি এত দূর পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়াছিলেন যে, না[মে] হিন্দু থাকিলেও তাহারা ব্যবহারে দশআনা মুসলমান হইয়া গিয়াছিল। [পূ]র্ব্বে রাজা প্রাসাদ ত্যাগ করিয়া, স্থানান্তরে যাইলে বন্দিগণ উচ্চৈঃস্বরে স্তুতিগান করিত; এই রীতি অনাদিকাল হইতে আর্য্যাবর্ত্তে প্রবর্ত্তিত আছে। আকবর রাজা বিহারীমল্লকে নকীবী দিলেন, বড়ই মর্য্যাদার কথা। নকীব রাজা বাহাদুরের গতাগতির কালে কলমা পাঠ করিত; তাঁহার [দে]খাদেখি অন্য রাজারাও ভট্ট চারণ বন্দিগণের বন্দনাপদ্ধতি উঠাইয়া দিলেন, পাদশাহী হুকুমনামা লইয়া নকীবের ব্যবস্থা সকলেরই হইল যে ক্ষেত্রে বেদের শান্তিপাঠ হইত, সেখানে কোরাণের কল্‌মা-পাঠ আরব্ধ হইল। তেমনি পোষাক পরিচ্ছদেও অল্প অল্প পরিবর্ত্তন করিয়া, মুসলমানী ঢঙ করিয়া লওয়া হইল। লেখকজাতি কায়স্থগণ মুন্সীলালা হইয়া আচারে, ব্যবহারে ষোল আনা মুসলমান হইলেন, কেবল নামে হিন্দু রহিলেন।

যেমন করিয়া বিশ্লেষণ করিলে পরাজিত জাতি শুষ্ক বালুকাকণায় পরিণত হয়, এক একটি স্বতন্ত্র ও পৃথক্ হইয়া যায়, আকবরের শাসনপ্রভাবে হিন্দু জাতির তাহাই হইয়াছিল। আকবরনামা ও আইনআকবরী হইতে ইহারই প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া আমরা সময়ে সময়ে পাঠকগণকে অঞ্জলি দিব।

পৌণ্ড্রক-বাসুদেব।

[পৌরাণিক ইতিবৃত্ত।]

প্রথম পরিচ্ছেদ।

অজ্ঞাতেতিবৃত্ত প্রদেশের পুরাবৃত্ত-সঙ্কলন-বিষয়ে সেই দেশের বা তৎপার্শ্ববর্ত্তী [অ]ন্যতর জনপদের সাহিত্য ও বিদে[শী] পর্য্যটকের ভ্রমণবৃত্তান্ত হইতে যথেষ্ট ...য়। এইরূপে প্র... হিন্দুগণের জাতীয় ইতিহাস সঙ্কলিত

করিয়া, নূতন ভিত্তিতে রাজনীতি প্রতিষ্ঠিত করিয়া, রাজ্যশাসন করিবার উদ্দেশ্য আকবরের ছিল না। মনে হয়, সে সময়ও এমন বিরাট ভাবনার অনুকূল ছিল না। তবে গ্রাম্য ভাষায় বলিতে গেলে আকবর "হাঘরে" "হাভাতে" ছিলেন। উষ্ণ মোগল শোণিতে তাঁহার দেহ পুষ্ট হইয়াছিল; পরের দ্বারস্থ হইয়া, পরের আশ্রিত থাকিয়া, "ঘর" ও "ভাত" সংগ্রহ করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হয় নাই। তিনি স্বাধীনভাবে নিজের ঘর নিজে বাঁধিয়া, নিজের অন্ন নিজে সংগ্রহ করিতে চাহেন। বিশেষ, শৈশবের অসহ্য দুঃখ দুর্দ্দশার কথা, পিতার অবমাননার কথা তিনি ইহজীবনে ভুলিতে পারেন নাই। তাই ভারতে আসিয়া ভারতে থাকিয়া, ভারতের হইয়া বাদশাহের মত থাকিতে তাঁহার বাসনা বলবতী হইয়াছিল। দারিদ্র্যের পেষণে পিষ্ট হইয়া তিনি হিন্দুকে চিনিয়াছিলেন, হিন্দুস্থানকে বুঝিয়াছিলেন। তাই বিজয়ী হইয়া উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিয়া নিজের প্রভাব অক্ষুণ্ণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। সেই উপযুক্ত চেষ্টার তাৎকালিক ফলে আকবর হিন্দুর দৃষ্টিতে দেবতার উচ্চ পদবী পাইয়াছিলেন, এবং পরোক্ষ বলে হিন্দুস্থান মুসলমানের এজমালী আবাসস্থান হইয়াছে। ইসলামীরা বজ্রলেখনীতে নিজের ধর্ম্মমর্ম্ম হিন্দুস্থানের হৃদয়ে চিরদিনের তরে লিখিয়া রাখিয়াছেন। যাহা এক ছিল, তাহা দুই হইয়াছে; যাহা ভাবে সমষ্টি ছিল, তাহা ব্যষ্টিতে পরিণত হইয়াছে। এখন রাজনীতির ভাবনা ভাবিতে হইলে, প্রথমেই মুসলমানের ভাবনা ভাবিতে হয়। যে মণিময়-পাত্র দেবতার পানীয়ের আধার ছিল, কুশলীর কৌশলে তাহা ভাঙ্গিয়া দুইখানা হইয়াছে, আর জোড়া লাগিবে না।

আকবর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, যে হিন্দু বা কাফের স্বেচ্ছায় ইসলাম-ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে, সে তৎক্ষণাৎ বিজেতার—মুসলমানের সকল অধিকারে অধিকারী হইবে। রাজপুত মুসলমান হইলে খাঁ উপাধি পাইবেন, খাঁয়ের মানমর্য্যাদা পাইবেন, দরবারী হইবেন। ব্রাহ্মণ স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে, তিনি ইমাম-পদে অভিষিক্ত হইবেন; মৌলানার দলে আসন পাইবেন। উচ্চপদস্থ হিন্দু মুসলমান হইলেই জাগীর পাইত, নিশান-নগরা পাইত, সেনার অধিনায়ক হইতে পাইত। আসল মুসলমান অপেক্ষা ধর্ম্মান্তরগ্রাহী হিন্দু মুসলমান অধিক ম... ...র ভাগী হইত। হিন্দু মুসলমান হইলে, সামান্য জাগীরদারী হইতে নিজ... ...পদ পর্য্যন্ত পাই...

তেছে, এবং এক্ষণে ভরসা হইতেছে যে, প্রাচীন আর্য্যগণের সমাজচিত্র আর বহুদিন অতীতের দুর্ভেদ্য আবরণে লোকলোচনান্তরালে লুক্কায়িত থাকিবে না।

অতি প্রাচীনকাল হইতে প্রাচীন আর্য্য হিন্দুগণের ভারতে আগমন, অবস্থান ও ক্রমশঃ উপনিবেশবিস্তারের বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ এক্ষণে লিপিবদ্ধ হইয়া জ্যামিতির অভ্রান্ত স্বতঃসিদ্ধ বিষয়ের ন্যায় বিদ্যালয়ের বালকগণ কর্তৃক অধীত হইতেছে। এখন সুকুমারমতি বালকগণ ও প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের বহু যত্ন ও পরিশ্রমে আবিষ্কৃত ভারতীয় ইতিহাসের বৈদিক ও মহাভারতীয় যুগের (১) সভ্যতারশ্মির স্নিগ্ধ প্রাখর্য্য অনুভব করিতে পারিতেছে। তাহারা শিখিয়াছে যে, অতি প্রাচীনকালে আর্য্য হিন্দুগণ সপ্তসিন্ধু প্রদেশে উপনিবেশ সংস্থাপন করেন, এবং সেই অতি প্রাচীনকালেই তাঁহাদের সভ্যতা ও প্রভাব সদানীরার শীতল স্রোত উত্তীর্ণ হইয়া পূর্ব্বসমুদ্রাভিমুখে প্রধাবিত হইতেছিল।

শতপথ ব্রাহ্মণ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, অতি প্রাচীনকালে, সম্ভবতঃ বৈদিক যুগে, যাগযজ্ঞশীল কৃষিজীবী আর্য্যগণ সদানীরা বা গণ্ডক (২) উত্তীর্ণ হন নাই। ঐ সময়ে গণ্ডক নদের পূর্ব্ব ভাগ অত্যন্ত জলাময় ছিল, এবং তখনও তাহা আদৌ কর্ষণযোগ্য হয় নাই। (৩) শতপথ ব্রাহ্মণের রচনার সময়ে, বা তাহার অল্পকাল পূর্ব্বাবধি, গণ্ডকের পূর্ব্ববর্ত্তী ভূভাগে আর্য্যগণ উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়া যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপ আরম্ভ করেন। এই প্রদেশে বিদেহগণ প্রবল হইয়া উঠেন। সদানীরা বা গণ্ডক, এই সময়ে পশ্চিম দিকে কোশল ও পূর্ব্ব দিকে বিদেহ, এই দুই রাজ্যের সীমা নির্দ্দেশ করিত। বিদেহ রাজ্যের পূর্ব্ব সীমা কত দূরে ছিল, শতপথ ব্রাহ্মণে তাহার নির্দ্দেশ নাই।

---

(১) শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত স্বীয় প্রাচীন ভারতের ইতিবৃত্তে পাঁচটি যুগের নির্দ্দেশ করেন; যথা,—বৈদিক যুগ (২০০০—১৪০০ পূঃ খৃঃ,) (খ) মহাভারতীয় যুগ (১৪০০—১০০০,) (গ) বৈদান্তিক যুগ (১০০০—২৪২,) (ঘ) বৌদ্ধ যুগ (২৪২ পূঃ খৃঃ—৫০০ খ্রীঃ,) (ঙ) পৌরাণিক যুগ (৫০০—১১৯৪)। আমি এই প্রবন্ধে মোটামুটি রমেশ-চন্দ্রের যুগবিভাগের অনুসরণ করিব।

(২) পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ গণ্ডক-নদকে প্রাচীন সদানীরা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু কোষকার অমরসিংহ করতোয়াকে সদানীরা বলেন।

(৩) Datt's Ancient India.

বিদেহ রাজ্যের পূর্ব্ববর্ত্তী প্রদেশসমূহ যে মহাভারতীয় যুগে আর্য্যসভ্যালোক প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের আলোচনায় স্থিরীকৃত হয় নাই। বেদ বা ব্রাহ্মণাদি প্রাচীন সাহিত্যে এই সকল প্রদেশের কোন বিবরণ, এমন কি, নামোল্লেখ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না। গণ্ডকের পূর্ব্ববর্ত্তী ভূভাগের অবস্থা সম্বন্ধে শতপথ ব্রাহ্মণে যতটুকু বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা হইতে ইহা অনায়াসে বলা যাইতে পারে যে, বেদ ও ব্রাহ্মণাদি প্রাচীন আর্য্য সাহিত্য হইতে বিদেহ রাজ্যের পূর্ব্ববর্ত্তী ভূখণ্ডের তদানীন্তন ইতিবৃত্ত-সঙ্কলনে কোনরূপ সাহায্যপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আর্য্যাবর্ত্তের মানচিত্র উদ্ঘাটন করিলে গণ্ডকের পরে পূর্ব্ব দিকে স্বনাম-খ্যাতা কৌশিকী নদীর প্রবাহরেখা দৃষ্টিপথবর্ত্তিনী হয়। সম্ভবতঃ, স্রোত-স্বতী সদানীরার পরে কৌশিকীই প্রাচীন আর্য্য উপনিবেশের পূর্ব্ব সীমা নির্দ্দিষ্ট হয়। কৌশিকীর সহিত রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের নাম সংযোজিত আছে। কৌশিকী নদীর তীরে বিশ্বামিত্র উগ্র তপস্যা করেন বলিয়া মহাভারতে উল্লিখিত হইয়াছে। (১) ক্ষত্রিয় গাধিনন্দন বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণত্বলাভের উপাখ্যানে ভারতের পুরাতত্ত্বানুসন্ধায়িগণ বিশ্বাসস্থাপন না করিলেও, বিশ্বামিত্র যে একজন বৈদিক যুগের ঋষিগণের ন্যায় ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়, এই উভয়ধর্ম্মশীল ছিলেন, ইহা তাঁহারা প্রতিপাদিত করিয়াছেন। (২) অতএব, রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের কৌশিকীতীরে তপশ্চর্য্যা হইতে ইহা অনুমিত হইতে পারে যে, বৈদিক যুগের শেষ বা মহাভারতীয় যুগের প্রথমাবধিই কৌশিকী প্রাচীন আর্য্যগণের পরিচিতা হইয়াছে।

যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞোপলক্ষে ভীমকর্ম্মা বৃকোদর প্রাচ্য জনপদসমূহ-বিজয়ে বহির্গত হন, এবং গিরি ব্রজ (রাজগৃহ) এবং মোদগিরি-(মুঙ্গের)-জয়ের পর কৌশিকীকচ্ছনিবাসী রাজা মহৌজা ও পৌণ্ড্রক বাসুদেবকে পরাজয় করিয়া বঙ্গদেশের অভিমুখে ধাবিত হন। (৩) মহাভারতের এই

(১) বনপর্ব্ব, ১৯১ অঃ।

(২) Both Visvamitra and Jamadagni were *Vedic Rishis* and they bore arms and composed hymns when kshatriyas and Brahmans, as such, were unknown.—Dutt's Ancient India.

(৩) সভাপর্ব্ব, ৩০ অঃ।

ভ্রান্তি হইতে অনুমিত হয় যে, মহাভারতের উক্ত-অংশ-রচনার সময় কৌশিকী তীরে কৌশিকীকচ্ছ (৪) এবং তাহার নিকটেই পৌণ্ড্রক বাসুদেবের জনপদ ছিল।

যুধিষ্ঠির ভীমাদির ঐতিহাসিক অস্তিত্ব প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ স্বীকার করেন না। রাজসূয়যজ্ঞোপলক্ষে পাণ্ডবগণের দিগ্বিজয়বর্ণনাবসারে যে সকল জনপদের বিবরণ উল্লিখিত হইয়াছে, ঐ সকল জনপদ যে অতি প্রাচীনকালে মহাভারতীয় যুগে বর্ত্তমান ছিল, তাঁহারা তাহা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহেন। কারণ, মহাভারতীয় যুগে আর্য্যোপনিবেশ পূর্ব্বে গণ্ডক ও দক্ষিণে বিন্ধ্য অতিক্রম করিয়া যে অধিক দূর অগ্রসর হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ প্রাচীনতম সংস্কৃত সাহিত্যে দুর্লভ। কিন্তু আর্য্যোপনিবেশ মহাভারতীয় যুগে গণ্ডক অতিক্রম করিয়া বহু দূর অগ্রসর হয় নাই বলিয়া যে সেই সময়ে তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী ভূমিখণ্ড জনমানবশূন্য ছিল, ইহারও কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। সদানীরার উপকূলনিবাসী আর্য্যগণ যে দিগ্বিজয় বা মৃগয়াদির উদ্দেশে, বা কৌতূহলপরবশ হইয়া, বা অন্য কারণে গণ্ডকের গণ্ডী লঙ্ঘন করিতেন না, তাহাই বা কে বলিবে? বরঞ্চ মহাভারতের অপেক্ষাকৃত আধুনিক স্তর, মনুসংহিতা, রামায়ণ ও প্রাচীন পুরাণাদি পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, দরদ, খস, পার্ব্বত্য, কিরাত, নিষাদ ইত্যাদি বহু আর্য্যেতর জাতি আর্য্যগণের প্রতিবেশী ছিল। এরূপ স্থলে গণ্ডকের পূর্ব্ববর্ত্তী ভূখণ্ডে বৈদিক যুগের শেষ বা মহাভারতীয় যুগের প্রথমভাগে, আর্য্য জাতি উপনিবেশ-স্থাপন না করিলেও, তথায় যে বহু আর্য্যেতর জাতির বাস ছিল, এরূপ অনুমান করিলে, সম্ভবতঃ ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপ করা হইবে না। এই সকল প্রাচ্য আর্য্যেতর জাতির মধ্যে সম্ভবতঃ পুণ্ড্রগণ একতর।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

জমদগ্নিকুমার পরশুরাম কর্ত্তৃক পৃথিবী একবিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয়া হইলে, ক্ষত্রিয়াণী-গর্ভে ক্ষেত্রজ ক্ষত্রিয় সন্তান উৎপাদন দ্বারা পৃথিবীতে পুনর্ব্বার ক্ষত্রিয়বংশ বিস্তারিত হয়, এই বিবরণ অতি সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া প্রাচ্য

(৪) জলের সমীপবর্ত্তী দেশকে কচ্ছ বলে। অনেকে কৌশিকীকচ্ছ জনপদ ও সুরাষ্ট্রের নিকটবর্ত্তী কচ্ছকে এক জনপদ বলেন। কিন্তু বৃহৎসংহিতা নামক জ্যোতিগ্রন্থে সুরাষ্ট্রের নিকটবর্ত্তী কচ্ছ "মরুকচ্ছ" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে

দেশে ক্ষত্রিয়বংশপ্রতিষ্ঠার এক প্রাচীন ইতিহাস মহাভারতের আদিপ ভীষ্ম দেবের মুখে বর্ণিত হইয়াছে। এই উপাখ্যান (১) পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, সুরগুরু বৃহস্পতির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা উতথ্য স্বীয় প্রিয়তমা পত্নী মমতার গর্ভে অন্ধ দীর্ঘতমা ঋষিকে অপত্যস্বে লাভ করেন। কালে দীর্ঘতমা গোধর্ম্ম-পরায়ণ ও পরিবারপ্রতিপোষণে অসমর্থ হইয়া ভর্ত্তা নামের অযোগ্য হওয়ায় তাঁহার পত্নী প্রদ্বেষী পুত্রগণের সাহায্যে তাঁহাকে বন্ধন পূর্ব্বক উড়ুপে নিক্ষেপ করিয়া গঙ্গায় ভাসাইয়া দেন; এবং দীর্ঘতমা যদৃচ্ছাক্রমে বহুদেশ অতিক্রম করিয়া গঙ্গাপ্রবাহে ভাসিয়া যাইতে থাকেন। অবশেষে বলি নামক জনৈক অপুত্রক ধর্ম্মপরায়ণ রাজা তাঁহাকে তদবস্থা হইতে উদ্ধার করিয়া তাঁহার ব্রহ্মতেজঃ লক্ষ্য করিয়া তাঁহার আশীর্ব্বাদে আপন পত্নী সুদেষ্ণার গর্ভে পঞ্চ পুত্র লাভ করেন। এই পঞ্চ পুত্র অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র, ও সুহ্ম; পাঁচটি বৃহৎ জনপদের অধিপতি হইয়াছিলেন।

রামায়ণ, মহাভারত, বৃহৎসংহিতা ও অন্যান্য পুরাণে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র, সুহ্ম, উৎকল ইত্যাদি জনপদগুলির নাম প্রায়ই একত্র গ্রথিত দেখিতে পাওয়া যায়। এই কারণে বোধ হয় যে, এই সকল রাজ্য পরস্পরের নিকটবর্ত্তী ছিল। অঙ্গদেশ বর্ত্তমান ভাগলপুর, বঙ্গ বর্ত্তমান পূর্ব্ববঙ্গ, কলিঙ্গ পুরী হইতে কৃষ্ণাতীর পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ জনপদ, এবং সুহ্ম বর্ত্তমান উড়িষ্যার পূর্ব্বোত্তরদিকবর্ত্তী ছিল। ইহাতে পুণ্ড্রকে অঙ্গ ও বঙ্গের মধ্যবর্ত্তী বলিয়াই মনে হয়।

চীনদেশীয় পরিব্রাজক হোয়েন্থসাং আর্য্যাবর্ত্তের পশ্চিম দিক হইতে ক্রমাগত অগ্রসর হইয়া প্রাচীন অঙ্গ দেশের রাজধানী চম্পানগরী পরিদর্শন করিয়া নানা স্থান দর্শনান্তে পূর্ব্বাভিমুখে আসিয়া পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে (২) উপস্থিত হন। হোয়েন্থসাং পৌণ্ড্রবর্দ্ধন রাজ্যকে ৮০০ মাইল বিস্তারিত দেখিয়াছিলেন; এবং তিনি পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের পর কামরূপে গমন করেন। এই নির্দ্দেশ-অনুসারে হোয়েন্থসাংএর সময়ে, অর্থাৎ খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথম

(১) আদিপর্ব্ব, ১০৪ অঃ।

(২) মহাভারতে পুণ্ড্র ও পৌণ্ড্র, এই দুই নামেরই উল্লেখ পাওয়া যায়। বৌদ্ধযুগের ও তৎপরবর্ত্তী কালের গ্রন্থে ও প্রশস্তিলিপিতে পুণ্ড্রবর্দ্ধন ও পৌণ্ড্রবর্দ্ধন এই দুই নামেরই উল্লেখ আছে। ইহা হইতে অনুমান হয় যে, পুণ্ড্র, পৌণ্ড্র, পুণ্ড্রবর্দ্ধন ও পৌণ্ড্রবর্দ্ধন, একই জনপদের বিভিন্ন নাম; তবে পুণ্ড্রবর্দ্ধন ও পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরবাচক বলিয়া বোধ হয়।

পৌণ্ড্রবর্দ্ধন রাজ ম্পা ও কামরূপের মধ্যবর্ত্তী ছিল, ইহা অনায়াসে যাইতে পারে।

বৈদ্যক গ্রন্থে (১) পৌণ্ড্রক বা পৌণ্ড্রিকা নামক একজাতীয় ইক্ষুর বর্ণনা দেখা যায়। পু দেশে জন্মে বলিয়া উক্ত ইক্ষু ঐরূপ নামে অভিহিত হইয়াছে। মালদহ জেলার উত্তর ও দিনাজপুর জেলার দক্ষিণপূর্ব্বাংশে প্রচুর ইক্ষু জন্মে, এবং ঐ ইক্ষুজাত গুড় মালদহের একটা হাটে বিক্রীত হয়। ঐ হাটে ঐ গুড় ভিন্ন আর প্রায় কিছুরই ক্রয়বিক্রয় হয় না বলিয়া ইহাকে "গুড়ের হাট" (২) বলিয়া থাকে। এই হাট হইতে বাঙ্গলার নানা স্থানে ইক্ষু-গুড় প্রেরিত হয়।

শব্দকল্পদ্রুম অভিধানে (৩) শব্দরত্নাবলীর মতে "পৌণ্ড্র" শব্দের অর্থ-স্থলে "চন্দেল দেশ" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। মালদহ জেলার পূর্ব্বদক্ষিণ-ভাগে "চান্দলাই" নামে এক গ্রাম ও এক পরগণা আছে।

"পৌণ্ড্রক" শব্দের অর্থস্থলে শব্দকল্পদ্রুম অভিধানে (১) "জাতিবিশেষঃ। পুঁড়ো ইতি ভাষা" লিখিত হইয়াছে। মালদহ জেলায় "পুণ্ডরী" বা "পুঁড়ো" নামক একটি জাতি দেখা যায়। আজকাল ইহাদের অধিকাংশেরই বাসস্থান মহানন্দার পশ্চিম পারে, কিন্তু পূর্ব্বে ইহারা বরেন্দ্র অঞ্চলে বাস করিত। পুরাতন মালদহ যখন শ্রীবৃদ্ধিসম্পন্ন মহানগর ছিল, সেই সময়ে পুরাতন মালদহের একটি অংশে কেবল ইহাদের বাস ছিল, এবং তাহাদের অধ্যুষিত অংশকে পুঁড়াটুলি বলিত। শুনিয়াছি, এক শত বৎসরের মধ্যেও পুঁড়াটুলিতে ৪০০।৫০০ ঘর পুণ্ডরী আপনাদের জাতীয় ব্যবসায় চালাইত। মহানন্দার পশ্চিম পারে ইংরেজদের ও ফরাসীগণের রেসমের কুঠিস্থাপনের পর হইতে ইহাদের সংখ্যা মহানন্দার পশ্চিম পারে অধিক হইয়াছে।

প্লবগেশ্বর সুগ্রীব পূর্ব্ব দিকে সীতান্বেষণার্থ বানরদল প্রেরণ করিবার সময় যূথপতি বিনতকে পুণ্ড্র ও অঙ্গদেশে সীতান্বেষণের উপদেশ দিয়া উক্ত দেশদ্বয়কে "ভূমিঞ্চ কোশকারাণাং ভূমিঞ্চ রজতাকরাং" (৪)

(১) রাজবল্লভ, ভাবপ্রকাশ, দ্রব্যগুণ, ও অমরকোষ প্রভৃতি।

(২) দুই বৎসর হইল, এই হাট প্রতিযোগী জমিদারের চেষ্টায় স্থানান্তরিত হইয়াছে গুড়ের হাট না থাকিলেও লোকে স্থানটিকে এখনও "গুড়হাটী" বলিয়া থাকে।

(৩) শোভাবাজার রাজবাটীর ১৭৩২ শকাব্দের সংস্করণ।

(৪) রামায়ণ, কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড, ৪০ অঃ।

বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন। পৌণ্ড্রক বা পুণ্ড্র [illegible]ত্রেই এখনও [illegible] কারের বৃত্তিতেই (১) অনুরক্ত, এবং তাহা[illegible] সংসারযাত্রা নির্ব্বা[illegible] করিয়া থাকে। ১৮৭২ সালের লোকগণনায় [illegible]হ জেলায় পুণ্ডরী-সংখ্যা ১১১৬২ ছিল; কিন্তু ১৮৯১ সালের লোকগ[illegible]নায় তাহাদের সংখ্যা কমিয়া ৯৫৭৪ হইয়াছে; অর্থাৎ ১৮৭২ হইতে ১৮৯১ পর্য্যন্ত এই ১৯ বৎসরে গড়ে প্রতিবৎসর ৭৫ জন হিসাবে পুণ্ডরীর সংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে। এই হিসাবে এক শত বৎসর পূর্ব্বে মালদহ জেলায় যে বর্ত্তমান সময়ের দ্বিগুণসংখ্যক পুণ্ডরী ছিল, ইহা নিঃসংশয় বলা যাইতে পারে। তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে যে, বহু শত বৎসর পূর্ব্বে মালদহ জেলায় বহুসহস্র পুণ্ডরী ছিল, এবং তদনুসারে মালদহ জেলাকে সুগ্রীবের সহিত একবাক্যে "ভূমিঞ্চ কোশকারাণাং" বলা যাইতে পারে।

স্কন্দপুরাণের পৌণ্ড্রখণ্ডে "করতোয়ামাহাত্ম্য" নামে একটি অধ্যায় আছে। করতোয়ামাহাত্ম্যে করতোয়াকে (২) পৌণ্ড্রদেশান্তর্গত তীর্থ এবং জ্যোতিস্তত্ত্বে পুণ্ড্র দেশকে কূর্ম্মাকৃতি বলা হইয়াছে। খরস্রোতা, অনিয়তপ্রবাহা, ক্রূরগতি কৌশিকীর ধ্বংসকরী প্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, কৌশিকী, করতোয়া ও গঙ্গাবেষ্টিত উন্নতপৃষ্ঠ বরেন্দ্র ভূভাগের প্রাচীন চিত্র মানসপটে অঙ্কিত করিলে, তাহাকে অনেকটা কূর্ম্মাকার বলিয়াই প্রতিভাত হইবে।

মালদহ জেলার অন্তর্গত পাণ্ডুয়ার ভগ্নস্তূপের মধ্যে যিনিই প্রবেশ করিয়াছেন, তিনিই তাহার অতিপ্রাচীনতার উপলব্ধি করিয়া বিস্মিত হইয়াছেন। এই পাণ্ডুয়াকে অনেকে পুণ্ড্ররাজধানী বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। নামের সৌসাদৃশ্যের সহিত ভগ্নস্তূপের প্রাচীনতার সমন্বয় করিতে গেলে, পাণ্ডুয়াকে প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্দ্ধন হইতে ভিন্ন মনে হয় না। (৩)

(২) তন্তুৎপাদক কীটবিশেষের অর্থাৎ রেসম কীটের প্রতিপালন ও রেসম প্রস্তুতের ব্যবসায়। রামানুজের টীকা দ্রষ্টব্য।

(৩) করতোয়াকে এখন যেমন একটি সামান্য ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী বলিয়া বোধ হয়, প্রকৃতপক্ষে চিরকাল সেরূপ ছিল না। তিস্তা নদী ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দের ভীষণ বন্যার পূর্ব্বে ইহারই উপনদী ছিল। ইহা পূর্ব্বে প্রবলবেগবতী বিশাল নদী ছিল। ইহার সম্বন্ধে নানা উপাখ্যান ও প্রবাদ বরেন্দ্র অঞ্চলে এখনও প্রচলিত আছে। হণ্টার সাহেবের সুপ্রসিদ্ধ Gazetteer এবং Statistical Account of Bengal নামক গ্রন্থেও করতোয়ার বিস্তৃত বর্ণনা আছে।

(১) বগুড়ার অন্তর্গত মহাস্থানকে কনিংহাম প্রভৃতি প্রত্নতত্ত্ববিদগণ পৌণ্ড্রবর্দ্ধন

এ পর্য্যন্ত যাহা আলোচনা করা গেল, তাহা হইতে, পশ্চিমে কৌশিকী হইতে পূর্ব্ব দিকে করতোয়া পর্য্যন্ত, এবং উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশ হইতে দক্ষিণে গঙ্গাপ্রবাহ (১) পর্য্যন্ত পুণ্ড্রদেশ বিস্তীর্ণ ছিল, এরূপ অনুমান করিলে, পুণ্ড্রদেশের ভৌগোলিক অবস্থাননির্ণয়ে ভ্রমমাত্রা অধিক হইবে না। আমার বিশ্বাস, মালদহ জেলার উত্তর ও পূর্ব্ব অংশ, দিনাজপুর ও রঙ্গপুরের দক্ষিণাংশ, রাজসাহী ও বগুড়া জেলা লইয়া প্রাচীন পুণ্ড্র রাজ্য সংগঠিত হইয়াছিল। এই ভূভাগেই বলিপুত্র পুণ্ড্র আপন নামে রাজ্য ও রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। পুণ্ড্র রাজগণের নাম বিলুপ্ত হইয়াছে, পৌণ্ড্র রাজ্য বিধ্বস্ত হইয়াছে; এখন কেবল পুরাতত্ত্বানুসন্ধানকালে পুণ্ড্র-গণের বংশধর "পুণ্ডরী" জাতি ও পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের ভগ্নাবশেষ "পাঁড়ুয়া"র পুঞ্জীকৃত ইষ্টক ও প্রস্তররাশি, ঐতিহাসিকগণের হৃদয়ে পৌণ্ড্রকগণের স্মৃতি জাগরিত করিতেছে।

ক্রমশঃ।

শ্রীরাধেশচন্দ্র শেঠ।

বলিয়া অনুমান করেন; কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। মহাস্থান সম্ভবতঃ প্রাচীন বরেন্দ্র নগরে।

(১) পুণ্ড্রের দক্ষিণ সীমা গঙ্গাপ্রবাহ বলিয়া উল্লেখ করিলাম; কিন্তু আমার বিশ্বাস, পুণ্ড্রের দক্ষিণ সীমার অনতিদূরে সমুদ্র ছিল। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ১৩০৪ সালের তৃতীয় সংখ্যায় বাঙ্গলার ভূতত্ত্ব প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিপাদিত করিয়াছেন যে, খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে দক্ষিণ বাঙ্গলা সমুদ্রগর্ভে ছিল, এবং গৌড়ের অনতিদূরে সমুদ্র ছিল।

কবিতা-কুঞ্জ।

প্রত্যাগত।

গাথা।

সজলজলদ-ভরা নিবিড় বরষা-রাতি,
ঘুমায় তারকাকুল তিমির শয়ন পাতি';
ক্ষান্ত তীব্র বরষণ,—বিন্দু বিন্দু ঝরে জল,
উঠিছে পল্বলকূলে দর্দ্দুরের কোলাহল;
জনহীন পল্লীপথ,—বাঁশঝাড়ে দুই পাশে,
জাগিছে মুখর শব্দ পবনের দীর্ঘশ্বাসে।
সেই ঘন বাঁশবন জনহীন পথ'পরি
রজনীর অন্ধকার তুলিছে নিবিড় করি';
পথিপার্শ্বে নালা বহি' বর্ষার আবিল জল
উচ্ছ্বসিত স্রোত লয়ে বহিতেছে কলকল।
কর্দ্দমাক্ত পল্লীপথে নির্ব্বাপিত-দীপ-করে,
দীর্ঘ চারি বর্ষ পরে মহেশ ফিরিছে ঘরে।
অবসন্ন শ্রান্ত তনু,—চরণ চলে না আর;
কেবল ভাবিছে মনে,—কত দূর গৃহ তার।
মনে তা'র জাগিতেছে, অতীত-জীবন-কথা,
মরমের মর্ম্মে মর্ম্মে জাগিছে ব্যাকুল ব্যথা—
সুখের শৈশব সেই, সুখভরা বাল্যকাল,
প্রথম যৌবনে সেই আকুল কল্পনাজাল;
তার পর, তার পর,—সেই পাপপ্রলোভন,
সদসদ্‌জ্ঞানহীন পাপপরিপূর্ণ মন;
বংশের অতুল যশ, পিতার অসীম আশ,
সব পদে দলি' সেই চারি বর্ষ কারাবাস।
অসহ্য যাতনাবেগে চৈতন্য বিলুপ্তপ্রায়,
শয়ন করিল সেই কর্দ্দমাক্ত মৃত্তিকায়।

*   *   *

মূর্চ্ছা অবসানে উঠি' আসিল গৃহের দ্বারে,
দাঁড়াইয়া ক্ষণতরে ভাবিল ডাকিবে কা'রে।
মুক্ত সিংহদ্বার, গৃহে নাহি ভায় দীপকর,
নাহি উঠে মানবের মধুময় কণ্ঠস্বর!
পেচক বসিয়া শুধু জনহীন গৃহ'পর,
তুমি অনিবার অমঙ্গল কণ্ঠস্বর।
শঙ্কায় কম্পিত করে দীপখানি জ্বালি লয়ে
পরিচিত কক্ষে তা'র প্রবেশিল ভয়ে ভয়ে।
প্রবেশিতে দ্বারপথে ঘন লূতাতন্তুজাল
পরশ করিল তার বক্ষঃ, চক্ষু, কেশ, ভাল;
সেই অন্ধ অন্ধকারে আলো হেরি চমকিয়া
উড়িল বিনিদ্র পাখী পক্ষযুগ ঝাপটিয়া;
ভগ্নদ্রব্য অযতনে ছড়ান রয়েছে ঘরে—
কত বরষের ধূলি জমিয়াছে তা'র পরে!
বিষধর সর্প আর নিশাচর জীব যত
আশ্রয় লয়েছে আসি সে গৃহে—গৌরবহত।
পড়ি আছে হর্ম্ম্যতলে পিতার আলেখ্য তা'র,
তা'র পানে চাহি যেন, আঁখিতে কি তিরস্কার
যেন প্রেতলোক হ'তে জনকের মনস্তাপ
সন্তানের শির'পরে বর্ষিতেছে অভিশাপ।
হেরি' সেই তীব্র দৃষ্টি হর্ম্ম্যতলে চিত্রপ্রায়
ভীতিভরে অভাগার শিহরি উঠিল কায়;
দ্রুতপদে কক্ষ ত্যজি বাহিরে আসিল ফিরি'
যন্ত্রণার শত শিখা জ্বলিল হৃদয় ঘিরি।

*   *   *

পরদিন নিশিশেষে আবার উদিল রবি,
জাগিয়া উঠিল জীব নূতন জীবন লভি।
দিবালোকে গৃহদ্বারে দেখে পুরবাসী সব
জীর্ণ অস্থিসার দেহ—পড়িয়া রয়েছে শব।

চৈতন্যের উদ্দেশে বিষ্ণুপ্রিয়া।

সাঙ্গিলে কি লীলা, বঁধু, প্রেম-বৃন্দাবনে
হে গৌরাঙ্গ কিশোর সন্ন্যাসী! হে সুন্দর!
গেলে চলি কি উদ্দেশে নিশীথে নির্জ্জনে
কোন্ বিশ্ব-তপোবনে বিশ্ব-মনোহর!
নিদাঘে বসন্তরুচি পড়েছে ঝরিয়া
মোর মরুময় বুকে;—কোথা কুহরণ,
মুহুর্মুহু শতোচ্ছ্বাসে জাগাত যে হিয়া,
বৈশাখী মুকুলে ভরি প্রেম-কুঞ্জবন।

কোথায় সে সুখস্বপ্ন? ভূমিশয্যাধানে
শত স্বর্গ বিরাম-শয়নে! দু' জনার
কিবা তৃপ্তি, কি অতৃপ্তি, চাহি দোঁহা পানে;
এ বিয়োগে ধরি কিসে একা দেহভার?
এ মান বিরাগ তব কোন্ অভিমানে?
প্রেম-যজ্ঞে বুঝি ত্রুটী ঘটিলা আমার।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম।

বর্ষা।

আবার নব হরষভরে বরষা আসে ভুবনে
ফুল্ল করি তাপিত তরু লতিকা,
গগনপথে নবীন মেঘ বেড়ায় ভাসি' পবনে,
কাননে ফুটে কামিনী জাতি যূথিকা।

উচ্ছ্বসিতা নির্ঝরিণী তুলিয়া শত লহরী—
ছুটিয়া যায় যৌবনের গরবে,
মত্তবায়ে শ্যামল বন উঠিছে ঘন শিহরি,
বকুলগুলি ঝরিয়া পড়ে নীরবে।

কদম্বের গন্ধ মাখি' সিক্ত বায়ু আসিয়া
শীতল করে অঙ্গ খর পরশে,
কুঞ্জ হ'তে ভ্রমরতান শ্রবণে আসে ভাসিয়া,
সারসকুল হরষে খেলে সরসে।

স্নিগ্ধ নব জলদজাল-আবৃত দেখি নভসে
উল্লসিত চাতক যত পিপাসী,
রঙ্গভরে মত্ত শিখী নৃত্য করে রভসে,
কলাপে তা'র ইন্দ্রধনু বিকাশি।

নিবিড় করি মেঘের ছায়া সন্ধ্যা আসে নামিয়া,
অন্ধকারে মিশিয়া যায় ধরণী,
কুলায়হীন বিহঙ্গের কাকলি যায় থামিয়া,
রজনী আসে তামসী মসীবরণী।

কোথা গো আজি বরষারাতে স্নিগ্ধ বনভবনে
তরুণী বালা—আকুলা প্রেমপুলকে,
নীরদনীল বসন পরি' এস গো অয়ি শোভনে,
কুসুমদাম জড়ায়ে নীল অলকে।

নিভৃত-গৃহ-কক্ষ মাঝে এস গো অয়ি নায়িকা
ললিত তনু—মালতীমালাধারিণী;
মোহন বীণাযন্ত্রে অয়ি অমৃতময়ী গায়িকা,
বাজাও নব রাগিণী মনোহারিণী।

কৃষ্ণ মেঘে কনকরেখা ফুটিয়া উঠি দামিনী
নিমেষ তরে ঝলসি' দেয় নয়নে,
বজ্র-নাদে সুপ্ত গৃহে চমকি' পুরকামিনী
কাঁপিয়া উঠে মিলনসুখশয়নে।

ব্যাকুলচিতে নিরখি' আজি বাদলঘেরা আকাশে
পথিক-বধূ পথের পানে চাহিয়া,
ভাবিছে কবে দয়িত তা'র আসিবে ফি'রে সকাশে
অশ্রু ঝরে কপোলতল বাহিয়া।

শ্রীরমণীমোহন ঘোষ।

মরমবেদনা।

বিশাল তরুর তলে, সুশ্যামল দূর্ব্বাদলে
শীতল ছায়ায়
সংসারে ঘৃণিত দীন রাখি এ জীবন ক্ষীণ
একা নিরালায়।
নিকটে তটিনী বহে, কুলকুলরবে কহে
মরম-বেদন;
ব্যথাময় এ জীবনে আমিও তটিনী সনে
মিশাই ক্রন্দন।
প্রবাহিণী, তোর কূলে জীবনযাতনা ভুলে
জুড়ায় যাতন,
তাই আজ তোর কূলে এসেছি ও পদমূলে
সঁপিতে জীবন।
তোর তীরে একা আসি এ হৃদয়জ্বালারাশি
জুড়াই বিরলে,
দুঃখজ্বালা হৃদি পরে নিবৃত্ত ক্ষণেক তরে;—
মুছি আঁখিজলে।

শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী।

প্রেমপিপাসা।

সেকালের সেই কথা আর কি তোমার, সখা,
হবে তা স্মরণ?

সুদূর অতীতগর্ভে সেদিন এখন হায়,
লভেছে মরণ।—
কোন কথা নাই, তবু বসে সারা দিনরাত
কথা অগণন,
এক কথা ফিরে ফিরে বলা শতবার,—তবু
নহে পুরাতন।
কোন কাজ নাই, তবু করি কত কার্য্যছল
মোর পাশে পাশে—
সব কায তেয়াগিয়া যাতায়াত বারবার;
মনে কি তা আসে?
দেখিয়া দেখিয়া মুখ হ'ত না তৃপ্তির শ্রান্তি
তাই সদা দেখা,—
নব পরিচয় যেন; সে চাহনি মাঝে ছিল
নব ভাব লেখা।

তখন প্রাণের ভাষা ফুটিত না মুখে কভু,
ফুটিত নয়ানে,
আঁখির নীরব ভাষা সকলি বুঝায়ে দিত
উঠিত যা মনে।
আজ ডেকে ডেকে সাড়া পাইনে তোমার আর
কেন সে না জানি,
যদি কভু দেখা হয় করি কত কার্য্যছল
ফিরাও মুখানি!
আজ নাহি লভে ভাষা নূতন জীবন আর
দুজনের প্রাণে;
সে প্রেমপিপাসা, সখা, লভেছে কি তৃপ্তি আজ—
খুঁজি কোনখানে?

শ্রীনগেন্দ্রবালা মুস্তোফী।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

বামাবোধিনী পত্রিকা। কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ। "বৌদ্ধসন্ন্যাসিনীসম্প্রদায়", "শ্বাসপ্রশ্বাস", "জন্তুদিগের ভোজনপ্রণালী", "আর্য্যজাতি" প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি সুপাঠ্য ও শিক্ষাপ্রদ। অল্পমাত্রায় অধিক প্রবন্ধ না দিয়া, সম্পূর্ণ প্রবন্ধের সংখ্যাবৃদ্ধি করিলে ভাল হয়। "বৈদ্যনাথ কুষ্ঠাশ্রমদর্শন" প্রবন্ধ পড়িয়া কুষ্ঠাশ্রমের উদ্দিষ্ট সাধুব্রতে পাঠকপাঠিকাগণের সহানুভূতি জন্মিলে লেখকের উদ্দেশ্য সফল হইবে। 'বৈদ্যনাথ কুষ্ঠাশ্রমে' সাধারণের সাহায্য ও সহানুভূতি সর্ব্বথা প্রার্থনীয়।

মুকুল। কার্ত্তিক। প্রথমেই "কবিবর হেমচন্দ্র" নামক একটি সচিত্র প্রবন্ধ। চিত্রখানি মন্দ হয় নাই। ইহাতে হেমচন্দ্রের জীবনের কাহিনী বড় অল্প। "অদ্ভুত জুতা" শ্রীযুত অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়ের রচিত একটি কৌতুকাবহ গল্প,—সুখপাঠ্য। "সেকালের কথা"ই এবারকার মুকুলের মানরক্ষা করিয়াছে। এই ধারাবাহিক প্রবন্ধটি যেমন কৌতূহলের উদ্দীপক, তেমনই শিক্ষাপ্রদ। "নিত্যানন্দের উপাখ্যান" শ্রীযুত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের একটি হাস্য-রসাত্মক মিষ্ট কবিতা। অপাত্রে বিন্যস্ত হইয়াছে। মুকুলের মানবক পাঠকেরা ইহার সমস্ত রস আয়ত্ত করিতে পারিবে, বোধ হয় না। "মুকুলে" পূর্ব্বে চুরুট দেখা গিয়াছে; এবার সিদ্ধি; ভবিষ্যতে? "পশুপক্ষীর দুই একটী কথা" চিত্তরঞ্জক।

আলো। কার্ত্তিক। প্রথমেই শ্রীযুত দীনেশচন্দ্র সেনের একটি কবিতা। কানে সুর পঁহুছিল না। "হারুণউলরশীদ" প্রবন্ধটি মন্দ হয় নাই। শ্রীযুত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের

রচিত "মাঘ" আলোচ্য 'আলো'র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ। প্রবন্ধটি আমরা আগ্রহসহকারে পাঠ করিয়াছি। লেখক অনেক অনুসন্ধান করিয়া তাহার ফল এই প্রবন্ধে নিবিষ্ট করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার সঙ্কলিত সকল মতের যাথার্থ্য সর্ব্বত্র স্বীকৃত হইবে, বোধ হয় না; প্রত্নতত্ত্বে তাহার আশাও করা যায় না। মাঘের জন্মভূমি সম্বন্ধে লেখক যে আনুমানিক সিদ্ধান্ত উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা এই;—"মাঘের রচনামধ্যে প্রায়ই সমুদ্র ও পার্ব্বত্যদৃশ্য বর্ণিত হইয়াছে; ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যপূর্ণ সমুদ্রমেখলা পর্ব্বতসমাকুল কোনও প্রদেশ তাঁহার জন্মভূমি। অধিকন্তু তিনি শিশুপালবধ কাব্যের ৩য় ও ৪র্থ সর্গে গিরিনারপর্ব্বত ও সমুদ্র বর্ণনা করিয়াছেন; ইহা হইতে জর্ম্মন পণ্ডিত অধ্যাপক জ্যাকোবি এবং ডাক্তার ক্ল্যাট্ মাঘকে গুজরাটের অধিবাসী বলিতে চাহেন।" কবির কাব্যে দেশবিশেষের বর্ণনামাত্র দেখিয়া তাঁহাকে সেই দেশবিশেষের অধিবাসী বলা যায় না। এরূপ "আন্তর" প্রমাণকে প্রকৃত প্রমাণ বলিয়া গণ্য করা যায় না। লেখকের মতে, মাঘ কবি প্রভাস প্রভৃতি বৈষ্ণব তীর্থের সন্নিহিত শ্রীমাল নগরের অধিবাসী ছিলেন। এই প্রবন্ধে লেখক মাঘ কবির সম্বন্ধে ঐতিহাসিক তত্ত্বের অনুসন্ধান করিয়াছেন। তাঁহার গবেষণা প্রশংসনীয়। পরিশেষে তিনি সংক্ষেপে মাঘের কবিত্বসমালোচনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা অঙ্গহীন ও অসম্পূর্ণ। শ্রীযুত আবদুল করিম, "নূতন মুসলমান বৈষ্ণব কবি" প্রবন্ধে আলিরাজ নামক একজন মুসলমান পদকর্ত্তার পরিচয় দিয়া, তাঁহার রচিত পাঁচটি পদ প্রকাশিত করিয়াছেন। সুরুচির অনুরোধে পদগুলি অঙ্গহীন করিয়া রুচির মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন বটে, কিন্তু প্রাচীন সাহিত্যের দিক হইতে দেখিতে গেলে তাহাতে পদগুলির বিলক্ষণ ক্ষতি হইয়াছে। "বার্ণাডোট" ও "উত্তরবঙ্গে সাঁওতাল উপনিবেশ" দুইটি; সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক প্রবন্ধ।

ভারতী। কার্ত্তিক। "ধ্যানযুতা"—দুটি সনেটে 'পতিবিরহিণী' শকুন্তলার ধ্যানচিত্র। বিশেষত্ব নাই। "বিষবৃক্ষের ফল" একটি ক্ষুদ্র গল্প। আখ্যানবস্তু অসম্ভব। নায়ক চারুর সুরুচি দেখিয়া পাঠক বিস্মিত হইবেন। তাহাকে আহাম্মুক বলিলে অত্যুক্তি হয় না; কিন্তু সে বেচারা আহাম্মুকি না করিলে গল্পটি তাসের বাড়ীর মত এক ফুৎকারেই ভূমিশায়ী হয়। গল্প-সংস্থানে লেখক বিষবৃক্ষের একটি ঘটনার অনুকরণ করিয়াছেন;—বিষবৃক্ষের নগেন্দ্রনাথ বৈষ্ণবী সাজিয়া দত্তবাড়ীর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছিল; এ ক্ষেত্রে নায়ক চারু তাহার আর দুইটি সহচরকে বৈষ্ণবী সাজাইয়া ও স্বয়ং বৈষ্ণবী সাজিয়া নিজের শ্বশুরালয়ের অন্দরে প্রবেশ করিয়াছে। ক্রমবিকাশ ইহাকেই বলে! "গুজরাটী শিল্প ও শিল্পী" প্রবন্ধে লেখক গুজরাটের শিল্প ও শিল্পীর বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। "ঔপনিবেশিকের জীবনসংগ্রাম" প্রবন্ধের বক্তব্য কি, তাহা ভাল বুঝিতে পারিলাম না। কৃত্রিম অলঙ্কারের ছটায়, কষ্টকল্পিত সাধুভাষার ছটায় মূল বিষয় এত আচ্ছন্ন যে, বহু পরিশ্রমেও তাহার সন্ধানলাভ দুর্ঘট। "পসারিণী" একটি সৌখীন কবিতা। ইহার ভাষার সৌন্দর্য্য প্রশংসনীয়, কিন্তু সমগ্র কবিতাটির উদ্দেশ্য বা অভিধেয় কি, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। "মনস্তত্ত্বজ্ঞানের নূতন প্রণালী" উল্লেখযোগ্য। "বঙ্কিম বাবুর কাজির বিচার" কৌতুকাবহ। "যদি" কবিতার কবি বলিতেছেন,—

"আমি যদি হইতাম আকুল ভ্রমর, তুমি হ'তে ফুল্ল পুষ্পরাশি,
শূন্য করি সুধাসিক্ত ও চারু অধর, সব মধু লইতাম টানি।"

এই উক্তির সহিত পুষ্প নায়িকা ও ভ্রমর কবি ভিন্ন আর কাহারও কোনও সম্পর্ক নাই। তবে কবি জগতের হাটে এ হাঁড়ি ভাঙ্গিলেন কেন? বঙ্গসাহিত্যের গীতিকবিতায় আজকাল

শারীরিক তৃষ্ণা বড় প্রবল; সাহিত্যের পক্ষে তাহা শঙ্কাজনক, এবং জাতীয় কবিতার অন্তঃসারশূন্যতার পরিচায়ক। সৌখীন কবিদের শব্দসর্ব্বস্ব চর্ব্বিত-চর্ব্বণে সৌখীনতা বরং সহনীয়, কিন্তু কলুষতা কখনই মার্জ্জনীয় হইতে পারে না।

নব্যভারত। কার্ত্তিক। "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত" সুপাঠ্য ও শিক্ষাপ্রদ। শ্রীযুক্ত বিজয়-চন্দ্র মজুমদারের "বংশীগোপাল" একটি সুখপাঠ্য গাথা। "এ অযথা বৈষম্য কেন?" ইতিশীর্ষক প্রবন্ধে, শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র সেন বলেন, স্ত্রী ও পুরুষের ব্যভিচারের বিচারে এ দেশে অযথা বৈষম্য আছে। পুরুষের ব্যভিচার অপেক্ষা স্ত্রীর ব্যভিচার এ দেশে অধিক গুরুতর বলিয়া পরিগণিত হয়। 'ধর্ম্ম, নীতি এবং পাপ, পুণ্য সম্বন্ধেও বৈষম্য কল্পনা সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক।' সুতরাং তাহা পরিহার্য্য। লেখক মানবধর্ম্মশাস্ত্রকে আক্রমণ করিয়া ধীরবুদ্ধির পরিচয় দেন নাই। জাতিবিশেষের পুরাতন ধর্ম্মশাস্ত্রে যে সকল বিধি দেখা যায়, ঊনবিংশ শতাব্দীর তুলাদণ্ডে তাহার ওজোন হইতে পারে না। সমাজের প্রয়োজন-অনুসারে সামাজিক নিষেধ ও বিধির উৎপত্তি হয়। কি অবস্থায়, কি জন্য, কোন কালে, কিরূপ সমাজের জন্য তাহার ব্যবস্থা হইয়াছিল, তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান না করিয়া সহসা মনুর বেত্রদণ্ডের ব্যবস্থা করিলে, তাহা অসঙ্গত মনে করিবার কারণ আছে। স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে কেবল যে ব্যভিচারবিষয়েই বৈষম্য আছে, এমন নহে। একটি প্রধান বৈষম্যের ভিত্তির উপর যেমন অন্যান্য অবান্তর বৈষম্য প্রতিষ্ঠিত, ব্যভিচারবিষয়ক বৈষম্যও সেই সাধারণ মূল বৈষম্যের আর একটি ফল। সেই মূল কারণের বিলোপ না ঘটিলে, তাহার কার্য্য বা ফলের বিলোপ সম্ভব নহে। স্ত্রীর উপর স্বামীর স্বামিত্ব আছে, এই মূল সংস্কার হইতে যে বৈষম্যের উদ্ভব, সেই বৈষম্য হইতেই স্ত্রীর ব্যভিচার সম্বন্ধে এই বৈষম্যের উৎপত্তি। লেখক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে এই সকল মূল প্রসঙ্গের আলোচনা না করিয়া অবান্তরভাবে হৃদয়ের উচ্ছ্বাস ও নিজের কল্পনা ভাষাবদ্ধ করিয়াছেন। এরূপ বিষয়ের আলোচনায় হৃদয়ের উচ্ছ্বাস অপেক্ষা যুক্তি ও প্রমাণের যে অধিক আবশ্যক, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র।

স্বাস্থ্য। কার্ত্তিক। সর্ব্বসাধারণের উপযোগী ও উপকারী এই মাসিকপত্রখানি, নিয়মিতরূপে প্রকাশিত ও সুচারুরূপে সম্পাদিত হইতেছে। "স্বাস্থ্যপ্রসঙ্গে" অনেক জ্ঞাতব্য বিষয়ের সমাবেশ আছে। "দৌর্ব্বল্য", গৃহচিকিৎসা", "ম্যালেরিয়ার প্রকোপ প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি সুলিখিত ও শিক্ষাপ্রদ। প্রত্যেক গৃহস্থের গৃহে "স্বাস্থ্য" বিরাজ করুক, এই আমাদের আন্তরিক কামনা।

পুণ্য। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ। "যজ্ঞ ও অগ্নি" প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর বৈদিক যুগের যজ্ঞ ও অগ্নিদেবতার ইতিহাস সঙ্কলন করিতেছেন। এই প্রবন্ধে গ্রীসীয় অগ্নিদেব ভাস্কন বা ভার্গবের একখানি সুন্দর ক্রমোলিথো ছবি প্রদত্ত হইয়াছে। "ব্রাহ্মসমাজ ও স্ত্রী-শিক্ষা" প্রবন্ধের প্রারম্ভে শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিতেছেন, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ব্রাহ্মসমাজের অধীনস্থ ছিল। আমরা জানিতাম, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা তত্ত্ববোধিনী সভার পত্র ছিল; ব্রাহ্মসমাজের সহিত প্রথমে তাহার সংস্রব ছিল না। কেহ যদি তত্ত্ববোধিনীর ইতিহাস সংগ্রহ করেন, তাহা হইলে ভাল হয়। "ক্রমোলিথোগ্রাফী প্রবন্ধটি" পড়িয়া এই শ্রেণীর চিত্র-মুদ্রণের প্রণালী মোটামুটি জানা যায়।

ঋষি। নভেম্বর। "দ্রব্যগুণবিচার" বেশ হইতেছে। পড়িয়া সাধারণ পাঠকগণ উপকৃত হইবেন। লেখক কমলা লেবুর নামান্তর নাগরঙ্গ শব্দের বিষয়ে যে আলোচনা করিয়াছেন, কিছু দিন পূর্ব্বে শ্রীযুত ঋতেন্দ্র নাথ ঠাকুরের রচিত একটি প্রবন্ধে তাহা পড়িয়াছিলাম, মনে হইতেছে।
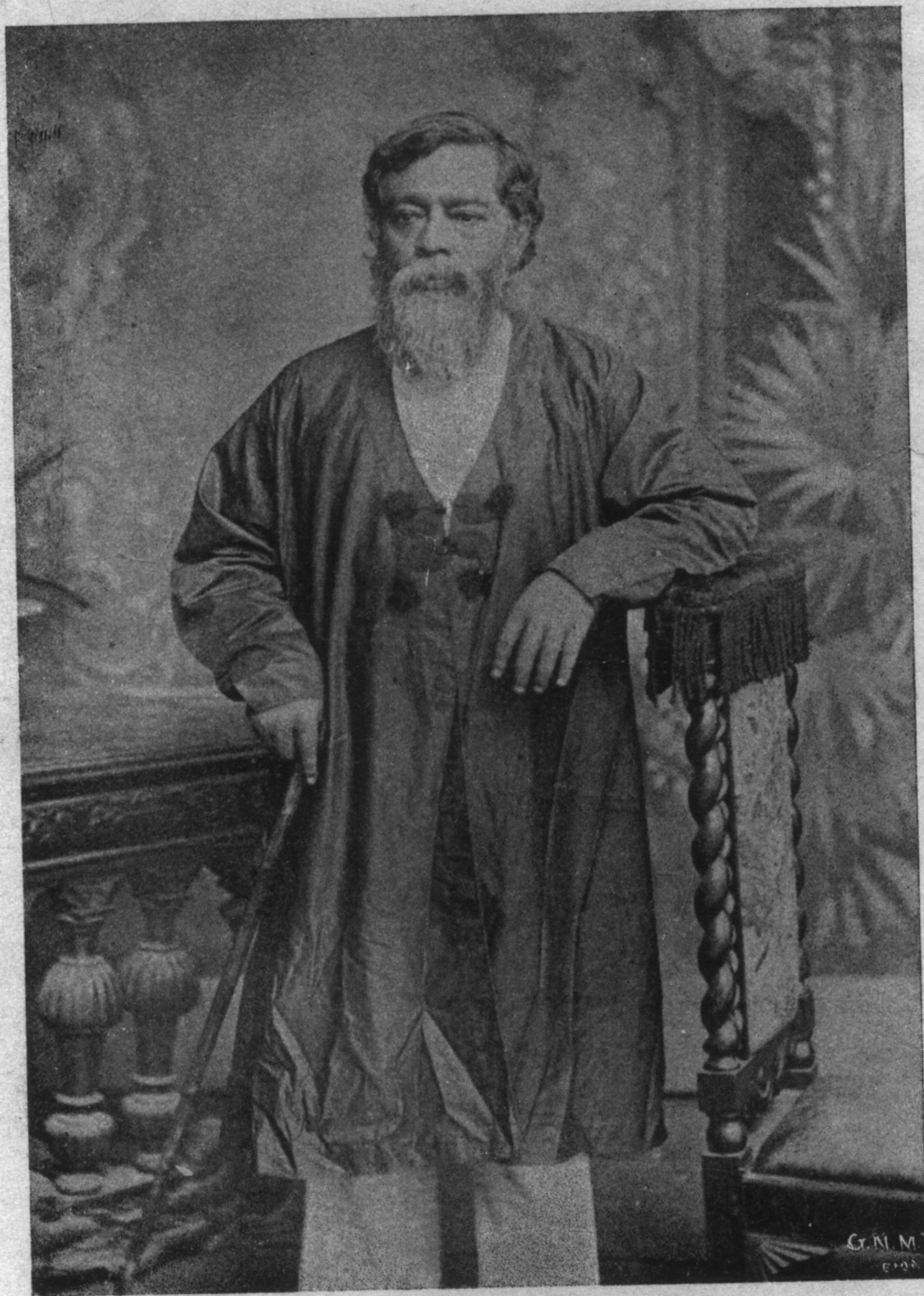
শ্রীচন্দ্রনাথ বসু।

The Cherry Press.

সাবিত্রীর পাতিব্রত্য।

2/9/1900

মহাভারতকার সাবিত্রীর কথা পতিব্রতার কথাস্বরূপ কহিয়াছেন।

অস্তি সীমন্তিনী কাচিদ্দৃষ্টপূর্ব্বাথবা শ্রুতা।
পতিব্রতা মহাভাগা যথেয়ং দ্রুপদাত্মজা॥

অর্থাৎ—এই দ্রুপদ-দুহিতার ন্যায় পতিব্রতা ও মহাভাগা অন্য কোন সীমন্তিনীকে আপনি কি পূর্ব্বে আর কখন দর্শন বা শ্রবণ করিয়াছেন?*

সুতরাং সাবিত্রীর কথা পাতিব্রত্যের উদাহরণ। পাতিব্রত্য বলিতে কি বুঝায়?

হিন্দুপত্নীর গুণবর্ণনায় তিনটি শব্দের ব্যবহার হইয়া থাকে—সতীত্ব, পতিপ্রেম, পাতিব্রত্য। তিনটি শব্দ একার্থবোধক নয়। যে স্ত্রী পতি ভিন্ন অন্য পুরুষের সহিত সম্ভোগেচ্ছা করেন না, তিনি সতী। সতী স্ত্রী বলিতে সাধারণতঃ এইরূপ স্ত্রীই বুঝায়। যে স্ত্রী পতিকে ভালবাসেন, তিনি পতি-প্রেমিকা। পতিপ্রেমিকাও সতী, কারণ পতিকে ভালবাসিলে, মনে পরপুরুষসম্ভোগের স্পৃহা জন্মিতে পারে না। পরপুরুষে স্পৃহাহীন অথচ পতিকে ভালবাসেন না, এমন অনেক স্ত্রী দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু পতিকে ভালবাসেন, অথচ পরপুরুষপ্রিয়, এমন স্ত্রী নাই। সতী পতিপ্রেমিকা না হইতেও পারেন, কিন্তু পতিপ্রেমিকা সতী হইবেনই। সতীত্ব পতিপ্রেমের অন্তর্নিবিষ্ট, কিন্তু পতিপ্রেম সতীত্বের অন্তর্নিবিষ্ট নয়। পতিপ্রেমে যেমন সতীত্বও বুঝায়, পাতিব্রত্যে তেমনি সতীত্ব, পতিপ্রেম এবং আরো কিছু বুঝায়। পাতিব্রত্যের অর্থ পতিব্রতার ধর্ম্ম। যে স্ত্রী পতিকে আপন ব্রতস্বরূপ করেন, অর্থাৎ পতির সেবা, পতির প্রিয়সাধন, পতির অনুসরণ, পতির সহিত ধর্ম্মচর্য্যা শাস্ত্রবিহিত ব্রতপালনের ন্যায় জ্ঞান করিয়া তদুদ্দেশ্যে দৃঢ়সঙ্কল্পা হইয়া জীবনোৎসর্গ করেন, তিনিই পতিব্রতা। পতিপ্রেমের অর্থ পতির প্রতি ভালবাসা। ভালবাসা হৃদয়ের একটি ভাবমাত্র। উহাতে কার্য্য বুঝায় না। পাতিব্রত্য কার্য্যসাপেক্ষ। বিনা কার্য্যে পাতিব্রত্যের পরিচয় নাই। পাতিব্রত্য পতিপ্রেমমূলক সন্দেহ নাই। যেখানে পতিপ্রেম নাই, সেখানে পাতিব্রত্যও নাই। কিন্তু যেখানে পতিপ্রেম আছে, সেখানে পাতিব্রত্য থাকিবেই, এমন কথা বলিতে

* সংস্কৃত শ্লোকের বঙ্গানুবাদ বর্দ্ধমানের অনুবাদ হইতে গৃহীত হইল।

[illegible] না। পাতিব্রত্যে পতিপ্রেম আছে, এবং আর একটি জিনিস আছে—পত্নীর পারলৌকিক মঙ্গলসাধনের একমাত্র উপায় পতি, এই জ্ঞানই সেই জিনিস।

> নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথক্ যজ্ঞো ন ব্রতং নাপ্যুপোষিতং।
> পতিং শুশ্রূষতে যেন তেন স্বর্গে মহীয়তে॥—মনু, ৫ অধ্যায়, ১৫৫।

অর্থাৎ—স্ত্রীলোকদিগের স্বামী ব্যতীত যজ্ঞ নাই, স্বামীর অনুমতি ভিন্ন ব্রত নাই, উপবাস নাই, কেবল স্বামীর সেবা দ্বারাই স্ত্রী স্বর্গলোকে গমন করে।

এ জ্ঞানের মূল ধর্ম্মে। পত্নীর ধর্ম্মসাধনের একমাত্র উপায় পতি, এ শিক্ষা ও ব্যবস্থা অন্য কোন ধর্ম্মে নাই, কেবল হিন্দুধর্ম্মে আছে। হিন্দুনারীর পাতিব্রত্যের ভিত্তি পতিপ্রেমে এবং ধর্ম্মে বা আধ্যাত্মিকতায়। হিন্দুনারীর পাতিব্রত্যের অনুরূপ জিনিস অন্য কোন নারীতে নাই, থাকিতে পারেও না। হিন্দুনারীর পাতিব্রত্য, পার্থিব ভাব এবং আধ্যাত্মিক ভাবের অপূর্ব্ব এবং অত্যাশ্চর্য্য সম্মিলন ও সংমিশ্রণ। পতির সম্বন্ধে ঐ দুই ভাবের সম্মিলন ও সংমিশ্রণ, অন্য কোন নারীতে নাই। সতীত্ব, পতিপ্রেম, পাতিব্রত্য—এই তিনটি শব্দের মধ্যে প্রথমটির অর্থ সঙ্কীর্ণতম, দ্বিতীয়টির অর্থ তদপেক্ষা প্রশস্ত, এবং তৃতীয়টির অর্থ প্রশস্ততম। সতীত্ব নারীর মহৎ গুণ, পতিপ্রেম তাঁহার মহত্তর গুণ, পাতিব্রত্য তাঁহার মহত্তম গুণ। পাতিব্রত্যে সতীত্ব এবং পতিপ্রেম ত আছেই, তাহা ছাড়া আরো কিছু আছে। সাবিত্রী পতিব্রতা। তাঁহার সতীত্বের প্রকৃতি দেখুন।

সতীত্বের সাধারণ অর্থ, পতি ভিন্ন অন্য পুরুষে আসক্তি, অনুরাগ বা স্পৃহার অভাব। সাবিত্রীর সতীত্ব ইহা অপেক্ষাও কঠোরতর। তাঁহার যখন বিবাহও হয় নাই, তিনি যখন কাহারও পত্নী হন নাই, তখনও তিনি সতীত্বের যে পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা যথার্থই অলোকসামান্য। পিতার আদেশে সত্যবানকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করিয়া আসিলে পর, তাঁহার পিতা যখন তাঁহাকে অন্য বর অন্বেষণ করিতে বলিলেন, তখন তিনি দৃঢ়তাসহকারে উত্তর করিয়াছিলেন,—

> দীর্ঘায়ুরথবাল্পায়ুঃ সগুণো নির্গুণোঽপি বা।
> সকৃদ্বৃতো ময়া ভর্ত্তা ন দ্বিতীয়ং বৃণোম্যহম্॥
> মনসা নিশ্চয়ং কৃত্বা ততো বাচাভিধীয়তে।
> ক্রিয়তে কর্ম্মণা পশ্চাৎ প্রমাণং মে মনস্ততঃ॥

অর্থাৎ—আমি একবার যাঁহারে পতি বলিয়া বরণ করিয়াছি, তিনি দীর্ঘায়ু হউন বা অল্পায়ুই হউন, গুণবান হউন বা নির্গুণই হউন, তাঁহা ভিন্ন আমি

পর ব্যক্তিকে আর বরণ করিতে পারিব না। দেখুন, মনে মনে কোন বিষয় নিশ্চয় করিয়া পরে বাক্য দ্বারা ব্যক্ত করে, এবং পরিশেষে কর্ম্ম দ্বারা তাহার অনুষ্ঠান করিয়া থাকে; অতএব, উপস্থিত বিষয়ে আমার মনই প্রমাণ।

প্রকৃত কথাও তাই। পরের দ্রব্য বিনানুমতিতে গ্রহণ করিলেই যে চুরি করা হয় তাহা নহে, বিনানুমতিতে গ্রহণ করিবার ইচ্ছা করিলেই চুরি করা হয়। পাপের উৎপত্তি মনে, মনে পাপচিন্তার উদয় হইলেই পাপ করা হয়; পাপের অনুষ্ঠান না করিলে পাপ করা হয় না, এমন নহে। যে নারী পরপুরুষ সম্ভোগ করেন না, কিন্তু পরপুরুষসম্ভোগের অভিলাষিণী, তিনি অসতী। পাপ মনে, অনুষ্ঠানে নয়। সকল শাস্ত্রেরই এই কথা। খৃষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখিত আছে, "whosoever looketh on a woman to lust after her hath committed adultery with her already in his heart" (মেথিউ—৫, ২৮)। ইহা পুরুষ সম্বন্ধে কথা বটে। কিন্তু স্ত্রীলোক সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। এরূপ নীতি স্ত্রীপুরুষ উভয়ের সম্বন্ধেই এক, ভিন্ন নয়। যে নারী পতি ভিন্ন অন্য পুরুষের অভিলাষিণী, তিনি সতী নহেন, অসতী। তিনি বিবাহিতা, বিবাহসূত্রে পতিলাভ করিয়াছেন, এক জনের পত্নী হইয়াছেন, সুতরাং অন্য পুরুষের কল্পনা করিলে তিনি ত অসতী হইবেনই। কিন্তু সাবিত্রী যখন পিতার আদেশে অন্য বর অন্বেষণ করিতে অস্বীকার করেন, তখন তাঁহার বিবাহ হয় নাই, বিবাহসূত্রে সত্যবান তাঁহার পতি হয়েন নাই, কেবল মনে করিয়াছেন—সত্যবান আমার পতি। তথাপি তিনি সত্যবান ভিন্ন অপর ব্যক্তিকে পতিরূপে গ্রহণ করা নীতিধর্ম্মবিরুদ্ধ পাপাচরণ মনে করিলেন। মনই যদি পাপের হেতু হয়, পাপের অনুষ্ঠান না হইলেও, অর্থাৎ পাপকার্য্য কৃত না হইলেও, যদি পাপ হইতে পারে, তাহা হইলে সাবিত্রী যাহা মনে করিয়াছিলেন, সাবিত্রী যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই ঠিক। কিন্তু এত দূর কে মনে করে, এমন কথা কয় জনে বলে? যে সকল সমাজে অধিক বয়সে স্ত্রীলোকের বিবাহ হয়, তথায় বিবাহের পূর্ব্বে অনেক রমণী যে এক বা একাধিক পুরুষের অভিলাষিণী হইয়া থাকেন, তদ্বিষয়ে, বোধ হয়, সন্দেহ হইতে পারে না। সেই সকল সমাজের সাহিত্যে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু বোধ হয় যে তথায় কোন রমণী কোন পুরুষের অভিলাষিণী হইবার পর অন্য পুরুষকে পতিরূপে গ্রহণ করা পাপ মনে করেন না। কিন্তু পাপ যে তাঁহাদের হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাই বলিতেছি, সাবিত্রী যে সতীত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা যথার্থই অসাধারণ সতীত্ব, অলোকসামান্য

সতীত্ব ; বোধ হয় ভারত ভিন্ন অপর সর্ব্বত্র অননুষ্ঠেয়, কল্পনাতীত সতীত্ব সাবিত্রীর সতীত্বের তুলনা নাই। অমন কঠোর, অমন বিশুদ্ধ সতীত্ব তাঁহাতেই দেখিতে পাওয়া যায়, আর বোধ হয় তিনি যে রমণীকুলের সম্রাজ্ঞী, যে রমণীকুল পতিভাগ্যে ভাগ্যবতী হইবার আশায় ও আকাঙ্ক্ষায় তাঁহারই ব্রত উদ্‌যাপন করে, তাহাদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যাইতে পারে।

পতিপ্রেম ব্যতীত পাতিব্রত্য অসম্ভব। কিন্তু মহাভারতে সাবিত্রীকে প্রেমিকারূপে দেখিতে পাওয়া যায় না। সাবিত্রী সত্যবানকে আপন প্রেমের গভীরতার কথা বলিতেছেন, প্রেমোচ্ছ্বাসে পাগল করিয়া দিতেছেন, দীর্ঘ-নিশ্বাসে দগ্ধ করিয়া ফেলিতেছেন, আলিঙ্গনের আতিশয্যে নিপীড়িত করিতে-ছেন, সাবিত্রীর-উপাখ্যানে মহাভারতের মহাকবি এরূপ কিছুই লেখেন নাই। ফল কথা, মহাভারতের মহাকবি যে জাতীয় কবি, তাঁহাদের অনেকেই ওরকম করিয়া প্রেমবর্ণনা করেন নাই। ওরূপ প্রেমবর্ণনা যেন তাঁহাদের অননু-মোদিত ছিল, অসার অপ্রকৃত জ্ঞানে পরিত্যক্ত হইয়াছিল। বাল্মীকির মহাগ্রন্থ পড়িতে পড়িতে সীতার পতিপ্রেম দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়, বিস্মিত হইতে হয়। কিন্তু অত বড় গ্রন্থখানার মধ্যে কোথাও দেখি না, সীতা রামচন্দ্রকে আপন প্রেম-বিহ্বলতার কথা বলিতেছেন, প্রেমাশ্রুতে রামচন্দ্রের বিশাল বক্ষ ভাসাইয়া দিতেছেন, রামচন্দ্রের প্রেমবিস্ফারিত নয়নে আপন প্রেমবিস্ফারিত নয়ন মিলাইয়া বিশ্বের আদর্শ প্রেমিকার ন্যায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভুলিয়া বসিয়া আছেন, রামচন্দ্রের আলিঙ্গনে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছেন, আর রামচন্দ্র তাঁহার ব্রীড়াবনত মুখখানিতে চুম্বনবৃষ্টি করিতেছেন। রামায়ণ প্রেমকাব্য নয়, তাহাতে প্রেমের এরূপ বর্ণনা না থাকিতেও পারে। কিন্তু অভিজ্ঞানশকুন্তল প্রেমকাব্য— পৃথিবীর প্রেমকাব্যের মধ্যে একখানি শ্রেষ্ঠতম। কিন্তু অভিজ্ঞান-শকুন্তলের মহাকবির প্রেমবর্ণনাও এ প্রণালীর নহে। গভীর প্রেমে চঞ্চলতা নাই, বাচালতা নাই, অধৈর্য্য অস্থিরতা নাই—গভীর প্রেমে সহজে ঢেউ উঠে না, উহা অগাধ সলিলরাশির ন্যায় স্থির গম্ভীর। গভীর প্রেম উগ্র, উৎকট, উত্তপ্ত নয়। উহা স্নিগ্ধ, প্রশান্ত, সুশীতল। প্রাচীন আর্য্য কবিদিগের কাব্যে প্রেমের এই মূর্ত্তিই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। তখন-কার পতি-পত্নীর প্রেম এই প্রকৃতির হইলেও, তাঁহাদের মধ্যে যে হাস্যপরিহাস, রঙ্গরসাদি হইত না, এমন নহে। হইত বৈ কি। কিন্তু মহাকবিরা প্রেমের সেরূপ খেলাকে প্রেমের সারাংশ মনে করিতেন না। প্রেমের সেরূপ খেলাকে

তাঁহারা লুকাইয়া রাখিতেন। প্রেমের যে খেলা লোকচক্ষুর অন্তরালে হইয়া থাকে, সে খেলা লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখাই তাঁহারা মহাপ্রকৃতির নিয়ম-সঙ্গত মনে করিতেন। শকুন্তলাকে বিবাহ করিয়া দুষ্মন্ত দিনকতক মহর্ষি কণ্বের আশ্রমে ছিলেন। তাহার পর রাজধানীতে প্রত্যাগমন করেন। কিছু-দিন পরে শকুন্তলা তাঁহার নিকট আসিলেন, কিন্তু তিনি শকুন্তলাকে চিনিতে পারিলেন না এবং আপন পরিণীতা পত্নী বলিয়া স্বীকার করিলেন না। শকুন্তলা বিভ্রাটে পড়িয়া পতিকে পূর্ব্বকথা স্মরণ করাইয়া দিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার সেই আশ্রমবাসসময়ের একটি ঘটনার উল্লেখ করিলেন। তিনি বলিলেন,—এক-দিন আমরা উভয়ে নবমল্লিকা-মণ্ডপে বসিয়াছিলাম, আপনার হস্তে পদ্মপত্রের ঠোঙায় জল ছিল, তৎকালে আমার কৃত্রিমপুত্র দীর্ঘাপাঙ্গ নামে সেই হরিণশিশু আসিয়া উপস্থিত হইল। এই তবে অগ্রে জলপান করুক, ইহা বলিয়া আপনি স্নেহভরে তাহাকে নিকটে ডাকিলেন, কিন্তু সে অচেনা বলিয়া আপনার নিকট আসিল না। অনন্তর সেই জল আমি গ্রহণ করিলে, সে আসিয়া পান করিল। আপনি তাহাতে উপহাস করিয়া বলিলেন, সকলেই স্বজনে বিশ্বাস করে, তোমরা দুই জনেই জঙ্গলা কি না।

মহাকবি কিন্তু আমাদিগকে এ দৃশ্য দেখান নাই। পূর্ব্বকথা স্মরণ করাইয়া দিবার নিমিত্ত বাধ্য হইয়া শকুন্তলা স্বয়ং এই কথা না বলিলে আমরা ইহার কিছুই জানিতে পারিতাম না। মহাভারতের মহাকবিও লিখিয়াছেন, সাবিত্রী—

......প্রিয়বাদেন নৈপুণ্যেন শমেন চ।
রহশ্চৈবোপচারেণ ভর্ত্তারং পর্য্যতোষয়ৎ ॥

অর্থাৎ—প্রিয় সম্ভাষণ, নিপুণতা, শান্তি ও নির্জ্জনে পরিচর্য্যা দ্বারা ভর্ত্তাকে পরিতুষ্ট করিতে লাগিলেন।

কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত—আর নয়। গভীর প্রেমের প্রকৃতিও তাই। গভীর প্রেমের লঘু খেলা স্বভাবতই কম, এবং গোপনেই খেলান হয়। মহাকবিরা প্রেমের গভীরতাদি চিত্রিত করিবার নিমিত্ত ওরূপ খেলার বর্ণনা আবশ্যক মনে করিতেন না, অসমীচীন, অস্বাভাবিক ও শিষ্টতাবিরুদ্ধ বিবেচনা করি-তেন। ওরূপ খেলা না দেখাইয়াও তাঁহারা প্রেমের যে সকল চিত্র অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন, মানব সাহিত্যে তাহা অতুলনীয় হইয়া রহিয়াছে। মহাভারতের মহাকবি সাবিত্রীর পতিপ্রেমের কি অপূর্ব্ব চিত্র চিত্রিত করিয়াছেন, দেখুন।

পতির বিধাতৃবিহিত মৃত্যু নিবারণ করিবেন সঙ্কল্প করিয়া সাবিত্রী ব্রতাব-

লম্বিনী হইয়া তিন দিন অনশনে থাকিয়া পতির সহিত মহারণ্যে গমন করিলেন। তথায় পতিপ্রাণার কোলে শুইয়াই পতি মহানিদ্রায় অভিভূত হইলেন। স্বয়ং যম মৃত পতিকে লইতে আসিলেন। পতিব্রতা অমানুষিক চেষ্টায় পতিকে যমের হস্ত হইতে উদ্ধার করিলেন। তখন তাঁহার অনশনক্লিষ্ট দেহে ক্লান্তি আসিল, প্রতিজ্ঞাজনিত নির্ভীকতা চলিয়া গেল, মহারণ্যের ভীষণতা দেখিয়া তিনি ভীতা হইয়া পড়িলেন।

নক্তঞ্চরাশ্চরন্ত্যেতে হৃষ্টাঃ ক্রূরাভিভাষিণঃ।
শ্রূয়ন্তে পর্ণশব্দাশ্চ মৃগাণাঞ্চরতাং বনে॥
এতান্ ঘোরান্ শিবানাদান্ দিশং দক্ষিণপশ্চিমাম্।
আস্থায় বিরুবন্ত্যুগ্রাঃ কম্পয়ন্তো মনো মম॥

অর্থাৎ—এই নিষ্ঠুরনিনাদকারী নিশাচর সমস্ত হৃষ্টচিত্ত হইয়া বিচরণ করিতেছে এবং বনচারী মৃগ সকলের পদসঞ্চারে পত্রশব্দ সমস্ত শ্রুত হইতেছে। উগ্রমূর্ত্তি শিবা সকল দক্ষিণ পশ্চিম দিক্ আশ্রয় করিয়া এই ঘোর নিনাদ সমস্ত বিস্তার করিতেছে; ইহাতে আমার মন যে কম্পিত হইতেছে।

ভীতা হইয়া সাবিত্রী পতিকে বলিলেন;—

অস্মিন্নদ্য বনে দগ্ধে শুষ্কবৃক্ষঃ স্থিতো জ্বলন্।
বায়ুনা ধম্যমানোঽত্র দৃশ্যতেঽগ্নিঃ কচিৎ কচিৎ॥
ততোঽগ্নিমানয়িত্বেহ জ্বালয়িষ্যামি সর্ব্বতঃ।
কাষ্ঠানীমানি সন্তীহ জহি সন্তাপমাত্মনঃ॥
যদি নোৎসহসে গন্তুং সরুজং ত্বাং হি লক্ষয়ে।
ন চ জ্ঞাস্যসি পন্থানং তমসা সংবৃতে বনে॥
শ্বঃ প্রভাতে বনে দৃশ্যে যাস্যাবোঽনুমতে তব।
বসাবেহ ক্ষপামেকাং রুচিতং যদি তেঽনঘ॥

অর্থাৎ—হে অনঘ! আপনাকে কিঞ্চিৎ ব্যথিত দেখিতেছি; বিশেষতঃ অন্ধকারে বন আচ্ছন্ন হওয়াতে আপনি পথ জানিতে পারিবেন না; অতএব যদি গমন করিতে উৎসাহ না করেন, তবে কল্য প্রভাতে বন দৃষ্ট হইলে আপনকার অনুমতিক্রমে উভয়ে গমন করিব; সংপ্রতি আপনকার ইচ্ছা হইলে একরাত্রি এই স্থানেই বাস করি। অদ্য এই বন দগ্ধ হওয়াতে একটা শুষ্কবৃক্ষ জ্বলন্ত অবস্থায় রহিয়াছে; উহার কোন কোন স্থানে অগ্নি বায়ু দ্বারা দীপ্যমান হইয়া দৃষ্ট হইতেছে। আমি ঐ বৃক্ষ হইতে অগ্নি আনিয়া সর্ব্বদিকে প্রজ্বালিত করিব; এখানে এই কাষ্ঠ সমস্ত রহিয়াছে; অতএব আপনার সন্তাপ দূর করুন।

সত্যবানের প্রাণ কিন্তু তখন পিতামাতার নিমিত্ত আকুল হইয়া উঠিয়াছে। তিনি পতিব্রতাকে বলিলেন, "সন্ধ্যা না হইতেই মাতা আমারে রুদ্ধ করিয়া রাখেন, আমি দিবসে বহির্গত হইলেও আমার জনক-জননী সন্তাপ করেন, আমার পিতা আশ্রমবাসীদিগের সঙ্গে আমারে অন্বেষণ করিতে থাকেন। * * * * * হে সাবিত্রী! আমার মাতা ও পিতা উভয়েই বৃদ্ধ; আমি একমাত্র তাঁহাদের যষ্টিস্বরূপ রহিয়াছি; অতএব রাত্রিকালে আমারে না দেখিলে তাঁহারা কি অবস্থা প্রাপ্ত হইবেন।" এই সকল কথা বলিয়া সত্যবান "বাহুদ্বয় উত্তোলন পূর্ব্বক দুঃখার্ত্ত হইয়া সশব্দে রোদন করিতে লাগিলেন।" কিন্তু সাবিত্রী ধর্ম্মরূপিণী, স্বামীর অশ্রু মুছাইয়া তখনও বলিলেন—

যদি মেঽস্তি তপস্তপ্তং যদি দত্তং হুতং যদি।
শ্বশ্রূশ্বশুরভর্ত্তৃণাং মম পুণ্যাস্তু শর্ব্বরী॥
ন স্মরাম্যুক্তপূর্ব্বাং বৈ স্বৈরেষপ্যনৃতাং গিরম্।
তেন সত্যেন তাবদ্য ধ্রিয়েতাং শ্বশুরৌ মম॥

অর্থাৎ—যদি আমার তপস্যা দান বা হোম করা থাকে, তাহা হইলে আমার শ্বশ্রূ,শ্বশুর ও স্বামীর পক্ষে এই শর্ব্বরী কল্যাণকরী হউক। পূর্ব্বে আমি পরিহাসস্থলেও কখন মিথ্যা কথা বলিয়াছি, এরূপ স্মরণ হয় না; সেই সত্য দ্বারা আমার শ্বশ্রূ ও শ্বশুর অদ্য জীবিত থাকুন।

ধর্ম্মরূপিণীর ধর্ম্মবলে এমনি বিশ্বাস; অধিকন্তু যমের নিকট শ্বশুর শ্বশ্রূর নিমিত্ত যেরূপ বরলাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি ধ্রুব জানিতেন যে, পতি সে রাত্রে পিতামাতার নিকট প্রত্যাগমন না করিলেও তাঁহাদের অনিষ্ট বা অমঙ্গল ঘটিবে না। কিন্তু পতি যখন পুনরায় বলিলেন—

কাময়ে দর্শনং পিত্রোর্যাহি সাবিত্রী মা চিরম্।
পুরা মাতুঃ পিতুর্ব্বাপি যদি পশ্যামি বিপ্রিয়ম্।
ন জীবিষ্যে বরারোহে সত্যেনাত্মানমালভে॥
যদি ধর্ম্মে চ তে বুদ্ধির্মাঞ্চেজ্জীবন্তমিচ্ছসি।
মম প্রিয়ং বা কর্ত্তব্যং গচ্ছাবাশ্রমমান্তিকাৎ॥

অর্থাৎ—সাবিত্রী! আমি জনক-জননীর দর্শন কামনা করিতেছি; অতএব চল আর বিলম্ব করিও না। হে বরারোহে! আমি আত্মস্পর্শপূর্ব্বক শপথ করিতেছি, যদি মাতা বা পিতার অমঙ্গল ঘটনা দেখি, তবে কোন ক্রমে জীবন ধারণ করিব না। অতএব যদি ধর্ম্মে তোমার মতি থাকে, যদি আমাকে জীবিত

রাখিতে অভিলাষিণী হও, অথবা আমার প্রিয় কার্য্য করা তোমার যদি কর্ত্তব্য হয়, তবে চল অবিলম্বে আশ্রমে গমন করি।

আপন প্রাণের আশঙ্কার কথা বলিয়া এবং পত্নীর ধর্ম্মের নাম করিয়া সত্যবান যেমন সাবিত্রীর পতিপ্রেম ও পাতিব্রত্য দুইয়ের প্রতি একটু কটাক্ষ করিলেন, অমনি বৎসরব্যাপী চিন্তায় জর্জ্জরিতা, তিন দিনের অনশনক্লিষ্টা*, কাষ্ঠপুত্তলিকারূপে পরিণতা সাবিত্রী উঠিয়া আলুলায়িত কেশরাশি বন্ধন করিয়া স্বামীকে দুই হাতে ধরিয়া উঠাইলেন, এবং স্বামীর বাম হস্ত আপন বামস্কন্ধোপরি স্থাপিত করিয়া 'দক্ষিণ স্কন্ধ দ্বারা তাঁহারে আলিঙ্গন করিয়া' ভীতি ক্লান্তি সমস্ত ঝাড়িয়া ফেলিয়া, সেই নিবিড়তিমিরাচ্ছন্ন হিংস্রজন্তুসমাকুল নিবিড় অরণ্য ভেদ করিয়া রাত্রিমধ্যেই পতিকে শ্বশুর শ্বশ্রূর নিকট লইয়া গেলেন। জগতে পতিপ্রেম ও পাতিব্রত্যের অপূর্ব্ব চিত্র রহিয়া গেল।

আমাদের মহাকবিরা এই রকম করিয়াই প্রেম চিত্রিত করেন। সে সকল চিত্রও হৃদয়ের অন্তস্তলে গিয়া অঙ্কিত হইয়া পড়ে। এখনকার কবিনামপ্রাপ্ত অনেক বাঙ্গালী লেখকের প্রেমচিত্র অন্যরূপ দেখা যায়। সে চিত্রে প্রেমিক প্রেমিকার প্রেমের আস্ফালন, আড়ম্বর, বক্তৃতা, গবেষণা, হাহুতাশ, দীর্ঘনিশ্বাস, চুম্বন ও আলিঙ্গন ভিন্ন আর বড় একটা কিছু থাকে না। প্রেমের কার্য্যাদি যাহা বর্ণিত হয়, তাহাও যেন প্রেমের অভিনয়বৎ, মাত্রায় বড় বেশী চড়া, প্রকৃতিতে নিতান্ত অস্বাভাবিক। তাঁহারা প্রকৃত প্রেমের সহিত অপরিচিত, প্রেমতত্ত্বে অনভিজ্ঞ, তাই তাঁহাদের প্রেমচিত্র এত বিকৃত, বিসদৃশ, অপ্রকৃত ও লঘুত্বপূর্ণ হইয়া থাকে।

প্রেমের প্রকৃতিই এই যে, প্রেমিকের যাঁহারা শ্রদ্ধা ভক্তির পাত্র, প্রেমিকারও তাঁহারা শ্রদ্ধা ভক্তির পাত্র হইয়া থাকেন; প্রেমিকের যাঁহারা স্নেহ, দয়া বা কৃপার পাত্র, প্রেমিকারও তাঁহারা স্নেহ, দয়া বা কৃপার পাত্র হইয়া থাকেন। হৃদয়ের পূর্ণ মিলনেই পূর্ণ ও প্রকৃত প্রেম। পতির হৃদয় যেখানে যেখানে, পত্নীর হৃদয়ও যদি সেইখানে সেইখানে থাকে, তবেই বুঝিতে হয় যে, পত্নীর পতিপ্রেম অবিকৃত ও বিশুদ্ধ। সত্যবানের চক্ষে পিতামাতা কি বস্তু, তাহা

---

* এবমুক্ত্বা দ্যুমৎসেনো বিররাম মহামনাঃ।
তিষ্ঠন্তী চৈব সাবিত্রী কাষ্ঠভূতেব লক্ষ্যতে॥

মহামনা দ্যুমৎসেন এইরূপ কহিয়া বিরত হইলেন এবং সাবিত্রীও উপবাস করত কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিলেন।

ঞ্চৎ পূর্ব্বেই দেখা গিয়াছে। তিনি যে দয়ালু, দানশীল এবং মিত্রবৎসল, নারদ কর্তৃক তাঁহার চরিত্রবর্ণনায় তাহাও স্পষ্টরূপে ব্যক্ত—সাংকৃতে রন্তিদেবস্থ স্বশক্ত্যা দানতঃ সমঃ (সত্যবান স্বীয় শক্তি অনুসারে দান করিতে সংকৃতিনন্দন রন্তিদেবের তুল্য); সমৈত্রঃ (তিনি মিত্রবৎসল)। সাবিত্রী এ হেন পতির পিতা মাতা প্রভৃতির কত ভক্তিপ্রীতিসহকারে, কত প্রাণপণে সেবা করিতেন, তাহা সাবিত্রীর উপাখ্যানেই লিখিত আছে—

পরিচারৈগু ণৈশ্চৈব প্রশয়েন দমেন চ।
সর্ব্বকামক্রিয়াভিশ্চ সর্ব্বেষাং তুষ্টিমাদধে॥
শ্বশ্রূং শরীরসৎকারৈঃ সর্ব্বৈরাচ্ছাদনাদিভিঃ।
শ্বশুরং দেবসৎকারৈর্ব্বাচঃসংযমনেন চ॥

পতির প্রিয় ব্যক্তি যে পত্নীর প্রিয়, তিনিই যথার্থ পতিপ্রেমিকা; যে পত্নী পতির প্রিয় ব্যক্তির সেবা করেন, তিনিই যথার্থ পতির সেবিকা। এইরূপ পত্নীই প্রকৃত পক্ষে পতিব্রতা। যে রমণী পতির পিতা মাতা প্রভৃতিকে অশ্রদ্ধা অবজ্ঞা অনাদর বা অযত্ন করেন, তিনি পতিকে লইয়া থাকিলেও, পতিব্রতাও নহেন, পতিপ্রেমিকাও নহেন। আমাদের দুর্ভাগ্য, বঙ্গে এখন এইরূপ নারীর সংখ্যাই বাড়িয়া যাইতেছে।

এইবার মায়ের মৃতপতিকে পুনর্জীবিত করাইবার সেই ত্রিলোকবিস্ময়কর কথা কহিতে হইবে। সে কথার মাহাত্ম্য, বিশালতা, অপূর্ব্বত্ব, অলৌকিকতার ধারণা করিতে পারি, এমন ক্ষমতা আমাদের নাই। সে কথা কহিবার মতন করিয়া কহিতে পারি, এমন ভাগ্য করিয়া আসি নাই। তথাপি সে কথা না কহিলে নয়। সাবিত্রীকথার তাহাই চরম কথা। সে কথা কহিব। কহিতে ভয় কি? মায়ের কথা যেমন করিয়াই কহা যাউক, অপরাধ হয় না।

সত্যবানকে পতিরূপে মনোনীত করিয়া আসিয়াই সাবিত্রী দেবর্ষি নারদের নিকট শুনিলেন যে, ঠিক এক বৎসর পরে সত্যবানের মৃত্যু অবধারিত। এই বিষম কথা শুনিয়াও সাবিত্রী সত্যবানকে পতি করিবার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন না। সত্যবানের সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়া গেল। তিনি শ্বশুরগৃহে থাকিয়া সেই বিষম কথা ভাবিতে লাগিলেন। দিন গণিতে গণিতে সেই ভীষণ দিন নিকটবর্ত্তী হইল। আর তিন দিন মাত্র আছে। সাবিত্রী অনশনব্রত অবলম্বন করিলেন। চতুর্থ দিবসে স্বামীর পরলোকগমন হইবে। তিনি—

ব্রতং ত্রিরাত্রমুদ্দিশ্য দিবারাত্রং স্থিতাভবৎ।

'ত্রিরাত্র-ব্রত উদ্দেশ করিয়া দিবানিশি উপবাস করিতে' লাগিলেন। সঙ্কল্প—স্বামীকে পরলোকগমন করিতে দিব না। তাঁহার ব্রতের কথা শুনিয়া শ্বশুর দ্যুমৎসেন মহাচিন্তাকুল হইয়া বলিলেন—মা, তুমি বড় কঠিন ব্রত অবলম্বন করিয়াছ, তিন দিন তিন রাত্রি উপবাস করিয়া থাকিতে পারিবে না।

অতিতীব্রোঽয়মারম্ভস্ত্বয়ারব্ধো নৃপাত্মজে।
তিসৃণাং বসতীনাং হি স্থানং পরমদুশ্চরম্॥

শ্বশুরকে বড় কাতর দেখিয়া তিনি বলিলেন—পিতা, আপনি কাতর হইবেন না, আমি ব্রত উদ্যাপন করিতে পারিব। নিশ্চল উৎসাহ ব্যতীত ব্রত উদ্যাপন করা যায় না; আমি অবচলিত উৎসাহসহকারে এই ব্রত অবলম্বন করিয়াছি।

'না কার্য্যস্তাত সন্তাপঃ পারয়িষ্যামহং ব্রতম্।
ব্যবসায়কৃতং হীদং ব্যবসায়শ্চ কারণম্॥

যেমন বধূ, তেমনি শ্বশুর। দ্যুমৎসেন বলিলেন—তুমি ব্রতভঙ্গ কর, এমন কথা আমি তোমাকে কিছুতেই বলিতে পারিব না; মা, তুমি ব্রত উদ্যাপন কর, ইহা ভিন্ন আর কিছু তোমাকে বলা আমার উচিত নয়।

ব্রতং ভিন্ধীতি বক্তুং ত্বাং নাস্মি শক্তঃ কথঞ্চন।
পারয়স্বেতি বচনং যুক্তমস্মদ্বিধো বদেৎ॥

তিন দিন তিন রাত্রির উপবাসে সাবিত্রী কাষ্ঠ-পুত্তলিকাবৎ হইয়া গেলেন। তাঁহাকে দেখিয়া শ্বশুর শ্বশ্রূ চতুর্থ দিবসে আরও কাতর হইয়া বলিলেন, মা, তুমি যথানিয়মে ব্রত সম্পন্ন করিয়াছ, এখন আহার কর। কিন্তু যে কঠিন সঙ্কল্প করিয়া তিনি ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা এখনও সিদ্ধ হয় নাই, রজনীতে তাহা সিদ্ধ করিতে হইবে। তিনি বলিলেন—কামনা করিয়া ব্রতাবলম্বন করত আমি সঙ্কল্প ও প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, সূর্য্য অস্তগত হইলে তবে ভোজন করিব।

অস্তং গতে ময়াদিত্যে ভোক্তব্যং কৃতকাময়া।
এষ মে হৃদি সংকল্পঃ সময়শ্চ কৃতো ময়া॥

এমন সময়ে পতিব্রতা দেখিলেন, কাষ্ঠাদি আহরণার্থ কুঠার হস্তে লইয়া পতি বনে গমন করিতেছেন। তিনি শ্বশুর শ্বশ্রূর অনুমতি লইয়া পতির সহিত গমন করিলেন। সত্যবান তাঁহাকে বনের শোভা দেখিতে বলিলেন। তিনি তখন সত্যবানকে কালকবলিত মনে করিয়া আত্মহারা হইয়াছিলেন।

থাপি পাতিব্রত্যের সেই আদর্শরূপিণী হৃদয়কে যেন দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া এক কালে পতির সহিত কথোপকথন করিতে লাগিলেন এবং সেই ভীষণ মুহূর্ত্তের ভাবনা করিতে লাগিলেন।

নিরীক্ষমাণা ভর্ত্তারং সর্ব্বাবস্থমনিন্দিতা।
মৃতমেব হি তং মেনে কালে মুনিবচঃ স্মরন্॥
অনুব্রুবন্তী ভর্ত্তারং জগাম মৃদুগামিনী।
দ্বিধেব হৃদয়ং কৃত্বা তঞ্চ কালমবেক্ষতী॥

কাষ্ঠচ্ছেদন করিতে করিতে সহসা সত্যবান শিরঃপীড়ায় বিষম ব্যথিত হইয়া পড়িলেন! সাবিত্রী তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ধরিয়া আপন অঙ্কে তাঁহার মাথা রাখিয়া বসিলেন। 'মুহূর্ত্তকাল পরেই দেখিতে পাইলেন, 'রক্তবস্ত্রপরিধায়ী, বদ্ধমুকুট, প্রশস্তকায়, সূর্য্যসদৃশ তেজস্বী, শ্যাম-গৌরবর্ণ, লোহিতলোচন এক ভয়ঙ্কর পুরুষ পাশ হস্তে লইয়া সত্যবানের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকেই নিরীক্ষণ করিতেছেন।' সাবিত্রীর হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল বটে, কিন্তু তিনি পতিব্রতা। তৎক্ষণাৎ পতির মস্তক ধীরে ধীরে অতিসন্তর্পণে ভূমিতে রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া করযোড়ে তাঁহার আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। যেমন ভয়ানক কথা বলিতে হয়, যম তাহা বলিলেন। বলিয়া সত্যবানের সূক্ষ্মদেহ বাহির করিয়া লইয়া পাশবদ্ধ করিয়া চলিয়া যাইতে লাগিলেন। কিন্তু পতিব্রতা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। যম তাঁহাকে বলিলেন—আর আসিও না, তোমার যত দূর আসিতে পারা সম্ভব, তত দূর আসিয়াছ. এখন ফিরিয়া গিয়া পতির শেষ কার্য্য কর; তাঁহার নিকট তোমার আর ঋণ নাই, তাঁহার ঋণ হইতে তুমি মুক্ত হইয়াছ। কিন্তু পতিব্রতা সে কথা শুনিলেন না। তিনি যে পতির ঋণ হইতে মুক্ত হইয়াছেন, তখনও এরূপ মনে করিতে পারিলেন না। তিনি দৃঢ়তাসহকারে উত্তর করিলেন—'তপস্যা, গুরুভক্তি, পতিস্নেহ, ব্রত ও আপনকার প্রসাদ দ্বারা আমার গতি অপ্রতিহতা হইবে,' আপনি আমাকে ফিরাইয়া দিতে পারিবেন না। এই বলিয়া তিনি যমের নিকট অতি উচ্চ ধর্ম্মকথা কহিলেন। ধর্ম্মরাজ সন্তুষ্ট হইয়া স্বামীর জীবন ভিন্ন তাঁহাকে অন্য বর দিতে চাহিলেন। তিনি একটি বর লইলেন। কিন্তু আবার যমের সঙ্গে সঙ্গে গমন করিতে লাগিলেন। যম তাঁহাকে পথশ্রান্তা দেখিয়া আবার ফিরিয়া যাইতে বলিলেন। পতিব্রতা উত্তর করিলেন—স্বামীর কাছে থাকিলে শ্রান্তি আছে কি? আমি

স্থির করিয়াছি, আমার স্বামীর যে গতি, আমারও সেই গতি হইবে। আপ আমার স্বামীকে যেখানে লইয়া যাইবেন, আমিও সেখানে যাইব—

শ্রমঃ কুতো ভর্তৃসমীপতো হি মে যতো হি ভর্ত্তা মম সা গতির্ধ্রুবা।
যতঃ পতিং নেষ্যসি তত্র মে গতিঃ সুরেশ ভূয়শ্চ বচো নিবোধ মে॥

এই কথা বলিয়া সাবিত্রী আবার ধর্ম্মকথায় যমকে সন্তুষ্ট করিলেন; আর একটি বর দিয়া যম তাঁহাকে ফিরিয়া যাইতে বলিলেন। জ্ঞানধর্ম্মরূপিণী সাবিত্রীর অপূর্ব্ব ধর্ম্মকথায় সন্তুষ্ট হইয়া যম তাঁহাকে আরও একটি বর দিয়া বলিলেন—বহু দূর আসিয়াছ, এইবার ফিরিয়া যাও। পতিব্রতা উত্তর করিলেন—পতির নিকটে আছি বলিয়া দূরে আসিয়াও আমার বোধ হইতেছে না যে দূরে আসিয়াছি; আমার মন আরও দূরে যাইতেছে—

ন দূরমেতন্মম ভর্তৃসন্নিধৌ মনো হি মে দূরতরং প্রধাবতি।

এই কথা বলিয়া তিনি যমকে ধর্ম্মকথায় মুগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। যম বলিলেন, এমন কথা তোমার কাছে ভিন্ন আর কাহারও কাছে শুনি নাই। আনন্দে বিহ্বল হইয়া যম সাবিত্রীকে বর দিলেন, তোমার বলবীর্য্যশালী শত পুত্র হইবে। বর দিয়া এবং সাবিত্রীকে ফিরিয়া যাইতে বলিয়া সত্যবানের সূক্ষ্মদেহ লইয়া আবার গমন করিতে লাগিলেন। তেজোময়ী, পতিব্রতা আবার তাঁহাকে ধর্ম্মকথায় সন্তুষ্ট করিয়া আবার বরলাভের আশ্বাস পাইয়া বলিলেন—আমার পুণ্যের প্রতি দৃষ্টি করিয়া যেমন অন্যান্য বরগুলি দিয়াছেন, এ বরটিও তেমনি আমার পুণ্যের প্রতি দৃষ্টি করিয়া দিন। পতির মৃত্যুতে আমি মৃতবৎ হইয়াছি, আমার পতি জীবিত করুন। পতি হারাইয়া আমি সুখ কামনা করি না, পতিবিহীনা হইয়া আমি স্বর্গ কামনা করি না। পতি-বিহীনা হইয়া আমার জীবনধারণ অসম্ভব। আপনিই বলিলেন, আমার শত পুত্র হইবে, কিন্তু আপনিই আমার পতিকে লইয়া যাইতেছেন। আমার পতিকে বাঁচাইয়া দিন, আপনারই বাক্য সত্য হউক—

ন তেঽপবর্গঃ সুকৃতাদ্বিনা কৃতস্তথা যথান্যেষু বরেষু মানদ।
বরং বৃণে জীবতু সত্যবানয়ং যথা মৃতা হ্যেবমহং পতিং বিনা॥
ন কাময়ে ভর্তৃবিনাকৃতাসুখং ন কাময়ে ভর্তৃবিনাকৃতা দিবম্।
ন কাময়ে ভর্তৃবিনাকৃতা শ্রিয়ং ন ভর্তৃহীনা ব্যবসামি জীবিতুম্॥
বরাতিসর্গঃ শতপুত্রতা মম ত্বয়ৈব দত্তো হ্রিয়তে চ মে পতিঃ।
বরং বৃণে জীবতু সত্যবানয়ং তবৈব সত্যং বচনং ভবিষ্যতি॥

ধর্ম্মরাজ সত্যবানকে জীবিত করিয়া পতিব্রতার মস্তকে আশীর্ব্বাদ বর্ষণ

রয়া চলিয়া গেলেন। আমরাও সেই পর্য্যন্ত সম্ভ্রমসন্ত্রস্ত হইয়া ভক্তিপূর্ণ-অন্তঃকরণে বাষ্পাকুলনয়নে পাতিব্রত্যের সেই অমর, অক্ষর, অব্যয়, অতুলনীয় প্রতিমার প্রতি চাহিয়া আছি। বুঝাইতে পারি না, ইহা কি; বুঝিতে পারি না, ইহা কি; যখন দেখি, মর লোকের উপরে উঠিয়া বিস্ময়বিহ্বল হইয়া কেবলই দেখি।

শ্রীচন্দ্রনাথ বসু।

কেরল।

দক্ষিণ ভাগ।

কেরল নায়ার-প্রধান দেশ। জনসংখ্যা সাত লক্ষ। তাহাদের পক্ষে আমিষভোজন ও বারুণীসেবন নিষিদ্ধ নহে।

দ্রবিড়-ভূমি হইতে নায়েক উপপদধারী, বর্ত্তমান বণিয়ার জাতির পূর্ব্ব-পুরুষগণ মলয় প্রদেশে আগমন করিয়া নায়ার নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। নায়ার অর্থে নারীপর্য্যায়। তাহারা যোদ্ধৃতন্ত্র শাসন-প্রণালী স্থাপিত করিয়া সুজলা সুফলা মলয়া ভোগ করিতে থাকে। এক্ষণে কেহ কেহ সৈনিকবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করেন। তিরু অনন্তপুরের রাজপথে একদল নায়ার সেনাকে রণবাদ্যোদ্যমসহকারে ধ্বজদণ্ড অগ্রে করিয়া অভিযান করিতে দেখিয়াছি। ইহাদিগকে দেখিলে মনে হয়, বঙ্গে কোন স্বতন্ত্র প্রাচীন রাজ্য বর্ত্তমান থাকিলে মৎস্যান্নভোজী বাঙ্গালীও তক্রান্নভুক তিলঙ্গা অপেক্ষা রণবিদ্যাভ্যাসে অপটু হইত না।

সমস্ত মলিয়ালি ব্রাহ্মণের আচার একবিধ। ব্রাহ্মণের মধ্যে নম্বুরীগণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। শূদ্রযাজী ভিন্ন অপর শ্রেণীর ব্রাহ্মণের অন্নগ্রহণ সম্বন্ধে নম্বুরী পুরুষের আপত্তি নাই। রমণীদিগের পক্ষে তাহা নিষিদ্ধ। কিন্তু সূতিকাগারে নায়ার-রমণী কর্ত্তৃক পাচিত অন্ন গ্রহন করিলে ইহাদিগের শুদ্ধাচার ভ্রষ্ট হয় না। দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ গোল আলু ভক্ষণ করিলেও, ব্রাহ্মণী তদ্‌ভোজনে বিরত থাকেন।

নম্বুরীগণ চতুঃষষ্টিপ্রকার আচারশৃঙ্খলে আবদ্ধ। ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপরে স্পর্শ করিলে তাঁহারা স্নান করিতে বাধ্য হন। নম্বুরীদিগের পক্ষে অপর শ্রেণীর ব্রাহ্মণকে অভিবাদন করা নিষিদ্ধ। শিব ও বিষ্ণু উভয় দেবতার উপাসনাও এক ব্যক্তির করা অকর্ত্তব্য। পর্য্যুসিত জল ও অন্ন ইঁহাদিগের অব্যবহার্য্য। নক্ষত্র-অনুসারে ইঁহারা একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ করিয়া থাকেন।

নম্বুরীগণ প্রত্যূষে গাত্রোত্থান ও সূর্য্যোদয়ের পর স্নান করিয়া দেবালয়ে প্রবেশ করিয়া বেলা এগারটা পর্য্যন্ত তথায় অতিবাহিত করিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে পুনর্ব্বার তৈলাভ্যঙ্গসহকারে স্নান করিয়া দেবস্থানে গমন করেন। রাত্রি নয় ঘটিকার পর তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া স্বস্থানে সুখ অনুভব করেন। দেবালয়ে অবস্থানকালে উপাসনা ও অধ্যয়ন প্রভৃতি কার্য্য সম্পন্ন থাকে। সাংসারিক কার্য্যের জন্য অপরাহ্ন নির্দ্দিষ্ট আছে। মধ্যাহ্নে তাঁহারা কিঞ্চিৎ নিদ্রাসুখ উপভোগ করেন।

বয়ঃস্থা না হইলে কন্যার উদ্বাহ সম্পন্ন হয় না। সকল পুরুষের বিবাহ করিবার অধিকার না থাকায়, বহু মহিলাকে অনূঢ়া বা সপত্নীবেষ্টিত অবস্থায় কালযাপন করিতে হয়। অগ্রজ নিঃসন্তান না হইলে কনিষ্ঠ বিবাহ করিতে পারেন না। পারিবারিক ধন এ দেশে অবিভাজ্য, সুতরাং সকলের পক্ষে বিবাহ শ্রেয়স্কর নহে। বেদব্যাসস্মৃতি নামে খ্যাত "অশৌচপ্রায়শ্চিত্তম্" অনুসারে ধর্ম্মাধিকরণে পূর্ব্বে বিচার হইত। স্বজাতির মধ্যে ব্যভিচার, অখাদ্যভোজন বা নরহত্যাজনিত পাপে রাষ্ট্র হইতে তাড়িত ও সমাজচ্যুত হইলে, মুসলমান হইয়া পবিত্রতা লাভ করিতেন; এখন সে অবস্থায় খৃষ্টান হইয়া পরিত্রাণ পাইয়া থাকেন। অদ্যাপি শাস্ত্র ও সদাচার লইয়া কালাতিপাত করা তাঁহাদের জীবনের ব্রত। নগরে বাস করিলে শুদ্ধচারিতার ব্যাঘাত হইবে বিবেচনা করিয়া, গ্রামাভ্যন্তরে বসতি শ্রেয়ঃ জ্ঞান করেন। টিপু সুলতান তামুরী রাজ্য গ্রাস করিলে ইঁহারা কালিকট প্রদেশ হইতে পলায়নপর হইয়াছিলেন। ইংরেজাধিকারে দেশে শান্তি স্থাপিত হইলে, ইঁহারা পুনরায় স্বস্থানে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছেন। এই শুদ্ধাচারিগণ রজকালয়াগত বস্ত্র অধৌত অবস্থায় দেবতাকে পর্য্যন্ত পরিধান করাইয়া থাকেন। ইংরাজী বিদ্যামন্দিরে এক জন নম্বুরী ছাত্র প্রবিষ্ট হইলে, তাহা বিদ্যালয়ের বিশেষ ঘটনা বিবেচিত হয়। এ দেশে ক্রমশঃ ইংরাজী শিক্ষার বিস্তার হইতেছে বলিয়া, রাজকীয় কর্ম্মে দ্রাবিড়দিগকে নিযুক্ত না করিয়া,যাহাতে স্থানীয় শিক্ষিত ব্যক্তি-

দগকে নিযুক্ত করা হয়—এই মর্ম্মে সম্প্রতি রাম রাজার নিকট আবেদন করা হইয়াছে। এ দেশে ব্রাহ্মণজাতিকে বিশেষলক্ষণাক্রান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। কেরলে বিবাহবন্ধন অক্ষুণ্ণ রাখিবার উদ্দেশে মহিলাগণকে দক্ষিণাপথের নিয়মবিরুদ্ধ অবরোধপদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে। মুসলমানগণ কহেন, বিদেশীয় লোকের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিতে হয় বলিয়া তাহাদের মধ্যে অবগুণ্ঠনপ্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। কূর্দ্দপর্ব্বতবাসিনী মুসলমান রমণীগণ অদ্যাপি অবগুণ্ঠন ব্যবহার করেন না। এবং তাঁহাদিগের মধ্যে নারীযোদ্ধা দৃষ্ট হইয়াছে। আর্য্যাবর্ত্তবাসিনীদিগকে অনুকরণলালসাপরিতৃপ্তির জন্য অথবা প্রযোজনবশে আবরণ ধারণ করিতে হইয়াছে, তাহা নিশ্চয় করা দুঃসাধ্য। কেরলী ব্রাহ্মণী লোকান্তরালে অবস্থিতি করায় অন্তর্জনা নামে প্রসিদ্ধ।

মলিয়ালীগণের মতে শঙ্করাচার্য্য নম্বুরী ছিলেন। তিনি বদরিকাদ্রিতে কোনও ব্যাসের সহিত বাস করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, স্বদেশের আচারসংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়া পরশুরামসংস্থাপিত নিয়মে উপেক্ষা করিলেন। সংস্কারকেরা সকল দেশেই সাধারণের নিগ্রহভাজন হইয়া থাকেন। শঙ্করাচার্য্যের অন্তরঙ্গগণও তাঁহার বিরোধী হইলেন। শঙ্করকে সমাজচ্যুত করিয়া, শূদ্রজাতিকে তদীয় সেবা হইতে বিরত করা হইল; কিন্তু পরবর্ত্তিকালে আচার্য্যের ব্যবস্থাই শিরোধার্য্য হইয়াছে। তাঁর অনুশাসনবলে এক্ষণে অন্তর্জনাগণ বক্ষঃস্থল আবৃত করেন। ভট্টর-উপাধিধারী ব্রাহ্মণগণের কামিনীগণ অদ্যাপি তামিল-প্রণালীতে বস্ত্রপরিধানপ্রথা পরিত্যাগ করে নাই। পরপুরুষের মুখদর্শন নিষিদ্ধ থাকায় বহির্গমনকালে তালপত্রের ছত্র অন্তর্জনাদিগের সমভিব্যাহারে থাকে। অগ্রবর্ত্তিনী নায়ার দাসী সতর্ক করিয়া দিলে, তাঁহারা আতপত্র দ্বারা মুখাবরণ করেন। এ দেশে দেবতা ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সম্মুখীন হইলে, পুরুষ ও নারী উভয়ের পক্ষেই গাত্র অনাবৃত করা বিধি। পুরুষের পক্ষে গাত্রবস্ত্র কটিদেশে বেষ্টন করা সম্মানপ্রদর্শনের চিহ্ন বলিয়া পরিগণিত। এ রীতি কি দেশের শৈত্যহীনতার ফলে উদ্ভূত নহে?

এ দেশে দাম্পত্যনিয়মলঙ্ঘনের দণ্ড অতি কঠিন। দোষ প্রমাণিত হইলে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়কে জাতিচ্যুত হইতে হয়। অপরাধের প্রমাণাভাব ঘটিলে মীমাংসক সাধ্বীর চরণে প্রণিপাত করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করেন। এই প্রক্রিয়ার নাম—"ক্ষমানমস্কারম্"। তদনন্তর "শুদ্ধিভোজনম্" করাইতে

হয়। নম্বুরিগণ অন্তর্জনাকে ব্যভিচার স্বীকার করাইবার জন্য অসম্পূর্ণ আহার দিয়া বা ধনের প্রলোভন দেখাইয়া, বৎসর-ব্যাপী বিচার-বিড়ম্বনা, কুটুম্ব, রাজপ্রতিনিধি ও স্মার্ত্তবর্গের ভোজ্যান্নব্যয় প্রভৃতি হইতে রক্ষা পাইবার চেষ্টা করে। নারী দোষ স্বীকার করিলে এক জন নায়ার পুরুষ তাহার মুখাবরক ছত্র গ্রহণ ও উপস্থিত জনগণ করতালি প্রদান করে। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের অপবিত্রতা অধিকতর ঘৃণ্য। তাহার কারণ কেবল পুরুষের প্রাধান্য নহে, নারীকে গর্ভধারণ করিতে হয়, তদুৎপন্ন সন্ততির উপর সমাজের হিতাহিত নির্ভর করে।

জনকের অপেক্ষা জননীর যত্ন সন্তানের জীবনরক্ষার পক্ষে বিশেষ আবশ্যক। তাই উদ্দাম স্ত্রী-স্বাধীনতার লীলাক্ষেত্র ইউরোপেও অনূঢ়া যুবতী একাকিনী ভ্রমণ করিতে অনুজ্ঞাত হন না, এবং পরিচ্ছদ সম্বন্ধেও তাঁহাদিগের স্বানুবর্ত্তিতা চলে না। রমণীর সতীত্বরক্ষার জন্য কঠোর বিধি না থাকিলে মলয়ারে ব্রাহ্মণের পক্ষে পুত্রপর্য্যায়ে বংশপ্রণালী কদাচ রক্ষা পাইত না।

এই স্বেচ্ছাচারিতার দেশেও বিবাহকে "কল্যাণম্" কহে। বর হস্তে সূত্র বন্ধন করিয়া বংশদণ্ড পরিগ্রহ করিয়া দেহরক্ষক সমভিব্যাহারে পাত্রীর বাটীতে উপস্থিত হন। দ্বারদেশে বৃষলী ব্রাহ্মণীর বেশে বরকে স্বাগত-সম্ভাষণ ও আরতি করিয়া অষ্টবিধ বশীকরণক্রিয়া সম্পাদন করেন। বরকন্যার আহার হইলে পাত্র বংশদণ্ড পুনর্গ্রহণ করে, এবং পাত্রী দর্পণ ও তীর হস্তে লয়। তার পর কন্যার পিতা বরের পাদপ্রক্ষালন করেন। অবরোধ-প্রথার কঠোরতাবশতঃ নম্বুরীদিগের মধ্যে কন্যার মাতা বরের সম্মুখীন হইতে পারেন না। কাজেই কোন নায়ার-রমণী কন্যার মাতার প্রতিনিধি-রূপে বরকে পুনরায় আরতি করে। বর সভায় উপনীত হইলে কন্যা তাহার পদে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া গলদেশে মাল্য সমর্পণ করে। তার পর শুভদৃষ্টি। মহিলাগণ যবনিকার অন্তরাল হইতে উলুধ্বনি করিতে থাকেন। কন্যার পিতা দুহিতার হস্ত যৌতুক সহ বরের করে সমর্পণ করেন। বরকন্যা সপ্তপদগমনানন্তর উপবিষ্ট হইলে হবন করিতে হয়। সেই দিবসই কন্যাকে শ্বশুরগৃহে যাইতে হয়।

চতুর্থ দিবসে একটি কক্ষে পীতবস্ত্রোপরি ধান্যের স্তূপ করিয়া পান সুপারি রাখা হয়। অপর পার্শ্বে মছলন্দ মাদুরের ন্যায় শয্যা বিস্তৃত থাকে। তাহার চতুষ্পার্শ্বে ধান্যের আলি দেওয়া হয়। নব দম্পতি সেই শয্যা গ্রহণ

.ল পুরোহিত বহির্দ্দেশে গর্ভাধানের মন্ত্র পাঠ করিতে থাকেন। পঞ্চম
। বর বাহুস্থিত মঙ্গলসূত্র ও বংশদণ্ড পরিত্যাগ করিলে অনুষ্ঠান পরি-
প্ত হয়। পয়ন্নুর-গ্রামবাসী নম্বুরীদিগের কুলে ভাগিনেয়-গত উত্তরা-
ারপ্রথা বর্ত্তমান আছে বলিয়া নম্বুরী সম্প্রদায় ঐ বংশীয়া কন্যার
গ্রহণ করিলে পতিত হইয়া থাকেন।

ঋদীয় ব্রাহ্মণের উদ্বাহসংস্কারকালে স্ত্রী-আচারের সময় জায়াপতির
সরোবরে গমন করিয়া বস্ত্রাঞ্চলে মৎস্য ধৃত করিবার প্রথা আছে।
পাশ্চাত্যগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, পরশুরাম ধীবরের হস্তস্থিত জাল
করিয়া সূত্রনিষ্কাশনান্তে তদীয় স্কন্ধে আরোপ করিয়া উপনিবেশী ব্রাহ্ম-
র সংখ্যা বর্দ্ধিত করিয়া গিয়াছেন। কথিত আছে, নাগ দেবতার উপদ্রবে
নিবেশী দ্রাবিড় ব্রাহ্মণগণ একবার প্রত্যাবৃত্ত হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন।
আমি শ্রীরঙ্গমে অগ্রশিখাধারী ব্রাহ্মণ দর্শন করিয়াছি; বোধ করি,
তাঁহারা প্রত্যাবৃত্তদিগের বংশধর হইবেন। জনৈক সদাচারী হিন্দুস্থানী
ব্রাহ্মণের নিকট শুনিয়াছি যে, এক রাজা প্রতিযোগিতাপরবশ হইয়া লক্ষ
ব্রাহ্মণ আমন্ত্রণ করিতে বাধ্য হন। সন্নিকটে তৎপরিমিত ব্যক্তি দুষ্প্রাপ্য
হওয়ায় অন্বেষণকারিগণ ক্ষেত্রস্থ মঞ্চোপরি সমাসীন অপর বহু ব্যক্তিকে
আহ্বান করিয়া লইয়া গেল। নরপতি তাহাদিগকে ব্রাহ্মণবৎ সমাদর
করিলেন। ইহাতেই তরুয়ী পাঁড়ে ও মচিয়া পাঁড়ে প্রভৃতি জাতির উৎপত্তি
হয়। তৎশ্রবণে তীর্থজীবী সাদৃশ্য দিলেন, উৎকলবাসী হলচালননিরত
পনিয়ার ব্রাহ্মণ তদ্বৎ। ব্রহ্মস্থাপন হেতু অদ্যাপি পূর্ব্ববাঙ্গলায় নৌকাযোগে
আগমন করায় "ভরার মেয়ে" নামে খ্যাত কন্যার পাণিগ্রহণের রীতি আছে।
"ভাদ্র মাসে যে চর্ম্ম শুষ্ক হইতে চারি দিন অতিবাহিত হয়, শ্রাবণে তাহা
তিন দিনে শুকায়,"—এই উক্তি শ্রবণ করিয়া ননন্দার সন্দেহ হয়, তবে কি
বধূ চর্ম্মকারদুহিতা? ভট্টনারায়ণের পুত্রের নাম বারেন্দ্রমতে আদিগাই ওঝা।
ওঝা উপাধিদৃষ্টে অনুমিত হইবে, তদীয় পিতা কান্যকুব্জ হইতে না আসিয়া
মিথিলা হইতে আগমন করিয়া থাকিবেন। আদিশূর কর্ত্তৃক আহূত পঞ্চ
ব্রাহ্মণকে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণদিগের আদিপুরুষ স্বীকার করিলে, তদ্দ্বারা ৮২১ বৎসরে
ব্রাহ্মণের বর্ত্তমান জনসংখ্যা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা ছিল না। ধর্ম্মপাল কর্ত্তৃক
নারায়ণভট্টকে প্রদত্ত দানপত্রে লিপিব্যবসায়ী জ্যেষ্ঠ কায়স্থের পদ উল্লিখিত

ভৃত্যপঞ্চকের আগমন সম্বন্ধে কিম্বদন্তী ভ্রান্তিবিজৃম্ভিত। অথবা তদতি
আদিপুরুষ স্বীকার্য্য।

কন্যাকুমারী হইতে গোনর্দ্দ (গোয়া) পর্য্যন্ত কেরল। তদনন্তর ক
বেলাভূমির প্রারম্ভ। কেরলের ন্যায় কঙ্কণস্থ ব্রাহ্মণমণ্ডলী পরশুরাম ক
স্থাপিত। উক্ত বংশে পেশোয়া জন্মগ্রহণ করায় চিত্তপাবনগণ মহার
সমাজে ধন্য হইয়াছেন। ত্রিপুণীথুরীতে আমরা যে অযাচিত বন্ধু প্রাপ্ত
ছিলাম, তিনি কহেন, আমি তোমাদিগকে পূর্ণত্রয়ীশের সম্মুখীন
অক্ষম। আমি কঙ্কণস্থ ব্রাহ্মণ, সুতরাং এতদ্দেশে ব্রাহ্মণরূপে গণ্য
পারি না।

পূর্ব্বকালে এখানকার পোলিয়ার এবং চেরুমার জাতি ক্রীতদাসরূ
ব্যবহৃত হইত। পুরুষের মূল্য ১৪৲ টাকা ও স্ত্রীর ৭৲ টাকা ছিল। ক্রী
দাসের সন্ততি প্রভুর সম্পত্তিমধ্যে গণ্য হইত। অন্যের দাস দাসী আবশ্যক
হইলে প্রভুরা তাহাদিগকে ভাড়া দিতেন। কিন্তু ইউরোপীয় ধর্ম্মপ্রচারক-
গণের প্রসাদে দাস মতান্তরে দীক্ষিত হইলে স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়া বেতন
পাইবার অধিকারী হইত। অদ্যাপি ব্রাহ্মণ মানব-লীলা সংবরণ করিলে
নিকটস্থ শূদ্রদিগকে সংবাদ দেওয়া হয়। তাহারা উপস্থিত হইয়া উদ্যানস্থ
আম্রবৃক্ষ ছেদন করিয়া বাটীর দক্ষিণভাগে চিতা সজ্জিত করিয়া আপনাদের
আদরশীলতা রক্ষা করেন।

থিয়ার জাতি সাগু, নারিকেল ও তাল বৃক্ষের রসসংগ্রহ ও তাহা হইতে
খণ্ডশর্করা প্রস্তুত করিয়া জীবিকার্জ্জন করিয়া থাকে। অধুনা তাহারা
দেশস্থিতি রীতি প্রকরণে অভিজ্ঞ হইয়া উঠিতেছে। পাঁচ লক্ষ থিয়ারের
মধ্যে দশ জনমাত্র ইংরাজী ভাষায় শিক্ষালাভ করিয়াছে। সে কয় জনের অদ্যাপি
রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইবার সময় উপস্থিত হয় নাই। কোন ভদ্রলোক তাহা-
দিগের সংস্পর্শে থাকিতে ইচ্ছা করেন না। কিন্তু থিয়ার পণ্ডিত যদি খৃষ্টধর্ম্ম
অবলম্বন করিয়া খৃষ্টানোচিত নামে অভিহিত হয়, তবে তাহার রাজকর্ম্ম
পাইবার বাধা হয় না। ইতরজাতীয় ব্যক্তি মুসলমান কিংবা খৃষ্টান হইলে
তাহার নিকৃষ্ট ভাব অপনোদিত হয়। ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণ যে অন্ত্যজের ছায়ার
দশ হস্ত ব্যবধানের মধ্যে পদক্ষেপ করিলে অশুচি হন, তিনি উহাকে

বৈদেশিক খৃষ্টান ও মুসলমান পুরুষের সংস্রবে দেশীয় নীচকুলোদ্ভূতা নারীর নাজারা ও মুপ্পালা জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। এতদ্দেশীয় মুসলমানগণ জোনমুপ্লা ও খৃষ্টানেরা নসরাণীমুপ্লা নামে বিখ্যাত। পোর্ত্তুগীজদিগের আগমনের পূর্ব্বে সিরীয় খৃষ্টানেরা হিন্দু আচার পালন করিত। তাহারা গোমাংসভক্ষণেও বিরত ছিল, তাহাতে (এ দেশে?) উহারা পঞ্চম বর্ণ করিয়া পরিগণিত হইত। এক্ষণে বৈদেশিক আচারের প্রতি অধিক অনুরক্ত হওয়ায় তাহাদিগের সে সুযোগ অন্তর্হিত হইয়াছে।

এ দেশে খৃষ্টানেরা পণ্যজীবী। ত্রিচুরে কেহ রবিবাসরে গতাসু হইলে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য সে দিন বস্ত্রক্রয় করা অসম্ভব হয়। খৃষ্টান ও মুসলমান উভয় শ্রেণীর মুপ্‌লাই কৃষিকার্য্যনিরত। ইহাদিগের মধ্যে ভাগিনেয় দায়াদমধ্যে গণ্য। উত্তর মলয়ার নিবাসী মুপ্‌লারা মুসলমান প্রথানুযায়ী উত্তরাধিকারিত্ব প্রাপ্ত হয়। মুসলমানের অত্যাচারে কোন কোন স্থানের বসতি উৎসাদিত হইয়া বনে পরিণত হইয়াছে। মুপ্‌লাগণ অতীব হঠকারী। যেমন পঞ্জাবে মুসলমান ধর্ম্ম হইতে শিখমতের উৎপত্তি হইয়াছে, বঙ্গে খৃষ্টধর্ম্ম হইতে যে প্রকারে ব্রাহ্মমতের প্রাদুর্ভাব হইল, তদনুসারে বৈদেশিক ধর্ম্ম দক্ষিণাপথে সাধারণ দেশীয় ব্যবহারের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। দেশ বিজাতীয়ের সম্পূর্ণ আয়ত্ত না হইলে, পরের হৃদয়কে আপন হৃদয় করিতে পারা যায় না।

গান্ধার এক্ষণে আর আর্য্যদেশ নহে; সেইরূপ কেরলও আর অনার্য্যভূমি নাই। হিন্দুস্থানের পরিসর আর্য্যাবর্ত্তে হ্রস্ব হইয়া দাক্ষিণাত্যে বর্দ্ধিত হইয়াছে। সেইরূপ, হিন্দুধর্ম্ম অনৈসর্গিকতা পরিহার করিয়া যাহাতে নৈসর্গিকতার দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে পারে, তৎপক্ষে সহৃদয়গণের চেষ্টা সর্ব্বথা বাঞ্ছনীয়।

শ্রীদুর্গাচরণ ভূতি।

থেয়ায়গণ সিংহল বা ভারতমহাসাগরস্থ অপর কোন দ্বীপ হইতে এখানে আগমন করিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে। কথিত আছে, উহারা নারিকেল তরু এ দেশ প্রথম আনয়ন করে। সুতরাং তাহাদের পক্ষে সাগরের বিপরীতস্রোতবাহিনী তরণীতে মালয় (Malay) দ্বীপের আচরণ এই মলয় প্রদেশে আনয়ন করা অসম্ভব নহে।

সুমাত্রা দ্বীপে "স-মন্দেই" অর্থে মাতৃত্ব, ও কেরলে "সম্বন্ধকারী" শব্দে পত্নীত্ব বুঝায়। উভয় শব্দের মধ্যে সাদৃশ্য কল্পনা করিতে বোধ হয় ক্ষতি নাই। সুমাত্রায় (মালয়ে) গৃহস্থালীতে কেবল "স-মন্দেই"গণ বসতি করেন। সে দেশেও পুত্র কন্যা ও কন্যার সন্ততি লইয়া পরিবার গঠিত। পতি আপনার স্বতন্ত্র ভবনে বাস করেন। তিনি মধ্যে মধ্যে সন্তানগণকে দেখিতে আসেন ও পত্নীর কৃষিক্ষেত্রে কার্য্য করিয়া থাকেন। তাঁহার ভ্রাতা, ভগ্নী বা ভগ্নীর সন্তানেরাই উত্তরাধিকারী হইয়া থাকে, আপন সন্তানেরা কিছু পায় না। ভার্য্যার সহোদর ভাগিনেয়ের ভরণপোষণের ভার লয়, মাতামহী সর্ব্বোপরি কর্ত্রীত্ব করেন। এই পদ্ধতি কেরলের "তারয়াদের" "মরুমক্কতায়ম্" প্রণালীর অনুরূপ, সন্দেহ নাই। আদিমকালে অনেক স্থলে বিবাহের প্রয়োজনীয়তা বিদ্যমান না থাকায় প্রথমতঃ নারীপর্য্যায় বংশপ্রণালী প্রচলিত হইয়াছিল, বোধ হয়। কালক্রমে বিবাহপদ্ধতি স্থাপিত হইলে পুরুষপর্য্যায় আরব্ধ হইয়াছে। সুমাত্রা দ্বীপের অধিবাসীরা ইদানীং নারীপর্য্যায় রহিত করিবার সংকল্পে কন্যা ক্রয় করিয়া বিবাহ করে; তাহাতে পতিগৃহবাসিনীর পুত্রসন্তান-পরম্পরায় উত্তরাধিকারিত্ব বর্ত্তে। আমেরিকার কালিফর্ণিয়া সীমান্তে অদ্যাপি আদিম অধিবাসীদিগের জাতিবিশেষে স্বামী ভার্য্যার পিত্রালয়ে যাইয়া বাস করে; নিতান্ত যোত্রহীন না হইলে প্রণয়িনী নায়ককে প্রত্যাবৃত্ত করেন না। এরূপ অবস্থায় উত্তরাধিকার নারীপরম্পরাগত থাকিবে, ইহা বলা বাহুল্য। আষ্ট্রেলিয়ার অন্তর্গত কুইন্সল্যাণ্ডবাসী কোন কোনও বন্যজাতি যে রমণীর সহিত বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়, তাহারই স্বজাতি হইয়া পড়ে। এইরূপে পুত্র বিজাতীয়ত্ব লাভ করিলে উভয় জাতিতে যদি সংগ্রাম উপস্থিত হয়, তখন পিতা পুত্রের নিধন সাধন করিতে পরাঙ্মুখ হয় না।

আর্য্যধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবকালে যেমন অনার্য্য বংশ আর্য্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল, তেমনই মুসলমানদিগের অভ্যুদয়সময়ে এক মৎস্যজীবী জাতির সমগ্র লোক ইসলামধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল।

পৌণ্ড্রক বাসুদেব।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

দীর্ঘতমা ঋষির উপাখ্যান-পাঠে প্রতীত হয় যে, ঐ উপাখ্যানরচনার সময় জাতিভেদ প্রতিষ্ঠিত কিংবা সামাজিক শাসন প্রবর্ত্তিত হয় নাই। ইহাতে সমাজের আদিম অবস্থার চিত্র প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। সেই সময়ে জহ্নুনন্দিনী যে কোন্ কোন্ জনপদ বিধৌত করিয়া পূর্ব্বাভিমুখে প্রবাহিত হইতেছিলেন, কোন্ জনপদ সর্ব্বশেষে অতিক্রমপূর্ব্বক সমুদ্রসন্দর্শন লাভ করিয়াছিলেন, দীর্ঘতমার উপাখ্যান হইতে তাহা অবগত হওয়া যায় না। তাহাতেই অনুমিত হয় যে, মহাভারতে এই উপাখ্যান সংযোজিত হইবার সময় ঐ সকল জনপদের বিবরণ তদানীন্তন আর্য্যগণ আদৌ অবগত ছিলেন না; তবে প্রাচ্য দেশে সেই প্রাচীন কালেই যে বলিনামক একজন প্রবল প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন এবং তাঁহার পঞ্চ পুত্র যে পাঁচটি বিভিন্ন ভূভাগ শাসন করিতেন, ইহা তাঁহারা অবগত হইয়াছিলেন; সুতরাং দীর্ঘতমা ঋষির উপাখ্যানরচনার পূর্ব্বে যে বলি রাজা প্রাচ্য দেশে রাজদণ্ড চালনা করিতেন এবং পরে তাঁহার পাঁচ পুত্রের পঞ্চনামে প্রাচ্য ভূভাগে যে পাঁচটি জনপদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, ইহা নিঃসংশয়িতরূপে অনুমিত হইতে পারে।

পশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে, মহাভারতের মূল উপাখ্যান খৃষ্ট-জন্মের অন্ততঃ দ্বাদশ শত বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী। (১) মহাভারতের প্রাচীন স্তর যে খৃষ্টজন্মের এক সহস্র বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল, তাহা একরূপ সর্ব্ববাদি-সম্মত মত। দীর্ঘতমার উপাখ্যান মহাভারতের মূল উপখ্যানরচনার সমকালে রচিত, কি তাহা তাহার অপর কোন স্তরের অন্তর্গত, নিশ্চিতরূপে বলিতে না পারিলেও, দীর্ঘতমার আখ্যানাংশ এবং তৎপ্রতিবিম্বিত সমাজের অবস্থাচিত্র হইতে অনায়াসে অনুমিত হইবে যে, দীর্ঘতমার উপাখ্যান মহাভারতের

(১) Main story deals with a period assigned in the absence of

মৌলিক-অংশরচনার অধিক পরে রচিত হয় নাই, এবং দীর্ঘতমা তাহার ব. পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। দীর্ঘতমা কল্পনার বরপুত্র নহেন। ইনি এক জন বৈদিক ঋষি; ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ১৪০—১৬৪ সূক্ত ইঁহার রচিত।

হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ এবং ভাগবতে মগধের বার্হদ্রথবংশীয় রাজগণের উল্লেখ আছে বার্হদ্রথবংশীয়গণের মগধশাসন ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত বলিয়া পরিগৃহীত হইয়াছে। বার্হদ্রথবংশীয়গণ ১২৮০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ হইতে ৬৩৭ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মগধে শাসনদণ্ড চালনা করেন। (১) এই বংশের কৃষ্ণদ্বেষী জরাসন্ধ সমধিক প্রসিদ্ধ। ইঁহার পুত্র সহদেবের রাজত্বকালে কুরু-পাণ্ডব-যুদ্ধ সংঘটিত হয়। জরাসন্ধ ১২৮০—১২৫৯ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে রাজত্ব করেন বলিয়া শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় তাঁহার "প্রাচীন ভারত" নামক ইংরাজী ইতিহাস-গ্রন্থে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

অঙ্গবংশীয় কর্ণ জরাসন্ধের সমকালবর্ত্তী বলিয়া মহাভারত ও হরিবংশ পাঠে অবগত হওয়া যায়। কর্ণ অঙ্গ হইতে ষোড়শ পুরুষ অধস্তন। (২) প্রতি পুরুষে ২০ বৎসর গণনা করিলে, অঙ্গ ও কর্ণের মধ্যবর্ত্তী ১৫ জন রাজা ৩০০ বৎসর অঙ্গদেশ শাসন করিয়াছিলেন। পুণ্ড্র অঙ্গের সহোদর ভ্রাতা ও সমকালবর্ত্তী। এই হিসাবে পুণ্ড্র জরাসন্ধের ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে বলি ১২৮০ + ৩০০ = ১৫৮০ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে; অতএব বলি ও তৎপুত্র পুণ্ড্র যে বৈদিক যুগের রাজা ও রাজকুমার, ইহা স্থির ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। দীর্ঘতমা ঋষির মহাভারতীয় উপাখ্যানেও বৈদিক যুগের সমাজ-চিত্রের রেখাপাত পরিদৃষ্ট হয়, এবং ইহা হইতে বলি ও পুণ্ড্রের বৈদিক যুগে আবির্ভাবের বিষয় বিশ্বাস করিবার বলবত্তর কারণ পাওয়া যাইতেছে।

ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের কয়েকটি সূক্তের রচয়িতা এক দীর্ঘতমা ঋষি। ঋগ্বেদীয় দীর্ঘতমা আপনার পিতার নাম উতথ্য এবং মাতার নাম মমতা

---

(১) Dutt's Ancient India.

(২) হরিবংশের ৩১ অধ্যায় অঙ্গবংশীয় রাজগণের নাম এইরূপে প্রদত্ত হইয়াছে;— (১) অঙ্গ, (২) দধিবাহন (৩) দিবিরথ (৪) ধর্ম্মরথ (৫) চিত্ররথ (৬) দশরথ বা লোমপাদ (৬) কন্যা শান্তা (৭) চতুরঙ্গ (৮) পৃথুলাক্ষ (৯) চম্প (১০) হর্য্যক্ষ (১১)

বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; (১) সুতরাং ঋগ্বেদের উতথ্যই যে মহাভারতের উতথ্য, এবং ঋগ্বেদীয় উতথ্যপুত্র দীর্ঘতমাই যে মহাভারতীয় উতথ্যপুত্র দীর্ঘতমা, তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ দেখা যায় না। স্বর্গীয় সাহিত্যসেবক উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয় স্বতন্ত্র পন্থা ও গণনাপ্রণালী অবলম্বন করিয়া ঋগ্বেদীয় দীর্ঘতমাকে ১৬৯০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দের ঋষি বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। (২) ইতিপূর্ব্বে হরিবংশ অবলম্বন করিয়া পুণ্ড্রের আবির্ভাবকাল ১৫৮০ পূঃ খৃঃ অনুমান করিয়াছি। দীর্ঘতমা ইহার ৩০ বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন বলিয়া অনুমান করিলে, বটব্যাল মহাশয়ের সময়ের সহিত আমার নির্ণীত সময়ের ৮০ বৎসরের পার্থক্য ঘটে। বটব্যাল মহাশয় প্রতি পুরুষে ৩০ বৎসর ধরিয়া গণনা করিয়াছেন; আমি ২০ বৎসর ধরিয়াছি। আমি প্রতি পুরুষে ৩০ বৎসর ধরিলে ঐ পার্থক্য আরও কমিয়া যায়। কিন্তু অতিপ্রাচীন কালের গণনায় এই সামান্য ৮০ বৎসরের পার্থক্য আদৌ ধর্ত্তব্য নহে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বলিপুত্র পুণ্ড্র বৈদিক যুগে, অর্থাৎ ১৫৮০ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন এবং স্থূলতঃ খৃষ্টের ১৬০০ বৎসর পূর্ব্বে, অথবা অদ্য হইতে ৩৫০০ বৎসর পূর্ব্বে, পুণ্ড্র রাজ্য স্থাপিত হয়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

দীর্ঘতমার আশ্রয়দাতা বলি সম্ভবতঃ গঙ্গাতীরে মালিনী (৩) বা তন্নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে রাজত্ব করিতেন। তাঁহার পর তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র অঙ্গ বলির সিংহাসন প্রাপ্ত হন, এবং তাঁহার অপর পুত্রগণ রাজ্যের অপরাপর অংশ আপনাদের মধ্যে বিভাগ করিয়া লইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। ইহাদের মধ্যে অঙ্গ ও কলিঙ্গ বংশের নরপতিগণ উত্তরকালে সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া পুরাণেতিহাসে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন; কিন্তু পুণ্ড্র-বংশীয় নরপতিগণের মধ্যে এক বাসুদেব ভিন্ন সম্ভবতঃ অপর কেহই খ্যাতি দেবীর বরলাভ করিতে পারেন নাই। মহাভারত, হরিবংশ, শ্রীমদ্ভাগবত

(১) ঋগ্বেদ, ১ম মণ্ডল, ১৫৮ সূক্ত, ৪।৬ ঋক্।

(২) সাহিত্য, ৮ম বর্ষ, ৭৯ পৃঃ।

(৩) সভাপর্ব্ব, ৫১ অঃ। ভীমসেন সম্ভবতঃ এই সময়েই তাঁহার সুবৃহৎ "পৌণ্ড্র"

ও বিষ্ণুপুরাণে একমাত্র পৌণ্ড্রক বাসুদেবের বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়. "কোশকার" পুণ্ড্রগণ সম্ভবতঃ ইঁহার সময়েই "ক্ষত্রধর্ম্ম" অবলম্বন করিয়া ভারতবর্ষের বীরজাতিগণের মধ্যে আসনলাভের চেষ্টা করিয়াছিলেন।

পঞ্চালে পাঞ্চালীর স্বয়ম্বরসভায় আমরা প্রথম পৌণ্ড্রক বাসুদেবের দর্শন পাই। তিনি উক্ত স্বয়ম্বরসভায় নিমন্ত্রিত হইয়া গমন করিয়া লক্ষ্যভেদের চেষ্টা করিয়াছিলেন। (১) তৎপরে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞোপলক্ষে ভীমসেনের দিগ্বিজয়কালে পৌণ্ড্রক বাসুদেবের সহিত তাঁহার ভীষণ যুদ্ধের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। অযোধ্যাধিপতি দীর্ঘযজ্ঞ, অঙ্গরাজ কর্ণ, মোদাগিরির অধীশ্বর কৌশিকী কচ্ছপতি মহৌজা এবং পৌণ্ড্রক বাসুদেব ভিন্ন অপর বহুসংখ্যক প্রাচ্যরাজগণের মধ্যে কাহারও সহিত যুদ্ধে ভীমসেনের ভীম বলপ্রদর্শনের বর্ণনা মহাভারতে পাওয়া যায় না। বাসুদেব মহাবল বলিয়া মহাভারতের এই স্থলে (২) বর্ণিত হইয়াছেন। ইহাতে বোধ হয় যে, মহাভারতের এই দিগ্বিজয়বর্ণনার পূর্ব্বে পুণ্ড্র দেশে বাসুদেব নামে জনৈক মহাবল নরপতি ছিলেন, এবং মহাভারতের ঐ অংশরচনার সময়ে অন্ততঃ পুণ্ড্র একটি প্রবল রাজ্য বলিয়া পরিগণিত হইত।

পৌণ্ড্রক বাসুদেব ভীমসেনের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে গমন করিয়াছিলেন, এবং তদুপলক্ষে উপঢৌকনস্বরূপ দশ সহস্র হস্তী প্রদান করিয়াছিলেন। (৩) হরিবংশে পৌণ্ড্রক বাসুদেবের নিযুত হস্তী থাকার বর্ণনা আছে। (৪) এই বর্ণনা অত্যুক্তিদোষে দূষিত হইতে পারে; কিন্তু ইহা হইতে অনুমিত হয় যে, এই সময়ে পুণ্ড্রদেশে বহুসহস্র হস্তী পাওয়া যাইত, এবং বাসুদেবের মত একজন প্রবল রাজার নিযুত না হউক, অযুত হস্তী থাকা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

যুধিষ্ঠিরের রাজচক্রবর্ত্তিত্বস্বীকারের পূর্ব্বে পুণ্ড্র-রাজ্য সম্ভবতঃ মগধ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল; কারণ, হরিবংশ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, মগধ-রাজ বিক্রান্ত জরাসন্ধ অষ্টাদশবার বৃষ্ণি-ভোজান্ধকদিগের রাজধানী

---

(১) এই নগরী অঙ্গবংশীয় চম্পের সময় হইতে চম্পা নামে বিখ্যাত হইয়াছে। ভাগলপুরের অনতিদূরে প্রাচীন চম্পা নগরের ভগ্নাবশেষ এখনও বর্ত্তমান আছে।

(২) আদি পর্ব্ব, ৮৭। ৮৮ অঃ।

থুরা আক্রমণ করেন। এই মথুরাযুদ্ধাভিযানে ও মথুরা-অবরোধে পৌণ্ড্রক বাসুদেব অন্যান্য রাজগণের সহিত জরাসন্ধের সহবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে সসৈন্যে সাহায্য করিয়াছিলেন।

চেদি-রাজ শিশুপাল জরাসন্ধের আশ্রিত ছিলেন। বিদর্ভরাজনন্দিনী রুক্মিণীর সহিত শিশুপালের পরিণয়সম্বন্ধ স্থির হয়; কিন্তু দ্বারকানাথ কৃষ্ণের কুটিল আচরণে এই বিবাহ সম্পন্ন না হওয়ায়, জরাসন্ধ সসৈন্যে কৃষ্ণকে বিদর্ভে আক্রমণ করেন। বৃষ্ণি, ভোজ, অন্ধক ও দ্বারকা রাজচক্রের রাজগণ সহায়তা করেন। এই যুদ্ধেও আমরা পৌণ্ড্রক বাসুদেবকে বীর-বিক্রমে শর-চালনায় নিযুক্ত দেখিতে পাই।

এইরূপে মগধরাজের সহিত সতত সমরক্ষেত্রে সমুপস্থিত থাকিয়া পৌণ্ড্রগণের হৃদয়ে সমরানুরাগ সঞ্চারিত হয়; তাঁহারা রণ-কুশল হইয়া উঠেন, এবং রাজচক্রাধিনায়ক জরাসন্ধের দৃষ্টান্ত ও শিক্ষায় রণরসাস্বাদ পাইয়া পৌণ্ড্রক বাসুদেব সেই রণমদিরা স্বাধীনভাবে আস্বাদন করিবার অবসর-অন্বেষণে ব্যস্ত হন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

প্রাচীন ভারতবর্ষ অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনপদে বিভক্ত ছিল। মহাভারতে (১) উল্লিখিত হইয়াছে, ভারতবর্ষের জনপদসংখ্যা আর্য্যাবর্ত্তে ১৫১ এবং দক্ষিণাপথে ৫৭। বরাহমিহির স্ব-প্রণীত সংহিতায় (২) ভারতবর্ষের দুই শতেরও অধিক দেশের নামোল্লেখ করিয়াছেন। ভীমসেন হস্তিনা পুরী হইতে পৌণ্ড্র-রাজ্য পর্য্যন্ত আসিবার সময় পথে অন্যূন চল্লিশটি জনপদ পরাজয় করিয়াছিলেন। এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনপদের একজন অধিপতি বা রাজা থাকিতেন। এই সকল জনপদেশ্বরগণের মধ্যে এক এক জন সময় সময় প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া পার্শ্ববর্ত্তী রাজন্যগণকে স্ববশে আনয়ন করিয়া "সম্রাট", "রাজচক্রবর্ত্তী", "মণ্ডলেশ্বর" প্রভৃতি উপাধি গ্রহণ করিতেন। এইরূপে মগধরাজ জরাসন্ধ আপন বাহুবলে মগধে এক রাজচক্র প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহার অধিনায়ক হইয়াছিলেন। তৎপরে মহারাজ যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ উপলক্ষ করিয়া এক সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। কিন্তু এই সকল সাম্রাজ্য

---

(১) ভীষ্মপর্ব্ব ৯ অং।

বা রাজচক্র অধিক দিন স্থায়ী হইত না ; কারণ, রাজচক্রবর্ত্তিগণের বশ্যতা প্রথম একবার স্বীকার করিলে পর, সম্রাটগণ অধীন রাজন্যগণের সহিত আর বড় একটা সম্বন্ধ রাখিবার প্রয়াস পাইতেন না। অধীন ভূপালগণ আপন ইচ্ছাক্রমে অন্যান্য ভূপালগণের সহিত সন্ধিবিগ্রহাদি করিতে পারিতেন। এইরূপে মগধরাজ জরাসন্ধের মৃত্যুর পর মগধরাজচক্র দুর্ব্বল হইয়া যায়, এবং তাহার পরিবর্ত্তে যুধিষ্ঠিরের রাজচক্রবর্ত্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। পৌণ্ড্রক বাসুদেব ভীম কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া হস্তিনা রাজচক্রের অধীন হন বটে, কিন্তু রাজসূয়যজ্ঞের পর স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়াই উক্ত অধীনতা বিস্মৃত হইয়া স্বয়ং এক নব রাজচক্রপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস পান। পাশ্ববর্ত্তী রাজন্যগণের অনেককে পরাজিত করিয়া বা অন্য প্রকারে স্ববশে আনয়ন করিয়া স্বয়ং এক রাজচক্রের অধিনায়ক হন, (১) এবং তাঁহাদের সাহায্যে খ্যাতিমান্ বীরগণকে জয় করিয়া বীরকীর্ত্তিলাভের প্রয়াসী হন।

মথুরাপতি কংস জরাসন্ধের জামাতা ছিলেন। (২) বৃষ্ণিবংশীয় কৃষ্ণ সেই কংসকে নিহত করিয়া উগ্রসেনকে তদীয় সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই কারণে বৃষ্ণিবংশীয়গণকে মথুরা হইতে দূরীভূত করিবার জন্য মগধ-রাজ পুনঃপুনঃ মথুরা আক্রমণ করেন। বৃষ্ণিবংশীয়গণ মথুরায় অবস্থান তাঁহাদিগের পক্ষে নিরাপদ নহে ভাবিয়া, স্বগণ সহ দক্ষিণাপথে পলায়ন করিয়া সাগরোপকূলে দ্বারাবতী নগরে রাজধানী সংস্থাপনপূর্ব্বক তথায় এক নূতন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। এই নব রাজ্য ক্রমে বলসঞ্চয় করিয়া দক্ষিণাপথে প্রবল পরাক্রান্তও একটি রাজচক্রের কেন্দ্রস্বরূপ হইয়া উঠে; এবং বিদর্ভ, পাণ্ড্য, কেরল, কলিঙ্গ প্রভৃতি জনপদ তাহার প্রাধান্য স্বীকার করে। উগ্রসেন নামে দ্বারাবতীর অধিপতি হইলেও, বাসুদেব কৃষ্ণই প্রকৃত-পক্ষে এই নব রাজচক্রের নায়ক ছিলেন।

কূটনীতিক কৃষ্ণের নাম সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল। পঞ্চালে পাঞ্চালীর স্বয়ম্বরসভায় পৌণ্ড্রক প্রথম কৃষ্ণের দর্শন লাভ করেন; যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে তাঁহার সম্মানের সীমা জানিতে পারেন; এবং বিদর্ভে তাঁহার বীর্য্যবত্তার অনুভব করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়া

পৌণ্ড্রক বাসুদেব জগতে কেবল স্বয়ং "অদ্বিতীয় বাসুদেব" থাকিবেন, এইরূপ কামনা করিয়া, দ্বারাবতীর বিরুদ্ধে "অনেক সহস্র তুরঙ্গ-মাতঙ্গ-বলসমন্বিত শস্ত্রকোটিসংযুক্ত ও একলব্য (১) প্রভৃতি নৃপতিগণ কর্ত্তৃক সর্ব্বতোভাবে পরিবৃত হইয়া" সমরযাত্রা করিলেন। বাসুদেব কৃষ্ণের ন্যায় পৌণ্ড্রক বাসুদেবও সুদৃঢ় ও সুনির্ম্মিত শার্ঙ্গ, গদা, শঙ্খ ও চক্র সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ইনি কোন অংশেই আপনাকে বাসুদেব কৃষ্ণ অপেক্ষা হীন বিবেচনা করেন নাই, এবং হীন বিবেচনা করিবার কোন কারণও ছিল না; যে হেতু জরাসন্ধের চিরসাহচর্য্যে ইহার হৃদয়ে কৃষ্ণ-বিদ্বেষ সঞ্চারিত হয়, এবং এক্ষণে বর্দ্ধিত বলগর্ব্বে সেই বিদ্বেষ প্রবল প্রতিহিংসা-কামনায় পরিণত হইয়াছিল।

পৌণ্ড্রক বাসুদেব তুরঙ্গ-মাতঙ্গ-রথাদিবলসমন্বিত, খড়্গধারী, গদাহস্ত, চক্রধারী ও ধন্বী প্রভৃতি সৈনিক সমভিব্যাহারে ঘোর নিশীথসময়ে দ্বারাবতী-দ্বারে উপস্থিত হইয়া, সহচর ভূপালগণকে পুরদ্বারে স্থাপন করিয়া ভেরীনিনাদে যুদ্ধ-ঘোষণা করিলেন। ঘোরমেঘাচ্ছন্না তামসী রজনী বলিয়া পৌণ্ড্রক-সৈন্যগণ দীপিকাহস্তে দ্বারাবতী অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিল। এই সময়ে বাসুদেব কৃষ্ণ দ্বারাবতীতে উপস্থিত ছিলেন না। যাদবগণ মন্ত্রণা করিয়া যুদ্ধই কর্ত্তব্য স্থির করিলে, হলধর, সাত্যকি, উগ্রসেন, উদ্ধব প্রভৃতি মহাবল যাদবগণ সসজ্জ হইয়া পুরী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। পৌণ্ড্রক ও যাদব সৈন্যে ঘোরতর সংগ্রাম হইল। যাদবগণের মধ্যে সকলেই কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধের পর অল্পাধিক-পরিমাণে আহত হইয়া, যুদ্ধে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। তখন পৌণ্ড্রক বাসুদেব, যাদবগণ পরাজিত হইয়া পলায়ন করিয়াছে ভাবিয়া, পাষাণদারণ টঙ্ক, কুন্ত, কুঠার, কুণ্ডল, পাষাণকর্ষণকর শস্ত্রসমূহ দ্বারা (২) পুরীর প্রাকার ও প্রাসাদ সমুদায় ভেদ করিয়া দ্বারকালুণ্ঠনের অনুমতি প্রদান করিলেন।

---

(১) একলব্য নিষাদপতি, সুতরাং অনার্য্য। সম্ভবতঃ একলব্যের ন্যায় অনার্য্য-ভূপতিগণ পৌণ্ড্রক বাসুদেবের নায়কতাধীন রাজচক্র গঠিত করিয়াছিলেন।

(২) জরাসন্ধ মথুরাবরোধকালে যেরূপ সমরকৌশল প্রকাশ করেন, এবং অশ্মযন্ত্র, ক্ষেপণীয় মুদ্গর, উর্দ্ধক্ষেপণী, শস্ত্রপাত বিঘাত আদি যে সকল সামরিক শস্ত্র ও যন্ত্রাদি ব্যবহার করেন বলিয়া হরিবংশে বর্ণিত হইয়াছে, সেইরূপ সমরকৌশল প্রকাশ বা ওরূপ উন্নত [illegible] বর্ণনা পৌণ্ড্রকের দ্বারকাবরোধপ্রসঙ্গে নাই। ইহাতেই বোধ হয়

সৈনিকগণও অভিলষিতানুরূপ আদেশ পাইয়া তৎপ্রতিপালনে অগে. নিয়োজিত হইল।

এই সময়ে দ্বারাবতী-রক্ষার ভার বীরবর সাত্যকির উপর সমর্পিত ছিল। সাত্যকি অনেক বিবেচনার পর কূটবুদ্ধির আশ্রয়ে পুনরায় পৌণ্ড্রক সেনাগণকে আক্রমণের সঙ্কল্প করিয়া সৈন্য সমভিব্যাহারে পুরী হইতে পুনর্নিষ্ক্রান্ত হইলেন। আবার ঘোরতর যুদ্ধ আরব্ধ হইল। পৌণ্ড্রক বাসুদেবের সহিত সাত্যকি ও একলব্যের সহিত হলধর সম্মুখসংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। পৌণ্ড্রক বাসুদেবের সহিষ্ণুতায় ও বীর্য্যবত্তায় উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণই বিস্ময় প্রকাশ করিতে লাগিল, এবং বোধ হইল, যেন বিজয়শ্রী সত্বরই পৌণ্ড্রক-বীরের অঙ্কগতা হইবেন। এমন সময়ে বাসুদেব কৃষ্ণ দ্বারকায় প্রত্যাগত হইয়া সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইলেন। পৌণ্ড্রক কৃষ্ণকে পাইয়া সাত্যকির সহিত সমরে বিরত হইয়া পূর্ণপরাক্রমে তাঁহার প্রতি ধাবিত হইলেন। "মহাবল, নৃপসত্তম" পৌণ্ড্রক কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধে অসাধারণ বলবীর্য্য প্রকাশ করিয়া রথস্থ কৃষ্ণকেও অস্থির করিয়া তুলিলেন। অবশেষে কৃষ্ণ আপনার অমোঘ অস্ত্র সুদর্শন পৌণ্ড্রকের প্রতি নিক্ষেপ করিতে বাধ্য হইলেন। সুদর্শন পৌণ্ড্রকের মস্তক ধূল্যবলুণ্ঠিত করিল। একলব্যও হলধরের পরাক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া রণস্থলে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিলেন। পৌণ্ড্রক সৈন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। পৌণ্ড্রক রাজচক্রের অভ্যুদয় হইতে না হইতেই তাহার বিলোপ ঘটিল। (১)

কুরুক্ষেত্র সমরে ভারতের নানাস্থানীর রাজগণ যোগদান করিয়াছিলেন, এইরূপ উল্লেখ আছে। কিন্তু পৌণ্ড্রক বাসুদেবের নাম কুরুক্ষেত্রে সমাগত রাজগণের নামের মধ্যে উল্লিখিত নাই; তবে পুণ্ড্র সৈন্যগণ যে কুরুক্ষেত্র সমরে কৌরবপক্ষে সহায়তা করিবার জন্য উপস্থিত ছিল, তাহার উল্লেখ আছে। (২) ইহাতে বোধ হয় যে, পৌণ্ড্রক বাসুদেব কর্তৃক দ্বারকাবরোধ কুরুক্ষেত্র সমরের পূর্ব্বে সংঘটিত হইয়াছিল, এবং পৌণ্ড্রক বাসুদেবের পতনের পর পুণ্ড্ররাজ্য দুর্ব্বল ও হৃতগৌরব হইলেও বিলুপ্ত হয় নাই। (২) প্রবল নৃপতিগণ

(১) উদ্যোগপর্ব্ব, ৪ অঃ।

(২) বিদর্ভসমরে পৌণ্ড্রক বাসুদেবের পুত্র সুদেব এক অক্ষৌহিণী সৈন্য সহ বিপুলবিক্রমে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। এবং দ্বারকাবরোধকালে সুদেব পৌণ্ড্রকের সহিত যান নাই।

(কুরু)ক্ষেত্র মহাসমরে আমন্ত্রিত হইয়া যোগদান করায় তৎপরে পুণ্ড্রের মত ক্ষুদ্র রাজ্যের প্রতি অপর কোন রাজচক্র দৃষ্টিপাত করিবার কি যাদবগণ পৌণ্ড্রের দ্বারকাবরোধের প্রতিশোধ লইবার অবসর প্রাপ্ত হন নাই।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

বিষ্ণুপুরাণ (১) ও ভাগবতে (২) শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক পৌণ্ড্রক বাসুদেবের বধবৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবতের বর্ণিত পৌণ্ড্রক-বধ-বৃত্তান্তের সহিত হরিবংশ-বর্ণিত বৃত্তান্তের যে বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়, তাহাতে পৌরাণিক পৌণ্ড্রক বাসুদেব ও মহাভারত-কথিত ও হরিবংশোক্ত পৌণ্ড্রক বাসুদেব যে এক, তদ্বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট কারণ আছে। ভাগবতে পৌণ্ড্রক বাসুদেব করূষদেশাধিপতি (৩) বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন, এবং বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবত উভয় পুরাণেই শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক কাশীধামে পৌণ্ড্রক-নিধনের উল্লেখ আছে। মহাভারত ও হরিবংশে পৌণ্ড্রপতি "বাসুদেব" নামে অভিহিত হইয়াছেন, অথচ উক্ত উভয় পুরাণে পৌণ্ড্রক-নামীয় নরপতি অভিমানবশতঃ "বাসুদেব" বলিয়া আপনাকে প্রচার করিয়াছিলেন, এইরূপ উল্লেখ আছে। বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবতের "পৌণ্ড্রক-বধ" উপাখ্যান হইতে প্রতীত হয় যে, শৈব-ধর্ম্মের গ্লানি ও বৈষ্ণব-ধর্ম্মের সুখ্যাতি করিবার উদ্দেশ্যেই ঐ দুইটি উপাখ্যান সঙ্কলিত হইয়াছে। সৌরপুরাণ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, পুণ্ড্র অঞ্চলে প্রথমে শৈব-ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব ছিল। (৪) এই কারণে বিশ্বাস হয় যে, শৈব পুণ্ড্রগণকে উপলক্ষ করিয়া বিষ্ণুপুরাণে ও ভাগবতে মহাভারতোক্ত প্রাচীন পৌণ্ড্রক বাসুদেবের নামে উক্ত উপাখ্যান ঐ ভাবে সন্নিবেশিত হইয়াছে। শৈব-বৈষ্ণব-বিরোধ পৌরাণিক যুগে ঘটিয়াছিল, পৌণ্ড্রক বাসুদেব মহাভারতীয় যুগে বর্ত্তমান ছিলেন, এবং মহাভারত ও হরিবংশের কোথাও শৈব বা শৈবমিত্র বলিয়া পৌণ্ড্রকের বর্ণনা নাই।

---

(১) ৫ম অংশ, ৩৪ অঃ।

(২) দশম স্কন্ধ, ৬৬ অঃ।

(৩) শোণ ও গঙ্গার মধ্যবর্ত্তী জনপদের নাম করূষ। মনু কারূষগণকে ব্রাত্য বৈশ্য বলিয়াছেন। মনু, ১০ অঃ।

পৌরাণিক যুগে শৈব-বৈষ্ণব-বিরোধ লইয়া অনেক উপাখ্যান রচিত মিথ্যা কথা প্রকটিত হইয়াছে। সৌরপুরাণে বৈষ্ণব-সম্প্রদায়বিশেষের জনৈক প্রবর্ত্তক মধ্বাচার্য্যের নামেও কুৎসা স্থান পাইয়াছে। (১) আবার ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে, পুণ্ড্রগণ সম্ভবতঃ শৈবধর্ম্মাবলম্বী ছিল বলিয়া, তাহাদিগকে বৈশ্য ও শৌণ্ডিকা-সমুৎপন্ন অস্পৃশ্য হীন বর্ণসঙ্কর জাতি বলিয়া প্রচার করা হইয়াছে; (২) অথচ ব্রহ্মবৈবর্ত্তকার, বিদ্বেষপ্রসূত ধর্ম্মান্ধতা-বশতঃ, পুণ্ড্রগণকে যে বেদস্থানীয় মহাভারত ক্ষত্রিয় বলিয়াছেন, (৩) এবং ব্রহ্মবৈবর্ত্ত অপেক্ষা প্রামাণ্যতর (৪) মনুস্মৃতিতে যে পুণ্ড্রগণের যাগযজ্ঞ-ক্রিয়াবিহীনতা ক্ষত্রিয় হইতে শূদ্রশ্রেণীতে অবনমিত হইবার উল্লেখ আছে, (৫) তাহা আদৌ লক্ষ্য করেন নাই। কিন্তু মহাভারতের প্রমাণ বা মনুর শাসন পৌরাণিক যুগের অধঃপতিত সমাজে দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। ক্ষত্রিয়তাপ্রাপ্ত পুণ্ড্রগণ রাজ-জাতীয় হইলেও পরবর্ত্তী হিন্দু-সমাজে দূরে নিক্ষিপ্ত, হীন ও অস্পৃশ্য হইয়াই রহিয়াছেন। পুরাণশাসন লঙ্ঘন করিয়া, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পর পুণ্ডরীমাত্রেই সদাচারসম্পন্ন ও বৈষ্ণব-ধর্ম্মাবলম্বী হইলেও, সৎব্রাহ্মণগণ ইহাদের পৌরোহিত্য স্বীকার বা জলগ্রহণ করেন না।

পুণ্ডরীগণ চৈতন্যদেবের শান্তিপূর্ণ বৈষ্ণব-ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেও, ইহাদের পূর্ব্বপুরুষাগত তেজঃ, সাহসিকতা ও ঐক্যবল একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। ইহাদের সাহসিকতা ও ঐক্যবলের পরিচয় এখনও সময়ে সময়ে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

মালদহের ভূতপূর্ব্ব মাজিষ্ট্রেট স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয় বর্ত্তমান পুণ্ডরী জাতি সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি। তিনি লিখিয়াছেন ;—

"In the District of Malda we still have an important caste

---

(১) ৪০অঃ।

(২) শব্দকল্পদ্রুম, পৌণ্ড্রক শব্দার্থস্থলে ধৃত ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-বচন দ্রষ্টব্য।

(৩) মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ১০৪ অঃ।

(৪) শ্রুতিস্মৃতিপ্রমাণানাং বিরোধো যত্র দৃশ্যতে।

alled Punduri or Punra, * * * * They seem to be descendants of the ancient Pundras—at one time the ruling caste in the country. They are a pushing race, numbering in their ranks pleaders, Government clerks, money-lenders and traders. Many of them work as rearers of silk-worms, and weavers of silken fabrics. They form a rich and an influential caste; but even to this day they have not succeeded in securing the services of pure Brahmins as priests. (১)

দেশীয় শিল্প। *

প্রাচীন ভারতের শিল্প-নৈপুণ্য জগতের বিস্ময়ের বিষয়। যাঁহারা প্রাচীন মন্দিরে বা তাহার পরবর্ত্তিকালে নির্ম্মিত মসজিদে, ভগ্ন ধূল্যবলুণ্ঠিত চূড়, বনলতাগুল্মাচ্ছাদিত দুর্গে বা প্রাসাদে ভারতের শিল্প-নৈপুণ্য দেখিয়াছেন, তাঁহারাই বিস্মিত হইয়াছেন; তাঁহারাই মনে করিয়াছেন, যে দেশে শিল্পের এমন উৎকর্ষ হইয়াছিল, সে দেশের লোক কেমন করিয়া সে শিল্প-কৌশল ভুলিয়া গেল—রুচির কি শোচনীয় বিকারে তাহারা এখন বিদেশী শিল্প শিখিতে ব্যস্ত! তাহাদের হৃদয় হইতে কি সেই বহুকালের অনুশীলনে উৎকর্ষ-প্রাপ্ত শিল্পবৃত্তি সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়াছে! নানা কারণে রুচির বিকারে আমাদের এই দুর্দ্দশা। কলিকাতা গভর্মেণ্ট-শিল্পবিদ্যালয়ের কর্ত্তা মিষ্টার হেভেল এই বিষয়ে একখানি পুস্তক রচনা করিয়াছেন। আমরা তাঁহার প্রবন্ধ হইতে বর্ত্তমান প্রবন্ধের সঙ্কলন করিলাম।

ভারতে ইংরাজ গভর্মেণ্টের শিক্ষাবিভাগের ফল মোটের উপর আশানুরূপ হয় নাই। নানা পরীক্ষা ও অসাফল্যের পর এখন শিক্ষা ক্রমে দেশীয়দিগের বিশেষ ও বহুল অবস্থার উপযোগী হইয়া আসিতেছে; কিন্তু এখনও

শিক্ষাবিভাগের কার্য্য পরীক্ষা-যুগ অতিক্রম করে নাই, এখনও প্রথম সংস্থপনকালের অনেক ভ্রম নিরাকৃত হয় নাই। শিক্ষাব্যাপারে ইংলণ্ডই বহুকাল অন্যান্য য়ুরোপীয় দেশের সমকক্ষতা লাভ করিতে পারে নাই। কাজেই, বিদেশে—এই বৃহৎ সাম্রাজ্যের নানা জটিল বিষয়ের বিচারে বিক্ষিপ্তচিত্ত শাসকদিগের পক্ষে জন্মভূমিতেও বহুদিন অনাদৃত শিক্ষাকার্য্যে সম্যক উৎকর্ষ লাভ করিতে না পারা নিতান্তই স্বাভাবিক। কিন্তু শিল্প-শিক্ষাবিভাগে এই একটু বিশেষত্ব লক্ষিত হয় যে, শিক্ষাসংক্রান্ত অন্যান্য বিভাগে অসাফল্য হইতে অভিজ্ঞতা লব্ধ হইয়াছে; ভ্রম হইতে উন্নতির সূত্রপাত হইয়াছে; কেবল এই বিভাগই এখনও সঙ্কটসঙ্কুল ও সন্দেহসমাকুল। এ সম্বন্ধে বহু তর্কবিতর্কে কোন ফল ফলে নাই। ইহাতে বিস্মিত হইবার বিশেষ কারণ আছে;—ভারতের অবস্থা শিল্পশিক্ষার পক্ষে বিশেষ অনুকূল। ইতিহাসের আরম্ভ হইতেই ভারতবর্ষ শিল্পশালা বলিয়া খ্যাত। এ দেশে বৃটিশশাসন সংস্থাপিত হইবার পূর্ব্বে কখনও দেশীয়দিগের শিল্পবৃত্তির দমন হয় নাই। ব্রাহ্মণ্য (হিন্দু) বৌদ্ধ, শিখ, মহম্মদীয়, ভারতীয় শিল্পে সকল ধর্ম্মেরই প্রভাব সুস্পষ্ট। উত্তর দিক হইতে বিজয়লাভলোলুপ যে সকল জাতি পর পর আসিয়া দেশের নানা দুর্গতি করিয়াছে, তাহারাও শিল্পসহচর ছিল; তাহারা যে সকল শিল্পকীর্ত্তিতে আপনাদের সময়ের ইতিহাস রাখিয়া গিয়াছে, সে সকল আজও জগতের বিস্ময়ের সামগ্রী। ইংরাজশাসনে ভারতে—এ দেশে অজ্ঞাতপূর্ব্ব শান্তি সংস্থাপিত হইয়াছে, প্রজা নানা বিষয়ে স্বাধীনতা পাইয়াছে, দেশে আইন, শৃঙ্খলা, জাগতিক উন্নতি, সবই হইয়াছে। যে জাতির শিল্পশিক্ষাবৃত্তি স্বভাবতঃই প্রবল, সে জাতির পক্ষে শিল্পে উন্নতিলাভের এই অসাধারণ সুযোগ সত্ত্বেও, বিগত পঞ্চাশ বৎসরে ভারতীয়-শিল্পের ক্রমোন্নতি না হইয়া ক্রমাবনতি হইতেছে কেন?

যাঁহারা প্রকৃত অবস্থা অবগত আছেন, তাঁহারা জানেন যে, ভারতের অভিজাতবংশীয় ও ধনীদিগের রুচি বিকৃত, দেশীয় স্থাপত্য বিনষ্টপ্রায়, দেশীয় শিল্পজাত এখন প্রায় বিদেশী ক্রেতার ইচ্ছামত নির্ম্মিত। দেশীয়গণ দেশীয় শিল্পের প্রতি দারুণ অনাদরপ্রযুক্ত মনে করেন যে, যে দ্রব্য য়ুরোপীয় নহে, তাহা ভাল হইতে পারে না। দেশীয় বড়মানুষেরা দেখাইতে চাহেন যে, তাঁহারা ইংলণ্ডীয় শিল্পজাত ভালবাসেন। তাঁহারা বিদেশী

সাধু বিক্রেতারা তাঁহাদের নিকট নকল ছবি আসল বলিয়া চালাইয়া অসম্ভব অধিক মূল্য আদায় করে। প্রকৃত জীবন্ত ভারতীয় শিল্প এখন সাধারণতঃ দূর মফস্বলে বিদ্যমান। দেশীয়গণের নিকট তাহা 'সেকেলে' বলিয়া অনাদৃত। যাহারা ভারতের শিল্পজাত বিচিত্র বস্তুরূপে বিদেশে বিক্রয় করিয়া ব্যবসা করে, তাহারাও এখন বুঝিতেছে যে,—ব্যবসায়ে আর তেমন লাভ নাই। কারণ, ভারতীয় শিল্পের নমুনা বলিয়া পরিচিত অতি তুচ্ছ দ্রব্য এখন আর পর্যটকের প্রলোভনীয় হইতেছে না; ভারতবর্ষ হইতে যে শিল্পসৌন্দর্য্যশূন্য অলঙ্কার বিক্রয়ার্থ য়ুরোপে ও আমেরিকায় প্রেরিত হয়, তাহা এখন আর প্রাচ্যসম্ভব বলিয়া কল্পনার মোহালোকেও উদ্ভাবিত হইয়া উঠিতেছে না। সত্যের অনুরোধে স্বীকার করিতে হয় যে, যে কারণেই হউক, ইংরাজশাসন হইতেই ভারতের শিল্প বিনষ্টপ্রায়, ভারতবাসীর রুচি বিকৃত। ইংলণ্ডের শিল্পভাণ্ডার হইতে এ ক্ষতির পূরণ হয় নাই।

উপরে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা অতিরঞ্জিত নহে। গভর্মেণ্টও এ বিষয়ের উপলব্ধি করিয়াছেন। সমিতিতে, প্রস্তাবে, মন্তব্যে এ বিষয়ের বিচার ও আলোচনা হইয়াছে; কিন্তু বিষয়ের গুরুত্বানুরূপ কিছুই হয় নাই;—কেবল ভাসা ভাসা মন্তব্য, কেবল বাক্যসার পুরাতন কথার মত শেষ হইয়াছে। এক জনের স্কন্ধে দোষ চাপাইতে হইবে, তাই ভারতের শিল্পবিদ্যালয়গুলিকেই দোষী স্থির করা হইয়াছে। পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন, শিল্পশিক্ষা সম্বন্ধে কোন স্থিরসিদ্ধান্তহীন ভিন্ন ভিন্ন শাসনাধীন শিল্পবিদ্যালয়গুলির পক্ষে কি ৩৫,০০০০০০০ কোটি লোকের মনে শিল্পসম্বন্ধে নূতন ভাবের প্রাদুর্ভাব করান, বা যে সকল অবস্থাহেতু শিল্পের দুর্দ্দশা, সেই সকল অবস্থার পরিবর্ত্তন করা সম্ভব? তদ্ভিন্ন যাঁহার বিন্দুমাত্র বুদ্ধি আছে, তিনিই স্বীকার করিবেন যে, ভারতীয় শিল্পের উন্নতি অবনতি শিল্পবিদ্যালয়ের কার্য্যের উপর নির্ভর করে না।

এ দেশে বৃটিশশাসনের পূর্ব্বে মোগল-সম্রাজ্যের বিচ্যুতিকালে দেশে অশাসন, অশান্তি ও বিশৃঙ্খলাপ্রযুক্ত ভারতীয়-শিল্পের অবনতি হইয়াছিল। কিন্তু যখন বৃটিশশাসনে দেশের সে অবস্থার নিবারণ হইল, তখন শিল্পের উন্নতিরই সম্ভাবনা ছিল। তাহা হয় নাই। নিশ্চয়ই এ দেশে বৃটিশ গভর্মেণ্ট

শিল্প সম্বন্ধে অনিষ্টকর কতকগুলা প্রভাবের সূচনা হইয়াছিল। এক৹ কারণ এই যে, মাদ্রাজ, বোম্বাই ও কলিকাতা, এই তিন স্থানে বৃটিশ শক্তির অভ্যুদয়;—এই তিন স্থানে শিল্পচর্চ্চা ছিল না। "কোম্পানী"র লোকদিগের বৃহৎ সাম্রাজ্যশাসনের কল্পনাও ছিল না। তাঁহারা ব্যবসায়বাণিজ্যের কাযে, আপনাদের ধনসম্পত্তির সংরক্ষণে ব্যস্ত থাকিতেন। তাঁহাদের আদর্শ দেশীয় শিল্পের উপর কিরূপ প্রভাব সংস্থাপিত করিতেছে, তাঁহারা তাহা দেখিতেন না। তাঁহারা তৎকালে ইংলণ্ডে প্রচলিত আদর্শে এ দেশে গৃহাদির নির্ম্মাণ করিতেন, এবং সর্ব্ব বিষয়ে যথাসম্ভব স্বদেশের অনুকরণ করিতেন। তাহাতে তাঁহাদের জাতীয় গর্ব্ব অক্ষুণ্ণ ও স্বদেশের স্মৃতি সজীব থাকিত। এ দেশে যখন ইংরাজশক্তি স্থায়িরূপে প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন ইংরাজাধিকৃত প্রধান সহরের আদর্শ চারি দিকে গৃহীত হইতে লাগিল। দেশীয় রাজন্যবর্গ ইংরাজী ধরণে গৃহনির্ম্মাণ ও গৃহসজ্জাকরণ নব্য সভ্যতার ও ইংরাজের সহিত সহানুভূতির পরিচায়ক বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। ভারতীয় শিল্পের সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হইল। একে ত ইংলণ্ডে তৎকালে প্রচলিত শিল্পাদর্শ ও প্রাচ্য শিল্পাদর্শ সম্পূর্ণ বিভিন্ন, তাহাতে আবার তখন ইংলণ্ডেও শিল্পরুচির অবস্থা শোচনীয়। তখন ইংলণ্ডে কলের প্রতিযোগিতায় হাতে-গড়া শিল্পজাত উৎসন্নপ্রায়, প্রাচীন রুচির নামে স্থাপত্যে ও ললিতকলায় স্বাতন্ত্র্য বিসর্জ্জিত।

ইংলণ্ডে এ রুচির বিকার না হইলেও ইংরাজগণ সহসা ভারতে শিল্পোৎকর্ষের প্রকৃত প্রণালীর উপলব্ধি করিতে পারিতেন কি না সন্দেহ। অ্যাংলো-স্যাক্‌সন্ জাতির অন্ধ কুসংস্কার এই যে, তাহাদের পক্ষে যাহা ভাল, জগতে আর সকলের পক্ষেই তাহা যথেষ্ট। ভারতে শিক্ষা ব্যাপারে ইংরাজ এই ধারণাতেই চালিত হইয়াছেন। তবে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে এ দেশে ইংরাজ-স্থাপত্যের গুণ এই যে, ইংলণ্ডে যাহা ভাল, ভারতে তাহারই অনুকরণ হইত। তাই তৎকালে নির্ম্মিত গৃহগুলার একটা গাম্ভীর্য্যশ্রী আছে। তদ্ভিন্ন সেগুলা দেশের অবস্থার উপযোগী। কোম্পানীর শাসনের পর হইতে এ দেশে শিল্পশিক্ষার উন্নতি হইয়াছে সত্য, কিন্তু পূর্ব্বে যে ক্ষতি হইয়াছিল, তাহার পূরণ হয় নাই। সুখের বিষয়, এখন সকলে বুঝিতেছেন যে, ভারতের সভ্যতা, শিল্প ও সাহিত্য পুরাতন; সে সকলের উন্নতির উপায় দেশেই

শিল্পের অধোগতি নিবারিত হয় নাই। এই অধোগতিনিবারণের উপায় উদ্ভাবিত হয় নাই। শিল্প সম্বন্ধে লোকের রুচির বিকারের বিষয় বিবেচনা করা আবশ্যক। যত দিন লোকের মনে এই বিশ্বাস থাকিবে যে, শিল্প একটা খেয়ালমাত্র, তাহা গুরুতর কার্য্য হইতে চিত্ত বিক্ষিপ্ত করিবার জিনিস, কিন্তু দেশশাসনের গুরুভারকাতরদিগের যথেষ্ট ব্যক্তিগত মনোযোগের উপযোগী নহে—ততদিন ভারতীয় শিল্পের অবনতি অনিবার্য্য। "কাজের লোক" বৃটিশ মনে করে, রেলবর্ত্ম, খাল, রাস্তা, সেতু, দুর্ভিক্ষদমন, দেশের স্বাস্থ্যোন্নতি, পুলিশ ও কলকারখানার বিস্তার, এই সকলেই ভারত পুনর্জীবিত হইবে, শিল্প ইহার পর সুবিধামত সময়ে উন্নতিলাভ করিবে। বৃটিশ শিল্পীদিগের দোষেই বর্ত্তমান শতাব্দীতে ইংলণ্ডে শিল্পের উপযুক্ত আদর হয় নাই। এখন যে সে অনাদর বিদূরিত হইতেছে তাহার কারণ এই যে, সর্ব্ববিধ শিল্পীর সুশিক্ষার ফলে লোক বুঝিতেছে—The elementary basis and justification of all techniec Art lies in the ultimate perfection of utility and that even the highest forms of Art gain in dignity from being associated with a utilitarian purpose.

ভারতবর্ষ বড় রক্ষণশীল। এ দেশে লোকে এই সকল কথা বুঝিতে পারিবার পূর্ব্বেই দেশীয় শিল্প বিলুপ্ত হইয়া যাইতে পারে। তবে আশা করা যায় যে, ভারতীয় শিল্পের অবনতির কারণ বিবেচনা করিয়া গর্ভমেণ্ট বুঝিবেন যে, এখনও কতকটা ক্ষতিনিবারণ সম্ভব। ভারতীয় শিল্প অর্থে আমরা প্রধানতঃ সাধারণ হাতেগড়া শিল্পজাতের কথা বলিতেছি; কারণ, চিত্রবিদ্যা ও ভাস্কর্য্য য়ুরোপে যে সকল দিকে বিশেষ উৎকর্ষলাভ করিয়াছে, নানা কারণে ভারতে সে সকল দিকে বিশেষ উৎকর্ষে উপনীত হয় নাই। য়ুরোপীয় চিত্র ও ভাস্করকীর্ত্তির প্রতি অনুরাগে দেশীয় বড়মানুষদিগের রুচির বিশেষ উন্নতি হয় নাই। তাঁহারা য়ুরোপীয় ললিত কলার বাস্তবত্বে মুগ্ধ বটে, কিন্তু শিল্প-সৌন্দর্য্য উপলব্ধির ক্ষমতা তাঁহাদের নাই। ইংলণ্ডেও কেবল শিল্পপ্রদর্শনীতে বিশেষ ফলোদয় হয় নাই।

ভারতীয় শিল্পের এই দুর্দ্দশার কারণ এই যে, তাহা আর ভারতবাসী-দিগের ভাল লাগে না। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বের ইংরাজী শিল্পের মত ইহা আন্তরিকতাশূন্য কৃত্রিম। কাজেই ভারতীয় শিল্পের কারণানুসন্ধান করিতে

দেশের রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্ত্তনের ফল নহে। "কাজের লোক ইংরাজের অধীনে ভারতবাসী যে নিতান্তই কল্পনা ও আধ্যাত্মিকতা ছাড়িয়া নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যের ব্যবসায় (Industrial pursuit) আরম্ভ করিয়াছেন, এমন নহে। কারণ, দেখা যাইতেছে, দেশের জনসংখ্যার অনুপাতে দেশীয় শিল্পী কারিকর—(Artisan)-দিগের সংখ্যা বাড়ে নাই, বরং কমিয়াছে ও কমিতেছে; দেশীয় মহাজন এখনও শিল্পজাতোৎপাদক ব্যবসায়ে মূলধন ঢালিতে নারাজ। আবার ইংরাজাধিকারের পূর্ব্বে দেখা যাইত, ভারতীয় শিল্প বিদেশীয় প্রভায় প্রভাবিত হইত ও সে প্রভাব ক্রমে আত্মসাৎ করিয়া লইত। তবে গত পঞ্চাশ বৎসরের ভারতীয় শিল্পের এ দুর্দ্দশার কারণ কি ?

যে দেশে স্থাপত্যের কিছুমাত্র উন্নতি হইয়াছে, সে দেশে স্থাপত্যের ইতিহাস বুঝিলেই সকল শিল্পের ইতিহাস বুঝাইবে। সকল জাতির মধ্যেই শিল্প সম্বন্ধে নূতন প্রভাব প্রথমে গৃহনির্ম্মাণে প্রকটিত হইয়াছে। জাতীয় রুচির বিকারে স্থাপত্যের অবনতি হয়, আর সঙ্গে সঙ্গে সকল শিল্পেরই দুর্দ্দশা ঘটে। চিত্রবিদ্যা ও ভাস্কর্য্য হইতে নানা সামান্য শিল্প স্থাপত্য-প্রসূত। তদ্ভিন্ন তন্তুবায় ও কুম্ভকার, এমন কি, পিত্তলাদি ধাতব দ্রব্যের নির্ম্মাতাদিগের ব্যবসায়েও স্থাপত্যের প্রভূত প্রভাব।

কাজেই ভারতীয় শিল্পের অবনতির কথা বুঝিতে হইলে প্রথমেই বুঝিতে হইবে যে, বৃটিশশাসন ভারতে স্থাপত্যের উপর কিরূপ প্রভাব সংস্থাপন করিয়াছে। গভর্মেণ্টের সভাসমিতি এই কথাটিই বুঝেন নাই; কাজেই তাঁহাদের তর্কে—বিচারে কোন ফল হয় নাই।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, "কোম্পানীর" আমলেই অ্যাংলোইণ্ডিয়ান স্থাপত্যের বিকৃত রুচিপ্রভায় ভারতীয় স্থাপত্য প্রভাবিত হইয়াছিল। গর্ভমেণ্ট পূর্ত্ত-বিভাগের স্থাপন করিয়া অনিষ্টের যাহা অবশিষ্ট ছিল, তাহাও পূর্ণ করিয়াছেন। এই বিভাগের স্থাপনকারীরা বুঝেন নাই যে, এই বিভাগের স্থাপনে দেশীয় শিল্পের ভবিষ্যতের জন্য গভর্মেণ্ট দায়ী হইলেন। তাঁহারা শিল্পের বিষয় এত অল্প বুঝিতেন (বা গ্রাহ্য করিতেন) যে, পূর্ত্তবিভাগের কর্ম্মচারিগণকে স্থাপত্য-বিশারদ করিবার কোন বন্দোবস্ত করেন নাই। পূর্ত্তবিভাগে স্থাপত্য অপেক্ষা "সিভিল এঞ্জিনিয়ারিং" অধিক আদৃত। যেখানে তিন চারি বৎসরে উভয়

চয় লইয়া আসেন, তাহাতে ইষ্ট না হইয়া বরং অনিষ্ট হয়; তাহারই প্রভাবে তিনি ভারতে অবলম্বনীয় পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া থাকেন। এ দেশে পূর্ত্তবিভাগে যে স্থাপত্য প্রচলিত, তাহা মামুলী আমল হইতে নানা ভ্রমপ্রসূত। এ দেশে গভর্মেণ্টের গৃহে স্থাপত্যের নামে যে বীভৎস কুকাণ্ডের অভিনয় হইয়াছে, তাহা আর না বলাই ভাল। কলিকাতা, বোম্বাই ও সিমলা হইতে সুদূর মফস্বল পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র গভর্মেণ্টের গৃহের স্থাপত্য অতি কুৎসিত। (১) এ কথা বলা বাহুল্য যে, এ দেশে পূর্ত্তবিভাগের কর্ম্মচারীদিগের মধ্যেও কেহ কেহ বিশেষ দক্ষতা দেখাইয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা বর্ত্তমান শিল্পোন্নতির পূর্ব্বে ইংলণ্ডে প্রচলিত স্থাপত্যে বিশেষ উৎকর্ষবিধানের চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহারাও এ দেশে অধুনা-বিলোপোন্মুখ শিল্পের সমুচিত আদর করিতে পারেন নাই। ভারতের এই অত্যুন্নত শিল্পের এরূপ অনাদর সভ্যতাসহায় ইংরাজ জাতির কলঙ্কের কথা।

ভারতের শিল্পনাশে দেশের যথেষ্ট ক্ষতি হইবে; তাহার নিবারণ কর্ত্তব্য ও সম্ভব। ইংরাজ এক দিকে যেমন দিয়াছেন, অপর দিকে আবার তেমনই লইয়াছেন। নূতনের দানের সঙ্গে পুরাতনের বিলোপ হইতেছে। রেলবর্ত্ম ও রাজপথের বিস্তার, সেতুনির্ম্মাণ, খালখনন, ক্ষেত্রে জলসেচনের বন্দোবস্ত, দুর্ভিক্ষদমন—এ সব হইয়াছে; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দেশীয়দিগের শিল্পরুচির বিকার হওয়াতে ভারতের গৌরবের ধন শিল্পজাতের বিলোপ সাধিত হইতে চলিয়াছে।

সৌভাগ্যের বিষয়, রাজপুতানা, পঞ্জাব প্রভৃতি কোন কোন স্থানের অধিবাসিগণ এখনও শিল্পবিষয়ে মাদ্রাজ, বঙ্গদেশ প্রভৃতি স্থানের নবশিক্ষায় দীক্ষিতদিগের অপেক্ষা স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছে;—য়ুরোপীয় "ফ্যাশানে"র গতানুগতিক হয় নাই। ইংরাজী বিশারদগণ মনে করেন, শিল্প নিতান্তই "ফ্যাশান"; আবার তাঁহারা যে "ফ্যাশানের" অনুকরণ করেন, পূর্ত্তবিভাগের আদর্শেই তাহার প্রকাশ। কাজেই তাঁহাদের শিল্পবৃত্তির উৎকর্ষসাধন-সম্ভাবনা সুদূরপরাহত।

---

(১) মিষ্টার এফ্‌, এস্‌, গ্রাউস কিছু দিন পূর্ব্বে "কলিকাতা রিভিউ" পত্রে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহার ভাবার্থ এই,—ভারতে স্থাপত্য বিলুপ্ত শিল্প নহে। তাহার প্রসার সম্ভব। যাঁহারা বলেন, ভারতের শিল্প সেকেলে, তাঁহারা অধুনা-নির্ম্মিত কুশ্রী গৃহের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা বুঝেন না যে, এই সকল [illegible]

এখন দেশীয় রাজন্যবর্গ ও দেশীয় ধনীরা গৃহনির্ম্মাণকালে পূর্ত্তবিভাগের লোক নিযুক্ত করেন। ফলে বংশপরম্পরায় ভারতীয় শিল্পে শিক্ষিত শিল্পীদিগের স্থানে পূর্ত্তবিভাগের শিক্ষায় শিক্ষিত লোক নিযুক্ত হয়। গৃহে শ্রী বা শিল্পসৌন্দর্য্য কিছুই থাকে না। (১) গৃহসজ্জাও ইংরাজী অনুকরণে; কক্ষপ্রাচীরে প্রতীচ্য চিত্র, কক্ষ য়ুরোপীয় কার্পেটে ও য়ুরোপীয় সজ্জায় সজ্জিত, ভারতে ইংরাজ শাসনে ইহাই হইতেছে। কাজেই দেশীয় শিল্পের অবনতি ঘটিতেছে; তাই দেশীয় শিল্পী অন্নাভাবে "জাতব্যবসা" ছাড়িয়া হলচালন করিতেছে। এ অবস্থার পরিবর্ত্তন না হইলে দেশীয় শিল্পের বিলোপ অবশ্যম্ভাবী। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, য়ুরোপে ও আমেরিকায় ভারতীয় শিল্পের (curiosity) আদর হইয়াছে। ভারতে অনাদর ও বিদেশে আদর—ফল সমান। কিন্তু হায়—দেশের লোকের স্বতঃপ্রবৃত্তবৃত্তিতোষক যে শিল্প স্থাপত্যেই প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ বিকশিত হইয়াছিল, তাহা কি বিদেশীয় বিস্ময়োৎপাদক দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে? আন্তরিকতাই শিল্পের বিকাশের প্রধান উপকরণ; আন্তরিকতাই শিল্পের জীবন। বিদেশের জন্য যে শিল্পজাত প্রস্তুত হয়, শিল্পী তাহা বুঝে না; ক্রেতা তাহাতে শিল্পসৌন্দর্য্য চাহে না;—সে কেবল curiosity হিসাবে তাহা ক্রয় করে। বিদেশে বিক্রয়ে যে লাভ, দেশে অনাদরে ক্ষতি তাহার পরিমাণে শতগুণেরও অধিক।

আবার কেহ কেহ এ কথাও বলেন যে, দেশের অবস্থা বুঝিয়া পূর্ত্তবিভাগ বর্ত্তমান প্রণালীর অনুসরণ করিতেছেন;—এখন সাদাসিদা আবশ্যক গৃহের প্রয়োজন, তাহাতে শিল্পের স্থান নাই। ভারতে যে শিল্প অল্পব্যয়ে সাধিত হয় না, তাহা শিল্পের দোষে নহে, পরন্তু পূর্ত্তবিভাগের দোষে। যাহা কুৎসিত, তাহা অসম্পূর্ণ। এঞ্জিনিয়ার মনে করেন, শিল্প অলঙ্কারমাত্র। বস্তুতঃ তাহা নহে। যদি ইটালী ও অন্যান্য স্থানের কৃষক তাহার ক্ষেত্রের দৈনন্দিন গুরুশ্রম হইতে বিরলপ্রাপ্ত অবকাশকালে স্বল্পব্যয়সাধ্য, আরামদায়ক, সহজরচনীয় অলঙ্কারহীন অথচ নয়নরঞ্জন স্থাপত্যের আবিষ্কার করিতে পারিয়া থাকে, তবে কি কেবল ভারতবর্ষেই শিল্প বহুব্যয়সাধ্য? এখনও ভারতবর্ষে

(১) মার্কটোয়েন বলিয়াছেন, বরোদার প্রাচীন প্রাসাদটি প্রাচ্য ও রমণীয়—তাহা দেশের সহিত ঠিক খাপ খায়। আর নূতন প্রাসাদ "Mixed Modern American,

...সিক পনের টাকা বেতনে গৃহনির্ম্মাণ, গৃহসজ্জা ও স্থাপত্য বিষয়ে বিশেষ বুৎপন্ন শিল্পী পাওয়া যায়। তাহারা বংশপরম্পরায় শিল্পী, নির্ম্মাণকৌশলজ্ঞ, আবার তাহারা নানা শিল্পবিত্থায় বিশারদ। কেবল পূর্ত্তবিভাগের মামুলী আমল হইতে অনুসৃত নিয়ম না জানায় তাহারা অনাদৃত। পূর্ত্তবিভাগ ব্যবহার করিতে না জানায়, ভারতের শিল্প ও স্থাপত্য-সম্পদভাণ্ডার অযত্নে নষ্ট হইতেছে। দুই এক জনের চেষ্টায় গভর্মেণ্টের অনুসৃত পথের পরিবর্ত্তন হইবে না। পূর্ত্তবিভাগ ইংরাজী প্রথার তালিকার চিত্র দেখিয়া কায করেন। অল্প দিন হইলে, কলিকাতার কতকগুলা গৃহের বাহ্য সজ্জার জন্য লক্ষ টাকার টেরাকটার (Terracotta) সামগ্রী আনান হইয়াছিল ; সেগুলার যে বিশেষ কোন শিল্পসৌন্দর্য্য আছে, এমনও নহে। এক সময় বঙ্গদেশে ইষ্টকনির্ম্মাণে প্রচুর শিল্পের পরিচয় পাওয়া যাইত। নানা প্রাচীন গৃহে তাহার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এই লক্ষ টাকা ব্যয়ে সেই শিল্পের পুনরুদ্ধার করিলে গৃহগুলারও শ্রী হইত, দেশেরও পরম উপকার হইত।

এইরূপে অ্যাংলোইণ্ডিয়ান রুচির প্রভাবে শীঘ্রই দেশীয় অত্যুন্নত Fresco সজ্জা-শিল্প বিনষ্ট হইবে। আর স্বাস্থ্যকারিতায়, শিল্প-সৌন্দর্য্যে ও স্থায়িত্বে তদপেক্ষা হীন ইউরোপীয় কাগজ ও hangins তাহার স্থান লইবে। এখনও প্রণালীর পরিবর্ত্তন করিয়া দেশীয় শিল্পের ও নিত্যব্যবহার্য্য শিল্পজাতের ব্যবসায়ের উন্নতিসাধনে তৎপর হওয়া গভর্মেণ্টের কর্ত্তব্য।

এখন এ দেশে গভর্মেণ্টের পক্ষে গৃহ-নির্ম্মাণে যথাসম্ভব দেশীয় স্থাপত্যের ব্যবহার করা উচিত। পূর্ত্তবিভাগে এঞ্জিনিয়ারের স্থানে স্থপতিবিত্থাবিশারদের নিয়োগে কোনও ফল হইবে না। ইউরোপীয় স্থপতি চেষ্টা করিয়া প্রাচ্য-স্থাপত্যের অধ্যয়ন করিয়া নূতন পথের পথিক হইতে চাহেন না। আবার উৎকৃষ্ট ইউরোপীয় স্থাপত্যের আদর্শে ভারতীয় শিল্পের উপকার হইবে না। সর্ব্বদেশেই সাধারণ জনগণ স্থাপত্যে উৎকর্ষ অপকর্ষ বিচারে অসমর্থ। ভারতীয়-স্থাপত্যের উন্নতিবিধান করিতে হইলে, ভারতীয় শিল্পীর বংশপরম্পরাক্রমিক দায়াধিকারসূত্রে প্রাপ্ত শিল্পবৃত্তির বিকাশ করিতে হইবে। পূর্ত্তবিভাগে প্রাচ্য-স্থাপত্যের শিক্ষা হওয়া আবশ্যক। ভারতে নানা বিষয়ের বিত্থালয় আছে, স্থাপত্যের বিত্থালয় প্রতিষ্ঠিত হউক। যদি গভর্মেণ্ট জ্ঞাপন করেন যে,

দিনে কখনও স্থাপত্য-শিক্ষার্থীর অভাব হয় না। শিক্ষার সৌকর্য্যার্থ লোকশিক্ষার জন্য এঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যালয়ের সঙ্গে সঙ্গে স্থাপত্যের প্রদর্শনাগারের আবশ্যক। তাহা হইলে গভর্মেণ্টের গৃহনির্ম্মাণে দেশীয় শিল্পীর যে আর্থিক উপকার হইবে, তাহাদের আদর্শে দেশীয় শিল্পের তদপেক্ষা অনেক অধিক উপকার হইবে। শিল্পীর উপকার ক্ষণস্থায়ী, শিল্পের উপকার স্থায়ী। আবার দেশীয় রাজন্যবর্গ যখন বুঝিবেন যে, গভর্মেণ্ট দেশীয় স্থাপত্যের প্রতি সদয়, তখন তাঁহারা আর গৃহনির্ম্মাণে বিদেশী আদর্শ অবলম্বন করিবেন না। দেশীয় মিস্ত্রীর আদর হইবে; এক একটা প্রাসাদ-নির্ম্মাণে শত শত দেশীয় শিল্পজীবী পালিত হইবে। দেশীয় শিল্পে ব্যবসায়ের উন্নতি হইবে। তাহা হইলেই দেশীয়দিগের শিল্পবৃত্তির অনুযায়ী হইয়া, ভারতীয় শিল্প উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে। তখন ভারতে শিল্পশিক্ষা উপযুক্ত ভিত্তির উপর সংস্থাপিত হইবে।

এক দিনে এ সুফল ফলিবে না। পঞ্চাশ বৎসরের ভ্রম এক দিনে সংশোধিত হইবে না। কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থানে গভর্মেণ্টের গৃহগুলা ভাঙ্গিয়া নির্ম্মাণ করাও অসম্ভব। কিন্তু দেশীয় স্থাপত্যের উপযুক্ত আদরে ভারতীয় শিল্পের যত উপকার হইবে, তত আর কিছুতেই হইবে না। ভারতে তন্তুবায়ের ব্যবসা প্রভৃতি কতকগুলি শিল্পব্যবসায় অন্য কারণে বিলোপোন্মুখ। ভারতীয় স্থাপত্যের বিলোপ-নিবারণ সম্ভব ও আবশ্যক। তাহা না করিলে শিল্পবিদ্যালয়, প্রদর্শনাগার বা প্রদর্শনী, কিছুতেই কিছু হইবে না।

বৃটিশশাসনে যে ভারতবাসীর শিল্পবৃত্তি বিনষ্ট হইতেছে, রাজনৈতিক-হিসাবেও ইহা গুরুতর কথা। যে জাতি শিল্প-রত, সে জাতি সুখী, সন্তুষ্ট; যে জাতি শিল্পরত নহে, সে জাতি অসুখী ও অস্থির। ভারতবাসীর ধর্ম্মবিশ্বাসের বিলোপে যদি সাম্রাজ্যের অনিষ্টাশঙ্কা থাকে, তবে তাহাদের শিল্পবৃত্তির বিলোপেও সে আশঙ্কা বিদ্যমান। শিল্প ধর্ম্মের অংশ না হইলেও, ধর্ম্মের সোপান—ধর্ম্মের প্রবেশ-পথ। ব্যবসায়ের হিসাবেও ইহাতে ভারতের বিশেষ ক্ষতি। অনেক জাতি কেবল শিল্পজাতেই ক্ষমতাপন্ন ও সমৃদ্ধিশালী হইয়াছে। আজ ভারতীয় শিল্প অবনত ও বিলোপোন্মুখ সত্য; কিন্তু আজও শিল্প ভারতে যেরূপ জাতীয়জীবনের অবিচ্ছিন্ন অংশ, সেরূপ আর কুত্রাপি নহে। বিনাশের করালকবল হইতে এই বহুকালের গর্ব্বের ধন,

* * *

কদা ফাল্গুনে সন্ধ্যা সময়ে সূর্য্য নিতেছে ছুটি,
র্ব্ব গগনে পূর্ণিমা চাঁদ করিতেছে উঠি উঠি ;

* * *

'হেন কালে কবি গাহিয়া উঠিল—নরনারী, শুন সবে,
কতকাল ধরে কি যে রহস্য ঘটিছে নিখিল ভবে !
এ কথা কে কবে স্বপনে জানিত—আকাশের চাঁদ চাহি
পাণ্ডুকপোল কুমুদীর চোখে সারারাত নিদ্ নাহি !
উদয় অচলে অরুণ উঠিলে কমল ফুটে যে জলে
এতকাল ধরে তাহার তত্ত্ব ছাপা ছিল কোন্ ছলে !
এত যে মন্ত্র পড়িল ভ্রমর নবমালতীর কানে
বড় বড় যত পণ্ডিত জনা বুঝিল না তার মানে !
শুনিয়া তপন অস্তে নামিল সরমে গগন ভরি,
শুনিয়া চন্দ্র থমকি রহিল বনের আড়াল ধরি !
শুনে সরোবরে তখনি পদ্ম নয়ন মুদিল ত্বরা,
দখিন-বাতাস বলে গেল তারে—সকলি পড়েছে ধরা !

* * *

"শুনিয়া তখন করতালি দিয়ে হেসে উঠে নরনারী—
যে যাহারে চায় ধরিয়া তাহায় দাঁড়াইল সারি সারি !
কহিল হাসিয়া মালা হাতে লয়ে পাশাপাশি কাছাকাছি
ত্রিভুবন যদি ধরা পড়ি গেল তুমি আমি কোথা আছি !
হায় কবি হায়, সে হতে প্রকৃতি হয়ে গেছে সাবধানী,—
মাথাটি ঘেরিয়া বুকের উপরে আঁচল দিয়েছে টানি !
যত ছলে আজ যত ঘুরে মরি জগতের পিছু পিছু
কোন দিন কোন গোপন খবর নূতন মেলে না কিছু !
শুধু গুঞ্জনে কূজনে গন্ধে সন্দেহ হয় মনে ;—
লুকানো কথার হাওয়া বহে যেন বন হতে উপবনে ;
মনে হয় যেন আলোতে ছায়াতে রয়েছে কি ভাব ভরা,—
হায় কবি হায়, হাতে হাতে আর কিছুই পড়ে না ধরা !"

অগ্রহায়ণ। এই সংখ্যায় 'প্রদীপে'র দ্বিতীয় বর্ষ সমাপ্ত হইল। শ্রীযুক্ত নিত্যকৃষ্ণ
নিঃসম্বল" নামক ক্ষুদ্র কবিতাটি হীরকখণ্ডের ন্যায় সমুজ্জ্বল। "আলোক-তত্ত্ব"
রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী কঠিন জটিল 'তত্ত্ব'কে কোমল প্রাঞ্জল করিয়া অতি-
[illegible] রায়ের "অষ্টে ও কোম্পানী" ও

যাহা হউক, গঙ্গোপাধ্যায়-গৃহিণীর বুকের উপর হইতে
গিয়াছে। তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, এবার দশ সহস্র
অঞ্চলে না বাঁধিয়া আর তিনি কোথাও কর্ত্তাকে কনে
পাঠাইবেন না। কর্ত্তা শ্রীযুক্ত গাঙ্গুলী মহাশয়েরও চৈতন্যোদয়
কলমে ঠেকিয়া তিনি শিখিয়াছেন, মুণ্ডিতমস্তক ব্যক্তি এ
সুপক্ক-শ্রীফলপূর্ণ বিল্বদ্রুমের তলদেশে গমন করে না। তাই
নিদ্রাবস্থায় স্বপ্নঘোরে চীৎকার করিয়া উঠেন,—"নগদ দশ হাজা

শ্রীদীনেন্দ্রকুমা

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

ভারতী। অগ্রহায়ণ। "উন্নতি-লক্ষণ" একটি ব্যঙ্গ-কবিতা। ইহার
হৃদয়স্পর্শী। সমাজশরীরের ক্ষতপূর্ণ অংশে লেখক যে ঔষধ প্রয়োগ করিয়াছেন,
বটে, কিন্তু আবশ্যক ও উপকারী। "নিয়মের রাজ্য" একটি সুচিন্তিত সুলিখি
"সপ্তদশ শতাব্দীর বিদ্রোহ" একটি ঐতিহাসিক প্রবন্ধ। ইহাতে শোভাসিংহের
ন্ত বিবৃত হইয়াছে। "শান্তিদেবের বোধিচর্য্যাবতার" প্রবন্ধে একখানি বৌ
পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। "গুজরাটে হিন্দুবিবাহ" প্রবন্ধটি সুখপাঠ্য। "চি
কবিতাটি মন্দ নহে। "প্রিয়তম" একটি চলনসই গল্প। "ভূমিতি" একটি বৈ
সন্দর্ভ। এই প্রবন্ধে লেখক পৃথিবীর আকৃতিবিষয়ক অনেক জ্ঞাতব্য কথা
করিয়াছেন। "প্রকাশ" একটি উৎকৃষ্ট কবিতা। আমরা কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম

"হাজার হাজার বছর কেটেছে, কেহ ত কহেনি কথা।
ভ্রমর ফিরেছে মাধবীকুঞ্জে, তরুরে ঘিরেছে লতা;
চাঁদেরে চাহিয়া চকোরী উড়েছে, তড়িৎ খেলেছে মেঘে,
সাগর কোথায় খুঁজিয়া খুঁজিয়া তটিনী ছুটেছে বেগে;
ভোরের গগনে অরুণ উঠিতে কমল মেলেছে আঁখি,
নবীন আষাঢ় যেমনি এসেছে চাতক উঠেছে ডাকি;
এত যে গোপন মনের মিলন ভুবনে ভুবনে আছে,
সে কথা কেমনে হইল প্রকাশ প্রথম কাহার কাছে!
না জানি সে কবি জগতের কোণে কোথা ছিল দিবানিশি,
লতাপাতা চাঁদ মেঘের সহিতে এক হয়ে ছিল মিশি!

* * *

"মেঘের মতন আপনার মাঝে ...

এ দুঃখিনী মেয়ের জন্য তুমি দুঃখ করিও না। যদি কখন শু...
...আর এ পৃথিবীতে নাই, তখন আমার জন্য দু' ফোঁটা চোকে...
বৌদিদিকে আলাদা পত্র লিখিলাম না। তাঁহাকে আমার ...
পরমেশ্বর তাঁহাকে চিরসুখী করুন। দাদা কেমন আছেন, তুমি...
কোটী কোটী প্রণাম জানিবে।" অনেকবার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়...
জল মুছিয়া সুকুমারী ধীরে ধীরে পত্রখানি শেষ করিল। ...
হইয়াছিল, তাহার দেবর হয় ত পত্রগুলি ডাকে দেয় না, নতুবা...
পত্রও পান নাই কেন? তাই সেইদিন সে তাহার পত্রখানি ক্ষান্ত...
অর্পণ করিয়া মাথার দিব্য দিয়া বলিল, পত্রখানি যেন সে চুপে চু...
ফেলিয়া দিয়া আসে, এবং সে পত্রের কথা কাহাকেও না বলে।

ক্ষান্ত পত্রখানি লইয়া অঞ্চলে বাঁধিল। ভাবিল, এখনও অনেক বে...
ডাক ত সন্ধ্যার পর যাইবে, এখন একটু ঘুমাই। সে গিন্নির ঘরে...
উপর আঁচল বিছাইয়া শয়ন করিল। যেমন শয়ন, অমনি নিদ্রা। ...
আহারান্তে গৃহে আসিয়া দেখিলেন, ঝির অঞ্চলে কি বাঁধা আছে। কে...
তিশয্যে তাহা খুলিলেন ;—সুকুমারীর হস্তাক্ষর, সে মাকে পত্র লিখিয়াছে...
খানি খুলিয়া পাঠ করিয়াই ক্রুদ্ধা সর্পীর ন্যায় তিনি গর্জ্জন করিতে লাগি...
পত্রহস্তে রণরঙ্গিণীবেশে বধূর সমীপবর্ত্তিনী হইলেন ; কঠোর স্বরে বলি...
"হারামজাদি, লুকিয়ে লুকিয়ে আমার কুচ্ছো করে বড় যে মায়ের কাছে...
লিখিস্? তোর মা আমার করবে কি? তার খাই না পরি? জানিস্, এই...
ঝাঁটা দিয়ে তোর বিষ ঝেড়ে দিতে পারি? এমন আপদ কেউ ঘরে আ...
ইত্যাদি।

সুকুমারী যেমন বসিয়াছিল, তেমনি বসিয়া রহিল ; ছবির ন্যায় নি...
অসাড় ; তাহার চোক দিয়া এক ফোঁটাও জল বাহির হইল না, একটা দীর্ঘ...
পড়িল না। অনেকক্ষণ পরে তাহার সমস্ত হৃদয় মথিত করিয়া একটি অ...
অতিসংক্ষিপ্ত উক্তি তাহার ক্ষীণ কণ্ঠ হইতে নির্গত হইল। সে উভয় হস্তে ...
চাপিয়া ধরিয়া অবনতমস্তকে কাতরকণ্ঠে বলিল, "মাগো, আর ত সয় না।" ...
দুঃখিনী জনকনন্দিনী যখন অসহ্য যাতনায় নিপীড়িত হইয়া জননী বসুম...
হৃদয়ে স্থান প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তখন বুঝি তাঁহার অপমানমথিত অন্ত...
অন্তস্তল ভেদ করিয়া এমনি দুটি সংক্ষিপ্ত বাণী নির্গত হইয়াছিল। সুকুমা...
চক্ষুর সম্মুখ হইতে বিশ্বসংসারের সকল সুখ চলিয়া গিয়াছে, সকল আ...
নিভিয়া গিয়াছে ; এমন কি, তাহার প্রিয়তম স্বামীর যে স্নেহপূর্ণ, উদার, সর...
দৃষ্টি ধ্রুবতারার ন্যায় তাহার হৃদয়ে অবিচলভাবে অবস্থিত ছিল, এবং যা...
দিকে লক্ষ্য করিয়া সে সকল উৎপীড়ন, অত্যাচার, সকল গ্লানি ও মনোবে...
নীরবে সহ্য করিতেছিল, আজিকার এই তীব্র আঘাতে তাহাও যেন নি...
...র্য্যা, নবপ্রস্ফুটিতহৃদয়া, অসহায়া, সরলা কিশোরী ...

স্কুমারী শয্যায় পড়িয়া বালিশে মুখ গুঁজিয়া ফুলিয়া ফুলি

ভাতে যখন তাহার খোঁজ পড়িল, তখন সকলে তাহার কক্ষে
, সেই কুসুমকোমল বালিকাদেহ শুষ্ক কাষ্ঠের ন্যায় কঠিন,
বিবর্ণ, নিঃস্পন্দ পাণ্ডুর দেহ তুষারশীতল, তাহাতে প্রাণের
ই!—তৈলমিশ্রিত-অহিফেন-লিপ্ত একটি ক্ষুদ্র পাত্র তাহার
ন্ত পড়িয়া আছে। বিশৃঙ্খল বেশবাস ও বিমথিত শয্যা তাহার
নীর জীবনের অন্তিম যন্ত্রণা পরিব্যক্ত করিতেছে!

নয়টা বাজিতে না বাজিতে গ্রামের সকলে শুনিতে পাইল,
স্ত্রী পূর্ব্বরাত্রে বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হইয়া ইহলোক ত্যাগ
। গৃহচিকিৎসক নিবারণ বাবু বন্ধুমহলে প্রকাশ করিলেন, আসল
ক কলেরা, হোমিওপ্যাথি ও এলোপ্যাথী—কোন চিকিৎসাই কিছুমাত্র
য়ক হইল না।—শুনা যায়, ডাক্তার বাবু তাঁহার পারিশ্রমিক যোল
পাবাইয়া পাইয়াছিলেন।

হিণী স্নানের ঘাটে আক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "আহা কি যে রোগ হলো,
রাত্রির মধ্যে বাছা ফুরিয়ে গেল, এমন সোনার চাঁদ বৌ কি আর হবে?"
কেবল ক্ষান্ত ঝি মাটিতে পড়িয়া আছড়াইয়া আছড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল,
র বেলা কি কাল ঘুমই আমার চখে এলো, কেন আমি চিটিখানা তখনই
ফেলে দিয়ে এলাম না? তা হলে আর এ সর্ব্বনাশ হয় না; কেন আমি
না আঁচলে বেঁধে ঘুমিয়ে পড়লাম? হে অনাথনাথ মধুসূদন, এ দারুণ
হ'তে আমাকে উদ্ধার কর। নরকেও আমার স্থান হবে না!"—ক্ষান্ত
সত্যই স্কুমারীকে ভালবাসিত।

র্ত্তা গোপনে গৃহিণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আফিংটা কোথা থেকে
? আমি কলিকাতা হতে দু' ভরি আফিং আনিয়েছিলাম, কুলুঙ্গীতে
টাটা ছিল, দেখ দেখি।" কৌটা খুলিয়া দেখা গেল, তাহার ভিতর হইতে
র্দ্ধেক আফিং অন্তর্হিত হইয়াছে।

কলেরায় স্কুমারীর মৃত্যুসংবাদ যথাসময়ে দারজিলিংএ বিশ্বেশ্বরের নিকট
রিত হইল।—বিশ্বেশ্বর তখন আহারাদি শেষ করিয়া প্লেগ ইনস্পেকশন
টিতে বাহির হইবেন। পত্র পড়িয়াই তিনি ধীরে ধীরে মাটিতে বসিয়া
লেন, শেষে দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া শিশুর ন্যায় কাঁদিতে লাগিলেন। তিন
তাঁহাকে কেহ গৃহের বাহির হইতে দেখে নাই।

কন্যার মৃত্যুসংবাদে স্কুমারীর মায়ের কি দশা হইল, সে কথা আর
তে পারিব না। ভাষায় তাহা প্রকাশ করা যায় না।—এ সংবাদ পাইয়া
তরুবালার মুখে আর কোনও কথা নাই, গোপনে বসিয়া সে শুধু অশ্রু-
হৃদয়ভার যখন অত্যন্ত অসহ্য হয়, তখন বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে

মাতার প্রতি পুত্রের যেমন একটা কর্ত্তব্য আছে, স্ত্রীর
একটা কর্ত্তব্য আছে। কিন্তু সুকুমারী আপনার
মীর গোচর করে নাই। সে মনে ভাবিত, "যত
ন আমার দুঃখ তাঁহাকে জানাইয়া তাঁহাকে কষ্ট দিব
মাতার চির-আদরিণী কন্যা শ্বশুরালয়ের নিত্য-বর্দ্ধমান
পীড়ন ধীরভাবে সহ্য করিলেও, প্রতিদিন তাহার জীব
হইয়া আসিতেছিল।

করিয়া পত্র লিখিতেন, তরুবালা তাহার বিচ্ছেদে কাতর
হৃদয়ভার পত্রে ব্যক্ত করিতেন; কিন্তু সে সকল পত্রের একখা
গত হইত না। মেয়ের যাহাতে কোন কষ্ট না হয়, এ জন্য মা
রচের জন্য দুই এক মাস অন্তর ত্রিশ চল্লিশ টাকা মণিঅর্ডার করিয়া
তেন। কর্ত্তা মহাশয় রসিদ দিয়া টাকাগুলি লইয়া গৃহিণীর হাতে দিতেন।
ভাবিতেন, গৃহস্থের বৌ ঝির আবার টাকার কি দরকার? ভাত
র ত অভাব নাই। টাকাগুলি গৃহিণীর ক্যাশ্‌বাক্সে মজুত হইত.
রী টাকার কথা ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারিত না। কেবল সে মধ্যে
স্বামীর পত্র পাইত। গৃহিণী সে পত্রগুলি লুকাইয়া রাখা সঙ্গত মনে
তন না। তিনি বুঝিতেন, এ পত্র গাপ করিলে গোলযোগ হইতে পারে।
সুকুমারী তাহার পঞ্চদশবর্ষবয়স্ক দেবর সর্ব্বেশ্বরকে দিয়া চিঠিপত্র ডাকঘরে
াইত। সর্ব্বেশ্বর মায়ের পরামর্শমতে তাহার দাদার নামের পত্রগুলি ডাকঘরে
ত, তাহাও জিহ্বারসসম্পৃক্ত করিয়া খুলিয়া না পড়িয়া কোন দিন লেটার-
ক্সে ফেলিত না। অন্য পত্র খুলিয়া পড়িয়া মায়ের হাতে দিত, মা পড়িয়া
ছঁড়িয়া ফেলিতেন।

অবশেষে মায়ের একখানি পত্র কেমন করিয়া সুকুমারীর হস্তগত হইল।
আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছেন, "মা সুকু, তুই কি আমাদের একেবারে ভুলিয়া
য়াছিস? এত চিঠি লিখিলাম, তাহার একখানিরও কি উত্তর দিতে নাই! এত
ভিমান কেন মা? তোকে অনেক দিন না দেখিয়া আমার মনে একটু সুখ
ই। এই দু' দিন যাক,—আশ্বিন মাস পড়িতে পড়িতে তোকে লইয়া আসিব।"
পত্র পাইয়া সুকুমারী কত কাঁদিল। শেষে বাক্স খুলিয়া দোয়াত কলম ও
গজ বাহির করিয়া হৃদয়ের সমস্ত ভালবাসা অভিমান বেদনা ঢালিয়া,
খানি পত্র লিখিল,—"মা এত দিন পরে যে তোমার দুঃখিনী মেয়েকে মনে
ব, ইহা স্বপ্নেও ভাবি নাই। আমি ত কোন অপরাধ করি নাই মা, তবে
ন এত নির্দ্দয় হইয়াছিলে? এ পর্য্যন্ত ত তোমার একখানি পত্রও পাই নাই,
দিদিকে এত পত্র লিখিলাম, তিনিও কোন জবাব দিলেন না। তুমি আমাকে
যাইবে লিখিয়াছ, কিন্তু সে চেষ্টা করিও না, একবার মামা অপমানিত
ফিরিয়া গিয়াছেন, আবার কাহাকে অপমানিত হইতে পাঠাইবে? আমার
... তিনি কখন আমাকে পাঠাইবেন না

...ীনা অভাগিনী দাসীর দুই চক্ষু দিয়া ধারা বহিতে লাগি...
...অবলম্বন ছিল না, তাই সত্যই আজ তাহার বুকের...
...াগিল সুকুমারী অঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লা...
... গৃহিণী এক দিনও বধূর হৃদয়বেদনা প্রশমিত করি...
...েষ্টা করা দূরের কথা, তিনি প্রত্যেক কথায় তাহাকে 'ব...
... বিদ্রূপ করিতে ত্রুটী করিতেন না। আহারের সময় হইলে...
... ঝিকে দিয়া বলা হয়, "বড়লোকের ঝিকে ডেকে দে, এসে ...
...ানের সময় বলা হয়, "কথা কি কাণে যায় না? স্নান করতে...
...েয়ে তেল দেবার জন্যে ক'টা বাঁদি দাসী আছে?" অভাগিন...
চক্ষের জলে ভাসিয়া যাইত। মনের কথা বলিবার তাহার একটি...
নাই; পাড়ায় দুই একটি মেয়ে ছিল বটে, কিন্তু রঙ্গিণী দেবীর ভয়ে...
সে দিকে বড় একটা ঘেঁসিত না।

বধূর প্রতি এই অত্যাচারের কথা গুপ্ত রহিল না। দাসীমুখে, প্রতি...
গণের মুখে ঘাটে পথে রাষ্ট্র হইল। এক দিন কোন 'উচিতবক্তা'...
রঙ্গিণী দেবীকে বধূর প্রতি কর্ত্তব্য সম্বন্ধে স্নানের ঘাটে দাঁড়াইয়া মৃদুমধু...
দেশ দিলেন, বলিলেন,—"বৌর সঙ্গে এমন ব্যবহার করিলে কখন ভা...
হইবে না, উপরন্তু ছেলে পর্য্যন্ত বিগড়াইয়া যাইবে। স্বামী লইয়া ত চি...
কেহ ঘর করে না, পুত্র পুত্রবধূই স্ত্রীলোকের বুড়াবয়সের অবলম্বন।"—শু...
রঙ্গিণী দেবী বলিলেন, "আমার বাপের যা আছে, তাতেই আমার দিন ...
যাবে; আমি কারও মন যুগিয়ে চলতে পারি নে। এতে ছেলে বৌ আমা...
মানুক, চাই নাই মানুক।"

স্নানের ঘাট হইতে ফিরিয়া আসিয়াই তিনি সমুচ্চকণ্ঠে ঝঙ্কার দিয়া আর...
করিলেন, "আবাগের বেটীর জন্যে আমাকে ঘাটে পথে দশ জনের কথা শুন...
হয়।"

সুকুমারী আর কি বলিবে? রোদন ভিন্ন তাহার অদৃষ্টে আর কি আছে...
সে সমস্ত দুপুরটা ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিল। যথাসময়ে আহারের ডাক পড়ি...
অভিমানিনী, বেদনাক্রান্তহৃদয়া বালিকা বলিল, "আমার আজ ক্ষিদে নে...
কিছু খাব না।"—তখন আবার তাহার উপর শ্বাশুড়ীর গর্জ্জন আরম্ভ হইল।

হায়! এ দিনে যদি তাহার স্বামী কাছে থাকিতেন, তাহা হইলেও তা...
কিছু সান্ত্বনা ছিল। কিন্তু তাহার কাছে যে কেহ নাই; অপমানে হৃদয় ...
বিক্ষত, জীবন দুঃসহ। বিবাহের সময় সে কত উজ্জ্বল স্বপ্নছবি আ...
অদৃষ্টাকাশে চিত্রিত দেখিয়াছিল। পৃথিবী ত তাহাই আছে, কিন্তু তাহাকে...
দুঃখ সহিতে হইতেছে কেন?

এক দিন দুই দিন করিয়া ছয় মাস কাটিয়া গেল। ইতোমধ্যে বিশ্বেশ্বর ...
...দারজিলিংএ বদলী হইয়াছেন। তিনি আলিপুরে থাকিলে এ...

।। চকশ্যামনগরের 'ইতরেজনাঃ' অনেক মিষ্টান্নে
তাঁহাদিগকে দন্তরসেই ক্ষুধা পরিপাক করিতে
কেহ দেখিতে পাইল না। গাঙ্গুলী মহাশয়ের
। দিকে ধন্য ধন্য রব উঠিল!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ক্রমেই অধিক রুক্ষ হইয়া উঠিতেছে। সুকুমারী
লাগিল না। বধূর বয়স কিছু বেশী বলিয়া পাড়া
করিয়াছিল। সুকুমারীর শাশুড়ীও এই সমালোচনা
। দানসামগ্রী কিছুই তাঁহার পছন্দ হয় নাই। অবশে
যন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার শ্যালককে কন্যা আনি
.র পাঠাইলেন, তখন গৃহিণীর অমৃতনিঃস্যন্দিনী জিহ্বার
। অস্থির হইয়া উঠিল। এক দিনের বেশী তিনি আর সেখানে
না। চট্টোপাধ্যায়-পত্নী অতি মিহিস্বরে বলিলেন, "বেহাই ম
বলবেন, তিনি আমাদের ফাঁকি দিয়াছেন। মেয়ের বে দিবা
: মহাশয় দশ বিশ হাজারের লোভ দেখিয়েছিলেন! আগে টাকা
খাপড়া করে রেজেষ্ট্রী করা উচিত ছিল। যা হোক যদি মেয়ে বা
তে চান, ত আর সাড়ে পাঁচটি হাজার টাকা দিয়ে তবে নিয়ে যাবেন।"
খোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন, "তা হলে দশ হাজার পুরিয়ে তবে মেয়ে
ন? অনেক কসাইএর প্রাণ বেয়ানঠাক্‌রুনের চেয়ে নরম দেখছি।"
াঙ্গুলী মহাশয় যে পত্নীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে বধূ পাঠাবেন, সে সাহস তাঁর ছিল
কিন্তু কুটুম্বগৃহে নিন্দার ভয় ছিল। বিশেষতঃ, বড়মানুষ কুটুম্ব, ভবিষ্যতের
কিছু আশা রাখিতেন না, তাহাও নয়। তিনি মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে
লিলেন, "বৌমা বয়ঃস্থা হইয়াছেন, কিছু দিন থাকুন এখানে, দু' মাস পরে
াঠিয়ে দেব। (কিঞ্চিৎ নিম্নস্বরে) আপনার বেয়ানের কিছু বেশী বকা রোগ,
। কথা সেখানে কিছু প্রকাশ করবেন না।"

মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মেজাজ চটিয়া গিয়াছিল। তিনি বলিলেন, "তা
াামাকে কিছু বলতে হবে না, ঐ ত ঝি মাগী ফিরে যাচ্ছে, ওর মুখেই সব কথা
কাশ হবে। আপনার ঘরে মেয়ে দিয়ে শেষে দেখি মেয়েটাকে দুঃখের সাগরে
াসালুম, ঐ মাগী ঝি পেয়ারী—ও আবার সুকুকে মানুষ করেছে কি না,—মাগী
কেঁদেই অস্থির,—বলে, দিদিমণি যে রকম অভিমানী, মনের দুঃখে আত্মহত্যা
র না বসে।"

কর্ত্তা ঝিকে পুরস্কার-(অথবা উৎকোচ)-স্বরূপ পাঁচ টাকা প্রদান করিলেন;
ভিপ্রায়, সে বাড়ী গিয়া কোনপ্রকার নিন্দা না করে। প্যারী টাকা পাঁচটা
য়া গিন্নির পায়ের কাছে ফেলিয়া দিল এবং গাড়ীতে উঠিয়া গ্রামত্যাগ করিল।
ার সময় সুকুমারীকে বলিল,—"দিদিমণি সুখে থাক, জন্ম-এয়োস্ত্রী হও,

ছেন, আমি যে সে টাকা না দিতে পারি তা নয়, ।
ার ঐ একটি মেয়ে, আমার এই হয় ত শেষ কাজ
এই হিসাবে আমি মেয়ের বিবাহ দিব। আ
দওয়া কর্ত্তব্য, তাহা আমি দিব। তা এখনি হে
এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে দরকষাকষি কেন
লে আমার নিকট বিক্রয় করিতেছেন না।
যে একটা চোয়াড়ে-রীতি প্রবেশ করিয়াছে,—আ
স্তই ইহাতে নষ্ট হইয়া যাইতেছে।"

। মহাশয় বলিলেন, "আপনি মহাশয় ব্যক্তি, আপনার
র করিতেছে। কিন্তু বিবাহে কিঞ্চিৎ ব্যয় আছে, সে
হন করিলে সমাজে তেমন প্রতিষ্ঠা থাকে না।"

অর্থাৎ বৈবাহিকের ঘাড় ভাঙ্গিয়া আদায় করিলে প্রতিষ্ঠাটি
কিঞ্চিৎ শ্লেষের সহিত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই কথা বলিয়া
। মহাশয়ের মুখের দিকে চাহিলেন। গাঙ্গুলী মহাশয় নীরব,
ধ্যায় পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কত টাকা হইলে সেই কার্য্যটি
য় হয় ?—হাজার ?"

গাঙ্গুলী মহাশয় বলিলেন, "আমাদের গ্রামে জমিদার বলিয়া এক
আছি, কিছু সমারোহ আবশ্যক।"

স্থির হইল, চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বিবাহের ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য দেড়
টাকা দিবেন। দানসামগ্রী ও অলঙ্কারাদিতে কত টাকা দিবেন, চট্টোপ
মহাশয় তাহা প্রকাশ করিলেন না। গাঙ্গুলী মহাশয়ও এ বিষয়ে পীড়া
করিতে সাহস করিলেন না। কিন্তু সুরেশের মাতুল নবকৃষ্ণ মুখোপাধ
মহাশয়ের সহিত আলাপ করিয়া কথাপ্রসঙ্গে তিনি জানিতে পারিলেন (
অলঙ্কার, বরসজ্জা, তৈজসপত্রে তিন হাজার টাকা দিবেন, চট্টোপাধ্যায় মহ
শয়ের এরূপ অভিপ্রায় আছে। গাঙ্গুলী মহাশয় মনে মনে বড় ক্ষুণ্ণ হইলেন
পাঁচ হাজারও পূরিল না; কিন্তু এ রকম সম্বন্ধ ছাড়াও যায় না। কে জানে, বু
উইল করিবার সময় ত মেয়ে জামাইকে দশ-বিশ হাজার টাকার কোম্পানী
কাগজও দিয়া যাইতে পারেন। তাঁহার কথার ভাবেও ত তাহাই প্রকাশ
মাঘ মাসে বিবাহের দিন স্থির করিয়া গঙ্গোপাধ্যায় গৃহে ফিরিয়া গেলেন।

সকল কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণী ভারি রাগ করিলেন। কর্ত্তা বলিলেন, "আ
ত বলেছিলাম, তুমি ঘটকালি করে এস।

কর্ত্তা-গৃহিণীর এই প্রকার বিরোধ সত্ত্বেও বিবাহ হইয়া গেল। গৃহিণী ি
করিলেন, "আগে ত বৌ নিয়ে ঘরে তুলি, বাকি সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা
করে আদায় করতে হয়, তা আমি দেখাব; বেয়ানমাগীর হাতে কি টাকা নেই

কিন্তু তাই বলিয়া, গাঙ্গুলী মহাশয় নিজ মুখে তাঁহাকে যে দেড় হা
টাকা দিতে স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহা তিনি ছাড়িলেন না।

তা ব'লে রাগ করে যে ছেলেকে তেজ্যপুত্র
.র ত? আর সে যোগ্য ছেলে, বিষয়ের ভর
যে সব দিক হারিও না; এখন যা বলি তাই
বে শুনেছি ইঞ্জিনিয়ার মিস্তের অনেক টাকা, দশ
ত হয় ত নেন। কিন্তু চিঠি-পত্রে মীমাংসা হবে
র্ত্তা হলে তার একটু চক্ষুলজ্জা হবে। কর্ত্তা বলি
। কল্লে গিন্নি, আর একটা দিকে একেবারে দেখলে
মারও থাকৃতে পারে।"

না, সে বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত আছি, তুমি আজই চলে
তা, তেমন দেখি ত পাঁচ হাজারেই কি রাজী হয়ে আস
। দশ হাজার থেকে একেবারে পাঁচ হাজারে নামবে?
কিছু চটিয়া বলিলেন, "তবে না হয় তুমিই যাও, ছেলের
গ সেরে এসো! চক্ষুলজ্জা নেইও বল, আবার পাঁচ হাজারেও
রণ কর? স্ত্রীবুদ্ধিঃ প্রলয়ঙ্করী।"

ঙ্গুলী মহাশয় সেই রাত্রেই কলিকাতা রওনা হইলেন। পর দিন
র সহসা পিতৃদেবকে তাঁহার বাসায় সমাগত দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হই-
বলিলেন, "বাবা, হঠাৎ এ ভাবে এলেন, বাড়ীর সব ভাল ত?" বিশ্বেশ্বর
রণে প্রণত হইলেন। কর্ত্তা বলিলেন, "বাপু তা সব ভাল; তোমার
রিণী ত কেঁদেই অস্থির, বিয়ের কথা কি লিখেছ, কিন্তু বুঝতে পাল্লেম না।
রকম ঘর, কেমন মেয়ে, কি দেবে থোবে, কিছু স্থির করা নেই, অথচ
য়ের অভিপ্রায়টি লিখেছ, এতে আর স্থির থাকি কি করে?" বিশ্বেশ্বর
ঝিলেন, তাঁহার পিতা দর-দাম করিতে আসিয়াছেন। মনটা কিছু অপ্রসন্ন
ইল, কিন্তু সে ভাব প্রকাশ করিলেন না।

বিশ্বেশ্বরের পিতার আগমনবার্ত্তা অচিরকালমধ্যেই ইঞ্জিনিয়ার-গৃহে প্রচা-
রিত হইল। সুরেশ অসাধারণ ধূর্ত্ত, কার্য্যোদ্ধার করিবার কৌশল উত্তম
জানেন। সন্ধ্যার সময় মহাসম্মানে গাঙ্গুলী মহাশয়কে তাঁহার পিতার সহিত
পরিচিত করিবার জন্য লইয়া গেলেন।

ইঞ্জিনিয়ার মহাশয়ের বাড়ীর জাঁকজমক, তাঁহার বৈঠকখানার বাহার,
তাঁহার ড্রয়িং-রুমের সজ্জা দেখিয়া গাঙ্গুলি মহাশয়ের তাক লাগিয়া গেল। তিনি
ভাবিলেন, এ দেখছি অগাধ টাকার মানুষ! দশ হাজার কেন, ইচ্ছা করিলে
যে লক্ষ টাকা দিতে পারে। তাই ত বলি, আমার ছেলে কি না বুঝেই
কার দাবী করেনি! যে নিজ হইতে বিশ হাজার দিতে পারে, তাহার
ছে দশ হাজারের দাবী করিয়া বড় কুকার্য্যই করিয়াছি।

সুরেশচন্দ্র গাঙ্গুলী মহাশয়কে তাঁহার পিতার সুসজ্জিত উজ্জ্বলদীপালোকিত
ক্ষ লইয়া গিয়া তাঁহার পিতার সহিত পরিচিত করিয়া দিলেন। স্বাগত-
জিজ্ঞাসার পর বিবাহের কথা উঠিল।

সেই নামমাহাত্ম্যে পিতলের হাঁড়িও চে
ভাবই পরনিন্দা!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বঙ্গদেশে এত অধিক কন্যাভারনিপীড়িত ব্রাহ্
হস্র মুদ্রাব্যয়ে এম্. বি. পাশ পুত্রের হস্তে কন্যা
নর হয় না দেখিয়া ভজহরি গাঙ্গুলী মহাশয়ের ক্রে
তাঁহার পত্নীও অত্যন্ত অসন্তুষ্টা ও অধীরা হইলেন।
তিনি তাঁহার পুত্রের এক পত্র পাইলেন। অন্যান্য ব
া, "এখানকার ইঞ্জিনিয়ার বাবু বিধুভূষণ চট্টোপাধ্যায় ম
হার একমাত্র কন্যার বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছেন। এর
সম্মানিত ব্যক্তির কন্যার সহিত আমার বিবাহে আপ
হইবে না বলিয়াই বিশ্বাস করি। কি পরিমাণ টাকা ও
ন বিবাহে যৌতুক দিবেন, সে সম্বন্ধে কোন কথা হয় নাই; তবে
আমি লালায়িত নহি, কারণ টাকাকে আমি বিবাহ করিব না,
র্থের উপর আমার কিছুমাত্র লোভ নাই। আমার বিশ্বাস,
তে আমি চিকিৎসাব্যবসায়ে অনেক টাকা উপার্জ্জন করিতে
টাকা লইয়া বিবাহ করা শিক্ষিতসমাজের একটি রোগ হইয়া দাঁড়াই
কিন্তু এইরূপ আত্মবিক্রয় আমি আত্মসম্মানের হানিকর বিবেচনা করি।"

গাঙ্গুলী মহাশয় চিঠিখানা পড়িয়াই রাগে জ্বলিয়া উঠিলেন। স্ত্রীর
তাহা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া বলিলেন,—"ব্যাটা একেবারে চাণক্য পণ্ডিত
দাঁড়িয়েছে। কায়দা করে টাকা আদায় করা ত বেটাছেলের কাজ, সেটা
কাছে আত্মসম্মানের হানিকর! আরে সম্মান, সম্মান ধুয়ে জল খেতে হ
আর কি!—নৈকষ্য কুলীন আমি, আমি যদি টাকার অনুরোধে বিয়ে না
করতাম, তা হলে আজও আমাকে খোলা কেটে দু' পয়সার সংস্থান কর্ত্তে
হতো। আমার ছেলে শুকদেব গোস্বামী হলে চল্‌বে কেন?"

কথাগুলি এ পর্য্যন্ত স্ত্রীর কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করে নাই, তিনি নিবিষ্টচিত্তে
পুত্রের পত্রখানি পাঠ করিতেছিলেন। পত্রপাঠ শেষ করিয়া তিনি বলিলেন,
"কেমন, আমি তখনই না বলেছিলাম, দেখে শুনে বেটার বিয়ে দাও। তা
হুঁকো ছেড়ে ত নড়বে না, কেবল ঘরে বসে বসে লঙ্কা ভাগ করবে! নাও এখন
কৃষ্ণচন্দ্রপুর পত্তনি নাও। টাকা কি বস্তু, তা কি সে তোমার মত চিনতে
শিখেছে? কার চাঁদপানা মেয়ে দেখেছে, আর বিয়ে করবার জন্যে ক্ষেপে
উঠেছে; এখন যে লাভেমূলে সব যায়?"

কর্ত্তা হতাশভাবে বলিলেন, তাকে বারণ করে পত্র লিখি. যদি সে আমার
অমতে বিয়ে করে ত সে আমার ত্যেজ্য পুত্তুর হবে। কলিকালটা কি বিষম
কালই হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাপে কনে স্থির করবে, টাকাকড়ি যা আদায় করবার
করবে, ছেলে হাতে সুতো বেঁধে টোপর মাথায় দিয়ে বিয়ে করতে যাবে, এই
একালে দেখি সবই উল্‌টো. ছেলেই [illegible]

ই চন্দ্রশেখর 'প্লে' হবে, যে দিন যাব তুমিও যে
র মুখ হর্ষোৎফুল্ল হইল; "আচ্ছা তা দেখা যাবে।
ম্বাষণে চলিলেন। সে বৃত্তান্ত পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বিবৃত হ
সময়ে তাঁহার পিতার নিকট সুকুমারীর বিবাহের
ন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত ছিলেন
র বাহিরে একমাত্র প্রিয়তমা দুহিতার বিবাহ দিতে
হন না। তথাপি বিশ্বেশ্বরের মত জামাতা পাওয়া সহজ নয়
এ বিষয়ে আপত্তি করিলেন না; বলিলেন, "তা হলে বিশ্বেশ্বরের
না পত্র লেখা যাক; ছেলেটি উত্তম, সন্দেহ নাই; আমার বেশ
ছ। কিন্তু টাকা কড়ি নিয়ে কিছু গোল হবে না ত? এত
ন্ত বিশ্বেশ্বরের বিয়ে হয় নি, জানিনে তার বাপের কোন রকম
ণ আছে কি না।"

শ বলিল, সে জন্য কিছু গোল হবে না, বিশ্বেশ্বরকে আমি পারবো,
আপনার জবানী যাক।"

সময়ে পত্রের উত্তর আসিল,—"নগদ দশ সহস্র মুদ্রার কমে আমি
ও পুত্রের বিবাহ দিব না, যদি ইহাতে আপনার মত থাকে, লিখিবেন।
আশীর্ব্বাদ করিয়া বিবাহের দিন স্থির করিয়া আসিব।"

কর্ত্তা পত্র পড়িয়া চটিয়া গেলেন; বলিলেন, "এ যে একেবারে কসাই
চি, টাকা দিলে অনেক সুপাত্র মিলবে বাপু, ও রকম ছোটলোকের
র কাজ করা আমার পোষাবে না; আমার মেয়ে কানা না খোঁড়া,
আমি জাত খুইয়ে বসে আছি যে এত কায়দা? নগদ দশ হাজার
কা! দেশে ত আর ছেলে নেই!"

যখন রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, তখন উলু খড়ের প্রাণ যায়। এ ক্ষেত্রে
বেচারী উলু খড়ের প্রাণ লইয়া টানাটানি বাধিল। একটি বিশ্বেশ্বর,
রটি নিরপরাধা সরলা, প্রেমবিহ্বলা, সুকুমারী। উভয়ে বুঝিয়াছিল,
পক্ষ নরম না হইলে কখনও এ বিবাহ হইবে না; কিন্তু কে নরম
ব? টাকা না থাকিলে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় হয় ত নরম হইতেন;
যাহারা তাঁহাকে জানিত, তাহারা বলিত, বুড়া ইঞ্জিনিয়ারের অনেক

ংজে মেলে না; তিনি তরুবালাকে সকল কং

আর ছেলেমানুষটি নয়, শিশুকে সে দেখেছে,

পার যদি—”

রুবালা ভ্রূকুটীভঙ্গী করিয়া বলিলেন, “ঐ আবা

! বের আগে তোমাকে আমি ক’ বার দেখেছিলুম

ঙ্গে যখন আমার বে হয়, তখন আমিও ত কচি খুকিটি।

“তুমি আমাকে বিয়ের আগে না দেখেও বিয়ের পর

সত্য, কিন্তু আমার সঙ্গে তোমার বিয়ে না হয়ে যদি রায়বা

রমণীমোহনের সঙ্গে হতো, তা হ’লে তাকে যে আমার চেয়ে—

“বলতে গেলেম এক কথা, আর তুমি ব্যাখ্যা করতে বসলে? উলটে বলি, আমাকে বে না করে যদি তুমি দেখে শুনে ঐ মুখুয্যে মঞ্জরীকে বে করতে ত তুমি এর চেয়ে ঢের বেশী সুখী হতে পারতে, তোমার মনে কি হয়?”—মুখ আঁধার করিয়া তরুবালা এই কথা বলিে

সুরেশ সহাস্যে বলিলেন, “মনে এই হয় যে, তা হলে তোমা সম্বন্ধমাত্র থাকতো না, এবং তোমার পানে চাইলেও পাপ হতো; কিন্তু

অবশিষ্ট কথা সুরেশচন্দ্র আর বাক্যে প্রকাশ করিলেন না, উঠিয়া সস্নেহে তরুবালার মুখচুম্বন করিলেন, তাহার পর বলিলেন, “ আমার, এখন যাও, যা বল্লুম করে এস।”—সুরেশের উভয় হস্ত তখন তরুবালার উভয় স্কন্ধে স্থাপিত ছিল।

তরুবালা হাসিয়া বলিলেন, “তোমাকে পারা ভার, এত রঙ্গও জা তুমি, ছাড়, কেউ আবার দেখতে পাবে; কিন্তু তোমার বোন যে চাপা মেয়ে তার পেটের কথা কি পাবার যো আছে?”

সুরেশ পত্নীর স্কন্ধত্যাগ পূর্ব্বক বলিলেন, “ক্ষুরের মত ধারালো যা বুদ্ধি আছে, তার পক্ষে এ কাজটা একটুও শক্ত নয়।”

পতিসোহাগিনী সাধ্বী পত্নী স্বামীর তোষামোদে প্রীত হন না, এম দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে বিরল। তরুবালা পরিতৃপ্ত হইয়া বলিলেন, “তবে অম বকশিশের কথাটা হোক, যদি সুসংবাদ দিতে পারি?”

“বকশিশ ত আমার সর্ব্বস্ব দিয়াই রাখিয়াছি, নূতন কোথায় কি পাব?’

— বলিলেন, “সে জন্যে রাতদিন তোমার অনেক ব্যাপার

।জ্জা বস্ত্র। তরুবালা প্রেমের পাঠশালে
বরে বলিলেন, "বুঝেছি, মরেছিস্, কাকে
।"
রা বলিল, "বল্‌ব, রাগ করবে না ত ?"
মনে ভাবিলেন "এত শীঘ্রই কবুল, লক্ষণ ত ভাল
করিয়া বলিলেন, "তোর উপর কি রাগ করতে পারি ?"
সিয়া বলিল, "তোমাকে আমি বড় ভালবাসি।"
তৃষ্ণা ত ঘোলে মেটে না, তাই তোকে এখন একটা কথা
শোন, বে করবি ?"
গম্ভীরভাবে বলিল, "অবশ্য, আইবুড়ো থাকবার যথেষ্ট ইচ্ছা
ন সম্ভাবনা নেই, যে হেতু তোমরা অনুগ্রহপূর্ব্বক আহার নিদ্রা
করে আমার ঘটকালিতে নিযুক্ত হয়েছ।"
লা বলিলেন, "সে সন্ধানও রাখা হয় দেখছি, তা 'যার বে তার
ই পাড়াপড়সীর ঘুম নেই', এ কথাটা তোর সম্বন্ধে আর খাটে না
-যা হোক আপাততঃ দু তিনটি বর উপস্থিত আছে,—তার মধ্যে
র সরকারী ডাক্তার শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু বিশ্বেশ্বর গঙ্গোপধ্যায় বি. এ.
ব. মহাশয় সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। সেই নিকৃষ্ট পাত্রটির সঙ্গে আমার
স্নেহাস্পদ ননদিনী শ্রীমতী সুকুমারী দেবীর শুভ-পরিণয়ের কথা
মহাশয় স্বয়ং উত্থাপন—ও কি ও—"
সুকুমারীর মধ্যে মধ্যে হিষ্টিরিয়া হইত, এ দিকে ছয় মাস হয় নাই।
বালার কথা শেষ না হইতে হইতে তাহার চোখ কপালে উঠিল,
টি ঘর্ম্মাক্ত হইল, মুখ পাংশুবর্ণ ধারণ করিল। অবস্থা বুঝিয়া
বালা অতি ব্যগ্রভাবে তাহাকে কোলের মধ্যে টানিয়া তাড়াতাড়ি
নায় ফেলিলেন। দেখিতে দেখিতে সুকুমারী অজ্ঞান হইল।
সুরেশের অনুরোধে সুকুমারীর মনের ভাব জানিবার জন্যই তরুবালা
দিন মাধ্যাহ্নিক দৌত্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুকুমারী যে অবিবাহিতা,
শ্বর তাহা সহজেই জানিতে পারিলেন। স্বয়ং কথাটার উত্থাপন
ত বাঙ্গালীর ছেলের একটু চক্ষুলজ্জা হইয়াই থাকে, কিন্তু বন্ধু
র কল্যাণে সুরেশ শীঘ্রই ইহা শুনিতে পাইলেন। বলা বাহুল্য,

।শেষ হইবামাত্র. তরুবালা লঘুপদবিক্ষেপে

বলিলেন, "ঠাকুরঝি! একেবারে ক্ষেপ্‌লি

।ই, 'সাধের তরণী তোর কে দিল তরঙ্গে'।

মারার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। কি সর্ব্বন

. মুখ লাল হইয়া উঠিল, কিন্তু সে দেখিল. এ

।শ করিলে তাহাকে নাস্তানাবুদ হইতে হইবে।

দেবীকে সে উত্তমরূপ চিনিত। তাই সামলাইয়া লইয়া ব

সত্যি ভাই, তুমি খুব ঠাট্টা করতে পার; গানটা আমার ভ

তাই গুণ গুণ ক'রে গাচ্ছিলাম,—কে জানে যে তুমি (

দাঁড়িয়ে আছ।"

তরুবালা বলিলেন, "তা এ গান ত এখন ভাল লাগবেই

যে কি রকম বিবেচনা, এত তোর বয়স হোল, বের নামটি নে

তোর দাদাও ত কেবল রাত দুপুর অবধি নথি নিয়ে ব্যস্ত।"

সুকুমারী তাহার ক্ষুদ্র মুষ্টি খুব উঁচু করিয়া অতি আস্তে ত

পিঠে কিল বসাইল, তাহার পর বলিল, "সেই ঝাল বুঝি আম

ঝাড়তে এসেছ? তা দাদাকে স্পষ্ট বল্লেই পার, আমার সঙ্গে

আসা কেন বাপু!"

তরুবালা বলিলেন, "হাঁ, তুই ত সবই জানিস্;—কি জানিস; বল দে

বল্লে কিন্তু রাগ করো না, সেই সেবার দাদা দুদিনের জন্য মফঃস্বলে,—

বেড়ে না কোথায় মকর্দ্দমা কর্ত্তে গেলেন, আর তুমি মনের খেদে ঘ

কোণে বসে গাইতে লাগলে; গানটা বুঝি আমার মনে নেই?—

'একে আমার এ যৌবনকাল তাতে কাল বসন্ত এল।'

তা তোমার যৌবনকাল সত্য, কিন্তু তখন ত বসন্ত ছিল না, ঘোর গ্রী

তোমার সে গান শুনে কি আমি ঠাট্টা করতে গেছলুম?"

তরুবালা লজ্জিত হইয়া বলিলেন, "ওমা, তোর পেটে পেটে এত বুদ্ধি, অ

ভাবি বুঝি সুকুমারী কিছু জানে না। যা হোক, বল দেখি ভাই, এত রা

গান থাক্‌তে তোর ঐ সাগর ছেঁচার গানটা এত ভাল লাগলো কেন?"

"আমি সাগরের মধ্যে রতন দেখিছি বলে।"

সুকুমারী ভাবিল. চূড়ান্ত জবাব দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু সে বুঝি

াহার পরাজয়। বুদ্ধি বয়

ল! তিনি দাদার বন্ধু, বৌদিদির
খনও তাঁহাকে চক্ষে দেখি নাই, আজ
তে পারিলাম কৈ? সাধ ত মিটিল না!
মিষ্ট ভাব, এমন সকরুণ দৃষ্টি, এমন আর কে.
া, যেন আমার কত দিনের জানাশোনা। আবার
লই বা দেখা পাইব কি করিয়া? লুকাইয়া দেখিব,
দি কেহ জানিতে পারে. বৌদিদি যদি হৃদয়ভাব বু
হইলে ত লজ্জায় আর কাহাকেও মুখ দেখাইতে পা
ঝ ঐ ফুলের গন্ধ, চাঁদের আলো, বায়ুর হিল্লোলের মত,
। কিন্তু প্রণয় কি পাপ? পাপ কেন? আজ যদি আমার
তাহা হইলে তিনি আবার আমার দেখা দিবেন। আর
ভাল না বাসেন, তাহাতে আমার দুঃখ কি? ঐ ত র
সুগন্ধ নীরবে নৈশ আকাশে বিকীর্ণ করিতেছে, কিছু
ছে কি? অমনি করিয়া ত সে নীরবে শুকাইয়া ঝরিয়া পড়িবে,
কি তাহা পারিব না?

প্রথম প্রেমের মোহে পড়িয়া চতুর্দ্দশবর্ষীয়া বালিকা আত্মহারা হইল।
কৎসক বিশ্বেশ্বরও সংপ্রতি রোগগ্রস্ত—তাঁহারও ঘোরতর বিকার।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

উল্লিখিত ঘটনার কয়েক দিন পরে এক দিন মধ্যাহ্নে সুকুমারী আপন ঘরে বসিয়া গুন গুন স্বরে গাহিতেছিল—

> এ জনমের সঙ্গে কি সই জনমের সাধ ফুরাইবে,
> কিবা জন্মজন্মান্তরে এ সাধ মোর পুরাইবে।"

সুরেশচন্দ্র সংপ্রতি তাঁহার পত্নী তরুবালা ও ভগিনী সুকুমারীকে 'থিয়েটারে' মৃণালিনীর অভিনয় দেখাইয়া আনিয়াছিলেন।

সহসা গৃহদ্বারে তরুবালার আবির্ভাব হইল। গৃহমধ্যে গুন্ গুন্ শব্দ
নিয়াই তিনি দ্বারপ্রান্তে থমকিয়া দাঁড়াইলেন, সুকুমারী অন্যমনে গাহিতে-
ল, বৌদিদির আগমন অনুভব করিতে পারে নাই। সুকুমারী চাপাগলায়
র্বৎ গাহিতে লাগিল,—

> "লাজ ভয় তেয়াজিব, এ সাধ মোর পুরাইব,
> সাগর ছেঁচে রতন নিব, কণ্ঠে রাখবো নিশি দিবে

; কে জানে, তাঁহার হৃদয়ও অকম্পিত ছিল
াতি, বিদ্যুতের ন্যায় তাহার জ্যোতিঃ,
াকিত করে, কঠিনকে দ্রবীভূত করিয়া ফেলে
করিতে পারে, এবং মুহূর্ত্তকালমধ্যে তাহা জীব
পরিস্ফুট করিয়া দেয়। বিশ্বেশ্বরের যৌবনাকুল
আনন্দ, একটা বেদনা, একটা বিস্ময়, একটা ব্য
ঠল, তাঁহার নিকট তাহা অননুভূতপূর্ব্ব। তিনি
ভাষায় ও ছন্দে এই অমৃতময় ভাব প্রকাশের
ন, কিন্তু ভাষায় যাহাকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে পার
ও যাহার পূর্ণ পরিব্যক্তি অসম্ভব, কোকিলের কণ্ঠে, কুসুমে
, নদী-কল্লোলে যাহার ক্ষীণ আভাস অনুভূত হয়, তাহা
নি হৃদয়ের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম অনুভব করিলেন। তাই সুখে
..র তাঁহার মনে হইতেছিল,—

> "অনাঘ্রাতং পুষ্পং কিশলয়মলূনং কররুহৈ-
> রনাবিদ্ধং রত্নং মধু নবমনাস্বাদিতরসম্।"

বিশ্বেশ্বরের করস্পর্শে লজ্জা, ভয় ও বিস্ময়ে সুকুমারীর চোখ মুখ
হইয়া উঠিল। হাতে ঔষধ দিয়া ডাক্তার চলিয়া গেলেন, সুকুমা
ধীরে ধীরে আপনার শয়নকক্ষে আসিয়া শয্যাগ্রহণ করিল। কিন্তু হাতে
বেদনার কথা একবারও তাহার মনে হইতেছিল না। আকাশে তখন
চন্দ্র উঠিয়াছিল। সুকুমারী বাতায়নপথে চাহিয়া দেখিল, ফুলবাগান সুস্নিগ্ধ
চন্দ্রালোকে পরিপ্লাবিত; গন্ধরাজ উচ্চশাখায় ফুটিয়া শ্যামল পল্লবদল আলো
করিয়া আছে; প্রস্ফুটিত, শুভ্র, ক্ষুদ্র যূথিকা আপনার ক্ষীণবৃন্তে ভর
করিয়া যৌবনস্বপ্নে মগ্ন; চামেলী ও রজনীগন্ধার মৃদুগন্ধ নৈশ-সমীরণপ্রবাহে
ভাসিয়া শূন্যে বিলীন হইতেছে। সুকুমারী ভাবিল, এ পৃথিবী কি শোভাময়ী;
রজনী কি স্নিগ্ধ, শান্ত, সুন্দর; চন্দ্রের আলো ও ফুলের হাসি কি মধুর;
চারি দিকে সকলই আনন্দপূর্ণ। কিন্তু এ সকল কেন? নিজের জন্য ত কেহ
স্ত নয়, পৃথিবীতে সকলেই পরিপূর্ণহৃদয়ে আত্মোৎসর্গের জন্য বসিয়
হিয়াছে। শ্রদ্ধাভক্তি, স্নেহ ভালবাসা, আদর, যত্ন, যাহার যাহা প্রাপ্য, আমি
া হইতে ত কাহাকেও বঞ্চিত করি নাই; কিন্তু তাহাতেও তৃপ্তি ন
জের জীবন পর্য্যন্ত অন্যের পদে উৎসর্গ ক

ট্র 474.

চেঙ্গিস খাঁ ও তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ

১।

উত্তর মহাসাগর, কৃষ্ণসাগর, কাস্পিয়ান সাগর, অক্সাস নদী ও হি পর্ব্বতে পরিবেষ্টিত সুবিশাল ভূখণ্ডের সংখ্যাতীত অধিবাসীদিগকে ইউরো ইতিহাসবিদ্গণ সাধারণতঃ তাতার নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। প্রা কাল হইতেই ইহারা ইউরোপ ও দক্ষিণ এসিয়ার রত্নপ্রস্থ জনপদসমূহে দৈ বিপদের ন্যায় পতিত হইয়া দেশ ছারখার করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়াছে অথবা কোন কোন বিজিত দেশে উপনিবেশস্থাপন করিয়াছে। যদিও ইহারা স্মরণাতীত কাল হইতেই দক্ষিণভাগ আক্রমণ করিয়া বিধ্বস্ত করিতেছিল, তথাপি দশম শতাব্দীতেই খলিফারাজ্যে প্রবেশলাভ ও উপনিবেশসংস্থাপন করিবার পর, তাহাদের প্রবল প্রভাব ও স্থায়ী অভ্যুদয় সংঘটিত হইয়াছিল। তাহার পর চেঙ্গিস খাঁ বিপুলবিক্রমে এসিয়ার সুবিস্তৃত অংশ মথিত করিয়া সমগ্র এসিয়া ও ইউরোপ কম্পিত করিয়া তুলিয়াছিলেন।

আমরা চেঙ্গিস খাঁ ও তাঁহার উত্তরাধিকারিগণের বিবরণ পাঠকবর্গকে উপহার দিবার জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছি। কিন্তু এই বিবরণ বিশদ করিবার জন্য তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের বৃত্তান্ত সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করা আবশ্যক।

উত্তর-পশ্চিম এসিয়ার সুবিশাল ভূখণ্ডের অধিবাসীদিগকে একমাত্র তাতার নামে নির্দ্দেশ করা সঙ্গত নহে। বস্তুতঃ এই সুবিস্তীর্ণ ভূভাগের অধিবাসিগণ ধর্ম্ম, ভাষা ও আচারব্যবহারে পরস্পরবিরোধী নানা সম্প্রদায় ও জাতিতে বিভক্ত। তাহারা স্বস্বপ্রধান ও আপনাদিগকেও কোন সাধারণ নামে অভিহিত করে না; প্রত্যেক সম্প্রদায় বা জাতির স্বতন্ত্র নাম আছে।

মোসলমান ইতিহাসবিদ্গণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, পয়গম্বর নোয়া

---

* Akbarnama. Translated from the Persian by H. Beveridge I.C.S.
Tabakat-i-Nasiri. Translated from the Persian by Major. H. G· verty.
Erskine's Baber and Humayun Vol. I.

গের অধীশ্বর ছিলেন। তাঁহার তিন পুত্র ছিল। মহাত্মা নোয়া
র্যার্থ আপনার দিগন্তবিস্তৃত সাম্রাজ্য তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া
প্রদান করেন।

সারে তৃতীয় পুত্র ইয়াফেস আধুনিক চীন, তুর্কিস্থান ও অক্সাস নদী-
প্রদেশের (স্যানভোনিয়া) শাসনভার প্রাপ্ত হইয়া ভলগা নদীর তীরে
নী স্থাপিত করেন। তুর্কি জাতি এই ইয়াফেসকে তাহাদের আদিপুরুষ
। গণনা করিয়া থাকে।

ইয়াফেসের আট (কাহারও কাহারও মতে এগার) পুত্র ছিল। ইয়াফেসের
্যষ্ঠপুত্রের নাম তুর্ক। তুর্ক পিতৃরাজ্যের কিয়দংশ অধিকারপূর্ব্বক উষ্ণ ও
তল প্রস্রবণে অভিষিঞ্চিত ও নয়নাভিরাম শ্যামলক্ষেত্রে শোভিত সিন-উক
নামক স্থানে রাজধানী সংস্থাপিত করেন। তুর্কের অধিকৃত প্রদেশ তাঁহার
নামানুসারে তুর্কিস্থান আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং তদ্দেশবাসিগণ তুর্কি বলিয়া
প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

তুর্কের অধস্তন পঞ্চম পুরুষের নাম অলিঞ্জা খাঁ। প্রথমে তাঁহার কোন
পুত্রসন্তান ছিল না। কিন্তু অবশেষে দুই যমজ পুত্র ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহার গৃহ
আলোকিত করিয়াছিল। অলিঞ্জা খাঁ বৃদ্ধ বয়সে পুত্রমুখ সন্দর্শন করিয়া
প্রফুল্লচিত্তে তাহাদিগকে তাতার খাঁ ও মোগল খাঁ নামে অভিহিত করিয়া-
ছিলেন। পুত্রদ্বয় বয়সপ্রাপ্ত হইলে স্বরাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া তাঁহা-
দিগকে অর্পণপূর্ব্বক জীবনের সায়াহ্নকালে বিশ্রামসুখসম্ভোগে প্রবৃত্ত হন।
ভ্রাতৃদ্বয় রাজ্যলাভ করিয়া একযোগে শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছিলেন;
কিন্তু কতিপয় বৎসর পরে তাঁহারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া স্ব-স্ব-নামানুসারে
তাতার-আই-মাক ও মোগল-আই-মাক নামক দুইটি স্বতন্ত্র বংশের প্রতিষ্ঠা
করেন। এক জন ইতিহাসলেখক মোগল-অধিকৃত প্রদেশের যে সীমা নির্দ্দেশ
করিয়াছেন, আমরা এখানে তাহা লিপিবদ্ধ করিলাম;—পূর্ব্বে খিতা, পশ্চিমে
ইগুর প্রদেশ, উত্তরে কেরকির ও দক্ষিণে থরথেজ তাঙ্গুত।

মোগল খাঁর অধস্তন নবম পুরুষ ইল খাঁর সমসময়ে তুর নাম
একজন প্রবলপরাক্রান্ত রাজা রাজত্ব করিতেছিলেন। পররাজ্যলোলুপ তু
ইল খাঁকে পরাজিত করিয়া তাঁহার রাজ্য গ্রাস করিবার মনন করেন। তাতা
ও মোগল পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া দুইটি স্বতন্ত্র বংশের প্রতিষ্ঠা করিলে, উ
বংশে পুরুষানুক্রমে শত্রুতা চলিতেছিল। রাজা তুর, ইল খাঁকে আক্র

করিতে উদ্যত হইলে, তাতারবংশীয় অধিপতি সুঞ্জ খাঁ তাঁহার
হইলেন। মোগলের একাধিক পুত্র ছিল। তাঁহার জনৈক পুত্র
এক স্বতন্ত্র বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। ইগুর জাতিও জ্ঞাতিশক্রবি-
রাজা তুরের দলভুক্ত হইল। রাজা তুর বিপুল সৈন্য সমভিব্যাহারে
বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। মোগল জাতি ইল খাঁর একান্ত অনুরক্ত
তাহারা শক্রর গতিরোধ করিবার জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করিল। যুদ্ধক্ষেত্রে বহু
তাতার ও ইগুর যোদ্ধা শক্রহস্তে জীবনবিসর্জ্জন করিল; রাজা তুর স
রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিলেন। মোগল সৈন্য শক্রর পশ্চাদ্ধাবন কর
এই সূত্রে মোগলের সর্ব্বনাশ সাধিত হইল। রাজা তুর মোগলদিগকে প্র
রিত করিবার উদ্দেশ্যেই পলায়ন করিয়াছিলেন। মোগল সৈন্য শক্রর পশ্চা
দ্ধাবন জন্য আপনাদের সুদৃঢ় অবস্থানভূমি পরিত্যাগ করিয়া ব্যূহভঙ্গ করাতে
দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। এই সুযোগে শক্রসৈন্য নিশাবসানে অতর্কিতভাবে
মোগলদিগকে আক্রমণ করিল। মোগল সৈন্য এই আকস্মিক আক্রমণের
গতির প্রতিরোধ করিতে না পারিয়া শক্রহস্তে সমূলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল।
কেবলমাত্র ইল খাঁর পুত্র কারআন খাঁ ও শ্যালকপুত্র নগুজ খাঁ সস্ত্রীক অন্যত্র
ছিলেন বলিয়া শক্রহস্ত হইতে নিস্তার পান। মোগল খাঁর অধস্তন তৃতীয়
পুরুষ আগুজ স্বীয় পিতৃব্যদিগকে অত্যন্ত উৎপীড়ন করায় তাঁহারা চীন রাজ্যে
আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তুর কর্তৃক সমস্ত মোগলবংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া-
ছিল; সুতরাং আধুনিক মোগল জাতি আগুজের পিতৃব্যগণ, কারআন খাঁ ও
নগুজের বংশোদ্ভব।

রাত্রি সমাগত হইলে এই চারি জন স্ত্রী পুরুষ (কারআন খাঁ ও তাঁহার
স্ত্রী, এবং নগুজ ও তাঁহার স্ত্রী) ধন রত্ন ও গোমেষপাল লইয়া পার্শ্ববর্ত্তী
পর্ব্বতে পলায়ন করিলেন। তাঁহারা দুরারোহ পথে নিরাপদ স্থানে গমন
করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে এক শস্যরাজিসুশোভিত উপত্যকায়
উপনীত হইলেন, এবং উহার প্রাকৃতিক দৃশ্যে মুগ্ধ হইয়া তথায় বাসভবন
নির্ম্মাণ করিলেন। এই স্থানে কারআন ও নগুজের বংশ কালক্রমে অত্যন্ত
বিস্তৃতিলাভ করাতে বহু শাখায় বিভক্ত হইয়া পড়িল, এবং তথায় আর স্থান-
সঙ্কুলন হইল না। আবুল ফজলের মতানুসারে দুই সহস্র বৎসর ও আবুল
গাজির মতানুসারে চারি শত বৎসর মোগলগণ এই স্থানে বাস করিয়াছিল।
—কোন মত যথার্থ, তাহা নির্ণয় করিবার কোন উপায় নাই। এ জন্য

ইরগানাকুন উপত্যকা (১) (এই উপত্যকায় তাহারা বাস করি পরিত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার পৈতৃক রাজ্য উদ্ধার করিতে কৃতসঙ্কল্প তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যে পথ অবলম্বন করিয়া ইরগানাকুন উপ-প্রবেশ করিয়াছিল, ভূকম্পনে তাহা রুদ্ধ হওয়ায় নূতন পথ আবিষ্কার তাহাদিগকে প্রভূত পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। তাহারা নবাবিষ্কৃত কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া দেখিল যে, লৌহ আকরে উহা রুদ্ধ হইয়া রাছে। যাহা হউক, মোগলগণ অগ্নিসংযোগে পথ পরিষ্কার করিয়া পৈতৃক জ্য উপনীত হইল। (২) এই সময় মোগলভূমি তাতার-আই-মাক জাতির গত ছিল। আগন্তুক মোগলগণ যুদ্ধক্ষেত্রে তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া পুনর্ব্বার মোগলভূমি অধিকার করেন। মোগল খাঁর অধস্তন তৃতীয় পুরুষ আগুজের পিতৃব্যবংশীয়গণও চীন রাজ্য হইতে মোগলভূমিতে উপনীত হইয়া কার-আত (কারআন) ও দুরলাগিন (নগুজ) মোগলের সহিত সম্মিলিত হইল। মোগলগণের পৈতৃক রাজ্যে ফিরিয়া আসিবার সময় তাহাদের অন্যতম শাখার অধিনেতৃপদে ইয়ালদাজ খাঁ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। আবুল ফজলের মতে ইয়ালদাজ খাঁ পারস্যের সুবিখ্যাত ন্যায়পরায়ণ অধিপতি নোশেরওয়ার রাজত্বের সময় পৈতৃক বাসভূমি পুনর্ব্বার অধিকার করিয়াছিলেন। নোশেরওয়া ৫৩১ হইতে ৫৭৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। নোশেরওয়ার রাজত্বকালে (খৃঃ ৫৭৮) পয়গম্বর মহম্মদ জন্মপরিগ্রহ করিয়া আরবদেশ পবিত্র করেন। মহম্মদ তাদৃশ ন্যায়পরায়ণ ভূপতির রাজত্বকালে জন্মগ্রহণ করাতে, আপনাকে সৌভাগ্যশালী বলিয়া বিবেচনা করিতেন।

---

(১) The mountains referred to are evidently those mighty ranges towards the sources of Salinga and its upper tributaries. Major H. G. Raverty.

(২) মোগলগণ ইরগানাকুন হইতে বহির্গত হইবার দিন চিরস্মরণীয় করিবার জন্য প্রতি বৎসর উৎসব করিয়া থাকে। এই উপলক্ষে মোগলবংশীয় অধিপতিগণ অগ্নিকুণ্ডে এক খণ্ড লৌহ উত্তপ্ত করিয়া হাতুড়ি দ্বারা পিটিয়া থাকেন। ইরগানাকুন হইতে বহির্গ হইবার সময় মোগলগণ লৌহআকররুদ্ধ পথ অগ্নিসংযোগে পরিষ্কার করিয়াছিল। এ ঘটনার অনুকরণেই মোগল অধিপতিগণ এইরূপ অনুষ্ঠান করেন। কিন্তু কোন কোন ইতিহা বেত্তা ইহার মর্ম্মার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ হইয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, চেঙ্গিস খাঁ প্রথ

এই সময় মোগলজাতি বহু শাখায় বিভক্ত হইয়াছিল। প্রধান ছিল, একে অন্যের আধিপত্য স্বীকার করিত না। মৃগ: ও অনায়সধৃত মৎস্যই তাহাদের আহার্য্য ছিল। গৃহপালিত ও বন্য ও লোম দ্বারা তাহারা গাত্রাবরণ প্রস্তুত করিয়া লজ্জানিবারণ করিত তখন মোগলগণ অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল; সভ্যতার জ্যোতিঃ ত মধ্যে প্রবেশ করে নাই।

ইয়ালদাজ খাঁর মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র জুইনা বাহাদুর পিতৃসিংহ আরোহণ করেন। জুইনা বাহাদুরের আলানকোওয়া নাম্নী এক সর্ব্ব সম্পন্না রূপলাবণ্যবতী কন্যা ছিল। জুইনা বাহাদুরের ভ্রাতুষ্পুত্র দুবুন (কন্যাকে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করেন। পিতার জীবদ্দশায় এই বিবাহে ফলস্বরূপ দুইটি পুত্র-সন্তান লাভ করিবার পর আলানকোওয়া বিধবা হন। জুইনা বাহাদুরের মৃত্যুর পর আলানকোওয়ার পুত্রদ্বয় তদীয় রাজ্যের উত্ত রাধিকারী হন। তাঁহারা অপ্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন বলিয়া আলানকোওয়া তাঁহাদের প্রতিনিধিস্বরূপ রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেছিলেন।

আলানকোওয়া পত্যন্তর গ্রহণ করেন নাই। একদা রাত্রিকালে তিনি নিদ্রাভিভূতা ছিলেন। তখন এক অপূর্ব্ব রশ্মিমালা তাঁহার শরীরে প্রবেশ করিয়া সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছন্ন করাতে তিনি সসত্ত্বা হইলেন। এই সংবাদ প্রচারিত হইলে মোগলগণ তৎকথিত বাক্যে বিশ্বাস না করিয়া তাঁহার দুর্নাম রটনা করিতে লাগিল। যাহা হউক, নির্দ্দিষ্টকাল সমাগত হইলে আলান-কোওয়া এককালে তিনটি পুত্র প্রসব করিলেন। কালক্রমে এই পুত্র-ত্রয়ের সর্ব্বকনিষ্ঠ বুজঞ্জর খাঁ মোগলিস্থানের একাংশে আধিপত্য স্থাপন করেন। (১)

বুজঞ্জর খাঁর অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষের নাম তোমনাই খাঁ। তাঁহার দুই পত্নী।

---

(১) এই অসম্ভব গল্প কেন কল্পিত হইয়াছিল? সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক মেজর র‍্যাভারটি নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, প্রত্যেক ইতিহাসবেত্তা এই ঘটনা বিভিন্নভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বুজঞ্জর খাঁর বংশেই চেঙ্গিস খাঁ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জীবনবৃত্ত পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, তিনি আপনাকে দৈববলশালী বলিয়া প্রচার করিবার জন্য সর্ব্বদা যত্নবান ছিলেন। উত্তরকালে যে সময় চেঙ্গিস খাঁ উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিলেন, তখন দেবাশ্রিত বংশে তাঁহার জন্ম হইয়াছে, ইহা প্রমাণিত করিবার জন্য, এইরূপ অসম্ভব গল্প কল্পিত হইয়াছিল।

গর্ব্ভে সাতটি পুত্র জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিল। দ্বিতীয়টির দুই যমজ
একের নাম কাবাল ও অন্যের নাম কাজুলি।
। কাজুলি রাত্রিযোগে এক অপূর্ব্ব স্বপ্ন দেখিলেন। কাবাল খাঁর
হইতে ক্রমান্বয়ে তিনটি জ্যোতির্ম্ময় নক্ষত্র নির্গত হইয়া নির্ব্বাণ প্রাপ্ত
চতুর্থবার একটি অত্যাশ্চর্য্য উজ্জ্বল নক্ষত্র তাঁহার বক্ষঃস্থল হইতে নির্গত
আলোকচ্ছটায় সমস্ত দিঙ্‌মণ্ডল উদ্ভাসিত করিল, এবং তাহার অত্যুজ্জ্বল
়য় অন্যান্য তারকা উজ্জলতর হইল। এইরূপ প্রভাদীপ্ত তারকামালা দ্বারা
ত্যেক বিভাগ আলোকিত হওয়াতে অত্যাশ্চর্য্য উজ্জ্বল নক্ষত্রের অন্তর্দ্ধানের
রও পৃথিবী সমুজ্জ্বল রহিল। ইহার পর কাজুলির নিদ্রাভঙ্গ হইল। অত্যল্প
ল পরেই তিনি পুনর্ব্বার নিদ্রাভিভূত হইলেন। তিনি আবার স্বপ্ন দেখিলেন,
এবার তাঁহার নিজের বক্ষঃস্থল হইতে সাতটি নক্ষত্র ক্রমান্বয়ে বহির্গত হইয়া
অদৃশ্য হইল। অষ্টমবার একটি বৃহদায়তন নক্ষত্র বহির্গত হইয়া আলোক-
চ্ছটায় সমগ্র পৃথিবী উদ্ভাসিত করিল। তাহার পর এই বৃহদায়তন নক্ষত্র হইতে
কতিপয় ক্ষুদ্র তারকা সমুদ্ভূত হইয়া প্রত্যেক কোণ সমুজ্জ্বল করিল। এ জন্য
নক্ষত্ররাজ অদৃশ্য হইলেও এই ক্ষুদ্র তারকামালার প্রভায় সমগ্র পৃথিবী পূর্ব্ববৎ
সমুজ্জ্বল রহিল। রজনীর অবসান হইলে কাজুলি খাঁ পিতৃসমীপে এই স্বপ্নবৃত্তান্ত
নিবেদন করিলেন। তিনি বলিলেন, "কাবাল খাঁ, তোমার বংশীয় তিন জন
রাজা ক্রমান্বয়ে রাজত্ব করিবেন; তাহার পর যিনি জন্মগ্রহণ করিবেন, তিনি
পৃথিবীর অধিকাংশ স্থানে আধিপত্যবিস্তার করিয়া প্রবল পরাক্রান্ত হইবেন,
এবং তাঁহার বংশধরগণের প্রত্যেকেই এক এক প্রদেশে রাজত্ব করিবেন।
কাজুলি বাহাদুর, তোমার বংশে সাত জন সুশাসক ক্রমান্বয়ে জন্মগ্রহণ করিবেন;
তাহার পর যিনি আবির্ভূত হইবেন, তাঁহার আধিপত্য সমগ্র মনুষ্যজাতির উপর
বিস্তার লাভ করিবে, এবং তাঁহার বংশধরগণের মধ্যেও প্রত্যেকেই পৃথিবীর
এক এক বিভাগে রাজ্যসংস্থাপন করিতে সমর্থ হইবেন।" এই ব্যাখ্যা শেষ
হইলে কাবাল খাঁ ও কাজুলি বাহাদুর প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, কাবাল ও তাঁহার
বংশধরগণ পুরুষানুক্রমে রাজত্ব করিবেন, এবং কাজুলি বাহাদুর ও তাঁহার বংশ-
ধরগণ পুরুষানুক্রমে প্রধান মন্ত্রী ও সেনাপতির পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন। (১)

(১) সুপ্রসিদ্ধ এস্‌ক্রাইন সাহেব বাবর ও হুমায়ুন নামক গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে নির্দ্দেশ
করিয়াছেন যে, তৈমুরলঙ্গ চেঙ্গিস খাঁর বংশধরগণ কর্ত্তৃক শাসিত রাজ্যে আবির্ভূত হন।
তৈমুরলঙ্গ রাজসিংহাসনের প্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন যে, আপনাকে

তদনুসারে তোমিনাই খাঁর মৃত্যুর পর কাবাল খাঁ রাজপদে ও
ন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত হইলেন।

কাবাল খাঁ প্রবলপ্রতাপান্বিত শাসনকর্ত্তা ছিলেন বলিয়া মোগল
ভিন্ন শাখা তাঁহার সঙ্গে সৌহার্দ্দ্যসূত্রে আবদ্ধ ছিল। এই সময় মোগ
জ্যের পূর্ব্বপ্রান্তে খিতা রাজ্য বিদ্যমান ছিল। তত্রত্য অধিপতি আলত
াবাল খাঁর সহিত মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হইবার বাসনায় তাঁহাকে স্বরাজ্যে ি
রিলেন। কাবাল খাঁ খিতা রাজ্যে উপনীত হইলে তাঁহাকে আলতান সসম
ও সাদরে গ্রহণ করিলেন। কিন্তু কাবাল খাঁ মত্তাবস্থায় কোন দুষ্কার্য্য করা
আলতান খাঁ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে শিরস্ত্রাণ ও কোমরবন্ধ প্রদানপূর্ব্ব
বিদায় দিলেন। কাবাল খাঁ স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। এত সহজে
কাবালকে অব্যাহতি দেওয়াতে পারিষদবর্গ আলতান খাঁর নিন্দা করিতে লাগি-
লেন; এ জন্য তিনি তাঁহার অতিথিকে পুনর্ব্বার রাজধানীতে আনয়ন করিবার
জন্য দূত প্রেরণ করিলেন। কাবাল খাঁ প্রত্যাবর্ত্তন করিতে অস্বীকৃত হইলেন।
আলতান খাঁ তাঁহাকে আনয়ন করিবার জন্য এক দল সৈন্য প্রেরণ করিলেন।
কাবাল সানজুতি নামক জনৈক বন্ধুর শিবিরে বিশ্রাম করিতেছিলেন; এমন
সময় সৈন্যদল তাঁহার নিকট উপনীত হইল। কাবাল খাঁ তাহাদের সঙ্গে গমন
করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন; কিন্তু সানজুতি তাঁহাকে নিবারণ করিয়া গৃহে
ফিরিবার জন্য দ্রুতগামী অশ্ব প্রদান করিলেন। কাবাল এই বন্ধুর সাহায্যে
স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করিয়া আলতান খাঁর হস্ত হইতে রক্ষা পাইলেন। আল-

---

চেঙ্গিস খাঁর বংশোদ্ভব বলিয়া পরিচিত করিতে পারিলে সহজেই অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে
পারে। চেঙ্গিস খাঁর মৃত্যুর কিঞ্চিদধিক এক শত বৎসর পরে তৈমুরলঙ্গ জন্মগ্রহণ
করেন; এই সময়ের মধ্যে চেঙ্গিস খাঁর বংশীয়গণ সংখ্যাধিক্যবশতঃ নানা স্থানে বিভক্ত হইয়া
ড়িলেও নিঃসম্পর্ক ব্যক্তির পক্ষে তাঁহাদের স্বশ্রেণীভুক্ত হওয়া সহজ ছিল না। কিন্তু
রুষানুক্রমে চেঙ্গিসবংশীয়গণের সহিত সংস্রবের বিষয় প্রচার করিলে জনসাধারণ সহজেই
াহার বাক্যে বিশ্বাস করিবে, এবং তাহাতেও তাঁহার গন্তব্য পথ সুগম হইবে, এইরূপ বিবে-
না করিয়াই তৈমুরলঙ্গ এই গল্পের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আপনাকে চেঙ্গিস খাঁ ও তাঁহার বংশীয়-
ণের সঙ্গে পুরুষানুক্রমে সংসৃষ্ট বলিয়া পরিচিত করেন। কাবাল খাঁর বক্ষঃস্থল হইতে
র্গত চতুর্থ নক্ষত্র চেঙ্গিস খাঁর ও কাজুলি খাঁর বক্ষঃস্থল হইতে নির্গত অষ্টম নক্ষত্র তৈমুর-
ঙ্গর আবির্ভাবের পূর্ব্বাভাস সূচিত করিয়াছিল।

প্ররিত সৈন্যদল তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া মোগলিস্থানে উপনীত
.াজ্ঞায় তরবারিমুখে নিক্ষিপ্ত হইল।

ময় কাবাল খাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র ওকিনবরকাক দেশে ভ্রমণ করিত
তিনি দৈবদুর্ব্বিপাকে মোগল জাতির চিরশত্রু তাতারগণের হ
হওয়াতে তাহারা তাঁহাকে বন্দী করিয়া আলতান খাঁর নিকট সমর্প
।। আলতান খাঁ নির্দ্দোষ রাজকুমারকে নৃশংসভাবে হত্যা করি
াল খাঁর দুর্ব্ব্যবহারের প্রতিশোধ লইলেন।

ইহার কিয়দ্দিবস পরেই কাবাল খাঁ মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। তদীয় কনিষ্ঠ
্ত্র কুবিলা খাঁ পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করিলেন, এবং ভ্রাতৃহন্তাকে শাস্তি
দবার জন্য সসৈন্যে খিতা রাজ্যের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। কুবিলা খাঁ
তুমুল যুদ্ধে শত্রুসৈন্য পরাস্ত করিয়া অসংখ্য ধনরত্ন লুণ্ঠন পূর্ব্বক স্বরাজ্যে ফিরিয়া
আসিলেন।

কুবিলা খাঁ লোকান্তরিত হইতে তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা বরতান বাহাদুর (পূর্ব্ব-পুরুষগণের উপাধি খাঁ ছিল, ইনি তাহা পরিত্যাগ করিয়া বাহাদুর উপাধি গ্রহণ করেন) রাজসিংহাসন অধিকার করিলেন। বরতান বাহাদুর রাজ্যভার গ্রহণ করিবার অত্যল্পকালমধ্যেই কাজুলি বাহাদুর দেহপরিত্যাগ করিলেন, এবং পূর্ব্বনিয়মানুসারে তদীয় পুত্র ইরদম মন্ত্রিপদে অভিষিক্ত হইলেন। ইরদম মন্ত্রিপদে অভিষিক্ত হইয়া বরনাস (বরনাস—বীরপুরুষ ও সদ্বংশজাত) উপাধি গ্রহণ করিয়া একটি অভিনব মোগল শাখার (বরনাস) প্রতিষ্ঠা করিলেন।

বরতান বাহাদুর কালগ্রাসে পতিত হইলে তদীয় পুত্র এয়াসুক বাহাদুর পিতৃসিংহাসনের অধিকারী হইলেন। ইহার কিয়দ্দিবস পরেই ইরদম-সি-বরনাস প্রাণপরিত্যাগ করিলেন, এবং তদীয় পুত্র সুগুজিজান তৎস্থলাভিষিক্ত হইলেন। এয়াসুক বাহাদুর স্বীয় মন্ত্রী সুগুজিজানের সাহায্যে বিপুল সৈন্য সংগ্রহ করিয়া চিরশত্রু তাতারদিগকে আক্রমণ করিলেন, এবং তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করিয়া দিলোনবুলদাগে (১) ফিরিয়া আসিলেন। এয়াসুক বাহাদুর প্রধানতঃ এই স্থানে অবস্থান করিতেন। তিনি দিলোনবুলদাগে উপনীত হইলে তদীয় প্রধানা মহিষী উলোনআওকা ১১৫৫ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে একটি পুত্র প্রসব করিলেন। পুত্রের নাম তমুরচি। কিন্তু উত্তরকালে এই পুত্র চেঙ্গিস খাঁ

(১) রুসিয়ার সীমান্তপ্রদেশে উত্তর মঙ্গোলিয়ায় ওনন নদীর তীরে অবস্থিত।

.মে জগদ্বিখ্যাত হইয়াছিলেন। সুগুজিজান নবজাত শিশুর ত
সুলক্ষণ দেখিয়া নির্দ্দেশ করিলেন যে, কাবাল খাঁর বক্ষঃস্থল হই
নক্ষত্র বহির্গত হইয়া ইঁহারই জন্ম সূচিত করিয়াছিল।

১১৬৭ খৃষ্টাব্দে এয়াসুক বাহাদুর দেহত্যাগ করিলে তদীয় ত্র
বয়স্ক পুত্র তমুরচি পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করিলেন।

তমুরচির পিতৃসিংহাসনে আরোহণসময়েও সভ্যতার বিমল জে
মোগলিস্থানে প্রবেশ করিয়া অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত করে নাই। ত
তাহারা পশুপালক ছিল। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য মোগলিস্থানের
এক অংশ নির্দ্দিষ্ট ছিল। তাহারা শীত গ্রীষ্ম অথবা পালিত পশুর আহা
তৃণের প্রাচুর্য্য বা অল্পতা অনুসারে স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে এক স্থান হইতে
অন্য স্থানে পরিবারবর্গ, পশুপাল ও বাসগৃহ সহ স্থানান্তরিত হইত। এ জন্য
তাহারা পট্টবাস বা স্থানান্তরিত করিবার উপযোগী কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস
করিত। অশ্ব, গো ও মেষপালই তাহাদের একমাত্র সম্পত্তি ছিল। দুগ্ধ ও
পালিত পশুর মাংসই তাহাদের প্রধান খাদ্য ছিল। কিন্তু মোগলগণ পালিত
পশু সহসা হনন করিত না। তাহারা কৃষিকার্য্যের তাদৃশ অনুরাগী ছিল না,
বরং যে সকল প্রতিবাসী স্থায়িভাবে অবস্থান করিত, তাহাদিগকে
অবজ্ঞা করিত। সন্তানপালন, খাদ্যসামগ্রী প্রস্তুত ও অন্যান্য গৃহকার্য্যের
ভার স্ত্রীলোকের প্রতি ন্যস্ত ছিল। উন্মুক্ত স্থানে বাস করিয়া, অশ্বপৃষ্ঠে
অধিকাংশ সময় যাপন করিয়া, ক্ষুধা তৃষ্ণা সহ্য করিয়া, এবং শত্রুর
অতর্কিত আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য সর্ব্বদা সশস্ত্রভাবে অবস্থান
করিয়া তাহাদের জীবন কষ্টসহিষ্ণু ও প্রকৃতি বীর্য্যবিশিষ্ট হইয়াছিল।
তাহাদের রাজ্যশাসনপ্রণালী patriarchal ছিল; সমগ্র সম্প্রদায় বা
জাতি এক মূল হইতে উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়া তাহারা সানন্দে কোন এক নির্দ্দিষ্ট
পরিবারের সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তিকে বংশানুক্রমে অধিনেতা বলিয়া স্বীকার
করিত। কিন্তু বিভিন্ন শাখার আভ্যন্তরীণ শাসন সম্বন্ধে প্রাচীন স্বতন্ত্র
আচারব্যবহার বা অধিনেতৃগণের ব্যক্তিগত চরিত্রের পার্থক্যনিবন্ধন স্বতন্ত্র
প্রণালী অনুসৃত হইত। কোন কোন অধিনেতা সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাচারী ছিলেন।
কিন্তু সাধারণতঃ অধিনেতৃগণ আপন আপন সম্প্রদায়স্থ বিশিষ্ট পরিবারসমূ-
হের প্রধান ব্যক্তিগণের পরামর্শ-অনুসারে শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন;
" কোন গুরুতর বিষয়ের মীমাংসার সময় সমগ্র সম্প্রদায়কে সম্মিলিত করাই

আত্মকলহ উপস্থিত হইলে অক্‌সকৃলাসগণ (১) প্রাচীন প্রথা: বিচার করিতেন।

২।

মোগল ও তাতার জাতি বহুশাখায় বিভক্ত ছিল। তুর্কিজাতি াগল ও তাতার ব্যতীত আরও অসংখ্য বংশের উৎপত্তি হইয়াছিল। ল বংশও আবার নানা শাখায় বিভক্ত হইয়াছিল। মোগল, তাতার জাতীয় অন্যান্য বংশে একাত্তর জন হাকিম অথবা অধিনেতা আধি- করিতেছিলেন। প্রত্যেক অধিনেতা এক বা ততোধিক শাখার শাসন রতেন। মোগলবংশের অন্যতম শাখার নাম নায়রুন ছিল। এয়াসুক হাদুরের আধিপত্য নায়রুন মোগলগণের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। এ জন্য তাঁহার ত্যুর পর কেবলমাত্র তাহারাই তদীয় পুত্র তমুরচিকে অধিনেতৃরূপে গ্রহণ করিয়াছিল।

ইহার অব্যবহিত পরেই বিজ্ঞ ও বহুদর্শী অমাত্য সুগুজিজান লোকান্তরিত হইলে তদীয় কিশোরবয়স্ক পুত্র কারসার নোয়ান মন্ত্রিপদে নিযুক্ত হইলেন। নায়রুন মোগলগণ দুই জন কিশোরবয়স্কের হস্তে তাহাদের শাসনভার অর্পিত হয় দেখিয়া বিদ্রোহী হইয়া তানজিউত নামক মোগলগণের সঙ্গে মিলিত হইল। এই সময় নায়রুন মোগলগণ চল্লিশ হাজার পরিবারে বিভক্ত ছিল। ইহাদের অধিকাংশই অপরিণতবয়স্ক তমুরচিকে পরিত্যাগ করিয়া শক্রদলে মিলিত হইল; কেবলমাত্র কিঞ্চিদধিক ত্রয়োদশ সহস্র পরিবার তাঁহার অধীনতাপাশ ছিন্ন করিল না। চতুর্দ্দিক হইতে বিপদরাশি তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিল। এই- ভাবে সতের বৎসর অতিবাহিত হইলে ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহার প্রতি সুপ্রসন্ন হইলেন। যে সকল নায়রুন মোগল-পরিবার তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া শক্রসঙ্গে মিলিত হইয়াছিল, তাহারা পুনর্ব্বার তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিতে আরম্ভ করিল। এই সকল পরিবার তাঁহার সঙ্গে মিলিত হওয়াতে তাঁহার দল যথেষ্ট পুষ্টিলাভ করিল। অতঃপর তিনি আরও কতিপয় মোগল শাখার মধ্যে আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইলেন।

কিন্তু তমুরচির ভাগ্যলক্ষ্মী দীর্ঘকাল সুপ্রসন্ন রহিলেন না। নায়রুন মোগল- গণ পুনর্ব্বার তাঁহার সঙ্গে মিলিত হওয়াতে তানজিউত মোগলগণের অধিপতি

(১) The Turks and Afghans call the leading men who form a sor of councillors in the tribe Ak saklas white (grey) beards.

তুরকুতে তাঁহাকে বিনাশ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছি দৈবাৎ শত্রুহস্তে পতিত হইয়া বন্দী হইলেন। তিনি বন্দিভাবে তিন বৎসর অতিবাহিত করিয়া সুযোগক্রমে পলায়ন করিলেন, এব আবাসভূমির অনতিদূরবর্ত্তী একটি হ্রদে সর্ব্বাঙ্গ নিমজ্জিত করিয়া নাসিকাগ্রভাগ জলোপরি রক্ষাপূর্ব্বক লুক্কায়িত রহিলেন। তাঁহা বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইলে তুরকুতে তাঁহাকে ধৃত করিবার জন্য একদ প্রেরণ করিলেন। সুরগানসিরাহ নামক জনৈক তানজিউত মোগ চিকে এইরূপ বিপন্ন অবস্থায় পতিত দেখিয়া দয়াপরবশ হইল, এবং সমাগত হইবামাত্র তাঁহাকে হ্রদ হইতে উদ্ধার করিয়া একখানি মেষলো শকটের মধ্যে লুকাইয়া রাখিল। এ দিকে তুরকুতের প্রেরিত সৈন্যদল সন্দিহ হইয়া সুরগানসিরাহের গৃহে উপনীত হইয়া তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধা করিল। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তাহারা বহু অনুসন্ধানেও তমুরচিকে প্রাপ্ত না হইয়া ভগ্নান্তঃকরণে প্রস্থান করিল। তমুরচি শত্রুদলকে প্রস্থান করিতে দেখিয়া নির্ভয়চিত্তে সুরগানসিরাহ-প্রদত্ত কৃষ্ণবর্ণস্কন্ধ অশ্বে আরোহণ করিয়া স্বদেশে গমন করিলেন। এই ঘটনা ১১৯১ খ্রীষ্টাব্দে সংঘটিত হইয়াছিল। (১)

তমুরচি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া স্বীয় আধিপত্যবিস্তার করিবার কল্পনায় পুনর্ব্বার যুদ্ধবিগ্রহে ব্যাপৃত হইলেন। ইহার পর দুই বৎসর অতিবাহিত হইলে ১১৯৩ খৃষ্টাব্দে বিভিন্ন শত্রুদল তাঁহাকে সমূলে বিনাশ করিবার জন্য একত্র মিলিত হইল। তমুরচি শত্রুপক্ষকে একান্ত প্রবল ও বহুসংখ্যক দেখিয়া তাহাদের গতিরোধ করা অসাধ্য বিবেচনায় পিতৃবন্ধু আওয়াঙ্গ খাঁর শরণাপন্ন হওয়াই কর্ত্তব্য বলিয়া অবধারণ করিলেন। তদীয় অমাত্য কারসার নোয়ান তমুরচির একান্ত অনুরক্ত ছিলেন; তিনিও তাঁহার সঙ্গে আওয়াঙ্গ খাঁর রাজ্যে গমন করিলেন। আওয়াঙ্গ খাঁ করাএয়াত মোগল শাখার অধিপতি ছিলেন। করাএয়াত মোগলগণ জনসংখ্যায় অধিক ছিল। আওয়াঙ্গ খাঁ সম্ভ্রান্ত ও ঐশ্বর্য্যশালী নরপতি ছিলেন। তিনি খিতাধিপতির সঙ্গে সৌহৃদ্যসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। তমুরচি ও কারসার এই রাজ্যে উপনীত হইলে সাদরে গৃহীত হইলেন।

এখানে তমুরচির অবস্থা ক্রমশঃ শ্রীসম্পন্ন হইতে লাগিল। আওয়াঙ্গ খাঁ প্রত্যেক কার্য্যে তাঁহার মতামত গ্রহণ করিতেন। তমুরচি তাঁহার এত দূর প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহাকে পুত্র বলিয়া সম্বোধন করিতেন ও

ক্ত করিয়াছিলেন। তমুরচি আট বৎসর কাল আওয়াঙ্গ খাঁ
হান করিয়াছিলেন ; এই সময়ের মধ্যে তিনি আশ্রয়দাতার অনেক
পন্ন ও তাঁহার পক্ষে বহু যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন।

গবে আট বৎসর অতিবাহিত হইলে, তমুরচির সৌভাগ্যসন্দর্শন
আওরাঙ্গ খাঁর অমাত্য ও জ্ঞাতিবর্গের হৃদয়ে ঈর্ষ্যানল প্রজ্বলিত
তাঁহারা তমুরচির সর্ব্বনাশ করিবার জন্য উপায়-উদ্ভাবনে ব্যাপৃত
ন। তমুরচি তাঁহাদের ঐকান্তিক চেষ্টায় অত্যল্পকালমধ্যেই আওয়া-
খাঁর পুত্র সনগুণের বিষদৃষ্টিতে পতিত হইলেন। তাঁহারা সকলে
লিত হইয়া আওয়াঙ্গ খাঁকে তাঁহার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন।
মুরচি তাঁহার প্রিয়পাত্র ছিলেন। আওয়াঙ্গ খাঁ তাঁহাকে আশ্রয় প্রদান
করিয়া তমুরচির শত্রুদলের এত দূর বিরাগভাজন হইয়াছিলেন যে, তাহারা
আওয়াঙ্গ খাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিল ; তথাপি তিনি তাঁহাকে
পরিত্যাগ করেন নাই। আওয়াঙ্গ খাঁ ঈদৃশ প্রীতিভাজন আশ্রিতকে
বিনাশ করিতে স্বীকৃত হইলেন না। কিন্তু পুত্র কর্ত্তৃক অনবরত উত্তেজিত
হইয়া অবশেষে তমুরচিকে বন্দী করিবার অনুমতি প্রদান করিলেন।
তমুরচি আসন্ন বিপদের বিষয় দৈবাৎ অবগত হইয়া কারসার নোয়ানের সহিত
পরামর্শ করিয়া পলায়ন করাই কর্ত্তব্য বলিয়া অবধারণ করিলেন। তদনুসারে
পরিবারবর্গকে বানজোনাহবোনাক নামক নিরাপদ স্থানে প্রেরণ করিয়া
রাত্রিকালে অনুচরগণ সহ পলায়ন করিলেন। ইহার কিয়ৎকাল পরেই
আওয়াঙ্গ খাঁ তাঁহাদিগকে বন্দী করিবার জন্য উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের বাসভবন
শূন্য দেখিয়া একান্ত ক্ষুব্ধ হইলেন। আওয়াঙ্গ খাঁ তাঁহাদের পশ্চাদনুসরণ করিয়া
কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াই তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইলেন। উভয় দলে সংঘর্ষণ
উপস্থিত হইল ; অনুসরণকারী দল পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল।

অতঃপর তমুরচি স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই সময় তমুরচির
বয়ঃক্রম ঊনপঞ্চাশ বৎসর তমুরচি শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার
জন্য আওয়াঙ্গ খাঁর শরণাপন্ন হইলে নায়কশূন্য মোগলগণ নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত
হইল। তাহারা অধিপতিকে প্রত্যাগত দেখিয়া পুনর্ব্বার তাঁহার সঙ্গে মিলিত

---

(১) এই ঘটনা হইতে মোগলগণ কৃষ্ণবর্ণস্কন্ধ অশ্বকে পূজার্হ বলিয়া মনে করিয়া থাকে

প্রেরণ করিগিল। তমুরচি রাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইলে আরও ক
শত্রু কর্তৃপর বশ্যতা স্বীকার করিল।

রাৎ ; ক্রমশঃ শক্তিসঞ্চয় করিয়া বিপুল সৈন্য সংগ্রহপূর্ব্বক
খাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। যুদ্ধে
কালে কারসার নোয়ান আওয়াঙ্গ খাঁর অশ্বকে শরাঘাতে ভূ
করিলেন। তখন আওয়াঙ্গ খাঁ ভয়ব্যাকুলচিত্তে রাজমহিষী ও রা
দিগকে শত্রুহস্তে পরিত্যাগ করিয়া পুত্র সহ পলায়ন করিলেন। তমুর
ভাবে আওয়াঙ্গ খাঁকে বিধ্বস্ত করিয়া সগৌরবে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

আওয়াঙ্গ খাঁর ন্যায় পরাক্রমশালী অধিপতিকে পরাস্ত করাতে ত
চির যশোরাশি চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল ; এ জন্য কতিপয় মোগল শাৎ
তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিল, এবং তিনি খাঁ উপাধি গ্রহণ করিলেন।

অতঃপর তমুরচি পার্শ্ববর্ত্তী মোগল, তাতার ও তুর্কজাতীয় অন্যান্য-বংশীয়দের অধিকৃত স্থানসমূহ হস্তগত করিয়া স্বীয় আধিপত্য বৃদ্ধি করিতে সচেষ্ট হইলেন। ন্যূনাধিক চারি বৎসরের মধ্যেই তিনি বহুসংখ্যক অধিপতিকে পরাস্ত করিয়া প্রবলপরাক্রান্ত নরপতি বলিয়া সর্ব্বত্র পরিগণিত হইলেন। তাঁহার উচ্চাশা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

১২০ খৃষ্টাব্দে যে সকল বিভিন্নশাখাসম্ভূত মোগলগণ তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল, তাহাদিগকে একত্র সমবেত করিলেন। তাহার পর তিনি সমবেত জনমণ্ডলীর নিকট আপনাকে ভবিষ্যদ্দর্শী বলিয়া বর্ণনা করিয়া বলিলেন যে, তিনি কখনও কখনও স্বর্গে নীত হইয়া থাকেন। সরল বিশ্বাসী মোগলগণ এ কথায় প্রত্যয় করিল। তমুরচির বক্তব্য শেষ হইলে কুকজু নামক তাঁহার জনৈক অন্তরঙ্গ (১) গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন, “আমি গত রাত্রিতে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিয়াছি। একজন রক্তবর্ণ পুরুষ ধূসরবর্ণ অশ্বে আরোহণ করিয়া আমার নিকট উপনীত হইয়া বলিলেন, তুমি এস্নাসুক বাহাদুরের পুত্রকে বলিবে যে, আর কেহ তাঁহাকে তমুরচি নামে সম্বোধন করিবে না ; অতঃপর সকলেই তাঁহাকে চেঙ্গিস খাঁ নামে অভিহিত করিবে। তুমি চেঙ্গিস খাঁকে আরও বলিও যে, সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর

(১) তমুরচির মাতা উলোপআওকা এস্নাসুক বাহাদুরের মৃত্যুর পর মিঙ্গলিক নামক জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই বিবাহের ফলস্বরূপ কুকজু জন্মগ্রহণ করেন।

তাঁহার বংশধরগণকে পৃথিবীর অধিকাংশ সমর্পণ কর্
নমণ্ডলী এই স্বপ্নবৃত্তান্ত অবগত হইয়া চেঙ্গি‍‍স খাঁর (১)
য়া উঠিল।

স খাঁ যে গূঢ় উদ্দেশ্যে এই দরবার আহ্বান করিয়া কুক্‌জু দ্বারা সম-
নেমণ্ডলীর নিকট দৈববাণীর প্রচার করেন, তাহা সিদ্ধ হইয়াছিল।
প্নবৃত্তান্ত রাজ্যময় প্রচারিত হইয়া পড়িলে সরল বিশ্বাসী মোগলগণ বিশ্বাস
। যে, সমগ্র পৃথিবীতে আধিপত্য স্থাপন করিবার জন্যই চেঙ্গিস খাঁ
শক্তিমান ঈশ্বর কর্তৃক প্রেরিত হইয়াছেন। ইহার ফলস্বরূপ চেঙ্গিস
নানা স্থানে আধিপত্য স্থাপন করিতে সমর্থ হইলেন। এবং তদীয় সৈন্য
অমানুষিক সাহসসম্পন্ন হইয়া উঠিল। এই সময়ে চেঙ্গিস খাঁ উদীয়মান
সূর্য্যের ন্যায় প্রতীত হইতেছিলেন। পশ্চিমে ঘোর খাঁর অধিকৃত রাজ্যের
সীমান্তপ্রদেশ হইতে পূর্ব্ব দিকে খিতা অথবা উত্তর-চীনের পার্শ্বদেশ পর্য্যন্ত
সমগ্র ভূখণ্ডে তাঁহার আধিপত্য অল্লাধিক স্থাপিত হইয়াছিল।

অধিকাংশ মোগল-বংশ তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করাতে, তিনি পর রাজ্যের
প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার অবসর প্রাপ্ত হইলেন। সর্ব্বপ্রথমে খিতা রাজ্য
তাঁহার সতৃষ্ণ দৃষ্টিপথে পতিত হইল। চেঙ্গিস খাঁর অভ্যুদয়ের বহুপূর্ব্বে
তদানীন্তন খিতাধিপতি (২) তাঁহার পিতামহের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে
নৃশংসভাবে হত্যা করিয়াছিলেন। চেঙ্গিস খাঁ খিতাধিপতির পূর্ব্বপুরুষ
কর্তৃক অনুষ্ঠিত হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ লইবার ব্যপদেশে মোগল-
গণকে তাঁহার বিরুদ্ধে উত্থিত হইবার জন্য উত্তেজিত করিলেন।
তাহার পর তিনি খিতাধিপতি আলতান খাঁর দরবারে দূত প্রেরণ করিয়া
তাঁহাকে বশ্যতা স্বীকার করিবার জন্য আদেশ করিলেন। খিতা-
ধিপতি চেঙ্গিস খাঁর দূতকে দরবার হইতে বাহির করিয়া দিলেন।
রাজদূত প্রত্যাগত হইলে চেঙ্গিস খাঁ খিতারাজ্য মথিত করিবার
জন্য বিপুল আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন। আলতান খাঁ এই সংবাদ অবগত
হইয়া শত্রুর প্রবেশপথ রুদ্ধ করিবার জন্য ত্রিশ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য

(১) চেঙ্গিস খাঁ শব্দের অর্থ, সম্রাট।

(২) যিনি চেঙ্গিস খাঁর পিতামহের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বধ করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম
আলতান খাঁ। চেঙ্গিস খাঁর অভ্যুদয়কালে যিনি খিতারাজ্যে রাজত্ব করিতেছিলেন, তাঁহা
নামও আলতান খাঁ। খিতাধিপতিগণের উপাধি আলতান খাঁ ছিল বলিয়া অনুমি
হয়।

[প্রে]রণ করিলেন। মোগলাধিপতি খিতারাজ্যে প্রবেশ করিবার
শত্রু কর্ত্তৃক রুদ্ধ হইয়াছে দেখিয়া গুপ্তপথের অনুসন্ধান করিতে লা[গিলেন।]
অচিরাৎ তাদৃশ পথের সন্ধান প্রাপ্ত হইয়া নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতের
মোগলপরিবারদিগকে সমবেত করিলেন। এই স্থানে তাঁহার অ[াজ্ঞায়]
মাতা পুত্র ও স্ত্রীপুরুষ পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইল। তিন দিন পর্য্যন্ত কেহই
গ্রহণ করিল না, এবং স্ত্রীপুরুষনির্ব্বিশেষে সকলেই অনাবৃতমস্তকে
করিল। চেঙ্গিস খাঁ স্বয়ং পটগৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া গলদেশ রজ্জুবদ্ধ
লেন, তিন দিন পর্য্যন্ত আর বহির্গত হইলেন না। এই তিন দিন সম
জনমণ্ডলী ঈশ্বরের নামোচ্চারণ পূর্ব্বক জয়ধ্বনি করিতেছিল। চেঙ্গিস
চতুর্থ দিন প্রত্যূষে পটগৃহ হইতে বহির্গত হইয়া বলিলেন, "টিঙ্গরি (ঈশ্বর
আমাকে বিজয়মাল্যে ভূষিত করিয়াছেন। এখন আমরা আলতান খাঁকে
শাস্তি দিবার জন্য অভিযান করিব।" তাহার পর তিন দিন মোগলগণ
ভোজাদি উৎসবে মত্ত রহিল।

এই তিন দিন অতিবাহিত হইলে চেঙ্গিস খাঁ সসৈন্যে গুপ্ত পথে খিতারাজ্যে
প্রবেশ করিয়া তমগজ প্রদেশ আক্রমণ করিলেন। আলতান খাঁ চেঙ্গিস খাঁর
আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া ভীতিবিহ্বল হইয়া পড়িলেন; কারণ, তিনি
বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, শত্রুর প্রবেশপথ রুদ্ধ করিবার জন্য যে ত্রিশ
সহস্র সৈন্য প্রেরিত হইয়াছিল, তাহারা সমূলে বিনষ্ট হইয়াছে। এ দিকে
আলতানের প্রেরিত সৈন্যদল কর্ত্তৃক তমগজ প্রদেশ লুণ্ঠিত ও বিধ্বস্ত হইবার
সংবাদ অবগত হইয়া যে যে দিকে পারিল, পলায়ন করিল। যাহারা পলায়ন
করিতে পারিল না, তাহারা শত্রুহস্তে বন্দী হইল, অথবা জীবন বিসর্জ্জন
করিল।

চেঙ্গিস খাঁ তমগজ নগর ও তেঙ্গেত প্রদেশ অধিকার করিয়া খিতা
রাজ্যের রাজধানী তমগজ নগরের দ্বারদেশে (১) উপনীত হইলেন।
তিনি তমগজ নগর অবরোধ করিলে আলতান খাঁ বিপুলবিক্রমে আত্মরক্ষা
করিতে লাগিলেন। মনুষ্যের যাহা সাধ্য, আলতান খাঁ নগররক্ষার জন্য সে

(১) He then turned his face towards the Altan Khan's capital and metropolis of Khita which in the Tarikh-i-Jahangir Habib-us-Siyar, &c is named Chingdu or Chinghtu, where the Altan khan then vas. This must be our author's city of Tamghaj, that is to say, the chief ity of the country of Tamghaj.—Major H. G. Raverty.

ষ্ঠান করিলেন ; কিন্তু কিছুতেই নগর রক্ষা করিতে পারিলে—
বৎসর পরে তমগজ নগর শত্রুহস্তে পতিত হইল।

খাঁর অভ্যুদয় ও মোগলসৈন্য কর্ত্তৃক খিতারাজ্য বিধ্বস্ত হইবার
শে বিদেশে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িলে খারিজমাধিপতি (১) সুলতান
প্রকৃত তথ্যনির্ণয়ের জন্য দূত প্রেরণ করিলেন। রাজদূত আলতান
রধানীর নিকটবর্ত্তী হইলে একটি শুভ্রবর্ণ সমুচ্চ স্তূপ তাঁহার দৃষ্টিপথে
হইল। রাজদূত উহাকে তুষারমণ্ডিত পর্ব্বত বলিয়া বিবেচনা করি-
; কিন্তু তাঁহার পথপ্রদর্শককে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে,
গল-সংঘর্ষণে যে সকল সৈন্য কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে, তাহাদের কঙ্কাল-
শি তাদৃশ সমুচ্চ স্তূপাকার ধারণ করিয়াছে। রাজদূত তথা হইতে কিয়দ্দূর
গ্রসর হইয়াই দেখিলেন যে, রাজপথ বহু দূর পর্য্যন্ত মৃত সৈন্যের বসায়
চর্চ্চিত রহিয়াছে। পূর্ব্বোক্ত সুদীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধে অসংখ্য সৈন্য জীবন
বিসর্জ্জন করিয়াছিল। এক জন ইতিহাসবেত্তা নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, মৃতদেহ-
রাশি নিঃশেষ করিতে মাংসাশী পশুপক্ষীর এক বৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল।
রাজদূত রাজধানীর দ্বারদেশে উপনীত হইয়া দেখিলেন যে, দুর্গমূলে নরকঙ্কাল-
রাশি স্তূপাকারে সজ্জিত রহিয়াছে। তিনি অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারি-
লেন যে, ষষ্টিসহস্র বালিকা ও কুমারী মোগলের কবল হইতে রক্ষা পাইবার
জন্য আত্মহত্যা করিয়াছিল, তাহাদের কঙ্কালরাশি তথায় সজ্জিত রহিয়াছে।

রাজদূত চেঙ্গিস খাঁর দরবারে উপনীত হইলে তিনি সাদরে গৃহীত হইলেন।
চেঙ্গিস খাঁ সুলতানকে উপহার দিবার জন্য নানাবিধ বহুমূল্য দ্রব্য তাঁহার
হস্তে অর্পণ করিয়া বন্ধুতার প্রার্থী হইলেন, এবং উভয় রাজ্যে অবাধে বাণিজ্য
চলিতে পারে, এই মর্ম্মে সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। তৎপরে স্বীয় দূত সহ
স্বর্ণ, রৌপ্য, রেশম ও অন্যান্য নানাবিধ বহুমূল্য পণ্যদ্রব্যে পূর্ণ পঞ্চ শত
উষ্ট্র বাণিজ্যার্থ খারিজম রাজ্যে প্রেরণ করিলেন। খারিজমাধিপতি সুলতান
অর্থলোভের বশবর্ত্তী হইয়া এই বণিকদলকে সমূলে বিনষ্ট করিলেন। কেবল-
মাত্র এক জন উষ্ট্রচালক দৈবাৎ শত্রুহস্ত হইতে পরিত্রাণলাভ করিয়া খিতা-
রাজ্যে গমন করিয়া সুলতান কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত দুষ্কার্য্যের সংবাদ প্রদান করিল।
এই শোচনীয় সংবাদ অবগত হইয়া চেঙ্গিস খাঁর ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠে,
এবং উহাতে সমগ্র খারিজম সাম্রাজ্য ভস্মীভূত হইয়া যায়। (ক্রমশঃ।)

(১) আধুনিক খিতার প্রাচীন নাম খারিজম।

মুদ্রাবিভ্রাট।

২।

মুদ্রা-রাজ্যে বর্ত্তমান পরিবর্ত্তনের সম্যক অবধারণ করিতে হইলে আ: একটি কথা বিশেষরূপে বুঝিতে হইবে।

ভারতে রৌপ্যমুদ্রা একাধারে যে দুইটি প্রধান কার্য্য সম্পাদন ক পূর্ব্ব প্রবন্ধে তাহার উল্লেখ করিয়াছি। বিনিময়ের সুবিধার্থ রৌপ্য কেবল প্রচলিত মুদ্রারূপে ব্যবহৃত হইত, তাহা নহে; ইহাই মূল্যের মাপকাটী স্বর পরিগণিত হইয়া যাবতীয় দ্রব্যের মূল্য নির্দ্ধারণ করিতেছিল। প্রচলিত মুদ্রা মধ্যে একটিকে প্রাধান্য দিয়া তাহাকেই standard of value ধরিয়া লওয়া নানা কারণে সুবিধাজনক বটে, কিন্তু সকল অবস্থাতেই প্রচলিত মুদ্রার একটিকে যে standard of value করিতেই হইবে, এরূপ কোন কারণ নাই। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে এক্ষণে প্রচলিত স্বর্ণমুদ্রাই উভয় কার্য্য করিতেছে বটে, কিন্তু পূর্ব্বে অষ্টম হেন্‌রির রাজত্বকালে রজতনির্ম্মিত সিলিং নামক যে মুদ্রা stadard of value ছিল, সেই মুদ্রার তৎকালে আদৌ প্রচলন ছিল না। সেই সময়ে সাধারণতঃ তাৎকালিক প্রচলিত অন্যান্য মুদ্রা বিনিময়ের সমস্ত কার্য্যই সম্পাদন করিত। মুদ্রার এই দুইটি স্বতন্ত্র কার্য্যের পার্থক্য বিশেষ করিয়া হৃদয়ঙ্গম করা আবশ্যক। কারণ, এইরূপ সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, রৌপ্যকে তাহার দ্বিতীয় কার্য্য হইতে অবসর প্রদান না করিলে বর্ত্তমান বিভ্রাট হইতে মুক্তি পাইবার আর অন্য উপায় নাই। দরিদ্র ভারতে এখনও কিছুকালের জন্য রৌপ্যকেই প্রচলিত মুদ্রার কার্য্য করিতে হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহা standard of value রূপে যে কার্য্য করিতেছিল, কালবিলম্ব না করিয়া সেই কার্য্য হইতে ইহাকে অবসর দিয়া তৎস্থলে সুবর্ণকে অভিষিক্ত করা যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হইয়াছে।

ভারত দরিদ্র বলিয়াই ভারতে স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন আপাততঃ সম্ভব নহে। মুদ্রার উল্লিখিত উভয়বিধ কার্য্য যদি স্বর্ণের দ্বারা সম্পাদন করা এই দেশে বর্ত্তমান অবস্থায় সম্ভবপর হইত, তাহা হইলে মুদ্রারাজ্যে স্বর্ণ ও রৌপ্যের আনুপাতিক মূল্যের বিভিন্নতাজনিত বিভ্রাট সহজেই অপসারিত হইত। কিন্তু

ক্ষুদ্রাকৃতি করা হউক না কেন, প্রচলনার্থ ক্ষুদ্রতম স্বর্ণমুদ্রার মূল্য
; রজতমুদ্রার তুল্য হইবে। বহুপরিবারবেষ্টিত ভারতীয় শ্রমজীবীর
য় সাধারণতঃ ছয়টি রজতমুদ্রার অধিক নহে; তাহার সংসারযাত্রার
কল ক্রয় বিক্রয় আবশ্যক, তাহা কিরূপে ১০৲ টাকা মূল্যের স্বর্ণমুদ্রার
পাদিত হইবে? মনে করুন, ভারতে কৃষক তাহার উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়
বিনিময়ে একটি ১০৲ টাকা মূল্যের স্বর্ণমুদ্রা প্রাপ্ত হইল; কিন্তু তাহার
চ্ছাদনের জন্য তাহাকে যে সকল দ্রব্য ক্রয় করিতে হইবে, তাহাদের বিনি-
তাহার প্রাপ্য একটিমাত্র মুদ্রা কি করিয়া দিবে? তাহাকে তাহার প্রাপ্য
াকে অন্য নিকৃষ্ট ধাতুর বহু মুদ্রায় পরিণত করিতে হইবে। আমাদের
তপূর্ব্ব অর্থসচিব স্যার ডেভিড বার্ব্বর এই কথাই অতি সহজভাবে বুঝাইয়া-
ছেন। ইংরেজী-অভিজ্ঞ পাঠকদিগের অবগতির জন্য তাঁহার এই সম্বন্ধে
মতামত এইখানে উদ্ধৃত হইল।

"I have no doubt that even with a gold standard the people of India would in almost all their transactions prefer to employ silver Rupees. It is improbable that a gold coin of less than 10 Rs. in value would be issued in India and even such a coin would be quite unsuited for ordinary transactions. Ten Rupees represent generally much more than a coolie's wages for a month and even if a coolie received his wages in the form of a single coin he would immediately exchange it for smaller coins."

পাঠক মনে করিতে পারেন যে, রৌপ্যমুদ্রাকে পূর্ব্বপ্রবন্ধে কথিত "subsidiary coins" স্বরূপ ব্যবহার করিলেই আভ্যন্তরীণ বিনিময়ের কার্য্য সহজেই চলিতে পারে। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় ভারতে রৌপ্যের সম্মান কতকটা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে। একবারে ভারতে রৌপ্যমুদ্রার প্রচলন বন্ধ করিলে, কিংবা প্রচলিত স্বর্ণমুদ্রার মূল্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া রৌপ্যের স্বকীয় মূল্যের উপর নির্ভর করিয়া তাহা দ্বারাই subsidiary coins করিলে, রৌপ্যের বর্ত্তমান মূল্য অপেক্ষা উহা আরও মূল্যহীন হইয়া পড়িবে। ভারত গবর্মেণ্ট আইন অনুসারে রৌপ্যমুদ্রাকে legal tender করিয়াছেন, অর্থাৎ ভারতের যাবদীয় পাওনা রৌপ্যমুদ্রায় পরিশোধ করিতে ভারত বাধ্য। গবর্মেণ্ট-প্রাপ্য রাজস্বের পরিমাণ এই বাঙ্গালায় দশশালা বন্দোবস্তে একেবারে চির-

কালের জন্য স্থিরীকৃত হইয়াছিল। জমীদার বুঝিয়াছিলেন যে গবর্মেন্ট চিরকাল রজতমুদ্রায় তাঁহার নিকট হইতে রাজস্ব গ্রহ প্রচলিত মুদ্রা হইতে রৌপ্যকে অবসর প্রদান করিলে গবর্মেন্টকে ভঙ্গ করিতে হয়। কারণ, স্বর্ণ ও রৌপ্যের আনুপাতিক মূল্যের স্থির নাই। প্রত্যেক বৎসরেই স্বর্ণের তুলনায় রৌপ্যের মূল্যের হ্রাস হ এমন অবস্থায় রৌপ্যমুদ্রার পরিবর্তে স্বর্ণমুদ্রাপ্রদানের কোন প্রক বন্দোবস্ত হইতে পারে না। যদি কখনও স্বর্ণ ও রৌপ্যের আনুপাতিক মূ স্থিরতা সম্পাদিত হয়, তাহা হইলে স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন সম্ভব, নতুবা নহে। ক কমিশন সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, একটি রজতমুদ্রার মূল্য ২৬ পেন্স (স্ব মুদ্রার হিসাবে) আইনানুসারে নির্দ্ধারিত করিয়া সেই নির্দ্ধারিত অনুপাত অক্ষু রাখিবার চেষ্টা করা ভারত গবর্মেন্টের পক্ষে বিধেয়, এবং যখন সেই চেষ্টা কার্যে পরিণত হইবে, তখন রৌপ্যকে অবসর দিয়া স্বর্ণের দ্বারা মুদ্রার উভয় কার্য্যই সম্পন্ন করিতে হইবে। কিন্তু আপাততঃ নহে। রৌপ্যকে একবারে বিদায় না দিবার আরও একটি কারণ আছে; তাহা এখানে উল্লেখযোগ্য। রৌপ্য-মুদ্রার বর্ত্তমান প্রচলন রহিত করিলে, পূর্ব্বে যে ভারতীয় কৃষক কিয়ৎপরিমাণ রৌপ্য সংগ্রহ করিয়া আপনাকে সৌভাগ্যবান বিবেচনা করিতেছিল, সে দেখিতে পাইবে যে, রৌপ্যের এই অবশ্যম্ভাবী মূল্যহীনতায় সে একবারে দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছে। গবর্মেন্ট আইন করিয়া রৌপ্যকে প্রচলিত মুদ্রা ও legal tender স্বরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন [illegible]য়াই ত কৃষক কত আত্মত্যাগ ও কায়িক পরিশ্রম করিয়া কিয়ৎপরিমাণ রৌপ্য সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছে; এক্ষণে যদি বর্ত্তমান বিভ্রাট হইতে মুক্ত হইবার জন্য গবর্মেন্ট রৌপ্যমুদ্রা legal tender স্বরূপ গ্রহণ করিতে অসম্মত হয়েন, তাহা হইলে গবর্মেন্ট ন্যায়তঃ কৃষকের উল্লিখিত ক্ষতিপূরণ করিতে বাধ্য, অর্থাৎ রৌপ্যের আবশ্যকতার অভাবজনিত বাজারদর যতটা কমিবে, সেই পরিমাণ ক্ষতিপূরণ করিতে গব-র্মেন্ট বাধ্য। কিন্তু আয়ের পথ আবিষ্কার না করিয়া গবর্মেন্ট আর নূতন ব্যয়ভার বহন করিতে সমর্থ নহেন। কিন্তু সেরূপ কোন আবিষ্কারের উপায় নাই। আবার রৌপ্যমুদ্রার বর্ত্তমান প্রচলন একবারে বন্ধ করিয়া স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন করিতে হইলে যে পরিমাণ সুবর্ণের আবশ্যক, তাহার আয়োজনে যে ব্যয়বৃদ্ধির সম্ভাবনা, তাহাও বর্ত্তমান অবস্থায় ভারত গবর্মেন্ট করিতে অসমর্থ। ভারতে একবারে সুবর্ণমুদ্রার প্রচলন করিতে হইলে সুবর্ণের আবশ্যকতা

আবশ্যকতার বৃদ্ধির অর্থ তাহার মূল্যেরও বৃদ্ধি। এই বর্দ্ধিত
রত গবর্মেণ্ট বহন করিতে পারিবেন না, তাহা স্থির নিশ্চিত। এই
ণে ব্যবস্থা হইয়াছে যে, স্বর্ণমুদ্রাকে standard of value করিয়া
ৗপ্যের আনুপাতিক মূল্যের স্থিরতা সম্পাদন পূর্ব্বক উভয় ধাতুর
প্রচলিত মুদ্রা ও উভয়কেই legal tender স্বরূপ ব্যবহার করিতে
।

র্ণমুদ্রাকে legal tender করিয়া স্বর্ণমুদ্রার আংশিক প্রচলন হইল বটে,
ৱ রৌপ্য এখনও প্রচলিত মুদ্রারূপে ভারতে কিছু কালের জন্য ব্যবহৃত
ৈবে। ধনসঞ্চয় পূর্ব্বক ভারত গবর্মেণ্ট কালে সমস্ত প্রচলিত রৌপ্যমুদ্রা
চিত মূল্যে খরিদ করিতে সক্ষম হইবেন,—করেন্সি কমিশন এরূপ
আশা করেন। এক্ষণে গবর্মেণ্ট ১৲ টাকার পরিবর্ত্তে ষোল পেন্স প্রদান
করিতে সমর্থ নহেন বটে, কিন্তু স্বর্ণমুদ্রাকে legal tender করিয়া এবং ঐ
হিসাবে রৌপ্যের পরিবর্ত্তে স্বর্ণ গ্রহণ করিয়া ও অন্যান্য উপায়ে, কালে প্রচলিত
মুদ্রারূপে স্বর্ণের অপ্রতিহত প্রভাব স্থাপন করিতে সক্ষম হইবেন, এরূপ আশা
গবর্মেণ্টের আছে।

আপাততঃ স্বর্ণমুদ্রার সম্পূর্ণ প্রচলন না হউক, কালে স্বর্ণমুদ্রার সম্পূর্ণ
প্রচলন আবশ্যক। রৌপ্যের হতাদর করিবার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই।
কাজেই স্বর্ণকে standard of value ধরিয়া উহার সহিত তুলনায় রৌপ্যের
মূল্যের নির্দ্ধারণ একান্ত আবশ্যক। কারণ, পূর্ব্ব প্রবন্ধে দেখিয়াছি যে, স্বর্ণ ও
রৌপ্যের আনুপাতিক মূল্যের অস্থিরতাই বর্ত্তমান বিভ্রাটের মূল কারণ। যখন
রৌপ্যকে আদরের সহিত আমাদের চলিত মুদ্রারূপে ব্যবহার করিতে হইবে,
তখন উভয় ধাতুর স্বকীয় মূল্যের স্থিরতাসম্পাদনের উপায় উদ্ভাবন করা যুক্তি-
যুক্ত। এই জন্য করেন্সি কমিশন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে,
১৲ টাকার মূল্য ১৬ পেন্স আইনানুসারে নির্দ্ধারণ করা আবশ্যক, এবং আইন-
অনুসারে নির্দ্ধারিত উভয় ধাতুর এই আনুপাতিক মূল্যের স্থিরতা বজায়
রাখিবার বিশেষ চেষ্টা করা ভারত গবর্মেণ্টের আবশ্যক।

এ বিষয়ে ভারত গবর্মেণ্ট পূর্ব্বে একবারে নিশ্চিন্ত ছিলেন না। পূর্ব্বে দুই
একটি উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে একটি এখন উল্লেখযোগ্য।
১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে আমাদের টাঁকশালে রৌপ্য প্রেরিত হইলেই মুদ্রা
প্রস্তুতের জন্য কিঞ্চিৎমাত্র ব্যয় গ্রহণ করিয়া প্রেরিত রৌপ্যকে চলিত মুদ্রায়

পরিণত করিতে ভারত গবর্মেণ্ট আইনানুসারে বাধ্য ছিলেন, গবর্মেণ্ট এইরূপ বাধ্য ছিলেন বলিয়াই ভারতে রৌপ্যের আমদানি অধিক হইতেছিল। জর্ম্মনী প্রভৃতি দেশে রৌপ্যমুদ্রার স্থলে প্রচলন হওয়ায় ঐ সকল প্রদেশের পরিত্যক্ত রৌপ্য ভারতে আসিয়া পরিণত হইতে লাগিল। বিনিময়ের সাহায্যার্থ যত মুদ্রা আবশ্যক অপেক্ষা মুদ্রার সংখ্যা অধিক হইতে লাগিল। রৌপ্য পাইলেই সেই রে standard of value প্রচলিত মুদ্রায় পরিণত করিতে ভারত গবর্মেণ্ট ছিলেন বলিয়াই ভারতের বিশেষ ক্ষতি হইতেছিল। বৈদেশিক বাণি নিয়ম এই যে, রপ্তানি বস্তুর মূল্য আমদানি বস্তুর দ্বারায় পরিশোধ করা হ ইংলণ্ড আমাদিগের প্রেরিত দ্রব্য লইয়া তথায় তাহার আভ্যন্তরীণ ব্যবসায়ে প্রসার করেন, এবং আমরাও ইংলণ্ডের প্রেরিত দ্রব্য লইয়া আমাদের আভ্যন্তরিক ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হই। কিন্তু রৌপ্যের স্বকীয় মূল্যের হ্রাস হওয়ায় ইংলণ্ড প্রভৃতি প্রদেশ আমাদের রপ্তানি দ্রব্যের বিনিময়ে ব্যবসায়োপযোগী দ্রব্য প্রেরণ না করিয়া ভারতে রৌপ্যই প্রেরণ করিতে লাগিলেন। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে অন্যান্য দ্রব্যের তুলনায় রৌপ্য অনেক সুলভ, এবং রৌপ্য সুলভ বলিয়াই অন্যান্য দ্রব্য প্রেরণ করা অপেক্ষা ভারতে রৌপ্য প্রেরণ করা তাঁহাদের পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক হইতে লাগিল।* রৌপ্য ভারতে আসিলেই আবার অতি সামান্য ব্যয়ে মুদ্রায় পরিণত হইত। এবং মুদ্রায় পরিণত হইলেই আমরা আমাদের প্রেরিত দ্রব্যের মূল্যস্বরূপ সেই মুদ্রা গ্রহণ করিতে বাধ্য, কারণ, আইনানুসারে রৌপ্যমুদ্রাই আমাদের legal tender, অর্থাৎ ভারতে ক্রীত বস্তুর মূল্য বা কোন পাওনা রৌপ্য মুদ্রায় লইব না, এ কথা আমাদের বলিবার যো নাই। এইরূপে রৌপ্যের মূল্যের হ্রাস হওয়ায়, এ দেশে ব্যবসায়োপযোগী দ্রব্যের আমদানি অনেকটা বন্ধ হইয়াছিল।

মৃত মহাত্মা জেভন সাহেব রৌপ্যের মূল্যহীনতায় ভারতের এইরূপ সর্ব্বনাশ হইবে, তাহা কতকটা অনুমান করিয়াছিলেন। বহুদিন পূর্ব্বে তিনি লিখিয়াছিলেন,—

---

* ভারতবন্ধু দাদাভাই নাউরোজি প্রভৃতি অর্থনীতিবেত্তারা এই মতের সমর্থন করেন না। Currency Commisson তাঁহাদের মতের পোষকতা করেন নাই, এবং বাহুল্যভয়ে তাঁহাদের মত এখানে উল্লিখিত হইল না।

all in the value of silver compared with most other kes it more profitable to pay for certain produce with illion than with our commodities."

াইনের দ্বারা গবর্মেণ্ট রৌপ্য টাঁকশালে পাঠাইলে টাকায় পরিণত বাধ্য ছিলেন, এই সকল উৎপাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য ও য়ের সুবিধার জন্য ভারত গবর্মেণ্ট ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে সেই আইন রদ য়া দিয়াছিলেন। ঐরূপ করিয়া গবর্মেণ্ট ভাল করিয়াছিলেন কি না, ার বিচারও করেন্সি কমিশন করিয়াছেন। করেন্সি কমিশন গবর্মেণ্টের ক্ত কার্য্যের সম্পূর্ণ অনুমোদন করিয়াছেন, এবং পুনর্ব্বার ভারতের টাঁকশালে থেচ্ছ রৌপ্যমুদ্রার প্রস্তুতের ব্যবস্থা করিতে তাঁহারা কিছুতেই সম্মত নহেন।

করেন্সি কমিশন স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, ভারত গবর্মেণ্ট মিতব্যয়ী না হইলে মুদ্রাবিভ্রাট হইতে কিছুতেই পরিত্রাণ পাইবেন না। অজস্র ব্যয়ই সকল রোগের মূল। সেই ব্যয়ের কতকটা সঙ্কোচ করিতে না পারিলে বর্ত্তমান সমস্ত প্রস্তাব কিছুতেই কার্য্যে পরিণত করা যাইবে না। *

রঘুবংশ।

অনুধাবন।

কবির মহাকাব্যের অনুধাবন—বা তত্ত্বনিশ্চয়ের অনুসরণ—সহজ কার্য্য নহে। এ বিষয়ে কবির নিজের উক্তিটির উল্লেখ করিয়াই অগ্রসর হইতেছি। 'তিতীর্ষু-র্দুস্তরং মোহাদুড়ুপেনাস্মি সাগরম্।'

বঙ্গীয়পণ্ডিতকুলতিলক স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় লিখিয়াছেন যে, "কালিদাস সংস্কৃত ভাষায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহাকাব্য, সর্ব্বোৎকৃষ্ট খণ্ডকাব্য, সর্ব্বোৎকৃষ্ট নাটক লিখিয়া গিয়াছেন।" শকুন্তলা ও মেঘদূতের প্রাধান্য, সর্ব্বত্র অবিসম্বাদী। কিন্তু কবির রঘুবংশ ও কুমারসম্ভবের মধ্যে কোন্‌খানি শ্রেষ্ঠ, স্বর্গীয় মহাত্মা তাহার নির্দ্দেশ করেন নাই। এ বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত না হইয়াও, এ কথা পণ্ডিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চরণানুসরণ করিয়া বলিতে

* এই প্রবন্ধে যে সকল যুক্তি অবলম্বিত হইয়াছে, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত নহে। এ সম্বন্ধে বিভিন্ন মতামত আছে। পাঠকগণ যথাসময়ে তাহা অবগত হইবেন।

। তাহার পর স্রোত ফিরিল—নব্যবঙ্গের অলৌকিকী কীর্ত্তি বঙ্কিম-
ইংরাজী, মধুসূদনের মহাকাব্যের আদর্শ য়ুরোপীয়; নব্যবঙ্গ সাহিত্যে কাব্যের ত্রিধ
নের, হেমচন্দ্রের ও নবীনচন্দ্রের কবিতা ইংরাজীপ্রভাববিশিষ্ট। নব্যবঙ্গের গীতিব
নাথের গীতিকবিতায় "কালো আঁখি"র উল্লেখ কয় বৎসর মাত্র পূর্ব্বে দেখা গিয়াে
র প্রতিভাও ইংরাজীপ্রভাবপুষ্ট। কিন্তু তাই বলিয়া এ কথা স্বীকার করিতে পারি না
দিগের প্রতিভা আদৌ উদ্ভাবনী নহে। আমাদের অবস্থায় আমাদের পক্ষে ইংরাজীপ্রভ
টুকু প্রভাবিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী, তাঁহারা তাহাই হইয়াছেন। তাঁহাদের প্রতি
লিকতার অভাব নাই; তাঁহাদের নিজস্ব সম্বলও যে নাই, এমন নহে। তাঁহাদের
াদেরই নিজস্ব; তাহা আমাদের গর্ব্বের জিনিস। তাঁহাদের প্রতিভা "কা
স্লবনমধু" লইয়া যে মধুচক্র রচনা করিয়াছে, তাহা হইতে গৌড়জন "আনে
পান সুধা নিরবধি।" তাঁহাদের রচনা গিল্টি নহে; পরন্তু নিকষকষিত বহুমূ

। প্রবুদ্ধ ভারতে চারি দিকে যে সাহিত্যের সৃষ্টি হইতেছে, তাহাতে আশস্ত হইবার
াই সাহিত্যের সকলই যে স্থায়ী হইবে, এরূপ আশা করি না; করাও বাতুলের কার্য
দীতীরে রাশি রাশি বালুকা সন্ধান করিয়া যেমন এক কণা স্বর্ণ মিলে, সেইরূ
সাহিত্যে হয় ত একখানি স্থায়ী হয়। ইংরাজী সাহিত্যে সেক্সপীয়রের সমকালে,
কার বহু নাটকের রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম এখন কেবল ইংরাজী
র ইতিহাসপাঠকের বিস্ময়োৎপাদন করে। পিউরিটান সাহিত্যে মিল্‌টন ভিন্ন আ
র যশ আজও শুনিতে পাওয়া যায়? তবে আশা আছে, এই স্তূপাকার সাহিত্যে
ী হইবে। যে বীজ বপন করা যায়, তাহার সকলই ফলোৎপাদন করে না
কথায়, কতকগুলি প্রস্তরোপরি পতিত হইয়া নষ্ট হয়, কতকগুলি কণ্টকবনে-
া—অবশিষ্ট কতকগুলি ফলোৎপাদন করে। ই
কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত বেঙ্গল লাইব্রেরীর ত্রৈমাসিক পুস্তকতালিকাবণ
ইংলিশম্যান" নবপ্রকাশিত খানকতক পুস্তক লইয়া আমাদের পূর্ব্বকৃতজ্ঞ
না করিয়াছেন। প্রাপ্ত

। কোন নাটকের অভিনয় করিতে হইলে, পূর্ব্বে তাহা L হৃদয়
প লইতে হয়। তাঁহার কর্ত্তৃক অনুমোদিত না হইলে কে
। প্রকাশ্য অভিনয় হইতে পারে না। বেঙ্গল লাইব্রে
রর সেরূপ কোনও ক্ষমতা নাই। তিনি গ্রন্থের তালিক
রন, এবং ইচ্ছামত একআধটু সমালোচনাও করিয়ন
টর তরফ হইতে প্রশংসা

সহযোগী সাহিত্য।

সাহিত্য।

নব্যবঙ্গে সাহিত্য-চর্চ্চা।

বিংশতিবর্ষ পূর্ব্বে ইংরাজ রাজকুমারকে সম্বোধন করিয়া নবীনচন্দ্র বলিয়াছিলেন,—

"তোমার সাহিত্য, তোমার সঙ্গীত,
তোমারই শিল্প, তোমায় আচার,
তব সভ্যতায় ভারত প্লাবিত।"

ও চারি দিকে সেই একই কথা—ভারতবর্ষের সাহিত্যের সকল অংশে ইংরাজী সা বিভাসিত; ভারতবর্ষে সাহিত্য-চর্চ্চায় মৌলিকতা প্রায় দেখা যায় না, অধিকাংশই ...ই বেমালুম চুরী। গদ্যে, পদ্যে, উপন্যাসে, কবিতায়, ইতিহাসে, সমালোচনায়, সাহিত্যের যে দিকে চাহিবে, কেবল নকল, আসল বিরল। ভারতীয় সাহিত্যের রম্য কেবল বিদেশী গাছ, বিদেশী লতা, কাজেই ফুলফল সবই বিদেশী। নূতন মাটীতে, আবহাওয়ায় সে সব বৃক্ষলতার বাড় যথোপযোগী হয় না, ফুলফল আশোপযোগী হওয়া নহে। দেশীয় মধুভূৎ বিদেশী কুসুমকুঞ্জে গুঞ্জন করিতে গিয়া ফিরিয়া আসে, বলে,—"এ সবই নকল; ইহার মধ্যে আসল নাই।" এই ভাবের অভিব্যক্তি বহুদিন পূ গিয়াছে। "সেকাল আর একাল" পুস্তিকায় স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয় বলিয়া এক্ষণকার অধিকাংশ কাব্যে ইংরাজী ইংরাজী গন্ধ কহে। এক্ষণকার কোন কে পূর্ব্বকার কাব্য অপেক্ষা কোন কোন বিষয়ে অধিক ক্ষমতা প্রকাশিত আছে জাতীয়ভাব, সারল্য ও সহৃদয়তা বিষয়ে হীন বলিতে হইবে।"

আমরা স্বীকার করি যে, বর্ত্তমান সাহিত্যে ইংরাজীর প্রভাব সু অবশ্যম্ভাবী। আমাদের মত বিজিত, বিলুপ্তবীর্য্য জাতি একটা সংস্রবে আসিলে তাহাদের ভাব ও চিন্তার অনুকরণ তাহার প প্রাচীন সাহিত্য আমাদের অনেকের অনধিগম্য, যে ভাষায় প্রাচীন ব্যক্ত, সে ভাষা কেবল এক সম্প্রদায়ের একাংশের নিকটে পা ... কিন্তু নিত্য মনোভাবপ্রকাশের ...

সুদিনের সখা মদন ও বসন্ত নন্দন-কানন ত্যা...
শাখা, পল্লব সমস্তই শুকিয়ে গেছে,—ফুল আর ফুটে না,—বিহঙ্গেরা নীরব।" কারণ,
'বসন্তের কাল গেছে কেন ফুল ফুটিবে আর?" শেষে রতির চেষ্টায় বনদেবতাগণে
াহ্বানে মদন ও বসন্ত আবার নন্দনে ফিরিলেন। "থরথরকম্পিত মর্ম্মরমুখরিত, নবপল্ল
নকিত ফুল-আকুল মালতী-বল্লীবিতানে, সুখছায়ে, মধুবায়ে" বসন্তের পুনরাবির্ভাব হইত
ন তরুলতা কুসুমসুষমাসম্পন্ন হইয়া উঠিল,—তখন,—

"পিককুল আকুল কুঞ্জে কুঞ্জে
কুহু কুহু মুহু মুহু কুহরে, পাপিয়া ঝঙ্কারে।"

ী তখনও মানময়ী,—মদন "ভ্রমরের ছিলা কুসুমচাপ" লইয়া "অব্যর্থ সন্ধান" করি
শচীর মান অভিমান ভাসিয়া গেল; তিনি পতির মিলনলালসাবতী হইয়া পড়িলেন।
রদম্পতীর মিলন হইয়া গেল; সখীরা ব্যঙ্গভরে শচীকে বলিল,—

"সেই তো মল খসাতে হল, দেশ কেন হাসালে?
প্রাণদায়ে মান ভাসালে!"

লোচক সুরদম্পতীর মিলনের প্রধান কারণটির উল্লেখ করেন নাই। মদন যখন কুসুম
পানে হতচৈতন্য, তখন নারদের প্ররোচনায় বসন্ত সেই "বিশ্বমজান" দেবতাটিকে তাঁহার
া আঘাত করেন। কুসুমশরাহত হইয়া মদন শচীকে রতিভ্রমে প্রিয়
া। তখনই শচীর চেতনা হয় যে, মদনের এই ভ্রমের সময় তাঁহার নিকট ন
ক দেখিলে দেবরাজের মনে যে ভ্রান্ত বিশ্বাস জন্মিতে পারিত, হয় ত উর্ব্বশীর পদ
দেবরাজকে দেখিয়া তাঁহার সেইরূপই ভ্রান্ত বিশ্বাস জন্মিয়াছে। তখন
াগমপিপাসী। এই কথা মনে হইতেই শচীর সব সন্দেহ দূরে গেল,—

"রমণীর প্রেম—
স্রোতে অভিমান, সখি, বালীর বন্ধন।"

যা গ্রন্থরক্ষক-সমালোচক মহাশয়ও বলেন নাই; কাজেই প্রবন্ধলেখকও বু
র্বসন্ত" "অদ্ভুতরসমিশ্র গীতিনাট্য"—ইহার আখ্যানবস্তু লইয়া বিচার
প্রণেতার নাটকীয় রচনাশক্তির পরিচয় পাই। সে পরিচয় পাঠক তাঁ
"কিঞ্চিৎ জলযোগ" পর্য্যন্ত নানা নাটকে ও প্রহসনে পাইয়া
হৃত করাই গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য। ইহার

..৩৩ং বিরুদ্ধার্থ অংশ সকলের সমন্বয়ে

৫৪। ... ..পূণরূপ প্রতীচ্য। প্রাচ্য সাহিত্যে এইরূপ প্রণালীর অবলম্বন তীচ্য প্রভাবের পরিচায়ক। পণ্ডিত যশোদানন্দন সরকারের হিন্দু-ঔষধ-সম্বন্ধীয় গ্রন্থে

প্রতীচ্যপ্রভাব।

এই প্রভাবের প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়। বিষয়ের বিবরণে বুঝাইবার প্রণালীতে এই পুস্তকে সর্ব্বাংশে প্রতীচ্য প্রণালী অনুসৃ হইয়াছে। গ্রন্থরক্ষক মহাশয় তাঁহার সমালোচনাতেও বলিয়াছে . গ্রন্থকার প্রতীচ্য চিকিৎসা-প্রণালীতে অভিজ্ঞ, তাঁহার পুস্তকে ইউরোপীয় গ্রন্থকারদি ম্বের উল্লেখও যথেষ্ট আছে।

উপন্যাসসংক্রান্ত পুস্তকে এই প্রভাব আরও সুস্পষ্ট। দৃষ্টান্তস্বরূপ যে সকল পুস্তকে খ করা যাইতে পারে, শ্রীযুক্ত মনোমোহন রায় প্রণীত "রিজিয়া" তাহাদের অন্যতম। পুস্তকের আখ্যানবস্তু এইরূপ,—

দিল্লীর সিংহাসনাধিরূঢ়া সাম্রাজ্ঞী রিজিয়ার বীরেন্দ্র সিংহ নামক এক জন হিন্দু ও বক্তিয় মক একজন তাতারীয় সেনাপতি ছিল। রাজ্ঞী বিবাহ করেন নাই। তাঁহার অনুচর র্মচারীদিগের পক্ষেও বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু বীরেন্দ্র গোপনে সৌরাষ্ট্রাধিপের ক ন্দিরাকে বিবাহ করিয়া রাজ্ঞীর ভয়ে তাঁহাকে কুসুমপুরের দুর্গে লুকায়িত রাখিয়াছিলে ...ন গোপনে স্বামী স্ত্রীতে সাক্ষাৎ হইত। ইন্দিরার পিতার ইচ্ছা ছিল, সম ।সহিত কন্যার বিবাহ দিবেন। ক্রমে বীরেন্দ্রের প্রতি রাজ্ঞীর হৃদয় আকৃষ্ট হ রীয় সেনাপতির হৃদয়ে রাজ্ঞীকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা বলবতী থাকিলেও, বীরে াশা ছিল না। সেনাপতিদ্বয় একটা যুদ্ধে বিজয়ী হইয়া প্রত্যাগত হইলে তাহাি র্থে যে দরবার হয়, তাহাতে রাজ্ঞী আপনার কণ্ঠহার লইয়া স্বহস্তে তাহা বী শ বিলম্বিত করিয়া তৎপ্রতি আপনার প্রেমের পরিচয় দেন। কিন্তু ইহাতে বী রের কোনও পরিবর্ত্তনই পরিলক্ষিত হইল না। রাজ্ঞী বক্তিয়ারের প্রেম য়া রুষ্টা হইতেন। এই সময়ে বীরেন্দ্রের বিবাহবার্ত্তা প্রকাশিত হইয়া পড়ি ার আদেশে ইন্দিরাকে কুসুমপুরের দুর্গ হইতে সরান হইল। রাজ্ঞী বীরেন্দ্র তে চাহিলেন, এবং বীরেন্দ্র তাহাতে অস্বীকৃত হইলে, রাজ্ঞীর আদেশে ... হইল। বক্তিয়ারের হৃদয় প্রতিহিংসানলে জ্বলিতেছিল। সে রাজ্ঞী ...লম্বন করিল, ইন্দিরার ব্যর্থমনোরথ প্রণয়ী সমবে... ...রাজ্ঞীর পরাজয় হইল, এবং তিনি ...

পারি যে, শিশুপালবধ, নৈষধ, কিরাতার্জ্জুনীয়, ভট্টি, রঘু ও
সুপ্রসিদ্ধ ষট্‌মহাকাব্যের মধ্যে, রঘু ও কুমারই শীর্ষস্থানীয়। এ
কাব্যের তুলনায় সমালোচনা আমার উদ্দেশ্য নহে। রঘুবংশ পড়িয়
লাভ করিয়াছি, কথঞ্চিৎপরিমাণে তাহারই অনুশীলন করিব।

আমি যতটা বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাতে মনে হয় যে, রঘুবংশখান
পরিণত বয়সের রচনা। রঘুবংশের মাহাত্ম্য বুঝিতে হইলে, এ কথার
চনা প্রয়োজনীয় বলিয়া, ইহার অবতরণা করিতেছি। বঙ্গসাহিত্যের
শ্রেষ্ঠ লেখক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, "বুড়া বয়সের কথা" প্রবন্ধে,
বংশ কালিদাসের যৌবনের রচনা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বুড়াবয়ে
কথা যখন বঙ্গদর্শনে প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন কমলাকান্তের নামে প্রকাশি
হয় নাই। কিন্তু পরে, "উহার মর্ম্ম কমলাকান্তি বলিয়া, কমলাকান্তের "
মধ্যে" সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। যদি নববঙ্গসাহিত্যের কর্ণধার, উত্তরচরিত-স
লোচনার মত প্রবন্ধ লিখিয়া, উহা প্রবন্ধপুস্তকে মুদ্রিত করিয়া যাইতেন, তাহ
হইলে হয় ত বিপরীত মত সমর্থন করিতে সাহসপূর্ব্বক অগ্রসর হইতে পারি-
তাম না।

রঘুবংশ ও কুমারসম্ভবের মধ্যে কোন্‌খানি কোন্ বয়সের লেখা, তাহা
বুঝাইবার জন্য অমর কমলাকান্ত যে দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, অভি-
নিবেশপূর্ব্বক তাহা পাঠ করিলে, রঘুবংশলেখকের প্রাচীনতারই প্রমাণ
পাওয়া যায়। স্বদেশীয় বিদেশীয় যে সকল কবির রচনার সময়ের কথা আমা-
দের জানা আছে, তাঁহাদিগের যৌবনের ও পরিণত বয়সের রচনা পাঠ
করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, যৌবনের রচনায়, রচনাভঙ্গীর দিকে, শব্দ-
যোজনার দিকে, কবির সজাগ দৃষ্টি। আর পরিণত বয়সে, সংজ্ঞালব্ধ ও
অভ্যাসসিদ্ধ বলিয়া, বিনা প্রয়াসেই সুমধুর, সুকৌশলময় অথচ সরল রচনা
নিঃসৃত হয়। যুবক কবির রচনায়, প্রেমের যৌবনসুলভ অদম্যতা ও চাঞ্চ-
ল্যের ছায়া পড়ে; কিন্তু বৃদ্ধ বয়সের রচনায় তাহা দেখা যায় না। বর্ণনা যতই
রমণীয় হউক, তাহাতে চাঞ্চল্যের ছায়া নাই। উহা সরস, চিত্তমুগ্ধকর;
অথচ স্থির ও গম্ভীর। বঙ্কিম বাবুর বিষবৃক্ষ ও কৃষ্ণকান্তের উইল এক
দিকে, এবং দেবীচৌধুরাণী ও আনন্দমঠ অন্য দিকে লইয়া বিচার করিলেই
এ কথা সমর্থিত হয়। বাঙ্গালা সাহিত্যে অযথা বিলাতি বচন বা বিলাতি নামের
উল্লেখ গর্হিত। কিন্তু একশ্রেণীর পাঠকদিগের জন্য প্রয়োজনীয় বলিয়া

ৃষ্টান্ত দিব। গেটে-প্রণীত "ওয়ার্থারের দুঃখ" ও ফাউষ্ট এ কটি বিশিষ্ট প্রমাণ। এই জন্য যাঁহারা প্রেমের বাহ্যিক উদ্দাম ভাব ,তে ভালবাসেন, তাঁহারা সর্ব্বদাই বলিয়া থাকেন যে, যৌবনাতীতে .র রচনা ভাল হয় না।

ন একবার কমলাকান্ত-প্রদর্শিত শ্লোক দুইটি দেখা যাউক। যাঁহার ১ অস্থিতে ভালবাসা অনুবিদ্ধ, অথচ যিনি স্থির ও গম্ভীর, তিনি ঙ্গনীর আকস্মিক মৃত্যুতে উদ্ভ্রান্ত হইয়া বলিতেছেন ;—

ইদমুচ্ছ্বসিতালকং মুখং তব বিশ্রান্তকথং দুনোতি মাম্।
নিশি সুপ্তমিবৈকপঙ্কজং বিরতাভ্যন্তরষট্পদস্বনম্॥

অর্থ—এই ত তোমার অলকাদাম (বাতাসে) দুলিতেছে; কিন্তু কথা হিতেছ না বলিয়া ব্যথিত হইতেছি; তোমার এই মুখ যেন নিশাকালে কুলিত অভ্যন্তরে ভ্রমরগুঞ্জনরহিত পদ্মের মত। অজবিলাপের এই শ্লোকটি যে খুব ভাল, তাহা নয়। তাহার পর যেখানে বিরহ-বিধুরা রতি, যৌবনভোগ পরিসমাপ্ত হইল দেখিয়া অসহ্য বেদনায় ছটফট করিতেছেন, সেখানকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্লোকটি এই ;—

গত এব ন তে নিবর্ত্ততে স সখা দীপ ইবানিলাহতঃ।
অহমস্য দশেব পশ্য মাম্ অবিসহ্যব্যসনেন ধূমিতাম্॥

অর্থ—তোমার সখা সন্ধ্যাবায়ুতাড়িত দীপের ন্যায় পরলোকে গমন করিয়াছেন, আর ফিরিবেন না। আমি নির্ব্বাপিত দীপের দশাবৎ অসহ্য দুঃখে ধূমিত হইতেছি। রতির ক্রন্দনে সর্ব্বত্রই ভোগপরিসমাপ্তির আতঙ্কের জ্বালা। এই দেখুন,—

শিরসা প্রণিপত্য যাচিতান্যুপগূঢানি সবেপথূনি চ।
সুরতানি চ তানি তে রহঃ স্মর সংস্মৃত্য ন শান্তিরস্তি মে॥

অর্থ—হে অনঙ্গ, তুমি প্রণিপাতপূর্ব্বক যাচ্ঞা করিয়া সকম্পে আমাকে যে আলিঙ্গন করিতে এবং তদবস্থায় বিহার করিতে, তাহা স্মরণ করিয়া আর শান্তিলাভ করিতে পারিতেছি না। কিন্তু অজ যখন দেখিলেন, ইন্দুমতী সত্যসত্যই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, তখন বলিতেছেন,—

গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ।
করুণাবিমুখেন মৃত্যুনা হরতা ত্বাং বদ কিং ন মে হৃতম্॥

ইহাই ধীরোদাত্তের মর্ম্মভেদী বিলাপ। কেহ কেহ এই প্রমাণপ্রয়োগ-

গুলি উপযোগী বোধ করিতে না পারেন। বলিতে পারেন রতিবিলাপে "মদনে"র জন্য "রতি"র যাহা বিলাপ, তাহ করিয়াছেন; কুলবধূর বিলাপ বর্ণনা করেন নাই। প্রকৃত কথা সেই জন্য প্রারম্ভেই "বসুধালিঙ্গনধূসরস্তন"যুগলের দিকে ইঙ্গিত দেখাইয়াছেন। কাজেই অন্য স্থলের তুলনা করিয়া দেখা কুমারসম্ভবের দ্বিতীয় স্বর্গে দেবতাগণ ব্রহ্মার স্তব করিতেছেন, রঘুবংশেও দশম সর্গে রাবণ কর্ত্তৃক নিপীড়িত দেবগণ নারায়ণের করিতেছেন। কুমারসম্ভবে কেমন শব্দের পরিপাট্য; কথায় কথায় সর্ব্বদর্শনশাস্ত্রের জটিল তত্ত্বের কথা; কিন্তু রঘুবংশে তাহা কৈ? বাং সাহিত্যের নবানুরাগীদিগকে কথায় কথায় কেমন হর্বর্ট স্পেন্সার প্রভৃতি টেনিসন্ প্রভৃতির বচন তুলিতে দেখা যায়; কিন্তু প্রবীণ ও বিজ্ঞ লেখ দিগের রচনায় তাহা কৈ? কুমারসম্ভবের স্তোত্রে, সজাগ হইয়া গম্ভীরভাবে অবতারণার জন্য কতই চেষ্টা! সৌন্দর্য্যসৃষ্টির জন্য কতই প্রয়াস!

জগদ্‌যোনিরযোনিস্ত্বং জগদন্তো নিরন্তকঃ।
জগদাদিরনাদিস্ত্বং জগদীশো নিরীশ্বরঃ॥

বিপরীত কথার সংযোগে কবিত্ব ও শিল্পচাতুর্য্য কি সুন্দরভাবেই প্রস্ফুটিত হইয়াছে। কিন্তু রঘুবংশের স্তোত্রে দেবমহিমার যে বর্ণনা আছে, সে বর্ণনা ভক্তের বর্ণনা। সরল ভাষায় রচিত সুন্দর স্তোত্র, স্বাভাবিক মাধুরীতে চিত্ত মুগ্ধ করে।

সর্ব্বজ্ঞস্ত্বমবিজ্ঞাতঃ সর্ব্বযোনিস্ত্বমাত্মভূঃ।
সর্ব্বপ্রভুরনীশস্ত্বমেকস্ত্বং সর্ব্বরূপভাক্॥

সকল দর্শনশাস্ত্রের তত্ত্বকথা না বলিয়া, মুক্তিসাধনের জন্য যে সকল শাস্ত্রেরই এক ফল, ইহাই বলিতেছেন,—

বহুধাপ্যাগমৈর্ভিন্নাঃ পন্থানঃ সিদ্ধিহেতবঃ।
ত্বয্যেব নিপতন্ত্যোঘা জাহ্নবীয়া ইবার্ণবে॥

তাহার পর আবার ভক্তিই যে সার কথা, তাহারই উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে,—

ত্বয্যাবেশিতচিত্তানাং তৎসমর্পিতকর্ম্মণাম্।
গতিস্ত্বং বীতরাগাণামভূয়ঃসন্নিবৃত্তয়ে॥

যে প্রকার ভাবপ্রকর্ষতায় গীতা পূজ্য, এ স্থানেও তাহাই।

-"কেবলং স্মরণেনৈব পুনাসি পুরুষং যতঃ" এ কথা ভক্তের কথা।
অদৃশ্য হইলেও, তোমার স্মরণমাত্রে পবিত্রতা লাভ করি, এ কথা
ৎ বলিতে পারে ? এ প্রকার কাব্যপাঠে, উপনিষদ-পাঠের ফললাভ
ম সর্গ পড়িলে, এ কথা বুঝিতে বাকী থাকে না যে, কবির পাণ্ডিত্যে
ত দূর ছিল। কিন্তু কুমারসম্ভবের মত, এখানে আর তাহা দেখাই-
য়াস নাই। গির্জ্জার বেদীতে শ্রোতাদিগকে তৃপ্ত করিবার জন্য, উপা-
নামে ক্ষমতাশালী আচার্য্য, কতই সুন্দর বচনের রচনা করেন। আপাত-
ত তাহাতে যেমন কবিত্বের চাকচিক্য থাকে, ভক্তের নিভৃত গৃহের
স্পর্শী উপাসনায় তাহা দেখা যায় না। কিন্তু সহৃদয় লোকমাত্রই কোন্-
র কি মূল্য, তাহা জানেন।

তাহার পর রঘুবংশের রচনা কি সরল, বচনবিন্যাস কেমন স্বাভাবিক।
বল নবম সর্গের রচনায় শব্দচাতুরী দৃষ্ট হয়। ইহারও কারণ আছে।
অজবিলাপের পর, এবং রামায়ণ-আরম্ভের পূর্ব্বে, কতকগুলি কথা না বলিলে
নয় বলিয়া, বলা হইয়াছে। সেগুলিকে চিত্তাকর্ষক করিবার জন্য, অথবা
অন্ততঃ বেশ পড়িয়া যাইতে পারা যায়, ইহার জন্য, কবি একটুখানি চেষ্টা
করিয়াছেন। কিন্তু এই নবম সর্গের শব্দযোজনার সহিত, মাঘ বা শ্রীহর্ষের
রচনার তুলনা করিলে, কালিদাসের রচনা অতীব সরল ও শব্দালঙ্কারশূন্য
বলিয়াই প্রতীত হয়। শুধু তাহাই কেন ? কবির বাল্যরচনা নলোদয়ে যে
যমক ও অনুপ্রাসের ঘটা এবং শব্দের ছটা, তাহা কবির অন্য কোন গ্রন্থে
দেখা যায় না। সরল রচনা পরিণত বয়সেরই ফল ; কাজেই রঘুবংশ, কবির
কাব্যোত্থানের সুপরিপক্ক ফল বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।

কবির অন্যান্য গ্রন্থরচনা, কেবলমাত্র রচনারই জন্য; কেবলমাত্র সৌন্দর্য্য-
সৃষ্টিরই জন্য। অবশ্য এই ভাবের রচিত গ্রন্থই কাব্যজগতে অতুল্য হয়।
কিন্তু তাই বলিয়া, উদ্দেশ্য লইয়া লিখিলেই যে কাব্য মন্দ হইয়া পড়িবে, এমন
কোন কথা নাই। যদি সৌন্দর্য্যসৃষ্টি না থাকিত, যদি মনোহারিণী কল্পনার
খেলা না দেখিতে পাইতাম, তাহা হইলে, যত সৎউদ্দেশ্যে রচিত হউক না কেন,
এ মহাকাব্যকে পূজা করিতাম না। উদ্দেশ্য লইয়া রচনা, অথচ, সেই উদ্দেশ্য
কাব্যের মাহাত্ম্যের মধ্যে সমাচ্ছাদিত ; ইহা কি প্রাচীনতার ফল নহে ?

যে উদ্দেশ্য লইয়া মহাকবি রঘুবংশ রচনা করিয়াছিলেন, তাহা অতি

ধর্ম্ম ও সর্ব্বপ্রকার সন্নীতির শিক্ষা দিবার জন্যই এই মহাকাব্য।
দিগের রচনা নির্দ্দিষ্ট দেশকাল বা পাত্রে সীমাবদ্ধ থাকে না। বিশে
রচিত হইলেও রঘুবংশের গৌরব নির্দ্দিষ্ট দেশ-কাল-পাত্রে পরিসমাপ্ত
রঘুবংশের কবিত্ব ও শিক্ষা যে সর্ব্বকালোচিত এবং সর্ব্বদেশগ্রা
পরে দেখাইব। যখন কালিদাসের কবিত্বের খ্যাতি দেশব্যাপী হই
যখন তিনি শ্রেষ্ঠত্বে অদ্বিতীয় বলিয়া সমাজে পূজিত হইতেছিলেন,
তাঁহার পক্ষে শিক্ষকের আসন গ্রহণ করা সম্ভবপর হইয়াছিল।

শিক্ষা দিতে হইলে ও শিক্ষা মনোহারিণী করিতে হইলে উপযুক্ত
নির্ব্বাচন করিতে হয়। কালিদাস ইহার জন্য রঘুকুলকাহিনী অবলম্ব
করিয়াছিলেন।

যে দেশের মন্দিরে রামসীতার মূর্ত্তি, যে দেশের লোকের হৃদয়ে হৃদয়ে রাম-সীতা শ্রেষ্ঠ আদর্শ, যে দেশে রামায়ণের অমৃতকথা সর্ব্বজনবিদিত, সে দেশের লোকের পক্ষে সূর্য্যবংশের পুণ্যকাহিনীর তুল্য অধিকতর মনোজ্ঞ বস্তু আর কি হইতে পারে? নিত্য নিত্য শুনিতেছি, অথচ পুরাতন হয় না, অথচ আবার শুনিতে ইচ্ছা করে, এমন দ্বিতীয় কথা আর কি আছে? কবিগুরু মহর্ষি বাল্মীকির দৈবসৃষ্টি রামায়ণ হইতে পাঠশালার বালকশিক্ষার জন্য রচিত শিশুরামায়ণ পর্য্যন্ত, রামকথাসম্বলমাত্র সকল গ্রন্থই এ দেশে আদৃত। কালি-দাসের নির্ব্বাচিত বস্তু বিষয়োপযোগিতায় অদ্বিতীয়।

এই পুণ্যকাহিনী অবলম্বন করিয়া কবি যত শিক্ষা দিয়াছেন, তাহার মধ্যে একটি বিশেষভাবে মুখ্য। সেই শিক্ষাটি রাজাদিগের পক্ষেও বিশেষ উপযোগী। বহুপত্নী গ্রহণ করিলে মনুষ্যত্ব নষ্ট হয়, সামাজিক অমঙ্গল ঘটে, এবং আরও বহুবিধ দুর্গতি উপস্থিত হয়। এই কথা, কাব্যের নমস্ক্রিয়া হইতে ঊনবিংশতি সর্গের শেষ বচন পর্য্যন্ত বুঝাইয়া গিয়াছেন। যে সকল অমর দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা উদাহৃত হইয়াছে, যে রঘুবংশ পড়িবে, তাহারই হৃদয়ে তাহা অঙ্কিত থাকিবে। আমি কথার বাঁধুনির জন্য বলি নাই যে, নমস্ক্রিয়াতেও কবি এ কথার সূচনা করিয়াছেন। এ কথা বুঝিতে হইলে প্রথমতঃ প্রাচীন কবিদিগের লিপিকৌশল বিষয়ে দু' একটি কথার আলোচনার প্রয়োজন। যাঁহারা সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্র পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, নাটকের প্রারম্ভে যে নান্দী থাকে, তাহাতে সমগ্র নাটকের আভাস প্রদান করিবার রীতি আছে। রত্নাবলী ও

উত্তরচরিতের নান্দীতেও ইহা আছে, কিন্তু শ্রীহর্ষের নাটকে
ট, ততটা নয়। বেণীসংহারের নান্দীতে ইহা পরিস্ফুট হইলেও
নহে। সংক্ষিপ্ত বলিয়া নাগানন্দের নান্দীর দৃষ্টান্ত দিতেছি।
গ্রন্থে, পরার্থে দেহ-উৎসর্গের ভাবটা বৌদ্ধভাবানুযায়ী, এই জন্য
অপেক্ষা বুদ্ধজিনের সংযম অধিকতর বলিয়া প্রশংসা করিয়া, কবি
তছেন যে, ভোগলালসাপরিশূন্য হইয়া, প্রণয়িনী পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া
চিত্তে লোকহিতব্রতসাধনই পরম ধর্ম্ম। সমগ্র গ্রন্থের কথাও যাহা,
তেও তাহাই সূচিত।

ধ্যানব্যাজমুপেত্য চিন্তয়সি কামুন্মীল্য চক্ষুঃ ক্ষণম্
পশ্যাঽনঙ্গশরাতুরং জনমিমং ত্রাতাঽপি নো রক্ষসি।
মিথ্যা কারুণিকোঽসি নির্ঘৃণতরস্ত্বত্তঃ স কোঽন্যঃ পুমান্
সের্ষ্যং মারবধূভিরিত্যভিহিতো বুদ্ধোজিনঃ পাতু বঃ॥

ধ্যানের ছল করিয়া তুমি কোন্ কামিনীর চিন্তা করিতেছ? আমি অনঙ্গশর-পীড়িত; একবার আমাকে দেখ। ত্রাতা হইয়াও রক্ষা করিতেছ না? তোমার কারুণিকতা মিথ্যা। কোন্ পুরুষ তোমা অপেক্ষা অধিকতর নির্দ্দয়? এই প্রকারে ঈর্ষ্যাসহকারে মারবধূগণ যাঁহাকে বলিতেছেন, সেই বুদ্ধজিন তোমাকে পালন করুন।

কিন্তু এই প্রথা নাটকেই দৃষ্ট হয়; মহাকাব্যরচনায় নানাবিষয়িণী কথা থাকে বলিয়া, সাধারণতঃ বস্তুনির্দ্দেশ দ্বারাই আরব্ধ হয়। ষট্‌মহাকাব্যের মধ্যে কেবল রঘুবংশের প্রথমেই এইপ্রকার নাটকোচিত নমস্ক্রিয়া যোজিত হইয়াছে। এই বিশেষত্বটুকু দেখিলেই মনে হয় যে, এই নমস্ক্রিয়ার বিশেষ সার্থকতা আছে।

বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থপ্রতিপত্তয়ে।
জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্ব্বতীপরমেশ্বরৌ॥

জগৎস্রষ্টাই মনুষ্যের চরমাদর্শ। তিনি একমাত্র পার্ব্বতীতেই মিলিত; এবং সেই মিলন বাক্য ও অর্থের মিলনের মত অচ্ছেদ্য। একপত্নীত্বের উৎকর্ষ বুঝাইবার পূর্ব্বাহ্নে, এই নমস্কারটি কাজেই বড় উপযোগী হইয়াছে।

প্রথমেই বলিয়াছি যে, সুধু একটি বিষয়ের শিক্ষাদান করিবার জন্য এই মহাকাব্য নহে। ইহাতে নানাবিধ সন্নীতির শিক্ষা আছে; ক্রমে ক্রমে আমরা তাহা দেখিতে পাইব। কিন্তু চরিত্রসংযম ও একপত্নীত্বের গৌরবের বিষয়

আমরাও, কি কৌশলে একপত্নীত্বের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদিং তাহার আলোচনা করিতে করিতে, প্রাসঙ্গিকরূপে অন্যান্য মহ কথা উল্লেখ করিব।

শ্রীবিজয়চন্দ্র ম

ভারতের প্রাচীন কীর্ত্তি।

ইতিপূর্ব্বে আমরা ভারতের বিলোপোন্মুখ শিল্প সম্বন্ধে গবর্মেণ্টের এ জন কর্ম্মচারীর কথা পাঠককে উপহার দিয়াছি। সে প্রবন্ধে তিনি বলিয় ছেন, ভারতীয় স্থাপত্যের পুনরুজ্জীবনকল্পে চেষ্টা করা গবর্মেণ্টের কর্ত্তব্য। তাহার পর সেদিন "এসিয়াটিক সোসাইটী"র বার্ষিক অধিবেশনে ভারত গবর্মেণ্টের পরিচালক লর্ড কর্জ্জন প্রাচীন ভারতের শিল্পনিদর্শন গৃহাদির রক্ষণ সম্বন্ধে গবর্মেণ্টের দায়িত্বের বিচার করিয়া On Ancient Indian Buildings শীর্ষক একটি সুন্দর প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন। সে প্রবন্ধে অনেক কথা আছে। লর্ড কর্জ্জন স্বয়ং সুপণ্ডিত, সূক্ষ্মদর্শী, উদ্যমশীল; তিনি ভারত-ভ্রমণকালে ভারতের অনেক প্রাচীন কীর্ত্তি দেখিয়া আসিয়াছেন; সেই সক- দেখিয়া সে দিন "সোসাইটী"তে এই পাঠ করিয়াছিলেন। তাঁহার অভিভাষণ হইতে বর্ত্তমান প্রবন্ধ সঙ্কলিত হইল।

এসিয়াটিক সোসাইটীর অনেক প্রথিতকীর্ত্তি সভ্য প্রত্নতত্ত্ববিদ্যায় যে অনুরাগ দেখাইয়াছেন, তাহাতে আশা করা যায় যে, এখন যদিও চারি দিকে শুনিতে পাওয়া যাইতেছে, লোকের আর পাণ্ডিত্যের অবকাশ নাই, যদিও ভারতে আর ব্যক্তিবিশেষের অধ্যয়নের বা প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধানের রেওয়াজ নাই, তথাপি এই সভার সভ্যগণ প্রত্নতত্ত্বানুরাগবর্জ্জিত হইতে পারেন নাই। কাজেই এ সভায় ভারতের প্রাচীন গৃহাদি সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলা অসঙ্গত হইবে না।

লর্ড কর্জ্জনের মতে প্রাচীন স্মৃতিচিহ্নের সংরক্ষণ গবর্মেণ্টের অন্যতম প্রধান কর্ত্তব্য। যাঁহারা আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী, যাঁহারা আমাদের সমসাময়িক, এবং যাঁহারা আমাদের পরবর্ত্তী, তাঁহাদের সকলের সম্বন্ধেই আমাদের কর্ত্তব্য আছে। বাস্তবিক শেষোক্ত দুই শ্রেণীর সম্বন্ধীয় যে কর্ত্তব্য, তাহা প্রথম শ্রেণীর সম্বন্ধীয় কর্ত্তব্যের সহিত বিজড়িত।

মাদের অযত্নে যদি পরবর্ত্তিগণ আমাদের উপভুক্ত সুবিধার সম্ভোগে ন, তবে আমরা তাঁহাদিগের নিকট নিন্দার্হ হইব। আর আমাদিগের পূর্ব্ববর্ত্তিগণের কীর্ত্তিসংরক্ষণে যত্নবান না হই, তবে ার নিকট আমাদের কীর্ত্তিসংরক্ষণচেষ্টার আশা করা ধৃষ্টতামাত্র। র্ব প্রাচীন গৃহাদির সংরক্ষণ গবর্মেণ্টের পক্ষে বিশেষভাগে কর্ত্তব্য। "কর্পোরেশন," সমিতি প্রভৃতির কৃপায় গবর্মেণ্টের কার্য্যের যথেষ্ট তা হয়, এবং ঐতিহাসিক গৃহ, সুরম্যমন্দির ও অমূল্য শিল্পজাত সাধারণের ত্তি বলিয়া কালের কুলিশকঠোর করস্পর্শ ও মানবের পৈশাচিক ধ্বংস-ত্তির হস্ত হইতে বহুলপরিমাণে রক্ষা পায়। ভারতে ব্যাপার সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। থানে কেবল বিলুপ্ত বংশের, বিস্মৃতিগর্ভগত শাসকগণের ও পীড়ন-ক্লিষ্ট অসম্মানিত ধর্ম্মের চিহ্ন বিদ্যমান। প্রাচীন কীর্ত্তি প্রায়ই গবর্মেণ্টের অধিকৃত স্থানে অবস্থিত। অনেকগুলি আবার সাধারণতঃ দুর্গম স্থানে। একে এ দেশ উষ্ণপ্রধান, এ দেশে বৃক্ষলতাদির আধিক্য, তাহাতে আবার অজ্ঞ জনগণ প্রাচীন গৃহাদি ভাঙ্গিয়া স্বল্পব্যয়ে আপনাদের গৃহনির্ম্মাণের প্রলোভন সম্বরণ করে না, কাজেই প্রাচীন কীর্ত্তিকলাপের ধ্বংস বহুদিনসাধ্য নহে। এই কারণেই ভারতে প্রাচীন কীর্ত্তির সংরক্ষণ গবর্মেণ্টের পক্ষে বিশেষভাবে কর্ত্তব্য।

কেহ কেহ বলিতে পারেন, খৃষ্টান গবর্মেণ্ট কেন অন্যধর্ম্মসংসৃষ্ট কীর্ত্তির ংরক্ষণে ব্যাপৃত হইবেন? কিন্তু শিল্পসৌন্দর্য্য ও যাহাতে মানবের প্রতিভা দ্রিক্ত বা ধর্ম্মবৃত্তি বিকশিত হইয়াছে, তাহা কোন বিশেষ ধর্ম্মবিশ্বাস হইতে তন্ত্র; ধর্ম্মের সহিত সে সকলের যে সম্বন্ধ, তাহা সমস্ত মানবজাতির সাধারণ র্ম্মের অন্তর্ভুক্ত।

এই হিসাবে দেখিলে হিন্দুর গুহামন্দিরে, বৌদ্ধের বিহারে, মুসলমানের মসজিদে ও ক্রিশ্চিয়ানের "কেথিড্রালে" ইতরবিশেষ নাই। অত্যাচারীর স্মৃতি-স্তম্ভ ও সাধুর সমাধিমন্দির, উভয়ের মধ্যে, শিল্পের হিসাবে কোন প্রভেদ নাই। ধর্ম্মমতবিচারের 'চুলচেরা' তর্কের অপেক্ষা যাহা সুন্দর, যাহা ঐতিহাসিক, যাহা আলেকরেখা দেখাইয়া অতীতের অন্ধকার গহ্বরে আমাদের পথপ্রদর্শক, তাহার মূল্য অধিক। প্রাচীন কালের ইতিহাস এখনও অনেক স্থানে অনুমান-মূলকমাত্র। অধ্যয়নশীলের অধ্যবসায়ে, প্রত্নতত্ত্বোদ্ধারের কৃপায়, এখন ধীরে

চারি দিকে—প্রোথিত নগরে, অপঠিত শিলালিপিতে, প্রাচীন মুদ্
স্তম্ভে, রেখাঙ্কিত প্রস্তরফলকে বর্ত্তমান। সেই সকলের সাহা
প্রাচীন কালের ইতিহাসোদ্ধার করিতে পারি, বিস্মৃত যুগের নীতি,
রাজনীতি ও শিল্পের বিষয় অবগত হইতে পারি।

আসিরিয়ার, মিশরের, এমন কি, প্রাচীন য়ুরোপের হর্ম্ম্যাদির
ভারতের প্রাচীন গৃহাদির অধিকাংশ অপেক্ষাকৃত আধুনিক। লর্ড ক
বিশ্বাস, ভারতীয় ভাস্কর্য্য-শিল্প-সৌন্দর্য্যের নিদর্শনের মধ্যে সাঞ্চির
সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। স্তূপের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী রেলিং খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতা
পূর্ব্বে নির্ম্মিত নহে; (স্তূপ হয় ত আরও কিছু পুরাতন হইবে) কিন্তু ত
চাল্‌ডিয়ার ও নিনিভার প্রাসাদপুঞ্জ এবং মিশরের পিরামিড ও শৈলসমাধি
রাজি সহস্র সহস্র বর্ষের পুরাতন। এথেন্সের পার্থানন দূরের কথা, রোমের
কলিসিয়ামের তুলনায় ভারতের অনেক প্রাচীন গৃহ অপেক্ষাকৃত আধুনিক।
লণ্ডনের ওয়েষ্টমিন্‌ষ্টার হল প্রাচীন বলিয়া পরিগণিত নহে। কিন্তু ভারতে
মুসলমানদিগের প্রথম আমলে নির্ম্মিত কুতবমিনার তাহার অপেক্ষা অধিক
প্রাচীন নহে। আকবরের ও সাজাহানের শিল্পীদিগের রচিত গৃহাদি য়ুরোপে
নিতান্ত আধুনিক বলিয়া বিবেচিত হইত।

ভারতের এই সকল প্রাচীন কীর্ত্তির অধিকাংশে, অন্ততঃ মুসলমান
আমলের কীর্ত্তিতে, আর একটি বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, সে
সকলে দেশীয় প্রতিভার বিকাশচিহ্ন নাই, সে সকলের নির্ম্মাণপ্রণালী
ভারতীয় নহে। সে সকল বিদেশের—পারস্যে, মধ্য এসিয়ায়, আরবে বা
আফগানিস্থানে লব্ধ স্থাপত্যজ্ঞান, বিজেতৃগণ বিদেশ হইতে ভারতে তাহাদের
আমদানী করিয়াছেন। ইহার প্রায় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আবার আলেক্‌-
জান্দারের দিগ্বিজয়ফলপ্রসূত গ্রীকোব্যাক্‌ট্রিয়ান রাজ্যসমূহ হইতে গ্রীক প্রভাবে
ভারতীয় স্থাপত্য কতকটা প্রভাবিত হইয়াছিল। সে প্রভাব পরিস্ফুট
হইলেও তেমন স্থায়ী হয় নাই। উত্তর-পশ্চিম ভারতে ও পঞ্জাবে শিল্প ও
স্থাপত্য সেই প্রভাবে বিশেষরূপ প্রভাবিত হইয়াছিল। কিন্তু ভারতীয়
স্থাপত্য বা গৃহাদি বিদেশীয় বা বিদেশীয়প্রভাবযুক্ত বলিয়া ইংরাজের নিকট
সে সকলের আদর কমে না, বরং বাড়ে। কারণ, ইংরাজও বিজয়ের বীচি-
বিভঙ্গবাহিত হইয়া ভারতে আগত। তাঁহারা সেই সকলে পরিচিত য়ুরো-
পীয় প্রভাব দেখিতে পাইবেন। এক হিসাবে দেখিলে এই সকল ভিন্ন

ও পরস্পরবিরোধী ধর্ম্মের স্মৃতিচিহ্নসংরক্ষণের জন্য ইংরাজের
ভিন্ন জাতিই বিশেষরূপে উপযুক্ত; কারণ, প্রত্নতত্ত্ব, ইতিহাস ও
দিক হইতে ইংরাজের নিকট হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন সকল
র স্মৃতিচিহ্ন সমান আদরের। কোন একটির প্রতি বিদেশীর
অনুরাগের সম্ভাবনা নাই। ইংরাজের নিকট প্রত্যেক বিভাগ মানব-
র একাংশের ধর্ম্মবিশ্বাস বা গৌরবের ইতিহাস, প্রত্যেক বিভাগ
তর ইতিহাসের এক অধ্যায়, প্রত্যেক বিভাগই ভারতজয়ী ইংরাজের
ক্ষণীয় দ্রব্যাদির অংশ।

ভারতের স্তূপ ও মন্দিরাদি, দুর্গ ও প্রাসাদমালা যদি অপেক্ষাকৃত আধু-
নিক ও বিদেশী প্রভাবে পূর্ণ হয়, তবে এ কথাও নিশ্চিত যে, প্রকৃত ভারতীয়
ধ্বংসাবশেষের পরীক্ষা, প্রোথিত নগরের উদ্ধার, প্রাচীনলিপির পাঠনির্দ্ধার
প্রভৃতিতে প্রত্নতত্ত্ববিদের মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া বিশেষ আবশ্যক। আধুনিক
ভারতের ইতিহাস এখনও অজ্ঞানতার অন্ধতমোময় নিশাগর্ভে; তাহার উদ্ধার
আবশ্যক, তাহাও গবর্মেণ্টের কর্ত্তব্য। ভিত্তিগাত্রের লিপিপাঠ, প্রত্নতত্ত্বোদ্ধার
ও প্রাচীনকীর্ত্তির সংরক্ষণ, তিনই সমান আদরণীয়, তিনই এক কার্য্যের অবি-
চ্ছিন্ন অংশ। গবর্মেণ্টের পক্ষে প্রোথিত স্তম্ভ হইতে নগরাদির খনন,—প্রাচীন
কীর্ত্তির আবিষ্কার, বিভাগ, পুনর্নির্ম্মাণ, বর্ণনা,—প্রাচীন লিপির পাঠো-
দ্ধার ও প্রাচীন কীর্ত্তির সংরক্ষণ,—সবই সমান করণীয়।

ভারতে ইংরাজ গবর্মেণ্ট এই সকল কর্ত্তব্য কত দূর পালন করিয়াছেন,
তাহা বিবেচ্য। যদি তাঁহারা কর্ত্তব্যপালনে বিমুখ হইয়া থাকেন, তবে তাঁহারা
তাঁহাদের পূর্ব্বগামী ভারতবিজয়ীদিগেরই পদাঙ্কানুসরণ করিয়াছেন। ভারতে
প্রচলিত প্রায় সকল ধর্ম্মাবলম্বিগণ অন্যান্য ধর্ম্মের কীর্ত্তিবিলোপে উন্মুখ হইয়া
ধর্ম্মোৎসাহের পরিচয় দিয়াছেন। ইলোরার গুহামন্দিরে হিন্দুরা বৌদ্ধমূর্ত্তি নষ্ট
করিয়াছিলেন। হিন্দু মন্দির ভাঙ্গিয়া জৈনমূর্ত্তি বিকৃত করিয়া কুতবুদ্দিন
কুতবমিনার আরম্ভ করেন,—আল্‌তামাসের আদেশে ঐরূপ মালমশলায় স্তম্ভ-
নির্ম্মাণ শেষ হয়। ভারতের চারি দিকে প্রতিমাধ্বংসী আরঙ্গজেবের ধ্বংসকর-
স্পর্শচিহ্ন বর্ত্তমান। বারাণসীর শোভা মসজিদের নির্ম্মাণকল্পে আরঙ্গজেব
বিশ্বেশ্বর-মন্দির বিচূর্ণ করিয়াছিলেন। অল্প দিনে নাদির শাহ ভারতে যেরূপ
কীর্ত্তিনাশ করিয়াছিলেন, বোধ হয়, জগতের ইতিহাসে আর কোথাও সেরূপ
দৃষ্টান্ত নাই। উত্তর-ভারতে মহারাষ্ট্রীয়গণ বর্ব্বরভাবে খেলাচ্ছলে প্রাচীন কীর্ত্তি

বিনষ্ট করিয়াছিল। অমৃতসরের স্বর্ণমন্দিরনির্ম্মাণকালে রণজিৎ
মানের মস্‌জিদ ভাঙ্গিয়াছিলেন। আবার বংশধরদিগের নিকট
দিগের কীর্ত্তির বা কোন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের নিকট ধর্ম্মমন্দিরের যে বি
ছিল, সর্ব্বত্র তাহাও নহে। নির্ম্মাতার মৃত্যুর পর অসমাপ্ত রাজধ
দুর্গের, বা মন্দিরের নির্ম্মাণকার্য্য প্রায়ই শেষ হইত না। বরং অনে
উত্তরাধিকারী সে সকল নষ্ট করিতেন। দিল্লীর আশেপাশে বহু পা
পুরী ও বিধ্বস্ত সমাধি লক্ষিত হইবে। আকবর দিল্লী ছাড়িয়া আগ্রায়
ছিলেন, এবং পরে ফতেপুর শিক্‌রিতে নবনগর নির্ম্মাণ করিয়াছিে
জাহাঙ্গীর কখন আগ্রায় কখন দিল্লীতে কাল কাটাইতেন; কিন্তু লাহো
তাঁহার প্রিয় স্থান ছিল। শাহজাহান আগ্রাকে সৌন্দর্য্যশোভায় মণ্ডিত করে
এবং তাহার পর আবার দিল্লীতে আসিবার কল্পনা করিয়াছিলেন। আরঙ্গে
দক্ষিণে আসিয়া নূতন রাজধানীর সংস্থাপন করেন;—তাঁহার সমাধি হা
বাদের অধিকারসীমায়। এই সব খেয়ালজন্য পরিবর্ত্তনে গৃহাদি
ও সুসংরক্ষিত হইত না। ইংরাজ গবর্মেণ্টের এ সকল বালাই নাই।

অন্যান্য বিভাগের মত এই বিভাগেও কয়েক জন উদ্যমশীল ব্যক্তি
র্মেণ্টের কর্ত্তব্যপথের প্রদর্শক। জোন্স, কোলব্রুক, উইল্‌সন্‌, প্রিন্সেপ
ভারতের প্রাচীন সাহিত্যচর্চ্চায় অক্ষয়কীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন। তবে তঁ
সংস্কৃত ভাষার পাণ্ডিত্যলাভে, গ্রন্থের অনুবাদে, লিপির পাঠোদ্ধারে—সাহিত্ি
কার্য্যে অধিক মনোযোগ করিয়াছিলেন। ইঁহারা এত শ্রম করিতেন
গুরুশ্রমে অল্প বয়সে প্রিন্সেপ ও কিটো উভয়ের মৃত্যু হয়। ইহার পর
গৃহ ও স্তম্ভাদির সন্ধান আরম্ভ হয়। কলমের অপেক্ষা কোদালীর অধিক
হার আরব্ধ হয়। বর্ণনা, চিত্র ও ফটোগ্রাফের সাহায্যে য়ুরোপীয়গণ ভার
অমূল্য রত্নের পরিচয় পাইয়াছেন। যাঁহারা এইরূপ কষ্ট স্বীকার কি
ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ফার্গুসন ও কানিংহাম, দুই জ
নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

তখন ইংরাজ গবর্মেণ্ট নবজিত সাম্রাজ্য লইয়া ব্যাপৃত; কখন কখন
একজন উদারচেতা সুশিক্ষিত শাসক কোন কোন প্রাচীন কীর্ত্তির সংস্ক
কল্পে কিছু টাকা মঞ্জুর করিতেন মাত্র। লর্ড মিণ্টো তাজমহলের সংস্ক
কল্পে একটি সমিতি গঠিত করেন; লর্ড হেষ্টিংস ফতেপুর শিক্‌রি ও সিকান্
সংস্কার আরম্ভ করিবার আদেশ দেন; লর্ড আমহার্ষ্ট কুতবমিনারের

পুনর্গঠনের চেষ্টা করেন। লর্ড হার্ডিঞ্জের অনুরোধে Court rs ভারতের প্রাচীন গৃহাদি সন্ধান প্রভৃতি মঞ্জুর করেন। এই ক চেষ্টায় খানকত চিত্রসংগ্রহ ও কোথাও কোথাও সংস্কারকার্য্য বড় কিছু হয় নাই। তখনও ভারতে শাসকদিগের বর্ব্বরতার লুপ্ত হয় নাই। লর্ড উইলিয়ম বেন্‌টিঙ্কের শাসনকালে বহুমূল্য মর্ম্মরের জমহল ভাঙ্গিবার চেষ্টা হইয়াছিল। লর্ড হার্ডিঞ্জ চতুর্থ জর্জ্জকে উপহার জন্য শাহজাহানের দিল্লীর প্রাসাদের স্নানাগারশোভা মর্ম্মররাশি উৎখাত য়াছিলেন; সেগুলা পাঠান হয় নাই—বেন্‌টিঙ্কের আদেশে সেগুলা লামে বিক্রীত হয়। সেই সময় সিকান্দ্রার উদ্যান কৃষিপরীক্ষাক্ষেত্রে পরিণত রিবার কথা হইয়াছিল। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহীবিদ্রোহের পর সার জন ন্স নিবারণ না করিলে দিল্লীর জুম্মা মস্‌জিদ ভূমিসাৎ করা হইত। ৮ খৃষ্টাব্দে সার জনেরই চেষ্টায় সাঞ্চীস্তূপের দ্বার বিনাশের হস্ত হইতে রক্ষা আলিগড়ে একটা ছয় শত বৎসরের পুরাতন স্তম্ভ ভাঙ্গিয়া বেনের ান নির্ম্মিত হইয়াছে,—সেগুলার ভাড়াটিয়া নাই। বড় লাটের অভ্যর্থনার কটা ক্ষণস্থায়ী তোরণের নির্ম্মাণকল্পে আজমীরের মন্দিরের কয়টি ভাস্কর-চিত স্তম্ভ স্থানচ্যুত করা হয়। এরূপ কুকাণ্ডের অভিনয় যথেষ্ট হই-। সেনানিবাসের জন্য শাহজাহানের সৌন্দর্য্যপুরী দিল্লীর প্রাসাদাদি ান করা হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে যখন তাজমহলে চড়িভাতি করা হইত, অনেকে অস্ত্রাঘাতে বাদশাহের ও বেগমের শূন্য সমাধি হইতে প্রস্তরখণ্ড া লইতেন। এখনও নিম্নতলে বাদশাহের প্রকৃত সমাধি শ্রীহীন। সনের পুস্তকরচনাকালে দিল্লীর দেওয়ানিআম অস্ত্রাগাররূপে ব্যবহৃত ও না স্থান ইটের গাঁথনিতে বিকৃত হইয়াছিল; সুখের বিষয়, সে সকল এখন ান হইয়াছে। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে প্রিন্স অব ওয়েল্‌স্ আসিলে আরঙ্গজেবের ারগৃহ লোহিতপ্রস্তরে চূণকাম করা হয়; আগ্রায় নাচের জন্য শাহজাহানের ভিন্ন গৃহ এক করা হয়,— প্রাচীন চিত্রে রঙ্গ ফলান হয়; দেখিলে যুগপৎ রক্ত ও দুঃখিত হইতে হয়। রণজিৎ সিংহ লাহোরস্থিত জাহাঙ্গীরের মতি জিদ ধনাগাররূপে ব্যবহার করিতেন, এখনও বৃটিশ গবর্মেণ্ট তাহাই রিতেছেন। খিলানগুলি ইষ্টকের গাঁথনিতে বন্ধন করা হইয়াছে; হর্ম্ম্যতল ন করিয়া টাকার সিন্দুক রাখা হইতেছে! আহাম্মদাবাদের সুরম্য মস্‌জিদ

কামে তাহা এখন শ্রীহীন। ব্রহ্মবিজয়ান্তে বিজয়ী বৃটিশ শিল্প-সৌন্দর্য্য-শোভি প্রাসাদ ক্লব গবর্মেণ্ট আফিস ও গির্জ্জারূপে ব্যবহার করিতেছেন।

এক দিকে যেমন এই সকলের উল্লেখ করা যাইতে পারে, অন্য দিকে তেমনই বলিতে হয় যে, নানা তর্ক বিতর্ক বাগবিতণ্ডার পর বৃটীশ গবর্মেণ্ট ভারতের প্রাচীন কীর্ত্তিরাজির সংস্কার ও সংরক্ষণের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন। লর্ড ক্যানিং হইতে লর্ড এল্‌গিন পর্য্যন্ত গবর্ণরগণ এ বিষয়ে যথেষ্ট মনোযোগ দিয়াছেন। তবে বলা বাহুল্য, গবর্মেণ্টের কর্ত্তব্য শীঘ্র শেষ হইবার নহে, এখনও করিবার কার্য্য যথেষ্ট আছে। আশা করা যায়, গবর্মেণ্ট ক্রমে প্রাচীন কীর্ত্তিরাজির সংস্কার, উদ্ধার ও সংরক্ষণকার্য্যে আরও বিশেষরূপ মনোযোগ দিবেন।*

সহযোগী সাহিত্য।

জীবনচরিত।

সার উইলিয়াম উইলসন হণ্টার।

সুপ্রসিদ্ধ সিবিলিয়ান ও ভারতের ঐতিহাসিক ডাক্তার হণ্টারের সম্প্রতি মৃত্যু হইয়াছে। ডাক্তার হণ্টার আমাদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। সুতরাং তাঁহার জীবনচরিত ও কার্য্যাবলী আমাদের সকলেরই আলোচনার যোগ্য, সন্দেহ নাই।

ডাক্তার হণ্টার ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন; সুতরাং ষষ্টিতম বর্ষ পূর্ণ হইতে না হইতে তাঁহার জীবনলীলা সাঙ্গ হইয়াছে। তিনি ডেনহলম-নিবাসী মিঃ এ. জি. হণ্টারের

জীবনকাহিনী, সাহিত্যসেবা।

পুত্র; গ্লাসগো, পারিস ও বন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। তিনি ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে সিবিল-সার্ভিস পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে এ দেশে আগমন করিয়াছিলেন। বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব ছোটলাট সার এলেকজাণ্ডার মেকেঞ্জী ও রাজস্বসচিব সার জেম্‌স ওয়েষ্টল্যাণ্ড ও তিনি একই সময়ে এ দেশে আগমন করেন। এ দেশে আসিয়া তিনি প্রথমে কলিকাতায় চাকরি [illegible]ন; পরে এসিষ্টাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে বাঙ্গলার নানা জেলায় কার্য্য করেন। ১৮৬৬ অব্দের উড়িষ্যার ভীষণ দুর্ভিক্ষের কথা সকলেরই মনে আছে; সেই সময়ে তিনি উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত স্থান সকলের শিক্ষাবিভাগের ইনসপেক্টরের পদে আসীন ছিলেন। দুর্ভিক্ষ

* সুখের বিষয়, লর্ড কর্জ্জন এই প্রবন্ধে যে সকল গৃহাদির বিশ্রীকরণের কথা বলিয়াছেন, ভারতের শাসনকর্ত্তরূপে তিনি তাহার অধিকাংশের সংস্কারের বন্দোবস্ত করিতেছেন, বা করিবেন, আশা দিয়াছেন। সে জন্য তিনি আমাদের ধন্যবাদের পাত্র।—লেখক।

ষ হইয়া গেলে তিনি ছুটী লইয়া দেশে যান, এবং Annals of Rural Bengal নামক পুস্তক প্রণয়ন করেন; এই পুস্তক দশ বৎসরের মধ্যে পাঁচবার মুদ্রিত হইয়াছিল। ১৮৬৯ অব্দে Statistical Account of Bengal নামক গ্রন্থসঙ্কলনের ভার তাঁহার প্রতি অর্পিত হয়। পরে তিনি কিছু দিনের জন্য ভারত গবর্মেন্টের রাষ্ট্রবিভাগের অণ্ডারসেক্রেটারীর কার্য্য করেন। ১৮৭১ অব্দে তিনি Director General of Statistics নিযুক্ত হন; তাঁহারই জন্য এই পদের সৃষ্টি হইয়াছিল। ১৮৭১-১৮৮১ অব্দের মধ্যে তিনি কতকগুলি বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া অধিকাংশ কাল বিলাতে কাটাইয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ পুস্তক Imperial Gazeteer of India প্রণয়ন করেন। এই পুস্তক প্রণয়ন করিয়া তিনি গবর্মেন্ট হইতে সি. আই. ই. উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮৮১ হইতে ১৮৮৭ অব্দ পর্য্যন্ত তিনি বড়লাট সাহেবের ব্যবস্থাপক সভার অতিরিক্ত সভ্য ছিলেন, এবং কর্ম্মে দক্ষতা হেতু সি, এস. আই. উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮৮৪ অব্দে তিনি ভারতবর্ষীয় রেলওয়ের বিষয়ে হাউস অফ্ কমন্সে সাক্ষ্য দিবার জন্য বিলাতে প্রেরিত হন। মহাত্মা লর্ড রিপণের সময়ে যে এডুকেশন কমিশন নিযুক্ত হইয়াছিল, তিনি তাহার সভাপতির পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। ১৮৮৬ অব্দে তিনি ফাইনান্স কমিটির সভ্য হন, এবং ১৮৮৭ অব্দে কে. সি. এস. আই. উপাধি প্রাপ্ত হন। এই বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে এ দেশে পঁচিশ বৎসর চাকরীর পর তিনি অবসর গ্রহণ করেন। ১৮৮৬ অব্দে তিনি কলিকাতা ইউনিভারসিটীর ভাইস-চ্যান্সেলারের পদে নিযুক্ত হন, এবং অবসরগ্রহণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এ দেশ হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া তিনি অক্‌স্‌ফোর্ডের নিকটে ওকেন-হোল্ট নামক স্থানে গৃহনির্ম্মাণ করিয়া মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সাহিত্যচর্চ্চায় জীবনযাপন করিয়াছেন। অক্‌স্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন, এবং অক্‌স্‌ফোর্ডের অনার্স স্কুল অভ অরিয়েণ্টাল ষ্টাডিজ নামক বিদ্যালয়ে অধ্যাপকের ও পরীক্ষকের কার্য্য করিতেন। অক্‌স্‌ফোর্ড, কেম্ব্রিজ ও গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয় উপাধি দ্বারা তাঁহাকে সম্মানিত করিয়াছিল। এতদ্ভিন্ন তিনি ভারতবর্ষীয় ও ইউরোপীয় নানা বিদ্বৎমণ্ডলীর সম্মানিত সভ্য ছিলেন। তিনি স্বদেশে নাগরিকের কার্য্যেও নিযুক্ত ছিলেন; অক্‌স্‌ফোর্ড ও বার্কশায়রের জষ্টিস অভ্ দি পিস এবং বার্কশায়রের ডেপুটী লেপ্টেনাণ্টের কার্য্য করিতেন। তিনি এ দেশ হইতে অবসরগ্রহণ করিবার পর Rulers of India (ভারতের শাসকগণ) নামক গ্রন্থাবলীর সম্পাদন করেন ও তন্মধ্যে "লর্ড মেয়ো" ও "মার্কুইস ডালহাউসির" বিবরণ নিজেই প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তিনি যৌবনকাল হইতে সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লিখিতেন; ইদানীং বিলাতের সুপ্রসিদ্ধ টাইমস পত্রে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে প্রায়ই প্রবন্ধ লিখিতেন। শেষকালে তিনি ভারতবর্ষে ব্রিটিশ রাজত্বের ইতিহাস লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই পুস্তক পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত হইবার কথা, একখণ্ডমাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। বড়ই দুঃখের কথা, তিনি এই পুস্তক শেষ করিয়া যাইতে পারিলেন না। লর্ড মেওর জীবনচরিত নামক দুই খণ্ডে সমাপ্ত পুস্তক England's work in India, Indian Empire ও The Old Missionary নামক সুরচিত ও সুপাঠ্য গ্রন্থগুলিও তাঁহার রচিত।

১৮৮৬ সালের উড়িষ্যাদুর্ভিক্ষের প্রসঙ্গে ডাক্তার হণ্টার বলিতেন যে, সেই সময়ে দেশে লোকের অবস্থা সম্বন্ধে গবর্মেণ্ট অনেকটা অজ্ঞ ছিলেন। রেলওয়ে প্রভৃতির অভাবে দুর্ভিক্ষে সময় উড়িষ্যা প্রভৃতি স্থানে খাদ্যদ্রব্য পাঠান অসম্ভব ছিল; লোকের অবস্থা ও কত লোক দুর্ভিক্ষে কষ্ট পাইতেছিল, তাহা জানিবার সুবিধা ছিল না। লর্ড লরেন্স এই কথা জানিতে পারিয়া এই সমস্ত অসুবিধার দূরীকরণবিষয়ে তিনি যাহা সমীচীন মনে করিয়াছিলেন, তাহার উপায়নির্দ্ধারণ করিতে বলেন। লর্ড লরেন্সের এই অনুরোধেই Statistical Survey ও Imperial Gazetteer of Indiaর সূত্রপাত। অধিবাসীর সংখ্যা, জাতিবিভাগ, স্বত্বাধিকার, কৃষিকার্য্য, দেশের উৎপন্ন দ্রব্য, কৃষিকার্য্যের উৎপন্ন দ্রব্য, কৃষিকার্য্যের উন্নতি, লোকের আচার, পারিবারিক ব্যবস্থা, পুরাতন ইতিহাস প্রভৃতি বিষয় সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশিত করিলে শাসকদিগের অনেক সুবিধা হইতে পারে, হণ্টারের এই ধারণা হইয়াছিল। লর্ড মেয়ো লর্ড লরেন্সের পর এ দেশে রাজপ্রতিনিধি হইয়া আসেন; তিনি পূর্ব্বে আয়র্লণ্ডের সেক্রেটারী ছিলেন; এ বিষয়ে তাঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল। তিনি হণ্টারকে ভারতবর্ষের বিষয়ে এইরূপ গ্রন্থ লিখিতে বলেন। সে সময়ে লোকগণনা আরম্ভ হয় নাই; সুতরাং দেশের অধিবাসীর সংখ্যা কত, তাহা গবর্মেণ্টের ভালরূপ জানা ছিল না। ১৮৭১ অব্দে প্রথম লোকগণনা করা হয়।

মতামত।

ডাক্তার হণ্টার বলিতেন যে, ভারতবর্ষের বর্ত্তমান ইতিহাস আলোচনা করিতে গেলে পুরাকালের আলোচনাও আবশ্যক। বাঙ্গলার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথার বিষয়ে তিনি বলিতেন যে, এ দেশে জমিদারী সত্ব বলিয়া একটা জিনিস পূর্ব্বেও ছিল; লর্ড কর্ণওয়ালিস বিলাতের জমিদার-সম্প্রদায়ের অনুকরণে এ দেশে জমিদার-সম্প্রদায়ের নূতন সৃষ্টি করেন নাই। প্রজার স্বার্থরক্ষাবিষয়ে পরে যে আইন হইয়াছে, তাহার দ্বারা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কুফল দূরীকৃত হইয়াছে।

ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতি সম্বন্ধে ডাক্তার হণ্টারের উদার মত ছিল। ভারতে গবর্মেণ্ট যে শিক্ষা প্রচলিত করিয়াছেন, জাতীয় মহাসমিতি তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল; জাতীয় মহাসমিতির সৃষ্টি না হইলে ইংরাজী শিক্ষার ফল অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইত; শিক্ষার এখনও সম্পূর্ণ ফল ফলে নাই বলিয়া ভারত জাতীয় মহাসমিতি এখন তাহার বর্ত্তমান গতি প্রাপ্ত হইয়াছে; জাতীয় ইতিহাসের আলোচনা করিতে শিখিলে পাশ্চাত্য শিক্ষায় উন্নত ভারতবাসী বিশেষ বিবেচনার সহিত রাজনৈতিক আলোচনা করিতে শিখিবে। ডাক্তার হণ্টারের এই মত ছিল। ডাক্তার হণ্টার যদিও কখনও কোনও প্রদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইতে পারেন নাই, তবুও এ কথা বলা যাইতে পারে যে, তিনি তাঁহার উৰ্দ্ধতন কর্ম্মচারীদিগের প্রসাদলাভ করিয়াছিলেন।

জাতীয় মহাসমিতি।

এ দেশে চাকরীতে প্রবিষ্ট হইবার কয়েক বৎসর পর হইতেই তিনি এমন সকল কাজে নিযুক্ত ছিলেন, যাহাতে তাঁহার রচনাশক্তি স্ফূর্ত্তি পাইয়াছিল। দেশের শাসনবিষয়ে তাঁহার অভিজ্ঞতা জন্মে নাই; এবং এই কারণে বোধ হয় তিনি কখনও প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তার পদে প্রতিষ্ঠিত হন নাই।

অভিজ্ঞতা, সহানুভূতি।

ন্তু আমাদের মনে হয়, তিনি এ দেশের এত বিষয়ের অধ্যয়ন ও চর্চ্চা করিয়াছিলেন এবং এ দেশের লোকের রীতি নীতি আচার ব্যবহার ও অবস্থা সম্বন্ধে তিনি যত জানিতেন, শাসন-কার্য্যে নিযুক্ত অতি অভিজ্ঞ ও প্রাচীন রাজকর্ম্মচারীরা সেরূপ জানেন কি না সন্দেহ; অধিকন্তু তাঁহার এ দেশের লোকের প্রতি সহানুভূতি ছিল।

ডাক্তার হণ্টার অতি মনোরম ইংরাজীতে তাঁহার বক্তব্য প্রকাশ করিতেন। তাঁহার পুস্তকাবলী যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা তদীয় বর্ণনাশক্তির প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন না। প্রাতঃস্মরণীয় লর্ড মেটকাফের বংশধর এক জন সিবিলিয়ান কয়েক বৎসর পূর্ব্বে উড়িষ্যার কমিশনর ছিলেন; আমাদিগের কোন আত্মীয় সেই সময়ে উড়িষ্যার কোন এক স্থানে কর্ম্ম করিতেন। মিঃ মেটকাফ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, সেই স্থানের প্রাচীন কীর্ত্তি সকল তিনি দেখিয়াছেন কি না। তিনি উত্তর করিলেন যে, হাঁ দেখিয়াছি, কিন্তু তাহাতে বিশেষ বিস্ময়যোগ্য কিছু আছে, এমন মনে হয় না। তাহাতে মিঃ মেটকাফ আমাদের আত্মীয়কে বলিলেন যে, ডাক্তার হণ্টার সেই সকল প্রাচীন বস্তু সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা একবার পাঠ করা কর্ত্তব্য। মেটকাফের কথা শুনিয়া তিনি হণ্টারের পুস্তক পাঠ করিলেন এবং দেখিলেন যে, হণ্টার সেই সকল প্রাচীন কীর্ত্তি সম্বন্ধে এমন সুন্দরভাবে লিখিয়াছেন যে, সেই বর্ণনা পাঠ করিবার পর আর সেই সকল কীর্ত্তি তাঁহার নিকট সামান্য বলিয়া বোধ হইল না। কথিত আছে, জীর্ণকুটীর দেখিয়া লর্ড টেনিসনের কবিতার উৎস খুলিয়া যাইত। হণ্টারের সম্বন্ধেও এই কথা প্রয়োজ্য। আমরা চর্ম্মচক্ষে যাহা দেখিতে পাই না, কবির চক্ষে তাহা অতি সুন্দর এবং কবিতা পাঠ করিবার পর যদি সেই সকল বস্তু আমরা কবির ভাবে দেখিতে চেষ্টা করি, সেই সকল সামান্য জিনিসও আমাদের নিকট অতি সুন্দর দেখায়। হণ্টার কবিতা লেখেন নাই বটে, কিন্তু তাঁহার গদ্যভাষা কবিতার ন্যায় আবেগময়ী, এবং কবির তীক্ষ্ণদৃষ্টিও তাঁহার ছিল। তিনি যাহা লিখিতেন, তাহাতে তাঁহার প্রগাঢ় সহানুভূতির পরিচয় পাওয়া যাইত।

ডাক্তার হণ্টার মনে করিতেন যে, ইংরাজ এ দেশে আসিয়া এ দেশকে চির অশান্তি হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। যখন মোগল সাম্রাজ্যের ধ্বংস আরম্ভ হইয়াছে, তখন ইংরাজ এ দেশে আসেন; সুতরাং সে সময়ে ভারতে অশান্তি বিরাজ করিতেছিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু এ কথা বলা অনুচিত যে, মুসলমান রাজত্বের সকল সময়ে এ দেশে অশান্তি বিরাজমান ছিল। নানা কারণে বর্ত্তমান সময়ে এ দেশে সর্ব্বাঙ্গীন শান্তিস্থাপন সম্ভব হইয়াছে; মুসলমান রাজত্ব-কালে সে সকল কারণ বিদ্যমান ছিল না, এবং মুসলমানদিগের আমলে ভারতের যে অবস্থা, প্রায় সভ্যজগতের সকল স্থানেরই সেইরূপ অবস্থা ছিল।

তিনি ব্রিটিশ-শাসনের বড়ই পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি এ কথা প্রমাণিত করিবার যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন যে, আকবরের সময়ে ভূমির রাজস্ব ইংরাজ রাজত্বের সময়ে ভূমির রাজস্ব যাহা আছে, তাহার অপেক্ষা অনেক অধিক ছিল; তিনি এই কথা প্রমাণিত করিবার জন্য নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন।

ব্রিটিশ শাসনের অনেক সুফল আছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার অসুবিধাগুলি হণ্টার

খিতে পাইতেন না। দেশ দিন দিন দরিদ্র হইতেছে; শিল্পজাত লুপ্ত হইতেছে; দেশে লোকে শারীরিক ও মানসিক বল হারাইতেছে; ব্রিটিশ কোর্টের অনুগ্রহে মামলা মোকদ্দমায় দেশ উচ্ছিন্ন হইতেছে; তাহা তিনি দেখিয়াও দেখিতেন না। তিনি নিজেই বলিয়াছেন যে, এ দেশে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ লোক সকল সময়ে অনশনে বা অর্দ্ধাশনে দিনযাপন করে।

সেকালে আমাদের দেশে যে স্বায়ত্বশাসনপ্রথা প্রচলিত ছিল, গবর্মেণ্ট সেগুলির উচ্ছেদ সাধন করিয়াছেন, এবং বর্ত্তমান সময়ে তাঁহারা যে স্বায়ত্বশাসনপ্রথা প্রচলিত করিয়াছিলেন, তাহারও সঙ্কোচ করিতেছেন। সকল বিষয়ে দেশের লোকের স্বাধীনতার উপর ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট তাঁহাদের অটুট ক্ষমতা চালাইতেছেন। ইহার অপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় আর কি হইতে পারে?

ডাক্তার হণ্টার ভারতের ইতিহাসলেখক বলিয়া পরিচিত হইতে পারেন না। ইতিহাস লিখিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল কি না, আমরা সে কথার বিচার করিতে অক্ষম। তিনি শেষ জীবনে ইতিহাস লিখিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু সে চেষ্টা সফল হইতে না হইতে অকালে তিনি জীবনলীলা সাঙ্গ করিয়াছেন। তাঁহার রচনায় ভারতের নানা বিষয় আলোচিত হইয়াছে; তাঁহার অমৃতময়ী ভাষার জন্য সেগুলি অনেক দিন মানবের মনোরঞ্জন করিবে। সিবিলিয়ানদিগের মধ্যে তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লেখক ছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

সাহিত্যের উন্নতিকল্পে তিনি অনেক করিয়াছেন। ভারতবাসীর প্রতিও তাঁহার যথেষ্ট ভালবাসা ছিল। তাঁহার অকালমৃত্যুতে ভারতবাসী একজন বন্ধু হারাইয়াছেন ও সাহিত্য যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

মার্কনী।

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ২৫শে এপ্রিল তারিখে ইটালীর একটী পল্লীগ্রামে মার্কনীর জন্ম হয়। সুতরাং এখন তাঁহার বয়ঃক্রম পঁচিশ বৎসর মাত্র। যথাসময়ে বিদ্যালয়ে পড়িতে আরম্ভ করেন। পাঠ্যাবস্থায়ই তাঁহার মন বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত ছিল। "অহর্মুখ দেখিলেই সমস্ত দিবার পূর্ব্বাভাষ পাওয়া যায়," এই ইংরাজী প্রবচন তাঁহার জীবনে সর্ব্বথা প্রযোজ্য।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে, একুশ বৎসর বয়সে তিনি বিনা তারে সংবাদ প্রেরণ বিষয়ে মনোযোগী হইলেন; আশ্চর্য্যের বিষয় যে, তিনি সেই বৎসরই দুই

ভাবিত দুর্ঘটনায় তাঁহার ভাবী জীবন বিপর্য্যস্ত হইবার উপক্রম ঘটিল বিলাতের কাষ্টম্-হাউসের লোকেরা বিলাতে আনীত প্রত্যেক বিদেশীয় জিনিসই একবার পরীক্ষা না করিলে ছাড়েন না। তাঁহাদের সেই পরীক্ষায় পাশ হইলে তবে সেই জিনিস লইয়া বিলাতে অবতরণ করা যায়; কোন সন্দেহ-যোগ্য দ্রব্য (যথা ডিনামাইট্, বম্ ইত্যাদি) হইলে, তাহা বিলাতে নামাইতে দেওয়া হয় না। মার্কনীর যন্ত্রাদি পরীক্ষা করিয়া অজ্ঞতাবশতঃ কাষ্টম্-হাউসের লোকেরা ঐগুলিকে প্রাণনাশক আগ্নেয়াস্ত্র বিবেচনা করিয়া যন্ত্রসমূহ ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। মার্কনীর বিষাদের সীমা রহিল না। কিন্তু তিনি নিরুৎসাহ হইলেন না; মনে মনে হয় ত নিউটন তাঁহার 'ডায়মণ্ড' নামক কুকুরকে যাহা বলিয়াছিলেন, কাষ্টম্ হাউসের মহাপ্রভুদিগকে তাহাই বলিয়া আবার যন্ত্রাদির নির্ম্মাণ করিলেন।

লণ্ডনের জেনারেল পোষ্টাফিসের প্রধান ইঞ্জিনিয়ার প্রিস্ সাহেবের সঙ্গে পরিচিত হইয়া তাঁহারই অনুরোধে ও সাহায্যে নিজের যন্ত্রের সাফল্য সম্বন্ধে কয়েকটি পরীক্ষা করিলেন,—এবং তাহার প্রত্যেকটিতেই আশাতিরিক্ত ফল পাইলেন। সংক্ষেপে, ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের মে মাসের মধ্যে তিনি নয় মাইল দূর পর্য্যন্ত বিনা তারে সংবাদপ্রেরণে সমর্থ হইলেন। এ যাত্রা বিলাতে এই পর্য্যন্তই হইল।

এই সময়ে ইটালীর গবমের্ণ্ট কর্তৃক আহূত হইয়া তিনি রোমে গমন করিলেন; এবং রাজা, রাণী ও বহুসংখ্যক উচ্চ রাজকর্ম্মচারীর সমক্ষে স্বীয় যন্ত্রের কার্য্যকারিতার নানাবিধ নিদর্শন প্রদর্শন করিলেন। এমন কি, স্থল-ভাগে একটি যন্ত্র ও বার মাইল দূরবর্ত্তী দুইটি যুদ্ধজাহাজে অন্য দুইটি যন্ত্র স্থাপন করিয়া, জল ও স্থলের মধ্যে অবিরত অবলীলাক্রমে সংবাদ প্রেরণ করিতে লাগিলেন।

মার্কনীর উদ্ভাবিত এই সংবাদ-প্রেরণ-প্রণালী ইটালীর নৌযুদ্ধবিভাগে গত দুই বৎসর যাবৎ সুচারুরূপে চলিয়া আসিতেছে। ইটালীয় গবমের্ণ্ট তাঁহাকে 'নাইট,' উপাধিতে ভূষিত করিয়া গুণের উপযুক্ত সম্মান করিয়াছেন।

এক্ষণে এই অদ্ভুত ঐন্দ্রজালিক যন্ত্র সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা লিখিতেছি।

আমাদের নিকট যাহা আপাত-দৃষ্টিতে শূন্য স্থান বলিয়া বোধ হয়, তাহা

অতি সূক্ষ্ম পদার্থ বিরাজ করিতেছে। হিরণ্যকশিপুর সেই কঠিন স্ফটিকস্তম্ভে টাঁকশালের নিরেট স্বর্ণপিণ্ডের মধ্যেও ইহা বিদ্যমান। এই ঈথরের সাহায্যে আলো, উত্তাপ, তাড়িত এক স্থান হইতে অন্য স্থানে সঞ্চালিত হয়। আলোকিত পদার্থমাত্রই যে আমরা দেখিতে সমর্থ হই, তাহার কারণ এই ;—আমরা যে আলোকিত পদার্থ দেখি, তাহা দ্বারা ঈথরে একটি তরঙ্গ উৎপন্ন হয় ; সেই তরঙ্গ আমাদের চক্ষুর উপরে পতিত হয়, তাহাতেই আমরা সেই জিনিসটি দেখিতে পাই। কোন জিনিস উত্তপ্ত হইলে তাহা দ্বারা ঈথরে একটি স্বতন্ত্র রকমের তরঙ্গ উৎপন্ন হয়, সেই তরঙ্গ আমাদের শরীরে লাগিলেই আমরা উত্তাপ অনুভব করি। আবার কোন দ্রব্যে তাড়িত সঞ্জাত হইলেই তাহা দ্বারা আর এক অভিনব প্রকারের তরঙ্গ ঈথরে উৎপন্ন হয় ও ক্রমে সেই উর্ম্মিমালা ঈথর দ্বারা সঞ্চালিত হইয়া আমাদের কাছে আসিয়া উপস্থিত হয়। ঐ উর্ম্মিমালা ধরিবার জন্য যে সকল যন্ত্র প্রস্তুত হইয়াছিল, মার্কনি তাহাদের উন্নতিসাধন করিয়া দূর হইতে সংবাদপ্রেরণের উপযোগী করিয়া তুলিয়াছেন। নিম্নে সেই যন্ত্রের বিবরণ বিবৃত হইতেছে।
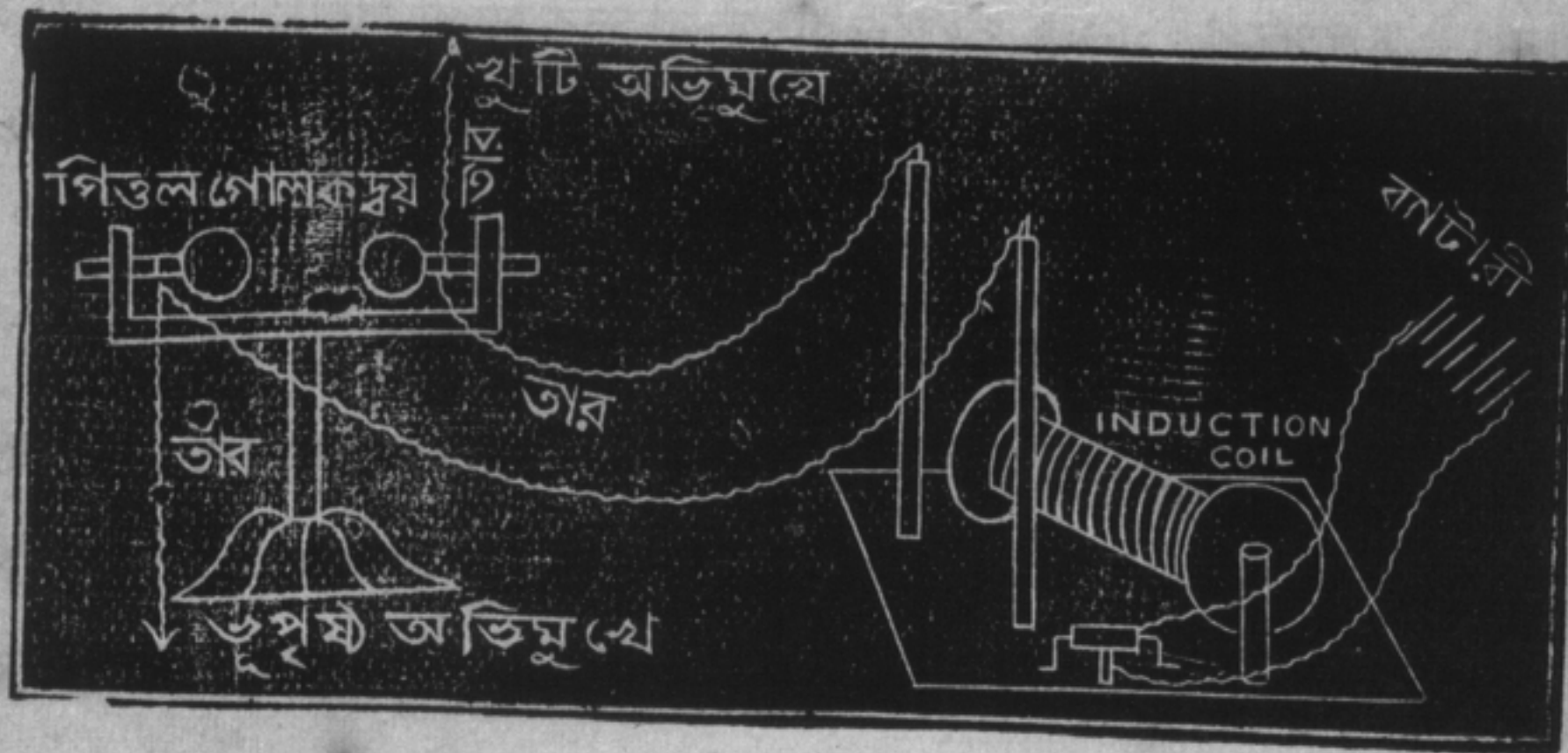
প্রেরক ষ্টেশনের যন্ত্র।

যে দুই স্থানের মধ্যে সংবাদপ্রেরণ অভিপ্রেত, তাহার প্রত্যেক স্থানে দুইটি খুঁটী (৮০—১০০ বা ১২০ ফিট উচ্চ) পুতিতে হয়। এই খুঁটী দুইটির অগ্রভাগ হইতে দুইটি তামার তার খুঁটীর নিম্নভাগ পর্য্যন্ত নামিয়া আইসে, ও মার্কনীর দুইটি যন্ত্রের সহিত তাহারা সংযুক্ত থাকে।* বলা বাহুল্য, যেখান হইতে সংবাদ প্রেরণ করা হয়, সেখানে খুঁটীর নীচে মার্কনীর একটি যন্ত্র থাকে,

* এই দুইটি তার সর্ব্বদাই প্রয়োজনীয়। সুতরাং 'বিনা তারে' টেলিগ্রাফী কথাটি এই হিসাবে ভুল। এখন ইংরাজীতে ইহার আর একটি নাম হইয়াছে, 'Signalling through space.'

ার যেখানে সংবাদ প্রেরণ করা হয়, সেখানেও খুঁটীর নীচে আর একটি স্বতন্ত্র রকমের যন্ত্র থাকে। খুব কাছাকাছি—(যেমন এক ঘর হইতে অন্য ঘরে, বা এক বাড়ী হইতে অনতিদূরবর্ত্তী অন্য বাড়ীতে)—সংবাদ পাঠাইতে হইলে এই খুঁটী না হইলেও চলে; অন্ততঃ খুব ছোটখাট খুঁটীতেই কাজ চলে।

যেথান হইতে সংবাদ প্রেরণ করা হয়, সেখানকার যন্ত্রটির এক অংশে দুইটি পিত্তল-গোলক অল্প দূরে অবস্থান করে। ব্যাটারীর সাহায্যে তাড়িত-স্রোত বহমান করিলেই একটি গোলক হইতে অন্য গোলকে বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গ যাইতে থাকে। যন্ত্রটিতে এই বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গ অল্পাধিককাল স্থায়ী করিবার বন্দোবস্ত আছে। † এবং এই স্ফুলিঙ্গ উৎপন্ন হইলেই ঈথর-তরঙ্গ (Hertzian waves) উৎপন্ন হইল, বলিতে হইবে।

যেথানে সংবাদ প্রেরণ করা হয়, সেখানকার যন্ত্রটিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কৌশলময়। এই যন্ত্রটিকে Co-herer

সংযোজক (Co-herer) যন্ত্র। গ্রাহক ষ্টেশনের যন্ত্রাংশ।

('সংযোজক') বলে। ইহাতে একটি কাচের নল আছে; তাহার মধ্যে দুইটি ধাতুখণ্ড, পরস্পর কিঞ্চিৎ ব্যবধানে, দৃঢ়রূপে সংযুক্ত আছে। এই ব্যবধানটুকুর মধ্যে রৌপ্য ও নিকেল নামক ধাতুর কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টুক্‌রা (filings) আছে। এই টুক্‌রাগুলি, যন্ত্রব্যবহারের সময় ব্যতীত অন্য সময়ে, এলোমেলো ভাবে অবস্থান করে। কিন্তু প্রেরক ষ্টেশন হইতে যখন ঈথরতরঙ্গ আসিয়া তাহাতে পতিত হয়, তখন, কি এক অদ্ভুত প্রাকৃতিক নিয়মবলে, উহারা এক বিশিষ্ট প্রণালীতে শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া সজ্জিত হয়। তখন পূর্ব্বকথিত দুই ধাতুখণ্ডের একটি হইতে

† ব্যাটারীর তাড়িত-স্রোতকে একবার বেশী সময় ও একবার অল্প সময় বহমান করিলেই বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গের স্থায়িত্বকালের পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। তাড়িত-স্রোতকে এইরূপ একবার অধিক ও একবার অল্পকালস্থায়ী করিবার সময় প্রত্যেক মধ্যবর্ত্তী সময়ে স্রোতকে মুহূর্ত্ত কালের জন্য সম্পূর্ণ বিশ্রাম দিতে হয়। ইহাতে প্রত্যেক স্ফুলিঙ্গের মধ্যবর্ত্তী সময়ে স্ফুলিঙ্গও ক্ষণকালের জন্য সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বাপিত হয়।

(ব্যবধান সত্ত্বেও) তাড়িত সঞ্চালিত হইতে থাকে। এ
া তাড়িত সঞ্চালিত হওয়াতে, যে নল পূর্ব্বে তাড়িত
nductor) ছিল, তাহা তাড়িত-পরিচালক (conduct
একটি ব্যাটারীর দুই তার আবার এই নলটির দুই প্রান্ত দি
মধ্যস্থিত ধাতুখণ্ড দুইটির সহিত সংযুক্ত থাকে। এতক্ষণ সেই
ধ্য ধাতুর টুকরাগুলি (filings) বিশৃঙ্খলভাবে থাকাতে ও
তে পারে নাই, এক্ষণে সেইগুলি শৃঙ্খলাবদ্ধ হওয়াতে রীতিমত ত
তে থাকে। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গকে ইচ্ছামত অল্পক
স্থায়ী করিবার ও মধ্যবর্ত্তী সময়ে সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বাপিত করি
ন্ত্রটিতে আছে। এক্ষণে সংবাদ-প্রেরক ইচ্ছামত স্ফুলিঙ্গকে অল্লাধি
করিয়া ও প্রত্যেকবার মধ্যবর্ত্তী সময়ে সম্পূর্ণরূপ নির্ব্বাপিত করিয়
নের "সংযোজক"(co-herer) যন্ত্রটিকে উল্লিখিত প্রণালীতে একবার
জন্য তাড়িত-পরিচালক, আবার বেশীক্ষণের জন্য তাড়িত-পরিচালক, ও
সময়ে সম্পূর্ণ অপরিচালক করিয়া থাকেন। এবং তাহা দ্বারা উক্ত যন্ত্র-সংযুক্ত ব্যাটারীতে অল্লাধিককাল স্থায়ী তাড়িত-স্রোত প্রবাহিত হওয়াতে, (সাধারণ স-তার টেলিগ্রাফি যন্ত্রের মত), একটি সহজ বন্দোবস্তে, দীর্ঘ ও হ্রস্ব রেখা (dash and dot) উৎপন্ন হয়। এক্ষণে এই উভয় প্রকার রেখার ভিন্ন ভিন্ন রূপ সম্মিলন দ্বারা বর্ণমালার যাবতীয় অক্ষর বিজ্ঞাপিত হইয়া থাকে ; অর্থাৎ, ভাবার সকল শব্দই ব্যক্ত হইয়া থাকে।

Co-herer (সংযোজক) যন্ত্রটি একবার তাড়িত-পরিচালক হইলে, পর-মুহূর্ত্তেই তাহাকে অপরিচালক করিবার জন্য এইরূপ বন্দোবস্ত আছে ;—একটি ক্ষুদ্র হাতুড়ী যন্ত্রটিকে উপর্য্যুপরি আঘাত করিয়া থাকে ; তাহাতে ক্ষুদ্র ধাতু-খণ্ডগুলি এলোমেলো হইয়া যায়। তৎক্ষণাৎ সেগুলিকে দূরাগত হার্জিয়ান তরঙ্গের সাহায্যে পুনরায় শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া তাড়িত-পরিচালক করা হয়। এই-রূপ ঘন ঘন তাহাদিগকে একবার তাড়িত-পরিচালক ও আবার তাড়িত-অপরি-চালক করা হয়। এ পর্য্যন্ত এই প্রণালীতে প্রতি মিনিটে বিশটি শব্দ প্রেরণ করা যায়। আমাদের সাধারণ স-তার-টেলিগ্রাফীতে ইহা অপেক্ষা কিছু অধিকসংখ্যক শব্দ প্রতি মিনিটে প্রেরিত হইয়া থাকে।

সকলেই জানেন, গত বৎসর আমাদের যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েলস্, প্রসিদ্ধ ধনকুবের রথচাইল্ডের বাড়ী নিমন্ত্রণে গিয়া পা ভাঙ্গিয়া আসিয়া-

্যার সেই পায়ের চিকিৎসার সময়ে তিনি 'অস্‌বর্ণ'
্যে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই মানসিক ঃ
াজের খেয়াল হইল যে, ইটালী-নিবাসী মার্কনী
অদ্ভুত যন্ত্রের কথা সংবাদপত্রে এত আন্দোলিত হইতে
্যানাইয়া তদীয় যন্ত্রের চাক্ষুষ পরীক্ষা করা হউক।
শান্তিময় সময়টা কতক আমোদে কাটিয়া যাইবে
রিয়া তিনি মার্কনীকে ইংলণ্ডে আহ্বান করিয়া পাঠাই
্যর মাতা ভারতেশ্বরীর 'অস্‌বর্ণ' নামক রাজপ্রাসাদ (ওয়াইট
স্থিত) ও স্বীয় 'অস্‌বর্ণ' নামক জাহাজের মধ্যে বিনা তারে সং
বন্দোবস্ত করিতে বলিলেন। তদনুসারে মার্কনী দ্বিতীয়বার
সিয়া দুই স্থানে যন্ত্রাদি স্থাপিত করিলেন, এবং মাতাপুত্রের মধ্যে অ
পে সংবাদের আদানপ্রদান চলিতে লাগিল। বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয়
সেই সময়ের পক্ষে) এই যে, যুবরাজের জাহাজ সর্ব্বদা এক স্থানে স্থিঃ
না; কিন্তু তথাপি চলিষ্ণু জাহাজ হইতে সংবাদ প্রেরণ বা গ্রহণ
অণুমাত্র অসুবিধা হয় নাই। জাহাজের মাস্তুলেই খুঁটীর কাজ সম্পন্ন হইয়াছিল।
কোন কোন সময়ে জাহাজ ও রাজপ্রাসাদের ব্যবধান ৭।৮ মাইলেরও বেশী
হইয়াছিল। যদিও এক্ষণে চৌত্রিশ মাইল পর্য্যন্ত দূরে সংবাদ প্রেরিত হই-
তেছে, যদিও উনবিংশ শতাব্দী বিদায় হইবার পূর্ব্বেই ইংলণ্ড ও আমেরিকার
মধ্যে বিনা তারে সংবাদ প্রেরিত হইবে বলিয়া বৈজ্ঞানিকেরা আশা করেন,
তথাপি সেই সময়ের পক্ষে ৭।৮ মাইল দূরে বিনা তারে সংবাদ-প্রেরণে সামান্য
বিস্ময়ের উদয় হয় নাই। বিশেষতঃ ঐ মধ্যবর্ত্তী ব্যবধানে বিস্তৃত সমুদ্র ও
অনতি-উচ্চ (খুঁটী হইতে ৩০০ ফিটেরও বেশী উচ্চ) পাহাড়ও ছিল।

মনে হইতে পারে যে, মার্কনীর যন্ত্রে সঞ্জাত ঈথর-তরঙ্গ, পুষ্করিণীবারি-নিক্ষিপ্ত প্রস্তরখণ্ড দ্বার উৎপন্ন জল-তরঙ্গের ন্যায় চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে, সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এক একটি যন্ত্র লইয়া বসিলে কোন প্রেরিত সংবাদ সকলেই জানিয়া ফেলিবে; এবং সংবাদের বাঞ্ছনীয় গোপনীয়তা না থাকিলে উহার উপকারিতা পনর আনা কমিয়া যাইবে;—মার্কনী সে পথ রুদ্ধ করিয়াছেন। Reflector ("প্রতিঘাতী") নামক যন্ত্র-বিশেষ দ্বারা তিনি যে কোন নির্দ্দিষ্ট দিকে ঈথর-তরঙ্গ প্রধাবিত করিবার উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। আর একই দিকের একই সরল রেখার উপরে

স্থিত দুইটি স্থানের লোকও যেন কোন তৃতীয় ব্যক্তির সংবাদ ন পারে, তাহারও বন্দোবস্ত হইয়াছে। মার্কনীর "সংযোজক" যন্ত্রের ম (wings) নামক একটি যন্ত্রাংশ আছে; কোন দুইটি যন্ত্রের পক্ষ যদি একরূপ না হয়, তবে তাহাদের একটিতে যে সংবাদ ধরিতে পারিবে, অ তাহা পারিবে না। যন্ত্র দুটি সর্ব্বাংশে একরূপ হওয়া চাই। একটি দুই প্রান্তে দুইটি সেতার ঠিক্ একই সুরে বাঁধা থাকিলে যদি তাহাদের টিকে বাজান যায়, তবে অপরটিও আপনা-আপনি বাজিয়া উঠে। কলেজের বিজ্ঞান-ক্লাসের ছাত্রদের নিকট একটি সুপরিচিত নিত্যপরী সত্য। দুইটি সেতার ঠিক্ এক সুরে বাঁধা না থাকিলে একটি বাজা অপরটি বাজে না; মার্কনীর যন্ত্র সম্বন্ধেও ঠিক্ এই নিয়ম; দুইটি য 'পক্ষ' সর্ব্বাংশে একরূপ না হইলে, তাহারা প্রত্যেকেই এক সংবাদ ধরি পারিবে না।

তীর্থের পথে।

১

মহামায়া বলিল, "তুমি মর!"

যোগমায়া বলিল, "আমি ত অনেকদিন মরিয়াছি। আজ তোর কথায় নূতন করিয়া মরিতে পারিব না।"

মহামায়া বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তীর কন্যা। সে তাহার স্বামী রামদয়াল ঘোষা-লের সহিত রুগ্ন পিতাকে দেখিতে আসিয়াছিল।

যোগমায়া বিশ্বেশ্বরের ভ্রাতুষ্পুত্রী। সে বিধবা। বিশ্বেশ্বরের পরিবারে থাকিয়াই সে ব্রহ্মচর্য্যপালন করিতেছিল।

মহামায়ার বয়স উনিশ, যোগমায়া তাহার অপেক্ষা তিন বৎসরের বড় হইবে। মহামায়া সুন্দরী, যৌবনের উচ্ছলিত তরঙ্গে তাহার রূপরাশি তর-ঙ্গিত হইতেছিল। মহামায়ার রূপের গাঙ্গে ভরা জোয়ার। আর বালবিধবা যোগমায়াকে রূপসী বলিলে হয় ত সঙ্গত হইবে না। কিন্তু তাহার চঞ্চল নয়নের দিকে চাহিলে দৃষ্টি সহজে ফিরিতে চাহিত না। মহামায়ার যৌবনে এখনও ভাঁটা পড়ে নাই। কিন্তু যোগমায়ার মত তাহার ভরা জোয়ারও

তটপ্লাবিনী খর-বাহিণী বন্যার সহিত তাহার অধিকতর সাদৃশ্য

তর ন্যায় উভয়ের প্রকৃতিও অত্যন্ত বিভিন্ন ছিল। মহামায়া গম্ভীর,
।, আপনাতে আপনি নিমগ্ন। যোগমায়া চঞ্চল, অস্থির,অধীর,আপনার
।য় আপনি অসন্তুষ্ট। বৈধব্যচিহ্নের সহিত, তাহার রূপের সহিত, এই
শোভা পাইত না। পক্ষান্তরে মহামায়ার সৌন্দর্য্য যেন এই যৌবন-
চাঞ্চল্যের অভাবে প্রাণহীন হইয়া থাকিত। মহামায়ার সৌন্দর্য্য
।; যোগমায়ার রূপেও বিশেষত্ব ছিল না। কিন্তু হৃদয়ের কোনও আবেগ,
।স যখন সহসা যোগমায়ার মুখে প্রতিবিম্বিত হইত, তখন তাহা মুহূর্ত্তের
। সূর্য্যকরসমুজ্জ্বল শিশিরবিন্দুর মত মনোহর শোভায় উদ্ভাসিত হইয়া
ত।

দুই ভগিনীতে কথা হইতেছিল। মহামায়া স্থির, অচঞ্চল। অপরা
।স্থির, চঞ্চল,—সমীরসংক্ষুব্ধ তটিনীর মত আপনার চাঞ্চল্যে আপনি
কম্পিত তরঙ্গিত হইতেছিল।

মহামায়া বলিল, "আমার জন্য বলিতেছি না ; এখনও বুঝিয়া দেখ।"

যোগমায়া বলিল, "আমি তোমার নিধি কাড়িয়া লইব না!"

মহামায়ার মুখে তাহার হৃদয়ভাব অনুসন্ধান করিলে কেহ বুঝিতে পারিত না, সে ক্রুদ্ধ, বিষণ্ণ, না বিরক্ত। কিন্তু যোগমায়ার হাস্যকিরণদীপ্ত মুখে চোখে কৌতুক উচ্ছলিত হইতেছিল।

যোগমায়া বলিল, "তুই সাবধানে পাহারা দিস, নহিলে আমি চুরি করিব।"

মহামায়া বলিল, "চুরি করিয়া কোথায় বমাল রাখিবি? আমার জিনিস আমারই থাকিবে, তোর অদৃষ্টে কেবল চোর অপবাদ—"

যোগমায়া বলিল, "সাত সমুদ্দুর তের নদীর পারে।"

অদূরে কাহার পদশব্দ শুনিয়া যোগমায়া চাহিয়া দেখিল, রামদয়াল সেই দিকে আসিতেছেন। সে ছুটিয়া পলাইল।

রামদয়াল সন্নিহিত হইলে মহামায়া বলিল, "তুমি বাড়ী যাও।" রামদয়াল দেখিল, মেঘমেদুর অম্বরে সন্ধ্যার অন্ধকারের মত মহামায়ার গম্ভীর মুখে কিসের ছায়া;—তাহা উদ্বেগের না আশঙ্কার, তাহা সে ভাল বুঝিতে পারিল না। কখনও সে তা পারিত না। রামদয়াল বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

মহামায়া বলিল, "দু' জনে ঘরসংসার ছাড়িয়া কত দিন এখ।
বাবাকে ফেলিয়া আমি ত যাইতে পারিব না, তুমি যাও।"

রামদয়াল বলিল, "তা কি হয়? তোমাকে রাখিয়া, রুগ্ন শ্বশুর।
চলিয়া গেলে লোকে কি বলিবে?"

মহামায়ার মুখে চোখে একটু হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিল। সে হাসি
শুভ্র মেঘের বিদ্যুতের মত ক্ষণিক ও ক্ষীণ, কিন্তু বর্ষার বিদ্যুতের মত
রামদয়াল কিছু বুঝিতে পারিল না। সে গত কয়েক দিবস হইতে
অন্যমনস্ক হইয়াছিল, আপনাকে আপনি বুঝিতে পারিতেছিল না।
উপর, মহামায়ার এই প্রহেলিকা দেখিয়া একটু অবাক হইয়া আবার
মনস্ক হইতেছিল। এমন সময়ে মহামায়ার কণ্ঠ শুনিয়া সে চকিত
উঠিল।

মহামায়ার কণ্ঠে উচ্চারিত হইতেছিল, "লোকে কি বলিবে—তাই ভা।
ত তোমার ঘুম হয় না; যোগমায়া কি বলিবে,—তাই—"

ঘটঘটনাচ্ছন্ন দুর্যোগে, ঘোর নিশীথের গাঢ় অন্ধকারে, মুক্ত প্রান্তরে দূ
সহসা বজ্রপাত হইলে পথিক যেমন বজ্রশব্দে চমকিয়া উঠে, আর চপলার চকি
আলোকে পলকের মধ্যে তাহার উদ্‌ভ্রান্ত নয়নের সমক্ষে এক মুহূর্ত্তের জন্য
প্রলয়ঙ্করী প্রকৃতির মূর্ত্তি উদ্ভাসিত হয়, মহামায়ার এই ক'টি কথা শুনিয়া
রামদয়াল তেমনই চকিত হইয়া উঠিল, মহামায়ার কণ্ঠোচ্চারিত যোগমায়ার
নামে সহসা তাহার জীবনপথের সম্মুখে এক অদৃষ্টপূর্ব্ব অস্পষ্ট ছবির আভাস
দেখিতে পাইল।

রামদয়াল আত্মস্থ হইবার পূর্ব্বেই মহামায়া সে স্থান ত্যাগ করিয়াছিল।
রামদয়াল চাহিয়া দেখিল, মহামায়া দ্রুতপদে চলিয়া যাইতেছে। কিন্তু তাহার
চর্ম্মচক্ষুর উপর এই প্রকৃত দৃশ্য বিদ্যমান থাকিলেও ইন্দ্রজালমুগ্ধের ন্যায়
সে এক নূতন ছবি দেখিতেছিল! তাহাকে আসিতে দেখিয়া যোগমায়া যখন
ছুটিয়া পলায়, তখন রামদয়াল তাহা দেখিয়াও দেখে নাই; ইহাও সম্পূর্ণ
সত্য, তাহা যে দেখিবার মত, তাহাও রামদয়ালের মনে হয় নাই। কিন্তু
এখন, অনিচ্ছাসত্ত্বেও, পলায়মানা অসম্বৃতকেশবাসা যোগমায়ার চিরপরিচিত
মূর্ত্তি নিতান্ত নবপরিচিতের মত, নিত্যনূতনের মত, তাহার নয়নপটে অনবরত
প্রতিবিম্বিত হইয়া তাহাকে আকর্ষণ করিতেছিল।

২

ইতিপূর্ব্বে, মহামায়ার সহিত এই সঙ্ক্ষিপ্ত কথোপকথনের পূর্ব্ব
ন্ত যাহা স্বপ্নেও ভাবে নাই, এখন তাহা নিতান্ত কঠোর সত্যে
হইল। মহামায়ার চিরপরিচিত কণ্ঠস্বরে জাগিয়া সে দেখিল, তাহার
সিংহাসন শূন্য, সেখানে মহামায়া নাই। আর এক জন বিনা
নে, অজ্ঞাতসারে, মহামায়ার শূন্য সিংহাসন কখন অধিকার করিয়াছে।
বস্মিত বিরক্ত বিচলিত হইল বটে, কিন্তু কি করিবে, স্থির করিতে
ল না।

একবার মনে করিল, চলিয়া যাই। কিন্তু তাহা সঙ্গত মনে হইল না।
ড়িত শ্বশুরকে ত্যাগ করিয়া যাইতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না। বৃদ্ধের আর
ছিল না; বিষয়আশয়ের কি বন্দোবস্ত হয়, তাহাও দ্রষ্টব্য বটে।

কিন্তু এ দিকে? রামদয়াল ভাবিল, এ হয় ত স্বপ্ন। এ হয় ত ক্ষণিক।
এই মরীচিকায় আমি কি সত্যই মুগ্ধ হইব?

রামদয়াল আপনার মনে আপনার মনের মত বিবিধ যুক্তির রচনা করিল। শেষে সিদ্ধান্ত করিল, এক দিকে সম্ভাবনা, অন্য দিকে কর্ত্তব্য। সম্ভাবনার ভয়ে কর্ত্তব্য ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিব কেন? মন কি এত লঘু? জীবন কি এত অসার? সংযম কি এত কঠোর? মানসিক ব্যাধি কি এত দুঃসাধ্য? তাই যদি হয়, আজ না হয় পলাইয়া বাঁচিলাম; কাল? পৃথিবীতে কোথায় প্রলোভন নাই? কোথায় গিয়া নিশ্চিন্ত হইব?

এই সব তর্কজালের অন্তরালে যে যোগমায়া লুকাইয়াছিল; তাহার কামনা, তাহার দর্শনলালসাই যে রামদয়ালের কর্ত্তব্যবুদ্ধিকে এতটা উৎসাহিত করিতেছিল; যে আত্মসংযমের ভরসায় নির্ভর করিয়া সে আত্মজয়ের আশা করিতেছিল, তাহাই যে অসংযমের নামান্তর; তাহা রামদয়াল বুঝিতে পারিল না।

মহামায়া বুঝিল, কিন্তু উপায় ছিল না। যোগমায়া বুঝিল, কিন্তু ফিরিতে পারিল না। রামদয়াল বুঝিয়াও বুঝিল না, আপনাকে আপনি বঞ্চনা করিল। ফলে কিন্তু মরিল মহামায়া।

মুমূর্ষুর অন্তিম-শয্যায়, মৃত্যুচ্ছায়ার আলো-আঁধারে, পরস্পরের দিকে চাহিয়া চাহিয়া চাহিয়া তিন জনের কেহ অবসন্ন হইত না। আশায় নিরাশায়, সংশয়ে যাতনায়, শঙ্কায় ভাবনায় তিন জনের হৃদয় মথিত হইতেছিল; তিন জনেই নীরবে স্রোতে ভাসিয়া চলিল, কেহ আর কিছু ভাবিল না।

৩

ায়ার চঞ্চলতা কোথায় গেল? তাহার কামনা-পূর্ণ
ন। সেই চঞ্চল নয়ন এখন প্রশান্ত, তাহাতে আর কৌতু
সে হাস্যদ্যুতি কোথায় অন্তর্হিত হইল? অতৃপ্তির চাং
তৃপ্তির সে সান্ত্বনা, সে শান্তি কই? তবু এই পরিবর্ত্তনে যোগ
তা লাভ করিল।

হামায়াও স্বভাবসিদ্ধ গাম্ভীর্য্য হারাইল। তাহার সৌন্দর্য্যের সহিত
যে অসঙ্গতি ছিল, তাহা দূর হইল। মহামায়া এখন প্রায় হাসে,
হাসিয়া আকুল হয়, কেন? জীবনের পরিপূর্ণ তৃপ্তি হারাইয়
ইতেছিল। জীবনের নিষ্ঠুরতায় দলিত পিষ্ট ব্যথিত হইয়াও সে প্রা
সুখ যায় যাক, শান্তি ছাড়িব না।

নার ঘর পুড়িতে দেখিয়া যে নিকটে দাঁড়াইয়া হাসে, সে জা
নসী জলে এ আগুন নিভিবে না! তবু না কাঁদিয়া সে হাসে কেন
না!

৪

এক দিন মুমূর্ষু পিতার শিয়রে বসিয়া মহামায়া ঢুলিতেছিল।—আর জাগিয়
থাকিতে পারে না। মনে করিল, হয় রামদয়ালকে নয় যোগমায়াকে ডাকিয়
দিয়া নিজে একটু ঘুমাইবে। মহামায়া ঘর হইতে বাহির হইয়া বারান্দায় গেল।
রামদয়ালের ঘরের দ্বারে দাঁড়াইয়া দেখিল, গৃহমধ্যে অন্ধকার। কথোপকথ-
নের মৃদু অস্পষ্ট শব্দ মহামায়ার কানে আসিতেছিল। নীরবে দ্বারে হাত
দিল। বুঝিল, দ্বার মুক্ত। দরজা একটু মুক্ত করিয়া দেখিল, ঘোর অন্ধকার,
কিছু দেখা যায় না। অনেকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া ক্রমে সেই অন্ধকারে দেখিল,
গৃহমধ্যে যোগমায়া ও রামদয়াল। মহামায়া না দেখিলেও তাহা বুঝিতে পারিত।
তবু দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিল। সেই গাঢ় অন্ধকার তাহার চক্ষে
গাঢ়তম হইয়া আসিতেছিল। অনেক কষ্টে সে আত্মসংবরণ করিবার চেষ্টা
করিল। তাহার হৃদয় অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। মহামায়া দুই হাতে বুক
চাপিয়া ধরিয়া ফিরিয়া আসিবার চেষ্টা করিল। সহসা মহামায়ার অজ্ঞাতসারে
তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল, "বেশ!"

গৃহমধ্যে কণ্ঠস্বর নীরব হইল। মহামায়া ধীরে ধীরে ফিরিয়া পিতার
শয্যাতলে আসিয়া বসিল। তাহার শিরায় শিরায় আগুন জ্বলিতেছিল;
নয়নের সমস্ত অশ্রু [illegible]

স্বপ্ন না জাগরিত, তাহা আপনিই বুঝিতে পারিতেছিল
নার মনে হইল, সোপানে কাহার পদশব্দ! তাহার পর
ইল, কে ধীরে ধীরে সদর-দরজা উন্মুক্ত করিল! সে স্বপ্নো
বসিল; ধীরে ধীরে প্রদীপ হইতে একটি শলিতা জ্বালিয়া
গৃহের দ্বারে গিয়া দেখিল, দ্বার মুক্ত। কম্পিতহস্তে শলি
ভিতরে চাহিল, সেখানে কাহাকেও দেখিতে পাইল না। মন্ত্র
সোপানমূলে আসিয়া দাঁড়াইল; এই সময়ে তমোময়ী যামিনীর
সের মত সহসাগত পবনবেগে শলিতাটি নিভিয়া গেল। অ
রে ধরিয়া সে নীচে নামিল;—অন্ধকারে বাহির-দরজার দিকে
গেল। একটু অগ্রসর হইয়া দেখিল, সেই অন্ধকার ভেদ করিয়া
রপথে একাদশীর চন্দ্রালোক প্রবেশ করিয়াছে, সম্মুখে অনন্ত
ক্ষত্রভূষিত গগনের কিয়দংশ, আর তাহার নিম্নে আলোক ও আঁধা
গ্রামপথ।

মহামায়া আর দাঁড়াইতে পারিল না, ছিন্ন ব্রততীর ন্যায় ভূমিতে
হইয়া কাঁদিতে লাগিল।

একবার মনে করিল, এ যাতনা সহি কেন? মরিলে ত জুড়াইতে পারি! কিন্তু তাহা হইলে পীড়িত পিতার কি হইবে? আবার ভাবিল, আর একবার না দেখিয়া মরিব? কিন্তু আর কি দেখা পাব?

তাহার পর ধীরে ধীরে উঠিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল,—কৃতাঞ্জলি হইয়া ঊর্দ্ধমুখে কহিল, "যাও,—মরিবার আগে আর একবার তোমায় দেখিতে ইচ্ছা করে!"

৫

এগার বৎসর অতীত হইয়াছে। স্বামিপরিত্যক্তা পিতৃহীনা মহামায়া এই কয় বৎসর শোকে দগ্ধ ও দুঃখে জীর্ণ হইয়াও বাঁচিয়া আছে। সংসারে তাহার কোনও অবলম্বন ছিল না, বন্ধন ছিল না। কেবল এক আশাবৃন্তে তাহার জীবনকুসুম সম্বদ্ধ হইয়াছিল;—মরিবার আগে অভাগীর অদৃষ্টে কি একবার তাঁহার চরণ-দর্শন ঘটিবে না?

এই সময়ে গ্রামে এক জন পুরুষোত্তমের সেথো উপস্থিত হইল। গ্রামে গ্রামে কোলাহল পড়িয়া গেল। সন্নিহিত সাত আটখানি গ্রামের নরনারী মিলিয়া পুরুষোত্তমতীর্থে দারুব্রহ্ম-দর্শনে যাত্রা করিল।

মহামায়াও তাহাদের সঙ্গী হইল। মনে মনে ভাবিল, তাঁহা
। না, ঠাকুরের চরণ পাইব কি?

৬

পথ। যাত্রীর দল পদব্রজে যাত্রা করিল। ক্রমে তাহারা মেদিনী
উৎকলের সীমায় প্রবেশ করিল।

আর দশ দিন পরে যাত্রীর দল একটি চটীতে উপস্থিত হইল।
চলিয়াছে। পথে জনতার সংখ্যা হয় না। মহামায়ার গ্রামস্থ ঃ
যখন রামপুরের চটীতে পঁহুছিল, তখন সেখানে বিসূচিকা বড় প্র
র্থযাত্রীর মৃতদেহে ক্ষুদ্র গ্রাম পরিপূর্ণ। পথের ধারে, প্রান্তরে, বৃক্ষত
রোবরতীরে, সর্ব্বত্র মৃতদেহ। কেহ বা অর্দ্ধমৃত, সঙ্গীরা ফেলিয়া চ
গিয়াছে। এ পথে কেহ কাহারও অপেক্ষা করে না। দলের কেহ পীড়ি
ইলে ফেলিয়া রাখিয়া যায়। পরিত্যক্ত হতভাগ্য অভীষ্ট তীর্থের পথেই পর
ি চরম তীর্থে চলিয়া যায়।

চটীতে স্থানাভাব। অনেক কষ্টে সন্ধ্যার পর একটি দোকানে মহামায়ার
দলস্থ সকলে আশ্রয় লইলেন।

সেই দিন মধ্যরাত্রে সেই দোকানে পূর্ব্বাগত যাত্রীর দলের একজন পুরুষ
বিসূচিকায় আক্রান্ত হইল। মহামায়ার গ্রামের দল ভয়ে চটী পরিত্যাগ করিয়া
সেই রাত্রেই যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইল।

সকলে বাহিরে সমবেত হইলে দেখা গেল, মহামায়া দলে নাই।

বৃদ্ধ রামহরি চট্টোপাধ্যায় বলিলেন, "মহামায়া কই? মহামায়া!"

এক জন বলিল,—"সে চটীতে পড়িয়া আছে, তাহার উঠিবার শক্তি
নাই। তাহাকেও রোগে ধরিয়াছে।"

এ পথের এই দস্তর। কোন্ পথেই বা নয়? আপনাকে বিপন্ন করিয়া
কে পরের প্রাণরক্ষার চেষ্টা করিবে? যাত্রীর দল চলিয়া গেল। মহামায়া—
একাকিনী, অসহায়া, মরণাহতা, সেই চটীতে পড়িয়া রহিল।

চটীর এক প্রান্তে মহামায়া ও অন্য প্রান্তে অপর দলের সেই রুগ্ন যাত্রী—
উভয়েরই জীবনবন্ধন শিথিল হইয়া আসিতেছিল। মহামায়াকে দেখিবার
কেহ ছিল না, কিন্তু এক বর্ষীয়সী রমণী রোগাক্রান্ত পুরুষের সুশ্রূষায় নিরত
ছিল। অপররিচিতার কি প্রাণের ভয় নাই? অথবা যে মৃত্যুশয্যায়, সে
ইহার প্রাণাধিক?

যাতনায় অস্থির হইয়া মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছিল। তা
আকৃষ্ট হইয়া অপরিচিতা প্রদীপহস্তে তাহার শয্যাপার্শ্বে উপন
মায়ার মুখের দিকে চাহিয়া সে শিহরিয়া উঠিল। ধীরে ধীরে প
লল, "তোমার অদৃষ্টে জগন্নাথদর্শন নাই।"

মায়া বলিল, "তাহাতে দুঃখ নাই। মরণেও দুঃখ নাই।
ক না দেখিয়া—"

অপরিচিতা বলিল—"কাহাকে? মরণেও যদি দুঃখ নাই, তবে ে
ঃখ কিসের?"

"বড় অহঙ্কার করিয়া বড় আশায় বুক বাঁধিয়াছিলাম, মরিবার অ
হার পদধূলি লইয়া মরিব। মরি, তাতে দুঃখ নাই। তাঁহাকে দেখি
রলাম কই?"

অপরিচিতা প্রদীপ রাখিয়া মহামায়াকে তুলিবার চেষ্টা করিল, পারিল
না। তখন সে মহামায়ার শয্যা ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল।

মহামায়া মনে করিল, এই শেষ;—বাহিরে ফেলিয়া দিতে যাইতেছে।

সেই সুদীর্ঘ গৃহের অপর প্রান্তে, আর এক জন মুমূর্ষুর শয্যাপার্শ্বে মহামায়ার শয্যা রাখিয়া, অপরিচিতা প্রদীপ উজ্জ্বল করিয়া দিল। তাহার পর মহামায়াকে বলিল, "দেখ!"

মহামায়া কাতরকণ্ঠে বলিল, "কি?"

সে বলিল, "তোমার স্বামী!"

মহামায়া চমকিয়া উঠিয়া বসিতে গেল, পারিল না। আবার শয্যায় পড়িয়া সবিস্ময়ে সাগ্রহে বলিল, "সে কি?"

অপরিচিতা কহিল, "তুমি সতী লক্ষ্মী। তোমার স্বামী রামদয়াল ঐ মৃত্যু-শয্যায়। দেখ।"

মহামায়া ভগ্নকণ্ঠে কহিল, "আমি যে আর দেখিতে পাই না,—দেখাও, দেখাও,—তুমি কে?"

অপরিচিতা মহামায়াকে তুলিয়া ধরিয়া কহিল,—"দেখ! তোমার স্বামীকে দেখ—আমি যোগমায়া—"

মহামায়া চীৎকার করিয়া উঠিল;—যোগমায়া পাষাণপ্রতিমার ন্যায় অবিচল। সে মহামায়াকে শয্যায় শায়িত করিয়া মুখে চোখে জল দিতে লাগিল।

মহামায়া একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিল, "তাঁর পদধূলি দাও, মরিবার আগে দাও দিদি, আমি সুখে মরি।"

যোগমায়া মুমূর্ষু রামদয়ালের পদধূলি আনিয়া তাহার মাথায় দি

মুমূর্ষু জিজ্ঞাসা করিল, "কি ?—কে ?"

মহামায়ার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল, নয়নদ্বয় অন্ধকারে অ তেছিল। ইঙ্গিতে বুঝাইল, রামদয়ালের শয্যার কাছে লইয়া যাও।

যোগমায়া তাহার শয্যা আরও নিকটে টানিয়া আনিল,—মুমূর্ষুকে —"চিনিতে পার ? মহামায়া—"

রোগী একবার চাহিয়া দেখিল, তাহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। হস্ত প্রসারিত করিল। যোগমায়া মহামায়ার শীতল হাতখানি লইয়া মুমূ শীতল হস্তে সমর্পণ করিল। উভয়ে উভয়ের হাত ধরিয়া অনন্ত প যাত্রা করিল।

তাহার পর বহুকাল সেই চটীর পথের ধারে একটা পাগলী বেড়াই তাহার মুখে আর অন্য কথা ছিল না, যাত্রীর দল সবিস্ময়ে শুনিত,—পাগ বিড় বিড় করিয়া বকিতেছে, "বড় সুখ! বড় সুখ!"

আকবর ও সমাজ।

ভারতে পাঠান বিজেতৃগণ রণজয়ী ও করগ্রাহী রাজা ছিলেন। নিজের শাসনপ্রভাব অক্ষুণ্ণ থাকিলে, যথারীতি রাজকর আদায় হইলেই তাঁহারা শান্ত থাকিতেন। দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে, হিন্দু সমাজ-শাসনপদ্ধতির পরিবর্ত্তন করিতে তাঁহারা কখনই প্রয়াসী হন নাই। তবে পৌত্তলিক ও কাফেরগণকে সত্য মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করা, দেবমন্দির ও বৌদ্ধবিহার ভাঙ্গিয়া মস্‌জিদে পরিণত করা মুসলমান সাধারণের ধর্ম্ম্য, কেবল রাজধর্ম্ম্যই নহে; এই হিসাবে যাহা কিছু উৎপাত মধ্যে মধ্যে হিন্দু সমাজে হইয়াছে বটে। তজ্জন্য হিন্দু সমাজশরীর অবসন্ন হয় নাই,—যখন যে স্থানে অত্যাচার হইয়াছে, যখন যে সময়ে অত্যাচার হইয়াছে, তখন সেই স্থানের ও সেই সময়ের লোকেই অল্পবিস্তর নির্য্যাতন ভোগ করিয়াছে। সামাজিক ব্যবস্থা, সামাজিক ধারণা ও সামাজিক শাসনপদ্ধতি অক্ষুণ্ণ ও অটুট থাকিত। বরং এই প্রকারের সাময়িক

সমাজদেহে নূতন তেজ নূতন সামর্থ্য অনুস্যূত হইত ;—
ার হইয়া হিন্দু সমাজ ও ধর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্য সর্ব্বস্ব পণ করিত,
র হইতে সহস্র সহস্র রাজপুত আসিয়া গয়াধামের বিষ্ণুপাদপদ্ম
খিবার জন্য অক্লেশে গয়াক্ষেত্রকে রাজপুত-শোণিতে বিধৌত করিয়া
। যেমন আঘাত, তেমনি প্রতিঘাত ; যেমন প্রতিরোধ, তেমনি
; যেমন নিপীড়ন, তেমনি সংক্রমণ। ফলে পাঠানগণের এমন সকল
চারে হিন্দু-সমাজদেহে নূতন বল, নূতন সাহস, নূতন উদ্যম, নবীন
াস ফুটিয়া উঠিয়াছিল। কাজেই চারি শত বৎসরব্যাপী পাঠান অত্যাচারেও
সমাজ অটুট অবস্থায় ছিল। যাহারা মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিত, কেবল
ারাই হিন্দুসমাজের পক্ষে নষ্ট হইত ; যাহারা হিন্দুসমাজে থাকিত, হিন্দু
য়া পরিচয় দিতে সাহসী হইত, তাহারা খাঁটি হিন্দুই থাকিত ; সুতরাং
জদেহ অক্ষত, অটুষ্ট অবস্থায় ছিল। বিশেষতঃ, এমন বিপ্লবের সময়ে
াজে পরিবর্ত্তন সম্ভবে না, সমাজপতি মাণ্ডলিকগণও সমাজে কোন অভিনব
তি বা পদ্ধতির প্রচলন করিতে সাহসীও হন না। কারণ, এমন বিপ্লবের
ময়ে আত্মরক্ষাই প্রধান ও একমাত্র চিন্তনীয় বিষয় হয় ; সমাজের সকল
শক্তিই সংহত ও সংযত হইয়া সমাজরক্ষাব্যাপারে যেন কেন্দ্রীকৃত হইয়া থাকে। পাঠান উৎপাতের চারি শত বৎসরকাল হিন্দুসমাজকে কেবল আত্মরক্ষাই করিতে হইয়াছে। তখনও হিন্দুর ধমনীতে উষ্ণশোণিত প্রবাহিত হইত, তখনও হিন্দুর দক্ষিণমুষ্টিতে তরবারী, তখনও হিন্দু প্রসারিত করযুগল দ্বারা তস্‌লিম কুর্নিস্ করিতে শিখে নাই ; তাই, সেই সময়ে সমাজ-রক্ষা করিবার জন্য,দেবতা ও দেবালয় রক্ষা করিবার জন্য সতী ও সতীত্ব রক্ষা করিবার জন্য ভারতের হিন্দু নিজের হৃৎপিণ্ড বাহির করিয়া নিজেই বলিদান করিয়াছিল। এমন অবস্থায় কি সমাজে পরিবর্ত্তন সম্ভবে ? কর্ম্মময় জগতে কর্ম্মের পারম্পর্য্যের ব্যাঘাত ঘটিলেই পরিবর্ত্তন হয়, প্রবাহবেগ বাঁকিয়া ঘুরিয়া অন্য দিকে ছুটিয়া যায়। পাঠানগণের শাসনকালে সে অবসর আসে নাই, সে অবসাদ হয় নাই, পারম্পর্য্যের তেমন ব্যাঘাত ঘটে নাই। ফলে পৃথুরায় ও জয়চন্দ্র শাসিত পৌরাণিক হিন্দুসমাজ যতটুকু বজায় ছিল, ততটুকু ঠিক বজায় ছিল ; বিশেষ কোন ব্যতিক্রম ঘটে নাই, বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই।

আকবর সকল প্রদেশ শাসন করিয়া যখন শান্ত হইয়া রাজাসনে আসীন হইলেন, তখন তিনি দেখিলেন, দেবমন্দিরের ভগ্নাবশেষে বিনির্ম্মিত কয়েকটি

প্রকাণ্ড মস্‌জিদ, এবং হিন্দুর বহুতীর্থের দেবালয়ের দেবপুত্তলির অঙ্গহানি ব্যতীত মুসলমান শাসনের অন্য কোন স্থায়ী চিহ্ন ভারতবর্ষের অঙ্গে অঙ্কিত নাই। তিনি দেখিলেন, হিন্দুর জাতিগত শাসনপদ্ধতিই দেশে প্রচলিত; তদ্দ্বারাই সমাজ শাসিত, এবং পরিচালিত। মুসলমানের রাজশাসন কেহই মানে না, তদনুযায়ী কোন ব্যবস্থাই হয় না। হিন্দু মুসলমান রাজাকে যথা-কালে মালগুজারী পঁহুছাইয়া দেয়, কাজি মোল্লা মৌলবী মুফ্‌তী দারোগা দেখিলেই দূর হইতেই দশটা সেলাম করে, আর নির্ব্বাকভাবে অবনতমস্তকে স্বকার্য্যে চলিয়া যায়। যে স্থানে ফৌজদার কাজি দারোগা প্রভৃতি মুসলমান রাজকর্ম্মচারিগণ অবস্থিতি করেন, সেই স্থানেই একটু মুসলমানী কায়দা চলে, মফস্বলে গ্রামে হিন্দুর সমাজশাসনই প্রবলতর। আর সে শাসনই বা কি ভয়ঙ্কর, কত তীব্র! মুসলমান-সংস্পর্শে হিন্দুকে স্নান করিতে হয়, বস্ত্রপরিবর্ত্তন করিতে হয়, মুসলমানের চাকুরী করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, মুসলমানের আহার্য্যের আঘ্রাণে হিন্দুর পবিত্র কুলে ও জাতিতে অনপনেয় কলঙ্কচিহ্ন চিরদিনের জন্য অঙ্কিত থাকে। আকবর আরও দেখিলেন যে, রাজশাসনে পীড়িত হিন্দু সামান্য স্নানদান করিয়া পুনরায় সমাজক্রোড়ে স্থান পাইতেছে, আর মুসলমান রাজার আদরে মর্য্যাদাপন্ন হিন্দুকর্ম্মচারী সামাজিক পদ ও মর্য্যাদা হারাইতেছে, হিন্দুর দৃষ্টিতে হীন হইয়া থাকিতেছে।

আকবর সব দেখিলেন, সব শুনিলেন। দেখিয়া শুনিয়া বুঝিলেন যে, মুসলমান কর্ত্তৃক ভারতজয় এখনও হয় নাই। বুঝিলেন, অনবরত শোণিত-স্রাব করিয়া সমাজদেহ কথঞ্চিৎ শিথিল হইয়া পড়িয়াছে বটে, এখনও সম্পূর্ণ বশ্যতা স্বীকার করে নাই। কারণ, স্বদেশী হউক, বিদেশী হউক, বিজেতা হউন বা স্বজাতীয় রাজাই হউন, অধীন সমাজ তখনই রাজশাসন মান্য করিতেছে বলিতে হইবে, যখন রাজার শাসনে শাসিত ও দণ্ডিত ব্যক্তি সমাজের দৃষ্টিতেও দণ্ডিত ও দুষ্ট বলিয়া গ্রাহ্য হইবে। অর্থাৎ, যখন অধীন সমাজশক্তি স্বতন্ত্র রাজশক্তির অনুকূল ও সহযোগী হইবে, তখনই সেই শক্তি-ধারী রাজাকে সমাজপতি ও শাস্তা বলা যায়, দেশ ও সমাজের রক্ষক, পালক ও ধারক বলা যায়। আকবর দেখিলেন, পাঠানগণ এই হিসাবে রাজা ও বিজেতা হইতে পারেন নাই। হিন্দু সমাজের অন্তর্গত সকল জাতির ও উপজাতির মাণ্ডলিক ও সমাজপতি আছে। ব্রাহ্মণ নিজের বর্ণগত পবিত্রতা রক্ষা করেন, আচার ব্যবহার চিরানুগত থাকিতেছে কি না, সে পক্ষে দৃষ্টি

রাখেন, অন্ত্যজাতির সমাজশাসনের জন্য যথাশাস্ত্র ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। সমাজে থাকিতে হইলে যাহা যাহা অত্যাবশ্যক, সে সকলই ব্রাহ্মণ্য শাসনে শাসিত। প্রচলিতও ব্রাহ্মণানুমোদিত পদ্ধতি হইতে একটু বিচলিত হইলে অমনি আহার ব্যবহার বন্ধ, কথাবার্ত্তা বন্ধ, ধোপা নাপিত বন্ধ, একেবারেই একঘরে। ভারতের সম্রাট হইলেও মুসলমানের এমন সামর্থ্য নাই যে, সে ভীষণ সমাজশাসনকে ব্যাহত করিতে পারেন। গ্রাম মনুষ্যশূন্য হয় সেও ভাল, গ্রামশুদ্ধ লোক মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করে সেও স্বীকার, কিন্তু যতদিন গ্রামে হিন্দু সমাজ থাকিবে, ততদিন সে সমাজশাসন অতি ভীষণ, অতি তীব্র। কুশলী আকবর হিন্দুসমাজশাসক হইবার পক্ষে, বিজেতার শাসনচক্রের নিষ্পেষণে হিন্দুসমাজকে চূর্ণ ধূলিসাৎ করিবার পক্ষে এক চমৎকার উপায় অবলম্বন করিলেন। তিনি বলিলেন, মুসলমান রাজা দণ্ডধারী ও করগ্রাহী হইলেও, রাজা শান্তিরক্ষক, প্রজাপালক ও সমাজপতি। গ্রাম্য পঞ্চায়ত গ্রামের শান্তিরক্ষা করেন বটে, কিন্তু সম্রাট কখনই পঞ্চায়তের ক্ষমতা স্বীকার করেন নাই। অতঃপর গ্রামের পাটেল বা মোড়লকে ফৌজদারের নিকট হইতে ছাড়পত্র গ্রহণ করিতে হইবে। মালগুজারী আদায় করিবার জন্য প্রত্যেকগ্রামে যেমন একজন পাটোয়ারী থাকে, তেমনি একজন চৌকীদার থাকিবে। ফৌজদারের নিকট হইতে চৌকীদারী পরোয়ানা লইতে হইবে। প্রত্যেক পরগণায় এক জন করিয়া কাজি নিযুক্ত থাকিবে। কাজি সাহেব গ্রামের প্রধান ব্যক্তিকে বা জাতিবিশেষের প্রধান ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়া বিচার করিবেন। গ্রাম্যব্যবস্থানুকূল দণ্ড হওয়া চাই। চোরকে গারদে রাখিতে হইলে, প্রথমে দেখিতে হইবে, চোরের নিবাস কোন গ্রামে, সে গ্রামের জমিদার বা ঠিকাদার কে, চোর কোন জাতীয়, সে জাতির প্রধান কে। এই সকল সমাচার ঠিক জ্ঞাত হইলে, প্রথমে চোরকে জাতিচ্যুত করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে, পরে গারদে রাখিবার হুকুম জারি হইবে। প্রায়ই সামান্য বিচারকার্য্য জমিদার, তালুকদার বা গ্রাম্য পঞ্চায়ত দ্বারাই নিষ্পন্ন হইত। ফৌজদার সাহেব সরকারের পক্ষ হইতে একটা অনুমতিপত্র লিখিয়া পাঠাইয়া দিতেন। যে জমিদার বা পঞ্চায়তের উপর এই প্রকারের পত্র জারি হইত, তাহাদের একটু হিসাব করিয়া একটু অগ্রপশ্চাৎ ভাবিয়া কার্য্য করিতে

এই সময় হইতেই পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইল; ভাষার পরিবর্ত্তন, আচারব্যবহারে পরিবর্ত্তন, বেশবিন্যাসের পরিবর্ত্তন, ধর্ম্মপদ্ধতিরও কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন আরব্ধ হইল। বিজিতের পক্ষে পরিবর্ত্তনই বিনাশের সূচক। কারণ এ ক্ষেত্রে পরিবর্ত্তন অর্থে বিজেতার সর্ব্বানুকরণ;—বিজেতার আকারে আকারিত হইয়া, তদ্ভাবাপন্ন হইয়া তন্ময়ত্বপ্রাপ্তি। বিজেতার পক্ষে ইহাই বাঞ্ছনীয়; তাই মহামতি আকবর আকিঞ্চন করিয়া, বিজেতার দর্প, গর্ব্ব, দম্ভের উচ্চাসন ত্যাগ করিয়া বিজিতের সহিত মিলিয়া মিশিয়া এক হইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার সে চেষ্টা ফলবতী হইয়াছিল।

হিন্দুকে শান্ত করিবার জন্য আকবর নিজ অধিকারমধ্যে গোহত্যা বন্ধ করিয়া দিলেন, নিজে নিরামিষাশী হইলেন। তাঁহার জন্মমাসে, জন্মতিথিতে, রাজ্যের মধ্যে মাংসভোজন নিষিদ্ধ ছিল। হত্যাকারীর প্রাণদণ্ডাজ্ঞা রহিত হইয়া গেল। আকবর বলিলেন, ভগবানের দত্ত মনুষ্যজীবন মনুষ্যে কোন মতেই নষ্ট করিবার অধিকারী নহে। রাজা ভগবানের গোলাম-রূপে রাজ্য-শাসন ও প্রজাপালন করিবেন। ঈশ্বরদত্ত প্রাণ ঈশ্বরের দাসানুদাস রাজা কখনই নষ্ট করিতে পারেন না। বিশেষ, মানুষ নরহত্যা করে উন্মত্তাবস্থায়, অথবা রণক্ষেত্রে। পাগল শয়তানস্পৃষ্ট; পাগলকে দণ্ড দিলে রাজার হস্ত কলঙ্কিত হইবে। আর রণক্ষেত্রে ঈশ্বরের আদেশপালনের জন্যই মানুষ মানুষকে মারে ও মরে; সে ক্ষেত্রে রাজা শান্তিরক্ষক হইয়া অধিকার বিস্তৃত করিতে পারেন না। সুতরাং হত্যাকারীকে দণ্ড দিবার উদ্দেশ্যে তাহার প্রাণদণ্ডাজ্ঞা ধর্ম্মাধিকরণের ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্য। এই যুক্তিবলে আকবরের জীবিতকাল পর্য্যন্ত মোগলরাজ্যে ফাঁসি শূল প্রভৃতি নৃশংস দণ্ডের ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল না। হিন্দু মুসলমানে প্রায়ই দাঙ্গা হয় বলিয়া আকবর আদেশ করিয়াছিলেন যে, এক ঘাটে হিন্দু ও মুসলমান স্নান করিতে পাইবে না, স্ত্রী ও পুরুষ একঘাটে স্নান করিতে পাইবে না। বারাঙ্গনাগণকে গ্রাম বা নগরের বাহিরে থাকিতে হইবে। তাহারা হাবভাব করিয়া প্রকাশ্য রাজপথে যাতায়াত করিতে পারিবে না; প্রদোষকালে বেশবিন্যাস করিয়া উন্মুক্ত বাতায়ন-পথে বসিয়া লোকলোচনের গোচরীভূতা থাকিতে পাইবে না। স্ত্রীজাতি অশ্বারোহণে প্রকাশ্য রাজপথে গমনাগমন করিতে পাইবে না। মদোন্মত্ত সুরাপায়ীকে রাজপথে দেখিতে পাইলে কোটাল অবিলম্বে কোড়া মারিয়া তাহাকে শাসন করিবে। পরদারাভিমর্ষক লম্পটের প্রতি বড়ই ভীষণ

ণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। অপরাধ প্রমাণীকৃত হইলে লম্পটের পুরুষত্ব নষ্ট করা হইত, তাহাকে খোজা করা হইত। ধনী বা বিলাসী যুবক বারনারী সঙ্গে লইয়া প্রকাশ্য রাজপথে যাইতে পাইতেন না। কোটাল দেখিলেই তাহাদের বন্দী করিয়া লইয়া যাইত। আকবরের সময়ে আমাদের দেশে ঘোড়ার গাড়ীর প্রচলন ছিল না, বেরুষ ফীটনের আয়েস ছিল না। বিলাসের যান ছিল কেবল তরণী; সুতরাং পথে ঘাটে তেমন অত্যাচার ছিল না। প্রকাশ্য-ভাবে বারাঙ্গনার নৃত্যগীত কোনও ভদ্রগৃহে হইতে পারিত না। নৃত্যগীত দেখিতে ও শুনিতে হইলে দেবালয়ে দেবদাসীগণের পর্ব্বাহে নৃত্যগীত হইত, অথবা নবাবের দরবারে নৃত্যগীত হইত, তাহাই দেখিয়া শুনিয়া সে সাধ মিটাইতে হইত। কোন ক্রিয়োপলক্ষে নৃত্যগীত করিতে হইলে তাহার জন্য কোটালের অনুমতি লইতে হইত। আর অর্থের স্বাচ্ছল্য থাকিলে বৃক্ষ-বাটিকায় বা তরণীবক্ষে নৃত্যগীত দেখিলে শুনিলে কাহারও আপত্তি থাকিত না।

হিন্দু সমাজকে করায়ত্ত করিবার জন্য আকবর আর একটি সুন্দর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। উচ্চবংশের দুঃস্থ পরিবারবর্গের ভরণপোষণের জন্য সরকার হইতে অর্থব্যয় করা হইত; উচ্চবংশের নাবালকগণ বয়স্ক হইলে সেনাবিভাগে তাহাদের চাকুরী দেওয়া হইত, তাহাদের যোতজমি রক্ষা করিবার জন্য সরকার হইতে খাস্ বন্দোবস্ত হইত। এক কথায়, তিনি একটি মুসলমানী ঢঙ্গের Wards department খুলিয়াছিলেন। ইহার প্রভাবে আকবর হিন্দুগণের নিকট বিশেষ সম্মানিত হইয়াছিলেন। ষোড়শ বৎসর বয়স হইতে পঞ্চাশ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত, কি হিন্দু কি মুসলমান, সকল অধিবাসীকেই সরকারী সেনাবিভাগে কিছু কালের জন্য কার্য্য করিতে হইত। কেবল অব্যাহতি পাইয়াছিলেন যজনযাজনশীল ব্রাহ্মণগণ ও হাফেজ এবং মোল্লাগণ। উত্তরাধি-কারস্বত্ব ও দায়ভাগ ব্যাপারে হিন্দুগণ ব্যবস্থাপক পণ্ডিতসকলের মতানুযায়ী পরিচালিত হইতেন, মুসলমানগণ মোল্লা ও উলেমা কর্ত্তৃক শাসিত হইতেন। এ বিষয়ে সরকার কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করিতেন না। বড় জায়গীরদারকে সনন্দ বা ফর্মান দিবার সময়ে বাদশাহী দেওয়ান লিখিয়া দিতেন যে, বাদশার অনুমতিক্রমে তুমি তোমার সমাজ ও ধর্ম্মের আদেশ অনুসারে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিবে। সনন্দে এই প্রকারের হুকুমনামা লেখা না থাকিলে, কোন জায়গীরদার নিজ অধিকারমধ্যে শাসনকর্ত্তার কার্য্য করিলে

অনেককে জায়গীরচ্যুত করা হইত। এক কথায়, আকবর ধীরে ধীরে হিন্দুসমাজের সকল শক্তি ও প্রভাব নিজেই কৌশলে হরণ করিয়া লইয়াছিলেন। হিন্দুর দেশে, হিন্দুর সমাজে, হিন্দুর হৃদয়ে মোগল সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন।

বিধবা।

"দেবী কি মানবী উনি ?" কাহারে সুধাই রে ?
এ হেন পুণ্যের ছবি বিশ্বমাঝে নাই রে !
শুভ্র-পুষ্প-বর্ণ বস্ত্র শ্রীঅঙ্গে জড়ানো !
চারিধারে মহিমার কিরণ ছড়ানো !
নীলোৎপল দুটি আঁখি করে ঢল ঢল
অশ্রুজলে , দ্রব হয়ে হৃদয় তরল
বহে সদা পর-দুঃখ করিতে মোচন !
উৎসর্গ পরার্থ-ব্রতে সারাটি জীবন !
শুভ্র দৃষ্টি, শুভ্র হাসি, আনত বদন,
যেন কোন দেব-কন্যা তপসে মগন !
শিবপূজা, শিবধ্যান, শিবভক্তি, শিব-জ্ঞান,
নিরখি, আনন্দময়, পুণ্যময় হই রে !
ভারতে বিধবা-নারী তপস্বিনী অই রে !

২

প্রশান্ত ললাট ! নাহি সিন্দুরের ছটা—
তবু যেন ঝল্ ঝল্ !—প্রভার কি ঘটা !
ঊষার সীমন্তদেশে শুক্রতারকাটি
লাজে সে গো গেছে সরি, হেরি পরিপাটি
মুখ-বালার্কের অই মহিমা-কিরণ !

শ্রীঅঙ্গেতে হার, কাঞ্চী, বলয়, কঙ্কণ
নাহি আর ; তারা যেন কিছু দিন থাকি,
পবিত্র দেহের অই রেণুকণা মাখি,
হয়ে গেছে সুপবিত্র ! হইয়ে উদাসী
নির্জ্জন আঁধারে এবে তারাও সন্ন্যাসী !
দেব দ্বিজ গুরুজনে প্রাণ-মন-সমর্পণে
পূজিছেন !—হেরে ওঁরে পুণ্যময় হই রে,
ভারতে বিধবা-নারী তপস্বিনী অই রে !

৩

তাম্বূলে বিরাগ সদা, বিলাসে অরুচি;
মূর্ত্তিমতী মন্দাকিনী, গঙ্গাসমা শুচি!
বিশুদ্ধ সংযম-ব্রতে আলু থালু বেশ ;
ফণী বেণী নাই ; তাহে অভিলাষলেশ
নাহি আর ! কেশজাল, ভুলি শোক-জ্বালা
কাঁধে, পৃষ্ঠে শুয়েছে লীলায়—নাগ-বালা,
শাপান্তে সাপিনী-বেশ করিয়া মোচন,
আনন্দে পেয়েছে যেন শান্তিনিকেতন !
সারাদিন বধূ-পুত্র অতিথি-পালন !
দিনান্তে তণ্ডুল দুটি আনন্দে ভোজন !
রুগ্ন, ভগ্ন, গৃহ-ছাড়া, তারে জননীর বাড়া
কত যত্ন ! হেরি ওঁরে পুণ্যময় হই রে।
ভারতে বিধবা-নারী তপস্বিনী অই রে।

৪

জ্ঞানময়ী ভক্তিময়ী ! তপো-ব্রতে ব্রতী
কপিল দেবের মাতা যেন দেবহূতি !
সত্যব্রতে মৃত্যু তুচ্ছ !—সত্যে ক্রোড়ে লয়ে
সংসার-অরণ্য-মাঝে সাহসে নির্ভয়ে
বসিয়া আছেন সাধ্বী ! করি প্রাণপণ

তরাসে শমন-দূত যায় পলাইয়া ;—
মহাকাল ধীরে আসি চাহিয়া চাহিয়া
বিস্ময়-সাগরে মগ্ন ! কহেন গোসাঞি,—
"আমার কি সাধ্য সতি, সত্যে লয়ে যাই।"
সত্যের হইল জয়, ওই শোন উচ্চ হয়
শঙ্খধ্বনি !—হেরি ওঁরে পুণ্যবন্ত হই রে
ভারতে বিধবা-নারী তপস্বিনী অই রে !

৫

হাস্যময়ী, দীপ্তিময়ী, অরুন্ধতীসমা,
মূর্ত্তিময়ী প্রভা যেন, দেবী নিরুপমা,
অন্নপূর্ণা হাসি হাসি সবারে আহার
দেন গো, অক্ষয় তবু লক্ষ্মীর ভাণ্ডার !
একাদশীব্রতদিনে শুষ্ক শীর্ণ দেহ –
তবু আহা ক্ষীণহস্তে (মূর্ত্তিময় স্নেহ !)
হাতা ধরি পরমান্ন ঢালিছেন পাতে
কাঙ্গালের !—এত যত্ন দরিদ্র অনাথে !
কুপুত্র যদিও হয় কুমাতা কখন
হয় না মা, অপরাধ কোরো গো মার্জ্জন
করে থাকি দোষ যদি আমি পুত্র হীনমতি।
কর্ম্মময়ি ! কর্ম্মফলে নাহিক কামনা !
ভারতে বিধবা তুমি অপূর্ব্ব ললনা !

পৃথিবী।

তোমার ও শ্যাম মুখ, হে ধরা সুন্দরি !
নিরখি ফিরাতে কভু নারি এ নয়ন ;—
হাসে পত্রময়ী লতা, ঘন শ্যাম বন ;
তুলিছে সুনীল সিন্ধু বিলোল লহরী!

কি চারু মেখলারূপে শোভে মালাকারে,
গিরির উপরে গিরি কামরূপ ধরি ;
দুলিছে লম্বিত বেণী নব-ফুল-ভারে ;
শ্রীঅঙ্গ রঞ্জিছে মিলি দিবস শর্ব্বরী !
হাতে হাতে ধরি ষড় ঋতু পরস্পরে—
তোমারে ঘেরিয়ে, রাণি ! করিছে নর্ত্তন ;
বন্দী সদা গ্রহগণ গগনে বিহরে ;
বৈতালিক-রূপে পিক করিছে কূজন।
শুধু মর্ত্ত্য-জীব-রশ্মি নিত্য নিভে যায়,
লয়ে শেষ-অশ্রু কোন্ সৌন্দর্য্যে মিলায় ?

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

ভারতী।—পৌষ। "কবির পরিচয়" একটি সুদীর্ঘ পয়ার। ভাষার ভারে অত্যন্ত ক্লিষ্ট, ভাবের দৈন্যে অত্যন্ত লঘু। "কজ্জল অঞ্চল" প্রভৃতি উদ্ভট উপমায় চিত্ত ব্যাকুল হউক, তবু বুঝা যায়। কিন্তু

"মেরুদণ্ড সম
আদিভূতা প্রকৃতির, অকুণ্ঠ অনম।"

নিতান্ত অসহ্য। "আচিরনবীন" শব্দের অর্থ কি ? যতদিন এই নবীন কালিদাসের মল্লিনাথ আবির্ভূত না হইতেছেন, তত দিন পাঠকের কাব্যরসপিপাসা অতৃপ্ত থাকিবেই। এই সকল নকলনবীশ রবীন্দ্রনাথের ন্যায় প্রতিভাশালী কবির অনুকরণে সংস্কৃতভাষালক্ষ্মীর মণিরত্ন লইয়া কন্দুকক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইতে অণুমাত্র লজ্জিত বা সঙ্কুচিত হন না। প্রাংশুলভ্যে লে লুব্ধ হইলে বামন যে উপহাসাস্পদ হয়, কবির এই অমূল্য উপদেশ বিস্মৃত হইয়া তাঁহারা ছিমারা কেরাণীর মত কেবল মাছি মারেন। মাছিমারা কেরাণীর নকলনিপুণতা যতই ংসনীয় হউক, কবিতার মানসরাজ্যে তাহার স্থান নাই। "কবির পরিচয়ে" লেখকের ট ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি যদি নকলনবীশী ও সাধুভাষা-হত্যার লোভ ণ করিয়া স্বতন্ত্র পথের পথিক হইবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তাঁহার ক্ষমতা কালে শিত হইতে পারে। "নিষ্কলঙ্কা" একটি আষাঢ়ে গল্প। ইনিও একজন নকলনবীশ,

প্রেমবিলাস গ্রন্থ।

নবদ্বীপে বাস বিষ্ণুপ্রিয়া শাখা জানি
বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণী তাহার ভগিনী ॥”

শ্রীমহাপ্রভুর বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর সহিত উদ্বাহকার্য্য সম্পন্ন হইবার অল্পকা পরেই শ্রীবাসালয়ে মহাপ্রভুর মহাপ্রকাশ ও মহাভিষেক হয়। মহাপ্রকাশের সময় ঠাকুরাণীর বয়স ৮।১০ বৎসরের অধিক ছিল না। পাশ্চাত্য-বৈদিক-সমাজে পূর্ব্বাপরই অতি অল্পবয়সে কন্যাদানের ব্যবস্থা আছে। বঙ্গদেশের বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ ক্রিয়ানিষ্ঠ ছিলেন ও প্রাণপণে শাস্ত্রবিধির পালন করিতেন। যখন দশ বৎসরের ঊর্দ্ধবয়সে কন্যার বিবাহ দেওয়া শাস্ত্রনিষিদ্ধ হইয়াছে, তখন বৈদিকসমাজের শিরোমণি সম্ভ্রান্ত রাজপণ্ডিত সনাতন মিশ্র স্বয়ং শাস্ত্রীয় বিধির উল্লঙ্ঘন করিয়াছিলেন, ইহা মনে করিতে পারা যায় না। সম্ভবতঃ মহাপ্রভুও শাস্ত্রীয় অনুশাসনের লঙ্ঘন করেন নাই। এমন অবস্থায় মহাপ্রভুর মহাভিষেক ও মহাপ্রকাশের সময় ঠাকুরাণীর কনিষ্ঠ সহোদর যাদবাচার্য্য অনুপনীত অল্পবয়স্ক বালক ছিলেন। তৎকনিষ্ঠ মাধবাচার্য্যের তখন হয় ত জন্মই হয় নাই। হইয়া থাকিলেও তিনি দুগ্ধপোষ্য শিশু ছিলেন।

... লিখিত ... প্রমাণের আধার প্রেমবিলাস গ্রন্থের
...প্রিয়া ঠাকুরাণীর ভ্রাতা মাধব'
...ক।

...র মাধবা...

আরম্ভ করেন। সংস্কৃতাধ্যয়নের প্রচলিত নিয়মানুসারে পঞ্জী কবিরাজ টীকা টিপ্পনী সহিত সমগ্র ব্যাকরণ তাঁহাকে অধ্যয়ন করিতে হইয়াছিল; তৎপরে মন্বাদি স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন; তবে ত তিনি আচার্য্য উপাধি পাইয়াছিলেন? অধ্যয়নকার্য্যে তাঁহার নূনকল্পে ১৪।১৫ বৎসর লাগিয়াছিল, এরূপ অনুমান করিতে পারা যায়। সুতরাং মহাপ্রভুর মহাপ্রকাশের সময় মাধবের বয়স ২০ বৎসরের অধিক হইয়াছিল, ইহাতে সন্দেহ নাই। তাহা হইলে, বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর বয়স ত্রিংশতের উপর হয়। কিন্তু মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-আশ্রম-গ্রহণের সময় ঠাকুরাণীর বয়স চতুর্দ্দশ বৎসরের অধিক হয় নাই, ইহাই বৈষ্ণবসমাজের স্থিরসিদ্ধান্ত। অমিয়নিমাইচরিত গ্রন্থেও এই মত সমর্থিত হইয়াছে; সুতরাং ১৯ বিলাসে বর্ণিত উক্ত আখ্যায়িকাটি বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তানভিজ্ঞ কোনও ব্যক্তির স্বকপোলকল্পিত, ইহা বলিলে অন্যায় হয় না।

পাঠকমহাশয় আরও একটি কথার প্রতি লক্ষ্য করুন। মাধব যে যাদবাচার্য্যের নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাই বৈষ্ণবসমাজের প্রাণগত বিশ্বাস; তদ্বিষয়ে এই নবরচিত ঊনবিংশ বিলাসে কি লিখিত আছে দেখুন,—

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তাঁরে
সব ভক্তগণ তাঁরে
মহাপ্রভু
দীক্ষা

কিন্তু গদ্যে। তবে ইনি বক্ষ্যমাণ গল্পটিতে যে সুরুচির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা যে লেখকের নিজস্ব, এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বিস্তৃত পৃথিবীর কি সমাজের সর্ব্বাংশই সাহিত্যের বিষয়ীভূত হইতে পারে, কিন্তু যে সব চরিত্রে সব ঘটনার বর্ণনায় পাঠকের চিরলালিত সংস্কার একবারে আহত সঙ্কুচিত হইয়া ঘটনা লইয়া সাহিত্যের সৃষ্টি করিতে গেলে তদনুরূপ সামর্থ্য আবশ্যক। এই গ ঘটনায় পাঠকের হৃদয়ে যে গ্লানির উদয় হয়, তাহার বিনিময়ে লেখক আর কি য়াছেন? কি জন্য এই বিসদৃশ ঘটনার অবতারণা, গল্প পড়িয়া তাহা ত খুঁজি যায় না। লেখক 'রিয়ালিষ্টিক' রকমে গল্পটির আরম্ভ করিয়াছেন, কিন্তু শেষকা উদ্ভট 'রোমাণ্টিক' রকমে তাহার উপসংহার করিয়াছেন যে, হাস্যসংবরণ দুরূহ হইয়া "আমলার নমুনা।" একটি সুখপাঠ্য নক্সা, কিন্তু অতিবিস্তৃত। নমুনা অল্প হয় জা কিন্তু ইনি আস্ত আমলা পিটিয়া ব্যাপারটা খুব 'বিরাট' করিয়া তুলিয়াছেন। "গুজ কৃষিজীবন" প্রবন্ধে লেখক অনেক জ্ঞাতব্য বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন। গুজরাটী বৃ ও কৃষির অনেক কথা জানা যায়। "সাবিত্রীর বধূত্ব" একটি উৎকৃষ্ট সন্দর্ভ। সকলে বিশেষতঃ হিন্দুবধূর অবশ্যপাঠ্য। "উৎকল-কাহিনী" প্রবন্ধে অনেক কথা আছে, গুছাই লিখিলে আরও সুপাঠ্য হইত। "ভারতবাসীর দয়ার পাত্রাপাত্র" প্রবন্ধটি পুরাতন কাসুন্দি আমরা উপভোগে অক্ষম। "রাজপুতানায় দুর্ভিক্ষ" প্রবন্ধের প্রতি সকলের দৃষ্টিপাত বাঞ্ছনীয়। "যাহাদের আত্মীয় স্বজন কেহ জীবিত নাই, যাহাদের আত্মীয় স্বজন তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া দূরদেশে চলিয়া গিয়াছে, অথবা যাহাদের আত্মীয় স্বজন কোনরূপে তাহাদিগকে ভরণপোষণ করিতে পারে না, এতাদৃশ বালকবালিকাগণের এ দুর্দ্দিনে কত কষ্ট, তাহা সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রই অনুভব করিতে পারেন। তাহাদের সাহায্য করাই স্বামী কল্যাণানন্দের বিশেষ লক্ষ্য। এতদ্ব্যতীত সম্ভব হইলে সাধারণকে সাহায্য করিতেও তিনি প্রস্তুত আছেন। এই কার্য্যের সহায়তার জন্য যদি কেহ কিছু দান করিতে ইচ্ছা করেন, দয়া করিয়া 'ভারতী' সম্পাদকের নিকট পাঠাইবেন, অথবা কৃষ্ণগড় অনাথালয়ে স্বামী কল্যাণানন্দের নামে পাঠাইবেন।" আশা করি, সহৃদয় পাঠকপাঠিকাগণ এই পুণ্য ব্রতের সাহায্যকল্পে মুক্তহস্ত হইবেন।

প্রয়াস।—জানুয়ারী। এই সংখ্যায় 'প্রয়াসে'র দ্বিতীয় বর্ষ আরব্ধ হইল। 'প্রয়াসে'র দ্বিতীয় বর্ষে সম্পাদক বলিতেছেন,—"নবীন লেখকদিগকে উৎসাহ দিবার জন্যই 'প্রয়াসে'র জন্ম, এবং এক বৎসরে 'প্রয়াস' ৭১ জন নবীন লেখককে উৎসাহ দিয়াছে।' "বিহারীলাল" সারদা-মঙ্গলের অমর কবি স্বর্গীয় বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর কবিত্বপ্রতিভা সমালোচনা। এখনও সমাপ্ত হয় নাই। "চন্দ্রশেখর—অনুশীলন" আর একটি সমালোচ লেখকের মতে, বঙ্কিম বাবুর চন্দ্রশেখর রোমাণ্টিক উপন্যাস; আমরা লেখকের সহিত এ হইতে পারিলাম না। প্রতাপ শৈবলিনীর সুখের জন্য প্রাণ দিয়াছিল, কিন্তু হতভাগি নীকে বিবাহ করিয়া কেন তাহার ক্ষুদ্র প্রাণটুকু গ্রহণ করিয়াছিল, লেখক সে সম্বন্ধে আলোচনা করিলে ভাল হইত। চন্দ্রশেখর প্রতিভার অমর সৃষ্টি, তাহার অনুশীলনে

। "প্রেম-ব্যাধি" নিতান্ত কাঁচা। "মারের চোটে কবিরাজ" নামক অনূদিত গল্পটির শব্দ অমার্জ্জিত। ভাষার প্রতি নবীন লেখকগণের অধিকতর অবধান প্রার্থনীয়।

।।—পৌষ। "হিমালয়কন্দরে সাধুসন্দর্শন" প্রকৃত না গল্প? চিত্তাকর্ষক। বোধ করি কখনও শেষ হইতে দেখিব না। "তুমি" কবিতাটির কোনও বিশেষত্ব লখিব, তাই ছাপাইব, লেখকগণের এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় বঙ্গসাহিত্য যায় যায়। বীণ আচার্য্য হইতে নবব্রতী তরুণ পর্য্যন্ত সকলেরই এই এক আবদার। "কৃষ্ণরাম ধকামঙ্গল" প্রবন্ধটি উল্লেখযোগ্য। প্রারম্ভে লেখক চট্টগ্রামের সাহিত্য সম্বন্ধে লিখিয়া- চট্টগ্রামের প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্য-উদ্ধার-কার্য্যে ব্রতী হইয়া অনেকগুলি প্রাচীন হস্তলিখিত আমরা হস্তগত করিতে সমর্থ হইয়াছি। হরিশ্চন্দ্রের স্বর্গারোহণ, বাণযুদ্ধ, একাদশীমাহাত্ম্য, রত, ধর্ম্মেতিহাস, মনসামঙ্গল, তুলসীচরিত্র, রাধিকামঙ্গল, সূর্য্যব্রত পাঁচালী, হরিবংশ তি ক্ষুদ্র বৃহৎ পুঁথি ছাড়া বহুতর চৌতিশাখ্য সন্দর্ভ ও প্রাচীন পদাবলী ও বারমাস্যা গত হইয়াছে। এ সকল ব্যতীত চট্টগ্রামে মুদ্রিত মুসলমান মহাকবি আলাওল ও লত কাজির গ্রন্থ সকল পাওয়া গিয়াছে। হিন্দুত্বের বহির্ভূত বিষয়েও রাশি রাশি প্রাচীন প্রকাশিত পুঁথি এখানে পাওয়া যায়। লয়লা মজনু, মুক্তল হোছন, মুছার ছওয়াল, বোগকলিন্দর, সিরাজকুলুপ প্রভৃতি। এ সকল অধিকাংশই ইস্‌লাম ধর্ম্মনীতি এবং জ্ঞানগর্ভ পরমার্থ উপদেশসম্বন্ধীয়। সকল গ্রন্থের ভাষাই প্রাচীনকালের খাঁটি বাঙ্গলা। লয়লা মজনুর মুখবন্ধে সুকবি দৌলত উজির চট্টগ্রামের এক অদ্ভুত প্রাচীন ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের নিকট যে পুঁথিখানি আছে, তাহার একখানি পাত কোথায় হারাইয়া গিয়াছে। উক্ত কবিকৃত এই গ্রন্থের অন্য একখানি নকলও সুপ্রাপ্য নহে।"

15 MAY 1900
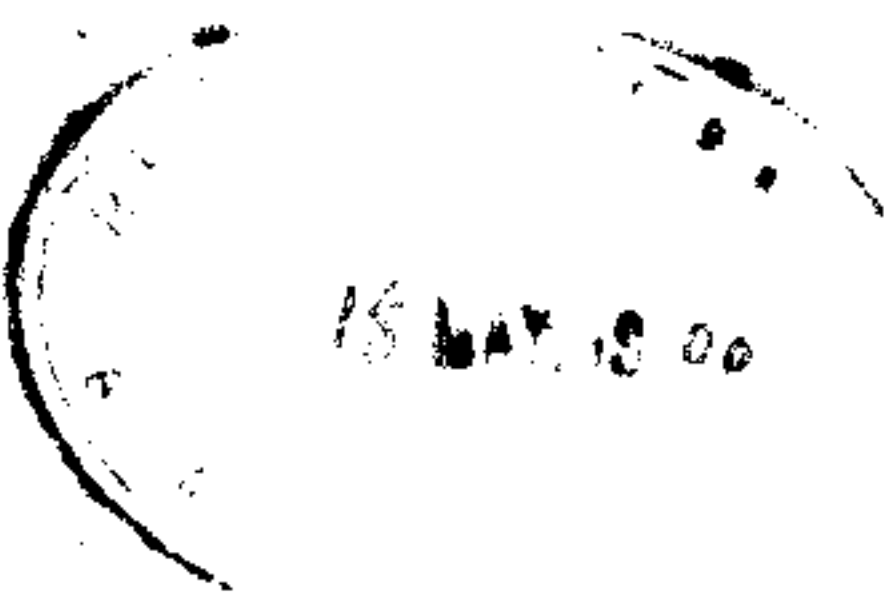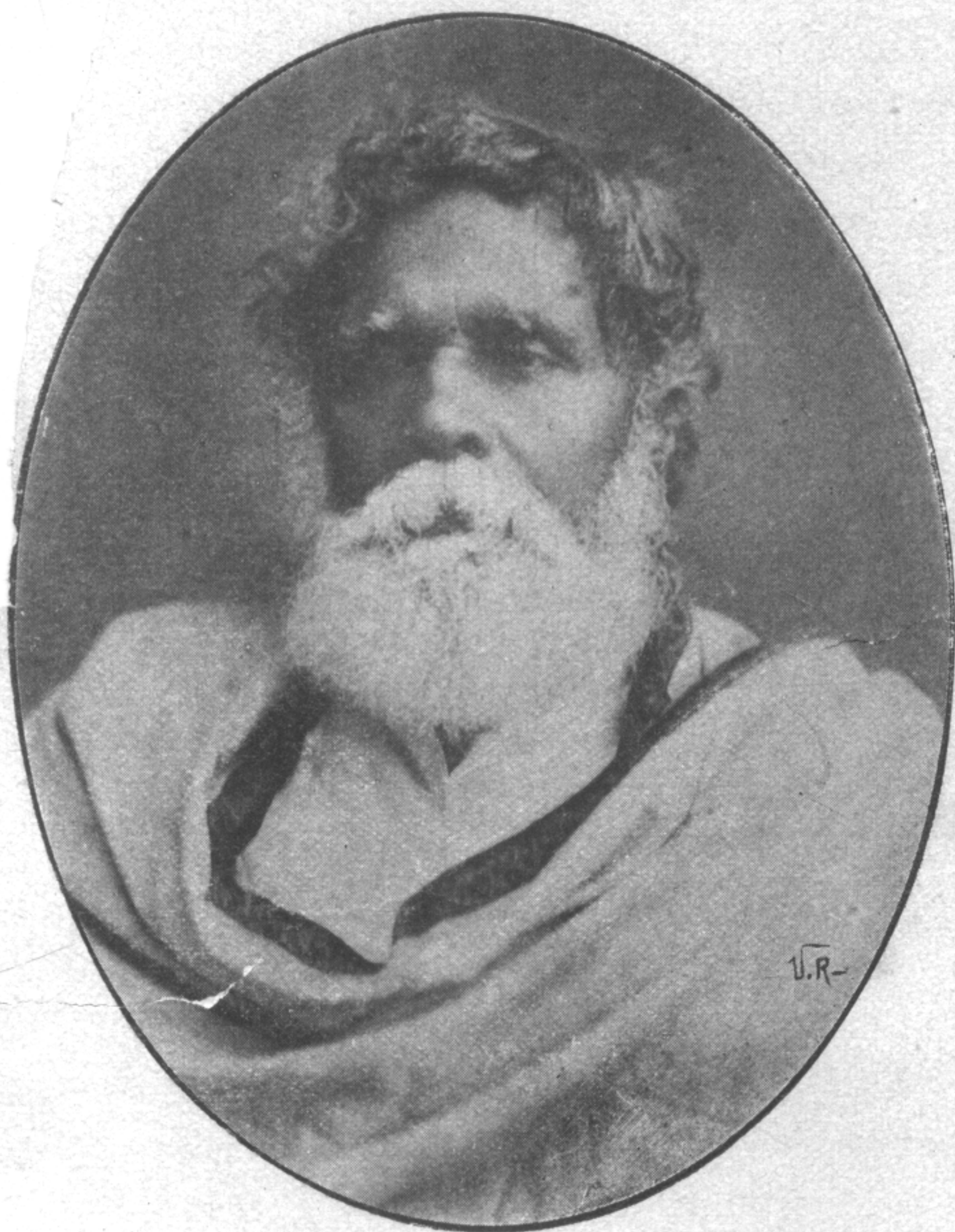
স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু ।

THE CHERRY PRESS, CALCUTTA.

RB 4757
3

Bc. 1141

চেঙ্গিস খাঁ ও তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ।

চেঙ্গিস খাঁ সুলতানকে শাস্তি দিবার জন্য বিপুল আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি চীন, তুর্কিস্থান ও তমগাজ হইতে অগণ্য সৈন্য সংগ্রহ করিয়া খারিজম সাম্রাজ্য ভূপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া ফেলিবার জন্য মহাসমারোহে যাত্রা করিলেন। (১)

চেঙ্গিস খাঁ সর্ব্বপ্রথমে সুপ্রসিদ্ধ উত্রার নগরীর প্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া তদভিমুখে ধাবিত হইলেন। মোগল সৈন্য বনসঙ্কুল দুরতিক্রম্য সুদীর্ঘ পথ বহু কষ্টে অতিবাহিত করিয়া মোগল-সীমান্ত-প্রদেশ পরিত্যাগের তিন মাস পরে শত্রুরাজ্যে উপনীত হইল। তাহাদের আগমনে সমগ্র দেশবাসী সন্ত্রাসিত হইয়া উঠিল, এবং স্বদেশরক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণ করিল। ধর্ম্মবিশ্বাসী অধিবাসিবর্গ ঈশ্বরানুগ্রহলাভ জন্য বিবিধ অনুষ্ঠান করিয়া আত্মবিসর্জ্জন করিতে লাগিল। (২) বীর্য্যশালী সৈন্যগণ পথশ্রমে কিছুমাত্র ক্লান্ত না হইয়া অমিতপরাক্রমে শত্রু-হননে প্রবৃত্ত হইল। খারিজম রাজ্যের চতুর্দ্দিকে একবারে বেড়া আগুন জ্বলিয়া উঠিল; তাহাতে অসংখ্য নরনারীর সুখ শান্তি চিরকালের জন্য ভস্মীভূত হইবার উপক্রম হইল। স্বদেশের জন্য মোসলমানগণ রণক্ষেত্রে

---

(১) Chengiz Khan issued commands so that the forces of Turkistan, Chin and Tamghaz assembled. Six hundred banners were brought out, and under each banner were one thousand horsemen, and six hundred thousand horses were assigned to the Bahadur: they call a warrior, Bahadur. To every ten horsemen three heads of tukli sheep were given with orders to dry them, and they took along with them, an iron cauldron, and a skin of water, and the host proceeded on its way.

(২) খারিজম রাজ্যের অধিবাসিগণ নার্শিহর দুর্গ অধিকৃত হইবার সময় যেরূপ ঈশ্বরবিশ্বাসের পরিচয় প্রদান করিয়াছিল, তাহা আমরা এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করিতেছি। "Three months prior to the occurrence of the capture of fortress, and their attainment of the glory of martyrdom, the whole of them, by mutual consent donned deep blue (mourning) garments, and used to repair daily to the great masjid of the fortress and would repeat the whole Kuran, and condole and mourn with each other; and, after doing all this, they used to pronounce benediction on and farewell to each other, and assume their arms, and engage in holy warfare with the infidels".

অসীম কষ্টসহিষ্ণুতা, ও শৌর্য্য বীর্য্যের একশেষ প্রদর্শন করিতে লাগিল। (১) কিন্তু এত করিয়াও তাহারা মোগলের গ্রাস হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারিল না ; তাহাদের অদৃষ্টপূর্ব্ব অত্যাচারে ও উৎপীড়নে সৌষ্ঠবশালী অমিত-ধনধান্যপূর্ণ খারিজম সাম্রাজ্য মরুভূমিতে পরিণত হইল। কিরূপে নগরের পর নগর, দেশের পর দেশ মোগলের অমানুষিক নিষ্ঠুরাচরণে ছারখার হইয়াছিল, বিস্তৃতভাবে তাহার বর্ণনা করা নিষ্প্রয়োজন। সে কাহিনীর আদ্যন্ত একই রূপ ঘটনায় পরিপূর্ণ। মোগল সৈন্য যে প্রদেশে পদার্পণ করিয়াছে, তাহারই অধিবাসিগণ আবালবৃদ্ধবনিতানির্ব্বিশেষে তরবারিমুখে নিক্ষিপ্ত, যোজনব্যাপী শস্যক্ষেত্র শত্রুর তাণ্ডবে তৃণশূন্য, সুদৃশ্য প্রাসাদমালাশোভিত সমৃদ্ধিশালী নগরসমূহ অগ্নিসংযোগে ভস্মীভূত ও অসংখ্য নরনারী দাসবিপণিতে বিক্রীত হইবার জন্য অবরুদ্ধ হইত। (২) কথিত আছে যে, মোগলের হস্তে

---

(১) মোগলগণ আশইয়ার দুর্গ অবরোধ করিলে দুর্গবাসিগণ সার্দ্ধ এক বৎসরের অধিক কাল পর্য্যন্ত আত্মরক্ষা করিয়াছিল। এই সময় খাদ্যাভাবে তাহাদের দুর্দ্দশার একশেষ হইয়াছিল। তাহারা শত্রুহস্তে আত্মসমর্পণ করা অপেক্ষা তাদৃশ কষ্ট সহ্য করাও বাঞ্ছনীয় বলিয়া বিবেচনা করিত। ক্রমশঃ তাহাদের অবস্থা এত দূর শোচনীয় হইয়াছিল যে, তাহারা মৃত অথবা নিহত ব্যক্তির মাংস দ্বারা উদরপূর্ত্তি করিতে বাধ্য হয়। এই সময় দুর্গ-মধ্যে একজন স্ত্রীলোক বাস করিত। তাহার মাতা ও একজন ক্রীতদাসী বর্ত্তমান ছিল। তাহারা মৃত্যুমুখে পতিত হইলে উক্ত স্ত্রীলোক তাহাদের মাংস বিক্রয়ার্থ শুষ্ক করিয়াছিল ; এই শুষ্ক মাংস বিক্রয় দ্বারা আড়াই শত স্বর্ণমুদ্রা (Gold dinirs) লাভ হইয়াছিল। সার্দ্ধবৎসরাধিক কাল গত হইলে কেবলমাত্র ত্রিশ জন দুর্গবাসী অবশিষ্ট ছিল ; তাহারা আর গত্যন্তর না দেখিয়া শত্রুহস্তে আত্মসমর্পণ করে।

(২) চেঙ্গিস খাঁ কর্ত্তৃক বিশাল ভূখণ্ড বিজন অরণ্যে পরিণত হইয়াছিল। আমরা এই প্রসঙ্গে একটি গল্পের উল্লেখ করিতেছি ; ইতিহাসবেত্তা মিনহাজ উদ্দীন গল্পটি কাজি ওয়াহিদ উদ্দীনের নিকট শুনিয়াছিলেন। এই কাজি চেঙ্গিস খাঁর অনুগ্রহভাজন ছিলেন ; এবং এই গল্পের বিষয় তাঁহাকে উপলক্ষ্য করিয়াই সংঘটিত হইয়াছিল। "When he (Chengiz Khan) enquired of me, 'will not a mighty name remain behind me (in the world through taking vengeance upon Sultan Mahamad, Kharwarazm Shah) I bowed my face to the ground, and said : 'If the Khan will promise the safety of my life I will make a remark'. He replied : 'I have promised thee its security.' I said : "A name continues to endure where there are people, but how will a name endure when the Khan's servants martyr all the people and massacre them, for who will remain to tell the tale ?"

অগণ্য মুসলমান বন্দী হওয়াতে তাহারা চেঙ্গিস খাঁর জন্যই বিশেষভাবে দ্বাদশ সহস্র কুমারী নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিল; ইহারা সৈন্যের পশ্চাতে পদব্রজে গমন করিত।

১২১৮ খ্রীষ্টাব্দে চেঙ্গিস খাঁ খারিজমাধিপতির দুর্ব্যবহারে বিচলিত হইয়া তাঁহাকে শাস্তি দিবার জন্য ট্রান্স অক্সেনিয়া প্রদেশে উপনীত হন; তত্রত্য অধিবাসিগণ সমূলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে তিনি আমু (অক্সাস্) নদী উত্তীর্ণ হইয়া বাল্কের বিরুদ্ধে আপনার ভুবনবিজয়ী তরবারি উদ্যত করেন। তদীয় তুলি খাঁ বিপুল বাহিনী সহ খোরাসানে প্রেরিত হন, এবং ইরাণ ও তু: বিজিত হইবার পর মোগল সৈন্য বাল্ক হইতে তালিকানে (তালিকান খোর সানের একটি নগর, বাল্কের পূর্ব্বাংশে অবস্থিত) পদার্পণ করে। এ স্থান হইতে চেঙ্গিস খাঁ খারিজমের শাহজাদা জেলাল উদ্দীন মঙ্গবারিকে সমূলে ধ্বংস করিবার জন্য তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া পথের উভয়পার্শ্বস্থ দেশসমূহকে মন্থন করিতে করিতে ১২২১ খ্রীষ্টাব্দে সিন্ধুনদের তটদেশে উপনীত হন।

চেঙ্গিস খাঁ খারিজম সাম্রাজ্য সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিয়া ভারতবর্ষে উপনীত হইবার সঙ্কল্প করিলেন। লক্ষ্মণাবতী ও কামরূপের পথে চীন দেশে গমন করিবার কল্পনাতেই তিনি ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। চেঙ্গিস খাঁ কোনও গুরুতর ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে ঈশ্বরের প্রত্যাদেশের প্রতীক্ষা করিতেন। এবারও তিনি ঈশ্বরের সম্মতিসূচক লক্ষণের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলেন; কিন্তু ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া যে জয়মাল্যে সুশোভিত হইতে পারিবেন, তৎসম্বন্ধে কোনও নিদর্শন প্রকটিত না হওয়াতে, তিনি আপনার অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে পারিতেছিলেন না। এ জন্য ভারতসীমান্তে চেঙ্গিস খাঁর কালবিলম্ব হইতেছিল; এমন সময় সংবাদ আসিল যে, তাঁহার দীর্ঘকাল অনুপস্থিতিনিবন্ধন সমগ্র তেঙ্গিত ও তমগাজ প্রদেশ সহ চীন রাজ্য বিদ্রোহ-পতাকা উড্ডীন করিয়া মোগলের শাসনশৃঙ্খল উন্মোচন করিতে উদ্যত হইয়াছে। চেঙ্গিস খাঁ এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া চিন্তাকুলচিত্তে পূর্ব্ব সংকল্প পরিত্যাগ করিয়া তিব্বতের পথে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তাঁহার কুসংস্কার হেতু ভারতবর্ষ অব্যাহতি লাভ করিল।

চেঙ্গিস খাঁ একাদশ বৎসর খারিজম সাম্রাজ্যের বিজয়ে লিপ্ত থাকিয়া স্বদেশাভিমুখে ফিরিয়া চলিলেন। রাজধানী হইতে যাত্রাকালে তাঁহার বয়স [প]ঞ্চষষ্টিতম বর্ষ অতিক্রম করিয়াছিল; তাঁহার সমুন্নত দেহ, বলিষ্ঠ গঠন ও

তেজোব্যঞ্জক মুখশ্রী দর্শন করিলে তাঁহাকে যুবাপুরুষ বলিয়াই ভ্রম জন্মিত কিন্তু বহুবর্ষব্যাপী যুদ্ধে নিরত থাকিয়া অবিরাম পরিশ্রমে তাঁহার লৌহ-কীলকসদৃশ সুদৃঢ় শরীরও অবশেষে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। স্বদেশ-প্রত্যাবর্ত্তনাভিলাষী বীরপুরুষ তরবারিহস্তে শনৈঃ শনৈঃ পথ অতিবাহিত করিতে লাগিলেন; কিন্তু বিধাতৃপুরুষ অন্যরূপ বিধান করিয়াছিলেন; স্বদেশে উপনীত হইবার পূর্ব্বেই অর্দ্ধপথে তিনি হঠাৎ পীড়িত হইয়া শয্যার ...য় লইলেন।

চেঙ্গিস খাঁ স্বপ্নে আপনার আসন্নমৃত্যু দর্শন করিয়া ভয়ব্যাকুলচিত্তে ...ত্রত্রয়কে (১) নিকটে আহ্বান করিলেন। তাঁহারা পিতার আহ্বানে সমবেত হইলে তিনি বলিতে লাগিলেন, "প্রাণাধিক পুত্রগণ, আমার মৃত্যুকাল উপস্থিত; ঈশ্বরের অনুগ্রহে তোমাদের জন্য সুবিশাল সাম্রাজ্য গঠিত করিয়া সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছি। আমার সাম্রাজ্য সুবিশাল, ইহার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে ভ্রমণ করিতে এক বৎসর অতিবাহিত হইয়া থাকে। তোমরা কাহাকে এই সুবিশাল সাম্রাজ্যের উপযুক্ত উত্তরাধিকারী বলিয়া বিবেচনা কর?" তাঁহারা নতজানু হইয়া উত্তর করিলেন, "আমাদের পিতা সাম্রাজ্যেশ্বর, আমরা তাঁহার ভৃত্য, তাঁহার আজ্ঞা আমাদের শিরোধার্য্য।" চেঙ্গিস খাঁ বলিলেন, "মন্ত্রি কারসার বহুদর্শী ও রাজনীতিবিশারদ; তাঁহার প্রতি আমার অগাধ বিশ্বাস, আমি তাঁহার অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করিতেছি, তাঁহার অভিমতানুসারেই উত্তরাধিকারী মনোনীত করিব।" তৎপর তিনি কারসারের মত গ্রহণ করিয়া কাবান খাঁ ও কাজুনি বাহাদুরের মধ্যে যে একরারপত্র স্বাক্ষরিত হইয়াছিল, তাহা আনয়ন করিবার জন্য আদেশ করিলেন। তদনুসারে একরার-পত্র আনীত হইলে তিনি বলিলেন, "আমি ওকতাই খাঁকে রাজসিংহাসন প্রদান করিলাম। পরস্পর সম্মিলিতভাবে কার্য্য করিবে; তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করিবে বলিয়া অঙ্গীকারবদ্ধ হইয়া একরার-পত্রে স্বাক্ষর কর। আমি চাঘাটাই, তুলি খাঁ এবং জুজি খাঁর পুত্রের জন্য পৃথক পৃথক রাজ্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলাম।" তদনন্তর তাঁহার আদেশে কারসার ও চাঘাটাই পিতাপুত্ররূপে আর একখানি একরার-পত্রে স্বাক্ষর করিলেন।

(১) চেঙ্গিস খাঁর চারি পুত্র ছিল; তন্মধ্যে জুজি খাঁ পিতার জীবদ্দশাতেই পরলোক গমন করেন।

উত্তরাধিকারিনিয়োগ সমাপ্ত হইলে, চেঙ্গিস খাঁ বলিলেন, "আমার মৃত্যু
তোমরা কেহ শোকাচ্ছন্ন হইয়া বিলাপ করিও না; পূর্ব্বনির্দ্দেশ মত ক.
ইনের অধিপতি আমার শিবিরে উপনীত হইলে তাঁহাকে নিহত করি
তাঁহার রাজ্য হস্তগত করিও; এই কার্য্য সম্পাদিত না হওয়া পর্য্যন্ত
আমার মৃত্যু সংগোপনে রক্ষা করিও।" [The ruling passion of
treachery was strong even in death.—H. G. Raverty.] এই
উপদেশবাক্য উচ্চারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার প্রাণবায়ু দেহ হইতে
বহির্গত হইয়া গেল। পুত্রগণ চেঙ্গিস খাঁর মৃতদেহ বহন করিয়া অগ্রসর
হইতে লাগিলেন, এবং তাঁহার মৃত্যুসংবাদ সংগুপ্ত রাখিবার জন্য পথিমধ্যে
যাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল, তাহাকেই শমনসদনে প্রেরণ করিয়াছিলেন।
এই ভাবে তাঁহারা গন্তব্য স্থানে উপনীত হইয়া চেঙ্গিস খাঁর মৃত্যুসংবাদ
প্রচারিত করিলেন। তৎপরে যথারীতি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদিত করিয়া তাঁহাকে
একটি বৃক্ষমূলে সমাহিত করিলেন। চেঙ্গিস খাঁ একদা মৃগয়া উপলক্ষে এই
বৃক্ষতলে উপনীত হইয়া মৃত্যুর পর তথায় তাঁহার সমাধিনির্ম্মাণের অভিলাষ
প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১২২৭ খ্রীষ্টাব্দে চেঙ্গিস খাঁ কালগ্রাসে পতিত হন।

চেঙ্গিস খাঁর জীবনের আদ্যন্ত পর্য্যালোচনা করিলে প্রতীয়মান হয় যে, তাদৃশ
অসাধারণ মনুষ্য পৃথিবীতে অতি বিরল। চেঙ্গিস খাঁ অধ্যবসায়ের অত্যুজ্জ্বল
দৃষ্টান্তস্বরূপ। তাঁহার প্রথম জীবন বিপদের ঘনঘটায় আচ্ছন্ন ছিল; কিন্তু
তিনি বিপুলবিক্রমে তরবারিহস্তে সমস্ত বিপদের মূলোচ্ছেদ করিয়া উন্নতির
চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিলেন। কিশোরবয়স্ক চেঙ্গিস খাঁ এক দুর্দ্ধর্ষ
সম্প্রদায়ের অধিনেতৃপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। এই দুর্দ্ধর্ষ সম্প্রদায় কিশোর-
বয়স্ক অধিনেতাকে সমুচিত সম্মান প্রদর্শন করা সঙ্গত মনে করিল না। তাহারা
অচিরে স্বস্বপ্রধান হইয়া উঠিল। নবীন অধিপতি বিপদসাগরে পতিত
হইলেন। সাধারণ মনুষ্য যে বয়সে ক্রীড়াকন্দুক লইয়াই সন্তুষ্ট থাকে, তিনি
সেই বয়সে সশস্ত্রভাবে রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া পর্ব্বতপ্রমাণ বাধাবিঘ্নের
অতিক্রম করিয়া স্ব-সম্প্রদায়কে বশীভূত করিয়া তরুণ বয়সেই আপনার ভাবী
অত্যুজ্জ্বল জীবনের পূর্ব্বাভাষ প্রদান করিলেন।

তার পর সুনিপুণ শিল্পীর ন্যায় চেঙ্গিস খাঁ আজীবনব্যাপী অধ্যবসায়
ও অক্লান্ত পরিশ্রমে রাজ্যের পর রাজ্য জয় করিয়া সুবিশাল সাম্রাজ্য সংগঠিত
করিলেন। (১)

---

(১) He acquired sway over all Cathay, Khotan, Northern and Southern China, the desert of Qilecaq, Saqsin (either a place near the

যদিও চেঙ্গিস খাঁ শৌর্য্য বীর্য্যের একশেষ প্রদর্শন করিয়াছেন, তথাপি তিনি জনসমাজে এক জন নৃশংস অত্যাচারিরূপেই পরিচিত হইয়া আসিতেছেন। বস্তুতঃ তাঁহার স্থায় প্রবল মনুষ্যশক্র আর কখনও পৃথিবীতে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছে কি না, সন্দেহের স্থল। চেঙ্গিস খাঁ প্রত্যেক যুদ্ধক্ষেত্রেই অত্যন্ত ক্রূরতা প্রদর্শন করিয়াছেন, এবং তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যেই মানবজীবনের প্রতি কঠোর অবজ্ঞা ও তাহাদের হৃদয়বিদারক যন্ত্রণায় অবিচলিত উপেক্ষা জাজ্বল্যমান হইয়া উঠিত; তাদৃশ কঠোর অবজ্ঞা ও অবিচলিত তাচ্ছীল্যর দ্বিতীয় প্রমাণ সমগ্র ইতিহাসে একান্ত দুর্লভ। মোগলাধিপতি যে সকল অনুর্ব্বর প্রদেশের দুর্দ্ধর্ষ জাতিকে বশীভূত করেন, তাহাদিগকেই পরদেশ-আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিবার জন্য সৈন্যশ্রেণীভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার বিজিত রাজ্য ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া উঠিলে তিনি অনুর্ব্বর দেশের পরিবর্ত্তে শস্যরাজিসুশোভিত জনপদ-সমূহের প্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করেন। চেঙ্গিস খাঁ এই সকল দেশে উপনীত হইয়া বালবৃদ্ধস্ত্রীপুরুষনির্ব্বিশেষে অধিবাসীদিগকে নিহত করিয়া রক্তস্রোত প্রবাহিত করিতেন; তাঁহার অমানুষিক নিষ্ঠুরাচরণে জনাকীর্ণ সমৃদ্ধিশালী নগরসমূহ বিজন অরণ্যে পরিণত হইত। চেঙ্গিস খাঁ এক দেশ মথিত করিয়া তাহার পরবর্ত্তী দেশে উপনীত হইতেন; পূর্ব্ববর্ত্তী দেশের এক জন অধিবাসীও যেন জীবিত থাকিয়া বিজয়ী সৈন্যের পশ্চাতে উত্থিত হইয়া তাহাদিগকে বিন্দুমাত্র কষ্ট দিতে না পারে, তজ্জন্য তিনি নির্ব্বিকারচিত্তে বিজিত শত্রু-মাত্রকেই নিহত করিতেন। এই সকল অমানুষিক হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে বধ্য ব্যক্তিদিগকে অশেষ যন্ত্রণা প্রদান করা হইত, এবং আবাল-বৃদ্ধবনিতা কেহই তাঁহার হস্তে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিত না। চেঙ্গিস খাঁর এইরূপ বর্ব্বরোচিত নিষ্ঠুরাচরণে স্বদেশ বিদেশের সর্ব্বত্র ভয় ও বিষাদের গভীরচ্ছায়া পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

Caspian or a country of Turkistan), Bulgaria, As (Crimea or its neighbourhood), Russia, Alan (the country between the Caspian and the Black sea) &c. When he had finished the affairs of Transoxiana he * * turned his world opening reins to-wards Balkh. He despatched * * a large army to Khursan and conquering Iran and Turan he came from Balkh to Taliqan (a town in Khursan). *Akbar nama.* This (Bulgaria) *is not therefore European Bulgaria to the west of the Black sea but* great Bulgaria on the Volga. *H. Beveridge.*

সময় মোগলিস্থান অজ্ঞানান্ধকারে পরিপূর্ণ ছিল, এবং তাহাদের অপরিস্ফুট ছিল। এ জন্য তাহারা বিজিত দেশে কোন প্রকার ধর্ম্মমত বা জ্ঞানালোক আনয়ন করে নাই; অবিশ্রান্ত নরশোণিত-বিনাশকার্য্যেই তাহাদের সমস্ত শক্তি পর্য্যবসিত হইয়াছিল; বিজিত হের একমাত্র শ্মশানদৃশ্যই মোগলবিজয়ের পরিচয় প্রদান করিত।

৩।

স খাঁ মৃত্যুর পূর্ব্বে আপনার সুবিশাল সাম্রাজ্য পুত্রচতুষ্টয়ের মধ্যে ক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। তদনুসারে জ্যেষ্ঠপুত্র জুজি কিপচাকের সমতল প্রাপ্ত হন। কিন্তু পিতার জীবদ্দশাতেই তিনি কালগ্রাসে পতিত হইয়া-ছিলেন বলিয়া তদীয় পুত্র বটু তাঁহার উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচিত হন। এই রাজকুমারের রাজ্য জাক্সারটিস্ নদী, আরল সাগর ও কাস্পিয়ান সাগরের উত্তরাংশে ডন ও ভলগা নদীর তীরবর্ত্তী স্বর্ণপ্রসূ প্রদেশে ও কৃষ্ণসাগরের পার্শ্ব-বর্ত্তী কিয়দংশে বিস্তৃত ছিল। দ্বিতীয় পুত্র চাঘাটাই সুবিস্তীর্ণ দেশের অধিপতি হইয়াছিলেন; পশ্চিমে দেস্ত কিপচাক, পূর্ব্বে মোগল জাতির আদিম বাসস্থান, দক্ষিণে মেকরান ও উত্তরে সাইবেরিয়া, এই সীমার অন্তর্ব্বর্ত্তী সমগ্র প্রদেশে তাঁহার আধিপত্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল; এতদ্ব্যতীত কাশঘর, খোতেন এবং ওইঘর প্রদেশ, বদক্ষান, বাল্ক, খারিজম, খোরসান, গজনি ও কাবুল প্রভৃতি চেঙ্গিস খাঁর বিজিত প্রদেশ তাঁহার রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত ছিল। তৃতীয় পুত্র ওকতাই আদিম মোগল ভূমি ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানের শাসনভার লাভ করিয়াছিলেন, এবং চতুর্থ পুত্র তুলিকে চীন রাজ্য অর্পণ করা হইয়াছিল।

চেঙ্গিস খাঁ রাজকুমারচতুষ্টয়ের রাজ্যশাসনসংরক্ষণের সাহায্য জন্য এক এক দল সৈন্য পৃথকভাবে নিয়োজিত করিয়া দিয়াছিলেন। উলু, যাযাবর মোগল অথবা অন্যান্য তুর্কজাতীয় সৈন্য এই সব দলের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

প্রথমতঃ চেঙ্গিস খাঁর বংশধরগণ ওকতাইকে সাম্রাজ্যে [illegible] বলিয়া স্বীকার করিতেন। তাঁহার পরলোকগমনের পর তদা[illegible] খিনা মোগল সাম্রাজ্যের অধিনেতৃপদ অধিকার করিয়াছিলেন; [illegible] সময়ে রাজ্যশাসনবিষয়ে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হওয়াতে মোগল [illegible] তাহাকে পদচ্যুত করিয়া তৎপদে চাঘাটাইর পুত্র কৈয়ুকাকে নির্ব্বাচিত করি-লেন। তাঁহার মৃত্যুর পর সাম্রাজ্যের অধিনেতৃনির্ব্বাচন সম্বন্ধে গৃহ-বিবাদ উপস্থিত হইল, এবং কতিপয় বৎসরের মধ্যেই মোগল অধিপতি

গণ অধিনেতার অধীনতাপাশ ক্রমশঃ শিথিল করিতে লা
অবশেষে তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র হইয়া পড়িলেন। চেঙ্গিস-সাম্রাে
অবস্থা কোন সময়ে সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা নিঃসংশয়িতরূপে নির্দ্ধা
সহজ নহে। পারস্য রাজ্যের অধিপতি আরঘুন খাঁ ১২৯১ খ্রীষ্টাে
মুদ্রায় অধিনেতার পার্শ্বে স্বনাম অঙ্কিত করিয়াছিলেন। এবং কাভ
১৩০৪ খৃষ্টাব্দে অধিনেতার নাম পরিত্যাগ করিয়া স্বনামে রাজমুদ্রা ে
করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ, জুজি এবং চাঘাটাইবংশীয় অধিপতিগণও
সময়েই স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়াছিলেন। অতঃপর চেঙ্গিসবংশীয় অধিপা
স্ব স্ব রাজ্যে আপনাদিগকে সম্রাট নামে পরিচিত করিতেন।

এই আত্মবিচ্ছেদের ফল কি হইয়াছিল? অধিপতিগণ যত দিন সম্মিলি
ছিলেন, তাঁহাদের সুবিশাল সাম্রাজ্য তত দিন ক্রমশঃ বিস্তৃতিলাভ করিতেছিল। চেঙ্গিস সাম্রাজ্যের প্রতাপ ও প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ ছিল, এবং পার্শ্ববর্ত্তী রাজন্যবর্গ মোগলের কবল হইতে আপন আপন রাজ্য রক্ষা করিবার জন্য সর্ব্বক্ষণ সশঙ্ক থাকিতেন। চেঙ্গিসবংশীয় অধিপতিগণ দক্ষিণ চীনের বিজয় সম্পঃ করেন, এবং ডন নদী উত্তীর্ণ হইয়া বালগেরিয়া ও পোল রাজ্যে মোগল-পতাকা উড্ডীন করেন। এতদ্ব্যতীত হাঙ্গেরি, বসনিয়া, ডালমেসিয়া ও সাইনেসিয়া আক্রমণ করিয়া এবং ভায়েনা-বিজয়ের উদ্যোগে প্রবৃত্ত হইয়া সমস্ত খ্রীষ্টজগৎকে সন্ত্রাসিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। এই ভাবে কিঞ্চিদধিক সত্তর বৎসর অতিবাহিত হইলে, তাঁহারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন। ইহার ফলস্বরূপ তাঁহারা ইউরোপের বিজিত দেশসমূহ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন; একমাত্র রুসিয়া দেশে তাঁহাদের আধিপত্য স্থির ছিল। ইহার পর তাঁহারা অন্তর্ব্বিচ্ছেদে জীর্ণ শীর্ণ হইয়া ক্রমশঃ হীনবল ও নিস্তেজ হইয়া পড়েন, এবং কোরিয়া সাগর হইতে আড্রিয়াটিক সাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত সুবৃহৎ সাম্রাজ্যের চেঙ্গিসখাঁ-নির্দ্ধারিত বিভাগচতুষ্টয় শতধা বিভক্ত হইয়া যায়। এই ভাবে কিঞ্চিদধিক অর্দ্ধ শতাব্দী গত হইলে তৈমুরলঙ্গ আবির্ভূত হন, এবং তাঁহার প্রদীপ্ত প্রভায় দক্ষিণ এসিয়ার চেঙ্গিস খাঁর বংশীয় অধিপতিগণ দগ্ধীভূত হন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, চেঙ্গিস খাঁ মৃত্যুকালে আপনার সুবিশাল সাম্রাজ্য চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া পুত্রত্রয় ও পৌত্র বটুকে প্রদান করেন, এবং কৌলিক প্রথানুসারে কারসার নোয়ান তাঁহার (চেঙ্গিস খাঁর) প্রধান অমাত্যের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। চেঙ্গিস খাঁর মৃত্যুকালে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র চাঘাটাই

কারসার নোয়ানকে প্রধান অমাত্যের পদে প্রতিষ্ঠিত রাখিতে আদিঃ
তদনুসারে তিনি এবং তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ বংশানুক্রমে চাঘ
প্রধান মন্ত্রণাদাতা বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। আমরা চেঙ্গিস খাঁ
কারিগণের প্রসঙ্গে অপর তিন শাখা পরিত্যাগ করিয়া একমাত
শাখার বিবরণ প্রদান করিব।

চেঙ্গিস খাঁ কর্তৃক নির্দ্দিষ্ট চাঘাটাই রাজ্য বৃহদায়তন এবং তিনটি
অংশ লইয়া সংগঠিত ছিল। (১) সির ও কাশঘরের উত্তরাংশস্থিত প্রদে
এই প্রদেশ দিগন্তবিস্তৃত এবং ইহার অধিকাংশ তৃণগুল্মাদিশূন্য বাল
কদাচিৎ কোথাও লোকাবাস দৃষ্টিগোচর হইত। কিন্তু এই মরুভূমিরও
কোন স্থানে ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী, প্রশস্ত হ্রদ, বিস্তীর্ণ পর্ব্বতমালা ও শু
সমভূমি দৃষ্টিগোচর হইত। কিন্তু শীতাধিক্যবশতঃ যাযাবর অধিবাসি
স্ব স্ব বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণদিকস্থ উষ্ণতর প্রদেশে আশ্রয় লইত
(২) দক্ষিণে জনাকীর্ণ ও সমৃদ্ধিশালী জনপদসমূহ এবং উত্তরে মরুভূমি ; ইহা
মধ্যবর্ত্তী কাশঘর ও ইয়ারখণ্ড প্রদেশ ;—যদিও এই দেশ বনসঙ্কুল ছিল,
তথাপি বহুজনপূর্ণ কাশঘর, ইয়ারখণ্ড, খোটেন, আকসু ও তারকণ্ প্রভৃতি
নগর এই দেশের শোভাবর্দ্ধন করিত। (৩) জাক্সারটিস নদীর উত্তর উপকূল
হইতে দক্ষিণে হিন্দুকুশ ও হাজরা পর্ব্বতমালা, তাসখণ্ড, সমরখণ্ড, বোখারা
ও বাল্ক পর্য্যন্ত বিস্তৃত প্রদেশ ; এই সুসভ্য অমিতধনধান্যপূর্ণ দেশের আদ্যন্ত
যোজনব্যাপী শস্যক্ষেত্র ও সৌষ্ঠবশালী নগরমালায় খচিত ছিল।

সুবিস্তীর্ণ চাঘাটাই রাজ্যের অধিবাসিগণ পরস্পরবিরোধী নানা সম্প্রদায়ে
বিভক্ত ছিল। মরুভূমির যাযাবর জাতিই প্রথম অংশের অধিবাসী বলিয়া
পরিগণিত ছিল। ইহারা প্রবল স্বদেশানুরাগবশতঃ আপনাদের দেশকে ভূতলে
নন্দনকাননতুল্য জ্ঞান করিত; পার্শ্ববর্ত্তী নগরসমূহের অধিবাসী ও কৃষকসম্প্র-
দায় ইহাদের অবজ্ঞাভাজন ছিল। ইহারা আপনাদের উচ্ছৃঙ্খল ও নিরবলম্ব
জীবনযাপনপ্রণালীই উন্নতমনা স্বাধীন জাতির অনুকরণীয় বলিয়া বিবেচনা
করিত। দ্বিতীয় অংশের অধিবাসিগণের মধ্যে এক সম্প্রদায় এক স্থান হইতে
অপর স্থানে আপন আপন সুবিধামত স্থানান্তরিত হইত, এবং অপর সম্প্রদায়
তথায় চিরস্থায়িভাবে বাস করিত। তৃতীয় অংশের অধিকাংশ অধিবাসীই
স্থায়ী ছিল। যে সকল বিভিন্ন সম্প্রদায় দ্বারা চাঘাটাই মরুভূমি পূর্ণ হইয়াছিল,
তাহাদের অধিকাংশই মোগলবংশসম্ভূত। ইহার দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে কালায়

পরাক্রান্ত সম্প্রদায়ের বসতি ছিল; ইহাদের আবাসস্থল চীনের
'খে বিস্তৃত ছিল।

নানাপ্রকার বিসদৃশ উপকরণে গঠিত রাজ্য প্রতাপশালী প্রতি-
সনকর্ত্তা কর্তৃক পরিচালিত না হইলে দীর্ঘকাল সম্মিলিত থাকিতে
বিশেষতঃ, অধিপতিগণের একাধিক পুত্র থাকিলে, তাঁহাদের মধ্যে
রাজ্য বিভাগ করিয়া দেওয়াই মোগলরাজবংশের কৌলিক প্রথা
তাদৃশ প্রথাও আত্মবিচ্ছেদের অনুকূল। চেঙ্গিস খাঁর অসাধারণ
বলে মোগল-শাসন এরূপ শক্তিসম্পন্ন হইয়াছিল যে, তাঁহার মৃত্যুর
বহু বৎসর পর্য্যন্ত তদ্বংশীয়দের প্রতাপ অক্ষুণ্ণ ছিল।

চেঙ্গিস খাঁর পুত্র চাঘাটাই প্রধানতঃ মরুভূমির মধ্যস্থিত স্বীয় রাজধানী
বালিন নগরে বাস করিতেন; কখনও কখনও বা কারাকোরাম নগরে ভ্রাতা
টাইর সঙ্গে কালযাপন করিতেন। রাজ্যশাসনসংক্রান্ত বহু কার্য্যের ভার
দীয় প্রধান অমাত্য কারসার নোয়ানের প্রতি ন্যস্ত ছিল। চাঘাটাইর
উত্তরাধিকারিগণও প্রধানতঃ মরুভূমিতেই বাস করিতেন, কিন্তু রাজবংশসুলভ
দুরাকাঙ্ক্ষা ও মনোভেদ ক্রমশঃ তাঁহাদিগকেও আক্রমণ করিয়াছিল, এবং
চাঘাটাইর মৃত্যুর পর এক শতাব্দীর মধ্যে তাঁহারা সির ও আমু নদীর তটবর্ত্তী
জনাকীর্ণ জনপদসমূহে বাস করিতে আরম্ভ করেন; ইহার পর তাঁহাদের
অবস্থা ক্রমশঃ এত নিস্তেজ ও সামর্থ্যশূন্য হইয়া পড়ে যে, তাঁহারা অবশেষে
মন্ত্রিগণের হস্তে ক্রীড়নকে পরিণত হন।

যদিও চাঘাটাই রাজ্য বিবাদ বিসম্বাদ ও অন্তর্দ্রোহে ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিল,
তথাপি প্রথম ইসাল বুগা খাঁর রাজত্বের পূর্ব্বে যে উহার কোনও অংশ বিচ্ছিন্ন
হইয়া স্বতন্ত্র রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল, তাহার সন্তোষজনক প্রমাণ পাওয়া যায়
না। ইসাল বুগা খাঁর রাজত্বকালেই চাঘাটাই বংশ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া দুইটি
স্বতন্ত্র রাজ্য সংস্থাপিত হয়। ইহার এক রাজ্য মোগলভূমি ও কাশঘর প্রদেশ
লইয়া গঠিত হইয়াছিল; অপর রাজ্যের আধিপত্য মাওরাওন্নাহার দেশে প্রতিষ্ঠা
লাভ করে।

অতঃপর যে সকল চেঙ্গিসবংশীয় নরপতি রাজত্ব করিয়াছেন, তাঁহারা
প্রজাপালনে অক্ষম বিলাসপটু রাজসিংহাসনাধিকারিমাত্র ছিলেন। তাঁহারা
ক্রীড়াকৌতুকেই দিনাতিপাত করিতেন; মন্ত্রিগণ তাঁহাদের নামে রাজ্যশাসন
তেন। দুরাকাঙ্ক্ষ মন্ত্রিসমাজের কার্য্যের অনুমোদন করিয়াই তাঁহারা

রাজকীয় কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিতেন। ট্র্যান্স অক্সেনিয়া প্রদেশে ও দৃষ্ট হইতেছিল; অন্তর্বিবাদেই দেশমধ্যে দুর্দ্দশার একশেষ তদুপরি উত্তর প্রদেশ হইতে তাতারগণ প্রবল বন্যার ন্যায় ৫ হইয়াছিল। এইরূপ সঙ্কটসময়ে অসাধারণ তৈমুরলঙ্গ স্বীয় প্রতি পরাস্ত করিয়া নবোদিত সূর্য্যের ন্যায় এসিয়ার ভাগ্যাকাশে উদি তাঁহার সমুজ্জ্বল কিরণে সমস্ত কুজ্ঝটিকা তিরোহিত হয়, এবং মোগ পুনরায় নবতেজে প্রদীপ্ত হইয়া উঠে।

চেঙ্গিস খাঁর অভ্যুদয়কালে মোগলসমাজে অজ্ঞান ও ধর্ম্মহীনতার ঝঞ্ঝা বহিতেছিল; ঈশ্বরজ্ঞান একান্ত অপরিস্ফুট ছিল। এই সময় তি ও চীনে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত ছিল; তাহাদের সংস্পর্শে মোগল জাতি কি পরিমাণে তাহাদের আচারব্যবহারের অনুকরণ করিতে শিখিয়াছিল। কি তাহাতে মোগলসমাজের অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত হয় নাই, অথবা তাহাদিগে ধর্ম্মবিশ্বাসী করিয়া তুলিতে পারে নাই।

চেঙ্গিস খাঁর মৃত্যুর পর মোগল জাতির মধ্যে এসলাম ধর্ম্মের জ্যোতিঃ প্রকাশিত হয়। জুজি খাঁর পৌত্র (বতুর পুত্র) উজাবল এসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া নবোৎসাহে আপনার রাজ্যে ধর্ম্মপ্রচারে ব্রতী হন। কিপচাক দেশে উজবেক খাঁর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত ছিল; তাঁহার অক্লান্ত চেষ্টায় ও যত্নে সমগ্র কিপচাকবাসী এসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল।

তৎপরে চাঘাটাই বংশের তোগলক তৈমুর খাঁ অধিনেতৃপদে বৃত হইয়া এসলাম ধর্ম্মের পক্ষপাতী হইয়া উঠেন, এবং তিনি স্বয়ং দীক্ষিত হইয়া আপনার প্রজাবর্গের কিয়দংশকেও কোরাণোক্ত ধর্ম্মে বিশ্বাসী করিতে সমর্থ হন। তৎপরে ক্রমশঃ এসলাম ধর্ম্মের জ্যোতিঃ সমগ্র মোগলজাতির মধ্যে বিস্তৃত হইয়া পড়ে, এবং তৈমুরলঙ্গের অভ্যুদয়কালে উহার প্রভাব সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠা-লাভ করিয়াছিল।

শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত।

ষ্মান প্রাণীর নিকটে যেমন অকাশের চন্দ্র সূর্য্য নিত্যসিদ্ধ, সেইরূপ সনা মিশ্রের ঔরসে বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণী ও যাদবাচার্য্য প্রভুর উদ্ভব, বৈষ্ণবসমাজে নিত্যসিদ্ধ মত। মুদ্রিত প্রেমবিলাসের এতাদৃশ অদ্ভুত মত সকল প্রাচীন প্রেমবিলাসের মত বলিয়া কি কোনও বৈষ্ণব গ্রহণ করিতে পারেন? প্রেম-বিলাসরচয়িতা জাহ্নবা-শিষ্য নিত্যানন্দ দাস যাদবাচার্য্য ও মাধবাচার্য্য প্রভুর সমসাময়িক, সুতরাং তাঁহাদের পরস্পরের সাক্ষাৎকারসমাগম থাকা সম্ভব। এমন অবস্থায় যাদবাচার্য্য সনাতন মিশ্রের সন্তান ছিলেন না, এ কথা নিত্যানন্দ দাস কখনই লিখিতে পারেন না; অতএব মনে হয় যে, মুদ্রিত প্রেমবিলাসের ঊনবিংশতিতম বিলাসটি নবরচিত বা প্রক্ষিপ্ত।

শ্রীঠাকুরদাস দাস।

কাশীনাথ-প্রতিষ্ঠা।

পূর্ব্বকথা।

দেড় শত বৎসরেরও অধিক গত হইল, ফরাসী-অধিকৃত চন্দননগরে এক জন অতিশয়ধনশালী ব্রাহ্মণ বাস করিতেন; তাঁহার নাম ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী। পলাশীর যুদ্ধের অনতিকালপূর্ব্বে যখন ক্লাইব চন্দননগর আক্রমণ করেন, তখন ইন্দ্রনারায়ণ ইহসংসার পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। কথিত আছে, ক্লাইব চন্দননগর আক্রমণ করিলে ইন্দ্রনারায়ণের উপযুক্ত পুত্র কৃষ্ণপ্রসাদ ফরাসী-দিগকে বিশেষরূপ সাহায্য করেন। চন্দননগর ইংরাজ-হস্তে পতিত হইলে, ক্লাইব কেবল কৃষ্ণপ্রসাদের আবাস লুণ্ঠন করিয়াই নগদ টাকা ও অলঙ্কারাদিতে প্রায় পঁয়ষট্টি লক্ষ টাকা হস্তগত করিয়া প্রস্থান করেন। এই ঘটনার পর হইতেই চৌধুরী-বংশ দিন দিন হীনপ্রভ হইয়া পড়িতে লাগিল।

পলাশীর যুদ্ধের সমসময়ে কি তাহার অব্যবহিতকাল পরে, চন্দননগরে আর এক ব্রাহ্মণ-পরিবার ধীরে ধীরে লক্ষ্মীর কৃপাদৃষ্টি লাভ করিতেছিলেন। এখন হইতে প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে চন্দননগর 'নেড়োর মন' নামক স্থানের চট্টোপাধ্যায় মহাশয়গণ বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র ক্রিয়াকর্ম্ম ও দানশীলতার জন্য যথেষ্ট প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। এরূপ জনশ্রুতি আছে যে, ভাগীরথীর পশ্চিম কূলে অনেক ধনবান ব্রাহ্মণ বিদ্যমান থাকিলেও, দানে ও পরোপচিকীর্ষায়

—ট্টোপাধ্যায় মহাশয়দিগের কেহ সমকক্ষ ছিলেন না। এমন কি, বৰ্দ্ধমানের ..রাজাদিগের পরই চট্টোপাধ্যায়-পরিবার ক্রিয়াবান বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়া-ছিলেন।

কৃষ্ণরামের পর হইতে চৌধুরী বংশ হীনপ্রভ হইলেও, উঁহাদের সামাজিক সম্মান কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই। চৌধুরীগণ গোষ্ঠীপতি সিদ্ধশ্রোত্রীয়, এবং চট্টোপাধ্যায়গণ স্বভাবকুলীন চৈতলীবংশসম্ভূত। এ জন্য পরস্পর পরস্পরের মর্য্যাদা বুঝিতেন, এবং পরস্পরকে যথেষ্ট সম্মান করিতেন।

১

প্রায় আশী বৎসর পূর্ব্বে, এক দিন জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যাহ্নে, ঘাটালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রেশমের কুঠীর দেওয়ান রামপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় স্বীয় অতিথিশালার কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আহারার্থ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছেন, এমন সময় ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, এক জন ব্রাহ্মণ দেওয়ানজীর সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেন। ব্রাহ্মণ আহারকালে আগত হইয়াছেন শুনিয়া দেওয়ান মহাশয় অবিলম্বে বহির্ব্বাটীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। আসিতে আসিতে ভৃত্যমুখে শুনিলেন, সমাগত ব্রাহ্মণ একটি অতিবলিষ্ঠ হৃষ্টপুষ্ট অশ্বে আরোহণ করিয়া আসিয়াছেন;—দেখিলে অতি ভাগ্যবান বলিয়া বোধ হয়।

দেওয়ান মহাশয় বহির্ব্বাটীতে সমাগত হইবামাত্র আগন্তুক ব্রাহ্মণ স্বীয় যজ্ঞোপবীত উন্মোচন করিয়া দ্রুতপদে দেওয়ান মহাশয়ের নিকট আসিয়া তাঁহার পদতলে উপবীত নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন,—"আমার জাতি গিয়াছে, আমি অব্রাহ্মণ হইয়াছি। যদি আমাকে জাতি দান করিতে পারেন, তাহা হইলে আমি আবার দেশে গিয়া মুখ দেখাইব, নচেৎ অনাহারে প্রাণত্যাগ করিব।"

আগন্তুক দেওয়ান মহাশয়কে দেখিবামাত্র অধোবদনে নিকটবর্ত্তী হওয়াতে দেওয়ানজী প্রথমে তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই। ব্রাহ্মণের বাক্য সমাপ্ত হইবামাত্র দেওয়ান মহাশয় সসম্ভ্রমে ভূপতিত যজ্ঞোপবীত উত্তোলনপূর্ব্বক স্বীয় মস্তকে ধারণ করিয়া আগন্তুককে উঠাইয়া সবিস্ময়ে কহিলেন,—

"চৌধুরী মহাশয়, ব্যাপার কি? আপনি অব্রাহ্মণ? আপনার জাতি গিয়াছে! অনাহারে প্রাণত্যাগ করিবেন! এ সকল কথার অর্থ কি?"

"সে সকল অনেক কথা, যদি আপনি প্রতিজ্ঞা করেন যে, আমার বৃত্তান্ত

শুনিয়া আমার জাতিদান করিবেন—তাহা হইলে আমি আপনাকে সমস্ত কথা বলিব ; নচেৎ আমার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ।"

"আপনার কাহিনী আমি পরে শ্রবণ করিব,আগে আমাকে বলুন,—আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন ? মধ্যাহ্ন অতীতপ্রায়, আহারাদি করিয়া প্রথমে স্নিগ্ধ হউন, পরে যথাকর্ত্তব্য করা যাইবে।"

"তাহা হইবে না, অগ্রে আপনার আশ্বাসবাণী শ্রবণ করিয়া তবে অন্য কথা বলিব। এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, আমি কাল প্রাতঃকালে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে চন্দননগর ত্যাগ করিয়া দিনরাত ক্রমাগত আসিতেছি ; ইতিমধ্যে এক বিন্দু জল পর্য্যন্ত পান করি নাই। প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমার উদ্ধারের উপায় না হয়, ততক্ষণ বারিবিন্দুও গ্রহণ করিব না। ইতিমধ্যে প্রাণ যায়, তাহাও স্বীকার।"

দেওয়ান মহাশয় চৌধুরী মহাশয়ের হস্তধারণ করিয়া কহিলেন,—

"আপনার কাহিনী শুনিবার প্রয়োজন নাই। যে কোনও কারণেই হউক, যখন আপনার জাতি গিয়াছে বলিতেছেন, তখন আমি আপনাকে পুনরায় জাতি প্রদান করিব। ইহাতে আমাকে পথের ভিখারী হইতে হয়, তৃণাদপি লঘু হইতে হয়,অথবা প্রাণত্যাগ করিতে হয়,তাহাও করিব; তথাপি আপনাকে স্বপদে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিব। আপনি প্রাতঃস্মরণীয় স্বর্গীয় ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর পৌত্র, পরোপকারিশ্রেষ্ঠ ৺ কৃষ্ণপ্রসাদ চৌধুরীর পুত্র, পালধিশ্রোত্রীয় গোষ্ঠীপতি,—আমার সর্ব্বথা পূজনীয় ; যদি আপনার কোনও বিপদে সাহায্য করিতে না পারি, তাহা হইলে আমাদের এ ছার জীবনে ও সামান্য সম্পত্তিতে প্রয়োজন কি ? আসুন, স্নানাদি করিয়া আহার করিয়া আমায় কৃতার্থ করুন, বিলম্বে প্রয়োজন নাই।"

এই বলিয়া চৌধুরী মহাশয়ের গলদেশে স্বীয় মস্তকস্থ উপবীত লম্বিত করিয়া দিয়া নমস্কার করিলেন। প্রতিনমস্কার করিয়া চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—"আমি অযোগ্য জনের শরণাগত হই নাই। নেড়োর মোনের চট্টোপাধ্যায় মহাশয়েরা শরণাগতপ্রতিপালক, দাতা ও ধার্ম্মিক। আপনি সেই চট্টোপাধ্যায়-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া নির্ম্মেঘ আকাশে শশাঙ্কের ন্যায় নির্ম্মল কুল উজ্জ্বল করিয়াছেন। বিশেষতঃ যদি কুলীনের নিকট শ্রোত্রীয় আশ্রয় না পাইবে, তাহা হইলে আমরা দাঁড়াইব কোথায় ?"

দেওয়ানজী সসম্ভ্রমে কহিলেন, "আমরা চিরকালই মহাশয়দের আশ্রিত ..."

২

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে,দেওয়ান রামপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় চন্দননগরের চট্টোপাধ্যায়বংশসম্ভূত। তখন বাঙ্গালায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রেশমের ব্যবসায় একচেটিয়া ছিল। সমস্ত বাঙ্গালা প্রদেশে যত রেশম উৎপন্ন হইত, তাহা পাঁচ জন ঠিকাদার বা কণ্ট্রাক্টরের দ্বারা কোম্পানি বাহাদুর সংগ্রহ করিতেন। এক এক জন কণ্ট্রাক্টর এই প্রকার রেশমের কার্য্যে অগাধ অর্থ সঞ্চয় করিতেন। ইঁহারা রেশমের কুঠীর দেওয়ান বলিয়া অভিহিত হইতেন। রামপ্রসাদ এই দেওয়ানদিগের অন্যতম।

ঘাটালে রামপ্রসাদের প্রধান কুঠী বা আফিস ছিল। বৎসরের মধ্যে অধিকাংশ সময় ঘাটালে থাকিতে হইত বলিয়া ইনি ঘাটালেও এক প্রকাণ্ড অট্টালিকা, অতিথিশালা, দীর্ঘিকা, শিবালয় প্রভৃতি স্থাপিত করিয়াছিলেন। ঐ দীর্ঘিকা আজ পর্য্যন্ত বিদ্যমান আছে; লোকে উহাকে দেওয়ানজীর দীঘী বলে। দেওয়ান মহাশয় স্বয়ং প্রত্যহ অতিথিশালার তত্ত্বাবধান করিতেন। তাঁহার আদেশ ছিল যে, ঘাটালে কোনও বিদেশী লোক আসিলে নিজ ব্যয়ে আহারাদি করিতে পাইবেন না। যাঁহারা অতিথিশালায় আতিথ্যগ্রহণ করিতে অস্বীকার করিতেন, তাঁহারা দেওয়ানজীর আবাসে আহারাদি করিতেন। কেহ বাজারে বা দোকানে রন্ধনাদি করিয়া আহার করিলেও দোকানদার বিদেশীর নিকট হইতে কোনও মূল্য গ্রহণ করিতে পাইত না। দেওয়ানজীর নিকট হইতে সমস্ত খরচ পাইত। দেওয়ানজীর অন্নদানকাহিনী আজিও ঘাটালের প্রাচীন লোকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়।

আহারসমাপনান্তে তাম্বূলচর্ব্বণ করিতে করিতে রামপ্রসাদ ও কাশীনাথ বসিবার গৃহে উপস্থিত হইলেন। ভৃত্য একটা সুবর্ণনির্ম্মিত রত্নখচিত শটকায় মৃগনাভিসুগন্ধি তামাকু দিয়া গেল। অপর এক জন ভৃত্য বৃহৎ একখানা চন্দনসিক্ত তালবৃন্ত লইয়া বীজন করিতে লাগিল। কাশীনাথ রামপ্রসাদ অপেক্ষা কিছু বয়ঃকনিষ্ঠ। রামপ্রসাদের বয়স বোধ হয় পঞ্চাশ,কিন্তু কাশীনাথের বয়স চল্লিশ হইয়াছে কি হয় নাই। উভয়েই অতি সুপুরুষ; কাশীনাথের প্রস্ফুটিত গোলাপের ন্যায় সুন্দর বর্ণ; কার্ত্তিকের ন্যায় বিস্তৃত বক্ষ ও মাংসল বাহু দেখিলেই যথার্থ ভাগ্যবান বীরপুরুষ বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার শরীরে যৌবনসুলভ চাঞ্চল্য এখনও যেন তরঙ্গায়িত হইতেছে। আর রামপ্রসাদ দীর্ঘাকার শান্ত অচঞ্চল, বিস্তৃত ললাটে প্রৌঢ়বয়সের দুই একটি রেখা অঙ্কিত

হইয়াছে। উজ্জ্বল গৌর বর্ণ, সুদীর্ঘ ললাটের উপর কুঞ্চিত কৃষ্ণ কেশরাশি তাঁহার বাৎসল্যমাখা মুখখানিকে যেন আরও প্রস্ফুটিত করিয়াছে।

কিয়ৎক্ষণ নীরবে ধূমপান করিয়া চৌধুরী মহাশয় বলিলেন, "যদি অবকাশ থাকে, এবং কষ্ট না হয়, তাহা হইলে আমার ক্ষোভের কারণ শুনিবেন কি?"

"আমি আপনার ব্যাকুলতার কারণ জানিবার জন্য বিশেষ উৎসুক হইয়াছি। পাছে আপনার কোন কষ্ট হয়, সেই জন্য এতক্ষণ এ প্রসঙ্গের উত্থাপন করি নাই। আপনার কাহিনী বর্ণনা করিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন।"

"আপনি বোধ হয় অবগত আছেন, কয়েক মাস পূর্ব্বে কলিকাতার বিখ্যাত ভূস্বামী মহাত্মা গোপীমোহন ঠাকুর মহাশয় তাঁহাদের মূলাজোড় গ্রামে গঙ্গার উপর এক কালীপ্রতিমা, দ্বাদশ শিব ও এক চতুষ্পাঠীর প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ দেবতাপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে ঠাকুর মহাশয় আমাদের চন্দননগরের বাটীতে আগমন করিয়া যথেষ্ট সাধ্যসাধনা করিয়া আমার যাইবার জন্য অনুরোধ করেন। ঠাকুর মহাশয়েরা বর্ত্তমান সমাজে পিরালী-অপবাদগ্রস্ত হইলেও তাঁহারা যে সর্ব্বাংশেই আমাদের অগ্রণী, এবং আমাদের আদর্শ, তাহার আর সন্দেহ নাই। এই সকল বিবেচনা করিয়াই আমি তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিতে সাহসী হই নাই। আমার স্বর্গীয় পিতামহ মহাশয় চতুঃসাগরী মেল বন্ধন করিয়া আমাদের সমাজে গোষ্ঠীপতিস্বরূপ অতুল্য সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। উত্তরাধিকারসূত্রে আমি এক্ষণে সেই সম্মানের অধিকারী। নির্দ্দিষ্ট দিবসে আমি মূলাজোড়ে সমাগত হইবামাত্র ঠাকুর মহাশয় অতি সমাদরে আমাকে আহ্বান করিয়া সভার মধ্যস্থলে সংরক্ষিত সিংহাসনে উপবেশন করাইলেন। আপনার নিকট বলিতে কি, সমগ্র বঙ্গদেশের গণ্য মান্য লোকের সমক্ষে যখন তিনি আমাকে সিংহাসনে উপবেশন করাইয়া গোষ্ঠীপতি বলিয়া আমার সম্বর্দ্ধনা করিলেন, তখন আমি বাস্তবিক বড়ই লজ্জাবোধ করিলাম। আমি কি গোষ্ঠীপতি হইবার উপযুক্ত? সেই স্বনামধন্য প্রাতঃস্মরণীয় পিতামহ কর্ত্তৃক অর্জ্জিত সম্পত্তি ক্লাইব লুণ্ঠন করিয়াছে; আমাদের সামাজিক সম্মান কেন অনাহত রাখিয়া গেল? আমাদের সেই সম্মান অপহরণ করিলে আজ আমাকে এত লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইত না।"

দেওয়ান মহাশয় বক্তাকে কাতর দেখিয়া বলিলেন, "আপনার ন্যায় বুদ্ধিমান লোকের বিপদে কাতর হওয়া উচিত নহে। আপনার কষ্ট বোধ হইলে এখন না হয় ও প্রসঙ্গ থাক।"

কাশীনাথ কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হইয়া কহিলেন, "আমার বিবাদের কারণ এখনও আপনাকে বলা হয় নাই; কারণ না জানিলে প্রতিকারের সম্ভাবনা কোথায়? যাহা হউক, মহাসমারোহে দেবতার প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন হইল। আমিও কর্ম্মকর্ত্তা কর্ত্তৃক যথোপযুক্ত পূজিত হইয়া তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম।

"সম্প্রতি তেলিনীপাড়ার স্বনামখ্যাত ভূম্যধিকারী অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অন্নপূর্ণা প্রতিমার প্রতিষ্ঠা-উপলক্ষে মহা সমারোহ করেন। আমরা চিরকাল উক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়দিগের দ্বারা সৎকৃত হইয়া আসিতেছি; কিন্তু বর্ত্তমান ব্যাপারে অন্নদা বাবু আমাকে পরিত্যাগ করিয়া এই শুভ-কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন।"

সবিস্ময়ে বাধা দিয়া রামপ্রসাদ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া দেবপ্রতিষ্ঠা করিবার কারণ?"

"তাই ত বলিতেছি, আমি পিরালী-প্রতিষ্ঠিত দেবালয়ে গমন করিয়া পিরালী কর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়াছি, এই আমার অপরাধ।"

"শ্রীরাম পরমভক্ত গুহকের আলয়ে ভোজন করিয়াও পতিত হয়েন নাই, চৈতন্য দেব ম্লেচ্ছের সহিত একত্র আহার করিয়াও সমাজে দেবজ্ঞানে পূজিত হইয়াছিলেন, আর আপনি অনুরোধে পড়িয়া মহাত্মা গোপীমোহনের শুভ-কার্য্যে যোগদান করিয়াছিলেন, ইহাই যদি আপনার অপরাধ হয়, তাহা হইলে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বড়ই ভ্রমে পড়িয়াছেন। তাঁহার এ ভ্রমের সংশোধন আবশ্যক।"

এ বিষয়ে অন্য কোনও কথা না বলিয়া দেওয়ানজী অন্য কথার অবতারণা করিলেন।

পর দিন অপরাহ্নে দেওয়ানের আবাসের সম্মুখে প্রকাণ্ড সরোবরের ঘাটের উপর এক শিবমন্দিরের রোয়াকে বসিয়া দেওয়ানজীর সহিত কাশীনাথের অনেক কথাবার্ত্তা হইল। প্রায় দুই ঘণ্টা বাক্যালাপের পর রামপ্রসাদ বলিলেন,—"এ কথা যেন কোনও রূপে প্রকাশ না হয়। প্রকাশ হইলে কার্য্যে ব্যাঘাত ঘটিতে পারে। ইতিমধ্যে, আমার পরামর্শ, আপনার চন্দননগরে প্রত্যাবর্ত্তন করাই শ্রেয়ঃ। আপনি যে আমার নিকট আসিয়াছিলেন, এ কথা কেহ জানে?"

"জন প্রাণীও না। এমন কি, বাটীর কাহাকেও কিছু বলি নাই।"

"মধ্যে মধ্যে আমি অশ্বারোহণে আমাদের তালুক ডাঁসি বা আমার মাতুলালয়ে গমন করি। আমি অশ্ব লইয়া আসিয়াছি দেখিলে কেহ আমার জন্য চিন্তিত হইবে না।"

"তাহা হইলে ভালই হইয়াছে। আমার এখানেও কেহ আপনাকে পূর্ব্বে বোধ হয় দেখে নাই, আর এখানে চন্দননগরের যে কয় জন লোক আছেন, তাঁহারাও আপনার আগমনের কারণ জ্ঞাত নহেন। এ সকল ব্যাপারের আয়োজন গোপনে হইলেই ভাল হয়।"

"যে আজ্ঞা, আপনার উপদেশ শিরোধার্য্য।"

পরদিন অতি প্রত্যূষে দেওয়ানজী কর্ত্তৃক সম্পূজিত হইয়া চৌধুরী মহাশয় অশ্বে আরোহণ করিলেন ও ক্ষণকাল মধ্যে দৃষ্টির অগোচর হইলেন।

চৌধুরী মহাশয়ের বিদায়ের দশ বার দিন পরে দেওয়ান মহাশয় স্বীয় খুল্লতাতপুত্র বিশ্বম্ভরকে ডাকিয়া বলিলেন,

"বিশ্বম্ভর, তুমি অদ্য আহারাদি করিয়া চন্দননগরে গমন কর। আমি দেবতার আদেশে দেবতাস্থাপন করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। তুমি অগ্রে বাটীতে গিয়া আমাদের বাটীর সম্মুখে দ্বাদশটি শিবমন্দিরনির্ম্মাণের উদ্যোগ কর। আমি শিবস্থাপনা করিব। আর এক কথা, এখানে যে চৌধুরী মহাশয় আসিয়াছিলেন, এ কথা যেন বিন্দুমাত্র প্রকাশ না হয়। যত শীঘ্র পার, সমস্ত আয়োজন করিবে। সমস্ত ঠিক হইলে আমায় সংবাদ দিবে। নিমন্ত্রণাদি আমি এই স্থল হইতেই শেষ করিব, সে জন্য তোমরা চিন্তিত হইও না। ছোট খুড়ামহাশয়কে বলিও, তিনি যেন নিজের অভিলাষমত মন্দিরাদি প্রস্তুত করান। তিনি এখন আমার পিতৃস্থানীয়। চন্দননগরের প্রত্যেক লোককে যেন নিমন্ত্রণ করা হয়। স্থানীয় নিমন্ত্রণ তোমরাই করিও।"

সেই দিনই বিশ্বম্ভর স্বগৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

৩

মন্দিরপ্রতিষ্ঠার আর অল্পদিনমাত্র অবশিষ্ট আছে। আত্মীয় স্বজনের আগ্রহে ও উৎসাহে অতি সত্বর সমস্ত আয়োজন হইতে লাগিল। রামপ্রসাদের বিশাল আবাসের সম্মুখে অনেকটা স্থান ফুলবাগান; ফুলবাগানের পর রাস্তা। এই রাস্তার ধারে মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। ফুলবাগানে সভা হইবে।

মন্দিরপ্রতিষ্ঠার এক সপ্তাহমাত্র পূর্ব্বে দেওয়ানজী চন্দননগরের বাটীতে

খুল্লতাতকে প্রণাম করিলেন। রামপ্রসাদের বয়ঃক্রম পঞ্চাশৎ পার হইলেও তাঁহার পিতামহী তখনও জীবিতা ছিলেন। তাঁহার খুল্লতাত শিবানন্দ তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া তাঁহার এই শুভকর্ম্মে আগ্রহ দেখিয়া কতই হর্ষ প্রকাশ করিলেন। রামপ্রসাদ কাহারও নিকট এ পর্য্যন্ত মন্দিরপ্রতিষ্ঠার কারণ কিছু খুলিয়া বলেন নাই। অন্তঃপুরে গমন করিলে তাঁহার পত্নী চট্টোপাধ্যায়-পরিবারের লক্ষ্মীস্বরূপিনী রাধামণি আসিয়া স্বামিসম্ভাষণ করিলেন। পুত্র নবকুমার ও শিশু পৌত্র আদিরাজ আসিয়া দেওয়ানজীকে যথাযোগ্য বন্দনাদি করিলেন। আদিরাজের বয়স পাঁচ বৎসরমাত্র। দেওয়ান মহাশয় পৌত্রকে ক্রোড়ে লইয়া একে একে সকলের সহিত সম্ভাষণাদি করিলেন। তাঁহার সহোদর ও পিতৃব্যপুত্রের সংখ্যা প্রায় ত্রিশ জন। তন্মধ্যে কনিষ্ঠ পিতৃব্যপুত্র বিশ্বম্ভর সর্ব্বকনিষ্ঠ এবং সর্ব্বদা দেওয়ানজীর নিকটে অবস্থান হেতু তাঁহার বড়ই প্রিয় ছিলেন। প্রায় সকল ভ্রাতারই বিবাহ হইয়াছে। অনেকের পুত্র কন্যা পর্য্যন্ত হইয়াছে। সকলেই একান্নে প্রতিপালিত। এত বড় চট্টোপাধ্যায় পরিবারে যে কেবল এক মাত্র দেওয়ানজীই উপার্জ্জনক্ষম এবং অন্যান্য সকলে বসিয়া থাকিতেন ও দাদার স্কন্ধে বাবুগিরি করিতেন, তাহা নহে। অনেকেই ব্যবসা বাণিজ্য বা মুৎসুদ্দির কার্য্য করিয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিতেন। কিন্তু পরস্পরে এমনি সম্প্রীতি, যে কেহ এক দিনের জন্যও পুরাতন বাটী ত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্র ভাবে বাস করিবার কল্পনা মনেও আনিতেন না। পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা দেখিয়া কেহ মনে করিতে পারিতেন না যে, ইহারা সকলেই সহোদর নহেন।

রামপ্রসাদ আর কাহারও নিকট তাঁহার অভিপ্রায় ব্যক্ত না করিলেও পতিপ্রাণা সহধর্ম্মিণীর নিকট এ কথা বলা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ করিলেন। পর দিন সুযোগ পাইয়া পত্নীর নিকট মনোভাব ব্যক্ত করিবামাত্র রাধামণি বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে কহিলেন,—

"আমিও তাহা কতক কতক অনুভব করিতে পারিয়াছি। এই সেদিন দুর্গোৎসবে এত খরচপত্র হইয়া গেল, আবার এরই মধ্যে ধর্ম্মকর্ম্মে এত মন—এর একটা কিছু কারণ আছে।"

"কেন—এ কারণটা কি ধর্ম্মছাড়া? না সৎকার্য্যে কখনও আমার কোনও-রূপ অবহেলা দেখিয়াছ? যদি তাহাই দেখিয়া থাক, তাহা হইলে আমাকে বল নাই কেন? সহধর্ম্মিণী হইয়াছ, কেবল পুণ্যের ভাগ লইলে ছাড়িব না; আমার

কিছু অপ্রতিভ হইয়া রাধামণি বলিলেন,

"আমি সে কথা বলিতেছি না। দশ বৎসর বয়সে তোমার হাতে পড়িয়াছি, আর প্রায় চল্লিশ বৎসর পার হইল; এখনও কি তোমায় চিনিতে পারি নাই? এত দিন কি বৃথা তোমার চরণসেবা করিয়াছিলাম? কিন্তু একটা কথা, বাঁড়-য্যেরা সামান্য লোক নহেন, তাঁহাদের সঙ্গে পারিবে?"

"আমি ত তাঁহাদের সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ করিতে যাইতেছি না। আমার কর্ত্তব্যবুদ্ধি ধরিয়া চলিব, তাহাতে হারিলেও আমার লজ্জা নাই।"

"আমার মতে তাঁহাদের সহিত না লাগিলেই ভাল হইত।"

"ইহাতে আর লাগালাগি কি আছে? চৌধুরী মহাশয় সিদ্ধশ্রোত্রীয় আমাদের আশ্রয়দাতা—পূজনীয়। বাঁড়ুয্যেরা ভঙ্গভাব, অথচ সেই ভাঙ্গাকুলীন একজন শ্রোত্রীয়ের অপমান করিবেন, আর আমরা স্বভাবকুলীন হইয়া তাহা সহ্য করিব? যদি নিজের মর্য্যাদা বজায় করিতে না পারিলাম, তাহা হইলে সমাজে বাস করিবার আবশ্যক কি?"

"তাহা হইলে কি অন্নদা বাবুকে নিমন্ত্রণ করিবে না?"

"সে কি কথা? আমি আজ প্রাতে স্বয়ং গিয়া বাঁড়ুযো মহাশয়কে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিয়াছি; তিনি যাহাতে সভায় উপস্থিত থাকেন,সে বিষয়েও তাঁহাকে বিশেষ অনুরোধ করিয়া আসিয়াছি।"

"চৌধুরী মহাশয়কে নিমন্ত্রণ করিয়াছ?"

"আমি আজ রাত্রে যাইব।"

৪

আজ দেওয়ান রামপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের দ্বাদশ শিবের প্রতিষ্ঠা হইবে। এক দিনে দ্বাদশশিবস্থাপনা বড় সহজ কথা নহে। বর্দ্ধমানের রাজারা কালনায় এক দিনে দ্বাদশ শিব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন; কিন্তু সে বহু কালের কথা। চক্ষে দেখিয়াছেন এমন লোক প্রায় কেহ জীবিত নাই। এক্ষণে দেওয়ানজী কর্ত্তৃক এক দিনে দ্বাদশশিবস্থাপনা হইবে, এই জনরবে সভামণ্ডপ লোকে লোকারণ্য হইয়াছে। কৃষ্ণনগরের ও বর্দ্ধমানের রাজারা স্বয়ং আসিতে পারেন নাই, প্রতিনিধি পাঠাইয়া দিয়াছেন। বাঙ্গালার যাবতীয় জমীদার তালুকদার সওদাগর এবং পণ্ডিত এক সভায় সমাগত হইয়াছেন। তেলিনীপাড়ার জমীদার অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় স্বকীয় অনুচর সমভিব্যাহারে আসিয়া প্রথমেই সন্ধান লইলেন যে, কাশীনাথ চৌধুরী

মহাশয় আসিয়াছেন কি না? যে সভায় বাঙ্গলার প্রায় সকল জেলার বড়-লোক রাজারাজড়া সমবেত, তথায় প্রকাশ্যভাবে চৌধুরী মহাশয়ের আগমন বিষয়ে সন্ধান লওয়া একটু সভ্যতাবহির্ভূত বলিয়া বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গোপনে সন্ধান লইলেন। কিন্তু কেহ কোনও সন্ধান বলিতে পারিলেন না। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মনে মনে বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার জন্যই চৌধুরী মহাশয়ের হয় নিমন্ত্রণ হয় নাই, নচেৎ তিনি নিমন্ত্রিত হইয়াও আসিতে সাহসী হয়েন নাই।

মিথিলা হইতে উৎকল পর্য্যন্ত সমস্ত প্রদেশের অধ্যাপকমণ্ডলীর নিমন্ত্রণ হইয়াছে। প্রায় দেড় সহস্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সভায় উপস্থিত হইয়াছেন। সভার বাহিরে প্রায় অর্দ্ধক্রোশ স্থান ব্যাপিয়া রাস্তায় কেবল লোকের কোলাহল। তখন কলের গাড়ী হয় নাই। দুই দিনে কাশী গয়া শ্রীক্ষেত্রে যাইবার কথা কেহ মনে করিলেও লোকে তাহাকে উন্মাদ বলিয়া উপহাস করিত। হুগলী চন্দননগর হইতে লোকে চলিয়া গমনাগমন করাকে বিশেষ একটা কাজ বলিয়া মনে করিত না; এখনকার মত তখন নানাবিধ ঘোড়ার গাড়ীও হয় নাই। কলিকাতায় দুই এক জনের নূতন ঘোড়ার গাড়ী হইতেছিল মাত্র; নচেৎ কলিকাতার বাহিরে কোথাও ঘোড়ার গাড়ীও ছিল না এবং ঘোড়ার গাড়ীর রাস্তাও ছিল না। গঙ্গার নিকটবর্ত্তী ধনবানদিগের ভ্রমণের প্রধান উপায় ছিল বজরা। এই যে দেশ বিদেশ হইতে লক্ষ্মীর বরপুত্রগণ চন্দননগরে আসিয়াছেন, ইহাঁদের অনেকেই জলপথে বজরায় আগমন করিয়াছেন। নবদ্বীপের ও কৃষ্ণ-নগরের যাবতীয় অধ্যাপকমণ্ডলী নবদ্বীপাধিপতির প্রতিনিধির সহিত বজরায় আগমন করিয়াছেন। বর্দ্ধমানের রাজপ্রতিনিধি শিবিকাযোগে আসিয়াছেন। স্থলপথে যাঁহারা আসিয়াছেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই শিবিকায় আসিয়াছেন। অনেকে অশ্বারোহণে আসিয়াছেন। সকলেই সভা হইতে প্রায় এক পোয়া দূরে শিবিকা রাখিয়া পদব্রজে আগমন করিয়াছেন। অনেক আগন্তুক দেখিলেন যে, একখানি রৌপ্যগজদন্তাদিখচিত রুদ্ধদ্বার শিবিকা সভার একপার্শ্বে নবনির্ম্মিত মন্দিরের নিকট সংস্থাপিত হইয়াছে। সেখানে বড় লোকজনের জনতা নাই, অথবা জনতা হইতে পাইতেছে না।

ক্রমে ক্রমে সভা যখন লোকে লোকারণ্য হইল, শাল জামিয়ার, হীরা মুক্তা, চট্টোপাধ্যায় মুখোপাধ্যায়, বিদ্যালঙ্কার ন্যায়ালঙ্কার, জমীদার তালুকদারে যখন সভা পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, তখন প্রধান পুরোহিত সভার মধ্যে বেদীর

নিকট দণ্ডায়মান হইয়া উভয় হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক ক্ষণকালের জন্য কোলাহল নিবারণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কোলাহল কথঞ্চিৎ মন্দীভূত হইলে পট্টবস্ত্রপরিহিত দেওয়ান মহাশয় গললগ্নীকৃতবাসে করযোড়ে বলিতে লাগিলেন,—

"আজ দেবপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে অনেক মহাত্মা আমাদের এই সামান্য কুটীরে পদার্পণ করিয়া আমাদের স্পর্দ্ধা বর্দ্ধিত করিয়াছেন। সমস্ত বঙ্গ দেশের হিন্দু সমাজের শিরোমণি কৃষ্ণনগরাধিপতির প্রতিনিধি, বর্দ্ধমানের রাজপ্রতিনিধি এবং সমাগত সমস্ত ব্রাহ্মণ শূদ্র ভদ্রমণ্ডলীর নিকট আমার এই নিবেদন, আমার পিতৃস্থানীয় প্রবীণ খুল্লতাতের প্রতিনিধিস্বরূপ হইয়া আমি আপনাদের সাক্ষাতে ভগবান ভবানীপতি মহাদেবের মন্দিরপ্রতিষ্ঠা করিতে সঙ্কল্প করিয়াছি। আপনারা আমাকে একবাক্যে অনুমতি করুন, আমি কাশীনাথ-সংস্থাপন করিয়া আমার জন্ম সার্থক করি।"

দেওয়ানজী নীরব হইলে সভামধ্যে সকলে সাধু সাধু বলিয়া সম্মতিজ্ঞাপন করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে দেওয়ানজীর এক ভ্রাতা পূর্ব্বকথিত রৌপ্য-গজদন্তাদিখচিত শিবিকা লইয়া ধীরে ধীরে বেদীর নিকট সমাগত হইলে দেওয়ান মহাশয় পুষ্প মাল্য ও চন্দনপাত্র লইয়া শিবিকার দ্বারোন্মোচন পূর্ব্বক আপাদমস্তকপট্টবস্ত্রাবৃত এক পুরুষের হস্ত ধারণ করিয়া বেদীতে সংস্থাপন করিলেন। সকলে বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে সেই ছদ্মবেশী শিবিকারোহী কে তাহা আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহাদিগকে আর অধিক চেষ্টা করিতে হইল না। উক্ত পুরুষকে বেদীতে উপবেশন করাইয়া রামপ্রসাদ পুনরায় বলিলেন,—

"যাঁহার পিতামহ স্বর্গীয় ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী চতুঃসাগরী মেল বন্ধন পূর্ব্বক কুলীন ব্রাহ্মণসমাজে চিরপূজ্য হইয়া গিয়াছেন ও মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র যে ইন্দ্র-নারায়ণের নিকট অধমর্ণরূপে উপস্থিত হইতে সঙ্কোচ বোধ করিতেন না, যাঁহার পিতা প্রাতঃস্মরণীয় কৃষ্ণপ্রসাদ চৌধুরী স্বীয় রাজা ফরাসী জাতির সাহায্যার্থ প্রাণান্তপণ করিয়া ইংরাজ সেনাপতি কর্ত্তৃক নানাপ্রকারে উৎপীড়িত ও লুণ্ঠিত-সর্ব্বস্ব হওয়াও শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিয়াছিলেন তথাপি ইংরাজপ্রদত্ত লক্ষ লক্ষ টাকা উৎকোচের কথায় কর্ণপাতও করেন নাই, সেই ইন্দ্রনারায়ণের পৌত্র কৃষ্ণপ্রসাদের পুত্র দেবোপম শ্রীযুক্ত কাশীনাথ চৌধুরী মহাশয়কে আজ আপ-নাদের অনুমতিক্রমে মাল্য প্রদান ও চন্দনচর্চ্চিত করিয়া স্বপদে প্রতিষ্ঠিত

করিলাম। এই কাশীনাথপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষেই আজ আমি যথেষ্ট কষ্ট দিয়া আপনাদের ন্যায় মহাত্মাদিগকে আমার এই দীন আবাসে আমন্ত্রণ করিয়াছি। এই চিরপূজ্য শ্রোত্রীয়সন্তানকে স্বমর্য্যাদায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করাই আমার উদ্দেশ্য। যদি ইহাতে কিছু অপরাধ করিয়া থাকি, অনুগ্রহপূর্ব্বক নিজ গুণে ক্ষমা করিবেন। আপনাদের অনুগ্রহেই আমি কাশীনাথ প্রতিষ্ঠা করিলাম।"

দেওয়ান মহাশয় উপবেশন করিলেন। সভাস্থল নিস্তব্ধ, স্তম্ভিত, চকিত। সূচীপতনের শব্দ পর্য্যন্ত শ্রবণগোচর হয়। এমন সময় অকস্মাৎ অন্তঃপুর হইতে শঙ্খধ্বনি হইল; বাহিরে জলদনির্ঘোষে বাদ্যোদ্যম হইল। সমাগত সভ্যমণ্ডলী দণ্ডায়মান হইয়া "সাধু" "সাধু" "ধন্য" "ধন্য" রবে সভাস্থল প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিলেন। তখন অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কতিপয় অনুচর সমভিব্যাহারে অন্যের অলক্ষ্যে সভাত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

আজি পর্য্যন্ত চন্দননগরে নেড়োর মনে ঐ দ্বাদশ মন্দির বর্ত্তমান আছে। ঐ মন্দিরসমূহে প্রতিষ্ঠিত প্রত্যেক শিবলিঙ্গের নাম "কাশীনাথ"। দেওয়ানজীর প্রাসাদের চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছে।

উত্তরা-অভিমন্যু-সংবাদ।

[কুরুক্ষেত্রযুদ্ধান্তে ব্যাসদেবের আহ্বানে একদিন সন্ধ্যাকালে কৌরব ও পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণ সমুজ্জ্বল দিব্যমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক জাহ্নবীসলিল হইতে সমুত্থিত হইয়া আত্মীয় স্বজনগণের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। পূর্ব্বে যে বীরের যেরূপ বেশ, যেরূপ ধ্বজ ও যেরূপ বাহন ছিল, তৎকালে তাহার কিছুই বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হয় নাই। সেই রজনী অতিবাহিত হইলে, সমাগত বীরগণ বিদায় লইয়া যথাস্থানে প্রস্থান করেন। * উত্তরা ও অভিমন্যুর সাক্ষাৎবৃত্তান্ত নিম্নে বিবৃত হইল।]

উত্তরা।

ব্যাসদেবমুখে, দাসী করেছে শ্রবণ—
আজি সে পাইবে, নাথ, তব দরশন;
হেরিবে সে বীরবপুঃ বর্ম্মে আচ্ছাদিত,
শুনিবে সে মধুবাণী প্রেমে বিগলিত;
প্রদোষে যখন আজ ডুবিবে ভাস্কর,
ধীরে ধীরে অন্ধকার ভরিবে অম্বর,
সীমন্তে চন্দ্রমাজ্যোতি, তারকা অঞ্চলে
আসি দেখা দিবে সন্ধ্যা পশ্চিম অচলে,
তখন জাহ্নবী হতে উঠি, প্রিয়তম,

ফিরিয়া আসিবে তুমি আলিঙ্গনে মম।
কাল যুদ্ধ অবসানে আজি দিন কয়
দীর্ঘ কয় যুগ বলি মোর মনে হয়।
অশান্ত এ হৃদি মোর শান্তি নাহি মানে,—
সিন্ধুমুখে নদী সম ধায় তোমা পানে।
অভাগীর যত ব্যথা,—চিন্তা অগণন
তোমারে ঘিরিয়া, নাথ, করে আবর্ত্তন।
এস তুমি, প্রিয়তম, দাসীরে তোমার
সাথে করে লয়ে, নাথ, যাও এইবার।
কতবার ভাবিয়াছি হৃদয় যাতনে—
ত্যজিব এ পোড়া প্রাণ জাহ্নবীজীবনে;
তখনি পড়েছে মনে সন্তান তোমার,
তাই বহি এই বৃথা জীবনের ভার।

অস্তমিত দিনমণি; সান্ধ্য অন্ধকার
বাঁধিতেছে ধরণীরে আলিঙ্গনে তার।
পশুপক্ষী নিদ্রাগত। জীব-কলরব
কাননে, কান্তারে, শৈলে হতেছে নীরব।
শুধু কল কল করি জাহ্নবীর জল
অনন্ত সাগর পানে ছুটে অবিরল।
একে একে শত তারা অনন্ত আকাশে
আপনার স্নিগ্ধ শান্ত আলোক বিকাশে।
ধীরে ধীরে উঠে চন্দ্র, রজতকিরণ
তুলিছে প্লাবিত করি—ধরণী, গগন।
শুধু এ হৃদয় মোর—ঘন অন্ধকার—
আশার আলোকরেখা নাহি পশে আর।
এস প্রিয়, প্রিয়তম,—হৃদয়রঞ্জন!
পূর্ণ কর জীবনের সুখের স্বপন।
এস তুমি, প্রাণাধিক, আশাপথ চাহি
তোমার উত্তরা আমি এ জীবন বাহি;—
আজি তব দেখা পাব—শুনি এই কথা
বসি আছি নদীকূলে প্রাণে বহি ব্যথা।

[জাহ্নবীসলিলে ছায়ারূপী অভিমন্যুর উত্থান।

জাহ্নবীর অবিরল বীচিভঙ্গ টুটি
ও কি ছায়া ধীরে ধীরে উঠিতেছে ফুটি;
অস্ত্রধারী—বর্ম্মাবৃত বীর কলেবর,
ধীরে ধীরে তীর পানে হয় অগ্রসর!
অভিমন্যু—অভিমন্যু—প্রাণেশ আমার,
তুমি কি দিতেছ দেখা দাসীরে তোমার?
এ কি তুমি, প্রিয়তম, কিংবা তব ছায়া,
দেবের ছলনা এ কি? শুধু মিথ্যা মায়া?
কহ কথা, প্রিয়তম, কহ একবার,
ঘুচুক আমার হৃদে সংশয়ের ভার।
এস প্রিয়, দাও মোরে প্রেম-আলিঙ্গন,
ঘুচুক এ হৃদয়ের অসহ যাতন।

অভিমন্যু।

শান্ত কর মন, প্রিয়ে, অশান্ত হৃদয়
দেবে কি মানবে সর্ব্ব পাপের নিলয়।
যে পবিত্র পতিপ্রেম লভি পবিত্রতা
পতিতে প্রেমিক ছাড়ি নিরখে দেবতা,
যে প্রেম পবিত্র হয়ে আনন্দে,—বেদনে
উপনীত হয় আসি দেবতা-চরণে,
তারো সীমা আছে। হ'লে সীমারেখা পার
অমৃতে কেবল করে গরল-উদ্গার।

উত্তরা।

ব্যাকুল এ হৃদি মোর তোমার লাগিয়া,
কেমনে করিব শান্ত এ অশান্ত হিয়া?
বাহু বাড়াইয়া তোমা ধরিবারে যাই,
মিলাইয়া যায় ছায়া, ধরিতে না পাই!
চাহি পুনঃ বাহুবন্ধে বাঁধিতে তোমায়;
বৃথা আশা;—ছায়ারূপ আকাশে মিলায়!
এ কি তুমি, প্রিয়তম, কিংবা তব ছায়া,
অশরীরী অবশেষ—শুধু প্রেতকায়া?
এ কি তবে অদৃষ্টের তীব্র বিড়ম্বনা,
শুধু ছায়ারূপ তব, দেবের ছলনা।

অভিমন্যু।

শান্ত কর মন, প্রিয়ে, দেবতার দান

নদীস্রোত সম বহে দু' কূলে সমান;
দেবতার দান কভু অসম্পূর্ণ নয়।
শান্ত কর—শান্ত কর—অশান্ত হৃদয়।
যায় নর, যেথা লয় তাহার নিয়তি,
কার সাধ্য রোধ করে অদৃষ্টের গতি?
ক্ষত্রিয়কুমার আমি; সম্মুখসমরে
লভেছি মরণ; কেন শোক মোর তরে?
ক্ষত্রিয়বংশীয় আমি ক্ষত্রিয়কুমার,
সম্মুখসমরে মৃত্যু সৌভাগ্য আমার;
অস্ত্র মোর ক্রীড়নক, ক্রীড়া মোর রণ,
জীবনের অভিলাষ—সমরে মরণ।
তবে কেন বর্ষ অশ্রু, ক্ষত্রিয়কামিনী—
বীরকন্যা—বীরস্নুষা—বীরের গৃহিনী?
আমি দিব্য শান্তিপূর্ণ হৃদয় আমার;
ভেব না হৃদয়ে মোর প্রেম নাই আর।
তোমারে ঘিরিয়া মোর পবিত্র প্রণয়
সর্ব্ব অমঙ্গল হ'তে দিতেছে অভয়।
প্রেম মোর বাসনার পঙ্ক তেয়াগিয়া
হয়েছে পবিত্রতর, উঠেছে ফুটিয়া;
পঙ্ক ত্যজি নীর পরে উঠিয়া কমল
সূর্য্য পানে চাহি যথা মেলে শতদল।

উত্তরা।

মরতের প্রেম তব—তাই যদি পাই,—
সেই মোর স্বর্গসুখ, আর নাহি চাই।
কাননে যে বাস করে—বনফুল তার
প্রিয়ধন; সেই তার যোগ্য অলঙ্কার।
আমরা এ মর্ত্ত্যবাসী; দিব্য ভালবাসা
পুরাতে পারে না, প্রিয়, হৃদয়ের আশা।
আমরা এ মর্ত্ত্যবাসী, মর্ত্ত্যের বন্ধন—
তাই চাহি, তাই পেলে সার্থক জীবন।
এস, প্রিয়,—প্রিয়তম, প্রেম-আলিঙ্গনে
ধরায় স্বর্গের সুখ পাইব দু'জনে।
হায়—জীবনের পারে মরণের পুরে
দয়া, মায়া, ভালবাসা, স্নেহ, ভক্তিভার
আর স্থান নাহি পায় হৃদয়ে তাহার!
কেন, প্রিয়, পাপরণে করিলে প্রবেশ,
আর না আসিলে ফিরি শিবিরে, প্রাণেশ!

অভিমন্যু।

শোকবেগে উন্মাদিনী, শান্ত কর মন,
ধর ধৈর্য্য রমণীর অমূল্য ভূষণ।
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম—রণ। কেন ধর্ম্মরণে
পাপরণ বলি, প্রিয়ে, ভাবিতেছ মনে?
যে যাহার ধর্ম্ম যদি না পালে ধরায়,
স্রষ্টার বিশাল সৃষ্টি লুপ্ত হয়ে যায়।
জড়ধর্ম্ম করে সদা জড়েরা পালন,
যে যাহার ধর্ম্ম পালে পশুপক্ষিগণ।

উত্তরা।

তুমি ত করেছ তব স্বধর্ম্মপালন;
কি করেছে কৌরবের রথী সপ্ত জন?
নিশ্চিত মরণ জানি, হারাইয়া জ্ঞান,
মহাহবে রথিকুল হারায়েছে প্রাণ,
নিশ্চিত মরণ জানি পতঙ্গ যেমন
অনলে আহুতি দেয় পতঙ্গ-জীবন।
মানবশোণিতে বৃথা তিতেছে ধরণী,
উঠেছে অম্বরপথে ক্রন্দনের ধ্বনি;
কাঁদে সতী পতি স্মরি, মাতা পুত্রতরে,
পিতৃহীন অনাথের নেত্রে অশ্রু ঝরে।
এই তবে ধর্ম্ম—তবে এই ধর্ম্মরণ!
এ ত শুধু মরণের পূজা-আয়োজন।
সর্ব্ব-উপকারক্ষম সংসার-আশ্রম
তার চেয়ে কোথা আছে পবিত্র ধরম?

অভিমন্যু।

শুন, প্রিয়ে,—পাণ্ডবের রথী শত শত
কুরুসেনা সনে যবে মহারণে রত,
কয় জন কৌরবীয় রথী সে সময়
পাণ্ডবশিবির চাহে করিতে বিজয়।

"বীর নাই,—এ শিবির রক্ষিব কেমনে ?"
শুনিনু সে কথা ; মম শিরায় শিরায়
জাগিল ক্ষত্রিয়-রক্ত দীপ্ত বহ্নি প্রায় ;
মুহূর্ত্তে বুঝিনু আমি,—ক্ষত্রিয়ের মন
ক্ষত্রিয়ের অসি সম চাহে শুধু রণ।
কহিনু—"পাইলে আজ্ঞা নিজভুজবলে
বিজয় করিয়া আসি শত্রুসেনাদলে।"
বাঁধি মোরে জ্যেষ্ঠতাত স্নেহ-আলিঙ্গনে
কহিলেন, শির চুম্বি, স্নেহার্দ্রবচনে—
"হে পুত্র, বালক তুমি, এ দুর্জ্জয় রণে
তোমারে পাঠাতে নানা শঙ্কা গণি মনে ;
কিন্তু, পুত্র, ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম ধর্ম্মরণ,
কেমনে সে ধর্ম্ম হতে করি নিবারণ ?
যাও পুত্র, সাবধানে যুঝ শত্রুদলে,
আমার আশীষ তোমা রাখুক মঙ্গলে।
লভিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি—অক্ষতশরীরে
বিজয়ী বিজয়গর্ব্বে ফির এ শিবিরে।
দেখাও কৌরবদলে—অর্জ্জুনকুমার
অর্জ্জুনের যোগ্যপুত্র—বীর-অবতার।"
শিবিরে বিদায় লয়ে সাজি বীরসাজে
প্রবেশিনু বীরদর্পে শত্রুসেনা মাঝে।
আমার বালকমূর্ত্তি করিয়া দর্শন
তুচ্ছ ভাবি শত্রুদল করিল গর্জ্জন ;
আমায় বালক হেরি মৃদু হাস্যরেখা
রথীদের ওষ্ঠাধরে আসি দিল দেখা।
ক্ষণপরে ক্ষণস্থায়ী ক্ষণপ্রভা সম
মিলাইল সে কৌতুক হেরি বীর্য্য মম।
দুই পক্ষে সেনাদল গর্জ্জিল ভৈরবে,
মহাবেগে প্রবেশিনু ভীষণ আহবে।
বাধিল তুমুল রণ ; অসির ফলকে
চমকিল রবিকর দামিনী-ঝলকে ;
কোদণ্ডটঙ্কার ঘোর, অসি-ঝন্‌ঝন্
তুলিল প্লাবিত করি ধরণী গগন।
দেখিল—মৃগেন্দ্রশিশু মৃগেন্দ্র যেমন ;—
দেখিল—বাহুতে মোর অর্জ্জুনের বল,
নেহারিল অর্জ্জুনের সমরকৌশল।
চলিতে লাগিল রণ। শত শত বীর
পড়িল ধরণীতলে—মৃত—ছিন্নশির।
করিল যতেক রথী শঙ্খের প্রনাদ,
বিজেতা আনন্দ-রব, জিত আর্ত্তনাদ।
তার পর কুরুদলে রথী সপ্ত জন,
ক্ষত্রিয়ের বীরধর্ম্মে দিয়া বিসর্জ্জন,
বীরধর্ম্ম ছাড়ি, লয়ে চাতুরী-শরণ
করিল চৌদিক বেড়ি মোরে আক্রমণ।
শোভিল সে শত্রুদলে ক্ষুদ্র রথ মম
বাতক্ষুব্ধ সিন্ধুবক্ষে ক্ষুদ্রতরী সম।
চারিদিকে সীমাহীন হেরি অরিদল
ক্ষণতরে হৃদি মোর হইল চঞ্চল ;
স্মরিনু তোমার কথা, সেই রণস্থলে
পূর্ণ হয়ে এল আঁখি নয়নের জলে ;
স্মরিলাম জননীর স্নেহ আচরণ,
জনকের স্নেহকথা করিনু স্মরণ,
স্মরিলাম জ্যেষ্ঠতাত-খুল্লতাত-গণে,
অশ্রু আসি আবরিল দুখানি নয়নে।
ক্ষত্রিয়ের বীরবাহু হ'ল বিকম্পিত,
ক্ষত্রিয়শিরায় রক্ত হইল স্তম্ভিত।
এক সেনাদল হ'তে ফিরাতে নয়ন
কপিধ্বজ রথ দূরে করিনু দর্শন।
স্মরিলাম—বীরব্রতে বীর ধনঞ্জয়
তুচ্ছ করি সুখ, দুঃখ, মরণের ভয়,
করেছেন কি অক্ষয় কীর্ত্তি উপার্জ্জন ;
মরণে ডরিব আমি অর্জ্জুন-নন্দন ?
জনকের মহাদর্শ করিনু স্মরণ ;
পাইনু নূতন বল, আরম্ভিনু রণ।
গর্জ্জিয়া উঠিল শঙ্খ ঘনঘোর রবে,
মাতিল উভয় পক্ষ ভীষণ আহবে।

উঠিল সে রব ভেদি কোদণ্ডটঙ্কার ;
ছুটিল উভয় পক্ষে বাণ অবিরত
পক্ষধারী বিষধর ভুজঙ্গের মত।
তার পর মহারবে অসি-ঝনৎকার
ডুবায়ে সকল রব উঠিল আবার।
বীরধর্ম্ম ভুলি নীচ রথী সপ্ত জন
সপ্ত দিক হতে মোরে করিল বেষ্টন।
তার পর সুখ, দুঃখ আলো, অন্ধকার,
সব শেষ হয়ে গেল,—সব একাকার ;
জীবনের অভিলাষ হইল পূরণ,
সম্মুখসমরে যুঝি লভিনু মরণ।
আজ বুঝিতেছি—তারা শত্রু নহে মোর,
পূর্ণ কাল হেথা মোর, ছিন্ন কর্ম্ম-ডোর ;
নিয়তির করে তারা শুধু অস্ত্রপ্রায়
বন্ধন ছেদিয়া মুক্তি দিয়াছে আমায়,
জীবনযাতনা মোর করি নিবারণ
করিয়াছে মিত্রোচিত স্নেহ-আচরণ।

উত্তরা।

কি হইল যুদ্ধ করি? শুধু অভাগীর
জীবনে মরণজ্বালা, দু নয়নে নীর।

অভিমন্যু।

কি হইল যুদ্ধ করি! পাণ্ডবের জয়
আনন্দে করেনি পূর্ণ তোমার হৃদয়?
বিজয়ী পাণ্ডবগণ কুরুক্ষেত্ররণে,
অধিষ্ঠিত ধর্ম্মরাজ রাজসিংহাসনে ;
অকারণে পাণ্ডবের লাঞ্ছনা অপার—
এতদিনে প্রতিফল ফলেছে তাহার ;
হয়েছে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ,—হয়েছে এখন
জনকের জীবনের ব্রত-উদ্‌যাপন।
সেই মোর জীবনের যোগ্য পুরস্কার,
আর কিছু নাহি চাহি, উত্তরা আমার।
ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে এই মহারণ
নহে শুধু ভূমি তরে সংগ্রাম ভীষণ ;—
ধর্ম্মাধর্ম্মে মহারণ চলে নিরন্তর ;
ধর্ম্মাধর্ম্মে মহারণ কুরুক্ষেত্র পরে,
মঙ্গলে ও অমঙ্গলে রণ—জয় তরে।
কৌরবের পরাজয়—অধর্ম্মবিনাশ,
অমঙ্গল-অবসান—মঙ্গল-বিকাশ।
ধর্ম্মক্ষেত্রে মহাযুদ্ধে ক্ষুদ্র এই প্রাণ
ইচ্ছায় করেছি আমি আহুতিপ্রদান।
কে আমি? বিশাল এই সৃষ্টি পারাবার—
তার মাঝে ক্ষুদ্র বিন্দু। কি সাধ্য আমার
নিয়তির গতি রোধি? বিধি বিধাতার
অবশ্য পালিতে হবে, গতি নাই আর।
পালিত বিধির বিধি চরাচরময়,
যে দাঁড়াবে পথে তার, হয়ে যাবে লয়।
কেবল কথার কথা—নর সৃষ্টীশ্বর,
সৃষ্টির নিয়মে নর চলে নিরন্তর ;
প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি শুধু উপকথা সার ;
নিয়তি-অধীন নর পদে পদে তার ;
নিয়তি করায় যাহা নর তাই করে,
তবু সে স্বাধীন বলি গর্ব্বিত অন্তরে!
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম রণ ; সেই রণ করি
শয়ন—নিয়তি মোর, রণশয্যা'পরি।
ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম করেছে পালন,
তবে কেন তার তরে করিছ রোদন?

উত্তরা।

তুমি ত গিয়াছ, নাথ, উত্তরা তোমার
কেন আর বহে বৃথা জীবনের ভার?
জাহ্নবীজীবনে ত্যজি এ পোড়া জীবন
যাব সাথে পূজিতে ও রাজীবচরণ।

অভিমন্যু।

আত্মহত্যা মহাপাপ, সে চিন্তায় স্থান
জীবন থাকিতে হৃদে করিও না দান।
অশান্ত চিত্তের বেগ কর সংবরণ,
ধর ধৈর্য্য—মানবের শ্রেষ্ঠ আভরণ।
জীবন যাহার দান, সময় যখন

তিনিই দিবেন আনি প্রশান্ত মরণ ;
প্রহর অতীত হ'লে অধ্যক্ষ আবার
ফিরাবেন প্রহরীরে, চিন্তা নাই তার।
সাঙ্গ প্রেমলীলা ; এবে স্নেহমন্দাকিনী
বহিবে তোমার হৃদে কলুষনাশিনী।
পতিসেবাব্রত, প্রিয়ে, করেছ পালন,
এখন হয়েছে সেই ব্রত-উদ্‌যাপন ;
এখন নূতন ব্রত নিতেছ আবার,
উদ্‌যাপিত কর ব্রত, আশীষ আমার।
সদ্বংশে জন্মিলে, প্রিয়ে, সেই সুসন্তান
ইহলোকে পরলোকে করে সুখদান।
সুগঠিত কর তার কোমল হৃদয়,
শিখাইও বীরধর্ম্ম,—সদ্‌গুণ নিচয় ;
তার' পরে বংশ-যশ করিবে নির্ভর
পাণ্ডবের বংশে সেই এক বংশধর।
কোমল নারীর হৃদি—স্নেহের নির্ঝর,
জননীত্ব রমণীর গৌরব-আকর।
সযতনে কর, প্রিয়ে, সন্তানপালন,
স্থিরলক্ষ্য রাখ সদা—দেবপদে মন ;
একমনে কর নিজ কর্ত্তব্যপালন ;
পাপী—যে কর্ত্তব্য ত্যজি করে পলায়ন।
পাবে হৃদে মহাশান্তি, নব সুখোদয়
স্বর্গীয় আনন্দে পূর্ণ হবে ও হৃদয়।
হয়েছিল কাল পূর্ণ—ক্ষত্রিয়নন্দন
পালি বীর ধর্ম্ম—আমি লভেছি মরণ ;
সম্বর—সম্বর, প্রিয়ে, নয়নের জল,
শান্তকর মন, হৃদে বাঁধ নব বল।
মর্ত্ত্যের বাসনাভরা আকুল প্রণয়
তোমার হৃদয়ে, প্রিয়ে, হয়ে যাক লয় ;
নব পবিত্রতা লভি যাক দেবস্থানে
যজ্ঞহোমশিখা যথা যায় ঊর্দ্ধপানে।
শুচি হ'ক প্রেম, সহি এ তীব্র যাতন
অগ্নিদগ্ধ স্বর্ণ হয় পবিত্র যেমন।
সূর্য্য যথা চরাচরে বিতরে কিরণ
সর্ব্বভূতে ভালবাসা কর বিতরণ।
ভুল হীন স্বার্থ, প্রিয়ে, ভুল আত্মপর,
আপনার—ভাব মনে—এই চরাচর ;
পরার্থসাগরে স্বার্থ কর বিসর্জ্জন,
আপনা বিলালে, প্রিয়ে, সকলি আপন।
স্বার্থ যে ঢালিয়া দেয় পরার্থের মাঝে,
দিব্যসুখ সদা তার হৃদয়ে বিরাজে।

সময় হয়েছে ;—নিশি অবসানপ্রায়
আমারে যাইতে হবে ;—বিদায়—বিদায়।
দেখ চাহি, বংশপতি ত্যজিয়া গগন
করিছেন অস্তাচলে কর-সংবরণ ;
অনন্ত-অম্বরকোলে তারা অগণন
নিশাশেষে ধীরে ধীরে মুদিছে নয়ন।
নবব্রত উদ্‌যাপিত হউক তোমার,
আবার মিলন হবে মরণের পার।
আমার আশীষে—সর্ব্ব যাতনা বিস্মর ;
শান্ত কর মন, প্রিয়ে, রোদন সম্বর।

উত্তরা।

প্রণাম চরণে, দেব, কর আশীর্ব্বাদ—
ঘুচুক সকল দুঃখ, সকল বিষাদ ;
উদ্‌যাপি' জীবন-ব্রত লভি নব বল,
প্রেম তব হয়ে থাক জীবনসম্বল ;
মরণের পারে যেন—আলোক-আলয়ে
তোমারে ধরিতে পারি, হে প্রিয়, হৃদয়ে।

প্রাচীন কলিকাতার ইংরাজ-সমাজ।*

হেষ্টিংসের সময়।

১

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখনও সমগ্র ভারতবর্ষ ইংরাজের অধিকারে আইসে নাই—ভারতের "আসমুদ্রগিরি" দখল করিয়া বাদশাহের সিংহাসনে বসিবার বাসনা ইংরাজের মনে তখন কেবল উদিত হইতেছিল। ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর একমাত্র উদ্দেশ্য ব্যবসায়ে লাভ করা, ধনী হওয়া। তখন সুয়েজ খালের কল্পনা লোকের স্বপ্নেরও অগোচর, বাষ্পীয়যানেরও চলন হয় নাই; —পালের জাহাজ দীর্ঘ পথ ঘুরিয়া অনেক দিনে যাতায়াত করিত। কাজেই ভারতপ্রবাসী ইংরাজদিগের পক্ষে কথায় কথায় "হোমে" যাওয়াটা এমন সহজ-সাধ্য ছিল না। তাঁহাদিগকে একাদিক্রমে প্রবাসে অনেক দিন কাটাইতে হইত;—ফলে ভারতবাসীদিগের সঙ্গে তাঁহাদের অনেকটা মেশামিশি—ঘনিষ্ঠতা হইত, তাহাদের সুখ দুঃখ, সুবিধা অসুবিধাও তাঁহারা অনেকটা বুঝিতেন। তখন ইংরাজের ও ভারতবাসীর মধ্যে ব্যবধান এত সুস্পষ্ট ছিল না।

তবে তখনও ইংরাজ এ দেশে এখনকারই মত অর্থোপার্জ্জনে ব্যস্ত থাকিতেন। তখন কথা ছিল, ভারতে "প্যাগোডা" গাছ আছে, নাড়া দিলে মোহর পড়ে। তখন ইংলণ্ডের লোকের বিশ্বাস ছিল, ভারতবর্ষে স্বর্ণ রৌপ্য বড় সুলভ। স্বয়ং মেকলে বলিয়াছেন,—তখন ভারতের ঐশ্বর্য্য সম্বন্ধে ইংলণ্ডের লোকের বড় অদ্ভুত ধারণা ছিল। তখন কাজের লোকেরাও সত্যসত্যই বিশ্বাস করিত,—ভারতে কেবলই বহুমূল্য প্রস্তরের প্রাসাদ, স্তূপাকার মণি মুক্তা, কক্ষপূর্ণ স্বর্ণ-মুদ্রা। তখন কেহই বুঝিত না যে, য়ুরোপের যে সকল দেশ দরিদ্র বলিয়া পরিগণিত, ভারতবর্ষ সে সকলের অপেক্ষা দরিদ্র;—ভারতবর্ষ আয়র্লণ্ডের বা পর্টুগালের অপেক্ষাও দরিদ্র। যে সকল ইংরাজ ভারতবর্ষ হইতে অর্থোপার্জ্জন করিয়া দেশে ফিরিতেন, তাঁহাদিগকে "নবাব" বলিত। মেকলে ইঁহাদের কথায় বলিয়াছেন,—ইহারা প্রায়ই দরিদ্র অনামাবিনামা বংশোদ্ভূত। অল্পবয়সে প্রাচ্যদেশে প্রেরিত হইয়া সেখানে ধনোপার্জ্জন করিয়া দেশে ফিরিত। ভাল

* সাহিত্য পরিষদের মাসিক অধিবেশনে পঠিত হইয়াছিল।

সমাজে মিশিতে না পারায় তাহারা যে 'আঙ্গুল ফুলিয়া কলাগাছের' অদ্ভুতত্ব ও আড়ম্বরপ্রিয়তা দেখাইবে, তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই! এসিয়ায় অবস্থানকালে তাহারা যে য়ুরোপবাসীদিগের নিকট বিস্ময়কর বা বিরক্তিকর কতকগুলা পসন্দ ও অভ্যাস লইয়া অসিবে, তাহা নিতান্তই স্বাভাবিক। প্রাচ্যে তাহাদের মান সম্ভ্রম, পদ প্রতিপত্তি ছিল, কাজেই দেশে আসিয়া তাহারা নগণ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে চাহে না। তাহারা ধনশালী, কিন্তু তাহাদের বংশ-গৌরব বা বড়ঘরের সহিত সম্বন্ধ,কিছুই নাই; কাজেই তাহারা তাহাদের একমাত্র সম্বল ঐশ্বর্য্যের জাঁক দেখাইতে চাহে। তাহারা যেখানেই বাস করিতে আরম্ভ করে, সেখানেই প্রাচীন অভিজাতবংশীয়দিগের সহিত তাহাদের বিরোধ আরম্ভ হয়। যাঁহারা সমসাময়িক সাহিত্যে এই সকল সাধারণসমক্ষে হুক্কার ধূমপানপ্রিয় "নবাব"দিগের সরস কথা পাঠ করিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে ঔপন্যাসিক থ্যাকারের চিরমধুময় উপন্যাস পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

অর্থোপার্জ্জনই ইংরাজের একমাত্র উদ্দেশ্য। কোম্পানীর লোকেরা উপার্জ্জ-নোপায়ের ভালমন্দ বড় বিচার করিতেন না। টাকা হইলেই হইল। হেষ্টিংসের চরিতাখ্যায়ক ট্রটার বলিয়াছেন, ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে পাটনায় হেষ্টিংস পথে দেখিয়া-ছিলেন, প্রায় প্রতি পল্লীতেই পল্লীবাসীরা ইংরাজ ব্যবসাদার ও তাহাদের অনু-চরবর্গের অর্থ সংগ্রহের ভয়ে পলাইয়াছে, দোকানীরা দোকানপাট বন্ধ করি-য়াছে। তিনি বুঝিয়াছিলেন, তাঁহার স্বদেশীয়দিগের আইনবিগর্হিত কার্য্যে নবাবের রাজস্বের, দেশের শান্তির ও ইংরাজ জাতির সম্মানের হানি হইবে। সে কেবল দুর্ব্বলতা, ভীতি বা আলস্য প্রযুক্ত প্রতিরোধে অক্ষম প্রতিবাসীর প্রতি সবলের অত্যাচার। এক দিকে দয়াহীন সভ্যতার বল,অপর দিকে বহুশতাব্দীর অত্যাচারী শাসকপীড়িত, বর্ণবিভক্ত, উষ্ণপ্রধান দেশের প্রভাবসিক্ত, দুর্ব্বল জনগণ। বাঙ্গলার অধিবাসীরা যেন সর্ব্বস্ব অপহরণের অপেক্ষাই করিতেছিল।

তখন ইংলণ্ডের মুদ্রায় টাকার দর ছিল দুই শিলিংএর উপর। আর এখন সওয়া শিলিং মাত্র।

তখন ইংরাজদের আয়ও যেমন অধিক ছিল, ব্যয়ও তেমনই অতিরিক্ত ছিল। ফ্রান্‌সিস বাড়ী ভাড়া দিতেন একশত পাউণ্ড! একত্র বাস করিতেন চারি জন, ভৃত্যের সংখ্যা ছিল—একশত দশ! ফ্রান্‌সিসের আত্মীয় ম্যাক্রাবীর মতে ইহারা সব আলস্যের অবতার। ইহাদের কায দেখিয়া লইবার জন্য আবার এক পাল সরকার ছিল। তিনি বলেন, ইহাদের প্রধান গুণ এই যে

ইহারা মাতাল কিংবা উদ্ধত নহে। "ইহাদিগকে বাটীর বাহির করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলে আমার যত আরাম হইবে, তত আর কিছুতেই হইবে না।"

এই সকল ব্যয়বাহুল্য দেখিয়া কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষগণ ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে আদেশ প্রচার করেন যে, জুনিয়ার সিবিলিয়ানগণ প্রত্যেকে কেবল একজন খাবুর্চ্চি ও তুই জন চাকর নিযুক্ত করিতে পারিবেন; ঘোড়া কি বাগানবাড়ী রাখিতে পাইবেন না। এতদ্ভিন্ন তাঁহাদিগকে সাদাসিদা পোষাক ব্যবহার করিতে হইবে।

তখন অনেকে আবার ক্রীতদাসদাসী রাখিতেন। ইহাদের ক্রয়বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন "কলিকাতা গেজেটে" প্রকাশিত হইত।

একবার কলিকাতার ইংরাজগণ কমিটি করিয়া ভিন্ন ভিন্ন চাকরের বেতনের হার নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। ধনীর পক্ষে ভৃত্যকে অধিক বেতন দেওয়া সম্ভব; কিন্তু তাহাতে অপেক্ষাকৃত দরিদ্রের অসুবিধা হয়। কাজেই স্থির হয়, যদি কেহ ভৃত্যকে এই নির্দ্দিষ্ট বেতনের অধিক দেন তবে তিনি আদালতের বিচার পাইবেন না, কোম্পানী তাঁহার ধনপ্রাণরক্ষার জন্য দায়ী হইবেন না। ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে "কলিকাতা গেজেটে" ভৃত্যদিগের বেতনের হারের যে তালিকা প্রকাশিত হয়, তাহা দেখিলে বোধ হয় যে, এই এক শতাব্দী পরেও ভৃত্যদিগের বেতনের হারের বিশেষ বৃদ্ধি হয় নাই। ভৃত্যগণ পূর্ব্বে না জানাইয়া কর্ম্মত্যাগ করিলে বিশেষ শাস্তি পাইত। এই স্থলে আমরা পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্টের ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দের charge sheet হইতে ভৃত্যদিগের শাস্তির কতকগুলি নমুনা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

জন রিংওয়েল নালিশ করেন, তাঁহার পাচক না বলিয়া চলিয়া গিয়াছে এবং তাহার স্থানে নিযুক্ত নূতন লোককে প্রহার করিয়াছে। শাস্তি—দশ বেত ও কর্ম্মচ্যুতি।

এণ্ডার্সন নালিশ করেন, তাঁহার ক্রীতদাসী পলায়ন করিয়াছিল; ধৃত হইয়াছে। শাস্তি—পাঁচ বেত ও মনিবের নিকট পুনঃপ্রেরণ।

কাপ্তেন স্কট নালিশ করেন, একজন তাঁহার গাড়ী মেরামত করিবে বলিয়াছিল, কিন্তু করে নাই। শাস্তি—দশ জুতা।

কর্ণেল ওয়াটসন নালিশ করেন, রামসিং ছুতার বলিয়া বেতন লইয়াছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে নাপিত। শাস্তি দশ বেত ও ঢোল সোহরতে কুলিবাজার প্রদক্ষিণ।

জেকব জোসেফ নালিশ করিলেন, তাঁহার বাবুর্চ্চি একটা পিত্তলপাত্র ও শিলনোড়া চুরি করিয়াছে। শাস্তি—যত দিন জিনিস না দেয়, ততদিন হরিণবাড়ীর জেলে বাস।

কাণ্টওয়াল নালিশ করিলেন, তাঁহার মেথরাণী খালি বোতল চুরি করিয়াছে। শাস্তি—মেথরাণীর দশ বেত, ক্রেতা দোকানী ভক্তরামের বিশ বেত, আর উভয়কে গোযানে সহর প্রদক্ষিণ করান, এবং সঙ্গে সঙ্গে ঢোল সোহরতে তাহাদের অপরাধের ও শাস্তির কথা প্রচার।

শাস্তি যে কেবল ভৃত্যদেরই হইত, এমন নহে। ইংরাজ মনিবদিগকেও সময় সময় শাস্তি পাইতে হইত। ভৃত্যকে প্রহার করার অপরাধে জনসন নামক এক ব্যক্তির জরিমানার আদেশ হয়। জরিমানা না দেওয়ায় এবং আদালতে হাজির না হওয়ায় তাহাকে কারারুদ্ধও হইতে হইয়াছিল।

এখন একটি পরমহাস্যোদ্দীপক মকদ্দমার কথা বলিয়া শেষ করিব—

মহম্মদ নালিশ করিল, রামজানীর স্ত্রী তাহার স্ত্রীকে গালি দিয়াছে। বিচারে প্রমাণ হইল, উভয়েরই দোষ সমান। সামান্য বিষয় লইয়া আদালতকে বিরক্ত করার অপরাধে উভয়েরই পাঁচ টাকা করিয়া জরিমানার আদেশ হইল।

যে যানে কয়েদীদিগকে লইয়া যাওয়া হইত, সে এক অদ্ভুত জিনিস। কুমারী গোল্ডবোর্ণ তাহার এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।—এই যানের চক্র চৌদ্দ ফিট উচ্চ, ধুরার নিম্নে দুই জন কয়েদীর স্থান সঙ্কুলান হয়, এমন একটি ছিদ্রবহুল কাষ্ঠের পিঞ্জর লম্বমান। সেই পিঞ্জরে আবদ্ধ ও সিপাহীগণে বেষ্টিত হইয়া কয়েদীরা লোকচক্ষুর গোচরীভূত হইত।

তখন ছোকরা সিবিলিয়ান অর্থাৎ ইংরাজ কেরাণীরা বৈকালে সাড়ে সাতটা হইতে নয়টা পর্য্যন্ত ও প্রাতে—গ্রীষ্মকালে নয়টা হইতে বারটা এবং প্রাতঃকালে দশটা হইতে দেড়টা পর্য্যন্ত আফিস করিতেন। তবে হেড আফিসে কোন বিশেষ কাগজপত্র পাঠাইতে হইলে বৈকালে অধিকক্ষণ কার্য্য করিতে হইত।

তখন প্রাতে সকলেই পদব্রজে বা অশ্বারোহণে ভ্রমণে বাহির হইতেন। তাহার পর নয়টার সময় প্রাতরাশ ও দুইটার সময় ডিনারের নিয়ম ছিল। আহার বড় অল্প হইত বলিয়া মনে হয় না। একজন পসারহীন ব্যারিষ্টারের পত্নী একদিনের ভোজ্যতালিকা দিয়া বলিয়াছেন,—"গ্রীষ্মে ক্ষুধামান্দ্য হয় না।" তখন মদ্যপানটা কিছু অধিক প্রচলিত ছিল। প্রায়ই রমণীরা এক বোতল

এবং পুরুষেরা চারি বোতল মদ্য পান করিতেন! কাজেই বৈকালিক ভ্রমণের পূর্ব্বে প্রকৃতিস্থ হইবার জন্য সকলেই যে নিদ্রার শরণ লইতেন, তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছু কারণ নাই।

সন্ধ্যাসমাগমে সকলে পুনরায় ভ্রমণে বাহির হইতেন। ভ্রমণের প্রধান স্থান ছিল—লালদীঘি ও পুরাতন দুর্গের প্রাকার। বলা বাহুল্য অবস্থাপন্নগণ গাড়ীতে বাহির হইতেন। মহিলা গাড়ী হাঁকাইতেন, পুরুষ "নিষ্ক্রিয় আলসে" পার্শ্বে বসিয়া থাকিতেন। রাস্তাগুলা বড়ই কদর্য্য ছিল; তাহার উপর আবার বিষম ধূলা। সেই জন্য কেহ কেহ আবার নদীবক্ষে নৌবিহারে যাইতেন।

গৃহে ফিরিয়া চা বা কফি পান হইত। তাহার পর পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎ, (visiting অর্থাৎ বাড়ীবেড়ান)।

তখনও টানা পাখার প্রচলন হয় নাই। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৯০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোনও সময়ে টানা পাখার প্রচলন হয়। কাহারও কাহারও মতে প্রবাসী ইংরাজগণ পর্টুগিজদিগের নিকট ইহার ব্যবহার শিক্ষা করেন; আবার কেহ কেহ বলেন, একজন ফিরিঙ্গি কেরাণী একদিন কেল্লায় কাজ করিতে করিতে গরমে ও মশায় জ্বালাতন হইয়া—ক্যাম্প টেবিলের উপরার্দ্ধ খুলিয়া কড়িতে টাঙ্গাইয়া ভৃত্যকে তাহা দোলাইতে বলিয়াছিল;—সেই হইতে টানাপাখার উৎপত্তি। যেখান হইতেই হউক, আবিষ্কারক যে আমাদের কৃতজ্ঞতার পাত্র, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই।

তখন ইংলণ্ডে জুয়াখেলার বিশেষ প্রচলন ছিল। কাজেই ভারতবাসী ইংরাজসমাজেও যে এ দোষ প্রচলিত হইবে, তাহা বিস্ময়ের বিষয় নহে। জুয়াখেলায় ফ্রান্সিস বিশেষ দক্ষ ছিলেন। তিনি যে প্রচুর অর্থ লইয়া দেশে প্রত্যাগমন করেন, তাহার অধিকাংশই যে জুয়ায় অর্জ্জিত তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। তাঁহার স্বলিখিত পত্রে এবং তাঁহার শ্যালক ও প্রাইভেট সেক্রেটারী ম্যাক্রাবীর কথাতেও ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। তখন ইংরাজসমাজে পরস্পরকে আয়ত্তাধীন করিবার জন্য জুয়াখেলায় ঋণী করিবার চেষ্টা করা হইত। বারওয়েল ফ্রান্সিসকে আয়ত্তাধীন করিবার জন্য এই উপায় অবলম্বন করেন কিন্তু ফলে তিনিই ফ্রান্সিসের নিকট অনেক টাকার দায়ী হইয়া পড়েন।

এই সময় কলিকাতা বড়ই অস্বাস্থ্যকর ছিল। কাজেই ডাক্তারদের আয় ছিল প্রচুর। তাঁহারা পাল্কীতে বাহির হইতেন;—"ভিজিট" লইতেন একমোহর।

কলিকাতা সহর তখন বড় অপরিচ্ছন্ন ছিল। অনেক সময় দেখা যাইত, দরিদ্রের শবদেহ প্রকাশ্য রাজপথে পড়িয়া পচিতেছে। একে সহর এইরূপ অপরিষ্কার, তাহাতে আবার মদ্যপান হইত অতিরিক্ত, সুতরাং ডাক্তারের আয় ও মৃত্যুর হার অধিক হইবারই কথা। ইহার উপর আবার চিকিৎসকদিগের অধিকাংশই 'হাতুড়ে'মাত্র। তখন ইংরাজদিগের বিশ্বাস ছিল যে, "সাদাজল" জ্বরের কারণ, আর জ্বরের একমাত্র প্রতিষেধক "লালপানি"। বর্ষাকালেই জ্বর কিছু প্রবল হইত। আর যাঁহারা এক বর্ষা কাটাইতে পারিতেন, তাঁহারা জ্বরঋতু উত্তীর্ণ হইলে মহাসমারোহে ভোজের আয়োজন করিতেন। একবার এক পত্র-সম্পাদক পাঠকগণকে জানাইয়াছিলেন যে, তিনি চিকিৎসকের মত লইয়া জানিয়াছেন, সেপ্টেম্বর মাসে সর্দ্দিজ্বরের একমাত্র ঔষধ অধিকপরিমাণে পোর্টমদ্যপান (Drink deep of Rosy Port)। আবার একবার সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইল, জুন মাসে—বড় গরমের সময় অধিক ভোজন অনুচিত।

১৭৮০ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসের সংবাদপত্রে দেখিতে পাই, অনেকে গলা ফুলিয়া জ্বরে মরিতেছে।

১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে ২২শে অক্টোবর বিচারপতি হাইড লিখিতেছেন,—প্রধান বিচারপতি ইম্পে অনুপস্থিত ; কারণ, তিনি পীড়িত,—গলা ফুলিয়াছে। বিচারপতি চেম্বার্স অনুপস্থিত—জ্বর হইয়াছে। উপস্থিত কেবল আমি। আমারও জ্বর হইয়াছিল, তবে এখন একটু সুস্থ হইয়াছি। প্রধান বিচারপতি ইম্পে এক স্থলে বলিয়াছেন যে, বৎসরের মধ্যে তিন বার আমার বিসূচিকা হয়।

তখন চিকিৎসার প্রধান অঙ্গ ছিল—রক্তমোক্ষণ। রোগে কি চিকিৎসায়, রোগী কোনটায় মরিত, অনেক স্থলেই তাহা নিশ্চিত করিয়া বলা দুষ্কর।

এই সময়ের প্রায় বাট বৎসর পরে মেকলে লিখিয়াছিলেন, এ আবহাওয়ায় কেবল পোকামাকড় আর শববাহীরা (Undertakers) স্ফূর্ত্তি পায়। বৎসরে চার মাস ভাজা হইতে হয়, চার মাস সিদ্ধ হইতে হয়, আর অবশিষ্ট চার মাসে শীতল হইবার সম্ভাবনা থাকে।

ফ্রান্সিস তাঁহার কোন বন্ধুকে লিখিয়াছিলেন,—আশা করি,আবার সাক্ষাৎ হইবে—অবশ্য এই জগতে। কিন্তু যদি স্বেচ্ছায় আর কখনও এমন কুস্থানে আসি, তবে যেন আমি জাহান্নমে যাই।

তবে যে অর্থের জন্য এত কষ্ট, সে অর্থ যে যথেষ্ট মিলিত, সে বিষয়ে দ্বিমত

নাই। ভারতপ্রবাসী ইংরাজ বাঁচিলে ধনী হইয়া দেশে ফিরিতেন। সার ইলাইজা ইম্পে পাঁচ বৎসর চাকরী করিয়া লিখিতেছেন, তিনি কোন বৎসরই তিন হাজার পাউণ্ডের (এখনকার দরে প্রায় ৪৫০০০ টাকা) অধিক উদ্বৃত্ত করিতে পারেন নাই। বড় অল্প!

এই সময়ে ভারতপ্রবাসী ইংরাজসমাজে মহিলাদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ছিলেন অবশ্য গভর্ণরজেনারেলের পত্নী মিসেস্ হেষ্টিংস। হেন্‌কক নামক হেষ্টিংসের এক জন প্রিয়পাত্রের পত্রে ইহার প্রথম উল্লেখ দেখিতে পাই (এপ্রিল—১৭৭২) ইমহফ নামক এক জন জার্ম্মান সৈনিক কর্ম্মের অন্বেষণে ভারতবর্ষে আগমন করেন। তিনি চিত্রবিদ্যায় পটু ছিলেন। কোন কাযের সুবিধা না হওয়ায় তিনি চিত্রকরের ব্যবসায় (miniature painter) অবলম্বন করেন। মিসেস্ হেষ্টিংস তাঁহার পত্নী। ইম্‌হফ-দম্পতী হেষ্টিংসের সহিত এক জাহাজে ভারতে আসিয়াছিলেন। শ্রীমতীর সহিত মান্দ্রাজেই হেষ্টিংসের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। হেষ্টিংস কলিকাতায় আসিলে ইম্‌হফ-দম্পতীও কলিকাতায় আসেন। ঘনিষ্ঠতা ক্রমেই অধিক হইতে লাগিল। হেন্‌ককের পত্রের ভাবে বোধ হয়, ইম্‌হফ পত্নীকে রাখিয়া ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে ভারত ত্যাগ করেন। বোধ হয়, স্ত্রীত্যাগের বন্দোবস্ত করিতে। কুলোকে বলে, তিনি অর্থলোভে এ কার্য্যে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। এই সময় হেন্‌কক লিখিয়াছেন, শ্রীমতী দেখিতে সুশ্রী,বুদ্ধিমতী,চতুরা, বয়স প্রায় ছাব্বিশ বৎসর। কিন্তু ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সিস লিখিয়াছিলেন, শীঘ্রই হেষ্টিংসের বিবাহ হইবে। পাত্রীর বয়স প্রায় চল্লিশ বৎসর। তিনি এক জন জার্ম্মান চিত্রকরের পত্নী বলিয়া পরিচিত। তাঁহার সেই 'কথিত' স্বামীর ঔরসজাত কতকগুলি বয়স্ক সন্তানও আছে। তবে তিনি অনেক দিন হেষ্টিংসের সহিত স্ত্রীরূপে বাস করিতেছেন। তিনি লোক মন্দ নহেন, এক সময়ে সুশ্রীও ছিলেন। কন্যাদান করিবেন—বিচারপতি ইম্পে। কিন্তু তাঁহার পত্নীর সহিত পাত্রীর প্রায় এক বৎসর বাক্যালাপ বন্ধ।

জুলাই মাসের প্রথমে পূর্ব্বস্বামীর সহিত বিবাহচ্ছেদের সংবাদ আসিলে, ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দের ৮ই আগষ্ট শুক্রবার বিবাহ ব্যাপার নিষ্পন্ন হয়। পাত্রী জন্মগ্রহণ করেন ১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে, সুতরাং এই সময় তাঁহার বয়স ত্রিশ বৎসর। এই সময় হেষ্টিংসের বয়স পঁয়তাল্লিশ বৎসর।

মেকলে তাঁহার স্বাভাবিক সুললিত ভাষায় এই ব্যাপারের যে বিবরণ লিপি-

১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে হেষ্টিংস ভারতে আসিতেছিলেন, সেই জাহাজে ইম্‌হফ নামক এক জন জার্ম্মান যাত্রী ছিলেন। তিনি আপনাকে 'ব্যারণ' (Baron) বলিয়া পরিচয় দিতেন। দুঃস্থ হইয়া চিত্রকরের ব্যবসায়ে ভারতে সহজপ্রাপ্য অর্থের লাভাশায় ভারতে আসিতেছিলেন। ব্যারণের পত্নী তাঁহার সহিত আসিতেছিলেন। এই প্রতীচ্যদেশসম্ভূতা যুবতী দেখিতে সুন্দরী, তাঁহার মানসিক অনুশীলন ছিল, তাঁহার ব্যবহারও চিত্তাকর্ষক। তিনি তাঁহার স্বামীকে বিশেষ ঘৃণা করিতেন। তিনি হেষ্টিংসের কথাবার্ত্তায় আকৃষ্টা ও তাঁহার প্রতি হেষ্টিংসের মনোযোগে তুষ্টা হইতেন। ভারতযাত্রী জাহাজে যেমন আন্তরিক বন্ধুত্ব বা বিষম শত্রুতার সঞ্চার হয়, তেমন আর কুত্রাপি হয় না। সুদীর্ঘকালব্যাপিনী জলযাত্রা স্বভাবতঃই বড় একঘেয়ে ও বিরক্তিকর। সে সময়ে যাহা হউক একটা কিছু ঘটিলে সে একঘেয়েমি দূর হয়—তা সে আর একখানা জাহাজের আগমনই হউক, একটা হাঙ্গর বা একটা বিহঙ্গম নয়নগোচরই হউক, আর একটা লোকই জাহাজ হইতে জলে পড়ুক। কেহ কেহ অত্যধিক আহার করিয়া সময় কাটায়; কিন্তু অনেকেই কলহে বা প্রেমক্রীড়ায় (Flirting) সময় কাটায়। দুইয়েরই সুবিধা প্রচুর। যাত্রীরা অনেক সময়ই একত্র থাকে; আপনার কোটরে আবদ্ধ হওয়া ভিন্ন অন্য যাত্রীদিগের সঙ্গত্যাগের উপায়মাত্র নাই। ভোজন, ব্যায়াম, সবই একত্র। জাহাজে এক জন যাত্রী ইচ্ছা করিলেই সহযাত্রীদিগকে বিরক্ত করিতে বা সন্তুষ্ট করিতে পারে। জাহাজ ভিন্ন অন্যত্র সমাজে যে সকল দোষ বা গুণ হয় ত বহুদিন অজানিত থাকিত, তাহা অনেক সময় আকস্মিক দুর্দ্দশায় বা বিপৎপাতে প্রকাশিত হয়। এইরূপ অবস্থায় ব্যারণেস ইম্‌হফের সহিত হেষ্টিংসের সাক্ষাৎ হয়,—উভয়েই অসাধারণ মনীষাসম্পন্ন। হেষ্টিংস অকৃতদার—ব্যারণেসের স্বামী আত্মসম্মানজ্ঞানহীন, পত্নী তাঁহাকে ঘৃণা করিতেন। এই সময় আর একটি ঘটনা ঘটিল—হেষ্টিংস পীড়িত হইয়া পড়িলেন। ব্যারণেস রমণীসুলভ কোমলতাসহকারে অনিদ্রায় তাঁহার শুশ্রূষা করিলেন। জাহাজ মান্দ্রাজে পঁহুছিবার পূর্ব্বেই হেষ্টিংস ব্যারণেসের প্রণয়াসক্ত হইলেন। তাঁহার প্রেম, তাঁহার ঘৃণা, উচ্চাভিলাষ প্রভৃতিরই মত প্রবল, কিন্তু স্থির গভীর, ও আন্তরিকতাপূর্ণ; তাহা বিলম্বে বিলুপ্ত হইবার নহে। ইম্‌হফ সব শুনিয়া অর্থলোভে স্বীকার করিলেন যে, তাঁহার পত্নী বিবাহবিচ্ছেদের নালিশ করিলে তিনি তাহার সব সুবিধা করিয়া দিবেন। স্থির হইল, বিবাহবিচ্ছেদ হইয়া গেলে হেষ্টিংস ব্যারণেস্‌কে বিবাহ করিবেন, এবং তাহার সন্তানগণের পালনের ভার লইবেন।

ইহার পর মেকলে বলিয়াছেন, মহাসমারোহে হেষ্টিংসের বিবাহব্যাপার সম্পন্ন হয়। কলিকাতায় ইংরাজসমাজে শত্রুমিত্র সকল পদস্থ ব্যক্তিই নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। মুতাক্ষরীণ-কার বলেন, ক্লেভারিং তখন শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতাবশতঃ বিবাহে আসিতে অক্ষমতা জানাইয়াছিলেন। হেষ্টিংস নাছোড় হইয়া তাঁহার গৃহে যাইয়া তাঁহাকে লইয়া আসেন। এই টানা-হেঁচড়ায় ক্লেভারিং অসুস্থ হইয়া পড়েন। কয় দিন পরেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

রঘুবংশ;—দিলীপ-কথা।

আজন্মশুদ্ধ রঘুকুলের কথা, শুদ্ধিমান দিলীপ রাজার চরিত্রব্যাখ্যা হইতে আরব্ধ হইয়াছে। দিলীপ বহুবিবাহ করিয়াছিলেন; কিন্তু কবি যে ভাবে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় না যে, বহুপত্নীগ্রহণে রাজার নিজের কিছু হাত ছিল। দুইটি কারণে মনুর পবিত্রস্মৃতিশাসিত ভারতবর্ষেও, রাজাদিগের মধ্যে বহুবিবাহ অনুষ্ঠিত হইত। সেকালেও হইত, একালেও হয়। রাজকুমারী-দিগের উপযুক্ত বর সহসা জুটিয়া উঠা দুঃসাধ্য; কারণ, রাজপরিবার ভিন্ন অন্যত্র বিবাহিতা হইলে, বংশমর্য্যাদা বজায় থাকে না। এই জন্য অনেক সময়ে কেবল-মাত্র রাজবংশের মর্য্যাদারক্ষার জন্য, অনেক রাজা ও রাজকুমারদিগকে বহুপত্নীগ্রহণ করিতে বাধ্য হইতে হইত। দ্বিতীয়তঃ, দায়াদসূত্রে ভিন্নবংশীয় ব্যক্তি রাজসিংহাসন অধিকার করিলে,প্রজাদিগের চক্ষে রাজবংশের পরম্পরাগত গৌরব ও মাহাত্ম্য কমিয়া যাইত; এবং যে রাজভক্তি বংশনিষ্ঠ বলিয়া প্রবল, তাহার ন্যূনতা হইবার সম্ভাবনা ঘটিত। এই জন্য পত্নী অপুত্রবতী হইলে, পুনঃ পুনঃ বিবাহ করিতে হইত। রাজা দিলীপ যে এই শেষোক্ত কারণে বহুপত্নী গ্রহণ করেন নাই, তাহা উদ্ধৃত শ্লোক দুইটি পড়িলেই বুঝিতে পারা যায়,—

> কলত্রবন্তমাত্মানম্ অবরোধে মহত্যপি।
> তয়া মেনে মনস্বিন্যা লক্ষ্ম্যা চ বসুধাধিপঃ॥
> তস্যামাত্মানুরূপায়াম্ আত্মজন্মসমুৎসুকঃ।
> বিলম্বিতফলৈঃ কালং স নিনায় মনোরথৈঃ॥

অর্থ;—বহুপত্নী থাকিলেও, রাজা দিলীপ কেবল মনস্বিনী সুদক্ষিণা এবং

রাজ্যলক্ষ্মী দ্বারাই আপনাকে কলত্রবান মনে করিতেন। এবং আপনার অনুরূপ সেই পত্নীতে পুত্রলাভের অভিলাষী হইয়া দীর্ঘকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন। ইহাতেই ধ্বনিত হয় যে, বহুপত্নীগ্রহণ, রাজার ইচ্ছানুসারে হয় নাই। পুত্রলাভে বঞ্চিত হইয়া তিনি যে কত মনোবেদনা পাইয়াছিলেন, তাহা ঋষির আশ্রমে গিয়া বলিয়াছেন ;—

অসহ্যপীড়ং ভগবন্ ঋণমন্ত্যমবেহি মে।
অরুন্তুদমিবালানম্ অনির্বাণস্য দন্তিনঃ॥

পুনশ্চ,—

ন মামবতি সদ্বীপা রত্নসূরপি মেদিনী।

এতটা কষ্ট, তথাপি তিনি সুদক্ষিণা ব্যতীত অন্য কাহারও সহিত পতিপত্নীত্ব সম্বন্ধে সম্বন্ধ হয়েন নাই ; দীর্ঘকাল পুত্রলাভে বঞ্চিত হইয়াও অন্যপত্নীসেবা করেন নাই। এই জন্যই কবি রাজা দিলীপকে মনুর পবিত্র আদর্শে গঠিত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। রাজা দিলীপের পবিত্রতা ও বিশুদ্ধি হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, প্রথম দুইটি সর্গের সমগ্র বর্ণনার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে হয়। প্রথম সর্গ, কেবল রাজা ও রাণীর আশ্রমযাত্রার বর্ণনায় শেষ হইয়াছে। কিন্তু সেই বর্ণনার দিকে লক্ষ্য করিয়া দেখুন যে, কাব্যশিল্পী, প্রকৃতির রমণীয় সৌন্দর্য্যের বর্ণনায় কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয়েন নাই ; অথচ তাহার মধ্যে পবিত্রতার বর্ণনা ভিন্ন অন্য কিছু নাই। সে বর্ণনায় ভাবের উদ্দীপনা যথেষ্ট আছে, কিন্তু সে ভাব কেবল পবিত্রতা। রঘুবংশের কতিপয় সর্গ, বিদ্যালয়ে নিত্যপঠিত বলিয়া, অধিক দৃষ্টান্ত তুলিবার প্রয়োজন দেখিতেছি না। যখনই এই বর্ণনার কথা মনে পড়ে, তখনই মানসপটে, রাজা ও রাজমহিষীর অবর্ণনীয় শুদ্ধতা-পরিবেষ্টিত সৌন্দর্য্য দেখিতে পাই ;—

কাপ্যভিখ্যা তয়োরাসীৎ ব্রজতোঃ শুদ্ধবেশয়োঃ।
হিমনির্মুক্তয়োর্যোগে চিত্রাচন্দ্রমসোরিব॥

যুবকযুবতীর বর্ণনায়, এত গাম্ভীর্য্য ও পবিত্রতা, অথচ অতুল্য রমণীয়তা, অন্য গ্রন্থে দেখি নাই। মাঘ কবির শিশুপালবধের প্রথম সর্গে গাম্ভীর্য্যপূর্ণ বর্ণনা অনেক আছে। কিন্তু তাহাতে কালিদাসের হৃদয়স্নিগ্ধকারি সরসতা নাই। বুড়া গোয়ালা, পথের গাছ, এ সকলই শুদ্ধতা ও সৌন্দর্য্যে বেষ্টিত। কালিদাস ভিন্ন কাহার সাধ্য যে, একটা গরুর সৌন্দর্য্যবর্ণনায় মন ভুলাইয়া দেন ? ঐ দেখ, কামদুঘা নন্দিনী—

ললাটোদয়মাভুগ্নং পল্লবস্নিগ্ধপাটলা।
বিভ্রতী শ্বেতরোমাঙ্কং সন্ধ্যেব শশিনং নবম্॥

রাজার সম্বন্ধে কবি লিখিয়াছেন যে, প্রকৃতির শোভা দেখিতে দেখিতে এবং দেখাইতে দেখাইতে, "অপি লঙ্ঘিতমধ্বানং বুবুধে ন বুধোপমঃ"। আমরাও দেখিতেছি যে, কোথাও কটাক্ষের ছটা নাই, স্রস্ত কঞ্চুক নাই, অথচ একটা দীর্ঘ সর্গ পড়িয়া মনে হয় না, এতটা পড়িলাম। প্রকৃতিবর্ণনায় দ্বিতীয় সর্গ সম্বন্ধেও ঐ কথা। কিন্তু কেহ কেহ ভাবিতে পারেন যে, যদিও দ্বিতীয় সর্গের প্রকৃতিবর্ণনা অতি মনোহারিণী; যদিও "মৃগাধ্যাসিতশাদ্বলানি" "শ্যামায়মানানি বনানি" দেখিতে দেখিতে নয়ন মুগ্ধ হয়, কিন্তু তাই বলিয়া নন্দিনীর সেবা ও বরলাভ, এই সামান্য কথার বর্ণনায়, একটা সর্গ পরিসমাপ্ত হইল। কিন্তু দ্বিতীয় সর্গে কবি যে মহতী শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারিলেই ইহার গৌরব অনুভব করিতে পারা যায়।

রাজা ঋষি কর্তৃক আদিষ্ট হইয়াছেন যে, তাঁহাকে নন্দিনীর সেবা করিতে হইবে। কর্তব্যপালনের জন্য রাজা প্রতিদিন বনে বনে গোচারণ করিতেছেন, এমন সময় একদিন দৈবাৎ একটা সিংহ নন্দিনীকে আক্রমণ করিল। এই বিপৎপাতটি নন্দিনীর মায়ার খেলা। ক্ষত্রিয়বীর, নন্দিনীর উদ্ধার করিবার জন্য সিংহবধে উদ্যত হইলেন। কিন্তু হাতের শর হাতে রহিয়া গেল; শরচালনা দূরে থাকুক,অঙ্গচালনা পর্য্যন্ত বন্ধ হইয়া গেল; রাজা চিত্রার্পিতের মত দাঁড়াইয়া রহিলেন। তখন সিংহ রাজাকে বলিলেন যে, তিনি যে সে সিংহ নহেন, তিনি অষ্টমূর্ত্তির "পাদর্পণানুগ্রহপূতপৃষ্ঠঃ"। তাঁহার শোণিতপারণার জন্য নন্দিনী উপস্থিত; কাজেই নন্দিনী অবশ্যবধ্য। সিংহ রাজাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, তাঁহার কোন লজ্জার কারণ নাই। কারণ তিনি গুরুর আদিষ্টকার্য্য করিতে ত্রুটি করেন নাই; রক্ষা করিতেও চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু শস্ত্রবল যখন বৃথা হইল, তখন তাঁহার অপরাধ কি? রাজা তখন সিংহকে বলিলেন যে, যদি শোণিতপারণাই উদ্দেশ্য, তবে নন্দিনীর পরিবর্ত্তে আমাকে গ্রহণ কর। ইহার উত্তরে সিংহ যাহা বলিলেন, তাহা বড় উপযোগী। সিংহ বলিলেন যে, একটা নন্দিনীর পরিবর্ত্তে তুমি কোটি কোটি গোদান করিয়া ঋষিকে তুষ্ট করিতে পার; এরূপ অবস্থায় এই তুচ্ছ গোরুটির জন্য তোমার একাতপত্র প্রভুত্ব, নবীন যৌবন ও সুন্দর শরীর ধ্বংস করা কি মূঢ়তা নয়?

অল্পস্য হেতোর্বহু হাতুমিচ্ছন্
বিচারমূঢ়ঃ প্রতিভাসি মে ত্বং।

lute duty, অন্য দিকে utility। এক দিকে ক্ষুদ্র গো-রূপ কর্ত্তব্যপালনে শরীরপাত; অন্য দিকে বড় বড় কার্য্যের জন্য উপযোগী শরীরটির রক্ষার কথা। কর্ত্তব্যের ছোট বড় নাই। যাহা উপস্থিত, তাহা অতি ক্ষুদ্র হইলেও পালনীয়। যে ব্যক্তি ক্ষুদ্র বলিয়া কর্ত্তব্যপালনে বিমুখ, সে কখনও কোনও কর্ত্তব্যই পালন করিতে পারে না। যাহারা ঘরের ছোট কথা লইয়া কোঁদল করে, ক্ষুদ্র স্বার্থ লইয়া মারামারি করে, তাহারা কি সভায় বসিয়া লম্বা বক্তৃতা করিয়া দেশ উদ্ধার করিতে পারে? কবি এই শিক্ষা দিবার জন্যই সিংহের বিজ্ঞতার কথার উত্তরে, রাজার মুখে বলাইয়াছেন, যে, যদি আমি নিয়োজিত কর্ত্তব্যপালনেই অক্ষম হইলাম, তাহা হইলে

রাজ্যেন কিং তদ্বিপরীতবৃত্তেঃ
প্রাণৈরুপক্রোশমলীমসৈর্বা।

এই দেখ, তুমিও তোমার কর্ত্তব্যপালনের জন্য একটা দেবদারু তরুর রক্ষায় কত যত্ন করিতেছ। তাহার পর, রাজা যেমন সিংহের শোণিতপারণার জন্য স্বীয় শরীর উপস্থাপিত করিলেন, অমনি

অবাঙ্‌মুখস্তোপরি পুষ্পবৃষ্টিঃ
পপাত বিদ্যাধরহস্তমুক্তা।

বর্ত্তমান সময়ে, এই শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন। যত ক্ষুদ্র হউক, আপনার কর্ত্তব্য যদি পালন করা যায়, তাহা হইলে স্বর্গ হইতে মস্তকের উপর পুষ্পবৃষ্টি হয়। আমাদের ছোট বড় সকল কর্ত্তব্যই নন্দিনীর মত বলিতেছেন,—"অবেহি মাং কামদুঘাং প্রসন্নাং।"

দিলীপ-কথায়, কবি বারংবার দেখাইয়াছেন যে, তিনি সকল প্রকার কর্ত্তব্যের প্রতিই দৃষ্টি রাখিতেন। রাজ্যপালন বড় কাজ বলিয়া, মহিষীর দোহদ কি, তাহারও অনুসন্ধান লইতে ভুলিতেন না। ছোট বড় সকল কাজ আপনি দেখিয়া করিতেন।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

সহযোগী সাহিত্য।

সাহিত্য।

বর্ত্তমান সময়ের উপন্যাস।

উনবিংশ শতাব্দী সাধারণতঃ বৈজ্ঞানিক যুগ নামে আখ্যাত হইয়া থাকে। বৈজ্ঞানিক যুগের প্রধান লক্ষণ বিভেদকরণ। বৈজ্ঞানিক যুগে সুধীগণ কোন পদার্থ অথবা ঘটনা কোন্ কারণ-পরম্পরার সমবায়ে উৎপন্ন, এইমাত্র স্থির করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন না; পক্ষান্তরে তাহাদের প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের স্বরূপনির্ণয়ে সচেষ্ট হন। কিন্তু এ বিষয়ের সকল বিভাগ এক জনের দ্বারা অনুসৃত হওয়া অসম্ভব। সেই জন্য তাহাদের কার্য্যবিভাগ আছে ও এক এক জন এক এক শ্রেণীর অনুসন্ধানে ব্যাপৃত থাকেন। এই কার্য্যবিভাগই আধুনিক বিজ্ঞান ও শিল্পের এরূপ উন্নতির প্রধান কারণ। কিন্তু সাহিত্যক্ষেত্রে ঐকদেশিত্ব বড় অসহ্য। প্রতিভাবান লেখক একই চিত্র বিভিন্ন বর্ণের সমাবেশে পুনঃপুনঃ সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করেন, তাহা বড় দুঃখের বিষয়। সম্প্রতি কোনও ইংরাজী পত্রে এই বিষয়ে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা তাহার সারোদ্ধার করিলাম।

আধুনিক কার্য্যবিভাগ বড় সর্ব্বগ্রাসী। এমন কি, স্কুলের ছাত্রগণ পর্য্যন্ত ইহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায় না। অনেককেই শৈশবাবস্থা হইতেই স্বীয় পাঠ্যবিষয় নির্ব্বাচন করিয়া লইতে হয়। পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে ইহার কোন ব্যতিক্রম ঘটে না। বণিক ও শিল্পিগণের সম্বন্ধেও এই কথা প্রযুক্ত হইতে পারে।

কার্য্যবিভাগ।

কারখানায় শিল্পী প্রতিদিন একই কার্য্যে চিরদিন নিযুক্ত থাকে। উনবিংশ শিল্পী দ্বারা একটি আলপিন প্রস্তুত হয়, ইহা প্রবাদের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। অন্যান্য সূক্ষ্ম কলাবিদ্যা সম্বন্ধেও এই কথা। কোন নট নায়কবিশেষের অভিনয়ে বিখ্যাত হইলে, তাঁহার অপর চরিত্রাভিনয়ের সুযোগ বিরল হইয়া আইসে। আধুনিক চিত্রকরগণকে বিষয়নির্ব্বাচন দ্বারা অতি সহজেই চিনিতে পারা যায়। তাঁহারা বিভিন্ন অবস্থাপর্য্যায়ে একই বিষয় চিত্রফলকে অঙ্কিত করেন; এবং কিছুতেই সেই পথ ত্যাগ করিতে সম্মত হন না। তবে চিত্রাঙ্কন সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, কোনও বিশেষ বিষয়ে এমন একটা মোহ ও আকর্ষণ থাকে যে, সহজে তাহা ত্যাগ করা যায় না। কিন্তু সাহিত্যক্ষেত্রে এক চিত্রের পুনরাবৃত্তি একান্ত অসহ্য। পৃথিবী বিপুলা, কালও অনন্ত; সুতরাং তৎসম্বন্ধে ঐকদেশিত্বের কোন অবশ্যম্ভাবী আবশ্যক নাই। কিন্তু আধুনিক উপন্যাসলেখকেরা অনেক স্থলে কেবল ভিন্ন বর্ণের সমাবেশে, সূক্ষ্ম সহজবোধ্য পার্থক্যের আবরণে আবৃত করিয়া পূর্ব্বচিত্রিত চরিত্রের পুনরঙ্কনে তৃপ্ত।

আধুনিক কালের যে সকল ঔপন্যাসিকের পুস্তকাবলী সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পঠিত হয়, তাঁহাদের মধ্যে হল্ কেনই এই দোষে বিশেষ দুষ্ট। তিনি কিছুতেই স্মরণ রাখিতে পারেন না যে, পৃথিবীতে আইল অব্ ম্যান ব্যতীত অন্য দেশ আছে—বংশপরম্পরাক্রমাগত মনোবৃত্তি ব্যতীত অন্য কোন শক্তিও মানবের কার্য্য সকল নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে।

দৃষ্টান্ত।

উপযুক্ত ঘটনার সুন্দর সমাবেশে তাঁহার ক্ষমতা কেহই অস্বীকার করেন না। আমরা কেবল তাঁহার নায়ক-চিত্রের কথা বলিতেছি। তাঁহার বিভিন্ন পুস্তকাবলীতে পৃথগবস্থাপন্ন একই ব্যক্তির চিত্র প্রতিফলিত হইয়াছে মাত্র। প্রথমে তাহারা আমাদের প্রশংসা আকর্ষণ করে বটে, কিন্তু পুনরুক্তিদোষে দুষ্ট হইয়া পরিণামে অপরিহার্য্য অবসাদের সৃষ্টি করে। "ম্যাঙ্কস্‌ম্যান" ও "ক্রিশ্চিয়ান" গ্রন্থদ্বয়ে তদীয় "ডিম্‌ষ্টার" গ্রন্থের নায়কগণ ঈষৎ পরিবর্ত্তিতভাবে অবস্থান করিতেছে। যদিও পৃথক্ পাঠে তাহারা যথেষ্ট কৌতূহলোদ্দীপক ও হৃদয়গ্রাহী হয়, কিন্তু তাহাদের সমবেত অনুশীলনে লেখকের চরিত্রাঙ্কনে নূতনত্ব অথবা স্বাধীনচিন্তা কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। অন্যান্য জীবিত লেখকগণ সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। টমাস হার্ডি প্রদেশবিশেষের কৃষিজীবনের আকর্ষণ কিছুতেই ভুলিতে পারেন না। উইডা সুন্দর ও সম্ভ্রান্ত সৈনিকদলের চিত্রাঙ্কনে নিযুক্ত। আর মারি কোরেলি সমাজপীড়িতা অবলা ও সাধারণ্যে অবজ্ঞাতা লেখিকার বর্ণনায় আনন্দলাভ করেন। এইরূপ আরও অনেকের নাম করা যাইতে পারে। ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে,আধুনিক লেখকগণ স্বনির্ব্বাচিত গণ্ডীর বাহিরে আসিয়া নূতন বিষয় ও চরিত্রের সৃষ্টিতে সম্মত নহেন। কিন্তু বড় সুখের বিষয় এই, সাধারণ নিয়মেরও দুই এক জন ব্যতিক্রম করিয়াছেন। এন্ড্ ল্যাঙের—চরিত্রাঙ্কনের বিশালতায় তাঁহাকে কতকগুলি ক্ষমতাশালী লেখকের সমষ্টি বলিয়া ভ্রম হয়। তাঁহার কথা ছাড়িয়া দিলেও আমরা কিপ্‌লিঙ্ ও ষ্টিভেনসনের নামোল্লেখ করিতে পারি! "ভাইলিমা" পত্রাবলীর পাঠকগণ তদীয় পুস্তকাবলীর রচনা-বিবরণ অবগত আছেন ও নিয়তির ক্রূর নির্ব্বন্ধে যদিও তিনি অভিলাষানুরূপ কার্য্য করিতে পারেন নাই, তথাপি তাঁহার রচিত গ্রন্থ সকল হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, এক জন লেখক সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের অঙ্কনৈপুণ্যে প্রভূত প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারেন। "ট্রেজার আইলাণ্ড" ও "ক্যাট্রিওনা"-লেখকের লেখনীপ্রসূত "নিউ আরেবিয়ান্ নাইট্‌স্" ও "ভারজিনিবস্ পিউএরস্ক" গ্রন্থদ্বয় পাঠে স্বতঃই বিস্ময়ের উদয় হয়। আধুনিক ঔপন্যাসিকগণ পুস্তকে স্ব স্ব সামাজিক ও রাজনৈতিক মত ব্যক্ত করিয়া থাকেন। তাঁহারা পাঠকগণের রুচি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ। সুতরাং আমাদের আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু দেশ-কাল-পাত্র-সম্বন্ধে তাঁহাদের এইরূপ সঙ্কীর্ণতা যে স্থায়ী সাহিত্যের ক্ষতিজনক ও গুণগ্রাহী পাঠকের আক্ষেপের বিষয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

উপরে যে সকল কথা লিখিত হইল, আমাদের দেশের অনেক নব্য লেখকগণ সম্বন্ধে তাহা অনেক পরিমাণে প্রযুক্ত হইতে পারে। গল্পে ও কবিতায় রবীন্দ্রবাবু তাঁহাদের আদর্শ। আদর্শের সবিশেষ উৎকর্ষ বিষয়ে কাহারও সন্দেহ নাই। কিন্তু এক জন প্রতিভাশালী লেখকের বিশাল সহানুভূতি ও পর্য্যবেক্ষণ, সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি

নব্যবঙ্গের লেখক।

ও বিভিন্ন রসাবতারণার নৈপুণ্য সকলের পক্ষে সম্ভবে না। সুতরাং অন্ধ অনুকরণের ফলে অনেক হাস্যজনক তুচ্ছ মূল্যহীন কবিতায় ও গল্পে বঙ্গসাহিত্য অপর্য্যাপ্ত স্ফীতকলেবর হইয়া উঠিতেছে। আর একটি কথা, নব্য লেখকগণ সমাজপরিত্যক্ত ও নিগৃহীত শ্রেণীবিশেষ হইতে গল্পের ও কবিতার বিষয় সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ঘৃণিত পাপীর উপর সাধারণের সহানুভূতি আকর্ষণ করা প্রচুরক্ষমতাসাধ্য। যথেষ্ট প্রতিভা ও রসসমাবেশ-কৌশলের অভাবে অনেক কৃতী লেখকও সে বিষয়ে বিফলকাম হইয়া থাকেন। কিন্তু আধুনিক লেখকগণ সে বিষয়ে একান্ত অনবহিত। তাঁহারা বিলয়-পথগামী বহু মাসিকের পাঠকগণের গল্পপাঠবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য যথেচ্ছ মসী লেখনীর প্রচুর অপব্যবহার আরম্ভ করিয়াছেন। বঙ্গসাহিত্য বহু দিন হইতে অরাজক; সাহিত্য-সম্রাটও লোকান্তরিত। আজ কাল ত অনেক প্রথম শ্রেণীর মাসিক পত্রিকা ও "সুপ্রতিষ্ঠিত" লেখকের আবির্ভাব হইতেছে, কিন্তু পাঠকসাধারণের উপর এই অযথা অত্যাচারের কি কোনও প্রতিবিধান সম্ভবে না?

ধর্ম্মবিষয়ক উপন্যাসের অভাবের কথা উল্লেখ করিয়া কোন ইংরাজীপত্রে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা নিম্নে তাহার আংশিক সার সংকলন করিলাম।

ধর্ম্মবিষয়ক উপন্যাস।

সম্প্রতি একটা ধুয়া উঠিয়াছে, আধুনিক কালে ধর্ম্মবিষয়ক উপন্যাস নাই। যে সকল পাঠক হল কেনের যন্ত্রচালিত নির্ব্বোধ নায়কচিত্রের অনুসরণ করিয়াছেন, তাঁহারা অবগত আছেন, তাঁহার দ্বারা এ অভাব দূরীভূত হইবে না। মিসেস অলিফাণ্ট গ্রাণ্ট এলেনকে আধুনিক "জোনা" সম্বোধন করিয়া যে মহিমামণ্ডিত গিরিশিখরে বসাইয়াছিলেন, তিনি মৃত্যুর কিয়ৎকাল পূর্ব্বে তথা হইতে অবতরণ করিয়া বিজ্ঞানচর্চ্চা অথবা সাধারণপাঠ্য গল্পের প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই সকল লেখকের সহিত টলষ্টয়ের নামোল্লেখ করিতে কিঞ্চিৎ কুণ্ঠাবোধ হয়। কিন্তু তিনিই কেবল আধুনিক লেখকবর্গের মধ্যে পুরাকালীন ধর্ম্মবিষয়ক উপন্যাসলেখকগণের সহিত তুলিত হইতে পারেন। মার্কিন দেশে ধর্ম্মবিষয়ক উপন্যাসের অভাব দূর করিবার জন্য এক সম্পূর্ণ অভিনব পন্থা অবলম্বিত হইয়াছে। তথাকার ব্রুকলীন নগরস্থ প্লাইমাউথ চর্চ্চের নবনিযুক্ত যাজক ডাক্তার হিলিস্ স্বীয় বক্তৃতার মূলমন্ত্রগুলি (texts) আধুনিক বিখ্যাত ঔপন্যাসিকের রচনা হইতে সংগ্রহ করিতেছেন। ইহাতে শিক্ষা ও আমোদের সুন্দর মিলন হইয়াছে। শত শত নর নারী এই অভিনব ব্যাপারে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার উপদেশ ও ধর্ম্মবক্তৃতা শুনিবার জন্য সমবেত হইতেছে। কিন্তু সনাতন বাইবেল ত্যাগ করিয়া উপন্যাস হইতে text-গ্রহণ যুক্তিযুক্ত কি না, এই কথা লইয়া তথায় তুমুল বাগ্‌বিতণ্ডা বাধিয়া গিয়াছে। ডাক্তার কিউলার এই নূতন পথাবলম্বিগণের বিপক্ষবাদীদিগের প্রধান নেতা। কিন্তু তিনি ইঁহাদের বিরুদ্ধে কোনও ন্যায়সঙ্গত যুক্তির অবতারণা করিতে পারেন নাই। যদি ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বক্তৃতায় অন্য সাধারণ সাহিত্য হইতে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা দোষাবহ না হয়, তাহা হইলে এইরূপ কার্য্যে যে কি দোষ, তাহা স্পষ্ট বুঝা যায় না। পরন্তু এই নূতন পন্থায় ধর্ম্মবক্তৃতায় এক অভিনব সজীবতা সঞ্চারিত হইবে। পূর্ব্বে বক্তৃতার মূলমন্ত্রগুলি বাইবেল হইতে সংগৃহীত হইত। বোধ হয়, উক্ত গ্রন্থের দুরূহ অংশগুলির বিশদ

ব্যাখ্যা করাই তাহার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু যখন শিক্ষাদানই ধর্ম্মবক্তৃতার মুখ্য উদ্দেশ্য, তখন যাহাতে ঐ উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হয়, তাহাই করা কর্ত্তব্য।

উপন্যাসে নারীপ্রতিভা।

আধুনিক ইংরাজী সাহিত্যে সুপরিচিতা শ্রীমতী হাম্‌ফ্রে ওয়ার্ড্‌ সুবিখ্যাত উপন্যাসলেখিকা শার্লট্‌ ব্রণ্টের গ্রন্থাবলীর ভূমিকা লিখিতে গিয়া প্রসঙ্গতঃ উপন্যাসরচনায় মহিলাদিগের পারদর্শিতার বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। বর্ত্তমান শতাব্দীতে মহিলাগণ কেবলমাত্র উপন্যাসরচনাতেই শ্রেষ্ঠ পুরুষ গ্রন্থকারদিগের সমকক্ষতা করিতে সম্পূর্ণরূপে সক্ষম হইয়াছেন। অন্যান্য কাব্যরচনায় মহিলাগণ এখনও তাদৃশী সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন নাই; সাহিত্যের অপরাপর ক্ষেত্রে স্ত্রীজাতির উদ্যম পুরুষগণ কতকটা অনুগ্রহদৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন, এবং তাঁহাদের কৃতিত্ব দেখিয়া পুরুষ সহযোগী বিস্মিত হইয়া থাকেন। লেখিকা বলেন, উপন্যাসরচনায় নারী-প্রতিভা পৃথিবীর কোনও গ্রন্থকারের প্রতিভার তুলনায় হীন নহে। বিজ্ঞ সমালোচকগণ যেরূপ উন্নত আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে থ্যাকারে প্রভৃতি বিখ্যাত লেখকগণের উপন্যাসের সমালোচনা করেন, রমণীরচিত উপন্যাসও ঠিক সেইরূপ কঠোরভাবে নিরপেক্ষতার সহিত সমালোচনা করিতে কুণ্ঠিত বোধ করেন না। অসামান্য-প্রতিভাশালিনী লেখিকা "জর্জ্জ এলিয়ট" পুরুষের নামে পরিচিতা হইয়াই সাহিত্যজগতে অনন্যসুলভ আসন অধিকার করিয়া লইয়াছেন।

শ্রীমতী ওয়ার্ডের মতে, উপন্যাসরচনায় মহিলাদিগের এইরূপ গৌরবান্বিত স্থান অধিকার করাই স্বাভাবিক, এবং বংশপরম্পরানুগত শিক্ষার অনিবার্য্য ফল। সুন্দর উপন্যাস লিখিতে হইলে প্রথমতঃ সুনির্ব্বাচিত শব্দযোজনায় নৈপুণ্য, এবং দ্বিতীয়তঃ চিত্তাকর্ষক আখ্যানবস্তু অথবা বর্ণনীয় বিষয় থাকা আবশ্যক। বাগ্‌বৈভবে স্ত্রীজাতি সুসম্পন্না, সুচতুর মনোজ্ঞ বাক্যবিন্যাসের বিদ্যা বংশানুক্রমে স্ত্রীজাতির অভ্যস্ত। সুপ্রিয়বাণী ও সুরচিত লিপি দ্বারা অপরের চিত্তরঞ্জনের শক্তি বিকশিত হইয়া উপন্যাসরচনা-শক্তিতে পরিণত হয়। উপন্যাসরচনায় নারীজাতির নৈপুণ্য দেখিয়া কাহারও বিস্মিত হইবার কারণ নাই।

আবার উপন্যাসের বর্ণনীয় প্রধান বিষয়টিতেও স্ত্রীজাতির অধিকার অবিসংবাদিত। সেই মূল বিষয়টি—যাহা স্বভাবতঃই চিরদিন নারীজাতির আয়ত্ত, যাহা মানবমাত্রেরই প্রিয়, সেই অফুরন্ত নিত্যনব পদার্থটি—ভালবাসা। ভালবাসার ভিন্ন ভিন্ন বিকাশ, প্রধানতঃ যুবক যুবতীর প্রেম অর্থাৎ প্রণয়, উপন্যাসের প্রাণ। ভাষা ও বিষয়, এই উভয় উপাদান আয়ত্ত থাকায়, উপন্যাস-সাহিত্যে রমণীদিগের স্থান অতি উচ্চে, এবং তাঁহাদের ভবিষ্যৎ অতীব আশাপ্রদ।

মানবহৃদয়ের সার্ব্বজনীন ও সার্ব্বকালীন সুকুমার ভাবগুলিই (emotions and feelings) উপন্যাসরচয়িত্রীদিগের প্রধান আলোচ্য বিষয়। উপন্যাস মানবহৃদয়ের ছায়া প্রতিফলিত করে; অধুনা মানবহৃদয়ে জ্ঞানতৃষ্ণা প্রবল, এবং উপন্যাসেও সেই তৃষ্ণা প্রতিবিম্বিত

এই নীরব নিভৃত নিকুঞ্জ,
বসি আছি পাতি' মম অঞ্চল,
অতি কম্পিত শঙ্কিত চঞ্চল,
এস হে প্রিয়, হে চিরবাঞ্ছিত,
আর প্রাণ অধীর প্রবোধ না মানে।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

মালা।

তুমি এই প্রকৃতির রম্য উপবনে
কত ফুল করেছ চয়ন;
তুমি গাঁথিয়াছ মালা, আমি সযতনে
কণ্ঠে তাহা করেছি ধারণ।

জীবনের সন্ধ্যাবেলা আসিবে মরণ,
ধীরে ধীরে নববধূ সম;
সূত্র শুধু কণ্ঠে মোর রহিবে তখন,
ফুল ঝরে গেলে প্রিয়তম!

শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু।

"ভাঙ্গব তবু মচ্‌কাব না।"

[মিসেস্ প্রফুল্লনলিনী রায় ও মিস্ কমলা দাস আসীনা]

প্রফুল্ল। তোমার কিন্তু ভাই মিষ্টার সেনকে বিবাহ করা উচিত। তিনি তোমাকে কত ভালবাসেন, আর কেমন গুণবান, স্বামীতে লোক যা প্রার্থনা করে—সে সব গুণ আছে।

কমলা। তা সত্য, আমি তাঁকে লাইক করি মাত্র। বোধ হয়, তাহাই যথেষ্ট। যে বাজার পড়েছে, মনের মত ভালবাসার পাত্র পাব কোথায়?

প্রফুল্ল। (কিয়ৎক্ষণ চিন্তার পর) তা হবে, কিন্তু ভাল না বাসলে আমি মিষ্টার রায়কে বিবাহ করতে পারতাম না। আজ কাল দেখছি প্রণয়ের অনুরোধে বিবাহ করা ফ্যাশনসঙ্গত নয়।

কমলা। তা বড় মিছা নয়।

প্রফুল্ল। দেখ কমলা, আমার একটু সন্দেহ হচ্চে, তুমি যেন আর কাকে ভালবেসেচ, সেই জন্যই তোমার মন এমন উদাস। কেমন, তাই না? আমি তোমার শৈশবের বন্ধু, আমাকে বলতে লজ্জা কি?

কমলা। না, না।

প্রফুল্ল। আমায় বল্‌লে কোন ক্ষতি হবে না, ঐ দেখ তোমার চোক ছল্ ছল্ কচ্চে, আমার মাথা খাও বল।

কমলা। [মৌন ও স্পন্দহীন]

প্রফুল্ল। মিষ্টার রায়কে দেখিবার পূর্ব্বে আমি কত শান্ত ও প্রফুল্ল ছিলাম, তাই বাবা স্বর্ণ নাম ছেড়ে প্রফুল্ল বলে ডাকতেন। এই জীবনের জন্য মুহূর্ত্তের জন্যও কোনও চিন্তা করি নাই। হাসি খেলাতেই দিন কাটিয়ে যাব, এই ভাবতাম। যখন মিষ্টার রায়কে প্রথম দেখলাম, তখন চিন্তা এসে আমাকে অধিকার করলে, প্রফুল্লতার বিকাশ আর রইল না, কেমন আমোদ আহ্লাদ ভাল লাগত না, তাঁহার চিন্তাতেই জগতের সুখ নিমজ্জিত বোধ হ'ত; পরে যখন তাঁহাকে পাইলাম, ভাবলাম, কি ঘোরতর নিঃসহায় [illegible] হইতে কি মধুর আশ্রয় ভগবান আমাকে মিলাইয়া দিলেন। বিশ্বাস শান্তি নির্ভর সাহায্য সকলই একাধারে পাইলাম। তখন বুঝিলাম, আশ্রয়[illegible] লতিকার জীবন কি [illegible] ও শান্তিপূর্ণ। সেই অবলম্বনের [illegible] হয় এক মুহূর্ত্তও প্রাণ [illegible] করা অসম্ভব।

কমলা। আমারও তাই বিশ্বাস।

প্রফুল্ল। আমাদের দেশের শিক্ষিতা [illegible] কুমারীরা মনে করেন, তাঁহারা [illegible] সকলের [illegible] ভোগ করিতেছেন, কিন্তু আমার বিশ্বাস যে, তাঁহারা জীবনের সুখ কি তাহা জানেন না। আমরা যে দিন পুরুষের আশ্রয়ে সমর্পিত হই, সেই দিন এই বিশ্বরাজ্যের সুখভোগের অধিকারিণী হই, সেই দিন হৃদয়ের কপাট খুলিয়া যায়, এবং স্বর্গরাজ্যের সুদূরস্থিত সিংহদ্বার দৃষ্টিগোচর হয়। তখন বুঝিতে পারি যে, এত দিন তমসাচ্ছন্ন কোন জড় পদার্থের ন্যায় ভাসিতেছিলাম, অথবা বিশ্বমাতার গর্ভে অবস্থান করিতেছিলাম, এইবার আলোকে পদার্পণ করিলাম। বিশ্বজগৎ ক্রমশঃ প্রসারিত হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে অন্তরের সঙ্কীর্ণতা দূর হইল, ক্ষমা যে কি স্বর্গীয় অধিকার, তাহা বুঝিলাম। দ্বেষ হিংসা ভুলিয়া গেলাম; গুরুতর অপরাধ সামান্য ত্রুটী বলিয়া বোধ হইতে লাগিল—

কমলা। ভাল, জিজ্ঞাসা করি, মিষ্টার রায়কে যদি অপর কোন রমণী ভালবাসিত, এবং এখনও বাসে, তাকে কি তুমি ক্ষমা করতে পার?

প্রফুল্ল। বোধ করি পারি, তবে ঠিক বলা যায় না, কিন্তু নিশ্চয়ই তার প্রতি আমার দয়া হয়।

কমলা। ভাই, তুমি আমাকে যথার্থই ভালবাস, এবং ঠিক ধরেচ, আমিও ভালবেসেচি।

প্রফুল্ল। এখনও কি তাকে ভালবাস?

কমলা। এখনও বাসি, কিন্তু অনন্ত বিচ্ছেদ ঘটেছে। বোধ হয়, তিনি আমাকে ভালবাসিতেন না, তাই অপর এক জনকে বিবাহ করিয়াছেন। আমি বোধ হয় মিষ্টার সেনকেই বিবাহ করিব। এখন বাড়ী যাই।

প্রফুল্ল। বোস না, মিষ্টার রায় এখনি আসবেন, তিনি যদি শোনেন যে তুমি আমার শৈশব সহচরী এসেছিলে, তাঁর সঙ্গে আলাপ না করে চলে গিয়েছ, তা হলে অত্যন্ত দুঃখিত হবেন, একটু বোস, তিনি এলেন বলে।

কম[illegible] তা বস্‌চি। কিন্তু আমার মনের কথা বলে ফেলেচি, যেন আর কেউ জান্‌তে না পারে।

প্রফু[illegible] [illegible]ও কি হয়! কিন্তু তোমার জন্ম বড় দুঃখ হচ্চে।

কম[illegible] [illegible] দুঃখ? যে আমায় চায় না, তা[illegible] জ[illegible] আবার দুঃখ কি? মিষ্টার সেনের [illegible]য়ে ভাল কে আছে?

প্রফুল্ল। তুমি যাই বল, আমি অত্যন্ত দুঃখিত; তুমি হতাশ হয়ে কঠোর হয়েছ, নিজের প্রতি[illegible] [illegible]দয় হচ্চ।

কমলা। তা হয়েছি, তুমি হ'লে কি করতে? আমি [illegible]কে অত্যন্ত ভালবাসতাম এবং ভাবতাম, সেও আমাকে সেই রকম ভালবাসে। শেষে এন্‌গেজমেণ্ট্‌ পর্য্যন্ত হয়েছিল। পরে তাঁর এক বন্ধুর সহিত আমার পরিচয় হ'ল। যামিনীনাথ সর্ব্বদা আমাদের দু'জনের সঙ্গে বসিতেন ও বেড়াইতেন। অকস্মাৎ তিনি একদিন আমাকে তাঁর চরিত্র সম্বন্ধে কিছু বলিলেন, এবং ওরূপ দুশ্চরিত্রকে বিবাহ করতে বারবার নিষেধ করলেন, অবশেষে তাঁর কথার পোষকতার দু' একটি প্রমাণ দেখালেন। তখন আমার চৈতন্য হ'ল, আমি অন্ধ হইয়া যাকে মন প্রাণ সমর্পণ করেছিলাম, তাহাকে লিখিয়া পাঠাইলাম যে, আমি তাকে চাই না। আমার নিষ্কৃতির অন্য পথ ছিল না। লিখিলাম বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে হৃদয় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল, তা' নয়, বরফের মত জমিয়া কঠিন ও ঠাণ্ডা হইয়া গেল। তাহার কি হইল? কিছুই না, পত্রের উত্তরও আসিল না। কিছু দিন পরে তাহার বিবাহের নিমন্ত্রণের কার্ড পাইলাম!

প্রফুল্ল। আর তার কোন সংবাদ পাও নাই?

কমলা। তাতে বিস্ময় বা দুঃখ কিসে? আমি কপটের হাত থেকে উদ্ধার পেয়েছি, সে জন্য জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ দাও। দেখ, আমার জীবনের ইতিহাসের একটি অধ্যায় তোমাকে শুনাইলাম। মনে করেছিলাম, কাহাকেও

বলিব না, কিন্তু তোমাকে বলিয়া ফেলিলাম। যা' হক্, গ্রন্থ আবার বন্ধ করিলাম, আর খুলিব না। এ কাহিনী কাহাকেও আর শোনাব না। তুমি কাঁদ কেন?

প্রফুল্ল। আমি কি স্বার্থপর, আমার নিজের সুখেই বিহ্বল, অপর কারও হৃদয়ের দারুণ যন্ত্রণা কখনও ভাবি না। আমার হৃদয়ে এইরূপ যন্ত্রণা উপস্থিত হ'লে না জানি আমি কি কর্‌ব।

কমলা। আমি তোমায় ভালবাসি, যেন বন্ধুত্ব অটল থাকে।

প্রফুল্ল। নিশ্চয় থাকবে।

[কার্ড হস্তে পরিচারিকার প্রবেশ।]

পরিচারিকা। মিসেস্ কর আগত।

প্রফুল্ল। (স্বগত) আবার কি করতে? (কমলার প্রতি) তুমি আমাকে পাঁচ মিনিটের জন্য একস্‌কিউজ কর। [নিষ্ক্রান্ত।]

[মিষ্টার নগেন্দ্রলাল রায়ের প্রবেশ।]

ন. রায়। (সবিস্ময়ে) [illegible] কমলা?

কমলা। (অবনতনেত্রে) হ্যাঁ আমি।

ন. রায়। [illegible] বুঝতে পাল্লুম না।

কমলা। মিসেস্ রায়ের সঙ্গে বেথুন কলেজে একত্র পড়েছি, বাল্যবন্ধুত্বের অনুরোধে তাঁকে দেখতে এসেচি, তার অনুরোধে আপনাকে দেখবার জন্য [illegible]।

ন. রায়। বিদলিত হৃদয় কিরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, তাহাই দেখিবার জন্য? সে ক্ষত সারিয়া গিয়াছে!

কমলা। অতি সামান্য ক্ষত ছিল বলিয়া।

ন. রায়। [illegible] ন্যায় আমার পক্ষ দুইটি ছিন্ন হইয়াছিল, অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিয়া [illegible] মরিয়াছিলাম, এখন পুনর্জন্ম হইয়াছে; কিন্তু ভিক্ষা এই যে নূতন পাখা দুটি আর ছিঁড়িও না।

কমলা। তোমার হৃদয়ের জন্য আমার কখনও ভাবনা হয় নাই, উহা অতি-বিস্তৃত, এবং অনেকগুলি প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট, ঐ প্রকোষ্ঠগুলির একটিমাত্র আমি [illegible]কের জন্য অধিকার করেছিলাম।

ন. রায়। দেখ কমলা, আমি এখনও কিছু বুঝতে পাচ্ছি না। যে যন্ত্রণা সহ্য করেছি, তা মানুষে কখনও সহ্য করে নাই, এবং তাহা রমণী কখনও

বুঝিতে পারে না। কিন্তু আঘাতটি এত অকস্মাৎ আসিয়া পড়িয়াছিল যে, কারণ জিজ্ঞাসা করিতে অপমান বোধ করিলাম, এবং সঙ্কল্প করিয়াছি যে, জ্ঞাসা করিব না। আমার হৃদয়ের বিষয়ে চর্চ্চা করিবার তোমার কি অধিকার?

কমলা। সে চর্চ্চায় কাজ নাই। যামিনীনাথকে জিজ্ঞাসা করিবেন, সমস্ত জানিতে পারিবেন। যাই হউক, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে আমাকে উপদেশ দিবার আপনার কি অধিকার?

ন. রায়। আমার ভ্রম স্বীকার করিলাম, কিন্তু যামিনী কি বলেছিল—শুনতে পাই কি?

কমলা। যামিনী আপনার জীবনের সেই সকল ঘটনা আমার নিকট ব্যক্ত করেচেন—যার জন্য আপনার লজ্জিত হওয়া উচিত। কিন্তু আপনাকে ত কিছু-মাত্র লজ্জিত দেখিতেছি না, বরং স্থিরগম্ভীরভাবে সাধুমূর্ত্তি ধারণ করে ধার্ম্মিকের ভান করিবার চেষ্টায় আছেন।

ন. রায়। কি সর্ব্বনাশ! কি প্রতারণা! যামিনী আমার বিষয় সমস্ত মিথ্যা বলেছে, কারণ সে স্বয়ং তোমাকে বিবাহ করতে চায়। সে বন্ধু হয়ে আমার কি সর্ব্বনাশ করেছে?

কমলা। তবে যামিনী আমাকে প্রতারণা করেচে, সব ফুরাল?

ন. রায়। না ফুরায় নাই! তুমি আমাকে ভালবাস, আমি তোমাকে ভালবাসি। আর কখনও কাহাকেও ভালবাসিনি।

কমলা। তুমি উন্মাদ! থাম। দু'খানি তরণীর মত দুটি হৃদয় ভেঙ্গে চুরমার হয়েছিল, আবার মেরামত করে রঙ দিয়ে কোন মতে ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছি, তাদের জন্যে অপর একটি কেন বিসর্জ্জন দেব? আমাদের ভাগ্যে যা হবার তা হয়েচে, আর একটি নিরপরাধকে কেন ছারখার করিব? না, তা পারিব না। আমার এ মর্ম্মব্যথা আমার সঙ্গের সাথী, এ যন্ত্রণার হাত থেকে পরিত্রাণ নাই। বোধ করি, তোমারও তাই। আমি মিষ্টার সেনকে বিবাহ করিয়া আর একবার সুখের অনুসন্ধান করব।

ন. রায়। ও কথা মুখে এনো না—তোমাকে মিনতি করি।

কমলা। আমি একবার ভুলেচি, অন্যায় করেচি, আবার তোমার—তোমার স্ত্রীর প্রতি কখনও অন্যায় করে অন্তরের অনুতাপ বাড়াব না।

ন. রায়। (সবিস্ময়ে) আমার স্ত্রী কই? আমার স্ত্রী নাই।

কমলা। চুপ কর, তিনি ঐ আসছেন।

[মিসেস রায়ের প্রবেশ।]

প্রতুল। ভাই কমলা, কিছু মনে কোর না, আমার একটু দেরি হয়ে [illegible] এই যে, ইনট্রোডিউস করবার অপেক্ষা না করেই তোমরা আলাপ করে নিয়েছ? কমলা, মিষ্টার নগেন্দ্রনাথ রায়,—আমার আত্মীয় স্বজন, উভয়েরই নাম [illegible] [illegible], কমলা আমার বাল্যবন্ধু ও সহপাঠী। আমার নগেন এখনও আসেন নি, আমার একান্ত ইচ্ছা ছিল, তাঁর সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দি। এখনও দেখা নেই, দেখ না কোথায় বেরিয়ে বসে আছেন।

[আহ্লাদে অভিভূত হইয়া নির্নিমেষনেত্রে কমলা নগেন্দ্রের প্রফুল্ল মুখ পানে চাহিয়া একটু হাসিলেন; নগেন্দ্র ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া কমলার দুটি হাত ধরিয়া স্বর্গের সোপানে পদার্পণ করিলেন।]*

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

প্রদীপ। পৌষ। প্রথমেই "[illegible] ভীষণ [illegible]নাবলী"—"ওয়াইড ওয়ার্ল্ড ম্যাগাজিন" হইতে সঙ্কলিত। আদ্যোপান্ত গাঁজাখুরি। "প্রাচীন ভারতে অনুসন্ধিৎসা" এবারকার প্রদীপের একমাত্র উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ। প্রবন্ধের লেখক আরম্ভে বলিয়াছেন, "সাংখ্য ও বৈশেষিক দর্শনে, চরক ও সুশ্রুত প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থে যে সকল তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে, তাহা পাঠে জানা যায়, প্রাচীন ভারতে অনুসন্ধিৎসাবৃত্তি অত্যন্ত প্রবল ছিল। প্রমাণ ভিন্ন কিছুতেই [illegible] বিশ্বাস করা হইত না।" লেখক এই অনুসন্ধিৎসাবৃত্তির পরিচায়ক প্রমাণ বিন্যাস করিয়া পরে বলিয়াছেন, "এই অনুসন্ধিৎসাবৃত্তি ও স্বাধীন চিন্তাশীলতা অবশেষে এক প্রকার লুপ্ত হইল।" লেখক উদাহরণস্বরূপ বলিতেছেন, "প্রাচীন আর্য্যগণ কেবল যুক্তিযুক্ত বাক্য গ্রহণ করিতে উপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, ম্লেচ্ছগণের নিকট হইতেও জ্যোতিষশাস্ত্র শিক্ষা করিতে ও তাঁহাদিগকে ঋষিবৎ মান্য করিতে উপদেশ

---

* ইংরাজী হইতে সঙ্কলিত। লেখক নাম পাঠান নাই; তিনি নাম পাঠাইলে বাধিত হইব।—সাহিত্য-সম্পাদক।

দিয়াছেন। মহামতি আর্য্যভট্টের যবন শিষ্য ছিল। তিনি ম্লেচ্ছ শিষ্যগণের শিক্ষার জন্য দশগীতিকাপরিশিষ্ট নামে জ্যামিতিশাস্ত্র লিখিয়াছিলেন। পাণিনিসূত্রের বার্ত্তিককার যবন শিল্পের বিষয় অবগত ছিলেন এবং চরকমুনি বাহ্লীকদেশীয় প্রধান ভিষক্ কঙ্কায়নের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু মধ্যযুগের যা ভারতের অধঃপতনের দিনে স্মৃতিতে ঘোষিত হইল—'ন বদেৎ যাবনীং ভাষাং প্রাণৈঃ কণ্ঠগতৈরপি।' প্রাণ কণ্ঠগত হইলেও যবন ভাষা বলিবে না। মহামতি শঙ্করাচার্য্য, কপিল, কণাদও বৌদ্ধ দর্শন খণ্ডন করিবার জন্য তর্কজাল বিস্তার করিয়া জড়জগতের আলোচনার পথপ্রদর্শক দর্শনগুলির প্রতি দোষারোপ করিয়া তীব্র মন্তব্য করিলেন; এমন কি কণাদকে অর্দ্ধ বৈনাশিক নাম দিতেও কুণ্ঠিত হইলেন না এবং স্বাধীন চিন্তাশীল বৌদ্ধগণকে বৈনাশিক নামে অভিহিত করিয়া জগতের নিকট তাঁহাদিগকে ঘৃণিত করিতে প্রয়াস পাইলেন। তিনি বলিলেন, 'সুগত পরস্পরবিরুদ্ধ বাহ্য বস্তুবাদ, বিজ্ঞানবাদ ও সর্ব্বশূন্যবাদ উপদেশ করিয়া আপনার অসম্বদ্ধপ্রলাপিতা ব্যক্ত করিয়াছেন, অথবা তিনি প্রজা (লোক) বিদ্বেষী ছিলেন। প্রজাগণ বিরুদ্ধার্থগ্রহণে বিমুগ্ধ হউক, ইহাই তাঁহার অভিপ্রায় ছিল'।" লেখকের শেষ সিদ্ধান্ত এই যে, "যাহা সার্ব্বজনীন ছিল, তাহা এইরূপে সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ হওয়ায় অনুসন্ধিৎসাবৃত্তি এই দুর্ভাগ্য ভারত হইতে বহু দিন হইল লুপ্ত হইয়াছে।" কিন্তু সুখের বিষয় এই যে,নবচেতনায় অনুপ্রাণিত ভারতে আবার সেই তত্ত্বানুসন্ধান-প্রবৃত্তি জাগরিত হইতেছে। ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসু, ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। "লক্ষ্ণৌ কংগ্রেস" একটি সাময়িক প্রবন্ধ। কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীযুক্ত রমেশ-চন্দ্র দত্ত, অভ্যর্থনা-কমিটীর সম্পাদক মুন্সী গঙ্গাপ্রসাদ বর্ম্মা ও সভাপতি মুন্সী বংশীলাল সিংহের ছবি সুন্দর হইয়াছে। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়ের "দিনবিভাগ" সাধারণের পক্ষে নিতান্ত গুরুপাক। "দাসীর শ্রাদ্ধে দানসাগর" সেকালের সমাজের সাত্ত্বিকবুদ্ধি ও সহৃদয়তার দৃষ্টান্ত। শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র লাহিড়ী নামক এক ব্যক্তি "ঐতিহাসিক তথ্যের পরিণাম" আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ইঁহার শূন্যগর্ভ আস্ফালন দেখিলে, 'ঢাল নেই, খাঁড়া নেই, নিধিরাম সর্দ্দার' এই বাঙ্গালা প্রবচনটি মনে পড়ে। নূতন লেখক যে "বৃথা কার্য্যে সেই দুর্দ্দমনীয় চিন্তাস্রোতকে ধাবিত না করিয়া প্রবন্ধরচনায় নিয়োগ করিয়াছেন," এই প্রবন্ধে তাহার পরিচয় আছে বটে। "ঐতিহাসিক সত্য লোকচক্ষুর গোচরীভূত" করিবার জন্য শ্রীযুক্ত অক্ষয়-কুমার মৈত্র মহাশয়কে সার্টিফিকেট-প্রদান ও অন্যান্য লোকের, বিশেষতঃ সাহিত্যের 'সিরাজ-চরিত্র'-লেখকের মুণ্ডপাত তাঁহার অভিপ্রেত। কিন্তু এই সহজসাধ্য কার্য্যে 'চিন্তাস্রোতকে ধাবিত' করিবার পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ ইতিহাস-অধ্যয়ন কি তাঁহার আবশ্যক মনে হয় নাই? স্বর্গীয় প্যারীচাঁদ মিত্রের "রাজাস্ অব্ রাজসাহী" তাঁহার কল্পনায় একখানি "বস্তাপচা, কপোল-কল্পিত পুস্তক।" অবশ্য সমালোচক উক্ত পুস্তকখানি দেখিয়াছেন। মুতাক্ষরীণ সম্বন্ধেও তাঁহার একটা মত আছে। মুতাক্ষরীণ কোন্ ভাবে কাহার জন্য লিখিত, গ্রন্থে অবশ্য তাহার "প্রমাণ" আছে। কিন্তু পারসী মুতাক্ষরীণের কথা দূরে থাকুক, তাহার সেই পূর্ণবয়স্কলোকবাহ্য বিপুল ইংরাজী অনুবাদ মর্ত্ত্যলোকে কয় জন পাঠ করেন? মুতাক্ষরীণ-কার যে "মীর জাফরের নবাবী আমলের নিমকের বলে" গ্রন্থ লিখিয়াছেন, ইহা লেখকের নবাবিষ্কৃত নূতন

কথা বটে। এত দিন ঐতিহাসিকগণ তাঁহাকে মীরজাফরের বিরোধী বলিয়াই জানিতেন। [মিলের ইতিহাসে উইলসনের টীকা দ্রষ্টব্য।] অভ দেবীর উপাখ্যানে মরাল সমালোচক অসীম নৈপুণ্যসহকারে নীরভাগ পরিহার করিয়া ক্ষীরভাগই গ্রহণ করিয়াছেন। অন্যের মনে হয়, লেখক তারা দেবী সম্বন্ধে প্রচলিত প্রবাদের সংক্ষেপে কেবলমাত্র উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সমালোচক ইহাতে সিরাজচরিত-লেখকের বিলক্ষণ "ধৃষ্টতা" দেখিয়াছেন, এবং পুনঃপুনঃ 'ধৃষ্টতা' শব্দের প্রয়োগ করিয়া স্বীয় ভদ্রতার পরিচয় দিয়াছেন। সাহিত্যের লেখকের প্রমাণের বিরুদ্ধে তিনি "অনেক কথাই বলিতে পারিতেন"; কিন্তু দেখিতেছি, অনুগ্রহ করিয়া সে পথে যান নাই, বাজে বকিয়া প্রবন্ধটি পরিপূর্ণ করিয়াছেন। মুতাক্ষরীণ-কার মীরজাফরের স্বপক্ষ [illegible] বিপক্ষ ছিলেন, তিনি তাহাও জানেন না. তিনিও 'ঐতিহাসিক অশোর পরিণাম' [illegible] আকুল। হায় অজ্ঞতার ঔদ্ধত্য! "মায়াবিনী" শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের একটি গল্প [illegible] গল্পের আখ্যানবস্তু আমাদের অকিঞ্চিৎকর। ভাষা কষ্টকল্পিত; অপপ্রযুক্ত শব্দনিগড়ে শৃঙ্খলিতা বন্দিনী। 'প্রাণের উত্তমার্দ্ধ', 'সমুত্তানিশ্চন্দিনী স্বপ্ন', 'বিগত নিদ্রালস্যজড়িত চক্ষে' প্রভৃতি অদ্ভুত। নগেন্দ্রবাবুর মত প্রবীণ লেখকও যে এই গল্পটি প্রকাশ করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারেন নাই, ইহাই আশ্চর্য।

প্রদীপ। মাঘ। [illegible] "কাদম্বরী-চিত্র।" "শূদ্রকের রাজসভা" নামক একখানি চিত্রের পরিচয়দান [illegible] চিত্র [illegible] করিয়াছেন। লেখক বলেন, "বর্ত্তমানসংখ্যক 'প্রদীপে' [illegible] মুদ্রিত হইয়াছে সেই চিত্র অবলম্বন করিয়া কিছু লিখিতে অনুরুদ্ধ হইয়াছি। ইহার মূল পটখানি [illegible] অঙ্কিত, বিষয়টি কাদম্বরী হইতে গৃহীত এবং চিত্রকর আমার স্নেহাস্পদ তরুণবয়স্ক আত্মীয় শ্রীমান্ যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়। এ কথা নিশ্চয়, সংস্কৃত সাহিত্যে আঁকিবার বিষয়ের অভাব নাই। কিন্তু শিল্পবিদ্যালয়ে আমাদিগকে অগত্যা য়ুরোপীয় চিত্রাদির অনুকরণ করিয়া আঁকিতে শিখিতে হয়। তাহাতে হাত এবং মন বিলাতী ছবির ছাঁচে প্রস্তুত হইয়া যায়, তাহার আর কোনও উপায় থাকে না। সেই অভ্যস্ত পথ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া দেশী চক্ষু দিয়া দেশী চিত্রবিষয়কে দেখা আমাদের পক্ষে বড় কঠিন। যামিনীপ্রকাশ অল্প বয়সেই সেই কঠিন ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। * * *" যামিনীপ্রকাশের প্রতিভা সফল হউক। তাঁহার চিত্র সাধনা সিদ্ধ হইলে দেশের মুখ উজ্জ্বল হইবে। আমরা 'মূল পট'খানি দেখিয়া আনন্দে মুগ্ধ ও আশায় উৎফুল্ল হইয়াছিলাম। দুঃখের বিষয়, 'প্রদীপে' সেই চিত্রখানির যে প্রতিলিপি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা মূল পটের অবমাননা। "রেশম-শিল্পে" জ্ঞাতব্য অনেক কথা আছে। "কাসাপা" একটি ভ্রমণবৃত্তান্ত ;—কিছু নাই। "শ্রীযুক্ত শশিকুমার হেশ" প্রবন্ধে আর এক জন উদীয়মান চিত্রশিল্পীর পরিচয় আছে। ইনি ইয়ুরোপ হইতে চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করিয়া সম্প্রতি দেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছেন। হেশ মহাশয়ের জীবনকাহিনী বিচিত্র। স্বাবলম্বন তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র। প্রতিমূর্তিচিত্রণে তাঁহার অনাধারণ দক্ষতা। আশা করি, উৎসাহের অভাবে হেশ মহাশয়ের চিত্রপ্রতিভা মলিন হইবে না। "পুস্তক-সমালোচনা"য় 'পদ্ম' ও 'কণিকা', এই দুইখানি খণ্ডকাব্যের সমালোচনা আছে। অপরের কৃত গ্রন্থসমালোচনা সম্বন্ধে আমরা প্রায়ই মৌনব্রত—কিন্তু নিতান্ত আবশ্যক বলিয়া

'কণিকা'র সমালোচনা সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিতে হইতেছে। সিরাজ-উদ্দৌলার চরিতাখ্যায়ক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্র 'কণিকা'র সমালোচনা উপলক্ষে সমালোচকদিগকে আক্রমণ করিয়া যথেষ্ট সুরুচি ও শীলতার পরিচয় দিয়াছেন। অক্ষয়বাবুর সেই সদাশয়তার পরিচয় দিবার বা তাঁহার 'উত্তোর' গাহিবার জন্য আমরা এই পণ্ডশ্রমে প্রবৃত্ত হই নাই। কিন্তু লেখক বন্ধুরূপে 'কণিকা'র কবি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামে যে মিথ্যা কলঙ্কের আরোপ করিয়াছেন, তাহার অপনয়নই আমাদের উদ্দেশ্য। অক্ষয়বাবু সাধারণকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, সমালোচকগণের মুণ্ডপাত করিবার জন্যই কবি 'কণিকা'র অনেকগুলি কবিতার রচনা করিয়াছেন। যদি সত্যই রবীন্দ্রবাবু সমালোচনায় অসহিষ্ণু হইয়া 'কণিকা'র মত রচনায় প্রবৃত্ত হইতেন, তাহা হইলেও, সমালোচকগণের ক্ষোভের কারণ ঘটিত না। আমাদিগকেও কর্তব্যে [illegible] রোধে রবীন্দ্রবাবুর রচনা সম্বন্ধে ভাল মন্দ অনেক কথা বলিতে হইয়াছে। প্রতিকূল সম[illegible]াচনার বাক্যবাণে যদি অমর কবি রবীন্দ্রনাথের কবিত্বের ভোগবতী উৎসারিত হইয়া বঙ্গসাহিত্যকে স্নিগ্ধ সরস শ্যামল করে, তবে সমালোচকগণের তদপেক্ষা আনন্দের বিষয় আর কি হইতে পারে? উপকথার রাজকন্যা হাসিলে মাণিক পড়িত, কাঁদি[illegible] মুক্তা ঝরিত। রবীন্দ্রবাবু উদার কল্পনায় অনুপ্রাণিত হইয়া বাঙ্গালী পাঠককে অনেক 'মাণিক' [illegible] করিয়াছেন; অসহিষ্ণুতা বা প্রতিহিংসায় উত্তেজিত হইয়া তিনি যদি 'কণিকা'র [illegible] দিতেন, তাহাও আমরা পরম সৌভাগ্য মনে করিতাম। কিন্তু সত্যপ্রিয় ঐতিহা[illegible]ক্ষয়বাবু শুনিয়া দুঃখিত হইবেন, স্বয়ং রবীন্দ্রবাবু অক্ষয়বাবুর কৃত 'কণিকা'র সমালোচনা পাঠ করিয়া আমাদিগকে বলিয়াছেন, তাঁহার এরূপ কোনও গূঢ় অভিসন্ধি ছিল না। অক্ষয়বাবুর প্রচারিত 'কণিকা'-রচনার গূঢ় উদ্দেশ্য বিনা প্রতিবাদে রবীন্দ্র বাবুর স্কন্ধে আরোপিত হইতে দিলে সাহিত্যে ধৃষ্টতা ও নীচতার প্রশ্রয় দেওয়া হয়, তাই আমরা এই প্রসঙ্গের উত্থাপন করিলাম। 'কণিকা'র জাতিযূথী-মল্লিকাপুঞ্জ সঙ্কীর্ণতার নরকে ফুটিয়া হিংসাবিদ্বেষের পবনে সৌরভ বিকীর্ণ করিতেছে, যে লেখক সমালোচকগণের প্রতি নিজের বিদ্বেষবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য অসঙ্কুচিতচিত্তে সাধারণের নিকট ইহা প্রচার করিতে পারেন, তিনিও যে সমালোচনায় প্রবৃত্ত হন, ইহা বিস্ময়কর। এরূপ বিড়ম্বনা বাঙ্গলা দেশেই সম্ভবে। "প্রতিশোধ" শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের একটি ক্ষুদ্র গল্প। লেখক বালক-চরিত্র লইয়া গল্পটি লিখিবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হয় নাই। অতুল ক্লাসে বসিয়া ছবি আঁকিতেছিল; অবিনাশ তাহাকে পণ্ডিত মহাশয়ের কাছে ধরাইয়া দিল। তাই অতুল ও অন্যান্য ছাত্রগণ জোট বাঁধিয়া অবিনাশকে জব্দ করিতে লাগিল। নানা প্রকারে উপদ্রুত হইয়া অবিনাশ অবশেষে যখন কাঁদিতে কাঁদিতে ঘাট মানিল, তখন অতুলের দয়া হইল। অতুল অবিনাশকে জিজ্ঞাসা করিল, 'আর কখনও কারুর নামে লাগাবে?' অবিনাশ শপথ করিয়া বলিল, 'আর কখনও না।' 'বল ঘাট।' 'ঘাট।' তার পর অতুলের আদেশে নাকে-খত দিয়া অবিনাশ নিষ্কৃতিলাভ করিল। অবিনাশ ব্যাচারার জন্য দুঃখ হয়! পক্ষান্তরে সে যে নিজকৃত কর্ম্মের ফল এত দিন সহ্য করিয়াছিল, এবং 'আমি কিছু করিনি ভাই! অমুকের জেদে পড়িয়া তোমার বিরুদ্ধে লাগিয়াছিলাম', সাংসারিক